পরমহংস যোগানন্দ

যোগী-কথামৃত

Yogoda Satsanga Society of India
FOUNDED 1917
Paramahansa Yogananda

যোগী-কথামৃত

(Autobiography of a Yogi)

শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ

বিরচিত

"যিনি যোগী, তিনি তপঃপরায়ণ সাধুগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এমনকি যাঁরা জ্ঞানমার্গ অথবা কর্মমার্গের সাধক তাঁদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; অতএব হে অর্জুন, তুমি যোগী হও!"

— শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬ ঃ ৪৬

শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজীর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার

শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দের আবির্ভাবের শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়েছে। বর্তমান যুগের এক উচ্চকোটির ঋষি-মহাত্মারূপে আজ তিনি সকলের মান্যতালাভ করেছেন। তাঁর জীবন ও কর্মের প্রভাব আজও ক্রমবর্ধমান। বহু বছর আগে, তাঁরই প্রবর্তিত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চিন্তা ও প্রক্রিয়াগুলি, আজ শিক্ষা, মনস্তত্ত্ব, ব্যবসা, চিকিৎসা ও অন্যান্য কর্মধারার মাধ্যমে প্রকটিত হচ্ছে এবং তা, মানবজীবন সম্বন্ধীয় এক দূরপ্রসারী সংগঠিত মানবিক ও অধ্যাত্ম দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে সহায়তা করে চলেছে।

আজ যে পরমহংস যোগানন্দজীর শিক্ষাবলীর নানা ব্যাখ্যা হচ্ছে এবং ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ও অধ্যাত্ম আন্দোলনের প্রবক্তারা বহুবিধ ক্ষেত্রে তার যে সৃজনশীল প্রয়োগ করছেন, তা থেকে আমরা যেমন তার মহান বাস্তব উপযোগিতাকে প্রত্যক্ষ করছি, সেই সঙ্গে এটাও উপলব্ধি করছি যে, কালপ্রবাহের সাথে সাথে উপদেশগুলি যাতে কোনভাবে সরলীকৃত, খণ্ডিত, বা বিকৃত হতে না পারে, তার জন্যে সবরকম উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাও একান্ত জরুরী।

পরমহংস যোগানন্দ সম্বন্ধীয় তথ্যের উৎস বহুমুখী হয়ে পড়ায়, পাঠকেরা অনেক সময় জানতে চান—কোনো প্রকাশনা শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দের জীবনী ও বাণীকে সঠিকভাবে তুলে ধরেছে কিনা, সে সম্বন্ধে তাঁরা নিঃসংশয় হবেন কিভাবে। এইসব জিজ্ঞাসার উত্তরে জানাই—নিজ শিক্ষাবলীর প্রচার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে তার শুদ্ধতা ও অখণ্ডতা বজায় রাখতেই পরমহংসজী যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/ সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ প্রতিষ্ঠা করেন। যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি/সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ প্রকাশন পর্ষদ (Publications

Council)-এ যারা কর্তৃত্বভার গ্রহণ করবে, তাদের তিনি স্বয়ং নিজ ঘনিষ্ঠ শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে থেকে মনোনীত ও প্রশিক্ষণদান করেন, এবং তাঁর ভাষণ, রচনা ও 'যোগদা সৎসঙ্গ লেশ্যনস্'-এর প্রস্তুতি ও প্রকাশন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাও দিয়ে যান। ওয়াই. এস্. এস্./এস্. আর. এফ্. প্রকাশন পর্ষদের সদস্যরা, এই পরমপ্রিয় জগৎগুরুর বিশ্বজনীন বাণী যাতে তার আদি শক্তি ও বিশুদ্ধতা চিরদিন বজায় রাখতে পারে, তার জন্যে ঐ সকল নির্দেশ এক পবিত্র আদেশ রূপেই গণ্য করে থাকেন।

বিশ্বব্যাপি আধ্যাত্মিক ও মানবিক কর্মধারা পরিচালনা ও পরিচিতিকরণার্থে পরমহংসজী তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠিত সংস্থার নামকরণ করেন যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/সেল্ফ-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ। ওয়াই. এস্. এস্./এস্. আর. এফ্.-এর প্রতীক চিহ্নটিও (ওপরে মুদ্রিত) স্বয়ং তাঁরই সৃষ্টি। ওয়াই. এস্. এস্./এস্. আর. এফ্.-এর যাবতীয় বই, অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিংস, ফিল্মস্ এবং অন্যান্য প্রকাশনায় এটি মুদ্রিত হয়ে থাকে। পাঠক তাই দেখে আশ্বস্ত হতে পারেন যে, প্রকাশনাটি শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ প্রতিষ্ঠিত সংস্থা থেকেই প্রকাশিত, এবং তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন ঠিক সেই ভাবেই, বিশ্বস্ততার সঙ্গে তা'তে তাঁর বাণী প্রচার করা হয়েছে।

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/
সেল্ফ-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ

পূজনীয় ও পরমারাধ্য আমার গুরুদেব
শ্রীশ্রী স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের
শ্রীকরকমলে অর্পিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি রচনায় শ্রীমতি এল. ভি. প্র্যাট্ (তারামাতা)-এর দীর্ঘ সম্পাদকীয় শ্রমের জন্য আমি তার কাছে গভীরভাবে ঋণী। শ্রী সি. রিচার্ড রাইটকেও তার ভারত পরিভ্রমণের দিনপঞ্জী থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করার অনুমতি দেওয়ায় আমার ধন্যবাদ জানাই। শুধুমাত্র মুখবন্ধ রচনার জন্যেই নয়, পরামর্শ ও উৎসাহ দানের জন্যেও আমি ডাঃ ডব্লু. ওয়াই. ইভান্স-ওয়েনৎসের কাছে কৃতজ্ঞ।

অক্টোবর ২৮, ১৯৪৫ পরমহংস যোগানন্দ

পরমহংস যোগানন্দজীর আশীর্বাদ

মৎপ্রণীত ইংরাজী *'অটোবায়োগ্রাফি অফ্ এ য়োগী'*র বঙ্গানুবাদে শ্রীমান ইন্দ্রনাথ শেঠের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রয়াস ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য আমি তাকে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাই।

২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ সাল
সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ পরমহংস যোগানন্দ
লস্-অ্যাঞ্জেলেস্, ক্যালিফোর্ণিয়া, ইউ.এস.এ.

গ্রন্থকার প্রসঙ্গে

"পরমহংস যোগানন্দ হলেন ভারতের গৌরব, প্রাচীন মুনি-ঋষিদের এক আদর্শ প্রতিনিধি। তিনি যেন এক অমেয় মূল্যের বিরল রত্ন, যার তুল্য কাউকে পৃথিবী আগে দেখেনি।"

— ***মহামান্য স্বামী শিবানন্দ,*** *হৃষিকেশের 'দি ডিভাইন লাইফ সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা*

"ইহজগতে যোগানন্দের উপস্থিতি ছিল তমসার মাঝে দীপ্যমান প্রদীপ্ত জ্যোতির তুল্য। একমাত্র মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দিলে তবেই তাঁর মত মহাপুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন।"

— ***মহামান্য শ্রী চন্দ্রশেখরেন্দ্র স্বরস্বতী,*** *শঙ্করাচার্য, কাঞ্চীপুরম*

১৮৯৩ সালের ৫ই জানুয়ারী উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ জন্মগ্রহণ করে, সকল জাতি ও ধর্মের মানুষকে নিজেদের জীবনে মানবাত্মার শোভনতা, মহত্ব ও দিব্যতার আরও অনুভব ও প্রকাশে সাহায্য করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

১৯১৫ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হয়ে তাঁর গুরু শ্রীশ্রী স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরির থেকে তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন। শ্রীযুক্তেশ্বরজী পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ভারতের সুপ্রাচীন ধ্যান প্রক্রিয়া "ক্রিয়া যোগ"কে সারা বিশ্বে প্রসারিত করাই হবে শ্রী যোগানন্দের জীবনের লক্ষ্য। ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব্ রিলিজিয়স লিবারেলস-এ ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে যোগদানের আমন্ত্রণ তিনি গ্রহণ করেন।

তাঁর শিক্ষাবলীকে প্রসার ও প্রচারের কাজের মাধ্যম হিসেবে পরমহংস যোগানন্দ, যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রচনার দ্বারা এবং ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও য়ুরোপের বিস্তৃত অঞ্চলে ভাষণ দিয়ে ও অসংখ্য আশ্রম ও ধ্যানকেন্দ্র স্থাপন করে তিনি হাজার হাজার সত্যসন্ধানীকে প্রাচীন যোগের বিজ্ঞান ও

দর্শন এবং তার ধ্যান প্রণালীর সার্বজনীন প্রবিধির সঙ্গে পরিচয় করান। ১৯৫২ সালের ৭ই মার্চ লস্ অ্যাঞ্জেলসে পরমহংসজী মহাসমাধি তে লীন হন।

শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজী আধ্যাত্মিক ও মানবসেবার যে কার্যধারার সূচনা করে যান, আজ শ্রীশ্রী মৃণালিনী মাতাজীর তত্ত্বাবধানে তা ক্রমাগত প্রসারিত হয়ে চলেছে। তাঁর কার্যসূচী পরিচালনে সাহায্য করতে শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজী শ্রীশ্রী মৃণালিনী মাতাজীকে স্বয়ং মনোনীত করে প্রস্তুত করেন। যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপের সঙ্ঘমাতা ও অধ্যক্ষারূপে শ্রীশ্রী মৃণালিনী মাতাজী পরমহংস যোগানন্দজীর শিক্ষাকে বিশ্বময় প্রসারিত করতে তাঁর আদর্শ ও সদিচ্ছাকে নিষ্ঠার সঙ্গে বহণ করে চলেছেন।

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

মুখবন্ধ

ডব্লু. ওয়াই. ইভান্স-ওয়েনৎস্, এম.এ., ডি.লিট., ডি.এস.সি.,
জিসস্ কলেজ, অক্সফোর্ড

টিবেটান য়োগা এণ্ড সিক্রেট ডকট্রিন্স, টিবেটস্ গ্রেট য়োগী মিলারেপা, দি টিবেটান বুক অফ্ দি ডেড্ প্রভৃতি প্রাচ্যদেশীয় যোগ ও প্রাচ্য জ্ঞান সম্বলিত উচ্চকোটি গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদক।

যোগানন্দজী লিখিত *'অটোবায়োগ্রাফি'*-র বিশেষত্ব হলো এইখানে যে, ভারতীয় সাধুমহাত্মাদের প্রসঙ্গে মুষ্টিমেয় যে ক'খানি বই ইংরেজী ভাষায় লিখিত হয়েছে, এ হলো তাদের অন্যতম। বইটি কোন সাংবাদিক বা বিদেশীর রচনা নয়; এ রচনা তাঁর যিনি ঐ মহাত্মাদেরই একজন ও তাঁদেরই ন্যায় কৃতবিদ্য। সংক্ষেপে বলতে হলে বলা যায়—বইটি এক যোগী লিখিত যোগীদের বৃত্তান্ত। আধুনিক হিন্দু ঋষিদের অসাধারণ জীবন ও শক্তির এ এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ; সে'কারণে বইটির গুরুত্ব যেমন কালোপযোগী, তেমনি কালাতীত। গ্রন্থটির খ্যাতনামা লেখক—যাঁর সঙ্গে ভারতে ও আমেরিকায় পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—তাঁর প্রতি প্রত্যেক পাঠকেরই সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। তাঁর অনন্য জীবনচরিতের মধ্যে দিয়ে আমরা হিন্দু মানস ও হৃদয়ের গভীরতা, এবং ভারতীয় অধ্যাত্ম সম্পদের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। পাশ্চাত্যে এরূপ প্রকাশনা আগে আর হয়নি।

গ্রন্থখানিতে যে সকল সাধুমহাত্মার জীবন-কাহিনীর বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে পরিচিত হবার অসীম সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমার 'Tibetan Yoga and Secret Doctrines'* বইটির প্রচ্ছদে পূজনীয় সেই সন্ন্যাসীর একটি ছবি রয়েছে। শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সঙ্গে আমার দেখা হয় বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী উড়িষ্যার পুরী শহরে। তিনি তখন সমুদ্রতটের কাছে নিরিবিলি এক আশ্রমের অধ্যক্ষ

---

* অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৫৮

হিসেবে কয়েক জন নবীন শিষ্যদের অধ্যাত্ম প্রশিক্ষণেই মূলতঃ ব্যাপৃত থাকতেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা সমগ্র আমেরিকায়, এমনকি ইংল্যণ্ডবাসীদের কুশল সংবাদ শুনতে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে, ১৯২০ সালে প্রতিনিধি করে আমেরিকায় পাঠানো তাঁর প্রধান শিষ্য—যাঁকে তিনি আন্তরিক ভালবাসতেন—সেই পরমহংস যোগানন্দের সুদুর ক্যালিফোর্ণিয়ার কাজকর্ম সম্বন্ধে আমার থেকে অনেক খোঁজখবরও নেন।

শ্রীযুক্তেশ্বরের প্রকৃতি ও কথাবার্তা ছিল শান্ত ধরণের, সান্নিধ্য মনোরম, এবং তাঁর শিষ্যেরা স্বতঃই তাঁকে যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন, তার একান্তই উপযুক্ত। যারা তাঁকে চিনতেন, তাঁরা শ্রীযুক্তেশ্বরের নিজের সম্প্রদায়ের হোন বা নাই হোন—সবাই তাঁকে উচ্চ সম্মান করতেন। আমার সুস্পষ্ট মনে পড়ে তাঁর দীর্ঘ, ঋজু, ঋষিসুলভ চেহারার কথা। গৈরিক বসন পরিহিত সংসারত্যাগী এই সন্ন্যাসী, আশ্রমদ্বারে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ ও দাড়ি সমন্বিত মুখশ্রী। দেহটি তাঁর দৃঢ় পেশীযুক্ত, কৃশকায় অথচ সুগঠিত। পদক্ষেপ বলদৃপ্ত। ধরাধামে মনোনিত তাঁর আবাস ছিল পবিত্র পুরীধাম, যেখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগণিত ধর্মপ্রাণ হিন্দু প্রতিদিন বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরে তীর্থভ্রমণ করতে আসেন। এই পুরীধামেই শ্রীযুক্তেশ্বরজী ১৯৩৬ সালে চোখ বুজে ক্ষনস্থায়ী দৃশ্যাবলীর থেকে চেতনা গুটিয়ে পরলোকে পাড়ি দেন—এই অববোধ নিয়ে যে ইহজীবনের কাজ তাঁর সুসম্পন্ন হয়েছে।

শ্রীযুক্তেশ্বরের সমুচ্চ ও পূতচরিত্রের প্রশংসাকীর্ত্তন লিপিবদ্ধ করতে পেরে আমি সত্যিই প্রীত। জনসমাজের বহুদূরে সুখে নিবাস করে, অকপটে ও শান্তিতে তিনি এক আদর্শ জীবন অনুসরণ করে গেছেন, যা তাঁর শিষ্য পরমহংস যোগানন্দ আগামী প্রজন্মের জন্যে এখানে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

বিশ্বব্যাপি উচ্চ প্রশংসাধন্য
অটোবায়োগ্রাফি অফ্ এ যোগী

"প্রতিবছর যে হাজার হাজার বই ছাপা হয়, তাদের মধ্যে কিছু বই আনন্দদায়ক, কিছু শিক্ষামূলক, আর কিছু অধ্যাত্ম উন্নতিসাধক হয়ে থাকে। পাঠক যদি কোন একটিমাত্র গ্রন্থে এই তিনের সম্মিলন দেখতে পান, তাহলে তিনি নিজেকে অবশ্যই ভাগ্যবান বলে মনে করতে পারেন। *'অটোবায়োগ্রাফি অফ্ এ যোগী'* তার চেয়েও দুর্লভ রচনা। এটি এমনই এক বই যা মন ও আত্মার জানালাকে খুলে দেয়।" —***ইণ্ডিয়া জার্নাল***

"এক অসাধারণ বিবরণ।" —***নিউইয়র্ক টাইমস্***

"অতুলনীয় শক্তি ও স্বচ্ছতায়, বইটির পাতায় পাতায় এক চিত্তাকর্ষক জীবন উদ্ঘাটিত হয়েছে—অশ্রুতপূর্ব উচ্চকোটির এমন এক ব্যক্তিত্ব, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে ... বইখানিতে অবিসংবাদিতভাবে এ'কথাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মানসিক ও আত্মিক প্রচেষ্টারই কেবলমাত্র স্থায়ী মূল্য আছে; আত্মিক শক্তির বলে সে যে কোনরকম পার্থিব বাধাকে জয় করতে পারে ... এই মূল্যবান জীবনীটির যে অধ্যাত্ম বিপ্লব ঘটানোর ক্ষমতা আছে, সেই স্বীকৃতি আমরা অবশ্যই জানাতে পারি।"

—***শ্লেস্উইগ্ হলস্টাইনইসেক ট্যাগেসপোস্ট, জার্মানী***

"... এক উল্লেখযোগ্য রচনা" —***শেফিল্ড টেলিগ্রাফ, ইংলণ্ড***

"বিস্ময়কর তথ্যপ্রকাশ ... অতীব মানবিক বিবরণ ... মানুষ নিজেকে আরও ভালভাবে বুঝতে শিখবে ... তুলনাহীন আত্মজীবনী ... শ্বাসরুদ্ধকারী ... অতি উপযুক্ত সময়ে প্রকাশিত ... আনন্দদায়ক হাস্যকৌতুকময় রচনা, যার সঙ্গে মিশেছে প্রগাঢ় নিষ্ঠা ... যে কোন উপন্যাসের মতই হৃদয়গ্রাহী।"

—***নিউজ-সেন্টিনেল, ইণ্ডিয়ানা, ইউ.এস.এ.***

"বইখানির বিষয়সূচী খুবই অভাবনীয় ... দার্শনিক বিষয়সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলি ভীষণ আগ্রহোদ্দীপক। এখানে যোগানন্দের স্থান ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে এক অধ্যাত্মলোকে।"

—*চায়না উইকলি রিভিউ, সাংহাই*

"অতি মনোরমভাবে লিখিত রচনা ... যোগের পক্ষে যোগানন্দ বিশ্বাসযোগ্য সওয়াল করেছেন; যারা 'উপহাস বা ব্যঙ্গ' করতে এসেছিল, তারা হয়ত প্রার্থনার জন্য থেকে যাবে।"

—*স্যান ফ্রান্সিসকো ক্রনিক্যাল*

"একটি চিত্তাকর্ষক, সুস্পষ্ট টীকাসমন্বিত রচনা" —*নিউজউইক্*

"এই শতাব্দীর এক গভীরতম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাণী।"

—*নেভে তেলতা জাইতুঙ্গ, অস্ট্রিয়া*

"এক অতীব মনোরম, সরল ও আত্মপ্রকাশক জীবনকাহিনী ... জ্ঞানের প্রাচুর্যময় ভাণ্ডার ... কত মহাপুরুষের যে দেখা পাই এর পাতায় পাতায় ... প্রভূত অধ্যাত্ম জ্ঞানসম্পন্ন বান্ধবদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, এবং তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন ঈশ্বরভাবুক লেখক নিজেই ... তুলনাহীন ... এ এক মহান্ আত্মার মহনীয় দর্শনপ্রাপ্তি।"

—*ডাঃ আন্না ভন হেলমহোলৎস ফেলান, মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ.এস.এ.*

"অমর মহাত্মাদের কথা, অলৌকিক নিরাময়ের কথা বা ভারতীয় প্রজ্ঞা ও যোগবিদ্যা—যে বিষয়েই যোগানন্দ আলোচনা করুন না কেন, পাঠক চমৎকৃত হন।" —*ডি ভোসেক, জুরিখ, সুইজারল্যাণ্ড*

"এটি এমন একখানি বই যার সাহায্যে পাঠক দেখতে পাবে তার চিন্তার সীমানা আদিগন্ত ছড়িয়ে পড়ছে; সে উপলব্ধি করবে তার হৃদয়, জাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যেই অনুভব করতে পারে। বইটিকে প্রত্যাদ্দিষ্ট রচনা বলতে পারি।" —*লেফথেরিয়া, গ্রীস*

"যোগানন্দের প্রখ্যাত *'অটোবায়োগ্রাফি অফ্ এ য়োগী'*তে, ব্রহ্মানুভূতির তিনি এক বিস্ময়কর বিবরণ দিয়েছেন যা যোগসাধনার উচ্চতর মার্গে পাওয়া যায়। তাছাড়া যোগ ও বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানব চরিত্রের নানা আগ্রহোদ্দীপক চিত্রাঙ্কন করেছেন।"

—***রবার্ট এস. এলউড***, *পি.এইচ.ডি., স্কুল অফ্ রিলিজিয়ন, দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়*

"যোগসাধনার সঙ্গে নতুন করে সংযোগ, বাস্তব সত্যের চেয়ে তার মানসিক উচ্চাবস্থা, আধ্যাত্মিক অনুশাসন—সব আমার কাছে বড়ই শিক্ষামূলক। এই আকর্ষণীয় জগতের কিছু অন্তর্দৃষ্টি আমাকে দান করার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।" —***টমাস ম্যান***, *নোবল পুরস্কার বিজেতা*

"পরমহংস যোগানন্দ হলেন এমন মানুষ, যাঁর অনুপ্রেরণা পৃথিবীর কোণায় কোণায় সর্বত্র সশ্রদ্ধভাবে গৃহীত হয়েছে।"

—***রাইডারস রিভিউ***, *লণ্ডন*

ভূমিকা

স্বর্গীয় সরোজ কুমার দাস, এম.এ., পি.এইচ.ডি. (লণ্ডন),

অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(১৯৫২ সালে রচিত)

পরমহংস যোগানন্দ বিরচিত *"অটোবায়োগ্রাফি অফ্ এ য়োগী"* বহু ভাষায় ইতিমধ্যে অনূদিত হয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই "আত্মজীবনী"র প্রচার-ব্রত-উদ্‌যাপনে ভূমিকা-লেখকের স্থান অতি গৌণ এবং নগণ্য। এক্ষেত্রে লেখক তাঁর দায় ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তদধিক নিজ অযোগ্যতাবিষয়ে। বলা বাহুল্য, অনেক সময় এই দৈন্যনিবেদনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অহমিকার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে অহং প্রদীপমাত্র আর আত্মা নিরপেক্ষ, নিরবচ্ছিন্ন আলোক। প্রদীপের পরিচয় তৈলাধার বা তৈলবর্তিকায় নয়, কিন্তু দীপ-শিখার উজ্জ্বলতায়। সেইজন্যই ভগবান বুদ্ধের উপদেশ-বাণী ছিল—"আত্মদীপো ভব" অর্থাৎ আপনাকে প্রদীপ করিয়া তুলিবে। এই অহমিকার আবরণ, যাকে কবির ভাষায় বলা যায়—"আপনারে দিয়ে রচিলিরে কি এ আপনারই আবরণ"—যখন অপসৃত হয় তখনই প্রকাশিত হয়, উপনিষদ-বর্ণিত সেই "তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি স্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ", সেই আলোর আলো, যাঁকে আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই কেবল জানতে পারেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য সেণ্ট জনের দিব্যদৃষ্টি-উজ্জ্বলিত ও মধ্যযুগীয় মরমী সাধক ও ভক্ত ঋষি অগষ্টিনের বাণী—"যে জ্যোতির্মণ্ডলের দীপ্তি প্রতিভাত হয় এই মর্ত্যলোকবাসী প্রতি মানবের হৃদয়ক্ষেত্রে।"

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের আলোচ্যবিষয় এমন একটি স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বয়ংজ্যোতিঃ, সসম্পূর্ণ নিবেদিতজীবন, যার পূর্ণ পরিচয় পাই যোগানন্দজীর পরম প্রিয় রবীন্দ্রনাথের এই গানটিতে ঃ—

"আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহ-দীপখানি জ্বালো হে।

... ...

পরশমণির প্রদীপ তোমার, অচপল তার জ্যোতি,

সোনা ক'রে লবে পলকে আমার সকল কলঙ্ককালো।"

যে 'আত্মানুভূতির প্রেরণা, যোগানন্দজী পূর্বজন্মের সংস্কাররূপে গুরু-পরম্পরাগত আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারক্রমে লাভ করেছিলেন

কৈশোরে, আকৈশোর-যৌবন যার সাধনা করেছিলেন অতন্দ্র, অনলস, অনন্যপর "ক্রিয়াযোগ" মাধ্যমে এবং যার পূর্ণাঙ্গ পারণতি সম্ভাবিত হয়েছে তাঁর বিশ্বব্যাপী "সেল্ফ-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ" মহাসঙ্ঘের বহু শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায়, সেই প্রেরণার ছায়াপাত হয়েছিল তাঁর শৈশবে এক স্মরণীয় ঘটনায়।

পরমহংস যোগানন্দজীর ভক্তপ্রাণা ক্রিয়াযোগদীক্ষিতা মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণের প্রায় মাস চৌদ্দ পরে, মৃত্যুশয্যায় কথিত এবং জ্যেষ্ঠপুত্র অনন্তের নিকট সুরক্ষিত বিবরণী হ'তে আমরা জানতে পারি যে তাঁর পরমগুরু (এবং মাতৃদেবীর গুরুদেব যোগিরাজ লাহিড়ী মহাশয়) শিশু যোগানন্দকে কোলে বসিয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের মত কপালে হাত রেখে বলেছিলেন তাঁকে—"মা জননী, তোমার ছেলে একজন যোগী হবে, আর আধ্যাত্মিক ইঞ্জিনের মত এ বহুলোককে ভগবানের রাজ্যে টেনে নিয়ে যাবে" (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)। পরে আর একবার এই নিবেদিতজীবনের এক পরম সন্ধিক্ষণে, আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে, যখন সমস্তই নৈরাশ্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন, তখন পেলেন সেই প্রত্যাদেশ, সেই ভবিষ্যদ্বাণী, সেই মুক্তধারা, যা সকল বাধাবিঘ্ন ভাসিয়ে দিয়ে, যুক্তরাষ্ট্রের "ক্রিয়াযোগ"-উন্মুখীন মহামিলনতীর্থে এই স্বামী যোগানন্দকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিল। সেই যুগবাণীর যেমন তদানীন্তন তথা চিরন্তন মূল্যও আছে, এবং সেই কারণে এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঃ—

"আমার জন্মভূমি, আমার গুরুদেব সব ত্যাগ করে আমেরিকার কোন্ অজানা দেশে পাড়ি জমাবার জন্যে যখন তৈরী হতে লাগলুম—মন যে ভয়ে একটুও কাঁপেনি তা নয়। ... অবশ্য আমেরিকায় যাবার জন্যে মন পূর্ব হতেই স্থির করে ফেলেছিলুম, কিন্তু প্রথমে ঈশ্বরের অনুমতি আর তাঁর আশ্বাসবাণী শোনবার জন্যে মনে সঙ্কল্প আরও দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল। প্রার্থনা চলতে লাগল—বিরাম নেই। বুকের কান্না বুকে চেপে রেখে অনঢ় হয়ে বসে সমস্ত অন্তর উজাড় করে ভগবচ্চরণে আমার কাতর প্রার্থনা করুণভাবে নিবেদন করতে লাগলুম ... আরও গভীরভাবে ক্রন্দন করতে গেলে মনে হচ্ছিল যেন মাথা বুঝিবা এখুনিই ফেটে যায়! সেই মুহূর্তে আমাদের বসত বাড়ীর সদর দরজায় একটা আঘাতের শব্দ শুনতে পেলুম। দরজা খুলে দেখি, কৌপিনধারী এক নবীন সন্ন্যাসী ... অতি মধুর হিন্দীতে বললেন, "আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন, তিনি তোমায় বলতে আমাকে আদেশ করেছেন যে তুমি গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে আমেরিকায় যাও, ভয়

কোরো না। ঈশ্বরই সর্বদা তোমায় রক্ষা করবেন। ... তোমাকেই আমি পশ্চিমে "ক্রিয়াযোগ"-এর বাণী প্রচার করবার জন্যে নির্বাচিত করেছি। বহুদিন পূর্বে কুম্ভমেলায় তোমার গুরুদেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখন আমি তাঁকে বলেছিলুম যে তোমাকেই আমি তাঁর কাছে শিক্ষার জন্যে পাঠাব। ... ঈশ্বরানুভূতির যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অর্থাৎ ক্রিয়াযোগ তা সবদেশেই শেষে বিস্তারলাভ করবে—আর মানুষের সেই অনন্ত করুণাময় পরমপিতার ব্যক্তিগত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্য দিয়েই জাতিসমূহের মিলন সাধিত হবে।" (৩৭ পরিচ্ছেদ)। বত্রিশ বৎসর পূর্বে শহরতলীর সাধারণ পরিবেশের মধ্যে যে অসাধারণ মানসিক পরিস্থিতিতে এই দিব্যদৃষ্টিসূচক ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, তার একমাত্র ঐতিহাসিক অথবা পৌরাণিক নিদর্শন দেখি ভগবদ্‌গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপদর্শনপ্রকরণে। যোগানন্দজীর চিত্তে তৎকালিক ভাবাবেশ যে তাই হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই এই ভাবাবেগ বর্ণনাকল্পে দ্বাদশ শ্লোকে উদ্ধৃত ভাষণে ঃ—

"নভোমণ্ডলে যদি সহস্র তপনের দীপ্তি একই সময়ে উত্থিত হয়, তবেই সেই ভাস্বতী প্রভার সহিত বিশ্বাত্মরূপী এই দৃষ্টিভাতির কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য মিলিতে পারে।"

এই বিশ্বাত্মদৃষ্টিপ্রভাবের ছন্দানুবর্তনে যোগানন্দজীর সাক্ষাৎ গুরু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে এই সূত্রভাষ্যকল্প নির্দেশ দিয়েছিলেন ঃ—

"ভুলে যাও যে তুমি একজন হিন্দু হয়ে জন্মেছ আর মার্কিনদেরও জীবনধারার সব কিছু যেন নিয়ে বোসো না। উভয়ের যা সবচেয়ে ভাল তাই গ্রহণ কোরো। অমৃতের পুত্র তুমি — তোমার যা স্বরূপ, তাইতেই প্রকাশিত হ'য়ো। আর পৃথিবীর চারদিকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তোমার যে সব ভাইয়েরা, তাদের মধ্যে যা' কিছু সব সদ্‌গুণ তা নিয়ে নিজেকে গড়ে' তুলো।"

এই বিশ্বতোমুখী দৃষ্টির বীজ যখন উপ্ত হ'ল সুদূর পশ্চিমে আমেরিকার ক্রিয়ামূলক মননশীলতার চিত্তক্ষেত্রে, তখনই অঙ্কুরিত হ'ল অনতিকালমধ্যে শাখাপ্রশাখাবিসর্পী "যোগদা সৎসঙ্গ/সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ"। ঋষিসুলভ ধ্যানচক্ষুতে এই গুরুত্রিতয় দেখেছিলেন যে এই প্রণালীতেই চিরপ্রবাহমান ভারতের সনাতন ধর্ম ও কৃষ্টি জগতে প্রচার করতে হবে এবং

তার জন্য চাই যুগোপযোগী মনোবৃত্তি ও প্রচার-পরিকল্পনা। এর অর্থ এই নয় যে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে পরকীয়া কৃষ্টির শরণাপন্ন হ'তে হবে আমাদের এই অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেও। দূরাবগাহী মননশক্তিতে এই সাধকত্রয় দেখেছিলেন যে, "সনাতন বলা যায় তাকেই, যা আজ এখানেই নবজীবনে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে।" ("সনাতনমেনমাহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ—" অথর্ববেদ)।

ভারতীয় জীবন-দর্শনের এই চিরন্তনবাণী যে অদ্যতন জীবনে বিস্মৃত ও বিলুপ্তপ্রায়, তা অস্বীকার করা যায় না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঋগ্বেদীয় শাখার ঐতরেয়ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এই জীবনদর্শনের নজীর ও নিদর্শন পাই রূপকের ভাষায়, রাজপুত্র রোহিতের বিরামহীন পর্যটনের মধ্যে। "চলাটাতেই হয় অমৃতত্বলাভ, চলাতেই লাভ হয় তার স্বাদুসুমিষ্ট ফল, চেয়ে দেখ সূর্যের কি আলোকসম্ভার—যে সূর্য সৃষ্টির প্রথমতম মুহূর্ত থেকে অতন্দ্রিত চলার পথে এগিয়ে চলেছে। অতএব চল, এগিয়ে চল।"

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণম্ যো ন তন্দ্রয়তে চরন্। চরৈবেতি চরৈবেতি।।"

এরই কি প্রতিধ্বনি আজ শুনতে পাচ্ছি না আমেরিকার গহন-গোপন আধ্যাত্মিক জীবনের বাণীতে যা স্ফুরিত হয়েছে ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যানের (দি সঙ্গ্ অফ্ দি ওপন্ রোড) "উন্মুক্ত রাজপথের উদাত্ত সঙ্গীতে" ঃ—

"হে পথিক বন্ধু মোর! যে কেহ হওনা তুমি,
এস আজি, চল মোর সাথে;
ভ্রমিলে আমার সাথে, পাইবে খুঁজিয়া যাহে
ক্লান্তি কভু স্পর্শে না তোমাতে।
... ...
হতাশ হয়োনা কভু, অগ্রসর হয়ে চল,
এস তুমি মোর পাশে আজ;
ছড়ায়ে রয়েছে জেনো দৈবীসম্পদভার,
চলিবার এ পথেরি মাঝ!"

কেবল ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেই যে এই জীবন-দর্শনের সমাধি হয়েছে, তা নয়—সম্প্রদায়নির্বিশেষে এই গতিশীল জীবন-দর্শন, "অর্থক্রিয়াকারিত্ব" (প্র্যাগম্যাটিক্, প্র্যাক্টিক্যাল এফিসিয়েন্সি)-কেই সত্যত্বাবধারণ বা সত্তার

মানদণ্ডরূপে স্বীকার করে এসেছে।

ক্রিয়াযোগের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য এ যুগে দেশে ও বিদেশে প্রচারিত হয়েছে চল্লিশ বছরের উপর এবং এখনও যা পূর্ণতরভাবে সক্রিয় রয়েছে, তাই এই "আত্মজীবনী"র মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। "ভূমিকা"য় এর অবতারণা সুবিবেচনার পরিচায়ক নয়। সুধী পাঠকবর্গের এটাই লক্ষ্য করবার বিষয় যে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যের ফ্রয়েডের মনোবিকলন বা বিশ্লেষণ ("সাইকো-এনালিসিস্") পদ্ধতি অবলম্বনে যে উন্মাদনা চলেছে, তা যে এই মানসধর্মশাস্ত্রের শেষ কথা নয়, তা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রমাণপর্যায়সহ প্রতিপাদিত হয়েছে যোগানন্দজীর জীবনভাষ্যোজ্জ্বলিত এই জীবন-বেদে। মনঃসমীক্ষণ বা মনোবিকলনের ঊর্ধ্বে যে মনঃসঙ্কলন বা মনঃসংশ্লেষ ("সাইকো-সিন্থেসিস্")-এর স্থান, ফ্রয়েডের অবচেতন ("আন্‌কন্সাস্"), প্রাক্‌চেতন ("প্রি-কন্সাস্") এবং চেতন ("কন্সাস্") অন্তঃকরণের এই সর্ববাদিসম্মত প্রবিভাগের ঊর্ধ্বে যে প্রত্যগাত্মার ("সুপার-এগো") বা উন্মনী আত্মশক্তির স্বীকৃতি রয়েছে, তারই পরিপূর্ণ বিকাশ পদ্ধতি নির্দেশকল্পে এই "আত্মজীবনী", এই যুগের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। "যোগ" যে কেবলমাত্র "চিত্তবৃত্তিনিরোধ" নয়, কিন্তু চিত্তবৃত্তি-বিকাশ-পরিকল্পনা পদ্ধতি —এই যুগবাণী প্রচার আজ সার্থক হয়েছে।

হে যোগিবর! তোমাকে আজ আহ্বান করি তোমার চির অভীপ্সিত ব্রত-উদ্‌যাপনক্ষেত্রে। তুমি যে সেই উপনিষদ্-বর্ণিত "প্রাণো বিরাট", বিরাট প্রাণেরই অংশীভূত, তাই তোমার অনুপ্রাণনা আজও সমভাবেই সক্রিয়। তোমার মত পরিপূর্ণপ্রাণ ব্যক্তির কখনও প্রয়াণ সম্ভবপর নয়—"ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি"। তাই তোমায় আহ্বান করি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্যরচিত হৃদয়াসনে. নব নব রূপে তুমি জন্মপরিগ্রহ কর দৈহিকসম্পর্কবিরহিত আমাদের চিত্তলোকে ঃ—

"উদ্যতে নমঃ, উদায়তে নমঃ, উদিতায় নমঃ।
বিরাজে নমঃ, স্বরাজে নমঃ, সম্রাজে নমঃ।।"

"উদিত হইবে যে তুমি তোমায় নমস্কার, উদীয়মান যে তুমি তোমায় নমস্কার, উদিত যে তুমি তোমায় করি নমস্কার। বিরাজিত যে তুমি তোমায় নমস্কার, স্বয়ংপ্রকাশ স্বরাট তোমায় নমস্কার, স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত সম্রাট, তোমাকে করি নমস্কার।"

প্রাগ্‌-কথন

"পরমহংস যোগানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা আমার জীবনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনারূপে স্মৃতিতে খোদিত হয়ে আছে ... সেই দর্শনলাভের প্রভাব অকল্পনীয় ... তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই আমার মনে হলো অত্যুজ্জ্বল এক আলোয় আমার চোখ প্রায় ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। এ হলো এক অধ্যাত্ম জ্যোতি, আক্ষরিক অর্থেই যা তাঁর মধ্যে থেকে প্রতিভাত হতো। তাঁর অসীম মৃদুলতা, করুণাপূর্ণ সহৃদয়তা, উষ্ণ রবিকিরণের মতো আমায় বেষ্টন করে রাখতো ... আধ্যাত্মিক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর বোধগম্যতা ও অন্তর্দৃষ্টি পার্থিব সমস্যার ওপরেও যে বিস্তারিত হতো তা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তাঁর মধ্যে আমি পেয়েছিলাম জগতের কাছে ভারতের সুপ্রাচীন জ্ঞানের বাহক ও প্রাচারক স্বরূপ প্রকৃত এক রাষ্ট্রদূতকে।"

—ডঃ বিনয়রঞ্জন সেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত
ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত

পরমহংস যোগানন্দজীকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে জানতেন তাঁদের কাছে তাঁর জীবন ও ব্যক্তিসত্ত্বা ছিল, সুপ্রাচীন যে জ্ঞান তিনি জগতের সামনে উপস্থাপন করেন, তারই অকাট্য এক প্রতিভূ। তাঁর আত্মকথার অসংক্ষ্য পাঠক সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তাঁর মধ্যে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রকাশ দেখা যেত, তাঁর আত্মকথার পাতায়-পাতায় সেই জ্ঞানালোক বিদ্যমান। ষাট বছরেরও কিছু পূর্বে যখন এই বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনই এ এক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হিসেবে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে; শুধু মাত্র এক মহাপ্রাণের জীবন কাহিনীই এই গ্রন্থে উক্ত, তা নয়; এ বইয়ে রয়েছে পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের অধ্যাত্মচিন্তনের, বিশেষ করে ঈশ্বরের সঙ্গে সরাসরি ব্যক্তিগত সম্পর্কস্থাপনের অনন্য বিজ্ঞানের এক চিত্তাকর্ষক প্রস্তাবনা—পাশ্চাত্যবাসীর কাছে গ্রন্থটি এমন এক জ্ঞানরাজ্য উন্মোচিত করে যে সম্বন্ধে অতি অল্পসংখ্যক মানুষ-ই পূর্বে অবগত ছিলো।

আজ *'অটোবায়োগ্রাফী অফ্ এ য়োগী'* (বঙ্গানুবাদঃ যোগী কথামৃত) সমগ্র বিশ্বে আধ্যাত্মিক সাহিত্যের এক ক্লাসিক গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত। এই ভূমিকায় আমরা এই গ্রন্থের অসাধারণ ইতিহাসের কিছু প্রসঙ্গ তুলে ধরতে চাই।

❖ ❖ ❖

এই গ্রন্থ যে লেখা হবে, তা বহুপূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। আধুনিক যুগে যোগের পুনরুজ্জীবনের ভিত্তিস্থাপকদের অন্যতম উনবিংশ শতাব্দীর মহাযোগী পূজনীয় শ্রী শ্রী লাহিড়ী মহাশয় ভবিষ্যদ্বাণী করেন, "আমার তিরোভাবের পঞ্চাশ বৎসর পরে আমার জীবন কথা লিখিত হবে, কারণ প্রতীচ্যে যোগ সম্বন্ধে তখন একটা গভীর আগ্রহ দেখা দেবে। এই যোগের বার্তা সে সময় সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়বে আর মানবজাতি যে একই পিতার সন্তান, তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে এক বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠবে।"

এর বহু বৎসর পরে, লাহিড়ী মহাশয়ের মহিমান্বিত শিষ্য স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী যোগানন্দজীর কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা উক্ত করে বলেন, "তাঁর পবিত্র জীবনকথা লিপিবদ্ধ করতে, তুমি অবশ্যই তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করবে।"

১৯৪৫ সালে, লাহিড়ী মহাশয়ের দেহ রাখার ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে পরমহংস যোগানন্দ তাঁর *'অটোবায়োগ্রাফী অফ্ এ যোগী'* গ্রন্থটি লেখা শেষ করেন; ফলে তাঁর গুরুদেবের দুই নির্দেশই সম্পূর্ণ রূপে পালিত হয়ঃ লাহিড়ী মহাশয়ের অসাধারণ জীবনের ইংরেজী ভাষায় প্রথম বিশদ উপস্থাপনা ও বিশ্বের জনসমূহের কাছে ভারতের সুপ্রাচীন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের পরিচয় প্রদান।

'অটোবায়োগ্রাফী অফ্ এ যোগী' লেখার কাজে পরমহংস যোগানন্দ বহু বছর ব্যাপৃত থাকেন। তাঁর প্রথম দিকের নিকটতম শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম শ্রীদয়ামাতা* স্মৃতিচারণে বলেনঃ

"১৯৩১ সালে আমি মাউন্ট ওয়াশিংটনে আসি, তার আগেই

---

* লস্-অ্যাঞ্জেলেস্ শহরে মাউন্ট ওয়াশিংটনের ওপর পরমহংস যোগানন্দজীর প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাস সংস্থায় শ্রী দয়ামাতার ১৯৩২ সালে প্রবিষ্ট হন। ১৯৫১ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত, তাঁর মৃত্যু অবধি যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/ সেল্ফ-রিয়েলাইজেশন ফেলোশিপ-এর অধ্যক্ষ রূপে তিনি সেবা করেন।

পরমহংসজী *'অটোবায়োগ্রাফী'* লেখার কাজ আরম্ভ করেন। একবার তাঁর সচিব হিসেবে কিছু কাজের জন্যে তাঁর পড়ার ঘরে, পূর্বেই রচিত কয়েকটি পরিচ্ছেদের একটি— *'দি টাইগার স্বামী'* (বঙ্গানুবাদ ঃ সোহং স্বামী) দেখার সৌভাগ্য আমার হয়। তিনি আমায় তা সংরক্ষিত করে রাখতে বলে বলেন যে তিনি যে বই লিখছেন—ঐটি তার মধ্যে যাবে। বইটির বেশির ভাগই পরে, ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে লেখা হয়।"

১৯৩৫ এর জুন থেকে ১৯৩৬ এর অক্টোবর পরমহংস যোগানন্দজী (ইউরোপ ও প্যালেস্টাইন হয়ে) তাঁর গুরুদেব স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করতে ভারতে ফেরেন। এই সময়ে তিনি তাঁর *'অটোবায়োগ্রাফী'*র জন্য প্রচুর তথ্য ও তাঁর জানা সাধু-মহাত্মাদের জীবন-কাহিনী সংগ্রহ-সংকলন করেন যা অবিস্মরণীয় ভাবে এ গ্রন্থে তিনি বর্ণনা করেন। পরবর্তীকালে তিনি লেখেন, "শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর অনুরোধ ছিল আমি যেন লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনী লিখি; সেকথা আমি কখনও ভুলিনি। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয়ের আত্মীয়স্বজন আর তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের প্রত্যেকটি সুযোগ আমি গ্রহণ করেছিলাম। তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে আমি প্রত্যেকটি ঘটনা সন তারিখসহ মিলিয়ে নিয়েছি; তাছাড়া ফটোগ্রাফ, পুরানো চিঠি ও অন্যান্য দলিলপত্রাদিও সংগ্রহ করেছি।"

১৯৩৬ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসেন। তার পর থেকে তিনি তাঁর অধিকাংশ সময় দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্র-সৈকতে অবস্থিত—তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর জন্যে নির্মিত—এন্সিনিটাস্ আশ্রমে কাটাতে আরম্ভ করেন। বহু বছর আগে যে বইটি তিনি লিখতে শুরু করেন, তা শেষ করার কাজে মনোযোগ দেওয়ার এ ছিল এক উপযুক্ত পরিবেশ।

শ্রীদয়ামাতা স্মৃতিচারণে বলেছেন, "সমুদ্রের ধারে অবস্থিত সেই শান্ত আশ্রম পরিবেশে কাটানো দিন আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তাঁর দায়-দায়িত্বের এতই কাজ থাকতো যে *অটোবায়োগ্রাফী* লেখার কাজ করে উঠতে পারতেন না; কিন্তু সন্ধ্যায়, ও অবসর পেলেই বইটি লেখায় ব্যস্ত হতেন। ১৯৩৯ বা'৪০ সালের প্রথম থেকেই তিনি তাঁর

পূরো সময় এই বই লেখায় ব্যস্ত হওয়ার সুযোগ পান। পুরোটা সময়ই এতে যেত—এক ভোর থেকে পরের দিনের ভোর পর্যন্ত! শিষ্যদের একটি ছোট্ট গোষ্ঠী—তারামাতা; আমার বোন, আনন্দমাতা; শ্রদ্ধামাতা ও আমি—তাঁর সাহায্যার্থে থাকতাম। টাইপ হওয়ার পর প্রত্যেকটি অংশ তিনি তারামাতার হাতে তুলে দিতেন, তারামাতা পরমহংসজীর লেখা সম্পাদনে সাহার্য করতেন।

"কি অমূল্য স্মৃতি! লিখতে লিখতে তাঁর বর্ণিত পবিত্র অভিজ্ঞতাগুলি তিনি আপন অন্তরে পুনরায় প্রত্যক্ষ করতেন। তাঁর দিব্য উদ্দেশ্য ছিল সাধু-মহাত্মাদের সাহচর্যে ও তাঁর আপন ঈশ্বর-উপলব্ধি থেকে লব্ধ আনন্দ ও প্রত্যক্ষিত অনুভূতি সবার সাথে ভাগ করে নেওয়া। প্রায়ই তিনি কিছুক্ষণ থামতেন; দৃষ্টি উর্ধ্বে, দেহ নিথর, ঈশ্বরের সঙ্গে সুগভীর একাত্মতায় সমাধি নিমগ্ন। ঐশী প্রেমের প্রবল এক দিব্য আভায় সারাটা ঘর ভরে যেত। সেখানে উপস্থিত আমরা, চেতনায় উন্নত এক স্তরে ওঠার অনুভূতি লাভ করতাম।

"অবশেষে এলো ১৯৪৫ সালে বইটি লিখে শেষ করার আনন্দঘন সে দিন! পরমহংসজী গ্রন্থটির শেষ অংশে লিখলেন, 'প্রভু, তুমি এই সন্ন্যাসীটিকে কত বড় সংসারই না দিয়েছ!' কলম নামিয়ে তারপর সানন্দে বললেন ঃ

"'অবশেষে শেষ হলো। এ বই লক্ষ-লক্ষ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনবে। আমি চলে গেলে এ হবে আমার বার্তা বাহক।'"

তারামাতার ওপর বইটির প্রকাশক সন্ধানের দায়িত্ব বর্তালো। ১৯২৪ সালে পরমহংস যোগানন্দ স্যানফ্রান্সিস্কো শহরে বেশ কিছু বক্তৃতা দেন ও ক্লাস নেন; এই সময় তারামাতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। অসাধারণ আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্না হওয়ার দরুণ তারামাতা তাঁর উন্নততম শিষ্য-শিষ্যাদের ছোট্ট গোষ্টির একজন হয়ে ওঠেন। পরমহংসজী সম্পাদনার কাজে তাঁর দক্ষতা সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন ও বলতেন যে তাঁর দেখা সর্বাধিক মেধাসম্পন্ন মানুষদের মধ্যে তারামাতা অন্যতম।

তিনি ভারতের শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে তারামাতার গভীর ধারনা ও প্রতীতির প্রশংসা করতেন ও এক বার বলেছিলেন, "আমার গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বরজীকে বাদ দিলে আর কারো সঙ্গেই ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করে আমি এত আনন্দ পাইনি।"

তারামাতা পান্ডুলিপি নিউ ইয়র্ক শহরে নিয়ে যান। কিন্তু প্রকাশক পাওয়া সহজ ছিল না। প্রায়ই এমন দেখা যায় যে কোন মহান সৃষ্টিকে অপেক্ষাকৃত প্রচলিত চিন্তাধারার মানুষ জন বুঝতে পারেন না। নবাগত পারমানবিক যুগ, জড়-শক্তি-চিন্তার সূক্ষ্ম ঐক্যের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান দ্বারা মানবতার সমষ্টিগত চেতনাকে প্রসারিত করে তুলেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকাশকেরা "হিমালয়ে প্রাসাদ সৃষ্টি" ও "দুই দেহধারী সাধু"—এমন সব অধ্যায়ের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না!

এক বছর ধরে তারামাতা স্বল্প আসবাবের ঘর, বা গরম জলের ব্যবস্থাবিহীন ফ্ল্যাটে থেকে নানা গ্রন্থ-প্রকাশনা সংস্থায় যাতায়াত করতে থাকেন। অবশেষে তিনি সাফল্যের খবর দিয়ে তার পাঠান। নিউ ইয়র্কের এক স্বনামধন্য প্রকাশক, দি ফিলজফিকাল লাইব্রেরী *'অটোবায়োগ্রাফী'*-র প্রকাশনের ভার গ্রহণ করলো। যোগানন্দজী বললেন, "এই বইটির জন্যে ও যা করেছে, তা বলে বোঝানোর নয়। ও না থাকলে আমরা এই বইটির কাজ শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারতাম না।"

১৯৪৬ সালে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে খ্রিস্টমাসের মাত্র কয়েক দিন আগে, অনেক প্রতিক্ষিত বইগুলি মাউন্ট ওয়াশিংটনে এসে পৌঁছলো।

পাঠকবর্গ ও বিশ্বের সংবাদপত্র গুলি প্রশংসা-বর্ষণ দ্বারা গ্রন্থটিকে স্বাগত জানালো। কলোম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস তার রিভিউ অফ্ রিলজিয়েন্স্ লিখলো, "যোগ সম্বন্ধীয় এমন একখানি বই পূর্বে কখনও ইংরেজী অথবা অন্য কোন য়ুরোপীয় ভাষায় রচিত হয়নি।" নিউজ উইক-এ লেখা হয়, "যোগানন্দের গ্রন্থখানি দেহের নয়, আত্মার আত্মকথা....এ প্রাচ্যের সরস শৈলীতে অকপটভাবে লেখা ধার্মিক জীবনযাপন প্রণালীর একটি চিত্তাকর্ষক ও সুস্পস্ট টীকাসমন্বিত রচনা।"

গ্রন্থটির অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বের বহু সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রিকায় এ নিয়ে আলোচনা প্রকাশিত হতে লাগলো।

শীঘ্রই এর দ্বিতীয় সংস্করণ, ও ১৯৫১ সালে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে পাঠ্য ও তত্ত্বের কিছু অংশ পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত করা হয়। যে সকল সাংগঠনিক কার্য্যক্রম ও পরিকল্পনা ইত্যবসরে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে, তা বাদ দেওয়া হয়। তা ছাড়া পরমহংস যোগানন্দজী ১৯৪০ থেকে ১৯৫১ সময়কালের বর্ণনা-সমৃদ্ধ শেষ পরিচ্ছেদ যোগ করেন। এই নতুন পরিচ্ছেদের টীকায় তিনি লেখেন "গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ (১৯৫১)-এ উনপঞ্চাশতম পরিচ্ছেদে নতুন অনেক কিছু যোগ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী দুটি সংস্করণের বহু পাঠকদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে, এই পরিচ্ছেদে আমি ভারত, যোগ ও বৈদিক দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অন্তর্ভুক্ত করেছি।"*

১৯৫১ সালের সংস্করণে লেখকের টীকায় তিনি লেখেন, "হাজার-হাজার পাঠকদের লেখাপত্র আমায় প্রবল ভাবে আন্দোলিত করেছে।

---

* পরমহংস যোগানন্দ কৃত আরও কিছু পরিবর্তন সপ্তম (১৯৫৬) সংস্করণে অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যা এই সংস্করণের প্রকাশকের টীকায় বর্ণিত ঃ-

"১৯৫৬ সালের মার্কিন সংস্করণে লণ্ডন (ইংল্যাণ্ড)-এর ১৯৪৯-এর সংস্করণে পরমহংস যোগানন্দ কৃত পরিবর্তন তথা ১৯৫১ সালে আরও যা অদল-বদল তিনি করেন, তাও তাতে স্থান পেয়েছে। ১৯৪৯ সালের ২৫ অক্টোবর 'লণ্ডন সংস্করণের টীকায়' পরমহংস যোগানন্দ লেখেন, "এই বইটির লণ্ডন সংস্করণ প্রকাশিত করার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তা আমায় কিছু পরিবর্তন করার ও অল্প কিছু আরও যোগ করার সুযোগ দিয়েছে। শেষ পরিচ্ছেদে নতুন কিছু তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। এ ছাড়া মার্কিন সংস্করণের পাঠকদের কিছু প্রশ্নের উত্তরও আমি টীকায় অন্তর্ভূক্ত করেছি।"

১৯৫১ সালে পরমহংস যোগানন্দজী যে পরবর্তী পরিবর্তনগুলি করেন, তা চতুর্থ (১৯৫২) মার্কিন সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। সেই সময় *'অটোবায়োগ্রাফী অফ্ এ যোগী'* গ্রন্থের স্বত্ব নিউ ইয়র্কের এক প্রকাশক সংস্থার কাছে ছিল। এই গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠার জন্যে একেকটি ইলেক্ট্রোটাইপ প্লেট তৈরী করা হয়েছিল। এই কারণে একটি বিরাম চিহ্ন যোগ করতে হলেও পুরো পৃষ্ঠার ধাতুর প্লেট কেটে ফেলে সেই বিরাম চিহ্ন অন্তর্ভুক্ত করতে এক নতুন পংক্তি যোগ করতে হতো। এই কাজ খুব ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ার কারণে নিউ ইয়র্কের প্রকাশক বইখানির চতুর্থ সংস্করণে এই সব পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত করেননি।

১৯৫৩ সালের শেষের দিকে সেল্ফ-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ (এস. আর. এফ.) নিউ ইয়র্কের প্রকাশকের কাছ থেকে *অটোবায়োগ্রাফী অফ্ এ যোগী* বইটির স্বত্ব কিনে নেয়। এস. আর. এফ. ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে যথাক্রমে বইটির পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত করে কিন্তু

তাদের মন্তব্য ও এই গ্রন্থের বহু ভাষায় অনূদিত হওয়া আমায় এই বিশ্বাস পোষণ করতে উৎসাহিত করছে যে এই পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে পাশ্চাত্যবাসী— "আধুনিক মানুষের জীবনে প্রাচীন যোগবিজ্ঞানের কি কোন স্থান আছে?— এ প্রশ্নের হ্যাঁ-সূচক উত্তর পেয়েছেন।

পরবর্তী বৎসরগুলিতে "হাজার-হাজার পাঠক" লক্ষ-লক্ষ পাঠকে পরিণত হয়। *'অটোবায়োগ্রাফী অফ্ এ য়োগী'* গ্রন্থটির আকর্ষণ যে চিরস্থায়ী ও বিশ্বজনীন, তা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রথম প্রকাশিত হওয়ার ষাট বছর পরেও গ্রন্থটি সর্বাধিক বিক্রিত আধ্যাত্মিক ও অনুপ্রেরণাদায়ী বইয়ের তালিকায় স্থান পেয়ে চলেছে। সত্যিই এ এক অসামান্য ঘটনা! বহু ভাষায় অনূদিত ও প্রাপ্ত গ্রন্থখানি এখন সারা বিশ্বে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্য দর্শন ও ধর্ম, ইংরেজী সাহিত্য, মনস্তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস, এমনকি ব্যাবসায়িক ব্যবস্থাপনার মত বিষয়ের পঠন-পাঠনে ব্যবহৃত হচ্ছে। যোগের বার্তা ও তার ধ্যানের প্রাচীন পরম্পরা সারা পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করছে, ঠিক যেমনটি লাহিড়ী মহাশয় একশো বছর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছলেন।

আধ্যাত্মিক পত্রিকা নিউ ফ্রন্টিয়ার (অক্টোবর, ১৯৮৬)-এ লেখা হয়, "সম্ভবতঃ পরমহংস যোগানন্দ সমগ্র বিশ্বে অগণিত লক্ষ মানুষকে অনুপ্রেরণা-প্রদানকারী *'অটোবায়োগ্রাফী অফ্ এ য়োগী'* গ্রন্থের লেখক হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত। গান্ধীজীর মতই তিনি আধ্যাত্মিকতাকে সমাজের

সেই সময় অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ এস. আর. এফের সম্পাদকীয় বিভাগ লেখকের পরিবর্তনগুলি ইলেক্ট্রোটাইপ প্লেটে তোলার বিশাল কাজ করে উঠতে পারেনি। কিন্তু সপ্তম [illegible]

পরমহংস যোগানন্দজীর মহাসমাধির পূর্বে তারামাতাকে দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৫৬ সালে বইটিতে আরও কিছু সম্পাদকীয় পরিবর্তন করা হয়।

অটোবায়োগ্রাফী অফ্ এ য়োগী-র প্রথম সংস্করণগুলিতে লেখকের পদবী বাংলা বানানের ধরণ অনুযায়ী অনুচ্চারিত বা প্রায়-অনুচ্চারিত "অ" বোঝাতে ইংরেজী বানানে "Paramhansa" লেখা হয়। এই বৈদিক পদবীর পুণ্য মর্যাদা দিতে, পরবর্তি সব সংস্করণে সংস্কৃত বানান অনুযায়ী "Paramahansa" লেখা হয়, যার ব্যুৎপত্তি-গত অর্থানুযায়ী *parama* বলতে বোঝায় "সর্বোত্তম" এবং *hansa* শব্দটি 'রাজহাস' বোঝায়, যাদের সম্মিলিত অর্থ দাঁড়ায়, এমন এক ব্যক্তি যিনি লাভ করেছেন নিজের দিব্য আত্ম-বোধ এবং সেই আত্মার সাথে পরমাত্মার অভিন্ন বোধ।

মূলস্রোতে নিয়ে এসেছেন। এ বলা ন্যায়সঙ্গত যে আমাদের শব্দতালিকায় 'যোগ' অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পেছনে অন্য সবার থেকে তাঁর কাজের অবদানই সর্বাধিক।

আমেরিকান ইন্স্টিটিউট অফ্ বেদিক স্টাডিজের ডিরেক্টর সমাদৃত সুপন্ডিত ডাঃ ডেভিড ফ্রলি তাঁর দ্বিমাসিক পত্রিকা *য়োগা ইন্টারন্যাশনাল* (অক্টোবর/নভেম্বর, ১৯৯৬)-এ লেখেন, "যোগানন্দকে পাশ্চাত্যে যোগের জনক বলা যায়—কেবলমাত্র জনপ্রিয় দৈহিক যোগের নয়—আধ্যাত্মিক যোগের জনক; আত্মোপলব্ধির বিজ্ঞানই যোগের প্রকৃত অর্থ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ আশুতোষ দাস, পি.এইচ.ডি, ডি.লিট্, লেখেন, *"অটোবায়োগ্রাফী অফ্ এ য়োগী"* হচ্ছে নবযুগের উপনিষদ....এ গ্রন্থ সমগ্র বিশ্বে সত্য-সন্ধানীদের আধ্যাত্মিক পিপাসা মিটিয়েছে। আমরা ভারতবাসীরা আশ্চর্য ও মুগ্ধ হয়ে ভারতীয় সাধু সন্ত ও দর্শন সম্বন্ধে এই গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার অসাধারণ বিস্তার লক্ষ্য করেছি। আমরা অত্যন্ত তৃপ্ত ও গর্বিত যে ভারতের সনাতন ধর্মের অমর সুধা *অটোবায়োগ্রাফী অফ এ য়োগী* গ্রন্থের স্বর্ণপাত্রে রক্ষিত রয়েছে।"

প্রাক্তন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কমিউনিস্ট শাসনকালে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক যাঁরা এই বইটি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের মনেও বইটি গভীর রেখাপাত করেছিল বলে মনে হয়।

ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি ভি. আর. কৃষ্ণ আইয়ার একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন—"সেন্ট পিটার্সবার্গ (তৎকালীন লেনিনগ্রাড)-এর নিকটবর্তী এক শহরে আমি এক দল অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলাম যে তাঁরা, মানুষের মৃত্যুর সময় কি হয়, এ বিষয়ে কিছু ভেবেছেন কি না....অধ্যাপকদের একজন শান্তভাবে ভেতরে গিয়ে একটি বই নিয়ে এলেন—*অটোবায়োগ্রাফী অফ্ এ য়োগী*। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মার্ক্স ও লেনিনের বস্তুবাদী দর্শন দ্বারা শাসিত দেশে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্ত্তা আমাকে পরমহংস যোগানন্দের বই দেখাচ্ছেন! অধ্যাপক বললেন, 'জানবেন ভারতীয় অধ্যাত্মের মর্ম আমাদের কাছে অবজ্ঞাত নয়। এই বইয়ে লেখা সবকিছুই আমরা সত্য বলে মানি।'"

ইণ্ডিয়া জার্নাল (২১ এপ্রিল, ১৯৯৫)-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধের উপসংহারে লেখা হয়, "প্রতি বছর যে হাজার হাজার বই ছাপা হয়, তাদের মধ্যে কিছু বই আনন্দদায়ক, কিছু শিক্ষামূলক, আর কিছু অধ্যাত্ম উন্নতিসাধক হয়ে থাকে। পাঠক যদি কোন একটি মাত্র গ্রন্থে এই তিনের সম্মিলন দেখতে পান, তাহলে তিনি নিজেকে অবশ্যই ভাগ্যবান বলে মনে করতে পারেন। *'অটোবায়োগ্রাফী অফ এ য়োগী'* তার চেয়েও দুর্লভ রচনা। এটি এমনই এক বই যা মন ও আত্মার জানালাকে খুলে দেয়।"

সাম্প্রতিক কালে পুস্তক বিক্রেতা, গ্রন্থ-সমালোচক ও পাঠকবর্গ আধুনিক সময়ের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী আধ্যাত্মিক গ্রন্থের অন্যতম হিসেবে এ বইটির প্রশংসা করেছেন। ১৯৯৯ সালে *হার্পার-কলিন্সের* প্যানেল-ভুক্ত লেখক ও বিদ্বৎজনেরা *'অটোবায়োগ্রাফী অফ্ এ য়োগী'* কে "শতাব্দীর ১০০ সর্বোৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক বই"-এর অন্যতম হিসেবে নির্বাচিত করেন। আবার ২০০5 সালে প্রকাশিত তাঁর *'50 স্পিরিচুয়াল ক্ল্যাসিক্স'*-এ টম বাট্‌লার-বোডেন বইটিকে "সর্বকালের সেরা বিনোদন ও জ্ঞান প্রদায়ক অধ্যাত্ম গ্রন্থের অন্যতম" হিসেবে বর্ণনা করেন।

গ্রন্থটির শেষ পরিচ্ছেদে পরমহংস যোগানন্দ যুগের পর যুগ ধরে সাধু-মহাত্মাদের দ্বারা সত্য বলে ঘোষিত সুগভীর প্রতিশ্রুতির কথা লিখেছেন ঃ

> *"ঈশ্বর প্রেমময়,—তাঁর সৃষ্টি পরিকল্পনাকে কেন্দ্রীভূত করা যেতে পারে একমাত্র প্রেমে। এই অত্যন্ত সরলভাব, পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির চেয়ে কি মানবহৃদয়ে বেশি আশ্বাস প্রদান করে না? প্রত্যেক সাধক, যিনি পরম সত্যের অন্তস্তলে প্রবেশ করতে পেরেছেন—তিনই এই মহাসত্য প্রচার করে গেছেন যে, একটি দৈব বিশ্বপরিকল্পনা আছে, আর তা হচ্ছে পরম সুন্দর আর অসীম আনন্দময়।"*

অটোবায়োগ্রাফী অফ্ এ য়োগী যেমন-যেমন তার দ্বিতীয় অর্ধশতকে প্রবেশ করছে, আমরা এই আশা পোষণ করি যে অনুপ্রেরণাপ্রদ এই গ্রন্থের সকল পাঠক—যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এই প্রথম এর সংস্পর্শে এসেছেন, এবং যাঁদের কাছে এ বই জীবনপথে দীর্ঘকালের এক পরম আদরের

সাথী—অন্তরে অনুভব করুন, জীবনের আপাত রহস্যের অন্তর্নিহিত পরম সত্যের প্রতি গভীরতর এক আস্থার জাগরণ।

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/
সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ

লস্-অ্যাঞ্জেলেস্, ক্যালিফোর্ণিয়া

জুলাই, ২০০৭

শাশ্বত ধর্ম

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের জাতীয় পতাকায় রয়েছে গাঢ় গেরুয়া, সাদা ও ঘন সবুজ রঙের ডোরা। গাঢ় নীল রঙের ধর্মচক্রটি সম্রাট অশোক কর্তৃক নির্মিত খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর সারনাথ প্রস্তর-স্তম্ভের নক্‌শার প্রতিরূপ।

চক্রটি শাশ্বত ধর্মের প্রতীক হিসেবে ও কিছুটা বিশ্বের মহানতম এক সম্রাটের স্মারক। ইংরেজ ঐতিহাসিক এইচ. জি. রলিন্‌সন্‌ লেখেন, তাঁর চল্লিশ বৎসরের রাজত্ব, ইতিহাসে সম্পূর্ণ নজীরবিহীন। বিভিন্ন সময়ে তাঁকে মার্কাস অরেলিয়াস, সেন্ট পল ও কন্‌স্টান্টাইনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে....খ্রিস্টের ২৫০ বৎসর পূর্বে এক সফল যুদ্ধাভিযানের পরিণাম দেখে তীব্র মনোবেদনায় অনুতাপে যুদ্ধ পরিবর্জনের সুচিন্তিত নীতি গ্রহণ করার মত সৎসাহস তাঁর ছিল।"

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত তাঁর রাজত্বে ভারত, নেপাল, আফ্‌গানিস্তান, ও বেলুচিস্তান অন্তর্ভুক্ত ছিল। সর্ব প্রথম আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসেবে তিনি ব্রহ্মদেশ, সিংহল, মিশর, সিরিয়া ও ম্যাসিডনে বহু উপহার ও আশীর্বাদ সহ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারক পাঠান।

সুপণ্ডিত পি. ম্যাসন আওর্সের মন্তব্য করেন ঃ "মৌর্য বংশের তৃতীয় অধিপতি অশোক ইতিহাসের মহান দার্শনিক-শাসকদের অন্যতম। পরাক্রম, পরোপকার, ন্যায়-বিচার ও দয়া-দাক্ষিণ্যের একত্র সন্নিবেশ তাঁর ন্যায় আর কেউই দেখাননি। তিনি ছিলেন তাঁর সময়কালের মূর্তবিগ্রহ। তাঁকে আবার বেশ আধুনিক বলেও মনে হয়। আমাদের কাছে যা কেবলমাত্র কোনও স্বপ্নদর্শীর খেয়াল, তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি তাই লাভ করেন; বিপুলতম জাগতিক ক্ষমতা ভোগ করেও তিনি শান্তির ব্যাবস্থা করেন। তাঁর

বিশাল সাম্রাজ্যের বাইরেও, সুদূব পর্যন্ত, তিনি বিশ্বমানবতার বিশ্বজনীন এক সম্প্রদায়—যা কোন কোন ধর্মের স্বপ্নমাত্র—তা বাস্তবায়িত করে তোলেন।

"ধর্মের লক্ষ্য হল সকল জীবের মঙ্গল।" আজও বিদ্যমান তাঁর শিলালিপি ও প্রস্তর-স্তম্ভে তিনি তাঁর প্রজাদের সস্নেহ এই উপদেশ-ই প্রদান করেন যে নৈতিকতা ও ধর্মপরায়ণতাই আনন্দের উৎস।

বহু সহস্র বৎসর ধরে ভারতবর্ষ যে মহত্ত্ব ও সমৃদ্ধির অধিকারী ছিল, তা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী আধুনিক ভারত তার নব জাতীয় পতাকার মাধ্যমে "দেবতাদের প্রিয়" সম্রাট অশোকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানায়।
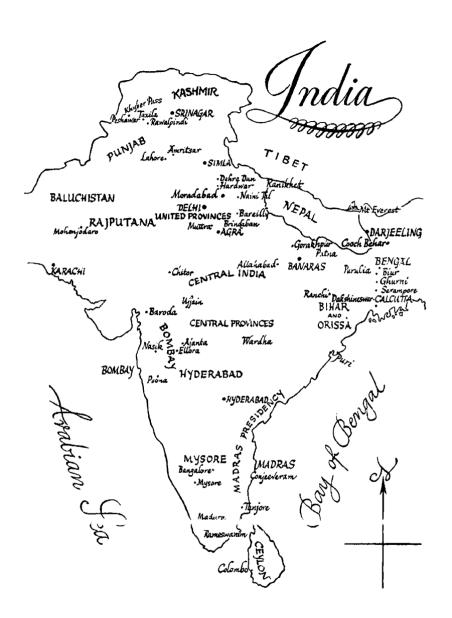
(১৯৪৭-এর পূর্বের মানচিত্র। উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তর-পূর্বের কিছু অংশ বর্ত্তমানে যথাক্রমে পাকিস্থান ও বাংলাদেশ।)

যোগী-কথামৃত

১ম পরিচ্ছেদ

আমার পিতামাতা ও বাল্যজীবন

ভারতীয় সংস্কৃতির বিশিষ্ট লক্ষণ বহু প্রাচীনকাল থেকেই পরমতত্ত্বের অনুসন্ধান ও তার আনুষঙ্গিক গুরু-শিষ্য সম্পর্কের* ভিতর দিয়ে তাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করা।

ঈশ্বরলাভের আকাঙ্ক্ষা আমার জীবনে এমন এক ঈশ্বরকোটিক ঋষিগুরুকে এনে দিয়েছিল, যাঁর অপূর্ব-সুন্দর জীবন সকল যুগেরই আদর্শরূপে চিহ্নিত। ভারতের প্রকৃত সম্পদ হচ্ছে — তার মুনি-ঋষিগণ। আমার গুরুদেব হচ্ছেন তাঁদেরই মতো একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। যুগে যুগে এঁদের আবির্ভাব ভারতবর্ষকে প্রাচীন মিশর ও ব্যাবিলনের মত ভাগ্যবিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষা করে এসেছে।

পূর্বজন্মের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমাবেশে আমার বাল্যস্মৃতি সমাচ্ছন্ন। বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে — কোন এক অতীত জীবনে আমি হিমালয়ের তুষারময় প্রদেশে এক যোগিরূপেই ছিলাম।† অতীতের এইসব ক্ষণ-উদ্ভাসিত স্মৃতি কোন অদৃশ্য যোগসূত্রে আমায় ভবিষ্যৎ জীবনেরও কিঞ্চিৎ আভাস দিয়েছিল।

ছোটবেলার অসহায় অবস্থার বিড়ম্বনা আমার এখনও স্মরণে আছে। চলতে না পেরে বা নিজেকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে না পেরে, আমি অত্যন্ত ব্যথিত বোধ করতাম। আমার শিশু দেহের অপটুতার কথা স্মরণ করে মনের মধ্যে প্রার্থনার তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে উঠত। আমার গভীর ভাবপ্রবণ জীবনে, আমার হৃদয়ের ভাব মনের মধ্যে নানাভাষায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। ঐ ভাষাবিভ্রাটের মধ্যে আমার

---

* অধ্যাত্ম শিক্ষাদাতা। "গুরু গীতা"য় (শ্লোক ১৭) গুরুকে যথার্থই তমোনাশক বলা হয়েছে। ("গু" — তমঃ, "রু" — নাশক)

† যোগ সাধক; প্রাচীন ঈশ্বরাধনার পদ্ধতি। (২৬ পরিচ্ছেদ ঃ "ক্রিয়াযোগ বিজ্ঞান" দ্রষ্টব্য)।

কান আত্মীয়স্বজনের বলা অবিরাম বাংলা শব্দ শুনে শুনে ক্রমশঃ সেই ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল। গুরুজনেরা আমার ছলনা দেখে মনে করতেন — আমার আনন্দ-তরল শিশুমন কেবলমাত্র খেলনা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠলেহনেই নিমগ্ন!

মনের নানা অকারণ উদ্বেগ ও উত্তেজনা, আর দেহের অসামর্থ, আমার মধ্যে বহু অদম্য ক্রন্দনবেগের সৃষ্টি করত। আত্মীয়স্বজনেরা এই অযথা ক্রন্দনের কোন কারণ আবিষ্কার করতে না পেরে বিমূঢ় হতেন। সুখের স্মৃতিগুলিও মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়াতো ঃ মায়ের আদর, আধো আধো উচ্চারণে আমার প্রথম কথা বলার চেষ্টা, আর হাঁটি হাঁটি পা পা বুলির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটবার চেষ্টা — এ সবই স্মৃতির আলোকে দেখতে পেতাম। বাল্যজীবনের এইসব প্রাথমিক সাফল্য যদিও শীঘ্রই ভুলে গিয়েছি, তবুও তারাই পরে আত্মবিশ্বাসের একটা স্বাভাবিক ভিত্তি হয়ে উঠেছিল।

আমার দূরপ্রসারী স্মৃতির ব্যাপারগুলি যে খুব অসাধারণ, তা নয়। অনেক যোগীদের সম্বন্ধে জানা গিয়েছে যে, এই জগৎ নাট্যশালায় তাঁদের এক জীবন হতে উৎক্রান্ত হয়ে মৃত্যুপথে পরবর্তী জীবনে আবির্ভাবকালে তাঁরা তাঁদের আত্মচেতনা অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। মানুষের যদি কেবল দেহমাত্রই সার হতো, তাহলে সেই দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই তার ব্যক্তিত্বও সব হারিয়ে যেতো। কিন্তু শতশত বর্ষধরে মহাপুরুষ ও অবতারগণ যদি সত্য বাণীই প্রচার করে গিয়ে থাকেন, তা হলে বলতে হয় — মানুষ হচ্ছে মূলতঃ একটি জীবাত্মা, বিদেহী ও সর্বব্যাপী।

আশ্চর্যজনক মনে হলেও শৈশবের সুস্পষ্ট স্মৃতি কিন্তু বিরল নয়। নানা দেশবিদেশে বেড়াবার সময় আমি সত্যনিষ্ঠ নরনারীদের মুখ থেকে তাদের অতি শৈশবকালের বহু স্মৃতিকাহিনী শুনেছি।

উত্তর-পূর্ব ভারতে হিমালয়ের কাছে গোরক্ষপুরে, ১৮৯৩ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখে আমার জন্ম হয়। সেখানেই আমার বাল্যজীবনের প্রথম আটটি বছর অতিবাহিত হয়েছিল। ভাই-বোন মিলে আমরা

আটজন। চার ভাই ও চার বোন। সংসার জীবনে আমি মুকুন্দলাল ঘোষ* নামে পরিচিত। পিতামাতার আমি দ্বিতীয় পুত্র এবং চতুর্থ সন্তান।

আমার পিতামাতা ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বাঙালী। উভয়েই সাধুপ্রকৃতির ছিলেন। তাঁদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি প্রশান্ত মহিমময় প্রীতি কখনও চপলতার দ্বারা লঘু হতে দেখিনি। পিতামাতার সুসমঞ্জস জীবনই হ'ল আমাদের আটটি তরুণজীবনের চপল আবর্তনের শান্তিময় কেন্দ্র।

পিতা ভগবতী চরণ ঘোষ — দয়ালু, গম্ভীর, কিন্তু সময় সময় কঠোরভাবও অবলম্বন করতেন। তাঁকে অন্তরে ভালবাসলেও আমরা শিশুর দল কিন্তু তাঁর সঙ্গে বেশ একটা সম্মানসূচক দূরত্বই রক্ষা করে চলতাম। তিনি একজন সুবিদিত গণিতজ্ঞ ও যুক্তিবাদী ছিলেন বলে প্রধানতঃ নিজের বুদ্ধিবলেই চালিত হতেন। কিন্তু মা ছিলেন আমাদের অন্তর্লোকের দেবী। তিনি কেবল ভালবাসার দ্বারাই আমাদের শিক্ষা দিতেন। মায়ের মৃত্যুর পর পিতা তাঁর অন্তরের কোমলতা আরও বেশি করে প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর চোখে তখন মায়ের স্নেহকোমল আঁখির ছায়ার প্রতিফলন দেখতে পেতাম।

মায়ের কাছেই সর্বপ্রথম আমরা শাস্ত্রাদির অম্ল-মধুর পরিচয়লাভ করি। রামায়ণ আর মহাভারতের কাহিনী ও উদাহরণ থেকে বেছে নিয়ে মা আমাদের উপর সেইসব শাসন, উপদেশ আর নীতিশিক্ষা সুচতুরভাবে প্রয়োগ করতেন। তারফলে শিক্ষা আর শাসন দুই পাশাপাশি চলত।

শ্রদ্ধার প্রকাশস্বরূপ প্রত্যহ বৈকালে মা আমাদের সযত্নে পরিপাটি করে সাজিয়ে দিয়ে বাড়ীর বাইরে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখতেন — পিতাকে অফিস হতে বাড়ী ফেরবার সময় অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। আমার পিতা "বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে" নামক তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ কোম্পানীর সহ-সভাপতির সমতুল্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কার্যোপলক্ষে তাঁকে নানা রাজ্যে ভ্রমণ করতে হত। এতে করে

---

* ১৯১৫ সালে আমি যখন প্রাচীন স্বামী সম্প্রদায়ে যুক্ত হই, তখনই আমার নাম পরিবর্তিত হয়ে যোগানন্দ হয়। ১৯৩৫ সালে আমার গুরুদেব আমায় 'পরমহংস' এই উপাধি দান করেন। (২৪ ও ৪২ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আমার শৈশবকালে আমাদের পরিবারবর্গকে বিভিন্ন শহরে বাস করতে হয়েছিল।

দুঃস্থ লোকেদের অভাব মোচনে মা সর্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। পিতার অন্তঃকরণও দয়ালু ছিল; কিন্তু তাঁর সংসারখরচ, দানধ্যান প্রভৃতি আয়ব্যয়ের একটা নির্দিষ্ট ধারা বেয়েই চলত। মা একবার দরিদ্রনারায়ণের সেবায় পক্ষকালের মধ্যেই পিতার একমাসের আয়ের চেয়েও বেশি খরচ করে ফেলেছিলেন। তাই একদিন তিনি মাকে ডেকে বললেন, "দেখ, তোমায় আমি শুধু এই কথাটুকু বলতে চাই যে, তোমার দানধ্যানগুলো যেন একটু যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যেই থাকে।" পিতার এই মৃদু ভর্ৎসনাটুকুও মায়ের অন্তরে প্রবল আঘাত দিয়েছিল। ছেলেদের কাছে পিতার সঙ্গে মনান্তরের কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করে মা তখনই এক ভাড়াটে গাড়ী ডাকালেন। তারপরে একেবারে সেই সুপ্রাচীন চরমপত্র, — "আমি বাপের বাড়ী চললুম।"

আমরা তো অবাক হয়ে কান্নাজুড়ে দিলাম। মাতুল মহাশয়ও অকস্মাৎ সেখানে ঠিক সময়মত এসে উপস্থিত হলেন, আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাবার উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ সুপ্রাচীন উপদেশও পিতার কর্ণে চুপি চুপি প্রয়োগ করলেন। ফল হল এই যে, পিতার সঙ্গে কতকগুলো আপোসসূচক কথাবার্তার পর মা প্রসন্নচিত্তে গাড়ী ফিরিয়ে দিলেন। যাইহোক্, পিতামাতার এইরকম মতান্তরের ঘটনা যা আমি কেবল একটিবার মাত্র ঘটতে দেখেছিলাম, তার একটা সন্তোষজনক নিষ্পত্তি হল। কিন্তু আর একবার উভয়ের মধ্যেকার এক বিশেষ কথাবার্তা আজ মনে পড়ছে। সেটাই এবার বলি।

পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলাম মা বাবাকে বলছেন, "দেখ, একটি বড় দুখিনী মেয়ে বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছে। বেচারীর বড্ডই অভাব। গোটা দশেক টাকা দাও তো।" মেয়েটির দুঃখ দূর করবার চেষ্টায় মায়ের হাসিমুখে আরজি পেশ করাতে পিতার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করল।

তবুও পিতা বললেন, "দশটাকা কেন? এক টাকাই তো যথেষ্ট।" তারপর আত্মপক্ষসমর্থনের উদ্দেশ্যে তিনি শুরু করলেন, "দেখ, যখন

আমার বাবা, ঠাকুরদাদা আর ঠাকুমা হঠাৎ মারা যান, তখন আমার দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। একটি মাত্র ছোট্ট কলা খেয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে স্কুলে যেতুম। শেষে বহুকষ্টে ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ করি। পড়াশুনা চালাবার জন্য অর্থের অভাবে এক ধনী বিচারকের কাছে মাসিক একটি মাত্র করে টাকা সাহায্য চাইতে যাই। 'একটা টাকাই কি কিছু কম না কি?' বলে কিছু না দিয়েই তিনি আমায় বিদায় করে দেন।"

মায়ের করুণার্দ্র হৃদয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রবল যুক্তির উদয় হওয়াতে প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, "সেই একটি মাত্র টাকা হতে বঞ্চিত হবার তিক্ত স্মৃতি আজও মনের মধ্যে পুষে রেখেছ! তাহলে তুমিও কি মেয়েটির এই দারুণ অভাবে তাকে দশটি টাকা সাহায্য না করে ফিরিয়ে দিয়ে সেইরকম তার মনে আঘাত দিতে চাও?"

"নাঃ, তুমিই জিতলে দেখছি," — এই বলে বাক্যযুদ্ধে স্বামীদের সনাতন পরাজয়ের মুখভাব অবলম্বন করে মনিব্যাগ খুলে পিতা বললেন, "এই নাও দশ টাকা। সেই সঙ্গে আমার শুভেচ্ছাও তাকে দিয়ে এস।"

নতুন কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হলেই পিতার প্রথমতঃ, 'না' বলে বসার একটা ঝোঁক ছিল। এই দুঃখিনী অপরিচিতা নারীটির প্রতি মায়ের হৃদয় স্নেহ-বিগলিত হওয়া সত্ত্বেও পিতার আচরণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সাবধানতার পরিচায়ক। কোন বিষয়ে হঠাৎ সম্মতি প্রদান করার প্রতিকূলতা প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে, "যথোচিত বিবেচনা" নীতির অনুসরণ মাত্র। পিতার আচরণ সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত এবং তাঁকে বিচারবিবেচনায় সর্বত্র সমদর্শী দেখতাম। যদি আমি আমার নানারকমের আবদার-অনুরোধ তাঁর কাছে বেশ একটা প্রবল যুক্তির সঙ্গে উপস্থাপিত করতে পারতাম, তা হলেই তিনি আমায় সেই বাঞ্ছিত বস্তুটি পাবার সুযোগ ঘটিয়ে দিতেন — তা, সে ছুটিতে দেশভ্রমণই হোক্ অথবা একটা নতুন মোটর সাইকেলই হোক্।

পিতৃদেব তাঁর সন্তানদের শৈশবকালে কঠিন অনুশাসনে রাখতেন। তাঁর নিজের প্রতি আচারব্যবহারও কঠোর তপস্বীর মতই ছিল। তার প্রমাণ এই যে, জীবনে তিনি কখনও থিয়েটার দেখেননি। তাঁর আমোদ-প্রমোদ

বা অবসরবিনোদনের জন্য তিনি আধ্যাত্মিক সাধনা বা গীতাপাঠেই আনন্দলাভ করতেন। সর্বপ্রকার ভোগবিলাস পরিহার করে তিনি একজোড়া পুরানো জুতো যতদিন পর্যন্ত না একেবারে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ত, ততদিন পর্যন্ত তাই দিয়ে চালাতেন। মোটরগাড়ী জনপ্রিয় হয়ে উঠলে পর ছেলেরা একটা গাড়ী কেনে। কিন্তু নিজে তিনি ট্রামে চড়েই অফিসে যাতায়াত করা পছন্দ করতেন।

ক্ষমতালাভের জন্য ধনসঞ্চয়ে তাঁর কোনদিনই আগ্রহ ছিল না। একবার কলকাতা আর্‌বান ব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করার পর তিনি নিজের লাভের জন্য তার শেয়ার কেনা বা তা ধরে রাখা সমীচীন বোধ না করে, তা প্রত্যাখ্যানই করেছিলেন। অবসরকালে জনকল্যাণের জন্য এইরূপ পৌরকর্তব্য পালন করেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন।

পিতা চাকরি হতে অবসর ও পেন্সন নেবার বহু বৎসর পরে বিলাত থেকে একজন ইংরেজ হিসাব পরীক্ষক বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষা করতে আসেন। তিনি দেখে আশ্চর্য হয়ে যান যে, পিতা তাঁর বহুদিনের প্রাপ্য বোনাসের জন্যে কোম্পানীর কাছে কখনও কোন আবেদনই করেননি।

পিতা তিনজন লোকের কাজ একাই চালাতেন বলে হিসাব পরীক্ষক সাহেব রেলকর্তৃপক্ষের কাছে মন্তব্য করেন। তিনি হিসাব করে দেখালেন যে, তাঁর বকেয়া প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা। কোষাধ্যক্ষ পিতাকে ঐ পরিমাণ টাকার একটি চেক পাঠিয়ে দেন। এ বিষয়ে এত অল্পই তিনি মনে ঠাঁই দিয়েছিলেন যে, সংসারে তার কথা উল্লেখ করতেও ভুলে গিয়েছিলেন। পরে বহুদিন বাদে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষ্ণু ব্যাঙ্কে এতগুলো টাকার একটা বড় রকমের জমার হিসাব পেয়ে তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করে।

পিতা বিষ্ণুকে বলেন, "পার্থিব লাভে উল্লসিত হও কেন? সুখে দুঃখে মন যার অবিচলিত, সে লাভে উল্লসিত বা ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হয় না। সে জানে যে মানুষ এ পৃথিবীতে আসে কপর্দকহীন হয়ে, আর যায়ও কপর্দকহীন হয়ে।"

বিবাহিত জীবনের প্রারম্ভে পিতামাতা উভয়েই কাশীর যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই যোগাযোগ পিতার স্বাভাবিক তাপস স্বভাবকে দৃঢ়তর করে তুলেছিল। মা আমার বড়দিদি রমার নিকট এক অদ্ভুত কথা প্রকাশ করেছিলেন ঃ "তোমার বাবা ও আমি বৎসরে কেবল একবারমাত্র স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ পালন করি, তাও সন্তানলাভের জন্যে।"

লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে পিতার প্রথম সাক্ষাৎলাভ হয় অবিনাশবাবুর মারফতে। ইনি বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের শাখা লাইনের এক কর্মী ছিলেন। ছোটবেলায় গোরক্ষপুরে থাকাকালে অবিনাশবাবু আমাকে ভারতের বহু সাধুসন্তের চিত্তগ্রাহী কাহিনী শোনাতেন। সে'সব কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটাবার সময় তিনি সর্বদাই তাঁর নিজগুরু লাহিড়ী মহাশয়ের মহত্তর মহিমার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গল্প শেষ করতেন।

গ্রীষ্মের এক অলস অপরাহ্নে অবিনাশবাবু আর আমি যখন বাড়ীর আঙ্গিনায় বসে গল্পগুজব করছি তখন তিনি এই কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নটি করে বসলেন ঃ "মুকুন্দ, তোমার বাবা কি আশ্চর্য পরিস্থিতিতে লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য হয়েছিলেন তা কি কখনও শুনেছ?" হেসে মাথা নেড়ে আমি তাঁর এই অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় তাঁরই মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

অবিনাশবাবু বলতে শুরু করলেন, "তোমার জন্মাবার অনেক আগে আমাদের উপরওয়ালা অর্থাৎ তোমার বাবার কাছে, কাশীতে আমার গুরুদেবকে দর্শনের জন্যে অফিস হতে এক সপ্তাহের ছুটি চাইলাম। তোমার বাবা তো আমার মতলবটি হেসেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বললেন, 'ধর্ম ধর্ম করে পাগল হবে নাকি? চাকরিতে যদি উন্নতি করতে চাও তো অফিসের কাজকর্মে ভাল করে মন দাও।'

"অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে সেদিন জঙ্গলের পথধরে অফিস হতে বাড়ী ফিরছি। এমন সময় দেখি যে, তোমার বাবা পালকি চড়ে চলেছেন। আমাকে দেখে তিনি পালকি থেকে নেমে পড়লেন আমার সঙ্গে বাড়ী ফিরবার জন্যে। পালকি আর বেহারাগুলোকে বিদায় করে দিয়ে আমার

সঙ্গে হাঁটতে শুরু করলেন। সান্ত্বনা দেবার ছলে তোমার বাবা পার্থিব উন্নতির চেষ্টাতে যে নানা সুবিধা আছে সে কথা আমায় বোঝাতে লাগলেন। উদাসীনভাবে তাঁর কথাগুলো শুনছিলাম। অন্তর কিন্তু বারবার কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, 'লাহিড়ী মহাশয়, আপনাকে না দেখতে পেলে আমি আর বাঁচব না।'

"তোমার বাবা আর আমি হেঁটেই রাস্তা ধরে একটি প্রশস্ত মাঠের ধার এসে পড়লাম। শেষ অপরাহ্নের সূর্যকিরণ তখনও দীর্ঘ তরঙ্গায়িত বন্য তৃণদলের অগ্রভাগগুলি রঞ্জিত করে তুলছিল। অবাক বিস্ময়ে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম সেই মনোরম শোভা দেখবার জন্যে। সেই ফাঁকা মাঠের মাঝখানে মাত্র কয়েকগজ দূরেই আমার পরমারাধ্য গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ সশরীরে আবির্ভূত হলেন।* তাঁর বাণী আমাদের বিস্ময়স্তব্ধ কর্ণে এসে ধ্বনিত হল, 'ভগবতী, তুমি তোমার কর্মচারীদের উপর বড়ই নির্দয়।' যেমনি অদ্ভুতভাবে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তেমনি আশ্চর্যভাবে তিনি অন্তর্ধানও করলেন। তখনই নতজানু হয়ে আমি প্রাণভরে ডাকতে লাগলাম, 'লাহিড়ী মহাশয়, লাহিড়ী মহাশয়।' তোমার বাবা স্তম্ভিত বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নিশ্চলভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"তোমার বাবা তখন বললেন, 'অবিনাশ, তোমাকেই শুধু ছুটি দিচ্ছি তা নয়, কালই তোমার সঙ্গে কাশী যাবার জন্যে আমি নিজেও ছুটি নিচ্ছি। তোমাকে সাহায্যের জন্য যিনি ইচ্ছামাত্রই মূর্তিপরিগ্রহ করে আবির্ভূত হতে পারেন, সেই যোগিরাজ লাহিড়ী মহাশয়কে আমি দেখবই। আমি সস্ত্রীক ঐ মহান গুরুর কাছে গিয়ে তাঁর সাধনপথে দীক্ষা নেব। তুমি আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে যাবে কি?"

"আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই ভগবতীবাবু, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।'" আমার প্রার্থনা এইরকম অলৌকিকভাবে পূরণ হয়ে যাওয়াতে এবং ঘটনার দ্রুত আর অনুকূল পরিবর্তনে মন তখন আনন্দে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

---

* মহান গুরুদের অলৌকিক শক্তির বিষয় ৩০ পরিচ্ছেদে, "অলৌকিক ঘটনার নিয়ম"তে বর্ণিত হয়েছে।
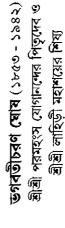
জ্ঞানপ্রভা ঘোষ (১৮৬৮ - ১৯০৪)
শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দের মাতৃদেবী ও
শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যা

ভগবতীচরণ ঘোষ (১৮৫৩ - ১৯৪২)
শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দের পিতৃদেব ও
শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য

(বামে) শ্রীশ্রী যোগানন্দ — বয়স ছয় বৎসর; (দক্ষিণে) জীতেন্দ্র মজুমদার, বৃন্দাবনে 'কপর্দকহীন' পরীক্ষায় যোগানন্দজীর সঙ্গী

(বামে) যোগানন্দজীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী কিশোরী উমা, গোরক্ষপুর; (দক্ষিণে) কোলকাতায় ১৯৩৫ সালে যোগানন্দজীর সঙ্গে সর্বজ্যেষ্ঠা ভগিনী রমা *(বামে)* ও কনিষ্ঠা ভগিনী নলিনী

"পরদিন সন্ধ্যাবেলা তোমার বাবা, মা আর আমি কাশীর গাড়ীতে চড়ে বসলাম। তার পরের দিনই কাশীতে পৌঁছে ঘোড়ার গাড়ী করে অনেকটা দূর গিয়ে এক জায়গায় এসে নেমে পড়লাম। তারপর একটা সরু গলির ভিতর দিয়ে খানিকটা পায়ে হেঁটে এসে গুরুদেবের নিরালা বসতবাটিতে গিয়ে পৌঁছলাম। তাঁর ছোট বৈঠকখানায় ঢুকতে দেখা গেল যে, গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয় তাঁর অভ্যস্ত পদ্মাসনে বসে আছেন; ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। অর্ধোন্মীলিত চক্ষুদু'টি খুলে তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তোমার পিতার উপর স্থাপন করে লাহিড়ী মহাশয় বললেন, 'ভগবতী, তুমি তোমার কর্ম্মচারীদের উপর বড়ই নির্দয়।" দু'দিন আগে অফিস হতে ফিরবার সময় সেই ঘাসে ঢাকা মাঠে আবির্ভূত হয়ে তিনি ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে যে, তুমি অবিনাশকে আমার কাছে আসতে দিয়েছ, আর নিজেও সস্ত্রীক এখানে এসেছ।"

"তোমার বাবা ও মা সেই মহান গুরুর কাছে ক্রিয়াযোগের* আধ্যাত্মিক সাধনায় দীক্ষালাভ করে অপরিসীম আনন্দলাভ করলেন। তোমার বাবা আর আমি — দুই গুরুভাই, লাহিড়ী মহাশয়ের সেই অবিস্মরণীয় আবির্ভাবের দিন থেকেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হলাম। তোমার নিজের জন্মবিষয়েও লাহিড়ী মহাশয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তোমার জীবন নিশ্চয়ই সেই মহান গুরুর জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকবে। সদ্‌গুরুর আশীর্বাদ কখনও বিফল হয় না।"

আমার এ সংসারে আসবার কিছুকাল পরেই লাহিড়ী মহাশয় ইহজগৎ পরিত্যাগ করেন। পিতা যখন যে সব শহরে বদলি হতেন সেই সব শহরে আমাদের বাড়ীর ঠাকুর ঘরে অলংকৃত ফ্রেমে বাঁধানো লাহিড়ী মহাশয়ের ছবি নিত্যপূজার জন্য রাখা থাকত। প্রায় প্রত্যহই সকাল ও সন্ধ্যায় — মা আর আমি, একটি সদ্যোরচিত বেদীর উপর লাহিড়ী মহাশয়ের ছবি স্থাপন করে চন্দনসিক্ত পুষ্প অর্ঘ্য দিয়ে ধ্যানে বসতাম।

* ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে মানবকে বিশ্বাতীত চৈতন্যের সহিত ক্রমবর্ধমান সাযুজ্যলাভের পথে অগ্রসর করে দেবার জন্য লাহিড়ী মহাশয় নির্দেশিত যোগ প্রণালী। (২৬ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ধূপধূনা আর গুগ্‌গুলের সঙ্গে মাতা ও পুত্রের মিলিত ভক্তিধারায় আমরা দেবত্বের পূর্ণবিকাশ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি আমাদের অন্তরের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতাম।

লাহিড়ী মহাশয়ের ছবিটি কিন্তু আমার জীবনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগিরাজের বিষয়ে চিন্তাও আমার বাড়তে লাগল। ধ্যানে বসে আমি প্রায়ই দেখতে পেতাম যে, তাঁর ফটোগ্রাফের মূর্তি, ছবির ছোট ফ্রেম থেকে বেরিয়ে একটি জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করে আমার সামনে এসে বসেছে। যেমনি সেই জ্যোতির্ময় দেহের চরণস্পর্শ করতে হাত বাড়াতাম, অমনি সেই মূর্তি বদলে গিয়ে আবার ফটোগ্রাফের ছবি হয়ে দাঁড়াত। শৈশব হতে কৈশোরে উপনীত হয়ে দেখলাম যে, লাহিড়ী মহাশয় আমার মনে ফ্রেমে আঁটা একটা ছোট ছবি থেকে একটি জীবন্ত ভাবসঞ্চারী সত্তায় পরিণত হয়েছেন। সঙ্কটকালে বা বুদ্ধিবিপর্যয়ে আমি প্রায়ই তাঁর নিকট প্রার্থনা করতাম আর অন্তরে তাঁর সান্ত্বনাদায়ক অভয়বাণী শুনতে পেতাম।

তিনি সশরীরে বর্তমান নেই বলে প্রথম প্রথম বড়ই দুঃখবোধ হতো। কিন্তু পরে যখন তাঁর গূঢ় সর্বব্যাপিত্ব আমার কাছে প্রকাশ পেতে লাগল, তখন আর আমার ক্ষোভের কোন কারণ রইল না। তাঁর দর্শনের জন্য অতি উৎসুক শিষ্যদিগকে তিনি প্রায়ই লিখতেন, "দেখ, তোমাদের কূটস্থের (আধ্যাত্মিক দর্শন) মধ্যেই যখন আমি সর্বদা রয়েছি, তখন এই হাড়-মাংসের খাঁচাটা আর দেখতে আসা কেন?"

যখন আমার আট বছর বয়স সেইসময় লাহিড়ী মহাশয়ের ফটোগ্রাফের কৃপায় আমার একবার অত্যাশ্চর্যভাবে রোগমুক্তি ঘটেছিল। এই ঘটনা আমার ভক্তিকে আরও গাঢ়তর করে তুলেছিল। বাংলাদেশে একবার আমাদের পৈতৃক ইছাপুরের বাড়ীতে থাকার সময় আমি দারুণ এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হই। জীবনের আর কোন আশাই ছিল না। ডাক্তারেরা কিছুই করতে পারলেন না। রোগশয্যার পাশে বসে মা আমার মাথার উপর দেওয়ালে টাঙানো লাহিড়ী মহাশয়ের ছবির দিকে ইঙ্গিতে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য প্রাণপণে উন্মত্তের মত চেষ্টা করতে লাগলেন।

তিনি জানতেন, আমি এত দুর্বল যে প্রণাম করবার জন্য হাত তোলবার ক্ষমতাও আমার নেই। তাই বললেন, "মনে মনে প্রণাম কর। যদি তোমার আন্তরিক ভক্তি থাকে, আর মনে মনে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর, তা হলেই তুমি প্রাণে বেঁচে যাবে।"

আমি ফটোগ্রাফের দিকে চেয়েই রইলাম। হঠাৎ দেখলাম, সেখান থেকে এক চোখঝল্‌সানো উজ্জ্বল আলো আমার সমস্ত শরীর আর ঘর ছেয়ে ফেলছে। আমার বমিভাব আর অন্যান্য প্রবল উপসর্গসকল একেবারে অন্তর্হিত হলো। আমি বেশ সুস্থ হয়ে উঠলাম। গুরুর প্রতি মায়ের অপরিমেয় বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে নীচু হয়ে হাত বাড়িয়ে মায়ের পায়ের ধূলো নেবার জন্যে যথেষ্ট শক্তিও আমি সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেলাম। মা বারম্বার সেই ক্ষুদ্র ছবিটিতে মাথা ঠেকিয়ে বলতে লাগলেন, "হে সর্বব্যাপি গুরুদেব, আপনার জ্যোতিঃই আমার সন্তানকে রক্ষা করেছে, আপনাকে প্রণাম, আপনাকে প্রণাম।" আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, তিনিও সেই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির বিকাশ লক্ষ্য করেছিলেন, যার কারণে আমি সেই সাংঘাতিক করাল ব্যাধি হতে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তিলাভ করতে পেরেছিলাম।

আমার সর্বাপেক্ষা অমূল্য সঞ্চয়গুলির মধ্যে হচ্ছে সেই ফটোগ্রাফটি। সেই প্রতিকৃতিটি লাহিড়ী মহাশয় স্বয়ং পিতাকে দিয়েছিলেন। ছবিটির পেছনে একটি অলৌকিক কাহিনী আছে। পিতার গুরুভাই শ্রী কালীকুমার রায় মহাশয়ের কাছ থেকে আমি গল্পটি শুনেছি।

মনে হয়, লাহিড়ী মহাশয় তাঁর কোন ফটোগ্রাফ তুলতে দিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর আপত্তি সত্ত্বেও কালীকুমার রায় সমেত একদল শিষ্যের সঙ্গে তাঁর একটা গ্রুপ ছবি একবার তোলা হয়। ফটোগ্রাফার মহাশয় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন যে, প্লেটে যদিও অন্যান্য শিষ্যদের ছবিগুলো বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে, কিন্তু মাঝখানে যে স্থানে তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিকৃতি দেখবেন বলে স্বভাবতই আশা করেছিলেন, সে স্থানটি একেবারে শূন্য — কিছুই নেই। এই অদ্ভুত ব্যাপার নিয়ে তো বহু সোরগোল চললো।

গঙ্গাধরবাবু ছিলেন তাঁর এক শিষ্য এবং সুদক্ষ ফটোগ্রাফার। তিনি সগর্বে ঘোষণা করলেন যে, লাহিড়ী মহাশয়ের পলাতক মূর্তি এবার আর তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। তার পরদিন সকালবেলায় গুরুদেব যখন পিছনে পরদা টাঙ্গানো একটা কাঠের বেঞ্চিতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট, গঙ্গাধরবাবু তখন তাঁর সাজসরঞ্জাম সমেত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সাফল্যলাভের জন্য সর্ববিধ সতর্কতা অবলম্বন করে সোৎসাহে তিনি বারটি প্লেট একে একে ছবি তুললেন। আশ্চর্য! প্রত্যেকটাতেই তিনি দেখলেন যে, কাঠের বেঞ্চি ও পরদার ছাপ উঠেছে, কিন্তু এবারেও তাদের কোনটাতেই গুরুদেবের ছবি নেই।

দর্পচূর্ণ হওয়াতে গঙ্গাধরবাবু ত সাশ্রুনয়নে গুরুদেবের চরণপ্রান্তে গিয়ে পড়লেন। বহুক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে লাহিড়ী মহাশয় অর্থপূর্ণ ভাষায় বললেন, "আমিই আত্মা। তোমার ক্যামেরা কি যা সর্বব্যাপী আর যা দৃষ্টিরও অগোচর, তার ছবি তুলতে পারে?"

"তাইত দেখছি — পারে নাইতো বটে! কিন্তু ঠাকুর, আপনার দেহমন্দিরটির একটি ছবি পেতে যে আমার বড্ডই ইচ্ছে করছে। সত্যিই আমার দৃষ্টি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ — আজ পর্যন্ত বুঝতেই পারিনি যে সেই বিরাট আত্মা পরিপূর্ণভাবেই আপনার মধ্যে বিরাজিমান।"

"তাহলে কাল সকালে এসো, তোমার জন্যে আমি ছবি তুলতে বসব।" আবার ফটোগ্রাফার মহাশয় ছবি তুললেন। এবার কিন্তু সেই পুণ্যমুর্তি রহস্যময় অদৃশ্যাবরণ থেকে মুক্ত হয়ে প্লেটের উপর অতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলেন। মহাগুরু আর অন্য কোন ছবি তোলান নি, অন্ততঃ আমার চোখে তা পড়েনি।

ফটোগ্রাফটি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে।* সর্বজনোচিত সুঠাম গঠন, লাহিড়ী মহাশয়ের গৌরবর্ণ সুন্দর আকৃতি কোন্ জাতির, তা সহসা

* সন্নিবেশিত ছবিগুলির মধ্যে শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের ছবি দ্রষ্টব্য। ১৯৩৫-৩৬ সালে শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ যখন ভারত পরিভ্রমণে আসেন, সেই সময় জনৈক বাঙালী চিত্রকরকে মূল ছবির মত ছবি আঁকার কাজে নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে ওয়াই. এস. এস./এস. আর. এফ. প্রকাশনায় লাহিড়ী মহাশয়ের ঐ চিত্রটিকে বিধিবৎ চিত্ররূপে ব্যবহারের জন্য মনোনীত করেন। [মাউন্ট ওয়াশিংটনে পরমহংসজীর বসার ঘরে টাঙানো আছে] *(প্রকাশকের মন্তব্য)*

বুঝে ওঠা কঠিন। ঈশ্বরসঙ্গলাভের আনন্দ তাঁর রহস্যময় মৃদু হাসিতে ঈষৎ স্ফুরিত। তাঁর নয়ন দু'টি অর্ধোন্মীলিত অবস্থায় বাহ্জগতের দিকে নামমাত্র নিবদ্ধ, আবার ভূমানন্দলাভের গভীর অনুভবের দ্যোতক — অর্ধনিমীলিতও বটে। পার্থিব জগতের তুচ্ছ আকর্ষণ সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হয়ে, তাঁর কৃপাপ্রার্থী সমাগত নরনারীদের আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধানে তিনি কিন্তু সর্বদাই জাগরূক ছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিকৃতির অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে আরোগ্য-লাভের অল্পকাল পরেই আমার এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক ভাবদর্শনলাভ হয়। একদিন সকালবেলায় বিছানায় বসে থাকতে থাকতেই এক জাগর স্বপ্নে মগ্ন হলাম।

"বন্ধ চক্ষুর অন্ধকারের আড়ালে কি আছে," এই মর্মসন্ধানী প্রশ্নটি মনের গহনে প্রবলভাবে উদয় হল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তশ্চক্ষুতে এক বিরাট জ্যোতির স্ফুরণ হল। পর্ব্বতগুহার মধ্যে ধ্যানে উপবিষ্ট সাধুসন্তদিগের দিব্যমূর্তিসকল আমার ললাটের ভিতর প্রশস্ত জ্যোতিঃপটে সিনেমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবির মত প্রতিভাত হল।

উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলাম, "আপনারা কে?" উত্তর এল, "আমরা সব হিমালয়ের যোগী।" সে' স্বর্গীয় বাণী বর্ণনা করা কঠিন। হৃদয় আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠল।

বললাম, "আমারও অন্তরের একান্ত বাসনা যে, হিমালয়ে গিয়ে আপনাদের মত যোগী হই।" দৃশ্যটি মিলিয়ে গেল। কিন্তু তার রজতরশ্মিরেখা ক্রমবর্ধমান বৃত্তাকারে অনন্তের দিকে প্রসারিত হতে লাগল।

প্রশ্ন করলাম, "এই অপূর্ব আলোর ছটা কিসের?"

মেঘমন্দ্রধ্বনিতে উত্তর এল, "আমিই ঈশ্বর,* আমিই জ্যোতিঃ!"

বললাম "আমি তোমার সঙ্গে এক হয়ে যেতে চাই!"

* ঈশ্বর — সংস্কৃত ধাতু ঈশ (আধিপত্য করা)। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্তা। হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরের হাজার নাম আছে; প্রত্যেকটাই বিভিন্ন দার্শনিক অর্থের ইঙ্গিত বহন করে। ঈশ্বর হচ্ছেন তিনি, যাঁর ইচ্ছায় সংগঠিত কালচক্রে বিশ্বের সৃজন ও লয় হয়ে থাকে।

তারপর সেই আনন্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। তার ভিতর দিয়ে আমি ঈশ্বরানুসন্ধানের প্রেরণা লাভ করবার স্থায়ী উত্তরাধিকার খুঁজে পেলাম। "তিনি শাশ্বত, তিনি চিরনবীন আনন্দ!" — এই স্মৃতি, সেই পরমানন্দ লাভের দিন হতে বহুকাল স্থায়ী হয়েছিল।

আর একটি কৈশোরের স্মৃতি আজও আমার মনের মধ্যে জাজ্বল্যমান, কারণ আজ পর্যন্ত তার ক্ষতচিহ্ন আমি অঙ্গে বহন করে বেড়াচ্ছি।

আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী উমাদিদি আর আমি একদিন সকালে আমাদের গোরক্ষপুরের বাড়ীর উঠোনে এক নিমগাছের তলায় বসে আছি। নিকটস্থ টিয়াপাখিদের নিমফল খাওয়া দেখার ফাঁকে ফাঁকে একটা বাংলা শিশুপাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে তার কাছে আমার পাঠাভ্যাস চলছিল। পায়ে ফোড়া হয়েছে বলে উমাদিদি একটা মলমের শিশি আনলো। মলমের খানিকটা আঙ্গুলে নিয়ে আমিও আমার হাতের উপর লাগিয়ে দিলাম। উমাদিদি বললো, "শুধু শুধু সুস্থ হাতে মলম লাগানো হচ্ছে কেন?" বললাম, "দেখ্ দিদি, আমার মনে হচ্ছে কাল আমার হাতেও একটা ফোড়া বের হবে। যে জায়গায় ফোড়াটা বেরোবে, সেইখানে তোমার মলমটা লাগিয়ে দেখছি!"

"ধ্যেৎ, মিথ্যুক কোথাকার!"

"দিদি, খবরদার আমায় মিথ্যুক বলবে না; আগে দেখ, কাল সকালবেলায় কি হয়।" রাগে আমার সর্বশরীর পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

উমাদিদির মনে কিন্তু কোন রেখাপাত হল না। উপরন্তু বার তিনেক তো আমায় টিট্‌কারিই দিলে। স্বরে দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করে ধীরে ধীরে বললাম, "আমার অন্তরের প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরেই আমি বলছি যে, কাল আমার হাতে ঠিক এই জায়গাটিতেই বেশ বড়গোছের একটি ফোড়া বেরোবে, আর তোমার ফোড়াটি এখনকার মাপের ঠিক দ্বিগুণ হয়ে ফুলে উঠবে, দেখো।"

সকালবেলায় দেখা গেল, ঠিক নির্দিষ্ট স্থানটিতে আমার একটি সুপুষ্ট ফোড়া উঠেছে আর উমাদিদির ফোড়াটির আকারও দ্বিগুণ হয়ে

দাঁড়িয়েছে। চিৎকার করে দিদি তো মাকে বলতে ছুটল যে, মুকুন্দ একটি যাদুকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মা সব শুনে গম্ভীরভাবে আমায় বারণ করলেন যাতে করে কখনও আমি কারও কোন ক্ষতি করবার জন্য যেন বাক্যের শক্তির অপব্যবহার না করি। আমিও তাঁর উপদেশ সর্বদা স্মরণে রেখে আজ পর্যন্ত তা পালন করে চলেছি।

আমার ফোড়াটিতে অস্ত্রোপচার করতে হল। ডাক্তারের অস্ত্র প্রয়োগের সুস্পষ্ট চিহ্ন আজ পর্যন্তও আছে। মানুষের কেবলমাত্র বাক্যের শক্তির নিত্যস্মারকস্বরূপ সেই ক্ষতচিহ্ন আমার দক্ষিণহস্তের উপর বিরাজমান।

উমাদিদির প্রতি ঐ সব সরল আর আপাতনির্দোষ কথাগুলি গভীর একাগ্রতার সঙ্গে উচ্চারিত হবার সময় অন্তর্নিহিত শক্তিবলে বোমার মতো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, ক্ষতিকর অথচ নিশ্চিত ফলপ্রসব করেছিল। পরে অবশ্য আমি বুঝেছিলাম যে, বাক্যের ভিতরকার বিস্ফোরক স্পন্দনশক্তি, সুবিবেচনার সঙ্গে প্রয়োগ করতে পারলে মানুষের জীবনকে আপন্মুক্ত করতে পারা যায়, আর তার ক্রিয়াপ্রকাশের জন্য ক্ষতচিহ্ন উৎপাদন বা তারজন্য ভর্ৎসনালাভ, কিছুরই প্রয়োজন হয় না।*

আমরা অর্থাৎ পরিবারের সকলে পাঞ্জাবের লাহোর শহরে চলে গেলাম। সেখানে আমি মা কালীর† একখানি পট সংগ্রহ করেছিলাম। সেটিকে আমাদের বাড়ীর বারান্দায় কুলুঙ্গির মত ছোট একটি পূজার জায়গায় স্থাপন করলাম। আমার মনে তখন এই অখণ্ড বিশ্বাস হল যে, সেই পূজাপীঠে যে প্রার্থনাই উচ্চারণ করি না কেন, তা নিশ্চয়ই সফল হবে।

---

* ওঙ্কারধ্বনি হতেই শব্দের অসীম শক্তির উৎপত্তি। এই প্রণব ঝঙ্কারই হচ্ছে সকল আণবিক শক্তির মধ্যে নিহিত মহাব্যোমের স্পন্দনশক্তি। কোন বাক্য, সুস্পষ্ট উপলব্ধি আর গভীর একাগ্রতাসহ উচ্চারিত হলে তার একটা প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়। কোন ভাবোদ্দীপক বাক্যের উচ্চৈঃস্বরে বা নীরব আবৃত্তি যে ফলপ্রসূ, তা ক্যুইজম্ ও একইপ্রকার মানসচিকিৎসা প্রণালীতে দেখা গেছে। এর গুপ্তরহস্য হচ্ছে মনের কম্পাঙ্কের বৃদ্ধির হার।

† কালী — অনন্তরূপিনী প্রকৃতির মাতৃরূপে ঈশ্বরের প্রকাশ।

একদিন সেখানে উমাদিদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম যে, সামনের খুব সরু গলির বিপরীত দিকের বাড়ীগুলোর ছাদের উপর দুটো ছেলে ঘুঁড়ি ওড়াচ্ছে।

উমাদিদি আমায় একটা ঠোনা দিয়ে বললো, "কিরে, তুই এত চুপচাপ কেন?" বললাম, "আমি ভাবছি যে কি আশ্চর্য বল দেখি, মা কালীর কাছে আমি যা-ই চাই না কেন, তাই পাই।"

ভগিনী তো ঠাট্টার সুরে বললে, "মা কালী তোকে বোধহয় ঐ ঘুঁড়ি দু'টিও পাইয়ে দেবেন।"

"তাই বা হবে না কেন?" বলে ঘুঁড়ি দু'টি পাবার জন্যে নীরবে প্রার্থনা শুরু করে দিলাম।

ভারতবর্ষে ঘুঁড়ির সুতায় কাঁচভাঙ্গা আর নানারকম মাঞ্জা মাখিয়ে প্যাঁচ কাটাকাটি খেলা হয়। একপক্ষ অপরপক্ষের ঘুঁড়ি প্যাঁচ কেটে ফেলে দিতে চেষ্টা করে। সুতোকাটা ঘুঁড়ি, ছাদের উপরি দিয়ে হাওয়ায় ভেসে যায় আর তা ধরে ফেলাতে প্রচুর আমোদ। যেহেতু উমাদিদি আর আমি ছাদে একটা ঢাকা বারান্দার কোণে ছিলাম, সেহেতু প্যাঁচকাটা ঘুঁড়ি যে আমাদের হাতে এসে পড়বে, তা একরকম অসম্ভব বলেই বোধ হল — কারণ স্বভাবতঃই তার সুতো ছাদের উপরই ঝুলতে থাকবে।

গলির ওপাশের লোকগুলো ঘুঁড়ির প্যাঁচ কাটাকাটি শুরু করে দিল। একটার সুতো কাটা যেতে তৎক্ষণাৎ সেটা আমাদের দিকে ভেসে এল। হঠাৎ হাওয়া কমে যাওয়াতে সেটা মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে বিপরীত দিকের বাড়ীর ছাদের উপর একটা ফণীমনসা গাছে তার সুতো বেশ শক্তভাবে জড়িয়ে ফেললো, আর আমার পক্ষে ধরবার জন্য বেশ চমৎকার একটা লম্বা ফাঁসও তৈরী হয়ে গেল। উমাদিদিকে ঘুঁড়িটা উপহার দিলাম।

উমাদিদি বললে, "এ একটা অদ্ভুত দৈব ঘটনা, এ তোমার প্রার্থনার ফল নয়। অন্য ঘুঁড়িটাও যদি তোমার কাছে আসে তবেই আমি তা বিশ্বাস

করতে পারব।” কথার চেয়েও তার কালো চোখ দু'টিতে একটা গভীরতর বিস্ময় ফুটে উঠল।

আমি একমনে প্রার্থনা জানাতে লাগলাম। অপর লোকটি সজোরে টান দিতেই হঠাৎ তার ঘুঁড়িটার সুতো ছিঁড়ে গেল। হাওয়ায় নাচতে নাচতে ঘুঁড়িটা আমার দিকেই ভেসে এল। আমার সহায় সেই ফণীমনসার গাছটি, যাতে করে আমি ধরে ফেলতে পারি এমনভাবে ঘুঁড়ির সুতোয় ফাঁসটি বানিয়ে সেটাকে গাছে আটকে ফেললো। এবারেও আমার দ্বিতীয় বিজয়চিহ্নটি উমাদিদিকে উপহার দিলাম।

“সত্যিই! মা কালী তোমার কথা শোনেন! ওরে বাবা, এসব যেন ভেল্কিবাজি!” বলে ত্রস্তা হরিণীর মতই দিদি ছুটে পালালো।

২য় পরিচ্ছেদ

আমার মাতৃবিয়োগ ও মন্ত্রপূত কবচ

মায়ের ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিবাহ দেন। "হায় রে, কবে অনন্তর বৌয়ের মুখ দেখে মর্ত্যে স্বর্গসুখ পাব!" বংশরক্ষার প্রবল আগ্রহে মাকে প্রায়ই এইরকম করে খেদ প্রকাশ করতে দেখতাম।

অনন্তদার পাকা-দেখার সময় আমার বয়স ছিল এগার বছর। মা কলকাতায় মহানন্দে বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত। কেবল পিতা আর আমি তখন উত্তর ভারতের বেরিলী শহরে আমাদের বাড়ীতে ছিলাম। বছর দুই আগে পিতা লাহোর থেকে ওখানে বদলি হয়ে এসেছেন।

পূর্বে আমি আমার দুই জ্যেষ্ঠা ভগিনী রমা ও উমাদিদির বিবাহে খুব ঘটা দেখেছিলাম। কিন্তু বাড়ীর জ্যেষ্ঠপুত্র বলে অনন্তদার বিবাহের আয়োজন সত্যই খুব বিরাট গোছের হয়েছিল। প্রত্যহই দূর-দূরান্তর হতে নানা আত্মীয়কুটুম্ব সব এসে পড়ছেন। তাঁদের আদর আপ্যায়নে মা খুবই ব্যস্ত। ৫০ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটে সদ্যসংগৃহীত একটি প্রকাণ্ড বাড়ীতে তাঁদের আরামে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিরাট ভোজের নানাবিধ খাদ্যসম্ভার, দাদা যে চতুর্দোলায় চড়ে কনের বাড়ী যাবেন — সেই চতুর্দোলা, রঙীন আলোর সারি, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিচবোর্ডের হাতী ও উট, ইংরেজী, স্কটিশ ও দেশী বাদ্য-পেশাদারী গাইয়ে বাজিয়ের দল, বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণাদি সবই প্রস্তুত।

পিতা ও আমি উৎফুল্ল মনে, বিবাহ উৎসবে ঠিক সময়মত বাড়ীতে গিয়ে হাজির হব বলে স্থির করেছিলাম। কিন্তু সেই বিবাহ দিবসের অব্যবহিত পূর্বেই আমি একটা অমঙ্গলসূচক স্বপ্ন দেখলাম।

বেরিলীর বাংলো বাড়ীর বারান্দায় পিতার পাশে ঘুমচ্ছি। রাত তখন অনেক। বিছানার উপর মশারির গায়ে হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঝটপটানির শব্দ

শুনে জেগে উঠলাম। মশারির পাতলা কাপড় সরে গেল, দেখতে পেলাম, সেখানে মায়ের স্নেহময়ী মুখখানি।

ফিস্ ফিস্ করে তিনি বললেন, — "মুকুন্দ, তোমার বাবাকে এক্ষুণি ডেকে তোল — আর আমায় যদি শেষ দেখা দেখতে চাও তো ভোর চারটের গাড়ি ধরে কলকাতায় শীগ্‌গির রওনা হয়ে পড়।" বলেই ছায়ার মত মূর্তিটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

"বাবা, বাবা, মা যে মারা যাচ্ছেন!" আমার ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর তাঁকে তখনই জাগিয়ে তুললো। কাঁদতে কাঁদতে আমি তাঁকে এই নিদারুণ দুঃসংবাদ জানালাম।

এই নূতন পরিস্থিতিকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে অগ্রাহ্য করে তিনি বললেন, "ও তোমার মনের ভুল; কিচ্ছু ভেবো না, তোমার মা বেশ ভালই আছেন। যদিই বা কোন খারাপ খবর আসে, তবে কালই আমরা বেরিয়ে পড়ব।"

"এক্ষুণি না বেরোলে আপনি নিজেকে কোন কালেই ক্ষমা করতে পারবেন না।" মানসিক যন্ত্রণা ও ক্ষোভে আমি রাগের চোটে বলে ফেললাম, "আমিও আপনাকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না।"

বিষাদাচ্ছন্ন প্রাতঃকাল সুস্পষ্ট দুঃসংবাদ বহন করে উপস্থিত হলো — "মাতা সাংঘাতিক পীড়িত, বিবাহ স্থগিত; এখনই চলে আসুন।"

পিতা আর আমি বিহ্বলের মত রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। পথে গাড়ী বদল করবার সময় আমার এক খুল্লতাত মহাশয় দেখা করতে এলেন। দেখি যে, একটা ট্রেন একটি ক্ষীণ বিন্দু হতে বিরাট আকার ধারণ করতে করতে বজ্রগর্জনে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। মনের ভিতর দারুণ উদ্বেগের মধ্যে হঠাৎ একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের উদয় হল যে, রেল লাইনের উপর লাফিয়ে পড়ি। আমার মনে হতে লাগল — মাকে হারিয়ে মরুভূমির মত এই হঠাৎ অন্তঃসারশূন্য পৃথিবী আমি আর কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারব না। এ জগতে মাকেই আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় সাথী বলে ভাবতাম। তাঁর স্নেহকোমল কালো চোখ দু'টি আমার শৈশবের তুচ্ছ ব্যথাবেদনার পরম আশ্রয়স্থল ছিল।

খুড়োমহাশয়কে শেষ একটিমাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, "মা কি এখনও বেঁচে আছেন?" আমার মুখে দারুণ হতাশার ভাব লক্ষ্য করতে তাঁর বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হয় নি। তৎক্ষণাৎ সান্ত্বনাচ্ছলেই বললেন, "নিশ্চয়ই, তিনি বেঁচে আছেন বই কি।" আমি কিন্তু তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারলাম না।

কলকাতার বাড়ীতে পা দিতেই হৃদয়বিদারক মৃত্যুরহস্যের সামনা-সামনি এসে দাঁড়ালাম। আমি তো একেবারে অবসন্ন হয়ে গিয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়লাম। মনের স্বাভাবিক স্থৈর্য্য আবার ফিরে পেতে আমার বহু বৎসর কেটে গিয়েছিল।

স্বর্গের দুয়ার ভেদ করেই যেন আমার আর্তক্রন্দন অবশেষে জগন্মাতার চরণপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছল। মনের রক্তঝরা ক্ষতস্থানে কে যেন পরম শান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিলো। জগজ্জননীর অভয়বাণী কানে এসে পৌঁছল — "বহু জন্মের বহু জননীর স্নেহের ভিতর দিয়ে আমিই তোমার উপর দৃষ্টি রেখে এসেছি। এ জনমের তোমার মায়ের সুন্দর কালো চোখ দু'টি, যা তুমি আজ হারিয়ে ফেলেছ, চেয়ে দেখ, আমারই দৃষ্টিতে তুমি তাকে আবার খুঁজে পাবে!"

পরম স্নেহময়ী জননীর শ্রাদ্ধশান্তির পর, পিতা আর আমি আবার বেরিলীতে ফিরে গেলাম। আমাদের বাংলোর সামনে যেখানে হলদে সবুজ ঘাসে ঢাকা সমতল মাঠের উপর একটি বড় শিউলি গাছ ছায়া বিস্তার করে রয়েছে — প্রত্যহ সকালে সেখানে যেতাম শোকের পুণ্যস্মৃতিতীর্থ দর্শনের জন্যে! কাব্যকল্পনায় মনে হত, যেন শুভ্র শেফালিগুচ্ছ স্বতঃ উৎসারিত ভক্তি নিবেদনে নিজেদের উৎসর্গ করে তৃণবেদীর উপর ছড়িয়ে পড়ছে! শিশিরের সঙ্গে অশ্রুকণার মিলনে আমি দেখতে পেতাম যে, অন্য জগতের একটি অপরূপ আলো যেন ঊষার অরুণাঞ্চল হতে ঝরে পড়ছে। ঈশ্বরলাভের আকাঙক্ষার গভীর আকুলতা আমায় অভিভূত করে ফেলত। হিমালয় যেন আরও প্রবলভাবে আমায় আকর্ষণ করছে বলে অনুভব করতাম।

পুণ্য হিমালয় অঞ্চল ভ্রমণ শেষ করে আমার এক জ্ঞাতিভাই বেরিলীতে আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। যোগি-স্বামীদের* আবাসস্থল তুঙ্গশীর্ষ সেই সব পার্বত্য প্রদেশের অপরূপ কাহিনী আমি তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই শুনতাম।

আমাদের বেরিলীর বাড়ীওয়ালার ছোট ছেলে দ্বারকাপ্রসাদের কাছে একদিন প্রস্তাব করলাম, "চল, হিমালয়ে পালান যাক।" কিন্তু সে তো সে-কথা কানে তুললোই না, বরং উল্টে বড়দার কাছে আমার সব মতলব ফাঁস করে দিল। বড়দাদা তখন পিতাকে দেখতে বেরিলীতে এসেছেন। নিতান্ত এক ক্ষুদ্র বালকের এইসব অসম্ভব পরিকল্পনা একটু লঘুভাবে হেসে উড়িয়ে দেবার পরিবর্তে অনন্তদা আমাকে ঠাট্টা করবার মতলবেই বললেন, "তোমার গেরুয়া বসন কোথায় হে? ওসব ছাড়া ত' তুমি আর সন্ন্যাসী হতে পারবে না!"

কিন্তু কি আশ্চর্য! তাঁর এই কথাগুলোতে আমি কিন্তু এক অবর্ণনীয় আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। কথাগুলো একটা সুস্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুললো; আমি যেন সন্ন্যাসীবেশে ভারত পরিভ্রমণ করছি। বোধহয় তাতেই আমার অতীত জীবনের কোন হারানো স্মৃতি মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল। যাইহোক, বুঝলাম যে, কত সহজে আমি প্রাচীন সন্ন্যাস ধর্মের চিহ্ন গৈরিকবসন ধারণ করবার সুযোগ পাব।

একদিন সকালে দ্বারকার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মনে হলো — ঈশ্বরপ্রেমের বন্যা যেন আমার অন্তরে মহাপ্লাবনের মত নেমে আসছে। বাক্যালাপের উচ্ছ্বাসে আমার সঙ্গীর মন তখন আংশিক সন্নিবিষ্ট — আমি কিন্তু সে সময় অন্তরে কান পেতে কার যেন নীরব বাণী শুনছিলাম।

সেইদিন বৈকালেই আমি হিমালয়ের পাদদেশে নৈনিতাল শহরে পলায়ন করলাম। অনন্তদাও দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে আমার পিছু পিছু এসে আমায় ধরে ফেললেন। বিষণ্ণচিত্তে বেরিলীতে আবার ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। আমার একমাত্র তীর্থভ্রমণের সুযোগ ছিল, সেই অভ্যস্ত শিউলিতলায় ভোরবেলায় বেড়াতে যাওয়া। আপন জননী আর জগজ্জননী — এ' দুজনকেই আজ হারিয়ে আমার অন্তর কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগল।

* সংস্কৃতে 'স্বামী' শব্দের ধাতুগত অর্থ ঃ 'যিনি আত্মার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন।' (২৪ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

মায়ের মৃত্যুতে পারিবারিক বন্ধনে যে শূন্যতা এল তা অপূরণীয়। পিতা তাঁর জীবনের অবশিষ্ট প্রায় চল্লিশ বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়বার আর দারপরিগ্রহ করলেন না। দেখা গেল যে, তাঁর ক্ষুদ্র সন্তানদলের একাধারে পিতামাতার দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি আরও স্নেহকোমল, আরও সহজলভ্য হয়ে উঠলেন। ধীরতা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে তিনি বহু পারিবারিক সমস্যার সমাধান করে ফেলতেন। অফিস থেকে ফিরবার পর তিনি নিজের ঘরে ঢুকে শান্ত সমাহিত ভঙ্গীতে ক্রিয়াযোগ অনুশীলনে রত হতেন। মায়ের মৃত্যুর বহুকাল পরে পিতা যাতে জীবনে আর একটু আরাম পান, আর একটু স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পারেন, সেজন্য তাঁর সুখসুবিধার খুঁটিনাটি ব্যবস্থার প্রতি একটু লক্ষ্য রাখবার জন্যে একজন ইংরেজ নার্স রেখে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। পিতা কিন্তু মাথা নেড়ে তা বারণ করলেন।

জীবনব্যাপী সুগভীর প্রীতিতে স্নিগ্ধ তাঁর দৃষ্টি সুদূরে প্রসারিত করে তিনি বললেন, "তোমার মায়ের চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমারও সেবাযত্ন নেবার আগ্রহ সব চলে গেছে। আমি আর অন্য কোন স্ত্রীলোকের পরিচর্যা গ্রহণ করব না।"

মায়ের স্বর্গারোহণের প্রায় মাস চৌদ্দ পরে জানতে পারলাম যে, মা আমার জন্য একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলে গেছেন। অনন্তদা তাঁর মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই সেই কথাগুলো লিখে রেখেছেন। যদিও মা বছরখানেকের মধ্যেই আমার কাছে ঐ কথাগুলো প্রকাশ করতে বলেছিলেন, কিন্তু অনন্তদা তা করেন নি — দেরি করেছিলেন। এবার কিন্তু তাঁকে শীঘ্রই বেরিলী ছেড়ে কলকাতায় যেতে হবে — মায়ের সেই পছন্দকরা মেয়েটিকে বিবাহ করবার জন্য; কাজেই একদিন সন্ধ্যার সময় আমায় কাছে ডেকে বললেন, "মুকুন্দ, আমি তোমায় এই অদ্ভুত খবরটা দিতে অনিচ্ছুকই ছিলাম।" তাঁর স্বরে হতাশা ও নিরুপায়ের ভাব, — "আমার বড় ভয় ছিল যে, এতে তোমার বাড়ী থেকে পালানোর মতলব আবার জেগে উঠবে। কিন্তু যাইহোক, মন তোমার এখন দৈব উদ্দীপনায় পূর্ণ। হিমালয়ে পলায়ণ থেকে সম্প্রতি তোমায় যখন পাকড়ে আনলাম, তখনই মন স্থির করে ফেললাম। এবার আমি আমার গুরুত্বপূর্ণ

প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে আর বেশি দেরী করব না।" এই বলে অনন্তদা আমার হাতে একটি ছোট বাক্স দিলেন। সেইসঙ্গে মায়ের বার্তাটিও দিলেন।

মা বলেছেন, "আমার প্রিয় পুত্র মুকুন্দ। এই কথাগুলোই তোমার কাছে আমার শেষ আশীর্বাদ। তোমার জন্মের পর কতকগুলো অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, তা বলবার এখন সময় এসেছে। যখন তুমি নিতান্ত ছোট্ট শিশুটি ছিলে তখনই তোমার জন্যে নির্দিষ্ট পথ যে কি, তা আমি প্রথম জানতে পারি। সে সময় আমি তোমায় একবার কাশীতে আমার গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাই।

"যোগিরাজ লাহিড়ী মহাশয় তখন গভীর ধ্যানে বসে আছেন। চারপাশে বহু শিষ্য তাঁকে ঘিরে আড়াল করে বসে, — অতি অল্পই তাঁকে দেখা যাচ্ছিল। কোলে শুইয়ে তোমায় চাপড়াচ্ছি আর মনে মনে নিবেদন করছি, গুরুদেব যেন তোমায় দেখতে পান ও তোমায় তাঁর আশীর্বাদ দান করেন। আমার নীরব প্রার্থনা গভীর থেকে গভীরতর হতে তিনি চোখ খুলে আমার দিকে চাইলেন আর তাঁর কাছে যেতে ইঙ্গিত করলেন। সকলে তখন আমায় রাস্তা করে দিতে, আমি গিয়ে তাঁর সেই পুণ্যপদতলে প্রণাম করলাম। গুরুদেব তখন তোমায় কোলে বসিয়ে আধ্যাত্মিক দীক্ষাদানের মত তোমার কপালে হাত রেখে বললেন, — 'মা জননী, তোমার ছেলে একজন যোগী হবে, আর আধ্যাত্মিক ইঞ্জিনের মত এ বহু লোককে ভগবানের রাজ্যে টেনে নিয়ে যাবে।"

"সর্বদর্শী গুরুদেব আমার গোপন প্রার্থনা পূর্ণ করায় আমার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তোমার জন্মাবার কিছু আগে তিনি কিন্তু আমায় বলেছিলেন যে, তুমি তাঁরই পথ অনুসরণ করবে।

"তারপর বাছা, তোমার দিদি রমা আর আমি তোমার সেই বিরাট জ্যোতিঃদর্শনের কথা জানতে পারি। কারণ পাশের ঘর থেকে তোমায় বিছানার উপর নিশ্চল অবস্থায় বসে থাকতে দেখতে পেয়েছিলুম; তোমার ছোট্ট মুখখানি স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত। ঈশ্বরলাভের জন্য হিমালয়ে যাবার কথা বলবার সময় দেখলাম যে, তোমার কণ্ঠস্বরে লৌহকঠিন সঙ্কল্পের দৃঢ় প্রকাশ।

"এই সব কারণে বাছা, আমি টের পেয়েছিলাম যে, তোমার জীবনের পথ এইসব পার্থিব বাসনাকামনা হতে বহুদূরে। আর তা ছাড়া আমার জীবনে অন্য এক আশ্চর্য ঘটনা এই বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করে তুলেছিল। ঘটনাটি এমনই অলৌকিক যে, আমি আজ এই মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তোমায় তা জানাতে বাধ্য হচ্ছি।

"ব্যাপারটা হচ্ছে পাঞ্জাবে থাকতে এক সাধুর দর্শনলাভ। লাহোরে তখন আমাদের পরিবারের সকলেই রয়েছেন। একদিন সকালে বাড়ীর ভৃত্য হঠাৎ আমার ঘরে এসে বলল, 'গিন্নিমা, এক অদ্ভুত গোছের সাধু* আমাদের বাড়ীতে এসেছেন। তিনি বলছেন যে, তিনি মুকুন্দর মা'র সঙ্গে দেখা করতে চান।'

"এই নিতান্ত সরল আর সোজা কথাগুলো কিন্তু আমার হৃদয়তন্ত্রীতে গভীরভাবে আঘাত করল। তৎক্ষণাৎ আমি সাধুটিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এগিয়ে গেলাম। পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতেই টের পেলাম — আমার সামনে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন।

"তিনি বললেন, 'মা, সিদ্ধ মহাগুরুগণ তোমায় জানিয়ে দিতে চান যে, পৃথিবীতে তোমার আয়ুষ্কাল আর বেশিদিন নয়। এর পরের অসুখই হবে তোমার শেষ অসুখ।'† তারপর এল এক গভীর নীরবতা; তার মাঝে আমি এক প্রগাঢ় শান্তির স্পন্দন ছাড়া কোন ভয়ই আর টের পেলাম না। অবশেষে তিনি পুনরায় আমায় বললেন ঃ

'তোমার কাছে একটি রুপোর কবচ গচ্ছিত থাকবে। সেটি কিন্তু তোমায় আমি এখনই দিচ্ছি না। আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য, কাল যখন পূজোয় বসবে, কবচটি তখন আপনাআপনিই তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে যাবে। তোমার মৃত্যুশয্যায় তোমার বড়ছেলে অনন্তকে

---

* সাধু — সন্ন্যাসী, যিনি আধ্যাত্মিক সাধনার পথ অবলম্বন করেন।

† এই কথাগুলির মধ্যে যখন আমি আবিষ্কার করলাম যে, মা তাঁর স্বল্পায়ুর কথা গোপনে জানতে পেরেছিলেন, তখনই আমি সর্বপ্রথম বুঝতে পারলাম যে, কেন তিনি অনন্তদার বিবাহের সব আয়োজন তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। যদিও দাদার বিবাহের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু ঘটে, তবুও তাঁর মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ছিল — বিবাহ উৎসবটি দেখে যাওয়া।

কিন্তু অতি অবশ্য বলে যাবে যে, কবচটি এক বছর তার কাছে রাখবার পর সে যেন তোমার দ্বিতীয় পুত্র মুকুন্দকে সেটি দিয়ে দেয়। মুকুন্দ এর মর্ম মহাপুরুষদের কাছ থেকেই জানতে পারবে। পার্থিব আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে যখন সে ঈশ্বরানুসন্ধানের জন্যে মনেপ্রাণে প্রস্তুত হবে, সেই সময় নাগাদ সে এটা পেয়ে যাবে। কবচটি কিছুকাল ধারণ করবার পর, তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেলেই কবচটি অন্তর্ধান করবে। যত গোপনীয় স্থানেই লুকিয়ে রাখা হোক না কেন, কবচটি যেখান থেকে এসেছিল, সেখানেই আবার ঠিক ফিরে যাবে।'

"আমি সাধুটিকে ভিক্ষাদান করে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। কিন্তু ভিক্ষা গ্রহণ না করেই তিনি আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন। তার পরের দিন সন্ধ্যাবেলায়, হাত জোড় করে ধ্যানে বসেছি, এমন সময় ঠিক সেই সাধুটির কথামত একটি রুপোর কবচ আমার হাতের মাঝখানে এসে গেল — তা টের পেলাম বেশ একটা ঠাণ্ডা আর মোলায়েম স্পর্শে। দু'বছরেরও বেশি আমি কবচটিকে অতি সন্তর্পণে রক্ষা করে এসেছি। এখন অনন্তর হাতে দিলাম। আমার জন্য শোক কোরোনা। গুরুমহারাজ আমায় পরমাত্মার কোলে নিয়ে যাবেন। চললাম বাবা, মা জগদম্বাই তোমায় রক্ষা করবেন।"

কবচটি পেয়ে যেন অন্তরে জ্ঞানাগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। বহু সুপ্ত স্মৃতি জাগরিত হল। গোলমত পুরানো সেই অদ্ভুতধরণের সুন্দর কবচটির উপর সংস্কৃত অক্ষরে কি সব খোদাই করা ছিল। আমি বুঝলাম — যাঁরা অদৃশ্যভাবে আমার জীবনপথে আমায় পরিচালিত করছিলেন, সেইসব পূর্বজীবনের গুরুমহারাজদের কাছ থেকেই সেটি এসেছিল। এর অন্য একটা উদ্দেশ্য বা অর্থ ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কবচের* ভিতরে যে কি আছে তা কেউ সম্পূর্ণ প্রকাশ করে বলে না।

---

* কবচটি সূক্ষ্ম উপায়ে প্রস্তুত হয়েছিল। ক্ষণস্থায়ী পদার্থে গঠিত এরূপ দ্রব্যসকল আমাদের এ পৃথিবী হতে শেষ পর্যন্ত অদৃশ্যই হয়ে যায়। (৪৩ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কবচটির উপর কতকগুলি মন্ত্র খোদিত ছিল। শব্দ এবং বাক্ অর্থাৎ মানব কণ্ঠস্বরের শক্তি সম্বন্ধে ভারতবর্ষে যেমন গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা হয়েছিল, এমন আর কোথাও হয় নি। মহাবিশ্বের মধ্যে নিয়ত ঝঙ্কৃত প্রণবধ্বনির (বাইবেলের "শব্দ" অথবা "বহু জলকল্লোল") মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিনগুণের প্রকাশ (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ১ঃ৮)। মানুষের প্রতিটি শব্দ

কেমন করে কবচটি অবশেষে আমার জীবনের গভীর দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে অন্তর্ধান করল, আর কেমন করেই বা এটি হারানোতে আমার গুরুলাভের সূচনা হলো, এই পরিচ্ছেদে তার কথা এখন বলা যাবে না। আর তা বলবার সময়ও এখন আসে নি।

তবে, সেই ক্ষুদ্র কিশোরটি হিমালয়ে পলায়নের চেষ্টায় বারম্বার বাধা পেলেও, কবচের পাখায় ভর করে প্রত্যহ সে বহু দূরদূরান্তই উড়ে বেড়িয়ে আসত।

উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রণবধ্বনির এই তিনটি গুণের একটি ক্রিয়া প্রকাশ হয়। মানুষ সর্বদা সত্যকথা বলবে — সকল শাস্ত্রবিধির এই হচ্ছে বিধিসম্মত নির্দেশ।

কবচের উপর খোদিত সংস্কৃত মন্ত্র, শুদ্ধরূপে উচ্চারিত হলে পর আধ্যাত্মিক হিতকর স্পন্দন-শক্তিবিশিষ্ট হয়। আদর্শগঠন পঞ্চাশটি বর্ণের সংস্কৃত বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণের একটি করে সুনির্দিষ্ট আর অপরিবর্তনীয় উচ্চারণভঙ্গী আছে। ল্যাটিন থেকে উদ্ভূত ইংরেজী বর্ণমালা, যাতে ছাব্বিশটি অক্ষরের শব্দভার বহনের নিষ্ফল চেষ্টা দেখা যায়, তার শব্দগত দৈন্যের উপর জর্জ বার্ণার্ড শ একটি সুচিন্তিত ও সরস প্রবন্ধ লিখেছিলেন। মিঃ শ তাঁর অভ্যস্ত নির্মম পরিহাসের সঙ্গে ("ইংরেজী ভাষার জন্য একটি ইংরেজী অক্ষরের প্রচলনে যদি গৃহবিবাদ শুরু হয় ..... তা হলেও আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই") বলেন যে বিয়াল্লিশ বর্ণের একটি বর্ণমালা গ্রহণ করা উচিত। (উইলসন লিখিত "দি মিরাকিউলাস বার্থ অফ্ ল্যাঙ্গোয়েজ" প্রকাশক : ফিলোসফিক্যাল লাইব্রেরী, নিউ ইয়র্ক নামক পুস্তকে তাঁর লেখা মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এরূপ একটি বর্ণমালা সংস্কৃতের স্বরসম্পূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে, যার পঞ্চাশটি বিভিন্ন বর্ণ ভুল উচ্চারণের কোন সম্ভাবনা নেই।

সিন্ধু সভ্যতার কয়েকটি শীলমোহর আবিষ্কারের পর কয়েকজন পণ্ডিত, ভারতবর্ষ যে তার সংস্কৃত বর্ণমালা সেমিটিক মূল থেকে "ঋণগ্রহণ" করেছে — বর্তমানে প্রচলিত এই মতবাদ পরিত্যাগে উদ্যত হয়েছেন। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার কাছে কয়েকটি বিরাট হিন্দুনগর আবিষ্কৃত হওয়াতে এমন একটি উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া গেছে, যার "ভারতভূমিতে এমন একটি সুদীর্ঘ ও প্রাচীন ইতিহাস ছিল এবং যা আমাদের সেই যুগে পৌঁছে দেয়, যে যুগের বিষয় কেবলমাত্র ক্ষীণভাবে অনুমান করা যেতে পারে।" (স্যার জন মার্শাল কৃত 'মহেঞ্জোদাড়ো এণ্ড ইণ্ডাস সিভিলাইজেশন ১৯৩১)।

এই পৃথিবীতে মানবজাতির সভ্যতার নিরতিশয় প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে হিন্দু মতবাদ যদি সত্য বলে গৃহীত হয়, তা হলে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত কেন সর্বাঙ্গসুন্দর, তা ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, স্যার উইলিয়াম জোনস্ বলেন, "সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব যাই হোক না কেন এর গঠন অতি অদ্ভুত — গ্রীকভাষা অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ, ল্যাটিন অপেক্ষা শব্দসমৃদ্ধ, আর দুয়ের অপেক্ষা অতি সুষ্ঠুরূপে সুমার্জিত।"

এন্‌সাইক্লোপিডিয়া আ্যামেরিকানাতে লিখিত আছে, "ধ্রুপদী শিক্ষা ও সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের দ্বারা) সংস্কৃতভাষার পুনরাবিষ্কারের মত এত বড় একটা ঘটনা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ইতিহাসে আর দেখা যায় নি। ভাষা-বিজ্ঞান, তুলনামূলক ব্যাকরণ অথবা পুরাণতত্ত্ব, ধর্মবিজ্ঞান ..... হয় তাদের সম্পূর্ণ অস্তিত্বই সংস্কৃতভাষার পুনরাবিষ্কারের উপর নির্ভর করে, অথবা এর চর্চার দ্বারা তারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে।"

৩য় পরিচ্ছেদ

দুই দেহধারী সাধু

পিতাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা বাবা, আমি যদি বিনা জোরজবরদস্তিতে বাড়ী ফেরার কথা দেই তাহলে কি একবার কাশী বেড়িয়ে আসতে পারি?"

পিতা অবশ্য আমার দেশভ্রমণের আকাঙক্ষাকে কখনো বাধা দিতেন না। ছোটবেলা থেকেই তিনি আমায় নানা শহর, তীর্থস্থান প্রভৃতি বেড়াতে যাবার অনুমতি দিতেন। প্রায়ই দু'চারজন বন্ধুও আমার সঙ্গে যেত। পিতারই দেওয়া প্রথম শ্রেণীর রেল পাসে আমরা আরামে বেড়াতাম; পিতা রেলের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হওয়াতে আমাদের পরিবারের ভ্রমণবিলাসীদের খুবই সুবিধা হয়েছিল।

পিতা আমার অনুরোধ যথোচিত বিবেচনা করে দেখবেন বলে অঙ্গীকার করলেন। তার পরদিন তিনি আমাকে ডেকে বেরেলী থেকে কাশী যাতায়াতের একখানি পাস, কিছু টাকা আর দু'খানি চিঠি দিয়ে বললেন, "কাশীতে গিয়ে আমার বন্ধু কেদারনাথবাবুকে একটি কাজের কথা বলতে হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁর ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের দু'জনেরই বন্ধু স্বামী প্রণবানন্দের মারফতে তুমি এই চিঠিখানা তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। স্বামীজী আমার গুরুভাই, খুব উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ করেছেন। তাঁর সঙ্গলাভ করে তোমার উপকারই হবে। আর এই দ্বিতীয় চিঠিখানি হচ্ছে তোমার পরিচয়পত্র।" তারপর পিতা একটু হাসি হাসি চোখে বললেন, "কিন্তু মনে থাকে যেন, বাড়ী থেকে তোমার আর পালানো চলবে না, বুঝলে?"

দ্বাদশ বৎসর বয়সের প্রবল উৎসাহ নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। (যদিও কোনকালে আমার নতুন দৃশ্য, নতুন মুখ দেখবার আনন্দ ও উৎসাহ কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি)। বেনারসে পৌঁছেই আমি স্বামীজীর বাড়ীর দিকে

অগ্রসর হলাম। সামনের দরজা খোলাই ছিল; সেখান দিয়ে তেতলার একটি লম্বা হলঘরের মত ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, কটিবাসপরিহিত স্বামীজী ঈষদুচ্চ এক চৌকির উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট। তাঁর মস্তক আর বলিরেখাহীন মুখমণ্ডল বেশ পরিষ্কারভাবে কামানো। দিব্য হাসি তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে খেলা করছে। আমার অনধিকার প্রবেশের সঙ্কোচ দূর করবার জন্য তিনি চিরপরিচিতের মত আমায় সাদর অভ্যর্থনা করে বললেন, "বাবা, আনন্দ!" শিশুসুলভ স্বরে তাঁর আন্তরিক স্নেহসম্ভাষণ।

নতজানু হয়ে তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণামান্তে জিজ্ঞাসা করলাম, — "আপনিই কি স্বামী প্রণবানন্দজী?" তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ।" তারপর পকেট থেকে পিতার চিঠিখানি বার করবার পূর্বেই তিনি বললেন, "তুমি তো ভগবতীবাবুর ছেলে?" অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে তাঁকে আমার পরিচয়পত্রটি দিলাম, যদিও তা তখন একেবারে নিরর্থক বলে বোধ হল।

স্বামীজী তাঁর অতীন্দ্রিয় দর্শনশক্তির সাহায্যে আমাকে পুনরায় আশ্চর্যান্বিত করে বললেন — "দাঁড়াও, কেদারনাথবাবুকে তোমার জন্য খুঁজে বার করছি।" তারপর চিঠিখানার দিকে একটিবারমাত্র দৃষ্টিপাত করে পিতার বিষয় কয়েকবার প্রীতিভরে উল্লেখ করে বললেন, "জানো, এখন আমি দু'টি পেন্সন ভোগ করছি। একটি তোমার বাবার সুপারিশে, যাঁর জন্য এককালে আমি রেল অফিসে চাকরি পেয়েছিলাম; আর একটি বিশ্বেশ্বরের কৃপায়, যাঁর জন্য আমি সচেতনে এই পার্থিব জীবনের কর্তব্যসকল ঠিকভাবে শেষ করতে পেরেছি।"

আমার কাছে তাঁর এ উক্তি অত্যন্ত দুর্বোধ্য ঠেকল। জিজ্ঞাসা করলাম, "আজ্ঞে, কি রকম পেন্সন আপনি বিশ্বেশ্বরের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন? তিনি কি আপনার কোলে টাকার তোড়া ফেলে দেন?"

শুনে তিনি হেসে উঠে বললেন, "আমার পেন্সন মানে সুগভীর শান্তি। আমার বহুবছরের গভীর ধ্যানসাধনার পুরস্কার। এখন আমার অর্থের প্রতি আর কোন লালসা নেই। আমার সাংসারিক প্রয়োজন অতি অল্পই — তা পর্যাপ্তভাবেই মিটে যায়। এখন নয়, পরে তুমি দ্বিতীয় পেন্সনের মানে বুঝতে পারবে।"

হঠাৎ কথাবার্তা বন্ধ করে দিয়ে স্বামীজী গম্ভীর ও নিস্পন্দ হয়ে পড়লেন। একটা গূঢ় রহস্যময় ভাব যেন তাঁকে ঘিরে ধরলো। প্রথমে তাঁর চোখ দু'টি অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন দূরে আগ্রহোদ্দীপক কোন কিছু দেখছেন; তারপরেই তা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। আমি তাঁর বাক্‌স্বল্পতাতে একটু যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম। এখনও পর্যন্ত তিনি কিন্তু আমায় এমন কিছুই বলেন নি, যাতে করে পিতার বন্ধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হতে পারে। ঈষৎ চঞ্চল হয়ে আমি ঐ ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখলাম, ঘরে আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউই নেই। আমার অলস দৃষ্টি তক্তাপোষের নীচে তাঁর খড়ম জোড়ার উপর গিয়ে নিবদ্ধ হল।

বললেন, "ছোটো মহাশয়,* কিচ্ছু ভেবো না। তুমি যাঁকে দেখতে চাও, তিনি আধঘণ্টার মধ্যেই তোমার কাছে এসে হাজির হবেন।" যোগিবর আমার মনের কথা সব যেন পড়ে নিচ্ছিলেন; যদিও তা সে সময় বিশেষ কিছু কঠিন ছিল না।

আবার তিনি এক দুর্জ্ঞেয় নীরবতার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন। ঘড়িতে দেখলাম তখন আধ ঘণ্টাটাক মাত্র কেটেছে।

স্বামীজী জেগে উঠে বললেন, "কেদারনাথবাবু বুঝি দরজার কাছে এলেন!" সিঁড়ি দিয়ে কেউ যেন উপরে উঠে আসছে শুনতে পেলাম। একটা অদ্ভুত অবিশ্বাসের ভাব হঠাৎ মনের মধ্যে উদিত হল। বিক্ষিপ্ত চিন্তাসকল মনের মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে ধাবিত হতে লাগল। ভাবলাম, "লোক না পাঠিয়ে পিতার বন্ধুকে এখানে কেমন করে ডেকে আনা সম্ভব হল? আমার আসার পর স্বামীজী তো আমি ছাড়া আর কাউকে কোন কথাই বলেন নি।"

কিছু না বলে সেই ঘর ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। মাঝপথে এক ক্ষীণদেহ গৌরবর্ণ মধ্যমাকৃতি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। দেখে বোধ হলো অতি দ্রুতবেগেই তিনি আসছেন।

"আপনিই কি কেদারনাথবাবু?" উত্তেজনায় আমার স্বর তখন কাঁপছে।

---

* বহু ভারতীয় সাধুসন্ন্যাসী আমায় এই বলেই সম্বোধন করতেন।

তিনি সস্নেহে হেসে বললেন, "হ্যাঁ। তুমিই বুঝি ভগবতীবাবুর ছেলে; আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ; কিন্তু মশায়, আপনি এখানে এলেন কি করে?" তাঁর রহস্যময় উপস্থিতিতে আমি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলাম।

তিনি তখন বলতে লাগলেন, "আজ দেখছি যা ঘটছে সবই অদ্ভুত! ঘণ্টাখানেকও হয়নি, গঙ্গায় সবেমাত্র স্নানটি সেরে উঠেছি, এমন সময় স্বামী প্রণবানন্দজী আমার কাছে গিয়ে উপস্থিত! আমি তো কল্পনাই করতে পারি নি, আমি যে তখন সেখানে থাকবো, তা তিনি জানলেন কেমন করে?

প্রণবানন্দজী বললেন, 'ভগবতীবাবুর ছেলে তোমার জন্যে আমার ঘরে অপেক্ষা করছে। সঙ্গে আসবে না কি?' আমি সানন্দে রাজী হলাম। হাত ধরাধরি করে চলেছি; খড়মপায়েই কিন্তু স্বামীজী আমায় অবাক করে এগিয়ে চললেন, যদিও পায়ে আমার তখন এই মজবুত জুতোজোড়াটা পরা।"

প্রণবানন্দজী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার ওখানে পৌঁছতে তোমার কতক্ষণ লাগবে?"

"'প্রায় আধঘণ্টা।"

"আমার এখন একটু কাজ আছে।' বলে তিনি একটি রহস্যময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "তোমায় ফেলেই আমায় এখন এগোতে হবে। তুমি আমার বাড়ীতে এসো; সেখানে ভগবতীবাবুর ছেলে আর আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।"

"আমি কোন আপত্তি তোলবার আগেই তিনি তাড়াতাড়ি আমাকে ছাড়িয়ে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি তারপর এখানে যত শীগগির সম্ভব চলে এসেছি।"

এই কৈফিয়তে আমি তো আরও হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি স্বামীজীকে কতদিন ধরে জানেন।

বললেন, "গেল বছর বারকতক দেখা হয়েছিল মাত্র। সম্প্রতি নয়। যাইহোক, স্নানের ঘাটে তাঁকে আজ আবার দেখতে পেয়ে ভারি আনন্দ হলো।"

শুনে বললাম, "আমি তো নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে? আপনি কি তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলেন, না কি সত্যি সত্যিই তাঁকে চাক্ষুষ করেছিলেন, তাঁর হাত ধরেছিলেন বা পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন?"

তিনি এবার রেগে উঠে বললেন, "তুমি কি বলতে চাইছ, তা বুঝতে পারছিনা! তোমার কাছে মিথ্যা বলছিনা, তা জেনো। আর এও কি তুমি বুঝতে পারছ না যে, একমাত্র স্বামীজী মারফৎ না হলে আমি কি কখনো জানতে পারতাম যে তুমি আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছ?"

"কি আশ্চর্য! উনি, মানে স্বামী প্রণবানন্দজী কিন্তু আমার এখানে ঘণ্টা খানেক আগে আসার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও কোথাও নড়েন নি বা আমার চোখের আড়ালও হন নি।" বলে তো আমি সব ব্যাপারটা এবং স্বামীজীর সঙ্গে আমার যাবতীয় কথাবার্তা তাঁকে জানালাম।

তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করে বললেন, "এ্যাঁ, আমরা কি এই মর্ত্যে বাস করছি, না স্বপ্ন দেখছি? জীবনে এমন অলৌকিক ঘটনা দেখব বলে তো কখনও কল্পনাই করিনি। ভেবেছিলাম স্বামীজী নিতান্তই একজন সাধারণগোছের মানুষ মাত্র! এখন দেখতে পাচ্ছি যে, তিনি অন্য একটি স্বতন্ত্র দেহ ধারণ করতে আর তা দিয়ে কাজও করতে পারেন।" দু'জনে আমরা স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করলাম। কেদারনাথবাবু তক্তপোষের তলায় খড়ম জোড়াটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন।

তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "দেখ, দেখ, ঐ খড়মজোড়াটাই পায়ে তিনি ঘাটে গিয়েছিলেন। আমি এখন ওঁকে যেমন দেখছি, ঠিক অমনিই একটা কৌপীন তাঁর পরা ছিল।"

কেদারনাথবাবু তাঁর সামনে এসে প্রণাম করতেই তিনি একটু হেঁয়ালির হাসি হেসে আমায় বললেন, "তোমাদের এতে অবাক হয়ে যাবার কি আছে, বল তো? সত্যিকারের যোগীদের কাছে প্রত্যক্ষ আর অপ্রত্যক্ষ জগতের মধ্যে সূক্ষ্ম ঐক্যের সম্বন্ধ কিছুমাত্র লুকোনো থাকে না। আমি এখান থেকে মুহূর্তমধ্যে সুদূর কলকাতায় গিয়ে আমার শিষ্যদের

সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলে আসতে পারি, আর তারাও তেমনি একইভাবে সবরকম জড়বাধা অতিক্রম করতে পারে।"

সম্ভবতঃ স্বামীজী আমার নবীন হৃদয়ে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলবার জন্যেই তাঁর যোগবলে দূরদর্শন আর দূরশ্রবণের শক্তির বিষয় অনুগ্রহ করে প্রকাশ করে বলেছিলেন।* কিন্তু উৎসাহবোধের পরিবর্তে আমার ভক্তির সঙ্গে ভয়েরও সঞ্চার হল। যেহেতু আমার ভাগ্যে লেখা ছিল যে, আমার ঈশ্বরলাভের সাধনায় সহায় হবেন এক বিশেষ গুরু — শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী মহারাজ, যাঁর দর্শনলাভ আমার তখনও ঘটেনি, সেইহেতু প্রণবানন্দজীকে গুরুরূপে বরণ করতে আমার তখন মনে কোনরূপ ইচ্ছার উদয় হয় নি। আমি সন্দিগ্ধনয়নে তাঁর দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম আর ভাবলাম, সত্য সত্যই তিনি স্বয়ং নাকি তাঁর প্রতিরূপ আমার সামনে রয়েছে।

স্বামীজী তাঁর মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে আমার দিকে দেখে আর তাঁর গুরুর বিষয়ে উদ্দীপনাময়ী বিবরণ দিয়ে আমার অস্বস্তি দূর করবার চেষ্টায় বললেন, "লাহিড়ী মহাশয়ের চেয়ে উত্তম যোগী আমি আর দেখিনি। তিনি নরদেহে দেবতা।"

ভাবলাম — শিষ্যই যদি ইচ্ছামাত্র একটি স্বতন্ত্র রক্তমাংসের দেহ ধারণ করতে পারেন, তবে তাঁর গুরুর কাছে অলৌকিক ব্যাপারে সত্যিই কি কোন সীমা-পরিসীমা থাকতে পারে?

* যোগীরা মনোবিজ্ঞান বলে যে সমস্ত বিধিনিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন, জড়বিজ্ঞান নিজেই সে সমস্তকে সত্য বলে স্বীকার করে নিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মানুষের যে দূরদর্শনের ক্ষমতা আছে, সে বিষয়টা ১৯৩৪ সালের ২৬শে নভেম্বর রোমের রয়্যাল ইউনিভার্সিটিতে প্রদর্শিত হয়েছিল। স্নায়ু-মনোবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ গিয়ুসেপ ক্যালিগারিস, একটি লোকের শরীরের কতকগুলি স্থান টিপে ধরলে পর লোকটি দেওয়ালের বিপরীত দিকে অবস্থিত অন্যান্য লোক বা জিনিষ সকলের বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করে। ডাঃ ক্যালিগারিস অন্যান্য অধ্যাপকদের বলেছিলেন যে, চর্মের উপর যদি স্থানবিশেষ বিক্ষোভিত করা যায়, তাহলে তার একরকম ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি হয়, যাতে করে সে এমনসব জিনিষের দর্শন পায়, যা সে অন্য কোন উপায়েই দেখতে পারতো না। দেওয়ালের ওপিঠের সব জিনিষ দেখতে পাবার জন্যে অধ্যাপক ক্যালিগারিস তাঁর পরীক্ষার বিষয়ীভূত কোন ব্যক্তির বুকের দক্ষিণ দিকে একটি জায়গা পনের মিনিট ধরে টিপে ধরেছিলেন। ডাঃ ক্যালিগারিস বলেছিলেন যে, যদি শরীরের কোন কোন স্থান ঐরকমভাবে উত্তেজিত করা যায় তাহলে সে আগে কখনও কোন জিনিষ দেখে না থাকলেও, যে কোনও দূরত্ব হতে সেইসব জিনিষই দেখতে পায়।

তিনি বলতে লাগলেন, "গুরুর কৃপা যে কি অমূল্য, তা আর তোমায় কি বলব। তাঁর অন্য একটি শিষ্যের সঙ্গে রোজ রাতে আমি ধ্যানে বসতাম। ধ্যান চলত আট ঘণ্টা ধরে। দিনেরবেলায় রেল অফিসে আমরা কাজ করতাম। কেরাণীর কাজে আমার অসুবিধা হয় দেখে আমি সব সময়টাই ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করব বলে মনস্থ করলাম। আট বছরধরে খুব অধ্যবসায়ের সঙ্গে অর্ধেক রাত পর্যন্ত ধ্যান করতাম। ফল পেলাম অদ্ভুত! বিরাট আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে মন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তবু সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আর আমার মাঝখানে বরাবরই একটা ছোট্ট আড়াল রয়ে গেল। এমন কি অতিমানবিক চেষ্টার পরও দেখলাম যে, সাযুজ্যলাভ আর আমার অদৃষ্টে ঘটে উঠল না।

"একদিন সন্ধ্যাবেলা লাহিড়ী ম'শায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর দৈবীকৃপা প্রার্থনা করলাম। সনির্বন্ধ অনুরোধ আমার সারারাত্তি ধরেই চলল। বললাম, 'গুরুদেবতা, ঈশ্বরলাভের আকাঙক্ষায় মনের যন্ত্রণা এত বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সেই প্রাণের ঠাকুরকে চোখের সামনে দেখতে না পেলে আমি আর বাঁচতে পারব না!"

"বললেন, 'তা আমি তার কি করব বল? তুমি আরও একমনে ধ্যান কর।' বললাম, 'তোমার চরণে নিবেদন করছি, হে মহাগুরু ভগবান, তুমিই যে জড়দেহে আমার সামনে বর্তমান; এই আশীর্বাদ কর ঠাকুর, যেন তোমাকেই আমি তোমার অনাদি অনন্তরূপে দেখতে পাই।'

"লাহিড়ী মহাশয় প্রসন্নভাবে অভয় হস্ত প্রসারিত করে বললেন, 'যাও, এখন ধ্যান কর গিয়ে। তোমার কথা আমি ব্রহ্মের* কাছে জানিয়েছি।'

"অপরিমেয় উচ্চ ভাবানুভূতি নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। ধ্যানে বসে সেই রাত্রে আমি সারাজীবনব্যাপি সাধনার চরম সিদ্ধি লাভ করলাম। এখন আমি আধ্যাত্মিক সাধনার নিরবচ্ছিন্ন পেন্সন ভোগ করছি। সেই থেকে পরমানন্দময় জগৎস্বামী আমার চোখের আড়ালে আর কোন মায়ার আবরণে লুকিয়ে রইলেন না।"

---

* ব্রহ্ম — সংস্কৃত বৃহ ধাতু, অর্থ ব্যাপ্তি; ঈশ্বরের স্রষ্টা রূপ।

প্রণবানন্দজীর বদনমণ্ডল স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এক ভিন্ন জগতের শান্তি আমার অন্তরে প্রবেশ করল। সব ভয় দূর হয়ে গেল। প্রণবানন্দজী আর একটি গোপন কথা ব্যক্ত করেছিলেন। সেটি হলো এই ঃ

"মাসকতক পরে আমি লাহিড়ী মশায়ের কাছে গিয়ে তাঁর অপরিসীম কৃপার কথা স্মরণ করে ধন্যবাদ দিতে গিয়েছিলাম। সে সময় তাঁর কাছে অন্য একটি ব্যাপারের উল্লেখ করতে হল।

"'গুরুদেব, আমি যে আর অফিসের কাজকর্ম করতে পারছি না। দয়া করে আমায় রেহাই দিন। ব্রহ্মানন্দপানে মন সদাই বিভোর।'

"'তোমার অফিস থেকে পেন্সন নাও।'

"'এত অল্পদিনের চাকরী, কি কারণ দেখাব, বলুন।'

"'যা মনে হয়, তাই বোলো।'

"তার পরদিন একটা দরখাস্ত করে দিলাম। ডাক্তার আমার অসময়ে অবসর গ্রহণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললাম, কাজ করতে করতে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে কেমন যেন একটা প্রচণ্ড টান উপর দিকে ঠেলে উঠছে বলে মনে হয়, আর সেটা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে আমায় একেবারে অকেজো করে দেয়।'*

"আমায় আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে ডাক্তার খুব ভালভাবে আমার জন্য পেন্সনের সুপারিশ করে দিলেন। আর তা শীগগিরই পেয়ে গেলাম।

---

* [illegible] আবির্ভাব হয় মেরুদণ্ডের বেদীতে, তারপর হয় মস্তিষ্কের ভিতর। সে অতুলানন্দের বেগ দুর্নিবার; কিন্তু যোগী তার বহিঃপ্রকাশের সংযম শিক্ষা করেন।

আমাদের সাক্ষাতের সময় প্রণবানন্দজী প্রকৃতই একজন পূর্ণজ্ঞানী সদ্‌গুরু ছিলেন; কিন্তু তাঁর কর্মজীবনের অবসান বহুবছর পূর্বেই ঘটেছিল। তখনও তিনি 'নির্বিকল্প সমাধি'তে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। পূর্ণজ্ঞানের সেই শুদ্ধ অবিচলিত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থেকে যোগী তাঁর যে কোন জাগতিক কর্তব্যপালনে কোনই অসুবিধা ভোগ করেন না।

অবসর গ্রহণের পর প্রণবানন্দজী "প্রণবগীতা" নামে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার একখানি গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা রচনা করেন। বাংলা আর হিন্দীতে প্রাপ্তব্য।

একাধিক শরীরে আবির্ভূত হওয়া একপ্রকার সিদ্ধি (যোগ শক্তি) যা পতঞ্জলির 'যোগসূত্রে' উল্লিখিত হয়েছে। উভয়ত্র আত্মপ্রকাশের ঘটনা যুগযুগান্তর ধরে বহু সাধুসন্তদের জীবনেই প্রদর্শিত হতে দেখা গিয়েছে।

আমি জানতাম — লাহিড়ী মহাশয়ের দৈব ইচ্ছাই ডাক্তারের ভিতর আর তোমার পিতা প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রেলকর্মচারীদের ভিতর দিয়ে কাজ করেছিল। তাঁরা সেই মহাগুরুর দৈবনির্দেশ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পালন করে সেই প্রাণের ঠাকুরের সঙ্গে অখণ্ড মিলনানন্দ সম্ভোগের মাধ্যমে আমার জীবনে মুক্তি এনে দিলেন।”

এই অপূর্ব তথ্য প্রকাশ করবার পর স্বামী প্রণবানন্দজী সুদীর্ঘকাল তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে বসে রইলেন। ভক্তিভরে তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণামান্তে বিদায় নেবার সময় তিনি আশীর্বাদ করে বললেন, “তোমার জীবন ত্যাগ ও যোগমার্গ অবলম্বন করবার জন্য। তোমার বাবা আর তোমার সঙ্গে পরে আবার আমার দেখা হবে।” অনেকদিন পরে তাঁর দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীই সফল হয়েছিল।*

কেদারনাথবাবু সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আমার পাশে পাশে চলতে লাগলেন। পিতার পত্রখানি তাঁর হাতে দিতে, তিনি সেটি রাস্তার আলোয় পড়ে বললেন, “তোমার বাবা প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন যে, তাঁদের রেল কোম্পানীর কলকাতার অফিসে আমি একটি পদ গ্রহণ করি। স্বামী প্রণবানন্দজী যে সব পেন্সন ভোগ করছেন, তার মধ্যে অন্ততঃ একটা পেলেও তা কত না আরামের হত, বল ত! কিন্তু তা আর হবার নয়, সে অসম্ভব; আমি বেনারস ছেড়ে যেতে পারি না। হায় রে, আমার তো আর দুটো শরীর এখনও হয় নি।”

---

* ২৭ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

আমার হিমালয় পলায়নে বাধা

"যাহোক একটা তুচ্ছ অছিলা করে ক্লাস থেকে সরে পড়বে, আর একটা ঠিকে গাড়ী ভাড়া করে এনে গলির মধ্যে এমন জায়গায় দাঁড়াবে যাতে আমাদের বাড়ীর কেউ তোমায় দেখতে না পায়, বুঝলে?"

এই বলে তো অমর মিত্রকে আমার গোপন মতলব জানিয়ে দিলাম। সে ছিল আমারই স্কুলের বন্ধু; সেও হিমালয়ে পলায়নের আমার সঙ্গী হবার মতলব এঁটেছিল। স্থির হয়েছিল, পরের দিন আমরা দু'জনে পলায়ন করব।

সাবধানতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কারণ অনন্তদার দৃষ্টি ছিল অত্যন্ত সতর্ক। পালাবার মতলব যে আমার মনে অত্যন্ত প্রবল, তা ঠিকই তিনি সন্দেহ করেছিলেন। তাই সেটাকে ফাঁসিয়ে দেবার জন্যে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। কবচটির প্রভাব, আধ্যাত্মিক বীজের মত নীরবে আমার মধ্যে কাজ করে চলেছিল। স্বপ্নে যাঁর মুখ প্রায়ই দেখতে পেতাম, সেই গুরুকে হিমালয়ের তুষারের মধ্যেই খুঁজে পাব বলে মনে আশা হয়েছিল।

পরিবারের সকলেই তখন কলকাতায় বাস করছেন, কারণ পিতা এখন পাকাপাকিভাবে এখানে বদলি হয়ে এসেছেন। স্থায়ীভাবে শ্বশুর-বাড়ীতে থাকবার জন্য অনন্তদা তাঁর নতুন বৌকে নিয়ে এলেন। সেখানে একটি চিলেকোঠায় আমি নিত্যনৈমিত্তিক ধ্যান আর ঈশ্বরলাভের সাধনায় মনকে নিয়োজিত করে রাখতাম।

অশুভ বৃষ্টিকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্মরণীয় প্রভাত এসে উপস্থিত হল। রাস্তায় অমরের গাড়ীর চাকার শব্দ শুনে আমি তাড়াতাড়ি একটা কম্বল, একজোড়া চটি, লাহিড়ী মহাশয়ের ছবি, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, একছড়া জপের মালা আর গোটাদুই কৌপীন একটা পুঁটলিতে বেঁধে নিলাম। পুঁটলিটা তিন

তলার জানালা গলিয়ে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। যাবার সময় খুড়োমহাশয়ের পাশ কাটিয়ে যেতে হল, দেখলাম তিনি সদরে মৎস্য ক্রয়ে ব্যস্ত।

"আরে এত তাড়া কিসের, এ্যাঁ?" বলতে বলতে তিনি তাঁর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আমার সর্বশরীরের উপর একবার বুলিয়ে নিলেন।

কিছু না বলে আমি নিতান্ত নিরীহভাবে হেসে গলির দিকে এগিয়ে গেলাম। পুঁটলিটি সংগ্রহ করে আমি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অমরের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তারপর গাড়ীতে করে ধর্মতলায় নানা পণ্য বিক্রির কেন্দ্র, চাঁদনী চকে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

মাসের পর মাস ধরে আমরা সাহেবী পোষাক কেনবার জন্য জল খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে আসছিলাম, কারণ আমার অত্যন্ত চালাক জ্যেষ্ঠভ্রাতাটি পাকা ডিটেকটিভের মত আমাদের ধরে ফেলবেন ভেবে মনে করেছিলাম যে, সাহেবী পোষাকেই তাঁকে ঠকানো যাবে।

স্টেশনে যাবার পথে আমার খুড়তুতো ভাই যতীন ঘোষের জন্য দাঁড়ালাম। তাঁকে যতীনদা বলে ডাকতাম। তিনিও এ পথে নতুন এসেছেন, হিমালয়ে গুরু খোঁজবার জন্য তাঁরও বাসনা। আমাদের সদ্যসংগৃহীত নতুন পোষাক একটি তিনিও পরিধান করলেন — মনে হল, ছদ্মবেশ খুব ভালই হয়েছে। একটা গভীর তৃপ্তি আর উল্লাসের মলয় বাতাস মনের মধ্যে বইতে লাগল।

"এখন চাই কেবল একজোড়া ক্যাম্বিসের জুতো", এই বলে তাদের একটা রবারের জুতোর দোকানে নিয়ে গেলাম। ওখানে রবার সোলের জুতো ছিল। "চামড়ার জিনিষ, যা সব কেবল জীবহত্যা করেই তৈরী করা হয়, সে সব এ পুণ্যযাত্রায় সঙ্গে থাকা উচিত নয়," বলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে গীতা হতে চামড়ার মলাট আর বিলেতে তৈরী সোলার টুপিগুলো হতে চামড়ার ফিতে সব খুলে রাস্তায় ফেলে দিলাম।

স্টেশনে গিয়ে বর্ধমানের টিকিট কেনা হল; সেখানে হিমালয়ের পাদদেশে হরিদ্বারে যাবার জন্যে গাড়ী বদল করবার মতলব করেছিলাম। ট্রেন যখন আমাদের মনের গতির মতই দৌড়তে আরম্ভ করল, সুযোগ

বুঝে তখন আমি সঙ্গীদের কাছে আমার মনের ভিতরকার গুটিকতক উজ্জ্বল আশা ব্যক্ত করতে শুরু করলাম।

বললাম, — "ভাবো দেখি, গুরুর কাছে দীক্ষা নেবার পর আমরা কেমন ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করব! আর আমাদের দেহের মধ্যে এমন একটা চৌম্বকশক্তি জন্মাবে, যাতে করে হিমালয়ের জঙ্গলের হিংস্র পশুগুলো পর্যন্ত নিতান্ত পোষমানা জন্তুদেরই মত আমাদের কাছে এসে হাজির হবে। বাঘগুলো পর্যন্ত বাড়ীর নিরীহ বিড়ালদের মত আদরের লোভে আমাদের কাছে এসে বসবে।"

এইরকম মন্তব্যে, বাস্তব ও রূপকের একটি লোভনীয় আশার মনোরম চিত্র অঙ্কনে, অমরের মুখে একটা উৎসাহব্যঞ্জক হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু যতীনদা তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে দ্রুত অপস্রিয়মাণ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চুপচাপ বসে রইলেন।

দীর্ঘ নীরবতা ভঙ্গ করে যতীনদা কিছুক্ষণ বাদে এই প্রস্তাবটি করে বসলেন, — "এস, এখন টাকাটা তিনভাগে ভাগ করে ফেলা যাক্। বর্ধমানে প্রত্যেকেই নিজের নিজের টিকিট কিনব; তাহলে স্টেশনে কেউ আর সন্দেহ করতে পারবে না যে, আমরা একসঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছি।"

বিন্দুমাত্র সন্দেহ না করে আমি তখনই রাজী হয়ে গেলাম। সন্ধ্যার সময় আমাদের ট্রেন বর্ধমানে এসে থামল। যতীনদা টিকিট ঘরে ঢুকলেন; অমর আর আমি প্ল্যাটফর্মেই বসে রইলাম। মিনিট পনের অপেক্ষা করবার পর যতীনদাকে আর ফিরতে না দেখে তাঁর বিস্তর খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হল। চারদিকে খোঁজবার পর নিষ্ফল হয়ে আমরা ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে যতীনদার নাম ধরে বার বার চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম। আর যতীনদা! তিনি ততক্ষণে সেই স্টেশনের অন্ধকার অজানার মধ্যে একেবারে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

ব্যাপার দেখে তো আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে একেবারে অবশ হয়ে এল। হায়রে, ভগবান পর্যন্ত এরকম চালাকির ব্যাপারে প্রশ্রয় দেবেন, তা কি আর জানি? তাঁর জন্যই তো আমার এই প্রথম বিচিত্র পলায়ন, আর

সেই উদ্দেশ্যে আমার সযত্নরচিত এই প্রথম পলায়নের রোমাঞ্চকর উপলক্ষ্য এইরকম নিষ্ঠুরভাবেই মাঠে মারা গেল।

ছোট ছেলের মতো তখন কান্না জুড়ে দিয়েছি, বললাম, — "অমর চল, আর কি হবে, বাড়ী ফেরা যাক্! যতীনদার এরকম নিষ্ঠুরভাবে সরে পড়াটা একটা অত্যন্ত অশুভ লক্ষণ। এবারকার যাত্রা নিষ্ফল হতে বাধ্য।"

"এই বুঝি তোমার ভগবানের উপর টান? একটা বিশ্বাসঘাতক সঙ্গীর এই ছোট্ট পরীক্ষাটুকু পর্যন্ত বরদাস্ত করতে পার না?"

অমর এই ব্যাপারটাকে ভগবানের একটা পরীক্ষা বলে উল্লেখ করাতে আমার মন অনেকটা শান্ত আর স্থির হল। বর্ধমানের প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন সীতাভোগ আর মিহিদানা সংযোগে ত জলযোগটা তখন সেরে নেওয়া গেল। ঘণ্টা কতকের ভিতরেই আমরা বেরিলী হয়ে হরিদ্বারে যাবার গাড়ীতে চড়ে বসলাম। তার পরদিন মোগলসরাইয়ে গাড়ী বদলি করতে হবে। স্টেশনে নেমে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করবার সময় একটি গুরুতর বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম।

বললাম, "অমর, শীগগিরই হয়ত রেলের লোকেরা আমাদের ধরে দারুণ জেরা শুরু করে দিতে পারে। দাদার বুদ্ধির দৌড় যে খুব খাটো, তা আমি আদৌ মনে করি না। তা যা হয় হোক্, মিথ্যে আমি কিছুতেই বলছিনা।"

"মুকুন্দ, যা বলি তা শোনো; তুমি চুপ করে থেকো। আমি যখন কথাবার্তা বলবো, খবরদার তুমি যেন তখন হেসে ফেল না, বা দাঁত বের কোরো না, বুঝলে?"

সঙ্গে সঙ্গেই এক ইউরোপীয় রেল কর্মচারীর সেখানে আবির্ভাব হ'ল। হাত নেড়ে একটা টেলিগ্রাম দেখাতে তার মানে বুঝতে আর বাকী রইল না।

প্রশ্ন এল, "তোমরা কি রাগ করে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাচ্ছ?" তার ঠিক ঐ কথাগুলোর উত্তরে সজোরে "না" বলতে পেরে অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করলাম। কারণ আমি তো জানি যে, "রাগ" নয়, "সংসার বিরাগ"ই আমার এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণ!

কর্মচারীটি অমরের দিকে তাকাল। তাদের বুদ্ধির যুদ্ধ এখন যা শুরু হল, তাতে করে আমার বহু-উপদিষ্ট উদাসীন গাম্ভীর্য বজায় রাখা নিতান্তই কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

লোকটি বেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে বললে, "দেখ, যা জিজ্ঞাসা করি সত্যি করে সব বলবে, বুঝলে? আচ্ছা, তৃতীয় ছেলেটি কোথায় এখন বল দেখি?"

"মশাই, আপনি তো দেখছি চশমা পরে রয়েছেন। দেখতে পাচ্ছেন না, আমরা কেবল মাত্র দু'জন?" অমর একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললো, "আমি তো আর যাদুকর নই যে, ভেল্কির জোরে তৃতীয় জনটিকে এনে হাজির করে দেবো?"

এই ঔদ্ধত্যপ্রকাশের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে কর্মচারীটি আক্রমণের আর একটি নতুন পন্থা আবিষ্কার করে বললে, —

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম টমাস; মা ইংরেজ, বাপ দীক্ষিত ভারতীয় খ্রিস্টান।"

"তোমার বন্ধুটির নাম কি?"

"ওকে টমসন বলে ডাকি!"

এই সময় মনের মধ্যে আমার হাসি চেপে রাখা দায় হয়ে উঠল। সৌভাগ্যক্রমে ট্রেন তখন ছাড়বার জন্য বাঁশী দিচ্ছে দেখে বিনা-বাক্যব্যয়ে ট্রেনের দিকে সোজা এগিয়ে গেলাম। অমর কর্মচারীটির পিছু পিছু চলল। লোকটা কিন্তু সবকিছু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে ভদ্রতাসহকারে আমাদের একটা ইউরোপীয় কামরায় বসিয়ে দিয়ে গেল। দু'জন ফিরিঙ্গী ছেলে নেটিভদের কামরায় যাচ্ছে দেখে, তার মনে হয়তো ক্ষোভেরই সঞ্চার হয়ে থাকবে। তার সবিনয় বিদায়-গ্রহণের পর আমি তো বেঞ্চিতে ঠেস দিয়ে বসে এক চোট প্রাণভরে খুব হেসে নিলাম। অমরও একজন পাকা ইউরোপীয় কর্মচারীকে বুদ্ধির জোরে হারিয়ে দিয়েছে ভেবে বেশ একটা সানন্দ পরিতৃপ্তির ভাব প্রকাশ করল।

প্ল্যাটফর্মের উপর আমি টেলিগ্রামটি লুকিয়ে পড়ে নেবার চেষ্টা করেছিলাম। দাদার কাছ থেকে এসেছে — তাতে লেখা ছিল, "মোগলসরাই হয়ে হরিদ্বারের দিকে সাহেবী পোষাকপরা তিনটি বাঙ্গালী ছেলে বাড়ী থেকে পালাচ্ছে। অনুগ্রহ করে আমার না পৌঁছন পর্যন্ত তাদের আটকে রাখুন। আপনার কাজের জন্যে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে।"

রাগতচোখে আমি বললাম, "অমর, তোমায় না আমি বাড়ীতে দাগদেওয়া টাইম টেবলগুলো ফেলে রেখে আসতে বারণ করেছিলাম? দাদা নিশ্চয়ই সেখানে একটা পেয়ে থাকবেন।"

বন্ধুবর নিতান্ত নিরীহভাবে আঘাতটি পরিপাক করলো। বেরিলীতে অল্প কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো; কিন্তু সেখানেও দাদার টেলিগ্রাম নিয়ে দ্বারকাপ্রসাদ* আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। দ্বারকা আমাদের আটকে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করলো। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে ছেলেমানুষি করবার জন্য নয়। তাকে সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধও করলাম। কিন্তু আগের মতো এবারও দ্বারকা হিমালয় পলায়নে আমাদের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করল।

সেই রাত্রে একটা স্টেশনে গাড়ী তখন দাঁড়িয়ে, আর আমিও আধঘুমে। একজন রেল কর্মচারী অমরকে জাগিয়ে তুলে নানা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলো। সেও 'টমাস' 'টমসনের' বর্ণসঙ্করের ভাঁওতায় পড়ে ঠকে গেল। ট্রেনটি বিজয়গর্বে আমাদের বহন করে হরিদ্বারে গিয়ে পৌঁছল ভোরবেলায়। আমাদের সাদর আহ্বান জানাবার জন্যেই যেন দূরে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা আত্মপ্রকাশ করল। স্টেশন হতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েই আমরা শহরের স্বচ্ছন্দবিহারী জনতার মধ্যে মিশে গেলাম। তারপর আমাদের প্রথম কাজ হল, দেশী পোষাক পরে ফেলা, কেননা অনন্তদা কোনও রকমে আমাদের সাহেবী পোষাকে ছদ্মবেশের ব্যাপারটা ধরে ফেলেছিলেন। ধরা পড়বার একটা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় মনটা কিন্তু বরাবর ভারী হয়েই রইল।

---

* ২১শ পৃষ্ঠায় দেখুন।

অবিলম্বে হরিদ্বার পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত হবে ভেবে, আমরা আরও উত্তরে যোগিঋষিপদরজঃপুত হৃষীকেশ যাবার জন্য টিকিট কিনে ফেললাম। আমি ইতিমধ্যে ট্রেনে চড়ে বসেছি, আর অমর প্ল্যাটফর্মের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা পুলিশের চিৎকারে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাঞ্ছিত আইনরক্ষক সেই পুলিশ কর্মচারীটি আমাদের সটান থানাতে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে টাকাকড়ি আর সঙ্গের সবকিছু কেড়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখলেন। অত্যন্ত বিনয়সহকারে তিনি জানালেন যে, তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে আমার বড়দাদা সেখানে না পৌঁছন পর্যন্ত আমাদের আটকে রাখা।

এই পলাতক দু'টি কিশোরের গম্যস্থল হিমালয় শুনে তিনি তখন এক অদ্ভুত কাহিনী শোনাতে বসলেন —

"তোমরা দেখছি যে সাধু-সন্ন্যাসীদের জন্য একেবারে পাগল হয়ে উঠেছ। তবে একটা ব্যাপার বলি শোন। এই সবেমাত্র কালকে আমি যাকে দেখেছি তার চেয়ে বড় সাধু আর তোমরা কোথাও দেখতে পাবে না, বুঝলে ? আমার এক সহকর্মী আর আমি মাত্র দিন পাঁচেক আগে তাঁর দর্শন পাই। এক খুনী আসামীকে পাকড়াবার জন্যে গঙ্গার ধারে খুব কড়া নজর রেখে আমরা পাহারা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমাদের উপর হুকুম ছিল, জ্যান্ত কি মরা যেমনই হোক, তাকে ধরবার জন্য। লোকটা তীর্থযাত্রীদের মধ্যে চুরি করবার উদ্দেশ্যে সাধুর ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে — কেবল এইটুকুমাত্র জানা ছিল। আমাদের ঠিক সামনেই অল্পদূরে একজনকে দেখা গেল, সেই আসামীর বর্ণনার সঙ্গে যার মেলে। চিৎকার করে তাকে দাঁড়াতে বললাম। লোকটা কিন্তু আমাদের থামবার হুকুম না মেনেই হন্ হন্ করে চলতে লাগল। আমরা তাকে পাকড়াবার জন্যে দৌড়তে শুরু করলাম। ধরতে না পেরে তার পিছন দিক থেকে প্রচণ্ড জোরে তার উপর কুড়ুলের এক কোপ বসিয়ে দিলাম। ব্যাস্! লোকটার ডান হাতটি তার ধড় হতে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

"কিছুমাত্র চিৎকার বা সেই ভীষণভাবে কাটা হাতের উপর দৃক্‌পাত না করেই ঐ অজানা লোকটি আশ্চর্যভাবে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল।

আসামী ভেগে যায় দেখে লাফিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াতেই অত্যন্ত নিরীহ আর শান্তভাবে সে বললে, 'তোমরা যে খুনীকে খুঁজছ আমি সে লোক নই।'

"আমি এক দেবপ্রতিম সাধুর অঙ্গচ্ছেদ করে ফেলেছি দেখে অন্তরে গভীর মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরণতলে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে তাঁর কাছে কাতরস্বরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগলাম, আর তাঁর ফিন্‌কি দিয়ে পড়া রক্ত বন্ধ করবার জন্যে পাগড়ীর কাপড় খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে ক্ষতস্থানটি বাঁধতে গেলাম।

"সাধুটি তখন অত্যন্ত স্নেহকোমল স্বরে বললেন, 'বেটা, দেখছি যে তোমার একটা সত্যি সত্যি ভুল হয়ে গেছে। তা যাক, তুমি যাও, মনে কিছু ক্ষোভ কোরো না। মা জগদম্বাই আমায় দেখছেন।' তারপর তিনি ঝুলে পড়া সেই হাতটি কাটা জায়গার উপর বসিয়ে দিতেই — আশ্চর্য! সেটা একেবারে বেমালুম জুড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে রক্তপড়াও বন্ধ হয়ে গেল।

"সাধুটি বললেন, 'তিন দিন বাদে ঐ গাছতলায় আমার কাছে এসো, দেখবে আমি একদম সেরে গেছি। তাহলে তোমায় আর কোনরকম অনুশোচনা করতে হবে না।'

"গতকাল আমি আর আমার সেই সহকর্মীটি অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে ঐ নির্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সাধুটি সেখানে বসেছিলেন; হাতটি বাড়িয়ে আমাদের দেখতে দিলেন — তাতে কোন রকম কাটা বা আঘাতের চিহ্ন পর্যন্তও নেই। তারপর তিনি আমাদের আশীর্বাদ করে বললেন, 'এবার আমি হৃষীকেশ হয়ে হিমালয়ের কোন নির্জন স্থানে চলে যাব'; বলেই তাড়াতাড়ি তিনি প্রস্থান করলেন। আমি নিশ্চয়ই করে জেনেছি যে, তাঁরই পুণ্যপ্রভাবে আমার জীবন উন্নত হয়ে গেছে।" আন্তরিক ভক্তিভরে এই কথাগুলি বলে তিনি তাঁর কাহিনী শেষ করলেন।

এটা ঠিকই যে, এই অভিজ্ঞতা প্রকৃতই তাঁর মনের গভীরতর স্তর আলোড়িত করে তুলেছিল। চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে তিনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত সেই অলৌকিক ব্যাপারের একটা "কাটিং" আমার হাতে

দিলেন। সংবাদপত্রে লোমহর্ষক ব্যাপারের বর্ণনা সাধারণতঃ যেমন বিকৃতরূপে প্রকাশিত হয়, (হায় রে! ভারতবর্ষেও এর অভাব নেই!), সংবাদদাতার এ বিবরণটিও সেইরকম কিঞ্চিৎ অতিরঞ্জিত হয়েই প্রকাশিত হয়েছিল। বিবরণে ছিল — সাধুটির মস্তক ধড় হতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

অমর আর আমি সেই পরম যোগীর — যিনি তাঁর উৎপীড়ককেও মহাপুরুষ যীশুখ্রীস্টেরই মত ক্ষমা করতে পারেন — দর্শনলাভে বঞ্চিত হয়ে অত্যন্ত দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলাম। গত দুইশত বৎসরধরে ঐহিক বিষয়ে দরিদ্র হয়ে পড়লেও, ভারতবর্ষে এখনও পারত্রিক সম্পদের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে। সংসারের এইসব পুলিশ কর্মচারীর মত বিষয়মুখী লোকেরা পর্যন্ত এখনও মাঝে মাঝে পথের ধারে আধ্যাত্মিক জগতের গগনচুম্বী বিরাট ব্যক্তিত্বের দর্শন পেয়ে থাকেন।

এই অপূর্ব কাহিনীটি শুনিয়ে আমাদের সময় কাটানোর একঘেয়েমি দূর করবার জন্য আমরা পুলিশ কর্মচারীটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। খুব সম্ভবতঃ তিনি বোঝাতে চাইছিলেন যে, তিনি আমাদের চেয়ে বেশি ভাগ্যবান। বিনা আয়াসে তিনি এক পরমজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ সাধুর দর্শনলাভ করতে পেরেছেন; আর অন্যদিকে আজ আমাদের ব্যাকুল অনুসন্ধান শেষ হয়েছে কোনো সদ্‌গুরুপদাশ্রয়ে নয়; নিতান্তই স্থূল এক পুলিশ চৌকিতে!

হিমালয় এত কাছে অথচ আটক থাকায় আজ তা থেকে আমরা কত দূরে! অমরকে জানালাম, মুক্তিলাভের জন্য মনে এখন দ্বিগুণ জোর এসে গিয়েছে।

উৎসাহসূচক হাসির সঙ্গে বললাম, "দেখ, সুযোগ পেলেই এবার সরে পড়বো, কি বল? আর পুণ্যতীর্থ হৃষীকেশে আমরা পায়ে হেঁটেই যেতে পারব।"

আমার সঙ্গীটি কিন্তু আমাদের কাছ হতে অর্থবল অপসারিত হতে দেখে নিতান্ত নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিল, বলল, "যদি আজ আমরা এই বিপজ্জনক জঙ্গলের দেশে যাত্রা শুরু করি, তা হলে আমরা সাধু-

সন্ন্যাসীদের আস্তানায় না পৌঁছে, পৌঁছব একেবারে সটান বাঘের পেটের মধ্যে।"

অনন্তদা আর অমরের দাদা তিনদিন বাদে এসে পৌঁছলেন। অমর তো মুক্তির আনন্দে কলকণ্ঠে তার দাদাকে অভ্যর্থনা করলো। আমার কিন্তু মতলব টলল না। আমার কাছ থেকে দারুণ ভর্ৎসনা ছাড়া অনন্তদার আর কিছুই লাভ হল না।

"তোমার মনে যে কি হচ্ছে তা আমি বুঝতে পাচ্ছি।" দাদা সান্ত্বনাকোমল স্বরে বলতে লাগলেন, "তুমি একটিবার শুধু কাশীতে চল। সেখানে আমার সঙ্গে গেলে তোমার একটি সত্যিকারের সাধুর দর্শনলাভ হবে। তারপর কলকাতায় গিয়ে দিনকতকের জন্য বাবাকে দেখে আসবে। মনে মনে তিনি বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন। তারপর না হয়, আবার এখানে এসে গুরু অন্বেষণ শুরু করে দিও।"

আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে অমর এই সময়ে প্রবেশ করে বলল যে, আমার সঙ্গে হরিদ্বারে ফিরবার তার আর কোনই ইচ্ছা নাই। পারিবারিক স্নেহরসের মধুর উষ্ণতা সে তখন অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করছিল। আমি কিন্তু বরাবরই নিশ্চিত ছিলাম যে, গুরু অন্বেষণ আমি কখনই পরিত্যাগ করব না।

যাইহোক, আমাদের দলটি অবশেষে কাশীর গাড়ীতে চড়ে বসল। কাশীতে পৌঁছে, আমি আমার প্রার্থনার একটি অদ্ভুত আর প্রত্যক্ষ ফল সদ্যসদ্যই পেয়ে গেলাম।

অনন্তদার একটি অতি সুচতুর ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। হরিদ্বারে এসে আমাকে পাকড়াবার আগেই তিনি কাশীতে নেমে জনৈক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে আমার দেখা করবার ব্যবস্থা করে এসেছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর এবং তস্যপুত্র আমাকে সন্ন্যাসের* পথ হতে নিবৃত্ত করবার জন্য চেষ্টার নাকি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

যাক্, অনন্তদা তো আমাকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। পুত্রটি অল্পবয়সী আর কিঞ্চিৎ উচ্ছ্বাসপ্রবণ। উঠানে দাঁড়িয়েই

---

* সন্ন্যাস — আক্ষরিক অর্থে ত্যাগী; সংস্কৃত ক্রিয়াপদ, 'ক্ষেপন করা।'

আমাদের অভ্যর্থনা করল। তারপরে আমার সঙ্গে এক লম্বা দার্শনিক তর্ক জুড়ে দিল। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের ব্যাপারে তাঁর অলোকজ্ঞান আছে এই ভাণ করে সে আমার সন্ন্যাসী হওয়ার মতলব দমিয়ে দেবার কাজ শুরু করল।

"দেখ, সংসারের সব কর্তব্য ছেড়েছুড়ে দেবার জন্যে যদি জিদ কর, তা হলে তোমায় অনবরত দুঃখই পেতে হবে, আর তা ছাড়া ভগবানকেও পাবে না। সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদন না করলে কখনও তোমার প্রাক্তন কর্মক্ষয়* হবে না, তা জেনে রেখো।"

প্রত্যুত্তরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত শ্রীকৃষ্ণের অমরবাণী আমার মুখে এসে পড়ল —

"যদি কোন ব্যক্তি নিতান্ত দুরাচার হইয়াও অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে, তাহা হইলে সে সত্বর পূর্বজন্মের অশুভ কর্মফল থেকে মুক্তি পায়; সে ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্মাত্মা হইয়া নিত্যশান্তি লাভ করে। তুমি ইহা নিশ্চয়ই জানিও যে, আমার ভক্ত কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।"†

তবে সেই যুবকটির দৃঢ় ভবিষ্যদ্বাণী আমার বিশ্বাসের মূল কিঞ্চিৎ শিথিল করে দিয়েছিল। অন্তরে অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে আমি নীরবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলাম, "দয়াময়, আমার মনের সকল সংশয় ছিন্ন করে, সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে, এখানে এখনই উত্তর দাও যে, তোমার ইচ্ছা কি, --- সন্ন্যাসজীবন যাপন করব, না সংসারে প্রবেশ করব?"

দেখলাম, এক সৌম্যমূর্তি সাধু পণ্ডিতজীর বাড়ীর প্রাঙ্গনের ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি সেই স্বয়ংসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বক্তা আর আমার মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে যে সব কথাবার্তা চলছিল, তা বোধহয় শুনতে পেয়েছিলেন; কারণ অপরিচিত হলেও তিনি আমাকে তাঁর কাছে ডাকলেন। দেখলাম, তাঁর প্রশান্ত নয়নদ্বয় হতে এক প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হচ্ছে।

বললেন, "বৎস, এই পণ্ডিতমূর্খের কথা কখনো শুনো না। তোমার প্রার্থনার উত্তরে ঠাকুর তোমায় এই বলে আমায় আশ্বাস দিতে বললেন

---

* কর্ম — ইহজন্ম বা পূর্বজন্মের কর্মফল। সংস্কৃত কৃ ধাতু হতে নিষ্পন্ন।

† ভগবদ্গীতা ঃ নবম অধ্যায়, শ্লোক ৩০-৩১।

যে, সন্ন্যাসই তোমার ইহজীবনে একমাত্র পথ।" বিস্ময় ও কৃতজ্ঞতায় এই পরম আশ্বাসবাণীতে আমি স্বস্তির আনন্দে হাসলাম।

উঠান হতে পণ্ডিতমূর্খটি তখন আমায় ডাকছিলেন, "চলে এসো, চলে এসো, ও লোকটার কাছ থেকে সরে এসো।" আমার পথনির্দ্দেশক সেই সাধুব্যক্তিটি হাত তুলে আমায় আশীর্বাদ করে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন।

পক্ককেশ পণ্ডিতপ্রবর তখন এই চমৎকার মন্তব্যটি করলেন যে, "ঐ সাধুটি তোমারই মত মাথাপাগলা।" তিনি ও তাঁর পুত্ররত্নটি তখন আমার দিকে সখেদে তাকাচ্ছিলেন, বললেন, "শুনেছি, ঐ সাধুটিও বৃথাই ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে ঈশ্বরলাভের জন্যে।"

আমি ফিরে চললাম। অনন্তদাকে বললাম — আমি আর এদের সঙ্গে কোন বৃথা তর্কই করতে চাইনা। এবার চলুন বাড়ী যাওয়া যাক্। নিরুৎসাহ দাদাও তৎক্ষণাৎ ফিরতে রাজী হয়ে গেলেন, এবং আমরাও শীঘ্রই কোলকাতার ট্রেনে চড়ে বসলাম।

বাড়ী ফিরবার সময় কিন্তু আমার অদম্য কৌতূহল আর চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে বসলাম — 'ডিটেকটিভ মহাশয়, কি করে জানলেন যে, আমি দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে পালিয়েছি?"

দুষ্টু হাসি হেসে দাদা বললেন, "তোমাদের ইস্কুলে গিয়ে দেখলাম অমর ক্লাস থেকে বেরিয়ে আর বাড়ী ফেরেনি। তার পরদিন সকালে তাদের বাড়ীতে গিয়ে একটা দাগ দেওয়া টাইম টেবল আবিষ্কার করলাম। অমরের বাবা সেইসময় গাড়ী করে বেরোচ্ছিলেন, আর সখেদে কোচম্যানকে বলছিলেন, 'ছেলেটা আজ আর আমার সঙ্গে গাড়ী করে ইস্কুলে যাবে না। সে বাড়ী থেকে পালিয়েছে।'

"কোচম্যানটা তখন বললে, 'শুনুন বাবু, আমাদের দলের একটা গাড়োয়ানের কাছ থেকে শুনলাম যে, সাহেবী পোষাকপরা আপনার ছেলে এবং আর তার দু'টি বন্ধুতে মিলে হাওড়া ইস্টিশানে গিয়ে গাড়ীতে চড়েছে। যাবার সময় তাদের চামড়ার জুতোগুলো কিন্তু তারা গাড়োয়ানটাকে বক্‌শিশ দিয়ে গেছে!"

"এতে করে আমি তিনটি সূত্র পেলাম — টাইম টেবল, তোমাদের তিনমূর্তি, আর সাহেবী পোষাক।"

অনন্তদার রহস্যোদঘাটন আমি মিশ্রিত আমোদ আর বিরক্তির সঙ্গে শুনছিলাম। বুঝলাম, গাড়োয়ানের প্রতি আমাদের বদান্যতা কিঞ্চিৎ অপাত্রে ন্যস্ত হয়েছে।

"অবিশ্যি অমর টাইম টেবলে যে সব শহরের নামের তলায় দাগ দিয়েছিল সেই সব জায়গায় স্টেশন মাস্টারদের কাছে তখনই টেলিগ্রাম করতে ছুটলাম। বেরিলীর গায়েও দাগ দেওয়া ছিল, কাজেই সেখানে তোমার বন্ধু দ্বারকাকে তার করলাম। কলকাতায় আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম যে খুড়তুতো ভাই যতীনদা একরাত্রি অনুপস্থিত; কিন্তু তার পরদিন সকালবেলায় সাহেবী পোষাকে বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছে। তাকে খুঁজে বার করে আমি তাকে বাড়ীতে খাবার নেমন্তন্ন করলাম। আমার বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্কচিত্তে সে নেমন্তন্নে এল। রাস্তায় কোন রকম সন্দেহ না জাগিয়ে আমি তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে তুললাম। গোড়া থেকেই জনকতক ভয়ঙ্কর গোছের চেহারার পুলিশের লোক আমি বেছে রেখে এসেছিলাম। তারা তাকে নিয়ে ঘিরে বসল। তাদের ভীষণ চাউনি দেখে যতীনদা ভড়কে গিয়ে তার রহস্যজনক আচরণের কৈফিয়ৎ দিতে রাজী হল।

"যতীনদা বলল, 'একটা হাল্কা আধ্যাত্মিক ভাব নিয়ে হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম। গুরুলাভের আশায় মন উৎসাহে নেচে উঠেছিল। কিন্তু মুকুন্দ যেই বলল, 'হিমালয়ের গুহার মধ্যে যখন ধ্যানে বসে থাকব, সেখানকার বাঘগুলো তখন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পোষা বেড়ালের মত এসে আমাদের চারধারে বসবে, তখনই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম হল; কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম দেখা দিল। ভাবলাম, 'আমাদের যোগবলে যদি বাঘগুলোর হিংস্রপ্রকৃতি সব না বদলায় তা হলে কি হবে, এ্যাঁ? তারা কি তবুও আমাদের কাছে বাড়ীর পোষা মেনীবিড়ালটির মতই শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকবে? মনঃশ্চক্ষে দেখতে পেলাম, একেবারে পুরো ধড়টা না

হলেও, — হাত-পাগুলোর এক একটা কিস্তি পাঠিয়ে ইতিমধ্যেই আমি একটি বাঘের পেটের ভিতর ঢুকে গেছি!"

যতীনদার অদৃশ্য হওয়াতে যে রাগ হয়েছিল, তা চলে গিয়ে এখন আমার খুব হাসি পেল। ট্রেন হতে সরে পড়ার এই হাস্যোদ্দীপক কৈফিয়তে তিনি আমায় যে মনঃকষ্ট দিয়েছিলেন, তা সব দূর হল। যতীনদাও পুলিশের হাত এড়াতে পারেননি বলে মনে যে কিঞ্চিৎ তৃপ্তিরভাব এসেছিল, তা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে।

হাসি পাচ্ছিল আবার ভয়ানক রাগও হচ্ছিল, বললাম, "অনন্তদা,* আপনি দেখছি জাত গোয়েন্দা। যাইহোক, যতীনদাকে আমি বলব যে, বিশ্বাসঘাতকতা করবার মতলবে নয়, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদেই যে তিনি এ কাজ করে ফেলেছেন, এতে আমার মনে একটুও দুঃখ নেই।"

কলকাতার বাড়ীতে পৌঁছলে অন্ততঃ স্কুলের লেখাপড়া সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও পা না বাড়াতে পিতা কাতর অনুরোধ করলেন। ইতিমধ্যে আমার অনুপস্থিতিতে পিতা শাস্ত্রজ্ঞ সাধুপণ্ডিত স্বামী কেবলানন্দজীকে† আমাদের বাড়ীতে নিয়মিত আসার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। তাই তিনি এবার পরম নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, "এই সাধু পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে এখন থেকে তুমি সংস্কৃত পড়বে।"

পিতা আশা করেছিলেন যে, আমার ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা একজন পণ্ডিতের শাস্ত্রোপদেশেই পরিতৃপ্ত হবে। কিন্তু তার বিপরীত ফল ফললো অতি সূক্ষ্মভাবে। আমার নব নিযুক্ত শিক্ষকটি, বৌদ্ধিক শুষ্কতার পরিবর্তে

---

* আমি সবসময়েই তাকে অনন্তদা বলেই ডাকতাম। 'দা' একটি সম্মানসূচক শব্দ।

† আমাদের সাক্ষাতের সময় কেবলানন্দজী তখনও সন্ন্যাস নিয়ে "স্বামী" উপাধি ধারণ করেননি; তিনি সাধারণতঃ "শাস্ত্রী মহাশয়" নামেই অভিহিত হতেন। "লাহিড়ী মহাশয়" আর "মাস্টার মহাশয়" (নবম অধ্যায়) এই দুই নামের সঙ্গে গোলমাল এড়াবার জন্যই আমি আমার সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়কে তাঁর পরবর্তী সন্ন্যাস জীবনের নামে স্বামী কেবলানন্দজী বলেই উল্লেখ করেছি। সম্প্রতি এঁর জীবনী বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৬৩ সালে বাংলাদেশের খুলনা জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও ৬৮ বছর বয়সে বেনারসে দেহরক্ষা করেন। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

আমার অন্তরের ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষার অগ্নিতে বায়ু সঞ্চার করলেন। পিতা জানতেন না যে, স্বামী কেবলানন্দজী লাহিড়ী মহাশয়ের একজন উন্নত শিষ্য। সেই অদ্বিতীয় গুরুর অমোঘ দৈবশক্তির চৌম্বকপ্রভাবে সহস্র সহস্র শিষ্য তাঁর দিকে নীরবে আকৃষ্ট হয়েছিল। পরে আমি শুনেছিলাম — লাহিড়ী মহাশয় কেবলানন্দজীকে প্রায়ই ঋষি আখ্যায় অভিহিত করতেন।

কেবলানন্দজীর সুন্দর মুখখানি কোঁকড়ানো চুলে ঘেরা। তাঁর কালো চোখ দু'টি শিশুর ন্যায় স্বচ্ছ ও সরল। তাঁর সুকুমার দেহের গতি একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্যের দ্বারা সংহত। চিরশান্ত ও স্নেহময় তিনি — আত্মজ্ঞানে সুসমাহিত। গভীর ক্রিয়াযোগ অভ্যাসে তাঁর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরমানন্দে কাটত।

সনাতন ধর্মশাস্ত্রে কেবলানন্দজী সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের দরুণ তিনি "শাস্ত্রী মহাশয়" এই উপাধি লাভ করেছিলেন এবং সচরাচর এই নামেই অভিহিত হতেন। কিন্তু সংস্কৃতে আমার উন্নতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয় নি। আমি সর্বদাই সুযোগ খুঁজতাম কি করে নীরস ব্যাকরণের হাত এড়িয়ে, যোগ আর লাহিড়ী মহাশয়ের আলোচনা শুরু করা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় একদিন তাঁর গুরুর সঙ্গে তাঁর জীবনের কিছু অংশ বিবৃত করে আমাকে কৃতার্থ করেন।

শাস্ত্রী মহাশয় বললেন ঃ "বহু পুণ্যের ফলে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে আমার বছর দশেক থাকবার অসীম সৌভাগ্যলাভ ঘটেছিল। তাঁর কাশীর বাড়ীতে প্রায় রোজই রাত্রে যেতাম। দোতলার উপর সামনের বৈঠকখানায় তিনি সর্বদাই থাকতেন। একটা কাঠের চৌকির ওপর পদ্মাসনে বসে থাকতেন, আর শিষ্যবর্গ মালার মত অর্ধবৃত্তাকারে চারধারে বসতো। তাঁর উজ্জ্বল চোখ দু'টি স্বর্গীয় আনন্দে উদ্ভাসিত; অর্ধনিমীলিত সেই দু'টি চোখ অন্তরের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিমণ্ডলের ভিতর দিয়ে শাশ্বত আনন্দময় রাজ্যে গিয়ে নিবদ্ধ হয়ে থাকত। কদাচিৎ তিনি বেশি কথা বলতেন। তাঁর মধুমাখা প্রাণারাম কথাগুলি বলার সময় জ্যোতিঃপ্রপাতের মত ঝরতে শুরু হত।

"গুরুদেবের দৃষ্টিপাতে মনের মধ্যে এক অপূর্ব শান্তি ফুটে উঠল। যেন একটি অনন্ত পদ্মের ভিতর থেকে তার অবর্ণনীয় অমৃতনিঃষ্যন্দী আনন্দসৌরভ আমার সকল সত্তার উপর পরিপূর্ণভাবে ব্যাপ্ত হলো। তাঁর সংসর্গ, এমন কি দিনের পর দিন কোনরূপ আলাপ আলোচনা ছাড়াই, আমার সম্পূর্ণ সত্তার মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। যদি কোন অদৃষ্টপূর্ব বাধা আমার মনঃসংযমের পথে এসে দাঁড়াত, তাহলে আমি গুরুপদতলে বসে ধ্যান শুরু করতাম। তখন নিতান্ত জটিল আর কঠিন অবস্থাও আমার কাছে অত্যন্ত সরল আর সহজ হয়ে আসত। স্বল্পোন্নত গুরুদের কাছে এইসব অনুভূতিগুলো বোঝা দুরূহ ছিল। গুরু ছিলেন ভগবানের সাক্ষাৎ জীবন্ত মন্দির — যাঁর গোপন দ্বারসকল শিষ্যদের কাছে ভক্তির জোরেই উন্মুক্ত হত।

"লাহিড়ী মহাশয় পুঁথিগত বিদ্যার জোরে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতেন না। বিনা আয়াসে তিনি 'ঐশ্বরিক জ্ঞানভাণ্ডারে' প্রবেশলাভ করতেন। তাঁর সর্বজ্ঞতার উৎস থেকে বাণীর ফেনোর্মি আর চিন্তার ধারা সহস্রমুখে উৎসরিত হয়ে উঠত। যুগযুগান্ত পূর্বে বেদের* মধ্যে নিহিত গভীর দার্শনিক তত্ত্বসকল নিরূপণ করবার অদ্ভুত কৌশল তাঁর চমৎকারভাবে জানা ছিল। প্রাচীন শাস্ত্রে লিখিত আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন স্তরের বিষয় বর্ণনা করতে অনুরোধ করলে, তিনি একটু হেসে বলতেন, "দাঁড়াও, আমি ঐ সব অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে এখুনিই আমার অনুভূতিগুলো তোমাদের সব বলে দিচ্ছি।" তিনি ছিলেন সেই সব গুরুদের সম্পূর্ণ বিপরীত, যাঁরা কেবলমাত্র শাস্ত্র মুখস্থ করে অনুপলব্ধ বিষয়গুলোর অজীর্ণোদ্গারই করতে পারতেন — তার বেশি কিছু নয়।

---

* সনাতন চতুর্বেদের একশতেরও উপর প্রস্থান গ্রন্থ এখনও বর্তমান। ইমার্সন তাঁর "জর্ণালে" নিম্নলিখিতভাবে বৈদিক চিন্তাধারার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ঃ "ইহা উত্তাপ, রাত্রি আর প্রশান্ত সমুদ্রের মত মহান ও গরিমাময়। প্রত্যেক উন্নত কবিচিত্তে পর্যায়ক্রমে যে সকল উচ্চ ও মহান নীতি ও ধর্মভাব আসে, তাদের সবগুলিই এতে আছে .... বইপত্র সরিয়ে রাখার কোন অর্থ হয় না; যদি কোন বনে অথবা পুষ্করিণীর উপর নৌকায় আমার নিজের প্রতি সত্যিই কোন আস্থা থাকে, তাহলে প্রকৃতি আমাকে সদ্য সদ্য 'ব্রাহ্মণ' করে দেয়; সীমাহীন প্রয়োজন, অখণ্ড ক্ষতিপূরণ, অপার শক্তি আর অখণ্ড নীরবতা .... এই তার নীতি। তার বাণী হচ্ছে শান্তি, পবিত্রতা আর পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ — এই সকল সর্বরোগহর বিষয়গুলিই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে আর তোমাকে সেই অষ্টদেবতার পরমানন্দের কাছে উপনীত করে।"

"নিকটস্থ কোন শিষ্যকে সেই স্বল্পভাষী গুরু প্রায়ই এই উপদেশ দিতেন ঃ 'শ্লোকগুলোর মানে তোমার কাছে যেমন বোধ হয়, তেমনিভাবে তাদের ব্যাখ্যা কর। আমি তোমার চিন্তা পরিচালিত করব, যাতে করে তোমার ব্যাখ্যা নির্ভুল হয়।' এমনি করে লাহিড়ী মহাশয়ের বহু অনুভূতিলব্ধ বিষয়, তাঁর নানা শিষ্যদের বহুল ব্যাখ্যাসমেত লিপিবদ্ধ হয়েছিল।

"গুরুদেব কখনও অন্ধ বিশ্বাসের উপদেশ দিতেন না। তিনি বলতেন, 'কথাগুলো কেবল খোলসমাত্র; ধ্যানেতে নিজ আনন্দবোধরূপে ঈশ্বরোপলব্ধির প্রমাণ গ্রহণ কর।'

"শিষ্যের সামনে যতরকমের সমস্যাই উপস্থিত হোক না কেন, তিনি তার সমাধানে ক্রিয়াযোগ সাধনেরই উপদেশ দিতেন। বলতেন, যখন আমি এ শরীরে আর তোমাদের দেখিয়ে দিতে উপস্থিত থাকব না, যৌগিক সমাধান তখনও তার উপযোগিতা হারাবে না। একটা তত্ত্বগত প্রেরণার মত এর অভ্যাসের কৌশল কখনও রুদ্ধ, অবহেলিত, বা বিস্মৃত হবার নয়। তোমার মোক্ষলাভে অবিরত ক্রিয়ার অভ্যাস করে যাও, তাতেই তোমার শক্তি বৃদ্ধি হবে।"

কেবলানন্দজী তারপর এই ঐকান্তিক বিশ্বাসের কথা দিয়ে শেষ করলেন যে, "সেই অনন্তপুরুষের সন্ধানে আত্মপ্রচেষ্টায় উদ্ভাবিত আজ পর্যন্ত যেসব মুক্তির উপায় বেরিয়েছে, তার মধ্যে এই ক্রিয়াযোগই হচ্ছে আমার মতে সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ। এর অভ্যাসে দেখা গিয়েছে যে, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর সকল জীবের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও, লাহিড়ী মহাশয় আর তাঁর কতকগুলি বিশিষ্ট শিষ্যদের দেহে প্রত্যক্ষভাবে রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন।"

কেবলানন্দজীর উপস্থিতিতে লাহিড়ী মহাশয়ের দ্বারা এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটেছিল। একদিন সেই কাহিনীটি বলতে শুরু করলেন — দৃষ্টি তখন টেবিলের ওপর রক্ষিত সংস্কৃত পুঁথি ছাড়িয়ে অনেক, অনেক দূরে নিবদ্ধ।

"রামু নামে তাঁর একটি অন্ধ ভক্ত-শিষ্য ছিল। তার অবস্থা দেখে মনে বড় দয়া হ'ল। ভাবলাম, যাঁর মধ্যে ঐশীশক্তি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান, সেই আমাদের গুরুদেবকে যখন সে আন্তরিকভাবে সেবা করছে, তখন তিনি কি

ওর জন্যে কিছুই করবেন না? যাইহোক, একদিন সকালে আমি রামুর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলাম। একটা তালপাতার হাতপাখা নিয়ে রামু তখন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গুরুদেবকে বাতাস করে চলেছিল। রামু যখন উঠে পড়ল, তখন আমিও তার পিছু নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, —

"রামু, কতদিন তুমি চোখে দেখতে পাও না?"

"'জন্মাবধি ম'শাই, সূর্যের আলো কখনও চোখে দেখি নি।'

"আমাদের সর্বশক্তিমান গুরুদেব তোমায় সাহায্য করতে পারেন। তাঁর চরণে একদিন তোমার কথাটা নিবেদন করেই দেখ না কেন?'

"তার পরদিন রামু খানিক ইতস্ততঃ করে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হল বটে, কিন্তু তাঁর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের সঙ্গে সামান্য দেহসম্পদও ভিক্ষা করতে রামু যেন একটু লজ্জিত হয়েই বললো, 'গুরুদেব, সারা জগতের আলো যোগান যিনি, তিনি ত' আপনার ভেতরেই রয়েছেন। আপনার কাছে শুধু এইটুকুমাত্র ভিক্ষে যে তাঁর আলো আমার চোখে ফুটিয়ে দিন, যাতে ক'রে আমি এ জগতের সূর্যের আলো, যদিও সে ঐ আলোর কাছে তুচ্ছ, তা' যেন দেখতে পাই।"

"গুরুদেব বললেন, 'রামু, এসব কথা তোমায় কে বলেছে? আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবার জন্যে কিচ্ছু না জেনেই তোমায় কেউ এসব কথা বলেছে। আমার ত' রোগ সারাবার কোন ক্ষমতা নেই, রামু!'

"রামু বলল, 'গুরুদেব! আপনার ভেতর অনন্ত শক্তি যিনি রয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই আমায় ভাল করে তুলতে পারেন।'

"'সে অবিশ্যি আলাদা কথা। ভগবানের অনন্ত শক্তি — তার কোথাও সীমা নেই। যিনি তারায় তারায় আলো আর শরীর-কোষে প্রাণের জ্যোতিঃ জ্বালাতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই তোমার চোখে দৃষ্টির জ্যোতিও ফুটিয়ে তুলতে পারেন।' এই বলে গুরুদেব রামুর কপালে দুই ভ্রূর মাঝখানে* স্পর্শ করে বললেন, 'তোমার মন ঠিক ঐ জায়গায় লাগিয়ে রাখ আর সাতদিন ধরে

---

* তৃতীয় বা যোগনেত্রের স্থান। মৃত্যুকালে মানুষের চৈতন্য সাধারণতঃ এই পবিত্র স্থানেই আকৃষ্ট হয় — আর সেটাই হচ্ছে মৃতের উর্ধ্বপানে দৃষ্টির কারণ।

অবিরাম রামনাম* জপ কর। আবার তোমার চোখে সূর্যের আলোর নতুন অরুণোদয় হবে।' আশ্চর্য! এক সপ্তাহের মধ্যে ঠিক তাই'ই হ'ল। জীবনে সেই প্রথম রামু প্রকৃতির সুন্দর মুখ দেখতে পেল। সর্বদর্শী গুরু শিষ্যকে নির্ভুলভাবে রাম নাম জপ করতে বলেছিলেন, যার চেয়ে প্রিয় আর কোন নাম তাঁর কাছে ছিল না। রামুর মনের জমিতে ভক্তির চাষ দেওয়া ছিল, যাতে গুরুদত্ত রোগ নিরাময়ের মহাবীজ পড়ে অচিরেই তা অঙ্কুরিত হয়ে উঠল।" মুহূর্তেক চুপ করে থেকে কেবলানন্দজী পুনরায় গুরুপ্রসঙ্গ শুরু করলেন ঃ

"লাহিড়ী মহাশয়ের যা কিছু অলৌকিক ব্যাপার ঘটত, তাতে তিনি নিজের কৃতিত্ব দাবী করে কখনও কোন অহঙ্কারের† প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর আত্মনিবেদনের পরাকাষ্ঠায়, তিনি রোগনিরাময়ে সেই আদ্যাশক্তিকেই নিজের মধ্য দিয়ে অবাধে পরিচালিত করতে পারতেন।

"সংখ্যাতীত মানবদেহ, যা লাহিড়ী মহাশয়ের ঐশী শক্তির দ্বারা চমকপ্রদভাবে আরোগ্যলাভ করেছিল, শেষপর্যন্ত অবিশ্যি তাদের চিতার আগুনে পুড়েই ছাই হতে হয়েছে। কিন্তু যে নীরব আধ্যাত্মিক জাগরণ তিনি সংসাধিত করেছিলেন, যেসব খ্রিস্টতুল্য শিষ্য তিনি তৈরী করেছিলেন, তাঁরাই হচ্ছেন তাঁর অবিনশ্বর কীর্ত্তি।"

সংস্কৃত বিদ্যায় আমার পণ্ডিত হওয়া কখনও ঘটে ওঠেনি বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিদ্যায় কেবলানন্দজী আমায় আরও উচ্চতর ঐশ্বরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করেছিলেন।

---

* সংস্কৃত মহাকাব্য 'রামায়ণের' পূতচরিত্র।

† অহঙ্কার হচ্ছে দ্বৈতবাদ অর্থাৎ মানব ও তার স্রষ্টার মধ্যে দ্বৈত বা আপাতদৃষ্টিতে বিভেদের মূল কারণ। অহঙ্কারই মানুষকে মায়াধীন করে যাতে করে বিষয়ই (অহম্) বস্তু বলে বোধ হয়। সৃষ্ট জীবেরা নিজেদেরকেই স্রষ্টারূপে কল্পনা করে।

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ। ...
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন।। (৫ ঃ ৮, ৯)
সমং পশ্যন হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্।। (১৩ ঃ ২৯)
অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।। (৪ ঃ ৬)
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।। (৭ ঃ ১৪)

৫ম পরিচ্ছেদ

‘গন্ধবাবা’র অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন

“পৃথিবীতে সব ব্যাপারেরই একটা নির্দিষ্ট কাল আর সব কাজেরই একটা উপযুক্ত সময় আছে।”*

সলোমনের† এই মহাজন বাক্য আমি আমার আশ্বাসলাভের জন্য পাইনি। বাড়ী থেকে কোন জায়গায় গেলেই আমার সন্ধানীদৃষ্টি বেশ সজাগ ও সতর্ক রাখতাম, যদি কোনভাবে আমার ভাগ্যে নির্দিষ্ট গুরুর শ্রীমুখটি কোনো জায়গায় চোখে পড়ে। কিন্তু আমার ইস্কুলের লেখাপড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দর্শন কোথাও পাই নি।

অমরের সঙ্গে হিমালয়ে পলায়ন আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর আমার জীবনে আবির্ভাবের সেই পরম পুণ্যদিনটির মাঝখানে দু'বছর কেটে গিয়েছিল। এর মধ্যে আমি অনেকজন সাধুমহাত্মার দর্শনলাভ করেছিলাম ঃ “গন্ধবাবা”, ‘সোহহং স্বামী’, নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, মাস্টার মহাশয় এবং বিখ্যাত বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক শ্রী জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয়।

‘গন্ধবাবা’র সঙ্গে আমার সাক্ষাতের দু'টি পূর্বাভাস ছিল — একটি ছিল সুসঙ্গত আর অন্যটি বেশ কৌতুকজনক।

“ঈশ্বরই সরল; আর সবই জটিল। প্রকৃতির আপেক্ষিক জগতে কোন পরম মান খুঁজতে যেয়ো না।”

মন্দিরস্থিত কালীমূর্তির‡ সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় এইসব দার্শনিক চরম তত্ত্বসকল মৃদুভাবে আমার কর্ণকুহরে এসে প্রবেশ করল।

---

* এক্লিসিয়াষ্টীজ, ৩ ঃ ১ (বাইবেল)।

† খ্রিস্ট পূর্ব দশম শতাব্দীর ইস্রায়েলের এক শক্তিশালী রাজা। জ্ঞান ও ন্যায়ের ভিত্তিতে তিনি এমন সুশাসন করতেন যে, জ্ঞানী ব্যক্তি ও তাঁর নাম সমার্থ হয়ে গেছে।

‡ কালী — প্রকৃতির অনন্ত সত্তার মূর্ত প্রতীক। শাস্ত্রে পরম সত্তা অর্থাৎ শিবের অর্ধশায়িত মূর্তির উপর দণ্ডায়মান চতুর্ভূজা দেবীমূর্তিরূপে তাঁকে চিত্রিত করা হয়; কারণ এই প্রপঞ্চময় জগৎ বা

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি যে একটি দীর্ঘকায় পুরুষ — যাঁর পরিচ্ছদে, অথবা বলতে গেলে তার অভাবে, তাঁকে পরিব্রাজক সাধু বলেই বোধ হয়।

আমি সকৃতজ্ঞভাবে হেসে বললাম, "সত্যিই আপনি আমার মনের জটিল চিন্তারাশির মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছেন। প্রকৃতির রুদ্র আর প্রসন্ন এই দুই ভাব মূর্ত হয়েছে কালীপ্রতিমার মধ্যে; কিন্তু তাদের ঐ বৈপরীত্য আমার চেয়ে অনেক জ্ঞানী-গুণীদেরও হতবুদ্ধি ঘটিয়েছে।"

তিনি বললেন, "অতি অল্পলোকই আছেন যাঁরা তাঁর রহস্যভেদ করতে পারেন। শুভাশুভ এই দুই ভাবের দুর্ভেদ্য প্রহেলিকাময় মানুষের জীবন যেন স্ফিংসের* মত সকল লোকের বুদ্ধির কাছে এক বিরাট রহস্যের সৃষ্টি করে! এর সমাধানের কোন চেষ্টা না করে অধিকাংশ লোক তাদের জীবন বৃথাই ব্যয় করে। মান্ধাতার আমল হতে, এমন কি আজ পর্যন্তও, লোকে সেই দণ্ডই দিয়ে আসছে। মাঝেমধ্যে এক আধজন হয়ত তাদের বিরাট ব্যক্তিত্বের জোরে কখনও পরাজয় মানতে চায় না। দ্বৈত মায়াবাদের† মধ্যে হয়তবা সে অদ্বৈতবাদের অখণ্ড সত্যের সন্ধান পায়।"

"আপনার কথাগুলি খাঁটি সত্যি, মশাই!"

প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়াই নির্গুণ ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন। তাঁর চতুর্ভুজ এই মৌলিক গুণগুলির প্রতীক — দু'টি মঙ্গলপ্রসূ, আর দু'টি বিনাশকারী; জড় বা সৃষ্টির মৌলিক দ্বৈতভাব।

* গ্রীক পুরাণে বর্ণিত এক অতিকায় প্রাণী; সাধারণতঃ বলা হয় তার মস্তকটি নারীর, এবং দেহটি সিংহ বা কুকুরের মত। তার ডানাও আছে। প্রাচীন গ্রীক শহর থীবসের রাস্তা দিয়ে যারাই যেত, তাদেরকেই সে একটা ধাঁধাঁ জিজ্ঞেস করত। উত্তর দিতে না পারলে পথিককে সে খেয়ে ফেলত।

† মায়া [illegible], আক্ষরিক অর্থে [illegible]। মায়া হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে এক অলৌকিক শক্তির প্রকাশ যাতে করে অপরিমেয় আর অভেদের মধ্যে সীমা আর ভেদের আপাতভাব দৃষ্ট হয়।

ইমার্সন 'মায়া' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেছিলেন ঃ—

"অভেদ্য মায়ার লীলা ব্যাপ্ত সর্বকালে,
বয়ন করিয়া চলে সংখ্যাতীত জালে;
মানস-মোহন দৃশ্য নানা মায়াছবি,
একের উপরে আসি' ঢাকা দেয় সবি।
মায়াবীরে সেইজন সত্য বলি মানে,
যে'জন বঞ্চিত হতে চায় মনে প্রাণে।"

"বহুদিনধরে অকপটভাবে জ্ঞানরাজ্যে অন্তর্দর্শনের অনুশীলন করে দেখেছি, প্রবেশের পথ দারুণ কঠিন। আত্মসমীক্ষা আর চিন্তার প্রতি নিরন্তর অবলোকনে এক কঠিন আর দারুণ অভিজ্ঞতা হয়। প্রবল আত্মাভিমানকেও তা চূর্ণ করে দেয়। সত্যিকারের আত্মবিশ্লেষণই কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে সত্যদ্রষ্টার ভাব আনয়ন করে। 'আত্মপ্রকাশের' ধারা বা ব্যক্তিগত স্বীকৃতি শেষপর্যন্ত তাদের আত্মম্ভরী করে তোলে যাদের এই ধারণা জন্মায় যে, ঈশ্বর ও সৃষ্টির ব্যাখ্যায় তাদেরই ব্যক্তিগত অধিকার আছে।"

আলোচনাটি বেশ ভালই লাগছিল; বললাম, "এ রকম উদ্ধত মৌলিকত্বের কাছ হতে সত্য কিন্তু নীরবে সরে যায়, তাতে আর সন্দেহ নেই।"

"মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না তার ব্যক্তিগত সংস্কার হতে মুক্ত হতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে শাশ্বত সত্য উপলব্ধি করতে পারবে না। মানুষের মন যুগ-যুগান্তব্যাপী সংস্কারের পলিমাটিতে আবৃত, সংখ্যাতীত জগৎমায়ার অধীন নিরানন্দ জীবনের নিষ্ফলতায় পরিপূর্ণ। মানুষ যখন তার অন্তঃশত্রুর সঙ্গে লড়াই শুরু করে, যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ লড়াই তখন তার কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। দুর্ধর্ষ শারীরিক শক্তিতে পরাজিত হবার মত মরজগতের শত্রু এরা নয়! সর্বব্যাপি দৃষ্টি, নিরলস, এরা মানুষকে স্বপ্নেও অনুসরণ করে থাকে। ভীষণ আর মারাত্মক রকমের অস্ত্রশস্ত্রে গুপ্তভাবে সজ্জিত অন্ধ কামনার এইসব সৈন্যদল আমাদের হত্যা করবার সুযোগ অনবরত খুঁজে বেড়ায়। অদৃষ্টের কাছে যে আত্মসমর্পণ করে, তার আদর্শের অপমৃত্যু ঘটায়, সে নিতান্তই হতভাগ্য বইকি! তাকে অক্ষম, নীরস আর ঘৃণ্য ছাড়া আর কিইবা বলা যায়?"

"মশায়, এই সব ভ্রান্ত হতভাগ্যদের জন্যে কি আপনার এতটুকুও সহানুভূতি নেই?"

সাধুটি মুহূর্তের জন্যে চুপ করে রইলেন। পরে একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন, "সর্বগুণাধার অপ্রত্যক্ষ ঈশ্বর আর প্রত্যক্ষ মানুষ, যার প্রায় কিছুই

গুণ নেই বললেই চলে, এই দু'জনকে সমানভাবে ভালবাসা অভাবনীয় বই কি! কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তিও কম নূন্য নয়। অন্তরের মধ্যে খুঁজে দেখলে, মানুষের মন যা স্বার্থবুদ্ধিজড়িত, তার মধ্যেও একটা ঐক্যের ভাব শীগ্‌গিরই খুঁজে পাওয়া যায়। এক হিসেবে অন্ততঃ মানুষের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের পরিচয় মেলে। এই ভ্রাতৃত্বভাবের আবিষ্কারে মানুষের ক্ষুদ্র ও ভীত মন স্তম্ভিত হয়ে যায়। এইভাবে মানুষের জন্যে মানুষের দরদ সৃষ্টি হয়। বিকাশোন্মুখ মানবাত্মার নিরাময় শক্তির বিষয়ে যে মন অন্ধ ছিল, তা একটা উদার দিব্যদৃষ্টি লাভ করে।"

"সকল যুগের সাধুসন্তরা তো আপনারই মতো জগতের দুঃখে কাতর হয়েছেন।"

"একমাত্র স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তিরাই অপর মানুষদের জীবনের দুঃখ-দৈন্যের প্রতি সহানুভূতি হারায়, কারণ নিজেদের সীমিত দুঃখকষ্টের মধ্যেই তাদের মন ডুবে থাকে।" সাধুটির গম্ভীরবদন বেশ কোমল হয়ে এল। বলতে লাগলেন ঃ "যে ছুরি দিয়ে চেরার মত আত্মব্যবচ্ছেদ করে দেখে, সেই বিশ্বানুকম্পার বিস্তার অনুভব করতে পারে। আর তার অহঙ্কারের উচ্চনাদও থেমে আসে। এইসব জমিতেই ভগবৎ প্রেমের ফুল ফোটে। অবশেষে জীব আর কিছু না হোক, মনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তার সৃষ্টিকর্তার দিকে তাকিয়ে বলে, "আর কেন প্রভু, আর কেন? আর যে পারি না।' দুঃখের দারুণ কশাঘাতে জর্জ্জরিত আর তাড়িত মানুষ অবশেষে সেই অসীম সত্তার দিকেই ধাবিত হয়, যাঁর অনুপম রূপের মাধুরীই একমাত্র তাকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে।"

সাধুটি আর আমি কলকাতার বিখ্যাত কালীঘাট মন্দিরে কালীমায়ের অপরূপ সৌন্দর্য দর্শন করবার জন্যে গিয়েছিলাম। আমার ক্ষণিকের সাথীটি তখনই আবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের কারুকার্য ও শোভাকে কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলে উঠলেন, —

"ইঁটকাঠ মনে কোন সাড়া জাগায় না, হৃদয় কেবল প্রাণের সুরেই বিকশিত হয়।" সূর্যকিরণের মধ্যে দিয়ে আমরা দরজার দিকে অগ্রসর হলাম। মন্দিরে তখন অসংখ্য ভক্ত পূজার্থীর দল যাওয়া আসা করছিল।

সাধুটি আমায় গম্ভীরভাবে নিরীক্ষণ করে বললেন, "তুমি শিশু, ভারতবর্ষও শিশু! প্রাচীন মুনি ঋষিরা* আধ্যাত্মিক জীবনের অক্ষয় আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তাঁদের সনাতন প্রথা অধুনাতন দেশ ও কালের পক্ষেও যথোপযুক্ত। জড়বাদের মোহে আচারভ্রষ্ট আর বিকৃত না হয়ে সেইসব ধর্ম্মানুশাসন বা তার উপদেশাদি এখনও ভারতবর্ষকে গড়ে তুলছে। হাজার হাজার বছরধরে বিপর্যস্ত-বুদ্ধি পণ্ডিতেরা যার মূল্যায়ণ করতে পারেননি, সন্দেহপ্রবণ সেই কালের বিচারে বেদের মূল্য আজ নিরূপিত হয়ে গেছে। এইটেকেই তোমার উত্তরাধিকার বলে গ্রহণ কোরো।"

পরম বাগ্মী সেই সাধুটির কাছ হতে বিদায় গ্রহণ করবার সময় তিনি এক ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলেন ঃ "এখান থেকে যাবার পরই কিন্তু তোমার একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ঘটবে, দেখো।"

মন্দির সীমানা ছেড়ে আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। একটা বাঁক ঘুরতেই বহুদিনের পরিচিত একটি লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। ইনি হচ্ছেন সেই সব মহাপ্রভুদের একজন, যাঁরা একবার আলাপ জুড়লে আর তাঁদের স্থানকালের মাত্রাজ্ঞান থাকে না।

আমি কিন্তু তখন তার হাত এড়িয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়বার মতলব করছিলাম দেখে সে বললে, "আচ্ছা, তোমায় আমি শীগ্‌গিরই ছেড়ে দেবো; কিন্তু আমাদের সেই ছাড়াছাড়ি হবার পর যা কিছু ঘটেছে, তা সব একে একে বল দেখি!"

বললাম. "কি মুশ্‌কিল! আরে আমাকে যে এখুনিই যেতে হবে।"

কিন্তু হলে কি হয়, কে বা শোনে কার কথা। সে তো আমার হাতটি পাকড়ে ছোটখাট যত সব খবর একে একে বার করে নিতে লাগল। মজা মন্দ নয়! যতই আমি বলি, ততই সে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আরও খবরের সন্ধানে লালায়িত হয়। মনে মনে আমি মা কালীর কাছে প্রার্থনা শুরু করলাম যাতে চট্‌ করে পালাতে পারি, তার একটা উপায় বার করে দেবার জন্যে।

* ঋষি — "দ্রষ্টা"; স্মরণাতীতকালে রচিত বৈদিক মন্ত্র রচয়িতা।

সঙ্গীটি হঠাৎ আমাকে ছেড়ে চলে গেল। একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে দ্বিগুণ জোরে পা চালিয়ে দিলাম এই ভয়ে যে, আবার তার বক্‌বকানির পাল্লায় পড়তে না হয়। পশ্চাতে দ্রুত পদধ্বনি শুনতে পেয়ে আমিও গতি বৃদ্ধি করলাম। পিছন ফিরে তাকাতে আর সাহস হল না। কিন্তু প্রায় ছুটে এসে বন্ধুবর খুব স্ফূর্তির সঙ্গে আমার কাঁধটি ধরে এসে দাঁড়াল। তার পরেই সে শুরু করলো —

"আরে, আমি যে তোমায় গন্ধবাবার কথা বলতে একেবারেই ভুলে গিয়েছি। উনি ঐ সামনের বাড়ীতেই থাকেন।" বলে সে সামান্য দূরে একটা বাড়ী দেখিয়ে দিল। তারপর বলল, "ওঁর সঙ্গে দেখা করে যেয়ো কিন্তু, বুঝলে? ভারি অদ্ভুত লোক! তুমি অনেক আশ্চর্য ব্যাপার ওখানে দেখতে পাবে। যাইহোক, এখন আমি চললাম তবে।" এই বলে এবার কিন্তু সে সত্যিই চলে গেল।

তার এই কথায় কালীঘাটের মন্দিরের সেই সাধুটির ভবিষ্যদ্বাণীর কথা আমার মনে পড়ে গেল। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সেই বাড়ীতে গিয়ে প্রবেশ করলাম। দেখি, একটি বেশ প্রশস্ত বৈঠকখানায় একটা গেরুয়ারঙের পুরু গালিচার ওপর বহু লোক এখানে-ওখানে বসে রয়েছে। বসতেই একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের চাপা ফিস্‌ফিসানি আমার কানে এসে পৌঁছল —

"ঐ দেখ, গন্ধবাবা বাঘছালের ওপর বসে রয়েছেন। উনি যে কোন গন্ধহীন ফুলের ভিতর স্বাভাবিক সুগন্ধ এনে দিতে পারেন। তাছাড়া, কোন শুকনো কুঁড়ি ফুটিয়ে তুলতে অথবা কারুর গা থেকেও অতি মনোরম গন্ধ বার করতে পারেন।"

শুনে সাধুটির দিকে আমি সোজা তাকালাম। সাধুটিরও চঞ্চল দৃষ্টি আমার উপর স্থির হয়ে দাঁড়াল। শ্যামবর্ণ নধর দেহ, শ্মশ্রুবিশিষ্ট, চক্ষু দু'টি বেশ বড় বড় আর উজ্জ্বল। বললেন, "বাবা, তোমায় দেখে খুব খুশী হয়েছি। কি চাও বল? কোন্ গন্ধ চাই?"

মনে হল, কথাগুলো যেন ছেলেমানুষের মত। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হবে?"

বললেন, "অলৌকিক উপায়ে গন্ধ বেরোচ্ছে, দেখতে পাবে।"

"ভগবানকে গন্ধ তৈরী করার কাজে লাগান নাকি?"

"তাতে কি হয়েছে? ভগবানই ত' গন্ধ তৈরী করেন।"

"তা বটে! তবে তিনি ফুলের নরম পাপড়ির ভিতরেই গন্ধ তৈরী করেন, সদ্যসদ্য ব্যবহারের পর ফেলে দেবার জন্যে। আপনি ফুল তৈরী করতে পারেন কি?"

"হ্যাঁ, তবে সাধারণতঃ আমি কেবল গন্ধই তৈরী করি।"

"তাহলে আতর তৈরীর কারখানা ত' সব উঠে যাবে।"

"আরে না, না, তাদের ব্যবসা সব ঠিক বজায় থাকবে। আমার নিজের উদ্দেশ্য হচ্ছে — ঈশ্বরের শক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া মাত্র, আর কিছু নয় বুঝলে?"

"মশায়, ঈশ্বরের প্রমাণের কোন দরকার করে নাকি? তিনি কি সর্বত্র সকল বিষয়েই অলৌকিক ব্যাপার ঘটাচ্ছেন না, বলুন?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তাঁর অনন্ত সৃষ্টিবৈচিত্র্যের মধ্যে আমরাও তো সামান্য কিছু দেখাতে পারি।"

"কতদিন আপনার এ বিদ্যায় পারদর্শী হতে লেগেছে?"

"বার বৎসর।"

"এই অলৌকিক উপায়ে গন্ধ তৈরী করার জন্যে! পূজনীয় সাধুজী, মনে হয়, যে কোন গন্ধবিক্রেতার দোকান থেকে গোটা কতক টাকার বদলে আপনি যা পেতে পারেন, তারজন্যে বৃথাই আপনি এই বারোটা বছর ব্যয় করেছেন।"

"গন্ধ ত' ফুলের সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়।'

"হ্যাঁ, কিন্তু গন্ধ ত' মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেও চলে যায়। শুধু মাত্র দেহের তৃপ্তির জন্যে আমি তা চাইব কেন?"

"দার্শনিকপ্রবর! তোমার কথা শুনে খুব খুশী হলাম। নাও, তোমার ডানহাতটি বাড়িয়ে দাও তো দেখি," বলে আশীর্বাদচ্ছলে দক্ষিণ হস্তটি প্রসারিত করলেন।

গন্ধবাবার কাছ থেকে আমি গজকতক দূরে বসেছিলাম। আমার গা ছুঁয়েও কোন লোক সেখানে বসে ছিল না। আমি হাতটি বাড়িয়ে দিলাম — যোগিবর তা স্পর্শও করলেন না। শুধু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি গন্ধ চাই?"

"গোলাপ।"

"বেশ, তাই হবে।"

অপরিসীম বিস্ময়ে দেখলাম যে, গোলাপের মনোরম সৌরভ আমার করতলের মধ্যস্থল হতে তীব্রভাবে ফুটে বেরচ্ছে। আমি একটু হেসে কাছের ফুলদানী থেকে একটি গন্ধহীন ফুল তুলে নিয়ে বললাম, "এই ফুলটিতে কি যুঁই ফুলের গন্ধ হতে পারে?"

"তাই হবে।"

ফুলের পাপড়িগুলো থেকে তখনই যুঁই ফুলের গন্ধ ভুর ভুর করে বেরতে লাগল। এই অপূর্ব ইন্দ্রজালের সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে, তাঁর একটি শিষ্যের পাশে গিয়ে বসলাম। তিনি বললেন যে, গন্ধবাবা, যাঁর আসল নাম স্বামী বিশুদ্ধানন্দ — তিব্বতে এক গুরুর কাছ থেকে যোগের নানা আশ্চর্য প্রক্রিয়া শিক্ষা করে এসেছেন। তিব্বতী যোগীটির বয়স শুনলাম হাজার বছরেরও ওপর।

শিষ্যটি গুরুর বিষয়ে বেশ একটু গর্ব প্রকাশ করে বললেন — "তাঁর শিষ্য গন্ধবাবা। আপনি এইমাত্র যে রকম দেখলেন, তেমনি যখন তখন কিন্তু উনি শুধু কথা বলে গন্ধ তৈরী করেন না। অবিশ্যি মেজাজ অনুযায়ী ওঁর কাজের অনেক তারতম্য হয়। ওঁর অদ্ভুত শক্তি! কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিই ওঁর শিষ্য।"

আমি মনে মনে ঠিক করলাম, আমি আর এঁদের দল বাড়াব না। একেবারে আক্ষরিক অর্থে "অলৌকিক শক্তিশালী" কোন গুরু আমার ঠিক মনের মত নয়। গন্ধবাবাকে বিনম্র নমস্কার জানিয়ে সেখান হতে প্রস্থান করলাম। বেড়াতে বেড়াতে বাড়ী ফেরবার সময় সেদিনকার তিনটি বিচিত্র ঘটনার কথা ভাবতে লাগলাম।

বাড়ীর দরজায় পা দিতেই উমাদিদির সঙ্গে দেখা। বলল, "বড়ই চাল বেড়ে গেছে দেখছি, আবার সেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাপার কি?"

বিনা বাক্যব্যয়ে হাতটি বাড়িয়ে দিদিকে তা শুঁকতে ইশারা করলাম। শুঁকেই চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আঃ! কি চমৎকার গোলাপের গন্ধ, আর কি অস্বাভাবিক রকমের উগ্র!" "সত্যিই ব্যাপারটা উগ্র রকমের অস্বাভাবিক" ভেবে নিঃশব্দে তার নাকের কাছে সেই অলৌকিক উপায়ে সুগন্ধকরা ফুলটি ধরলাম।

"ওঃ, যুঁই ফুল আমি বড্ড ভালবাসি!" বলেই সে ফুলটি ছিনিয়ে নিল। কারণ দিদি খুব ভাল রকমই জানত যে, ও ধরণের ফুল একেবারেই গন্ধহীন; কিন্তু তা থেকে যুঁই ফুলের গন্ধ বারম্বার শুঁকতে শুঁকতে তার মুখের উপর একটা হাস্যকর নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পেল। দিদির উপর গন্ধের প্রতিক্রিয়াতে আমার একটা সন্দেহ দূর হল যে, হয়তবা গন্ধবাবা আমার উপর আত্মসম্মোহিত অবস্থা আনাতে আমিই কেবল গন্ধটা টের পাচ্ছিলাম।

পরে আমি আমার বন্ধু অলকানন্দের কাছ হতে গন্ধবাবার আর একটি অলৌকিক শক্তির কথা শুনেছিলাম — যা শুনে আমার মনে হল যে, হায় রে, পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিত মানুষের আজকে যদি তা থাকত!

অলকানন্দ বলেছিল, "বর্ধমানে গন্ধবাবার আস্তানায় এক উৎসব উপলক্ষ্যে শতাধিক অভ্যাগতের মধ্যে আমিও উপস্থিত ছিলাম। বিরাট আনন্দোৎসব, অনেকেই এসেছেন। যোগিবরের শূন্য থেকে জিনিষ তৈরী করবার কথা শুনে আমি একটু হেসে কিছু অসময়ের ট্যাঞ্জারিন কমলালেবু তৈরী করবার কথা বললাম। সঙ্গে সঙ্গে কলাপাতার ওপর পরিবেশন করা লুচিগুলো বেশ ফুলে উঠল। প্রত্যেকটি লুচির খোলের ভেতর একটি করে খোসা ছাড়ানো ট্যাঞ্জারিন কমলালেবু! আমারটিতে তো ভয়ে ভয়ে কামড় দিলাম। কিন্তু দেখলাম, তা অতি সুস্বাদু!"

বহু বৎসর পরে আমি আত্মোপলব্ধিবলে জানতে পেরেছিলাম, কি করে গন্ধবাবা ঐ সব তৈরী করতেন। কিন্তু হায়! এই প্রক্রিয়াটি চিরকালই জগতের ক্ষুৎপীড়িত মানবগোষ্ঠীর আয়ত্তের বাইরে থেকে যাবে।

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উত্তেজনা, যা মানুষের ওপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে — শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ — তা সব ইলেকট্রন আর প্রোটনের স্পন্দন তারতম্যে উৎপন্ন হয়। এই স্পন্দনগুলি আবার প্রাণ অর্থাৎ "লাইফট্রন" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই "লাইফট্রন"'ই হচ্ছে সূক্ষ্ম প্রাণশক্তি, অথবা পারমাণবিক শক্তি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর শক্তি, যা সুকৌশলে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যযুক্ত পঞ্চতন্মাত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

গন্ধবাবা কতকগুলি যৌগিক প্রক্রিয়ার বলে নিজেকে এই বিশ্বপ্রাণশক্তির সঙ্গে একসুরে বেঁধে, এইসব "লাইফট্রন"গুলির স্পন্দনশীল গঠনকার্যে পরিবর্তন সাধিত করে, তাদের ইচ্ছামত রূপ দিয়ে ঈপ্সিত ফললাভ করতে পারতেন। তাঁর গন্ধ বা ফল তৈরী করা বা অন্যান্য আশ্চর্য ব্যাপার সকল এইসব জাগতিক স্পন্দনেরই বাস্তব রূপ মাত্র — সম্মোহিত অবস্থায় তৈরী কোন আভ্যন্তরীণ অনুভূতি নয়!

যে সব লোকেদের অ্যানেস্থেটিক প্রয়োগে বিপদ ঘটতে পারে, তাদের ছোটখাট অস্ত্রোপচারের সময় মানসিক ক্লোরোফর্ম হিসাবে ডাক্তারেরা সম্মোহনবিদ্যা প্রয়োগ করেন। কিন্তু কারোর ওপর বারবার সম্মোহন শক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত ক্ষতিকর, কারণ এর ফলে পরে এমন একটি তামসিক মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, যাতে করে তা কালে ক্রমে ক্রমে মস্তিষ্কের কোষগুলির মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার ভাব এনে ফেলে। সম্মোহনবিদ্যা হচ্ছে অপরের চিত্তভূমিতে অনধিকার প্রবেশ।* এর সাময়িক ঘটনাবলী ঈশ্বরানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কার্যকলাপের তুল্য কখনই নয়। দিব্যভাবে উদ্বুদ্ধ প্রকৃত মুনিঋষিরা এই নিখিল বিশ্বসৃজনকারী একজন যে স্বপ্নদ্রষ্টা আছেন, তাঁরই ইচ্ছার সঙ্গে একসুরে

---

* প্রতীচ্যের মনোবিদ্‌দের সংবিৎ চেতনার অনুধ্যান প্রধানতঃ অন্তর্জ্ঞান মন এবং মানসরোগ সকল, যা মনোরোগবিদ্যা আর মনঃসমীক্ষণ দ্বারা চিকিৎসিত হয়, সেইসব বিষয়ের অনুসন্ধানেই সীমিত। স্বাভাবিক মানস অবস্থাসমূহ আর তাদের প্রক্ষোভক আর ঐচ্ছিক দ্যোতনা সকলের উৎপত্তি আর মৌলিক গঠনের বিষয়ে অতি অল্পই গবেষণা হয়েছে — সত্যিই এ এমন একটা মৌল বিষয় যা ভারতীয় দর্শন উপেক্ষা করেনি। 'সাংখ্য' আর 'যোগদর্শনে'র স্বাভাবিক মানসগঠনের তারতম্যের মধ্যে বিভিন্ন সংযোগ আর বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মনের (ইন্দ্রিয় চেতনা) বিশেষ বৃত্তিসমূহের যথাযথ শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে।

বাঁধা তাঁদের ইচ্ছাশক্তিবলে এই স্বপ্নজগতে নানা পরিবর্তন আনয়ণ করতে পারেন।*

গন্ধবাবা প্রদর্শিত অলৌকিক কার্যাবলী দেখতে অবশ্য খুবই আশ্চর্যজনক বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে সেসব একেবারেই নিরর্থক। একমাত্র আনন্দবিধান করা ছাড়া তার আর অন্য কোনও সার্থকতা না থাকাতে এরা গভীর ঈশ্বরানুসন্ধিৎসার পথ থেকে মানুষকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে।

প্রকৃত গুরুরা কিন্তু অলৌকিক শক্তির অযথা ও সাড়ম্বর প্রদর্শন করাকে আদৌ পছন্দ করেন না। পারস্য দেশের মরমী আবু সৈয়দ একবার এই জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের উপর ক্ষমতালাভে দৃপ্ত কতকগুলি ফকিরকে মৃদু ভর্ৎসনাচ্ছলে বলেছিলেন, — "ব্যাং জলেতেও সমান স্বচ্ছন্দ্য, কাক-শকুন অতি সহজেই বাতাসে উড়ে বেড়ায়, পূর্বে ও পশ্চিমে শয়তান একইভাবে বর্তমান। সত্যিকারের খাঁটি মানুষ তাকেই বলে, যে তার স্বজনদিগের সঙ্গে সাধু ব্যবহার করে, — ভাবের হাটে যার বেচাকেনা চলে, কিন্তু মুহূর্তেকের তরেও সে ভগবানকে ভোলে না।†

* "প্রতিটি অণু-পরমাণু এই বিশ্বের প্রতিমূর্তি। একই গুপ্ত বস্তু প্রতিটির মধ্যে রয়েছে। একটি শিশিরকণাতেও পৃথিবী ঘূর্ণায়মান ... সর্বব্যাপিত্বের আসল তত্ত্ব হলো — প্রতিটি শ্যাওলা ও মাকড়সার জালেতেও ঈশ্বর পরিপূর্ণ বিদ্যমান।" — এমারসন, "কম্পেনশ্যেসন"

† "বেচাকেনা চলে কিন্তু মুহূর্তের জন্যও ভগবানকে ভোলে না।" এই উক্তির মধ্যে মূল কথাটি হল এই যে, বুদ্ধি এবং হৃদয় সুসমঞ্জসভাবে কাজ করবে। কিছু কিছু পাশ্চাত্য লেখক বলেন যে, হিন্দুর জীবনাদর্শ হল ভীরুর পলায়নবাদ অর্থাৎ নৈষ্কর্ম্য এবং অসামাজিক পশ্চাদপসরণ। বস্তুতঃ বৈদিক চতুরাশ্রম ব্যবস্থা হল সাধারণের পক্ষে প্রকৃত সুসমঞ্জস ব্যবস্থা, যাতে জীবনের অর্ধেক অংশ অধ্যয়ন আর গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালনের জন্য, আর বাকি অর্ধেক অংশ চিন্তা ও ধ্যানাভ্যাসের জন্য নির্দিষ্ট।

আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য নির্জনতা আবশ্যক; কিন্তু (সিদ্ধ) গুরুগণ জগতকে সেবা করবার জন্য সেখানেই ফিরে আসেন। এমন কি ঋষি কোনও বাহ্যিক কর্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত না হয়েও তাঁদের সৎচিন্তা এবং পবিত্র স্পন্দনের দ্বারা জগতের এমন সব উপকার সাধন করেন যা আত্মানুভূতিহীন ব্যক্তিদের বহু আয়াসসাধ্য মানবিক কার্যকলাপ থেকে পাওয়া যায় না। মহাত্মাগণ প্রায়ই তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও স্ব স্ব পন্থা অনুসারে নিঃস্বার্থভাবে অনুবর্তিগণকে অনুপ্রাণিত ও উন্নত করতে চেষ্টা করে যান। হিন্দুর কোনও ধর্মীয় বা সামাজিক আদর্শই নেতিমূলক নয়। মহাভারতে যে অহিংসাকে "সকলো ধর্মঃ" বলা হয়েছে, সেই অহিংসা হল ইতিবাচক উপদেশ, কারণ অহিংসা সম্বন্ধে এই ব্যক্ত ধারণা — কারোকে সাহায্য না করা মানে পরোক্ষভাবে তাকে "আঘাতদান" করা।

আর এক উপলক্ষ্যে পারস্যদেশের সেই মহান শিক্ষাগুরু ধর্মজীবন সম্বন্ধে এইরকম উপদেশ দিয়েছিলেন, —

"তোমার মাথার ভেতর যা' সব ঢুকে আছে (স্বার্থপর চিন্তা আর নানা দুরাশা) তা সব দুর করে ফেল; তোমার হাতে যা আছে, তা সব অকুণ্ঠভাবে বিতরণ কর। আর দুঃখের আঘাতে কখনও মুষড়ে পোড়োনা।"

কালীঘাটের সেই নিরপেক্ষ সাধু, অথবা তিব্বতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেই যোগী, কেউই আমার গুরু অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষায় পরিতৃপ্তি এনে দিতে পারেন নি।

আমার অন্তরে তাঁর পরিচয়ের জন্যে কোন উপদেষ্টার প্রয়োজন হয়নি, আর সেখানে একটা স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ বাণীর প্রতিধ্বনি প্রবলতর হয়ে উঠত কারণ তাঁর বিরল আবির্ভাব ঘটত নীরবতার মধ্য হতে। শেষ পর্যন্ত যখন আমি আমার গুরুর দর্শন পেলাম, তখন একমাত্র তাঁর মহিমময় আদর্শের মধ্যেই প্রকৃত মানুষটির পরিচয় পেলাম — আর কিছুরই দরকার রইল না।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে (৩/৪-৮) বলা হয়েছে যে, কর্মপ্রবৃত্তি মানুষের সহজাত প্রকৃতি, এবং আলস্য হ'ল অকর্ম বা ভ্রান্ত কর্ম।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।। ৪।।
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।। ৫।।

কর্ম অনুষ্ঠান বিনা কহিনু তোমারে, কর্মশূন্য ভাব কেহ পায় না সংসারে।
কর্মের আসক্তি পার্থ, নাহি যদি যায়, শুধু কর্মত্যাগে সিদ্ধি কেহ নাহি পায়। ৪
কর্ম্ম ছাড়ি ক্ষণকাল থাকা নাহি যায়, স্বাভাবিক গুণে কর্ম্ম আপনি করায়। ৫

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।। ৬।।
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।। ৭।।
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ।। ৮।।

ইন্দ্রিয় সংযত রাখি, ইন্দ্রিয় বিষয়, স্মরণ যে করে মূঢ়, কপটী সে হয়। ৬
ইন্দ্রিয় সংযত করি কর্ম্ম করে যেই, অনাসক্ত শুদ্ধচিত প্রশংসিত সেই। ৭
অবশ্য কর্ত্তব্য যাহা কর সে সকল, কর্ম্মত্যাগ হতে কর্ম্ম করাই মঙ্গল। ৮

— শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ৩য় অধ্যায়
('সুধাকরকৃত অনুবাদ')

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সোহহং স্বামী

স্কুলের এক বন্ধু চণ্ডী একদিন এসে এই মনোরম প্রস্তাবটি দিল ঃ "ওহে, সোহহং স্বামীর ঠিকানাটি এবার খুঁজে বার করেছি — চল, কাল তাঁকে দর্শন করে আসি।"

সন্ন্যাস নেবার আগে তিনি খালি হাতে বাঘের সঙ্গে লড়াই করতেন বলে সাধুটিকে দেখবার আমার খুবই আগ্রহ ছিল। এ রকম দুঃসাহসিক আর অসাধারণ শক্তির অধিকারীকে দেখবার জন্যে মনে বালকোচিত উৎসাহ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল।

তার পরদিন সকালে খুব শীত পড়েছে। চণ্ডী আর আমি কিন্তু খুব স্ফূর্তির সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। কলকাতার ভবানীপুরে কিছুক্ষণ বৃথা খোঁজাখুঁজির পর খানিকবাদে সঠিক বাড়ীটা পেয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ খুব জোরে কড়া নাড়বার পর বাড়ীর ভৃত্যমশাই গদাইলস্করী চালে বেরিয়ে এসে সহাস্যবদনে দর্শন দিলেন। তার সেই বিদ্রূপাত্মক হাসিতে বেশ বোঝা গেল যে, এত প্রবল আওয়াজ করেও আগন্তুকেরা সাধু মহারাজের আস্তানার নীরবতা ভঙ্গ করতে পারেনি!

যাইহোক, তার নীরব তিরস্কার হজম করে, আমরা দু'জনে বৈঠকখানায় গিয়ে বসতে পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেলাম। বহুক্ষণধরে সেখানে অপেক্ষা করার সময় মনে নানা রকম অস্বস্তিকর চিন্তার উদয় হতে লাগল। তত্ত্বসন্ধানীদের ধৈর্য ধরাই এদেশে নিয়ম। সাধু মহারাজেরা ইচ্ছে করেই হয়ত তাদের দর্শনের জন্য ভক্তের ঠিক কতটা আগ্রহ আছে, তা যাচাইয়ের জন্যে এই রকম পরীক্ষা করে থাকেন। পশ্চিমে ডাক্তার আর দন্ত-চিকিৎসকরা এই ধরণের মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা কৌশল অবাধে প্রয়োগ করে থাকেন।

অবশেষে ভৃত্যবর এসে আমাদের আহ্বান জানাতে চণ্ডী আর আমি একটি ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলাম দেখা গেল সেটি একটি শোবার ঘর। বিখ্যাত সোহহং* স্বামী বিছানার ওপর বসে আছেন। তাঁর বিরাট বপু দর্শনে আমাদের অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত হ'ল। বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে আমরা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এ রকম বিরাট ছাতি বা ফুটবলের মত হাতের গুলি আমরা আগে কখনো দেখি নি। বিশাল ঘাড়ের ওপর স্বামীজীর ভীষণ অথচ শান্ত মুখ, ঘন গোঁফদাড়ি আর বাবরি চুলে ঘেরা। কালো চোখে তাঁর একাধারে কপোতের শান্তকোমল আবার ব্যাঘ্রের হিংস্র দৃষ্টি! পেশীবহুল কোমরে একটা বাঘছাল জড়ান ছাড়া পরিধানে আর অন্য কিছুই ছিল না।

গলায় যখন স্বর ফুটল, তখন বন্ধুটি আর আমি বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে তাঁর অপূর্ব শৌর্যের বিষয়ে শ্রদ্ধা প্রকাশ ও প্রণাম করে বললাম, "আচ্ছা স্বামীজী, আজ দয়া করে একটু বলুন না জঙ্গলের সবচেয়ে যে ভয়ঙ্কর জানোয়ার, সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগারদের শুধু খালি হাতে কেমন করে কাবু করে ফেলা সম্ভব?"

"বাবা, বাঘের সঙ্গে লড়াই করা আমার কাছে কিছুই নয়। দরকার হলে আমি আজও তা করতে পারি।" শিশুর মত সরল হাসিতে মুখখানি তাঁর ভরে গেল, বললেন, "তোমরা বাঘকে বাঘ বলেই দেখ; আমি কিন্তু ওদের শুধু মেনী বেড়াল বলেই ভাবি।"

"স্বামীজী, অবচেতন মনে এ চিন্তা ঢোকালেও ঢোকাতে পারি যে বাঘেরা মেনীবেড়াল মাত্র, কিন্তু বাঘেদের কি তা বিশ্বাস করাতে পারব?"

"অবিশ্যি শক্তিরও প্রয়োজন আছে! একটা শিশু, বাঘকে বাড়ীর পোষা বিড়াল বলে ভাবে বলেই কি আর তার কাছ থেকে বাঘকে লড়াইয়ে হারানো আশা করা যেতে পারে? আমার এই মজবুত হাত দু'টিই হচ্ছে আমার যোগ্য অস্ত্র।"

তারপর তিনি আমাদের দালানের দিকে নিয়ে চললেন। সেখানে গিয়ে একটা দেওয়ালের ধারে একটি ঘুঁসি মারতেই একটা ইঁট সোজা

---

* সন্ন্যাস জীবনের নাম সোহহং। 'ব্যাঘ্র স্বামী' নামেই কিন্তু তিনি অধিক পরিচিত।

খুলে বেরিয়ে মেঝেতে পড়ল আর সেই দেওয়ালের ফাঁকের ভিতর দিয়ে আকাশ সুস্পষ্টভাবে উঁকি দিল। হতভম্ব হয়ে আমি তো ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলাম। ভাবলাম, একটি ঘুঁষির ঘায়ে যিনি নিরেট দেওয়াল থেকে চুনসুরকি দিয়ে পাকাপোক্ত করে গাঁথা ইঁট খসিয়ে দিতে পারেন, নিশ্চয়ই তিনি বাঘের দাঁতও খসিয়ে দিতে পারেন!

স্বামীজী বললেন, "কিছু লোকের আমার মত গায়ে জোর আছে বটে, কিন্তু মনে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস নেই। যারা শরীরে খুব মজবুত কিন্তু মনে তেমন নয়, তারা কিন্তু জঙ্গলের হিংস্র পশুর স্বাধীনভাবে উল্লম্ফন দেখামাত্রই মূর্চ্ছা যেতে পারে। স্বাভাবিক হিংস্রতা আর নিজ বাসস্থানের মধ্যে বনের বাঘের সঙ্গে আফিম খাওয়ানো সার্কাসের বাঘের আকাশপাতাল তফাৎ।

"ভীমের মত দারুণ বলশালী হওয়া সত্ত্বেও অনেক লোকই রয়েল বেঙ্গল টাইগারের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ভয়ে একেবারে কাবু হয়ে পড়েছে, এও দেখা গেছে। কারণ এইরকম বাঘই মানুষকে তার নিজের মনের ভিতরেই পোষা বিড়ালের মত ভীরু আর নিরুপায় করে তোলে। খুব সবল আর দৃঢ় শরীর আর সেই সঙ্গে অসীম মনের জোর যার ভিতর আছে, সেই উল্টে বাঘকে পোষা বিড়ালের মত আত্মরক্ষায় অসমর্থ করে ফেলতে পারে। ঠিক ঐ রকমই আমি যে কতবার করেছি, তার আর ইয়ত্তা নেই।"

আমার সামনে যে ভীমমূর্তিটি, তিনি যে বাঘকে একেবারে পোষা বিড়াল বানিয়ে ফেলতে পারেন, তাতে বিশ্বাস করতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। তাঁর এই কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীর মধ্যে কিঞ্চিৎ উপদেশেরও মিশ্রণ ছিল; আর তা চণ্ডী ও আমি সসম্ভ্রমে শুনতে লাগলাম, — "মনই আমাদের দেহের সকল পেশী চালনা করে। হাতুড়ীর আঘাত তার ওপর প্রযুক্ত শক্তির উপর নির্ভর করে। মানুষের শরীরযন্ত্রের দ্বারা যে শক্তির প্রকাশ হয়, সেটা তার আগ্রাসী ইচ্ছা আর সাহসের উপর নির্ভর করে। শরীর প্রকৃতপক্ষে মনের দ্বারাই সৃষ্ট ও পুষ্ট হয়। অতীত জীবনের সহজাত সংস্কারের প্রভাবেই শক্তি অথবা দুর্বলতা

মানুষের চেতনার উপর ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়। প্রথমতঃ তারা অভ্যাসরূপে দেখা দেয়, এবং তারপর তারা ঈপ্সিত বা অনভীপ্সিত দেহ গঠন করে। বাইরের দুর্বলতার উৎস হচ্ছে মন। বিপরীত অবস্থায়, অভ্যাসে গড়া শরীর মনের প্রতিবন্ধক হয়। মনিব যদি চাকরের কথায় চলে, তা হলে চাকরই শেষকালে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। মনও সেই রকম — শরীরের হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করে তার দাস হয়ে পড়ে।”

আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্বামীজী তাঁর নিজের জীবনের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক আর হৃদয়গ্রাহী ঘটনা থেকে কিছু ঘটনা বলতে শুরু করলেন ঃ

“ছোটবেলা থেকেই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আকাঙক্ষা ছিল বাঘের সঙ্গে লড়াই করা। আমার ইচ্ছা ছিল প্রবল, কিন্তু শরীরটা ছিল নিতান্তই দুর্বল!”

বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ বেরল মাত্র! এই ‘ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ’ লোকটিকে দেখে দুর্বলতা যে কি, বা কোনকালে তিনি তার কিছু জানতেন — সেটা অবিশ্বাস্য বলেই বোধ হল।

“স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভের চিন্তায় অদম্য অধ্যবসয়ের জোরে আমি সে অসুবিধা দূর করতে পেরেছিলাম। মনের জোরই হচ্ছে আসল জোর, আর তা দিয়েই যে রয়েল বেঙ্গল টাইগারকেও হারাতে পারা যায়, এ অত্যুক্তি করার আমার যথেষ্ট কারণ আছে।”

“পূজনীয় স্বামীজী, আপনি কি মনে করেন যে, আমিও কোনদিন বাঘের সঙ্গে লড়াই করতে পারব?” ঐ উদ্ভট চিন্তা অবশ্য সেই প্রথম আর সেই শেষবারের মতই আমার মনে উদিত হয়েছিল।

মৃদু হেসে তিনি বললেন, “নিশ্চয়ই, তবে বাঘ অনেক রকমের আছে, বুঝলে? তাদের মধ্যে কতক আবার মানুষের কামনাবাসনার জঙ্গলে ঘুরে ফিরে বেড়ায়। জঙ্গলের পশুদের ঘুঁসির ঘায়ে অজ্ঞান করে ফেলে ত’ কোন আধ্যাত্মিক লাভ হয় না। তার চেয়ে অন্তরের মধ্যে যে সব হিংস্র জন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদেরই জয় করবার চেষ্টা করো।”

"তা হলে স্বামীজী, বুনো বাঘ বশ করা থেকে, এই সন্ন্যাসের পথে কি করে এসে পড়লেন, তার কথা যদি দয়া করে শোনান!"

সোহহং স্বামী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। দূর অতীতের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ — অবচেতন থেকে যেন অতীতের ফেলে আসা দৃশ্যগুলি স্মরণ করছেন। আমার অনুরোধ রাখবেন কি না, তাই নিয়ে তাঁর মনে যে ঈষৎ তোলাপাড়া চলছিল সেটা বেশ লক্ষ্য করলাম। অবশেষে সম্মতিসূচক হেসে তিনি বলতে আরম্ভ করলেন, —

"যশের উচ্চশিখরে পৌঁছে আমার মনে একটা গর্বের উন্মাদনা এল। ঠিক করলাম, শুধু যে বাঘের সঙ্গে লড়াই করব তাই নয়, — তাদের নিয়ে নানারকম খেলাও দেখাব। আমার উচ্চাশা ছিল — বুনো জানোয়ারদের পোষমানা প্রাণীদের মত চলতে শেখান। আমি লোকেদের সামনে খুব কৃতিত্বের সঙ্গেই খেলা দেখাতে লাগলাম।

"একদিন সন্ধ্যেবেলা পিতা খুব চিন্তিত মুখে ঘরে ঢুকে বললেন ঃ 'বাছা, তোমায় গুটিকতক কথা বলে সাবধান করে দিতে চাই, — তোমার কর্মফলের দরুন ভাবী অমঙ্গলের হাত থেকে তোমায় বাঁচাতে চাই।

"জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাবা, আপনি কি অদৃষ্টবাদী? কুসংস্কারকে কি আমার শক্তিশালী কর্মস্রোত আবিল করে তুলতে দিতে হবে?'

"তিনি বললেন, 'বাবা, আমি অদৃষ্টবাদী নই; শাস্ত্রের বিধানে কর্মের প্রতিফলের ওপর আমার খুব বিশ্বাস আছে। বুনো জানোয়ারদের ভিতর তোমার ওপর যা রাগ জমে আছে, তা যদি জানতে! একদিন না একদিন তোমায় জীবনের মূল্যে তাকে পরিশোধ করতে হবে।'

বাবা, আপনি আমায় অবাক্ করলেন! আপনি ভালরকমই জানেন যে, বাঘেরা কি রকম প্রাণী — সুন্দর বটে, কিন্তু ভীষণ নির্দ্দয়। কে জানে, হয়তো বা আমার গোটাকতক ঘুঁসি তাদের মোটা মাথায় খানিকটা বুদ্ধিবিবেচনা ঢুকিয়ে দিতে পারে। ভব্যতা শেখাবার জন্যে জঙ্গলের শেষ ইস্কুলের আমিই হচ্ছি হেডমাস্টার!

"বাবা, আপনি জানবেন, আমার কাজ হচ্ছে বাঘকে মারা নয়, পোষ মানানো। আমার এই অত্যন্ত সাধুসঙ্কল্পে কি করে যে অমঙ্গল আসতে

পারে, তা আমি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না! আপনার কাছে আমার এই অনুরোধ — আমার জীবনের পথ যাতে বদলে যায়, এমন কিছু আমায় আদেশ করবেন না।"

চণ্ডী আর আমার ঐ একই রকম সঙ্কটের কথা মনে উদয় হওয়াতে কথাগুলিতে বিশেষ মনোযোগ দিলাম, কেননা ভারতবর্ষে ছেলেরা তো কখনও বাপের কথা লঘুভাবে অমান্য করে চলে না।

"একটা নীরব ঔদাসীন্যে পিতা আমার কৈফিয়ৎ শুনলেন। উপায়ান্তর না দেখে অবশেষে তিনি গম্ভীরভাবে আমায় বললেন, — 'শেষ অবধি তোমায় সব কথা খুলেই বলতে হল দেখছি। তবে শোন, কাল আমি যখন বারান্দায় যেমন ধ্যানে বসি তেমনি বসেছি, তখন এক সাধু সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই বলতে লাগলেন, 'বন্ধুবর, আপনার লড়াকু ছেলের ব্যাপারে একটা কথা বলতে এসেছি। তার এইসব হিংস্র আর বিপজ্জনক কাজগুলো এখনিই থামাতে বলুন। নইলে এর পরের বারেই বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে তাকে এমন ভয়ানক রকম জখম হতে হবে যে, মরণাপন্ন হয়ে ছ'টি মাস তাকে ভুগতে হবে। তার পরেই তার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসবে; তখন সে এসব চালচলন ছেড়েছুড়ে দিয়ে একেবারে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে!'

"এই কাহিনীতেও কিন্তু আমার মনে কোনও রেখাপাত হল না। মনে হল — পিতা এক ভ্রান্ত উন্মাদের পাল্লায় পড়ে এইসব বিশ্বাস করে বসেছেন!"

নিজের নির্বুদ্ধিতার প্রতি একটা অসহিষ্ণু ভঙ্গীমা করে সোহহং স্বামী এই স্বীকারোক্তি করলেন। অনেকক্ষণ গম্ভীরভাবে চুপ করে বসে রইলেন; বোধ হল — আমরা যে বসে রয়েছি তিনি তা একদম ভুলে গেছেন। তারপর হঠাৎ অত্যন্ত মৃদুস্বরে গল্পের ছিন্নসূত্র ধরে আবার শুরু করলেন, —

"বাবার ঐ সাবধান করে দেবার খুব অল্প কিছুদিন পরেই আমি কুচবিহার রাজ্যে গিয়েছিলাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপূর্ণ দেশটি আমার কাছে

নূতন। ওখানে বিশ্রামের সঙ্গে বেশ একটা পরিবর্তনও হবে বলে আশা করলাম। সর্বত্র যেমন, সেখানেও তেমনি কৌতূহলী মানুষ রাস্তায় বেরোলেই আমার পিছু নিত। মাঝে মাঝে এই ধরণের ফিসফিসানি আলাপের টুকরো একটু-আধটু আমার কানেও এসে পৌঁছত, —

"'এই লোকটি বুনো বাঘের সঙ্গে লড়াই করে!'

"'ও গুলো কি ওঁর পা, না গাছের গুঁড়ি?'

"'আরে, আরে, ওঁর মুখটা একবার দেখ, যেন নিজেই বাঘের রাজা!' এইসব আর কি।

"তোমরা তো জানো যে, গাঁয়ের ছেলেছোকরারা সব এক একটা খবরের কাগজ! আর এও তো জানো মেয়েদের মুখে পরবর্তী খবর কি রকম দ্রুতবেগে বাড়ী বাড়ী বিলি হয়ে যায়! ঘণ্টাকয়েকের মধ্যেই আমার উপস্থিতি শহরে একটা প্রবল সাড়া জাগিয়ে তুললো।

"সন্ধ্যেবেলায় নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছি, এমন সময় ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেলাম। শব্দটা আমার বাড়ীর সামনে এসে থামিল। পর মুহূর্তেই ঘরে এসে ঢুকল একদল লম্বা, পাগড়ীধারী পুলিশ।"

"আমি ত' অবাক হয়ে গেলাম! ভাবলাম, 'মানুষের আইনসৃষ্ট এইসব জীবের পক্ষে সবই সম্ভব! হয়তো বা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কোন বিষয়ের জন্যে বাড়ী বয়ে আমায় শাসন করতে এসেছে! দেখলাম, তা নয়। লোকগুলো বেশ বিনয়নম্র ভাব প্রকাশ করে অভিবাদন করবার পর বলল, 'হুজুর, কুচবিহারের যুবরাজের তরফ থেকে আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে এসেছি। কাল সকালে তিনি তাঁর প্রাসাদে আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন।'

"এ ব্যাপারের পরিণতি কি হতে পারে, তা নিয়ে আমি কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করলাম। কোন অনির্দ্দেশ্য কারণে আমার এই নিশ্চিন্ত ভ্রমণে বাধা পেয়ে মনে বড়ই অস্বস্তিবোধ হল। কিন্তু, পুলিশের লোকেদের কাকুতি-মিনতিতে অবশেষে যেতে রাজী হলাম।

"তার পরদিন সদর দরজায় এসে দাঁড়াল এক বিরাট চৌঘুড়ি! খুব জাঁকজমকের সঙ্গে তো আমায় তুলে নিয়ে চলল। আমি একেবারে বিহ্বল

হয়ে পড়লাম। সূর্যের প্রচণ্ড রোদ আড়াল করবার জন্যে সহিস মাথার ওপর কারুকার্যময় একটা প্রকাণ্ড ছাতা খুলে ধরল। শহর আর তার বনাকীর্ণ শহরতলীর ভিতর দিয়ে এমন নিশ্চিন্ত আরামে গাড়ী চড়ে বেড়ানটা পরম উপভোগ্য বলেই বোধ হচ্ছিল। রাজপুত্র স্বয়ং রাজপ্রাসাদের দুয়ারে আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে দণ্ডায়মান। ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাঁর নিজের সোনার কারুকার্যকরা আসনটিতে আমায় বসালেন — আর নিজে একটা সাধারণ গোছের চেয়ারেই বসলেন।

"উত্তরোত্তর বিস্ময় আমার বেড়েই চলল। ভাবলাম, 'এই সব খাতির দেখাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমায় নিশ্চয়ই কিছু একটা করতে হবে। দেখলাম রাজকুমারের মতলব দু'একটা সাধারণ কথাবার্তার পরই বেরিয়ে পড়ল। বললেন, 'সারা শহরে রটে গেছে যে, আপনি খালি হাতে জঙ্গলের বাঘের সঙ্গে লড়তে পারেন? সত্যি নাকি?'"

"বললাম, 'খুবই সত্যি।'

"'বলেন কি মশাই, আমার যে বিশ্বাসই হয় না! আপনি কোলকাতার বাঙ্গালীবাবু — শহরের লোকেদের মত সেদ্ধ চাল খেয়েই মানুষ! আচ্ছা মশাই, সত্যি করে বলুন তো দেখি, আপনি কি যত সব কোমরভাঙ্গা, আফিম-খাওয়ান, ঝিমিয়েপড়া বাঘগুলোর সঙ্গেই কেবল লড়েন, তাই না?' স্বর তাঁর কিঞ্চিৎ চড়া, আর টিট্‌কারি মেশানো — তাতে কিছু প্রাদেশিকতার টানও আছে।

"তাঁর এই রকম অপমানজনক প্রশ্নের আমি কোন উত্তরই দিলাম না।

"কিছুক্ষণ পরে আবার তিনি শুরু করলেন, — 'শুনুন মশায়, জঙ্গল থেকে একটা বাঘ সদ্য ধরা পড়েছে — নাম তার "রাজা বেগম"।* তার সঙ্গে লড়াই করতে আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি। যদি আপনি তাকে ঠেকাতে পারেন, আর তাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে সজ্ঞানে খাঁচা

* রাজা বেগম — একাধারে বাঘ ও বাঘিনীর সংযুক্ত হিংস্রতার প্রতিভূ।

থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন, তবে আপনি এই রয়েল বেঙ্গল টাইগারটিকে ত' পাবেনই, তাছাড়া হাজার কতক টাকা আর অন্যান্য পুরস্কারও পাবেন। কিন্তু তার সঙ্গে লড়াই করতে যদি আপনি আপত্তি করেন, তবে আমি সারা রাজ্যে রটিয়ে দেব যে, আপনি একজন পাকা ধাপ্পাবাজ!"

"তাঁর ঐ আস্পর্ধার কথাগুলো যেন একঝাঁক গুলির মত এসে আমার গায়ে বিঁধল। রেগে তখনিই তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। শুনে ত' তিনি উত্তেজনায় চেয়ার থেকে অর্ধেক লাফিয়ে উঠে একটু দেঁতোহাসি হেসে আবার ধপ করে বসে পড়লেন। রোম সম্রাটদের কথা মনে পড়ল — যাঁরা খ্রিস্টানদের হিংস্র জন্তুর মুখে ছেড়ে দিয়ে আনন্দ পেতেন!

"বললেন, — 'আজ থেকে এক সপ্তাহ বাদে লড়াই হবে। কিন্তু আগে থেকে আপনাকে বাঘটা দেখতে দেবার অনুমতি না দিতে পেরে আমি অত্যন্ত দুঃখিত!'

"রাজকুমার কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন যে — হয়তবা আমি বাঘটাকে সম্মোহিত করে ফেলব কিম্বা আফিমই খাওয়াব — তা জানি না!

"রাজপ্রাসাদ থেকে তারপর বেরিয়ে এলাম। দেখে মজা লাগলো যে, এবার আর আগেকার মত রাজছত্র বা চৌঘুড়ি কিছুই নেই।

"পরের সপ্তাহে আসন্ন কঠিন লড়াইয়ের জন্যে শরীর আর মন দুই নিয়মিতভাবে তৈরী করতে লাগলাম। আমার চাকরের মারফৎ নানা আজগুবি খবর সব কানে এসে পৌঁছতে লাগল। পিতার নিকট সেই সাধুটির অশুভ ভাবিষ্যদ্বাণীর কথা কোনও রকমে বাইরে প্রচার হয়ে গিয়েছিল — ক্রমশঃ তা ফুলেফেঁপে বেড়েই চলল। বহু সরল গ্রামবাসী সত্যিসত্যিই বিশ্বাস করেছিল যে, একটা দুষ্ট আত্মা ঈশ্বরের অভিশাপে বাঘের রূপ ধারণ করে জন্মেছে; সেটা রাত্রিবেলায় নানা রকম ভীষণাকার রাক্ষসের মূর্তি ধারণ করে, আর দিনেরবেলায় বাঘ সেজে থাকে। লোকের অনুমান — আমায় সায়েস্তা করবার জন্যে ঐ রাক্ষস বাঘটাকে পাঠানো হয়েছে।

"আর একটা অদ্ভুত গুজব রটে গিয়েছিল যে, বাঘেরা তাদের স্বর্গরাজ্যে কাতর প্রার্থনা জানাতে, এই 'রাজা বেগমের' আকারে তার উত্তর এসেছিল। গোটা বাঘজাতটার পক্ষে অত্যন্ত মানহানিকর, এই দু'পেয়ে মানুষের আস্পর্ধাকে শাস্তি দেবার সেটাই হবে ব্রহ্মাস্ত্র। একটা নখদন্তলোমবিহীন মানুষের এতবড় সাহস যে, নখদন্তবিশিষ্ট শক্তসমর্থ বাঘকে চ্যালেঞ্জ জানায়! গ্রামবাসীরা এমন কথাও বলল — লাঞ্ছিত বাঘেদের পুঞ্জীভূত বিষ এমনই তেজীয়ান হয়ে উঠেছে যা ঐ গূঢ় বিধিকে কার্যকরী করে তুলে বাঘ পোষ মানানো গর্বিত লোকটির পতন ডেকে আনতে পারে!

"আমার চাকরটি এসে আরও একটু খবর দিয়ে গেল — রাজকুমারটি হচ্ছেন আসলে বাঘে মানুষে লড়াইয়ের ব্যাপারে একজন উদ্যোক্তার মতো। কয়েক হাজার লোক ধরতে পারে আর ঝড়ে উড়ে না যায়, এমন একটা বেশ মজবুতগোছের মণ্ডপ তৈরী করানো শুরু হয়েছে। মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড লোহার খাঁচায় 'রাজা বেগম'কে রাখা হয়েছিল — তার বাইরের আরও খানিকটা জায়গা বেশ নিরাপদ করে ঘিরে রাখা হয়েছে। খাঁচা বন্ধ ব্যাঘ্রপ্রবর অনবরত যা গর্জন ছাড়ছিলেন, তা শুনে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়, এমনি ভীষণ! এর উপর তাকে আধপেটা খাইয়ে রাখা হত — তার হিংসার আগুনে প্রচণ্ড ক্ষুধার ইন্ধন যোগাবার জন্যে। রাজপুত্র বোধহয় 'রাজা বেগমের' জয়ের পুরস্কারস্বরূপ আমাকেই তার ভোজের ব্যবস্থা বলে ধরে নিয়ে ছিলেন!

"এদিকে হয়েছে কি, চারিদিকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল যে, বাঘে মানুষে অদ্ভুত লড়াই হবে। তাই না শুনে শহর আর তার আশেপাশের নানা অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ শহরে এসে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তামাসা দেখবার জন্যে টিকিট কিনতে লাগল। ফলে লড়াইয়ের দিনে জায়গার অভাবে শতশত লোককে ফিরে যেতে হল! অনেকে বিনা টিকিটেই তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল, কিম্বা গ্যালারির তলায় যেটুকু জায়গা ছিল, সেখানে গিয়ে ঢুকে ভিড় করে দাঁড়াল।"

সোহহং স্বামীর কাহিনী যত চূড়ান্ত পরিণতির দিকে এগোচ্ছিল, ততই আমার উত্তেজনাও বাড়ছিল। চণ্ডী ত' ভাবাবেগে কথাই বলতে পারছিল না!

"রাজা বেগমের কানফাটানো গর্জনের সঙ্গে সন্ত্রস্ত জনতার কোলাহলের মধ্যে, নীরবে এসে দাঁড়ালাম। কোমরে সামান্য কাপড় ছাড়া গায়ে আর অন্য কোন বস্ত্র ছিল না। বাইরের দিকের নিরাপদ ঘরটার খিল খুলে ভিতরে ঢুকে ধীরে ধীরে সেটাকে আমার পেছন থেকে আটকে দিলাম। 'রাজা বেগম' রক্তের গন্ধ পেল। লোহার রেলিঙের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাঘ্ররাজ ত' আমায় ভয়ঙ্করভাবে অভ্যর্থনা জানালো। নিদারুন ভয়ে দর্শকবৃন্দ একেবারে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। কারণ সেই ভীষণদর্শন ব্যাঘ্রপ্রবরের সামনে আমাকে একটি নিতান্ত নিরীহ মেষশাবকের মতই দেখাচ্ছিল!

"চোখের পলকে আমি খাঁচার ভিতর ঢুকে পড়লাম। দরজাটি বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই 'রাজা বেগম' বিদ্যুৎগতিতে আমার ওপর সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই আক্রমণ রোধ করতে গিয়ে ডান হাতটি আমার ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। নররক্ত বাঘের কাছে পরম উপাদেয় বস্তু। হাত থেকে তা ঝরঝর করে ঝরে পড়তে লাগল। সাধুটির ভবিষ্যদ্বাণী এবার বুঝি ফলে গেল!

"ঐরকম মারাত্মক আঘাতের প্রথম ধাক্কাটা তখনই সামলে নিলাম। রক্তমাখা আঙ্গুলগুলো কোমরের কাপড়ের তলায় ঢুকিয়ে তার চোখের সামনে থেকে লুকিয়ে ফেললাম। তারপর বাম হাত দিয়ে বজ্রমুষ্টিতে একটি ঘুঁসি লাগালাম। বাঘটা তাল সামলাতে না পেরে খাঁচার পিছন দিকে একটা পাক খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল। তারপর কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে সামনের দিকে আবার একটা লাফ মারল। সঙ্গে সঙ্গেই আমার দারুন মুষ্টি বৃষ্টি তার মাথার ওপর পড়তে শুরু হল।

"কিন্তু নররক্তের স্বাদ, বহুদিনের পিপাসী নেশাখোরের প্রথম মদের চুমুকের মতই 'রাজা বেগমকে' একেবারে পাগল করে তুলেছিল। মাঝে মাঝে কর্ণভেদী গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে তার আক্রমণ ক্রমশঃই ভীষণ থেকে

ভীষণতর হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু আমার একটা মাত্র হাত তার নখদন্তের আক্রমণের সামনে আমায় খানিকটা অসুবিধায় ফেলে দিয়েছিল। যাইহোক, আমিও তাকে আক্কেলগুড়ুম করা প্রতিদান দিতে থাকলাম। দু'জনেই জয়ের আশায় মরণ বাঁচন লড়াই চালাতে লাগলাম। লড়াইয়ের চোটে চারধারে রক্ত ছিটিয়ে পড়ল — বাঘটার পাশব গলার ভেতর থেকে মাঝেমাঝে যন্ত্রণার তীব্র আর্তনাদ আর তার নৃশংস বাসনায়, খাঁচাটা যেন একেবারে নরককুণ্ড হয়ে দাঁড়াল!

"দর্শকদের মাঝখান থেকে চিৎকার উঠল, 'গুলি কর, গুলি কর, বাঘটাকে মেরে ফেল, সাবাড় করে দাও!' বাঘেমানুষে লড়াই এত দ্রুতগতিতে চলছিল যে, সেখানকার রক্ষীদের রাইফেলের গুলি পর্যন্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল! স্থিরভাবে এবার আমি আমার সকল ইচ্ছাশক্তি একত্রে সংযুক্ত করে ভীষণ চিৎকারের সঙ্গে তাকে একটা প্রচণ্ড ঘুঁসি মারলাম। বাঘটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে শুয়ে পড়ল।"

আমি মাঝপথে বলে উঠলাম, "ঠিক মেনিবেড়ালের মত আর কি!" স্বামীজী পরম আপ্যায়িত হয়ে প্রাণ খুলে হাসলেন, তারপর আবার কৌতূহলোদ্দীপক গল্পটি শুরু করলেন ঃ

"যাক, — শেষ অবধি ত' 'রাজা বেগম' পরাজিত হলো। তার রাজগর্ব একেবারে চূর্ণ হয়ে গেল। ক্ষতবিক্ষত হাত নিয়ে সদর্পে তার চোয়ালটা ফাঁক করে ধরে নাটকীয় ভঙ্গীতে আমি মুহূর্তেকের জন্যে সেই হাঁ-করা মরণ ফাঁদের মধ্যে মাথাটা গলিয়ে দিলাম — তারপর একটা শিকলের জন্যে চারদিকে চাইলাম। মেঝের ওপরে ছিল একগোছা শেকল! তার ভিতর থেকে একটা শিকল টেনে নিয়ে বাঘটার গলা খাঁচার ডাণ্ডার সঙ্গে বেশ করে বেঁধে ফেললাম। তারপর বিজয়গর্বে দরজার দিকে অগ্রসর হলাম।

"কিন্তু জীবন্ত শয়তান সেই 'রাজা বেগমের' কল্পিত রাক্ষসজন্মের মতই দারুন সহ্যশক্তি ছিল। একটা বিরাট ঝটকা মেরে সে শিকলটা ছিঁড়ে ফেলে আমার পিঠের ওপর আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমার কাঁধটা প্রচণ্ড জোরে কামড়ে ধরতেই, আমি হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়ে গেলাম।

কিন্তু পলকের মধ্যে আমিও তাকে উল্টে ফেলে আমার পায়ের তলায় চেপে ধরলাম। নিদারুণ ঘুঁসির চোটে সেই বিশ্বাসঘাতক জানোয়ারটা এবার অর্ধচেতন অবস্থায় এলিয়ে পড়ল। এবার কিন্তু আমি তাকে আরও সাবধানে খুব শক্ত করে বেঁধে ফেললাম। তারপর আস্তে আস্তে খাঁচা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

"এইবার কিন্তু একটা নতুন চিৎকার শোনা গেল — সেটা প্রচণ্ড উল্লাসের। মনে হলো, জনতার সেই প্রবল উল্লাস যেন কোন এক দৈত্যাকৃতি গলা থেকে বেরিয়ে আসছে। দারুণভাবে ক্ষতবিক্ষত হলেও আমি কিন্তু লড়াইয়ের তিনটি শর্তই পূরণ করেছিলাম ঃ এক — বাঘটাকে অজ্ঞান করে ফেলা, দুই — তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা, আর তিন — কারোর সাহায্য ছাড়াই একলা বেরিয়ে আসা। উপরন্তু আমি সেই জানোয়ারটাকে এমন দারুন ঠেঙিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে, ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম যে, সে তার মুখের মধ্যে আমার মাথাটি পাওয়ার সুযোগটাও উপেক্ষা করে স্থির হয়ে পড়েছিল।

"আমার ক্ষতগুলোর প্রাথমিক চিকিৎসার পর, আমায় মালা পরিয়ে সম্মানিত করা হল। বহু সোনার মোহর আমার পায়ের কাছে বৃষ্টির মত এসে পড়তে লাগল। সারা শহরে তখন উৎসবের জোয়ার। সব চেয়ে বড় আর সব চেয়ে ভীষণ বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে আমারই যে জিত হয়েছে, তা নিয়ে চারিদিকে অফুরন্ত আলোচনা চলছে শোনা গেল। প্রতিজ্ঞামত 'রাজা বেগম'কে আমায় উপহার দেওয়া হল বটে, কিন্তু তাতে আমার মনে কোন আনন্দ হল না। ভেতরে তখন কি রকম একটা আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। মনে হল, খাঁচা থেকে আমার এই শেষবারের মত বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল পার্থিব উচ্চাশা আর আকাঙ্ক্ষার দরজাও যেন চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে এলাম!

"তারপর এল দুঃখের দিন! রক্তদুষ্টির জন্যে ছ'মাস ধরে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকতে হলো। কুচবিহার ত্যাগ করার মত অবস্থা একটু ভাল হতেই নিজের দেশে ফিরে এলাম।

"পিতার কাছে গিয়ে সবিনয়ে নিবেদন করলাম, 'যে পুণ্যাত্মা সাধুটি আমায় সতর্ক করে দিয়েছিলেন, এখন বুঝছি যে, তিনিই আমার গুরু। আহা, আজ যদি তাঁর দর্শন পেতাম!' আমার প্রার্থনা যে খুবই আন্তরিক ছিল তার প্রমাণ হাতে হাতেই পেয়ে গেলাম, কারণ অতি শীঘ্র তিনি একদিন বিনা আহ্বানেই আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন।

"অতি স্নিগ্ধ মধুর আশ্বাস দিয়ে তিনি বললেন, 'বাঘকে পোষ মানানো ত' যথেষ্ট হয়েছে! এখন আমার সঙ্গে এস; মানুষের মনের জঙ্গলে অজ্ঞানতা ও অবিদ্যার যে সব পশুর দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কি করে দমন করতে হয়, তা আমি তোমায় শিখিয়ে দেব। এ জগতে ত' প্রচুর দর্শক-ভিড়ে তুমি অভ্যস্ত; এবার তোমার অদ্ভুত যৌগ কৌশল দেখে স্বর্গবাসীরাও তেমনি উল্লসিত হোক, কি বল?'

"তারপর সেই গুরু-মহাত্মার কাছে আমি আধ্যাত্মিক পথে দীক্ষালাভ করলাম। আমার বহুদিনের অব্যবহৃত মরচেধরা আত্মার সিংহদ্বার তিনি নিজহস্তে উন্মুক্ত করে দিলেন! তারপর গুরুশিষ্য দুজনে হাত ধরাধরি করে সাধনার জন্যে শীগগিরই হিমালয়ের পথে বেরিয়ে পড়লাম।"

চণ্ডী আর আমি তাঁর এইরকম বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিচিত্র জীবনের অপরূপ কাহিনী শুনে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর চরণে প্রণত হলাম। যাইহোক, সুশীতল বৈঠকখানার ভিতরে, আগ্রহে বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পুরস্কার তখন প্রচুরভাবে পেয়ে গেছি বলেই মনে হল!

৭ম পরিচ্ছেদ

লঘিমাসিদ্ধ সাধু

বন্ধুবর উপেন্দ্রমোহন চৌধুরী বেশ গম্ভীরভাবে একদিন বলল, "জান, কাল রাত্তিরে এক ধর্মসভায় গিয়েছিলাম। দেখি, এক যোগী মাটি থেকে কয়েকফুট উঁচুতে শূন্যে অবস্থান করছেন!"

উৎসাহব্যঞ্জক হাসির সঙ্গে বললাম, "বোধহয় আমি তাঁর নাম আন্দাজ করতে পারি। আচ্ছা, তিনি কি আপার সার্কুলার রোডের ভাদুড়ী মশাই?"

উপেন্দ্র নতুন খবর আমদানি করার কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয়েই সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। সাধুসন্ন্যাসীদের ব্যাপারে আমার কৌতূহল বন্ধুবান্ধবদের বেশ ভালভাবেই জানা ছিল; কাজেই নতুন কোন সাধুর সন্ধান পেয়ে আমাকে তা জানাতে পারলে তাদের খুব আনন্দই হত।

বললাম, "উনি আমাদের বাড়ীর খুব কাছেই থাকেন; তাই প্রায়ই আমি ওঁকে দেখতে যাই।" কথাটা শুনে উপেন্দ্রের মুখে বেশ একটা গভীর আগ্রহ ফুটে উঠল দেখে আমি বলতে শুরু করলাম ঃ

"আমি তাঁর অনেক অদ্ভুত সব ক্রিয়াকলাপ দেখেছি। পতঞ্জলির* অষ্টাঙ্গ যোগের মধ্যে প্রাণায়ামের† বিভিন্ন প্রণালী তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে আয়ত্ত করেছেন। একবার তিনি আমার সামনে 'ভস্ত্রিকা প্রাণায়াম' এমন অত্যাশ্চর্য জোরের সঙ্গে করে দেখালেন যে, মনে হল বুঝি ঘরের মধ্যে সত্যিসত্যিই একটা প্রবল ঝড় উঠেছে। তারপর তিনি ঝোড়ো নিঃশ্বাস থামিয়ে উচ্চকোটির অতিমানস চেতনায়‡ নিমগ্ন হয়ে গিয়ে একেবারে

---

* অগ্রণী প্রাচীন যোগব্যাখ্যাতা।

† শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রাণশক্তির সংযমন। 'ভস্ত্রিকা' প্রাণায়ামে মন স্থির হয়।

‡ ১৯২৮ সালে সোরবনের অধ্যাপক জুলে বোয়া বলেছিলেন যে ফরাসী মনোবিদ্‌গণ গবেষণার পর অতিমানস চেতনার বিষয় স্বীকার করেছেন, যা তার পরিপূর্ণ মহিমায় হচ্ছে, "ফ্রয়েডের

নিস্পন্দ হয়ে পড়লেন। ঝড়ের পর শান্তির স্বর্গীয় জ্যোতিঃর ছটা যা তাঁর মুখে দেখা গেল, তা ভোলবার নয়।”

“শুনেছি, সাধুটি নাকি বাড়ী থেকে কোথাও বড় একটা বেরোন না?” উপেন্দ্রের স্বরে যেন ঈষৎ সন্দিগ্ধের ছোঁয়া।

“সত্যিই তাই! তিনি আজ কুড়ি বছর ধরে বাড়ীর মধ্যেই আছেন। পালপার্বণের সময়েই কেবল তাঁর এ নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটে — সে’ সময় হয়তবা সামনের ফুটপাথে একটু বেড়ালেন, এই যা! তাঁকে দেখলেই ভিখিরির দল ছুটে আসে, কারণ ভাদুড়ী মশায়ের দয়ার কথা সকলেরই সুবিদিত।”

“আচ্ছা, প্রবল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এড়িয়ে কি করে তিনি শূন্যে ভাসমান থাকেন?”

“কতকগুলো প্রাণায়াম প্রক্রিয়া অনুশীলনের পর যোগীদের শরীরের ভর একেবারে কমে যায়; তাতে করে দেহ শূন্যে ভেসে থাকতে অথবা ব্যাঙের মত লাফিয়ে চলতে পারে। এমন কি সেইসব সাধুসন্ন্যাসীরা, যাঁরা যোগপ্রণালীর কোন বিশেষ সাধনা আদৌ অভ্যাস করেন না, জানা গেছে যে ঈশ্বরের গভীর ধ্যানের সময় তাঁদেরও দেহ এমনিতর ভাসতে দেখা যায়।”

“তা হলে তো, এঁর সম্বন্ধে আরও কিছু জানা দরকার দেখছি। আচ্ছা, তুমি কি রোজই তাঁর সান্ধ্য সভায় যাও নাকি?” উপেন্দ্রের চোখ দু’টি কৌতূহলে জ্বলজ্বল করে উঠল।

[illegible] সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা, তার বৃত্তিগুলি মানবকে প্রকৃতই মানব করে তোলে, কোন অতি উন্নত জীবজন্তু নয়।” ফরাসী পণ্ডিতটি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে উচ্চতর চেতনার উন্মেষের সঙ্গে “ক্যুয়িজম্” অথবা সম্মোহণকে মিশিয়ে ফেলা উচিত নয়। তাত্ত্বিকভাবে অতিমানস চেতনার অস্তিত্ব বহু দিন ধরেই স্বীকৃত হয়েছে: বস্তুতঃ যা হচ্ছে ইমার্সন কথিত পরমাত্মা — তা সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃতও হয়েছে।”

“দি ওভারসোল”-এ ইমার্সন লিখেছেন; মানুষ হচ্ছে মন্দিরের সিংহদ্বার, যেখানে সব জ্ঞান, সকল শুভ অবস্থিত। সাধারণভাবে আমরা যাকে মানুষ বলি, অর্থাৎ পানভোজনরত, জীবনে প্রতিষ্ঠিত কাজের মানুষ, যেরূপে তাকে জানি, সেভাবে নিজেকে সে প্রকাশ করতে পারে না, বরং নিজেকে ভুলভাবেই প্রকাশ করে। তাকে আমরা সম্মান প্রদর্শন করি না; কিন্তু আত্মা, যার সে যন্ত্র, যাকে তার কর্মের ভিতর দিয়েই সে প্রকাশ করে, তার কাছেই আমাদের নতজানু হতে হয় ... ঈশ্বরের সকল গুণ, আধ্যাত্মিক প্রকৃতির গভীরতার দিকে আমাদের একটা পাল্লা সর্বদাই উন্মুক্ত।”

"হ্যাঁ, প্রায়ই আমি সেখানে যাই। তাঁর জ্ঞানোপদেশের সরসতা আমায় ভারি তৃপ্তি আর আনন্দ দেয়। মুশকিল হলো এই যে, মাঝে মাঝে আমার উচ্চৈঃস্বরে হাসি সভার গাম্ভীর্য নষ্ট করে ফেলে। তাতে সাধু বিরক্ত হন না বটে, কিন্তু ওঁর শিষ্যরা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে।"

সেদিন বিকালে স্কুল থেকে বাড়ী ফেরবার সময় ভাদুড়ী মশায়ের আশ্রমের পাশ দিয়ে আসতে আসতে একবার তাঁকে দর্শন করে আসব বলে মনস্থ করলাম। সাধারণ লোকেদের সেখানে প্রবেশলাভ দুরূহ। জনৈক শিষ্য কেবল এক তলায় থেকে গুরুর নির্জনতা যাতে ভঙ্গ না হয়, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখে। শিষ্যটি দারুণ কড়া, সহজে কাউকে তাঁর কাছে ঘেঁসতে দেয় না। জিজ্ঞাসা করলেন : দেখা করার কোন কথা আগে থেকে ঠিক করা আছে কিনা। তাঁর গুরুদেব সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সময়ে এসে পড়ে আমায় পত্রপাঠ বিদায়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

ভাদুড়ী মশাই চোখদু'টি মিট মিট করে বললেন, "মুকুন্দর যখনই ইচ্ছে হবে, তখনই আসবে। আমার নির্জনে থাকবার ব্যবস্থা আমার নিজের আরামের জন্যে নয়, বাইরের লোকেদের জন্যে, বুঝলে? সংসারী লোক সরলতা চায় না, তাতে করে তাদের মোহ ভঙ্গ হয়! সাধুরা যে কেবল বিরল তাই নয়, দুর্বোধ্যও বটে। শাস্ত্রেও তাঁদের চালচলন একটু খাপছাড়া ধরণেরই বলে মনে হয়।"

আমি ভাদুড়ী মশায়ের সঙ্গে উপরতলায় তাঁর অত্যন্ত সাদাসিধে আস্তানায় গিয়ে পৌঁছলাম। সেখান থেকে কদাচিৎ তিনি কোথাও যেতেন। সাধারণ পার্থিব সুখদুঃখের মিছিল সাধুসন্তরা প্রায়ই উপেক্ষা করে চলেন। এসব তাঁদের দৃষ্টির বাইরেই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা যুগসিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। সাধু-ঋষিগণের যারা সমসাময়িক, তারা এই সঙ্কীর্ণ বর্তমানেতে সীমাবদ্ধ নন।

বললাম, "মহর্ষি, আমার পরিচিত যোগীঋষিদের মধ্যে একমাত্র আপনাকেই দেখলাম, যিনি সর্বদাই গৃহান্তরালে থাকেন।"

"ভগবান সময় সময় সাধুসন্ন্যাসীদের একেবারে ভারি অপ্রত্যাশিত স্থানে এনে ফেলেন, যাতে না আমরা ভেবে বসি যে, তিনি একটা বাঁধা নিয়মের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নন!"

ভাদুড়ী মহাশয় তাঁর তেজোদীপ্ত দেহটিকে পদ্মাসনে আবদ্ধ করলেন। সত্তর বছর বয়সেও বার্ধক্যজনিত অথবা তাঁর স্থির শান্ত জীবনের অপ্রীতিকর কোন চিহ্নই দেখতে পেলাম না। বলিষ্ঠ ঋজু শরীর — ভাদুড়ী মশায় সকল বিষয়েই আদর্শস্থানীয়। শাস্ত্রবর্ণিত প্রাচীন মুনিঋষিদের মতই তাঁর প্রসন্ন আনন। জ্ঞানোন্নত শ্বশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডলী — তিনি সর্বদা ঋজুভঙ্গীমায় উপবেশন করেন — দৃষ্টি তাঁর ঈশ্বরে নিবদ্ধ।

আমরা দু'জনে ধ্যানে বসলাম। ঘণ্টাখানেক পরে তাঁর মধুর শান্তস্বরে আমার ধ্যান ভঙ্গ হলো।

ধ্যানের চেয়ে ভগবানকে আরও বেশি করে ভালবাসতে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে বললেন, "প্রায়ই ত' নীরবে ধ্যানে বস, কিন্তু কোন কিছু 'অনুভব'* লাভ তোমার হয়েছে কি? প্রক্রিয়াকে উদ্দীষ্ট বলে ভুল কোরো না।"

ধ্যান শেষ হবার পর তিনি কয়েকটি আম আমায় খেতে দিলেন। গম্ভীর প্রকৃতির মধ্যেও কিন্তু তাঁর সরস মনের পরিচয় আমাকে আনন্দিত করে। "সাধারণ লোকেরা 'ধ্যানযোগে'র চেয়ে 'জলযোগে'র কথাটাই বেশি বোঝে, বুঝলে!" তাঁর এই 'যৌগিক' রসিকতা আমায় হাসিতে উচ্ছ্বসিত করে তুলল।

বললেন, "বাবাঃ, তোমার কি হাসি!" তাঁর দৃষ্টিতে সকৌতুক স্নেহের দীপ্তি। তাঁর নিজের মুখ কিন্তু সদাই গম্ভীর, অথচ তাতে একটি স্বর্গীয় হাসির স্পর্শ রয়েছে। তাঁর দু'টি পদ্মলোচন, অন্তর্গূঢ় দিব্যহাসিতে উজ্জ্বল।

টেবিলের উপর রাখা কতকগুলো মোটা খাম দেখিয়ে তিনি বললেন, "সুদূর আমেরিকা থেকে এই চিঠিগুলো এসেছে। সেখানকার কিছু

---

* প্রকৃত ঈশ্বর দর্শন।

সভাসমিতির সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলে। দেখছি তাদের সভ্যদের যোগ সম্বন্ধে খুবহ আগ্রহ। কলম্বাসের চেয়েও তাদের দিঙ্‌নির্ণয়ের জ্ঞান সূক্ষ্ম; এরা ভারতবর্ষকে নতুন করে আবার আবিষ্কার করছে। আমি তাদের এ বিষয়ে সাহায্য করে খুব খুশী। দিনের আলোর মত যোগের জ্ঞান যে চায়, তার কাছেই তা বিনামূল্যে অবারিত।

"মানুষের মুক্তির জন্যে মুনিঋষিরা যা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে বোধ করেছিলেন, সেটা প্রতীচ্যের লোকেদের জন্যে হাল্কা করে দিয়ে আর কাজ নেই। আত্মায় এক, কিন্তু বাইরের অভিজ্ঞতায় ভিন্ন হলেও কি পশ্চিম, কি পূর্ব, কেউই কিছু উন্নতি করতে পারবে না, যদি না বিধি নিয়মানুযায়ী যোগ অভ্যাস করা যায়।"

সাধু মহাশয় তাঁর শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি তখন বুঝতেই পারিনি যে, এইসব কথাগুলোর মধ্যে আমার ভবিষ্যতের এক গূঢ় ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। আজ এই কথা লিখতে বসে বুঝতে পারছি যে, সময় সময় আমায় তিনি যে সব ইঙ্গিত করতেন, তার পরিষ্কার মানে এই ছিল যে, হয়ত কোনদিনবা আমাকে ভারতের শিক্ষাবলী আমেরিকায় বহন করে নিয়ে যেতে হবে।

"মহর্ষি, আমার বড্ড ইচ্ছে যে, আপনি জগতের উপকারের জন্যে যোগ সম্বন্ধে একটা বইটই কিছু লেখেন।"

তিনি বললেন, "আমি শিষ্যদের সব তৈরী করছি। তারা আর তাদের শিষ্যেরাই হবে সব এক একটা জীবন্ত পুস্তক। তারা হবে কালের স্বাভাবিক ক্ষয় অথবা সমালোচকদের অস্বাভাবিক সমালোচনাজনিত ক্ষতির ঊর্ধ্বে।"

সন্ধ্যায় তাঁর শিষ্যরা না আসা পর্যন্ত আমি একলা তাঁর সঙ্গে বসে রইলাম। ভাদুড়ী মহাশয় তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গীতে তত্ত্বকথা শুরু করলেন। শান্তির প্লাবনে তিনি শ্রোতৃবৃন্দের মানসিক জঞ্জাল সব ধুয়ে মুছে দিয়ে যেন তাদের ভগবানের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে চললেন। রূপকচ্ছলে নীতিকথা তিনি বেশ নির্ভুল বাংলায় বলতেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ভাদুড়ী মহাশয় মীরাবাঈয়ের জীবনসংক্রান্ত বিবিধ দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করছিলেন। মধ্যযুগের রাজকুমারী মীরাবাঈ ছিলেন একজন রাজপুতানী, যিনি সাধুসঙ্গলাভের কামনায় রাজকীয় জীবন পর্যন্তও ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন। একজন খুব বড় সাধু, সনাতন গোস্বামী, তাঁকে স্ত্রীলোক বলে দর্শন দিতে অস্বীকার করায় তিনি বলেছিলেন, — "তোমার গুরুজীকে বোলো যে, এক ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ যে পুরুষ আছেন, তা আমি জানি না। তাঁর কাছে আমরা কি সবাই নারী (মায়া বা প্রকৃতি) নই?" শাস্ত্রে ঈশ্বর একমাত্র সদর্থক সৃজন তত্ত্বরূপে বর্ণিত হয়েছেন; তাঁর সৃষ্ট সত্তা অক্রিয় 'মায়া' ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ উত্তর শুনে সাধু মীরাবাঈয়ের চরণাশ্রয় করেন।

মীরাবাঈ বহু ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত রচনা করে গেছেন, — সে সব ভারতের সর্বত্র সাদরে গীত হয়ে থাকে। এখানে তারই একটি উদ্ধৃত হ'ল, —

নিত নহানে সে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই,
ফলমূল খাকে হরি মিলে তো বাদুড় বান্দরাই।
তুলসী পূজন্‌সে হরি মিলে তো মেঁ পূঁজু তুলসী ঝাড়,
পত্থর পূজন্‌সে হরি মিলে তো মেঁ পূঁজু পহাড়।।
তৃণ ভখন্‌সে হরি মিলে তো বহুত মৃগী অজা,
স্ত্রী ছোড়ন্‌সে হরি মিলে তো বহুত রহে হৈ খোজা।।
দুধ পিনেসে হরি মিলে তো বহুত বৎস বালা,
মীরা কহে, বিনা প্রেমসে ন মিলে নন্দলালা।।

ভাদুড়ী মহাশয় যেখানে যোগাসনে বসেছিলেন, সেখানে তাঁর পাদুকার কাছে কয়েকজন শিষ্য কিছু প্রণামী রাখলেন। ভারতে প্রচলিত এইরূপ শ্রদ্ধানিবেদনের অর্থ এই যে, শিষ্য তার পার্থিব সকল সম্পদ গুরুপদতলে সমর্পণ করলেন। কৃতজ্ঞ বন্ধুরা ভগবানেরই ছদ্মরূপে নিজ সন্তানদের দেখাশোনা করেন।

পিতৃপ্রতিম সেই মহর্ষির নিকট হতে বিদায় নিতে গিয়ে, একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে তাঁর এক শিষ্য উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলেন, "গুরুদেব,

আপনার তুলনা পাওয়া ভার! ভগবানের খোঁজে আপনি ঐশ্বর্য, নিজের সুখ, সব ত্যাগ করে এসে আজ আমাদের জ্ঞান বিলোচ্ছেন, সত্যিই অদ্ভুত!" সকলেই জানত যে, একান্ত মনে যোগমার্গ অবলম্বন করবার জন্য ভাদুড়ী মহাশয় বাল্যকাল থেকেই তাঁদের বংশের বিরাট ঐশ্বর্য অতি অবহেলায় ত্যাগ করে চলে এসেছেন।

সাধুপ্রবর মৃদু ভর্ৎসনার সঙ্গে বললেন, "তুমি ঠিক উল্টো কথা বলছ বাপু। আমি সামান্য গোটাকতক টাকা আর তুচ্ছ কয়েকটা সংসারসুখ ত্যাগ করে চলে এসেছি বটে, কিন্তু তার বদলে কি পেয়েছি জান — অপার ভূমানন্দের অনন্ত সাম্রাজ্য! তা হলে কি করে আমি সব ত্যাগ করলাম, বল? সম্পদ বিলিয়ে দেবার আনন্দ আমি জানি। সেটাকে কি ত্যাগ করা বলে? অদূরদর্শী সাংসারিক লোকেরাই বরং ত্যাগী। কারণ তারা সামান্য গোটাকতক সংসারের খেলনার লোভে তাদের অতুলনীয় দিব্য ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বসে থাকে!"

ত্যাগের এই স্ববিরোধী ব্যাখ্যা শুনে আমি হাসতে লাগলাম। এ ব্যাখ্যার জোরে সাধুভিখারীরা কুবেরের ঐশ্বর্য পায় আর ধনগর্বী কোটিপতিরা সব নিজেদের অজ্ঞাতসারে শহীদ হয়ে যায়।

তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "জানলে, ঈশ্বরের বিধানে, আমাদের ভবিষ্যতের জন্যে যে কোন বীমা কোম্পানীর চেয়ে বেশ ভালভাবেই ব্যবস্থা করা আছে।" সাধক শ্রেষ্ঠের এই কথাগুলি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ উপলব্ধিজাত সত্য। "বাহ্য নিরাপত্তার ওপর বিশ্বাস করে সংসারী লোক অনিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে বসে থাকে। তাদের ক্লিষ্ট চিন্তাসকল তাদের কপালে কাটা দাগেরই মত ফুটে আছে। যিনি আমাদের প্রথম নিঃশ্বাস নেবার সঙ্গে সঙ্গেই বায়ু, মাতৃদুগ্ধ প্রভৃতির ব্যবস্থা করে রেখেছেন — তিনি তাঁর ভক্তদের দিনের পর দিন কি করে রক্ষে করতে হয়, সে ব্যবস্থাও জানেন বই কি।"

স্কুলের ছুটির পর সেই সাধুর কাছে আমার রোজ যাতায়াত চলতে লাগল। নীরব উৎসাহ তিনি আমায় প্রত্যক্ষ 'অনুভব' লাভে সাহায্য করতেন। একদিন তিনি আমাদের বসতবাড়ী থেকে কিছুটা দূরে

রামমোহন রায় রোডে উঠে গেলেন। তাঁর ভক্তশিষ্যগণ সেখানে "নগেন্দ্র মঠ"* নামে একটি নূতন আশ্রম স্থাপনা করেছেন।

যদিও এটা আমার এই কাহিনীর কয়েক বছর পরের কথা, তবুও ভাদুড়ী মশায়ের শেষ কথাগুলো এখানে একবার উল্লেখ করব। পশ্চিমে যাবার অব্যবহিত পূর্বে আমি তাঁর কাছে বিদায় আশীর্বাদ নেবার জন্যে নতজানু হয়ে বসতেই তিনি বললেন, "বাবা, আমেরিকায় যাও; ভারতের প্রাচীন গৌরবই হোক তোমার বিজয়বর্ম। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমার কপালে বিজয়তিলক। দেশ-বিদেশের মনীষীরা তোমায় সাদরে বরণ করে নেবেন, তা দেখে নিও!"

---

* তাঁর পুরো নাম ছিল নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী।

খ্রীস্টীয় জগতের লঘিমাসিদ্ধ সাধুগণের অন্যতম ছিলেন ১৭শ শতাব্দীর কুপেরতিনো নিবাসী সেন্ট জোসেফ। তাঁর কৃতিত্ব বহু প্রত্যক্ষদর্শীর দ্বারা স্বীকৃত। সেন্ট জোসেফের মধ্যে একপ্রকার জাগতিক অন্যমনস্কতা দেখা যেতো যা ছিল আসলে দিব্য স্মৃতিমাত্র। তাঁর সঙ্গী মঠবাসীগণ কখনও সাধারণ ভোজনস্থলে তাঁকে পরিবেশন করতে দিতেন না; তাহলে তিনি সকল ভোজ্যের থালাদি সমেত শূন্যে উত্থিত হতেন। ভূপৃষ্ঠে একসঙ্গে দীর্ঘসময় থাকার অক্ষমতাহেতু তিনি কোন জাগতিক কর্তব্য সাধনের অনুপযোগী ছিলেন। কোনও পবিত্রমূর্তির দর্শন সেন্ট জোসেফের উৎক্রমণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। হঠাৎ দেখা যেত দু'জন মহাত্মা — একজন প্রস্তর মূর্তিরূপে আর একজন রক্তমাংসের দেহে, পরস্পর সংলগ্ন হয়ে উর্দ্ধ বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করছেন।

আধ্যাত্মিক উন্নতিপ্রাপ্তা আবিলার সেন্ট তেরেসা শারীরিক উর্দ্ধগতির জন্য বড়ই বিব্রত বোধ করতেন। প্রতিষ্ঠানের গুরু কর্ম্মভার তাঁর উপর ন্যস্ত থাকায় তিনি শারীরিক উর্দ্ধগতি রোধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন — কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। তিনি লিখেছেন, "প্রভু যখন অন্যরূপ ইচ্ছা করেন, তখন তুচ্ছ প্রতিরোধ চেষ্টা নিষ্ফলই হয়।" স্পেনের আল্‌বা নামক স্থানের গীর্জায় রক্ষিত সেন্ট তেরেসার দেহ দীর্ঘ চার শতাব্দী যাবৎ পুষ্পের অলৌকিক সৌরভ সহ অবিকৃত অবস্থা প্রকট করে আসছে। ঐ স্থানটি বহু অলৌকিক ঘটনারও সাক্ষ্য বহন করছে।

৮ম পরিচ্ছেদ

ভারতের মহান বৈজ্ঞানিক — জগদীশচন্দ্র বসু

"জগদীশ চন্দ্র বসুর বেতার আবিষ্কার মার্কনির আগে হয়েছিল।"

এই চাঞ্চল্যকর উক্তি শুনে একটু এগিয়ে দেখলাম যে, ফুটপাথের উপর কয়েকজন অধ্যাপক বৈজ্ঞানিক বিষয়ে আলোচনা করছেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় যোগদানের অভিপ্রায় যদি আমার জাতীয় গর্বপ্রণোদিত হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্য আমি দুঃখিত! ভারত যে কেবল দর্শনশাস্ত্রেই নয়, পদার্থবিদ্যাতেও অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে — এমন প্রমাণ আমাকে খুবই আগ্রহী করে তোলে।

জিজ্ঞাসা করে বসলাম, "তার মানে কি, মশায়?"

অধ্যাপকটি অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। "বসু মহাশয়ই সর্বপ্রথম বেতারতরঙ্গ গ্রহণ যন্ত্র এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রতিসরণ নির্দেশক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কিন্তু আমাদের এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকটি তাঁর আবিষ্কার ব্যবসায়ে অর্থোপার্জনের কাজে লাগান নি। সত্বর তিনি অজৈব হতে জৈব জগতে তাঁর মনোযোগ নিবেশিত করেন। উদ্ভিদ-শারীরতত্ত্ববিদ্ হিসাবে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার, এমন কি পদার্থবিদ্ হিসাবে তাঁর মৌলিক গবেষণাকেও ছাড়িয়ে গেছে।"

অধ্যাপক মশায়কে তাঁর ব্যাখ্যার জন্য বিনীত ধন্যবাদ দিতে তিনি বললেন, "মহান বৈজ্ঞানিক প্রেসিডেন্সী কলেজে আমারই এক সহকর্মী-অধ্যাপক।"

তার পরদিনই আমি সেই ঋষিপুরুষ জগদীশচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। আমাদের গড়পার রোডের বাড়ীর কাছেই তাঁর বাড়ী। দূর থেকেই বরাবর আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করে আসছি। গম্ভীর, প্রশান্ত,

সৌম্যমূর্তি বসু মহাশয় আমায় সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। পঞ্চাশের কোঠায় তাঁর বয়স; সুন্দর সুঠাম দেহ, ঘন চুল, প্রশস্ত কপাল — চোখ দু'টিতে স্বপ্নদ্রষ্টার আবেশময় দৃষ্টি। সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর তাঁর জীবনব্যাপী বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিরই পরিচায়ক।

জগদীশ চন্দ্র বললেন ঃ "আমি সম্প্রতি পশ্চিমের বিজ্ঞান সভাগুলিতে যোগদান করে ফিরছি। সকল জীবজগতে এক অবিভাজ্য অখণ্ড প্রাণের ঐক্য প্রদর্শক আমার আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলির বিষয়ে সেখানকার সভ্যগণ প্রভূত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।* জগদীশ বসুর আবিষ্কৃত ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র বস্তুকে এক কোটি গুণ বড় করে দেখাতে পারে। অনুবীক্ষণযন্ত্রে কেবলমাত্র কয়েক হাজার গুণ বড় দেখায়। তাইতেই এ জীববিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ প্রেষণা এনে দিয়েছে। ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র নানাদিকে অগণিত পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে।"

বললাম, "আপনি মশায় বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক হাত দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের দ্রুত মিলন ঘটাতে যথেষ্টই সাহায্য করেছেন।"

বসু মহাশয় শুরু করলেন, "কেম্ব্রিজে আমার পড়াশোনা। পশ্চিমে যেভাবে তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষামূলক সত্যনির্ধারণ করা হয় তা অতীব প্রশংসনীয়! এইরকম পরীক্ষামূলক পদ্ধতি আর সেইসঙ্গে অন্তর্দৃষ্টি, পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর এটাই আমার প্রাচ্যের উত্তরাধিকার! মূক জড়প্রকৃতির মৌন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করতে আজ তারাই একসঙ্গে আমায় সাহায্য করেছে। আমার ক্রেস্কোগ্রাফের† স্বতঃপ্রকাশ লিপিগুলো এমনকি দারুণ সন্দেহবাদীদের কাছেও প্রমাণ করে দিয়েছে যে, উদ্ভিদেরও সংবেদনশীল স্নায়ুব্যবস্থা ও বিচিত্র ভাবাবেগময় জীবন আছে। প্রাণীজগৎ যেমন প্রেম, ঘৃণা, আনন্দ, ভয়, সুখ, বেদনা, উত্তেজনা প্রভৃতিতে সাড়া দেয়, উদ্ভিদজগতও সেইভাবে সাড়া দিয়ে থাকে।"

---

* "সব বিজ্ঞানই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানময়; তা না হলে তার অস্তিত্ব থাকে না। উদ্ভিদবিদ্যাও যথার্থ মত এখন গ্রহণ করছে — ব্রহ্মের অবতারগণও সত্বর প্রাকৃত ইতিবৃত্তের পাঠ্যপুস্তকরূপে দেখা যাবে।" — এমার্সন।

† ল্যাটিন শব্দ ক্রেসিকের (Crescere) বা বৃদ্ধি থেকে জাত। ক্রেস্কোগ্রাফ ও তাঁর অন্যান্য আবিষ্কারের জন্য জগদীশচন্দ্র ১৯১৭ সালে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন।

"অধ্যাপক মশায়, এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে যে অপূর্ব প্রাণস্পন্দন, আপনার আগমনের পূর্বে তা কেবল কবিকল্পনার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। আমি এক সাধুকে জানতাম, যিনি কখনও ফুল তুলতেন না। বলতেন, 'গোলাপ কুঞ্জকে তার সৌন্দর্যের সমারোহ থেকে বঞ্চিত করব কেন? আমার নিষ্ঠুর চয়নে কি এর মহিমার অপহরণ ঘটানো উচিত হবে?' আপনার আবিষ্কার তাঁর এই দরদী কথাগুলির সত্যতাকে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত করেছে।

"সত্যের সঙ্গে কবির মধুর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক; কিন্তু বিজ্ঞানী সে পথে অগ্রসর হন স্থূলভাবে। একদিন আমার পরীক্ষাগারে এসে ক্রেস্কোগ্রাফের অবিসম্বাদিত প্রমাণ সব দেখে যেও।"

সকৃতজ্ঞ চিত্তে আমি তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে প্রস্থান করলাম। পরে শুনেছিলাম যে, উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ বসু মহাশয় প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় একটি গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

'বসু বিজ্ঞান মন্দির' প্রতিষ্ঠার সময় আমি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলাম। শত শত উৎসাহী লোক সেই উপলক্ষ্যে মন্দিরে গিয়েছিলেন। নূতন বিজ্ঞান মন্দিরের অপূর্ব কারুকার্য আর তার আধ্যাত্মিক প্রতীকের দর্শনে আমি মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। সম্মুখের প্রবেশদ্বারে দেখা গেল — কোন এক সুদূর তীর্থক্ষেত্র হতে আনীত বহু শতাব্দীর প্রাচীন এক স্মৃতিচিহ্ন! পদ্মাকৃতি* ফোয়ারার পিছনে মশাল হাতে এক খোদিত কল্যাণীমূর্তি, — অনির্বাণ জ্ঞানালোকবর্তিকার চিরবাহিকা নারীর প্রতি ভারতীয় শ্রদ্ধার অপূর্ব নিদর্শন! উদ্যানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রকৃতির লীলাতীত অরূপের প্রতি উৎসৃষ্ট। বেদীতে কোন মূর্তির অনুপস্থিতি দেবতার নিরূপাধি ভাবেরই দ্যোতক। আজকের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রদত্ত জগদীশচন্দ্রের নিম্নলিখিত বাণী শুনে মনে হল যেন, ভাবানুপ্রাণিত প্রাচীন কোন ঋষির মুখ হতে তা নিঃসৃত হয়েছে ঃ

---

* পদ্মফুল — ভারতবর্ষের প্রাচীন দিব্য প্রতীক চিহ্ন। এর উন্মীলিত দলগুলি জীবাত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্যোতক। পঙ্ক হতে উদ্ভিন্ন পঙ্কজের অনাবিল সৌন্দর্যের বৃদ্ধিতে আধ্যাত্মিক পুণ্যপ্রসাদের আশ্বাস।

"আজ এই প্রতিষ্ঠানকে আমি শুধু পরীক্ষাগাররূপেই নয়, প্রকৃত মন্দিররূপে উৎসর্গ করলাম।" তাঁর শ্রদ্ধাপ্লুত গম্ভীরবাণী তখন সেই জনপূর্ণ সভাগৃহের উপর এক অদৃশ্য আবরণ বিস্তার করল। "আমার গবেষণার কাজ চালাবার সময় আমার অজ্ঞাতসারে আমি পদার্থবিদ্যা ও শারীরবৃত্তের সীমারেখায় উপস্থিত হয়ে পড়ি। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে, ঐ সীমারেখা ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আর চেতন ও অচেতন রাজ্যের সংযোগস্থল ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে! অজৈব পদার্থকে জড় ছাড়া অন্য কিছু ভাবা হয় না; বহু বৈচিত্র্যময় শক্তির ক্রিয়া এতে অপূর্ব শিহরণ জাগিয়ে তোলে!

"দেখলাম — একই রকম প্রক্রিয়াতে ধাতু, উদ্ভিদ, প্রাণী — সব একই সাধারণ নিয়মের অধীনে নিয়ে আসে। তারা সকলেই একই রকমের ক্লান্তি আর অবসাদ বোধ করে — একই রকমের তাদের আরোগ্যলাভ ও আনন্দ শিহরণ অথবা মরণে একই রকমের চিরস্থায়ী স্থির নিস্পন্দ ভাব দেখা যায়। এই বিরাট সর্বজনীন ঐক্যে বিস্মিত অভিভূত হয়ে প্রচুর আশার সঙ্গে আমি আমার পরীক্ষার প্রমাণসিদ্ধ ফলগুলি রয়েল সোসাইটির গোচরীভূত করি। কিন্তু সেখানে উপস্থিত শারীরতত্ত্ববিদেরা আমায় উপদেশ দিয়ে বলেন যে আমি যেন আমার অনুসন্ধান পদার্থবিদ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি, যেখানে আমার সাফল্য সুনিশ্চিত; আমি যেন তাদের সংরক্ষিত ক্ষেত্রে প্রবেশের চেষ্টা না করি। আমি হয়ত অজ্ঞাতসারে এক রকমের জাতিভেদের এলাকায় ঢুকে পড়ে বোধহয় তাদের শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে ফেলেছিলাম।

"এতে অজ্ঞাতে একটা ধর্মের গোঁড়ামি গোছের জিনিষও বর্তমান ছিল, যাতে করে বিশ্বাসের সঙ্গে অজ্ঞতার একটা তালগোল পাকিয়ে যায়! আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে, যিনি চিরবিবর্তনশীল সৃষ্টিরহস্যে আমাদের ঘিরে রেখেছেন, তিনিই আমাদের অন্তরের মাঝে জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধির ইচ্ছাও স্থাপন করেছেন। অন্যের কাছ থেকে বহুদিনের ভ্রান্তির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম যে, বিজ্ঞানতপস্বীর জীবন অন্তহীন সংগ্রামে পরিপূর্ণ। লাভ, ক্ষতি, সাফল্য ব্যর্থতা — একইরকম ভেবে নিয়ে তাঁদের নিজ জীবন উৎসর্গ করতে হয়।

"একসময় পৃথিবীর বিশিষ্ট বিজ্ঞানসমিতিগুলি আমার তত্ত্ব আর তার পরীক্ষার ফলগুলিকে স্বীকৃতি জানালেন, এবং বিজ্ঞানে ভারতের অবদানের গুরুত্বকেও স্বীকার করে নিলেন। সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ কোন কিছু কি ভারতীয় মননকে কোনদিন সন্তুষ্ট করতে পেরেছে? অবিচ্ছিন্ন প্রাণবন্ত ঐতিহ্য আর পুনরুজ্জীবনের প্রাণশক্তির দৌলতে এই ভারতভূমি বহু পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। আপাতমনোহর আর সাময়িক পুরস্কারের আকর্ষণ দূরে ফেলে রেখে ভারতবাসীরা সর্বদাই জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ উপলব্ধির সন্ধান করেছে, — আর তা করেছে নিষ্ক্রিয় ত্যাগে নয়, সক্রিয় সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। যে দুর্বল, যে সংগ্রামকে প্রত্যাখ্যান করে কিছুই পায়নি, তার আর ত্যাগ করবারও কিছুই থাকে না। চেষ্টার মধ্যে দিয়ে যিনি জয়লাভ করেছেন, তিনিই কেবল তাঁর বিজয়লব্ধ অভিজ্ঞতার ফল দান করে জগৎকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।

"জড়বস্তুর প্রতিক্রিয়া, এবং উদ্ভিদ জগতের অপ্রত্যাশিত রহস্যোদ্ঘাটনের কাজ যা বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে — তা পদার্থবিদ্যায়, শারীরতত্ত্বে, চিকিৎসা, কৃষি এমন কি মনোবিদ্যার গবেষণাক্ষেত্রেও বিস্তৃত এলাকা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। যে সব সমস্যার সমাধান করা এতদিন অসাধ্য বলেই বিবেচিত হত, তারাও এখন পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের সীমার মধ্যে এসে পড়েছে।

"কিন্তু নিশ্চিতভাবে সত্য নির্ণয় ছাড়া তো আর চরম সাফল্যলাভ করা যায় না। কাজেই আমার পরিকল্পিত সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন যন্ত্র সমূহের সুদীর্ঘ শ্রেণী, আপনার সামনেই বাইরের ঘরে নিজ নিজ আধারে রাখা আছে। তারা হচ্ছে বাস্তবতার আপাতপ্রতীয়মান ভ্রান্তিজনক সাদৃশ্য হতে অদৃশ্য প্রকৃত সত্তাকে খুঁজে বার করতে, আর মানুষের সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করতে, অবিরাম ধৈর্য, শ্রম আর উপায় উদ্ভাবনের সুদীর্ঘ প্রচেষ্টারই সাক্ষী। সকল সৃজনশীল বিজ্ঞানীই জানেন যে, আসল পরীক্ষাগার হচ্ছে মন, যেখানে মায়ার অন্তরাল হতে তাঁরা প্রকৃত সত্য বিধিগুলি উদ্ঘাটন করেন।

"এখানে প্রদত্ত বক্তৃতা কোন বিষয়ের পূর্বজ্ঞানের চর্বিতচর্বন হবে না। তারা ঘোষণা করবে সেইসব নতুন আবিষ্কার, যা এই মন্দিরে আজ সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হবে। ইন্সটিট্যুটের গবেষণাকার্যের বিবরণীর নিয়মিত প্রকাশের মাধ্যমে ভারতের এই সব অবদানগুলি পৃথিবীর সর্বত্রই পৌঁছতে পারবে, আর তা জনসাধারণেরই সম্পত্তি হবে। এদের উপর কখনও কোন পেটেণ্ট নেওয়া হবে না। আমাদের জাতীয় কৃষ্টির ঐতিহ্য হলো এই যে — কেবলমাত্র ব্যক্তিগত লাভের জন্যে আমরা যেন জ্ঞানের মর্যাদাহানি থেকে চিরতরে মুক্ত থাকি।

"আর এটাও আমার ইচ্ছা যে, এই বিজ্ঞান মন্দিরের সমস্ত সুযোগসুবিধা যতদূর সম্ভব সকল দেশের গবেষকরাই যেন লাভ করতে পারেন। এতদ্বারা আমি আমার দেশের প্রাচীন প্রথারই অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি। আড়াই হাজার বছর আগেও ভারতবর্ষ তার প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়সকল, নালন্দা ও তক্ষশীলায়, পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আগত বিদ্যার্থীদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিল।

"যদিও বিজ্ঞান প্রাচ্য বা প্রতীচ্য কোন দেশ বিশেষের নয়, বরং সর্বজনীনতায় তা বিশ্বজনীন, তথাপি ভারতবর্ষ জগতকে তার বিরাট অবদানের জন্য বিশেষভাবেই উপযুক্ত।* ভারতের উজ্জ্বল চিন্তাধারা, যা আপাতবিরোধী ঘটনাবলী থেকে নতুন ধারাকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম, তা গভীর একাগ্রতার অভ্যাসের কারণে সংযত। এই সংযমই কিন্তু মনে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সত্যানুসন্ধান করার শক্তি জোগায়।"

---

* প্রাচীন হিন্দুদের কাছে পদার্থের আণবিক গঠন সুবিদিত ছিল। ভারতীয় ষড়দর্শনের মধ্যে 'বৈশেষিক' একটি — সংস্কৃত "বিশেষ" অর্থাৎ 'আণবিক বৈশিষ্ট্য' হতে এর ব্যুৎপত্তি। বৈশেষিক দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন ঔলুক্য, — যিনি কণাদ নামেও পরিচিত; তিনি ২৮০০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

১৯৩৪ সালের "ইষ্ট ওয়েষ্ট" পত্রিকায় তারা মাতা লিখিত এক প্রবন্ধে বৈশেষিক দর্শনের বৈজ্ঞানিক মতবাদের সংক্ষিপ্তসার নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশিত হয়েছে ঃ "যদিও আধুনিক 'আণবিক মতবাদ' সাধারণভাবে বিজ্ঞানের নূতন অগ্রগতি বলেই বিবেচিত হয়, সেটি কিন্তু কণাদ কর্তৃক বহু পূর্বেই সুচারুভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল। সংস্কৃত 'অণু', গ্রীকশব্দ এটমের (atomos = uncut) বাচ্যার্থ "অবিভাজ্য" রূপে সুষ্ঠুভাবেই অনূদিত হতে পারে। খ্রীস্টপূর্ব যুগের বৈশেষিক দর্শনের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যসকলের মধ্যে আছে — (১) চুম্বকের দিকে সূচের গমন (২) উদ্ভিদে জলসংবহন (৩) আকাশ বা ইথার, জড় ও নিরাবয়ব, — সূক্ষ্মশক্তি

জগতবিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের এই শেষ কথাগুলিতে আমার চোখে জল এসে গেল। "ধৈর্য" কথাটা কি ভারতবর্ষ এই নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নয় — যা মহাকাল ও ঐতিহাসিকদের সমানভাবে বিভ্রান্ত করে?

প্রতিষ্ঠাদিবসের কিছুদিন পরেই আমি আবার ঐ গবেষণাকেন্দ্র দেখতে গিয়েছিলাম। সুবিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ মহাশয়, তাঁর প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে, তাঁর নিঃস্তব্ধ পরীক্ষাগারে আমায় নিয়ে গেলেন।

তারপর একটা পরীক্ষা শুরু করে বললেন, "আমি এই ফার্ণগাছের সঙ্গে আমার "ক্রেস্কোগ্রাফ" লাগিয়ে দিচ্ছি, এ আকারকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেখায়। ঐ অনুপাতে যদি শামুকের গতি বাড়িয়ে দেখান যায়, তবে তাকে এক্সপ্রেস ট্রেনের মত দৌড়তে দেখা যাবে।"

পর্দার উপর খুব বড় করে প্রতিফলিত ফার্ণ গাছের ছায়ার ওপর আমার সাগ্রহ দৃষ্টি আবদ্ধ হল। জীবনের সূক্ষ্ম স্পন্দন এখন বেশ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া গেল। আমার মুগ্ধ চোখের সামনে গাছটি অতি ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। বৈজ্ঞানিক মহাশয় ফার্ণ গাছটির ডগার উপর একটি ছোট ধাতুখণ্ড ছুঁয়ে দিলেন। নীরব বৃদ্ধির অঙ্গসঞ্চালন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল! দণ্ডটি সরিয়ে নিতেই আবার বৃদ্ধির মুখর ছন্দ শুরু হয়ে গেল।

বসু মহাশয় বললেন, "দেখলেন ত', বাইরের যৎসামান্য বাধাও সুবেদী কোষগুলির পক্ষে কি রকম ক্ষতিকর। চেয়ে দেখুন; এবার আমি ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করব, তারপর তার প্রতিষেধকও দেব।"

সঞ্চরণের ভিত্তি (৪) সৌরাগ্নি সর্বপ্রকার তাপের কারণ, (৫) তাপই আণবিক পরিবর্তনের হেতু, (৬) মাধ্যাকর্ষণ হচ্ছে পৃথিবীর অণুমধ্যস্থ গুণ, যা তাদের আকর্ষণ শক্তি বা নিম্নাভিমুখী আকর্ষণ শক্তি দেয়, (৭) সকল শক্তির গতিশীলতা — যার কার্যকারণ সম্বন্ধে শক্তির ক্ষয় অথবা গতির পুনঃসংস্থান বোঝায়, (৮) আণবিক বিস্ফোরণে জগতের শিথিলীভবন, (৯) তাপ ও আলোকরশ্মির বিচ্ছুরণ হচ্ছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার চতুর্দিকে অবিশ্বাস্য দ্রুতবেগে ধাবন (আধুনিক "কসমিক রে" মতবাদ), (১০) দেশ ও কালের আপেক্ষিকতা।

বৈশেষিক দর্শন, অণুকেই জগতের উৎপত্তির কারণ বলে নির্দেশ করেছে — অনন্ত তাদের প্রকৃতি অর্থাৎ তাদের চরম বৈচিত্র্য। এই অণুগুলি অবিরাম স্পন্দনগতিবিশিষ্ট বলে বিবেচিত হয়েছে ... অণু যে একটি ক্ষুদ্র সৌরজগৎ — এই নূতন আবিষ্কার, প্রাচীন বৈশেষিক দার্শনিকদের কাছে কোন নূতন সংবাদ নয়। এঁরা সময়কেও তার গাণিতিক ধারণায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে তার একককে 'কাল' বলে অভিহিত করেছেন; আর তা হচ্ছে অণুর নিজ একক অবকাশে ঘুরতে যেটুকু সময় লাগে, কেবল সেইটুকু সময় মাত্র।"

ক্লোরোফর্ম দেওয়ার ফলে গাছের বৃদ্ধি রোধ হয়ে গেল; প্রতিষেধকের ক্রিয়াতে আবার তা পুনরুজ্জীবিত হল। পর্দায় প্রতিফলিত বৃদ্ধির সময়কার স্পন্দনগুলি চলচ্চিত্রের কাহিনীর চেয়েও আমাকে বেশি মুগ্ধ করে রেখেছিল। বসু মহাশয় (এ ক্ষেত্রে সিনেমার খল চরিত্রের মত) ফার্ণ গাছটার এক অংশের ভিতর একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্র প্রবেশ করিয়ে দিলেন। যন্ত্রণাজনিত আক্ষেপের স্পন্দন দেখা গেল। কাণ্ডের একাংশ দিয়ে যখন তিনি একটা ক্ষুর চালিয়ে দিলেন, ছায়াটা তখন ভয়ানক কাঁপতে লাগল; অবশেষে মৃত্যুর শেষ ছটফটানির মধ্যে দিয়ে একসময় নীথর হয়ে গেল।

একটা সতৃপ্ত হাসির সঙ্গে পুনরুজ্জীবনের কৌশল দেখাতে দেখাতে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় বললেন, "একটা প্রকাণ্ড গাছকে প্রথমে ক্লোরোফর্ম দিয়ে আমি সাফল্যের সঙ্গে স্থানান্তরিত করতে পেরেছিলাম। সাধারণতঃ এই রকম বিরাট বনস্পতিকে স্থানান্তরিত করতে গেলেই অতি শীঘ্র তা মারা যায়। গাছেদেরও যে সংবহনতন্ত্র আছে, আমার সূক্ষ্ম যন্ত্রের রেখাচিত্রগুলোই তা প্রমাণ করেছে। তাদের রসসঞ্চালনক্রিয়া ঠিক প্রাণীদেহের রক্তসঞ্চালনক্রিয়ারই অনুরূপ। বৃক্ষরসের ঊর্ধ্বগতি, কৈশিক আকর্ষণেরই মত সাধারণ কোন যান্ত্রিক কারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। একটা সজীব কোষের ক্রিয়ারূপে ক্রেস্কোগ্রাফের দ্বারাই এর রহস্যের সমাধান হয়েছে। গাছের তলা অবধি নামানো একটা গোলাকৃতি নল থেকে সর্পিল গতিতে ঢেউগুলো বেরোয়; আর সে'টাই আসলে হৃৎপিণ্ডের কাজ করে। যতই আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করি, ততই এ প্রমাণ অত্যন্ত আশ্চর্য বলে মনে হয় যে, একটি সর্বাঙ্গীন পরিকল্পনা প্রকৃতির নানা বিচিত্ররূপকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছে।"

বসু মহাশয় নিজের তৈরী আর একটি যন্ত্র দেখিয়ে বললেন, "এবার আমি আপনাকে এক টুকরো টিনের ওপর কতকগুলো পরীক্ষা দেখাব। বাইরে থেকে আঘাতে ধাতুর ভিতরের প্রাণশক্তি অনুকূল অথবা প্রতিকূলভাবে ক্রিয়া প্রকাশ করে; কালির দাগের সাহায্যেই বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার ফল দেখা যাবে।"

গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে আমি অণুপরমাণুর গঠনগুলির তরঙ্গ বৈশিষ্ট্যের রেখাচিত্র দেখতে লাগলাম। যখন আচার্য মহাশয় টিনে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করলেন, স্পন্দনশীল দাগগুলি তখনই থেমে গেল। ধীরে ধীরে ধাতুটি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাওয়ার পর, আবার সেগুলি চালু হল। বসু মহাশয় খানিকটা বিষাক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ করলেন। টিনের স্পন্দনশীলতা থামার সঙ্গে সঙ্গে সূচীলেখনীও নাটকীয়ভাবে রেখাচিত্রের ওপর মৃত্যু পরোয়ানা লিখে দিল। স্যার জগদীশচন্দ্র বললেন ঃ

"বসু মহাশয়ের আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কাঁচি বা যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত ইস্পাতও ক্লান্তির অধীন, আর তারা সাময়িক বিশ্রাম পেলে পুনরায় কর্মক্ষমতা লাভ করে। ধাতুর মধ্যেকার প্রাণস্পন্দন, বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা বিপুল চাপপ্রয়োগে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকি লোপ পর্যন্ত পায়।"

অক্লান্ত কর্মকুশলতার মুখর নিদর্শনস্বরূপ গৃহমধ্যে রক্ষিত সেই অগণিত আবিষ্কারগুলি আমি চারদিকে চেয়ে চোখে দেখতে লাগলাম।

বসু মহাশয়কে বললাম, "মশায়, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আপনার অদ্ভুত যন্ত্রপাতির ব্যবহারের পূর্ণতর সুযোগ নিয়ে কৃষিকার্যে ব্যাপক উন্নতি আরও দ্রুত হয়ে উঠতে পারছে না। গাছের বৃদ্ধির ওপর নানারকম সারের প্রভাব দেখবার জন্যে, এদের মধ্যে কতকগুলোকে ল্যাবরেটরীতে চট করে পরীক্ষা করে দেখবার কাজে কি লাগান যায় না?"

তিনি বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন। ভবিষ্যত মানুষ বসু আবিষ্কৃত যন্ত্রগুলির ব্যবহারের অগণিত উপায় তৈরী করবে। বৈজ্ঞানিক কদাচিৎ তাদের পরিশ্রমের পুরস্কার তাৎক্ষণিক পায়। সৃজন প্রচেষ্টার আনন্দই তাদের কাছে যথেষ্ট।"

অক্লান্তকর্মী, নিরলস ঋষিপ্রতিম বৈজ্ঞানিকের প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে আমি বিদায় নিলাম। ভাবলাম, "তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার উদ্ভাবনী শক্তি কখনও কি হ্রাস পেতে পারে!"

কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তা কখনও হ্রাস পায়নি। 'রেজোনেণ্ট কার্ডিওগ্রাফ' নামে একটি জটিল যন্ত্র আবিষ্কার করে জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় নানাজাতীয় ভারতীয় বৃক্ষের বিস্তৃত গবেষণায় নিযুক্ত হন। প্রয়োজনীয় ঔষধের একটা বিরাট অনাবিষ্কৃত ভেষজতালিকা তাই থেকে বেরিয়ে আসে। কার্ডিওগ্রাফ যন্ত্রটি এমন নিখুঁতভাবে তৈরী হয়েছিল যে, তাতে সেকেণ্ডের শতাংশও রেখাচিত্রে পরিস্ফুট হয়। বৃক্ষ, প্রাণী এবং মনুষ্যশরীরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দন সকল, রেজোনেণ্ট পরিমাপ করতে পারে। সুবিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, তাঁর আবিষ্কৃত 'কার্ডিওগ্রাফ' ব্যবহারে প্রাণিগণের পরিবর্তে বৃক্ষেরও অঙ্গচ্ছেদ পাওয়া যাবে।

তিনি বললেন, "একই সময়ে একটা বৃক্ষ বা একটি প্রাণীকে একই ওষুধ দেওয়াতে, পাশাপাশি লেখা প্রতিলিপিতে তাদের ফলের এক আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যে যা কিছু আছে, তার সব কিছুরই পূর্বাভাস গাছের ভিতরও আছে। উদ্ভিদের উপর পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে, জীবজন্তু ও মানুষের অনেক দুঃখকষ্ট দূর করা সম্ভব হবে।"

তারপর বেশ কয়েক বছর বাদে বসু মহাশয়ের বৃক্ষ সম্বন্ধীয় যুগান্তকারী আবিষ্কার, অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে। ১৯৩৮ সালে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার বিবরণ 'নিউইয়র্ক টাইমস্'-এ নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশিত হয় ঃ—

"গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এটা নির্ধারিত হইয়াছে যে, যখন তান্ত্রিকাসকল মস্তিষ্ক ও শরীরের অন্যান্য অংশের মধ্যে সংবাদ বহন করে, তখন তাতে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এই সকল প্রবাহ সূক্ষ্ম গ্যালভানোমিটার যন্ত্রে পরিমাপ করা হইয়াছে, এবং আধুনিক বিবর্ধনকারী যন্ত্রের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ গুণ পরিবর্ধিতও করা হইয়াছে। জীবন্ত প্রাণী অথবা মানব দেহের তন্ত্রিকাতন্তুর মধ্য দিয়া শক্তিপ্রবাহ অনুসন্ধান করিবার জন্য আজপর্যন্ত কোন সন্তোষজনক প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই, কারণ এই সকল শক্তিপ্রবাহ অত্যন্ত দ্রুতবেগে ধাবিত হয়।

"ডাক্তার কে. এস. কোল এবং ডাক্তার এইচ. জে. কার্টিস তাঁদের রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে, নিটেলা নামক মিঠাজলের গাছ যাহা সাধারণতঃ রঙীন মাছের কাঁচের পাত্রে ব্যবহৃত হয়, তাহা একটি তন্ত্রিকাতন্তুর সহিত প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। উপরন্তু তাঁহারা এও দেখিয়াছেন যে নিটেলার তন্তুগুলি উত্তেজিত হইলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ উৎপাদন করে, যাহা একমাত্র গতি ভিন্ন, প্রাণী ও মানব তন্ত্রিকাতন্তুর সহিত সর্বতোভাবে সমান। গাছের তন্ত্রিকার বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রাণীদিগের অপেক্ষা বহু গুণে শ্লথ। এই আবিষ্কার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ, তন্ত্রিকার বৈদ্যুতিক প্রবাহের ধীরগতিচিত্র তুলিবার উপায়স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।"

"জড় ও মনের প্রান্তরেখায় সুরক্ষিত গূঢ় তথ্যের সঙ্কেতলিপি উদ্ধারে নিটেলা চারা হয়ত রসেটা স্টোন হয়ে উঠতে পারে।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের এই আদর্শবাদী বৈজ্ঞানিকের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কবিগুরু নিম্নলিখিত কয়েকটি ছত্র তাঁরই নামে উৎসর্গ করেছেন, —

হে তপস্বি ডাকো তুমি সামমন্ত্রে* জলদগর্জনে,
"উত্তিষ্ঠত! নিবোধত!" ডাকো শাস্ত্র অভিমানীজনে

---

* রবীন্দ্রনাথের কবিতায় উল্লিখিত "সামমন্ত্র" চতুর্ব্বেদের মধ্যে একটি। অপর তিনটি বেদ হচ্ছে ঋক, যজুঃ আর অথর্ব্ব। এই ধর্মশাস্ত্রে ব্রহ্মের সগুণভাব — স্রষ্টারূপে ঈশ্বর, যিনি মানবদেহে জীবাত্মারূপে প্রকাশিত, তাঁর স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্ম শব্দ 'বৃহ' ধাতু হতে উৎপন্ন, মানে বিস্তার করা; বৈদিক অর্থে এর মানে হচ্ছে ঐশ্বরিক শক্তির স্বতঃপ্রসারণ অথবা সৃষ্টিক্রিয়াশীলতার সম্প্রসারণ। ঊর্ণনাভের ঊর্ণার মত নিখিল বিশ্ব তাঁর সত্তা থেকে বেরিয়ে আসছে। বেদের প্রতিপাদ্য হচ্ছে ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার সজ্ঞান মিলন।

বেদের সংক্ষিপ্তসার 'বেদান্ত' বহু বড় বড় পাশ্চাত্য মনীষীদের অনুপ্রাণিত করেছে। ফরাসী ঐতিহাসিক ভিক্টর কুজ্যাঁ বলেছেন, "যখন আমরা প্রাচ্যের — বিশেষতঃ ভারতবর্ষের দার্শনিক তত্ত্বগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, সেখানে এমন সব গভীর সত্য আছে যে, যার পরিচয়ে আমরা প্রাচ্যদর্শনের সম্মুখে নতজানু হতে বাধ্য হই, এবং বুঝি, মানবজাতির এই ধাত্রীগৃহই হলো সর্ব্বোচ্চ দর্শনের জন্মভূমি।" শ্লীগেল মন্তব্য করেছেন ঃ "এমন কি ইউরোপের সর্ব্বোচ্চ দর্শন, গ্রীক দার্শনিকদের দ্বারা প্রচারিত যুক্তিবাদ, প্রাচ্যের আদর্শবাদের প্রাণপ্রাচুর্য আর শক্তির তুলনায় মনে হয়, যেন মার্তণ্ডালোকের প্রবল বন্যাপ্রবাহের কাছে প্রমিথিয়ুস কর্তৃক আনীত অগ্নির একটি ক্ষীণ স্ফুলিঙ্গমাত্র।" (গ্রীক পুরাণে উল্লিখিত আছে যে, প্রমিথিয়ূস মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে সূর্যের কাছ থেকে অগ্নিকে চুরি করে মর্ত্যে আনয়ন করেন।)

পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে। সুবৃহৎ বিশ্বতলে
ডাকো মূঢ় দাম্ভিকেরে। ডাক দাও তব শিষ্যদলে —
একত্রে দাঁড়াক তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া।
আরবার এ ভারত আপনাতে আসুক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে, — বসুক সে অপ্রমত্তচিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শান্ত গুরুর বেদীতে।
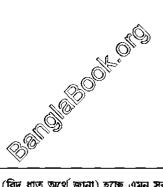
ভারতবর্ষের বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডারে বেদ (বিদ্ ধাতু অর্থে জানা) হচ্ছে এমন সব মূল রচনা, যাতে কোন রচয়িতার নাম আরোপ করা যায় না। ঋগ্বেদে (১০ ঃ ৯০, ৯) এই মন্ত্রের উৎপত্তিকে অপৌরুষেয় বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ঋগ্বেদ বলে (৩ ঃ ৩৯, ২) যে তারা অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে এসে নূতন ভাষার আচ্ছাদনে পুনরাচ্ছাদিত হয়েছে। সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের নিকট যুগে যুগে ঐশীভাবে প্রকাশিত বেদসকল "নিত্যত্ব" অর্জন করেছে।

বেদ শ্রুতি বলে পরিচিত — ঋষিরা যা সরাসরি শুনতে পেতেন। মূলতঃ এগুলি স্তব ও আবৃত্তিমূলক রচনা; এ কারণে যুগযুগান্ত ধরে বেদের এক লক্ষ শ্লোক লিখে রাখা হয় নি; ব্রাহ্মণ আচার্যদের দ্বারা মুখে মুখেই তা চলে এসেছে। প্রস্তর কিম্বা কাগজ, উভয়েই কালের বিলোপকারী প্রভাবের অধীন। বেদ যে লোপ না পেয়ে যুগে যুগে রক্ষিত হয়ে এসেছে, তার কারণ ঋষিরা বুঝেছিলেন যে, এর উপযুক্ত প্রচলনের পক্ষে জড়পদার্থের চেয়ে মনই শ্রেষ্ঠ। "মানসপটে" যা লিখিত থাকে, তার চেয়ে উৎকৃষ্ট উপাদান আর কিই বা হতে পারে?

"আনুপূর্ব্বী, অর্থাৎ ক্রমবিশেষ, যাতে বৈদিক শব্দসকল পাওয়া যায়, তা সংরক্ষণ করে, সন্ধিপ্রকরণাদি ও অক্ষর সংযোজন প্রভৃতি ধ্বনিবিদ্যার কতকগুলি নিয়মের সাহায্যে, আর অক্ষরের সম্পর্ক (সনাতন) মূল কতকগুলি গাণিতিক উপায়ে স্মৃতিতে রক্ষিত মূলপাঠের নির্ভুলতা প্রমাণিত করে; ব্রাহ্মণরা বহু সুদূর অতীত থেকে বেদের আদি বিশুদ্ধতা অতি অপূর্ব উপায়ে সংরক্ষণ করে এসেছেন। বেদের প্রত্যেকটি অক্ষর গূঢ়ার্থ প্রকাশক ও ফলপ্রসূ।

৯ম পরিচ্ছেদ

এক আনন্দময় ভক্ত ও তাঁর ভগবতী প্রেম

মাস্টার মহাশয় বললেন, "বাবা, একটু বোসো। আমি জগজ্জননীর সঙ্গে এখন কথা বলছি।"

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি নীরবে ঘরে প্রবেশ করলাম। মাস্টার মহাশয়ের দিব্য আকৃতি আমার চোখকে যেন রীতিমত ঝলসে দিল। রেশমের মত তাঁর শ্বেত শ্মশ্রু আর উজ্জ্বল বড় বড় চক্ষু দু'টিতে মনে হয় তিনি যেন পবিত্রতার প্রতিমূর্তি। তাঁর ঈষৎ উন্নত গ্রীবা আর যুক্তকর দেখেই বুঝতে পারলাম — প্রথম সন্দর্শনের জন্যে তাঁর গৃহমধ্যে আমার প্রবেশ যেন তাঁর পূজায় কিঞ্চিৎ বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে।

তাঁর সরল আন্তরিক আহ্বান আমার মনের উপরে এতাবৎ অনুপলব্ধ একটা দারুণ প্রভাব বিস্তার করল। মায়ের মৃত্যুর করুণ বিচ্ছেদে মনে হয়েছিল, আমার সকল দুঃখের সেটাই চরম পরিণতি। এখন কিন্তু জগন্মাতার অদর্শনে আমার মনের মধ্যে এক অবর্ণনীয় যন্ত্রণাবোধ হতে লাগল। বিলাপ করতে করতে মেঝের উপর বসে পড়লাম।

"বাবা, শান্ত হও।" বলে সাধু মহাশয় সহানুভূতিসূচক দুঃখ প্রকাশ করলেন।

নিদারুণ দুঃখে অভিভূত হয়ে তাঁর চরণ দু'টিই আমার উদ্ধারের একমাত্র উপায় ভেবে তাকে আঁকড়ে ধরে বললাম, — "মহাত্মন্, আপনার সাহায্য বিনা আমার আর গতি নেই। মাকে জিজ্ঞাসা করুন — তাঁর করুণা আমি পাব কি না!"

মধ্যস্থতা করার এইরূপ পূত আশ্বাস সহজে দেবার নয়। বাধ্য হয়েই মাস্টার মহাশয় চুপ করে বসে রইলেন।

নিঃসংশয়ে স্থির বিশ্বাস হলো যে মাস্টারমশায় জগন্মাতার সঙ্গে একান্তে কথা বলছেন। ভাবতেও নিজেকে অত্যন্ত হীন বলেই বোধ হল যে, যিনি এই ক্ষণেতেই এই সাধুটির অমল দৃষ্টির সামনে উপস্থিত, তাঁকেই আমি আমার এই পোড়া চোখে দেখতে পাচ্ছি না। লজ্জার মাথা খেয়ে, তাঁর মৃদু ভর্ৎসনায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করে, তাঁর পা দু'টি ধরে বার বার তাঁর কৃপা ভিক্ষা করতে লাগলাম।

মাস্টার মহাশয় বললেন, "আচ্ছা গো, মায়ের কাছে তোমার কথা জানাবো।" ধীর করুণাভরা হাসিমুখে অবশেষে তাঁর অঙ্গীকার পাওয়া গেল।

ঐ কয়েকটি মাত্র শব্দে কি অনন্য শক্তি! মনে হলো, আমার সত্তা বুঝিবা তার উত্তাল নির্বাসন থেকে এবার মুক্তি পাবে।

বললাম, "মহাত্মন, আপনার প্রতিজ্ঞা স্মরণ থাকে যেন; মায়ের উত্তর পাবার জন্যে শীগ্‌গিরই আমি আবার আসবো।" ক্ষণেক পূর্বের দুঃখে অবরুদ্ধ আমার কণ্ঠস্বরে যেন আবার আশার আনন্দধ্বনি মুখরিত হয়ে উঠল।

দীর্ঘ সিঁড়িপথ দিয়ে নিচে নেমে আসবার সময় কত স্মৃতিই না মনে পড়তে লাগল। ৫০ নং আমর্হাস্ট স্ট্রীটের এই বাড়ী, যেখানে এখন মাস্টার মহাশয় থাকেন, এককালে সেটাই আমাদের বসতবাড়ী ছিল। এই বাড়ীতেই মা দেহরক্ষা করেছেন। আর এখানেই আমার মানবহৃদয় মাতৃবিয়োগে কাতর হয়েছিল; আর আজ মনে হচ্ছে ভগবতী মায়ের অদর্শনে আমার সত্তা যেন ক্রুশবিদ্ধ হচ্ছে। পুণ্য-স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়ীটি আমার শোকের নিদারুণ বেদনা ও তার অন্তিম নিরাময়ের এক নীরব সাক্ষী।

দ্রুতপায়ে গড়পার রোডের বাড়ীতে ফিরলাম। সেদিন রাত দশটা অবধি আমার সেই নির্জন ছোট্ট চিলেকোঠায় আমি ধ্যানে ডুবে রইলাম। নিদাঘ নিশীথের অন্ধকার সহসা এক অলৌকিক দৃশ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

দিব্যজ্যোতি বিভূষিতা জগজ্জননী মা আমার সামনে দাঁড়িয়ে! মধুর হাসিতে ভরা তাঁর মুখখানি স্বর্গীয় সুষমা মাখা। স্পষ্ট তাঁর বাণী কানে এসে

প্রবেশ করল, বললেন — 'তোমায় ত' আমি চিরকালই স্নেহ করি, আর তা সর্বদাই করব।' স্বর্গীয় বাণী তখনও হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল — মা অন্তর্হিতা হলেন।

পরদিন, সূর্য তখন সবেমাত্র উঁকি দিতে শুরু করেছে, এমন সময় আমি মাস্টার মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে আবার উপস্থিত হলাম। নানা দুঃখময় স্মৃতি বিজড়িত সেই বাড়ীর সিঁড়ি দিয়ে আমি তাঁর পাঁচতলার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। বন্ধ দরজার হাতলে একটুকরো কাপড় জড়ানো। বুঝলাম — মাস্টার মহাশয় এখন কারুর ভিতরে আসা পছন্দ করেন না। কি করব ভেবে না পেয়ে অনিশ্চিতভাবে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় মাস্টার মহাশয় সাদরে দুয়ার খুলে দিলেন। আমি তাঁর পুণ্যপদতলে প্রণত হলাম। দিব্য আনন্দের ভাব চেপে রেখে মুখের উপর একটা ছদ্মগাম্ভীর্যের আবরণ টেনে দিয়ে নিরীহভাবে বললাম, "মাস্টার মহাশয়, উত্তরটা জানবার জন্যে খুব সকাল সকালই এসে পড়লাম। মা কি আমার কথা আপনাকে কিছু বলেছেন নাকি?"

"দুষ্টু ছেলে কোথাকার!" শুধু এইটুকুমাত্র বলেই আর কিছু বললেন না। বাহ্যতঃ আমার কৃত্রিম গাম্ভীর্য তাঁর মনে কোনই রেখাপাত করেনি।

ফের জিজ্ঞাসা করলাম, — "আপনার এত হেঁয়ালিই বা কিসের, আর আমাকে এত এড়াতেই বা চাইছেন কেন? সাধুসন্ন্যাসীরা কি সোজাসুজি কোন কিছু বলেন না নাকি?" বোধহয় একটু অধৈর্যও হয়ে পড়েছিলাম।

"তুমি কি আমায় পরীক্ষা করতে চাও নাকি, বল?" তাঁর শান্ত নয়নের দৃষ্টি অর্থপূর্ণ। "সেই করুণাময়ী জগজ্জননীর কাছ থেকে কাল রাত দশটার সময় যে আশ্বাস তুমি স্বয়ং পেয়েছ, তার উপর কি আজ এই সকালে আমার আর একটাও কথা বলা চলে, বল?"

পুনরায় তাঁর চরণে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম। এবার আমার চোখ আর দুঃখে নয়, যেন অসহ্য সুখেই অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল।

"তুমি কি মনে কর, তোমার ভক্তি মায়ের অসীম করুণাকে স্পর্শ করেনি? ঈশ্বরের মাতৃভাব, — যা তুমি মানবী আর দেবীর আকারে

পূজো করে এসেছ, তা তোমার আকুল ক্রন্দনে সাড়া না দিয়েই পারে না।”

কে এই সরল সাধু, যাঁর সামান্য অনুরোধটুকুও পরমাত্মার কাছে মধুর স্বীকৃতি লাভ করে? পৃথিবীতে তাঁর কর্মজীবন অতি সামান্যই — আমার জানা অতি দীনতম ব্যক্তিরই মত। এই আমর্হাস্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে মাস্টার মহাশয়* ছেলেদের একটি ছোট্ট উচ্চ বিদ্যালয় চালান। ছেলেদের শাসনের জন্যে কোনরকম বকুনিই তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না। কোন বাঁধাধরা নিয়ম-কানুন বা বেতের শাসন তিনি প্রয়োগ করতেন না। এইসব অত্যন্ত সাধারণ ক্লাস ঘরে, উচ্চতর অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হত — আর শিক্ষা দেওয়া হত প্রেমের রসায়ন শাস্ত্র, যা কোন ইস্কুলের পাঠ্য বইয়ে পাওয়া যায় না। তিনি দুর্বোধ্য নীতিশিক্ষার বদলে ধর্মভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানদানও করতেন। মা ভগবতীর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তির আগুনে পুড়ে তিনি এমন হয়েছিলেন যে, ছোট শিশুর মতই কোন বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শনের লৌকিকতা প্রত্যাশা করতেন না।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, “আমি তোমার গুরু নই; তিনি কিছুকাল পরেই আসবেন। তাঁরই নির্দ্দেশনায় প্রেম ও ভক্তির মাধ্যমে তোমার উপলব্ধ দিব্যানুভূতি, তাঁরই প্রদত্ত গভীর জ্ঞানে রূপান্তরিত হবে।”

রোজই বিকালের দিকে একবার করে আমর্হাস্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে যেতাম। মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গ আমি প্রত্যহই কামনা করতাম। তাঁর পবিত্র সাহচর্যের আনন্দ আমার সকল সত্তাকে পরিপ্লাবিত করে যেন একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। এত প্রগাঢ় ভক্তির সঙ্গে আমি কখনও আগে প্রণাম করি নি। মাস্টার মহাশয়ের পদচিহ্ন যে ভূমিকে পবিত্র করেছে, সেখানে দাঁড়াতে পাওয়াটা একটা পরম সৌভাগ্য বলেই মনে করি।

একদিন সন্ধ্যেবেলা একছড়া চাঁপাফুলের মালা হাতে করে এনে বললাম, “মাস্টার মশাই, আজ এই মালাটি পরুন, আপনার জন্যই বিশেষ করে এটিকে তৈরী করিয়ে এনেছি।” কিন্তু তিনি এই সম্মান গ্রহণ করতে

---

* এইরূপ সম্মানসূচক উপাধিতেই তিনি সাধারণতঃ অভিহিত হতেন। তাঁর আসল নাম শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। তাঁর রচনাবলীতে তিনি “শ্রীম” এই সংক্ষিপ্ত নামেই স্বাক্ষর দিতেন।

বারম্বার অস্বীকার করে সসঙ্কোচে সরে গেলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে, মনে আঘাত পেলাম ভেবে অবশেষে রাজী হলেন। বললেন, "আচ্ছা বেশ, আমরা দু'জনেই যখন মায়ের ভক্ত সন্তান, তখন মায়ের আবাস এই দেহমন্দিরে তুমি তাঁকেই অর্ঘ্য দিতে পার — আমাকে কিন্তু নয়।" তাঁর নিরহঙ্কার ও উদার প্রকৃতিতে আত্মশ্লাঘার কোন স্থান ছিল না। তারপর বললেন, "চল, কাল আমরা আমার গুরুস্থান, পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির দেখে আসি।" মাস্টার মহাশয় হলেন ঈশ্বরকোটি জগদ্‌গুরু, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য।

তার পরদিন সকালে গঙ্গায় নৌকা করে আমাদের চারমাইল যাত্রা শুরু হল। দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে পৌঁছে আমরা নবচূড়াশোভিত কালীমন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মন্দিরের ভিতর মা ভবতারিণী ও শিব — উজ্জ্বল ও সুনিপুণ কারুকার্যশোভিত রৌপ্যনির্মিত সহস্রদল পদ্মের উপরি বিরাজ করছেন। মাস্টার মহাশয় আনন্দে পুলকিত হয়ে উঠলেন। হৃদয়েশ্বরীর সঙ্গে অফুরন্ত প্রেমলীলায় তিনি তখন নিমগ্ন। মায়ের নামগান যখন শুরু করলেন, তখন আমার আনন্দোদ্বেলিত হৃদয় যেন শতদলের মতই বিদীর্ণ হতে লাগল।

তারপর আমরা সেই পুণ্যভূমি মন্দির-প্রাঙ্গণের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে একটা ঝাউগাছের ঝোপের ধারে এসে দাঁড়ালাম। এই বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য যে রসক্ষরণ, তা যেন মাস্টার মহাশয়ের পরিবেশিত আধ্যাত্মিক অমৃত ধারারই প্রতীক। তাঁর সেই দিব্য নামগান তখনও সমান ভাবেই চলতে লাগল। চারপাশে ছড়ানো লালচে রঙের ঝাউফুলের মধ্যে আমি ঘাসের ওপর স্থির নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম। মনে হল, যেন সাময়িক ভাবে দেহ থেকে বিযুক্ত হয়ে আমি কোন স্বর্গীয় ভাবরাজ্যে গিয়ে পড়েছি।

এরপর সেই পুণ্যাত্মা মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে আরো বহুবার আমি দক্ষিণেশ্বর বেড়াতে গিয়েছি। তাঁর কাছ থেকেই ঈশ্বরের দয়াময়ী মাতৃভাবে আরাধনার মাধুর্য উপলব্ধি করেছি। পিতৃভাব বা ঐশ্বরিক ন্যায়মূর্তি ভজনা করার মধ্যে তিনি বিশেষ কোন আকর্ষণ অনুভব করতেন না। কঠোর, আর খুব খুঁটিনাটি নিখুঁত হিসাব করে চলা, তাঁর শান্ত প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

একদিন তিনি উপাসনায় বসেছেন — দেখে মনে হল যেন তিনি মর্ত্যে স্বর্গের দেবদূতদেরই প্রতিমূর্তি। কোন বিচার-বিতর্ক বা অভিযোগ-অনুযোগ মনে বহন না করে, তিনি এ জগতকে তাঁর চিরদিনের ক্ষমাসুন্দর চক্ষেই দেখতেন। দেহ, মন, কথা, কাজ — সবই ছিল তাঁর অন্তরের সরলতার সঙ্গে একান্তভাবেই সুসমঞ্জস।

কোন জ্ঞানোপদেশ বিতরণের সময় আত্মগরিমাকে দূরে রেখে তিনি প্রায়ই এই কথা বলে শেষ করতেন, "আমার গুরুদেব এই কথা বলেছেন।" ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ এতই নিবিড় ছিল যে, মাস্টার মহাশয় কোন চিন্তাকে তাঁর নিজের বলেই ভাবতে পারতেন না।

তাঁর স্কুলবাড়ীর একটা অংশে একদিন সন্ধ্যেবেলা আমরা হাত ধরাধরি করে বেড়াচ্ছি। এক পরিচিত ভদ্রলোক সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। লোকটি অত্যন্ত আত্মম্ভরী। দীর্ঘ তত্ত্বালোচনায় তিনি আমাদের ভারাক্রান্ত করে তুললেন।

ভদ্রলোক নিজের বক্তৃতায় নিজেই বিভোর; সেই আত্মম্ভরীর কর্ণগোচর না হয়, এমনভাবে মাস্টার মহাশয় চুপি চুপি আমায় বললেন, "দেখছি, এই লোকটিকে দেখে তুমি খুশী নও। যাইহোক, মায়ের কাছে সব জানিয়েছি। তিনি আমাদের দুর্ভোগ বুঝতে পেরেছেন। মা বললেন, যেই আমরা ওধারের ঐ লালবাড়ীটার কাছে পৌঁছব, অমনি ওর একটা ভয়ানক জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে যাবে।"

আমার চোখ দু'টি সেই মুক্তিতীর্থে নিবদ্ধ হয়ে রইল। লালবাড়ীটার দরজার কাছে পৌঁছতেই লোকটি ঘুরে একেবারেই চলে গেল। না শেষ করলো তার কথা, না নিল বিদায়। বিক্ষুব্ধ পরিবেশ আবার শান্তশ্রী ধারণ করল।

আর একদিন হাওড়া স্টেশনের কাছ দিয়ে একলাই হাঁটছি। ক্ষণেকের জন্যে সেখানকার একটা মন্দিরের কাছে একটু দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটা ছোট দল, ঢোলক আর করতালের সঙ্গে উদ্দাম হয়ে গান শুরু করে দিয়েছে। আমি তাদের মনে মনে নিন্দা করছিলাম। ভাবছিলাম ঃ

"দেখেছো, কোন ভক্তিভাব ছাড়াই যন্ত্রের মত এরা নামগান করছে।" হঠাৎ অবাক হয়ে দেখলাম মাস্টার মশায় খুব দ্রুতগতিতে আমারই দিকে এগিয়ে আসছেন।

বললাম ঃ "আপনি এখানে?"

মাস্টার মহাশয় আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে যেন আমার চিন্তার প্রত্যুত্তরেই বললেন, "আচ্ছা বাবা, ঠাকুরের নাম, কি জ্ঞানী কি মূর্খ, সকলের মুখ থেকেই কি শুনতে মধুর লাগে না?" এই বলে সস্নেহে তিনি এক হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। মনে হলো যেন তাঁর যাদু কার্পেটে চড়ে ভেসে তাঁর সঙ্গে মায়ের দরবারে গিয়ে হাজির হয়েছি।

একদিন বিকালে হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "একটা বায়োস্কোপ দেখবে না কি?" প্রশ্নটা সংসার-বিরাগী মাস্টার মহাশয়ের কাছ থেকে আসাতে বেশ রহস্যময় বলেই বোধ হল। বায়োস্কোপ কথাটি তখন চলচ্চিত্র বোঝাতে ব্যবহৃত হত। আমিও তখনি রাজী হয়ে গেলাম, কারণ যে কোন উপলক্ষ্যে তাঁর সান্নিধ্য আমার অতীব প্রিয়। যাইহোক, দু'জনে তো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গোলদীঘিতে এসে পৌঁছলাম। মাস্টার মহাশয় সেখানে একটা বেঞ্চে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

মাস্টার মহাশয় বললেন, "এস, খানিকক্ষণ এখানেই বসি। গুরুদেব সর্বদাই বলতেন — কোন জলাশয় দেখলেই তার পাশে বসে ধ্যান করবে। এই নিস্তরঙ্গ রূপ — ঈশ্বরের বিরাট শান্তির ভাবটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সব জিনিষই যেমন জলে প্রতিবিম্বিত হতে পারে, তেমনি নিখিল বিশ্বজগতও বিশ্বচৈতন্য সাগরে প্রতিফলিত হতে পারে। গুরুদেব* প্রায়ই এই কথা বলতেন।"

অল্প কিছুক্ষণ বাদেই আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘরে প্রবেশ করলাম। সেখানে তখন একটা বক্তৃতা চলছিল। সেটা নীরস আর অত্যন্ত একঘেয়ে বলেই বোধ হল, যদিও স্লাইড দেখিয়ে মাঝে মাঝে একঘেয়ে বক্তৃতার ভিতর বৈচিত্র্য আনবার চেষ্টা করাও হচ্ছিল।

---

* আধ্যাত্মিক পথনির্দ্দেশককে সংস্কৃতে গুরুদেব বলে। গুরুর সঙ্গে 'দেব' শব্দ যুক্ত হলে গভীর শ্রদ্ধার ভাব উদ্রেক করে।

ভাবলাম, "তা হলে মাস্টার মহাশয় কি আমায় এই ধরণের বায়স্কোপ দেখাতে চেয়েছিলেন না কি?" আমি অধীর হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু মুখে সে রকম ভাব প্রকাশ করে মাস্টার মহাশয়ের সরল মনে আঘাত দিতে আর আমার মন চাইল না। যাইহোক, তিনি সাগ্রহে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, "তবে ত' দেখছি, তোমার এই ধরণের বায়োস্কোপ আর মনে ধরছে না। মাকে জানালাম; তিনিও আমাদের দু'জনের জন্যে সমান দুঃখিত। তিনি আমায় জানিয়ে দিলেন যে, এই হলের বৈদ্যুতিক আলোগুলো এক্ষুণি নিভে যাবে, আর আমরা হল থেকে বেরিয়ে না পড়া পর্যন্ত তা নিভেই থাকবে, জ্বলবে না।"

আশ্চর্য! যেই মাত্র তাঁর কথা শেষ হল, অমনি হলটি একেবারে অন্ধকারে ডুবে গেল। বক্তা অধ্যাপক মহাশয়ের উচ্চ কণ্ঠ বিস্ময়ে একেবারে নীরব হয়ে গেল। তারপর তিনি বলে উঠলেন, "হলের ইলেকট্রিক লাইনগুলো দেখছি সব একদম খারাপ।" এর মধ্যেই মাস্টার মহাশয় আর আমি নিরাপদে দরজায় পৌঁছে গিয়েছি। বারান্দা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম — হলঘরটি আবার আলোকিত হয়ে উঠেছে।

"বাবা, তুমি ঐ রকমের বায়োস্কোপ দেখে আদৌ খুশী হও নি দেখছি। যাক, তুমি এবার আর এক ধরণের বায়োস্কোপ দেখে নিশ্চয় খুশী হবে বলে মনে হয়।"

বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের ফুটপাথের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমার বুকে, হৃৎপিণ্ডের ওপর মৃদুভাবে আঘাত করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা নীরব আর অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। শব্দযন্ত্র হঠাৎ বিকল হয়ে গেলে আধুনিক 'টকি'র কথাবলা ছবিগুলো যেমন এক নিমেষে শব্দহীন হয়ে যায়, তেমনি ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে যেন অলৌকিকভাবে জগতের সকল আওয়াজের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। পথচারীর দল, ট্রামগাড়ি, মোটর, গরুরগাড়ি, লোহার চাকাওয়ালা "ছ্যাকড়াগাড়ি" — সবই যেন নিঃশব্দ গতিতে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। যেন একটি সর্বদর্শী চক্ষু দিয়ে সামনে পেছনে, দু'ধারে অত্যন্ত সহজভাবে সকল দৃশ্যই

বেশ পরিষ্কারভাবে দেখতে লাগলাম। কলকাতার এক ক্ষুদ্র অংশের কর্মচাঞ্চল্যের যাবতীয় দৃশ্য আমার চক্ষের সম্মুখে নিঃশব্দে ঘটে যেতে লাগল। মিহি ছাইয়ের তলায় ঢাকা আগুনের মৃদু আলোকছটার মত একটা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলো সেই সব পরিদৃশ্যের উপর যেন ছড়িয়ে পড়ছিল।

আমার নিজের দেহও সেই সব ছায়ামূর্তিদের একটির চেয়ে বেশি কিছু বোধ হচ্ছিল না — যদিও সেটা একেবারে নিশ্চল আর অন্যসকলে ইতস্ততঃ নিঃশব্দ গতিতে চলাফেরা করে বেড়াচ্ছে। কতকগুলো ছেলে, — আমারই সব বন্ধুবান্ধব — তারা কাছে এল বা চলেও গেল। আমার দিকে সরাসরি তাকালেও তারা আমায় মোটেই চিনতে পারল না।

এই অপূর্ব মূকদৃশ্য মনের মধ্যে একটা অবর্ণনীয় হর্ষোচ্ছ্বাস এনে দিল। যেন কোন এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের ধারা গভীরভাবে পান করছি। হঠাৎ মাস্টার মহাশয় আমার বুকে আবার সেইরকম মৃদুভাবে আঘাত করলেন। আবার আমার অনিচ্ছুক কর্ণদ্বয়ের মধ্যে রাজ্যের যত সব হট্টগোল হুড়মুড় করে এসে ঢুকে পড়ল। হঠাৎ আমার মধুর আর সূক্ষ্ম স্বপ্নজাল একটা রূঢ় আঘাতে ছিঁড়ে যেতে, আচমকা জেগে উঠলাম। সেই অতীন্দ্রিয় ভাবমদিরা আমার নাগালের বাইরে চলে গেল।

"এবার দেখছি যে, দ্বিতীয় বায়োস্কোপটি* তোমার বেশ ভালই লেগেছে, তাই না?" মাস্টার মহাশয় হাসছিলেন। কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে নতজানু হয়ে পায়ের উপর পড়তে যাচ্ছি দেখে, তাড়াতাড়ি আমায় ধরে ফেলে বললেন, "আরে, আরে কর কি, কর কি — এখন আর তুমি আমায় ওটি করতে পারবে না। তুমি ত' জান যে, ভগবান তোমার মন্দিরেও রয়েছেন। আমি তো আর জগজ্জননীকে তোমার হাত দিয়ে আমার পা ছুঁতে দিতে পারিনে।"

সেই জনবহুল ফুটপাথ থেকে বিনয়নম্র সরল মাস্টার মশায় আর আমাকে ধীরে ধীরে চলে আসবার সময় কেউ যদি লক্ষ্য করতো, তাহলে

---

* ওয়েবস্টার নিউ ইন্টারন্যাশনাল ডিক্সনারিতে (১৯৩৪) বায়োস্কোপের এই অর্থ — অপ্রচলিত হলেও দেওয়া আছে ঃ "জীবনের একটা ভাব; যা এরূপ ভাবদৃশ্য দেখায়।" অতএব মাস্টার মহাশয়ের নির্বাচিত কথাটি একেবারে যথাযথ।

নিশ্চয়ই তার সন্দেহ হত যে আমরা অবশ্যই নেশা করেছি। মনে হল, সন্ধ্যার ঘনায়মাণ অন্ধকারও বুঝিবা সহানুভূতিতে ভগবৎপ্রেমমদিরা পান করছে!

তাঁর এই সদাশয়তার প্রতি দুর্বল ভাষায় সুবিচারের চেষ্টা করতে গিয়ে আমি এই ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি যে, মাস্টার মহাশয় আর অন্যান্য যেসব তত্ত্বদর্শী সাধুগণের সঙ্গ আমি জীবনে লাভ করেছি, তাঁরা কি কখনো ভাবতে পেরেছিলেন যে, বহু বৎসর পরে পাশ্চাত্যের কোন এক দেশে বসে আমি তাঁদের দিব্য ভক্তজীবনের কাহিনী লিখব। তাঁদের ভবিষ্যজ্ঞানের ক্ষমতার কথায় আজ আর আমি যেমন আশ্চর্য হই না, তেমনি আশা করি আমার পাঠকবর্গ, যাঁরা এতদূর পর্যন্ত আমার এ কাহিনীটি পড়েছেন, তাঁরাও বিস্মিত হবেন না।

ঈশ্বরের ভগবতীরূপের সরল ধারণার মাধ্যমেই সর্বধর্মের মুনিঋষিগণ ঈশ্বরানুভূতি লাভ করেছেন। যেহেতু পরব্রহ্ম হচ্ছেন "নির্গুণ" এবং "অচিন্ত্য", তাই মানবিকচিন্তা আর আকাঙ্ক্ষা এই সত্তাকে জগজ্জননীরূপে কল্পনা করে একটা প্রাতিস্বিক রূপদান করেছে। প্রাতিস্বিক আস্তিক্যবাদ আর অদ্বৈতবাদ — এই দুয়ের সংযোগসাধন, হিন্দুর ঈশ্বরসাধনার একটা প্রাচীন বৈশিষ্ট্য — বেদ ও ভগবদ্গীতায় যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই দুই "বৈপরীত্যের" সমন্বয়, যুক্তি ও ভাবের সামঞ্জস্য ঘটায়। 'ভক্তি' ও 'জ্ঞান' মূলতঃ এক। "প্রপত্তি" বা ঈশ্বরে আশ্রয় গ্রহণ, আর "শরণাগতি" — ঈশ্বরানুকম্পায় পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ — বস্তুতঃ সর্বোচ্চ জ্ঞানেরই মার্গ।

ঈশ্বরই যে একমাত্র প্রাণ, তিনিই যে একমাত্র বিচারক — এই ভাবের উপর পরিপূর্ণ নির্ভরতা (শেষত্ব) হতেই মাস্টার মহাশয় আর অন্যান্য সাধুসন্তদের নম্রতাভাবের উদ্ভব। কারণ ঈশ্বরের স্বরূপই হচ্ছে আনন্দ; তাই তাঁর সঙ্গে একাত্মবোধে মানুষ সহজাত অসীম আনন্দলাভ করে থাকে। "আত্মা ও সংকল্পের প্রথম ভাবাবেশ হচ্ছে আনন্দ।"*

---

* সেন্ট জন অফ্ দি ক্রস। প্রিয় এই খ্রিস্টির সাধুটির মৃত্যু হয়েছিল ১৫৯১ সালে। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে সমাধি হতে শবোত্তোলন করে দেখা যায় যে তা অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে।

সকল যুগে যেসব ভক্ত জগন্মাতার কাছে শিশুসুলভ সরলতা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন, তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন যে মা তাঁদের সঙ্গে সদাই লীলা করে চলেছেন। মাস্টার মহাশয়ের জীবনেও এই দৈবলীলার প্রকাশ প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নানা সময়েই ঘটত। ঈশ্বরের চোখে বড়-ছোট বলে কিছুই নেই। তিনি যদিনা সম্পূর্ণ নিখুঁতভাবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরমাণু রচনা করতেন, তাহলে কি আর আজ আকাশ অভিজিৎ ও স্বাতীনক্ষত্রের মত বিরাট দেহ বুকে ধারণ করে থাকতে পারত? সৃষ্টিকর্তার কাছে "প্রয়োজন" "অপ্রয়োজনের" কোন ভেদাভেদ নিশ্চয়ই অজ্ঞাত ছিল, নচেৎ একটা আলপিনের অভাবে সারা বিশ্বসৃষ্টিটাই লোপ পেয়ে যেত!

স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ড (এ্যাটলাণ্টিক মান্থলি, ডিসেম্বর, ১৯৩৬) ব্যক্তিগত মহাজাগতিক আনন্দের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "উল্লাস বা প্রাণচঞ্চল, আনন্দোচ্ছ্বাস হতে ঢের ঢের বেশি একটা ভাব আমায় অভিভূত করে ফেলল। আনন্দের গভীরতায় আমি একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলাম। আর ঐ অবর্ণনীয় আর প্রায় অসহ আনন্দের মধ্যে প্রকাশিত হল জগতের মঙ্গল সত্তা। সকল যুক্তিতর্কের অতীত আমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হলো যে, মানুষ অন্তরে সৎ; তাদের মধ্যে অসৎ বৃত্তিটা একটা বাহ্যবস্তুমাত্র।"

১০ম পরিচ্ছেদ

মদীয় গুরুদেব স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরের দর্শনলাভ

"ঈশ্বরে বিশ্বাস যে কোন রকম অসাধ্যসাধন ঘটাতে পারে বটে কিন্তু একটি মাত্র বিষয় ছাড়া — তা হচ্ছে, না পড়ে পরীক্ষায় পাশ করা।" কথাগুলো পড়ে নিতান্ত বিরক্ত হয়েই অলস মুহূর্তে পড়তে নেওয়া সেই "ভাবোদ্দীপক" পুস্তকখানি বন্ধ করলাম।

ভাবলাম, "এই লেখক যে ব্যতিক্রমের কথা বলেছেন, তাতে করে তাঁর বিশ্বাসের একান্ত অভাবই দেখা যায়। বেচারার রাত জেগে পড়া তৈরীর উপরই যথেষ্ট ভরসা আছে দেখছি।"

পিতার কাছে প্রতিশ্রুত ছিলাম যে আমি মাধ্যমিকের পড়া শেষ করব। আমি যে পরিশ্রমী ছিলাম তা বলতে পারিনে। মাসের পর মাস ক্লাস ঘরের চেয়ে কলকাতার স্নানের ঘাটে কোন নির্জন স্থানেই আমার বেশি দেখা পাওয়া যেত। নিকটস্থ শ্মশানভূমি, বিশেষতঃ রাত্রিকালে যা বিভীষিকা উৎপাদন করে, যোগীদের কাছে তাই-ই পরম আকর্ষণীয় স্থান। মৃত্যুহীন সত্তার খোঁজে যারা ফেরে, গোটাকতক কেশহীন মড়ার খুলি দেখে নিশ্চয়ই তারা ভীত হয় না। মানুষের অসম্পূর্ণতা নানা অস্থি কঙ্কালের অন্ধকার আবাসেই প্রকট হয়ে ওঠে। তাই পড়ুয়াদের রাতজাগা থেকে আমার রাতজাগা একটু ভিন্ন রকমের ছিল।

হিন্দু হাইস্কুলের চূড়ান্ত পরীক্ষার সময় দ্রুত এগিয়ে আসছিল। পরীক্ষার প্রস্তুতির এই সময়টা শ্মশানভূমির ভয়ের মতই একটা বহুপরিচিত ভয়ের সৃষ্টি করে। তা সত্ত্বেও আমার মনে কোন উদ্বেগ ছিলনা। সাহস নিয়ে এই সব ভূতপ্রেতের রাজ্যে বিচরণ করে আমি এমন সব জ্ঞান আহরণে রত ছিলাম যা লেক্‌চার হলে পাওয়া যায় না। কিন্তু

স্বামী প্রণবানন্দের মত তো আমার আর সে ক্ষমতা ছিল না, যাতে দু' জায়গায় একই সময় উপস্থিত থাকতে পারি! আমার যুক্তি (হায়! অনেকেরই কাছে হয়ত এটা অযৌক্তিক বলে মনে হবে) ছিল — ভগবানই আমার সমস্যা দেখে আমায় তার হাত থেকে উদ্ধার করবেন। বিপদ হতে উদ্ধার করবার হাজারো রকমের উদাহরণের অবোধ্য কারণ হতেই ভক্তের মধ্যে এইরকম যুক্তিহীনতা এসে পড়ে।

একদিন বিকালে গড়পার রোডে এক সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল। বন্ধুটি বলল, "কিহে মুকুন্দ, আজকাল যে তোমার দেখা পাওয়াই যায় না!"

তার প্রীতিকোমল দৃষ্টির সম্মুখে আমি আমার সমস্যাকে উন্মুক্ত করে বললাম, "জানিস নান্টু, স্কুলে না গিয়ে আমায় বড্ডই মুশ্‌কিলে পড়তে হয়েছে।"

নান্টু ছিল খুবই ভাল ছাত্র; আমার কথা শুনে প্রাণ খুলে হাসল। অবশ্য আমার বিপদেও যে হাসির খোরাক ছিল না — তা নয়। বলল, "ফাইনাল পরীক্ষার জন্য তো তুমি কিছুমাত্র তৈরী হও নি। তা হলে তোমায় কিছু সাহায্য করার দরকার দেখছি!"

তার এই অত্যন্ত সহজ কথাগুলো কিন্তু আমার কানে দৈব আশ্বাসবাণীর মতই এসে প্রবেশ করল। কালবিলম্ব না করে বন্ধুটির বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। মাস্টার মশায়দের কাছ থেকে যে সব প্রশ্ন আসতে পারে, তার উত্তরগুলো সব মোটামুটি আমায় বুঝিয়ে দিয়ে বন্ধুবর বলল, — "এই প্রশ্নগুলোই হচ্ছে সব টোপ — যাতে সরল বিশ্বাসী অনেক ছাত্রই পরীক্ষার ফাঁদে ধরা পড়ে যাবে। আমি যে উত্তরগুলো বললাম সে সব মনে রেখো; তা হলে তুমি অনায়াসে রক্ষা পাবে।"

যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। অসময়ে পড়া তৈরী করার সঙ্গে অন্তরে প্রার্থনা করতে লাগলাম, যাতে করে সেই সাংঘাতিক দিনগুলো পর্যন্ত পড়াগুলো মনে থাকে। নান্টু আমায় অনেক পাঠ্যবিষয়েই সাহায্য করেছিল বটে, কিন্তু সময়ের অভাবে সংস্কৃতের কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিল। কাতর প্রাণে আমি ভগবানের কাছে এই মারাত্মক ভুলের কথাটাও নিবেদন করে রাখলাম।

যাক্, তার পরদিন ত' সকালবেলায় রাস্তায় একটু বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম — পায়চারি করতে করতে আমার নবলব্ধ বিদ্যা সব পারপাক করবার জন্য। গলি পথে চলতে চলতে হঠাৎ নজর পড়ল, রাস্তার একটা কোণে কতকগুলো আগাছার ওপর খানকতক ছাপা কাগজ পড়ে রয়েছে। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সেগুলো তুলে নিতেই দেখা গেল, তাতে সব সংস্কৃত শ্লোক ছাপা রয়েছে। আমার কল্পিত ভ্রান্ত অর্থ শুধরে নেবার জন্য, এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। গম্ভীর উদাত্তস্বরে সেই প্রাচীন শ্লোকগুলির সুমধুর আবৃত্তি শেষ করবার পর তিনি সেগুলিকে সন্দিগ্ধস্বরে বাতিল করার ভঙ্গীতে বললেন, — "কিন্তু এই অসাধারণ শ্লোকগুলো তো তোমার সংস্কৃত পরীক্ষায় কোন কাজে আসবে বলে মনে হয় না।"*

ঐ বিশেষ শ্লোকগুলোর ব্যাখ্যা বেশ ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা থাকাতে, পরের দিনে সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে আমার খুবই সহায়ক হয়েছিল। নান্টুর সাহায্য থেকে অন্যান্য বিষয়েও আমি পাস মার্ক পেয়ে গেলাম।

মাধ্যমিকের পড়া শেষ করে কথা রেখেছি দেখে বাবাও অত্যন্ত খুশী হলেন। আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরের চরণে নিবেদন করলাম, একমাত্র যাঁর কৃপাবলে আমি নান্টুর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম, আর পরিত্যক্ত গলিতে জঞ্জালের উপর পড়ে থাকা সেই সংস্কৃত শ্লোকছাপা কাগজের পাতাগুলো কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। লীলাচ্ছলে তিনি ঠিক সময়মত আমায় দু'দুবার সাহায্য পাঠালেন, বিপদ হতে উদ্ধার পাবার জন্য!

আবার সেই পরিত্যক্ত বইটি খুলে দেখলাম, যাতে লেখক পরীক্ষার হলে ভগবৎশক্তির প্রাধান্য অস্বীকারই করে গেছেন। মনে মনে হাসি সংবরণ করতে পারলাম না, এই ভেবে যে, যদি লেখক মহাপ্রভুকে বলি, "শ্মশানে

---

* সংস্কৃত অর্থাৎ মার্জিত বা সুসম্পূর্ণ। সংস্কৃত ভাষা হলো সকল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার জ্যেষ্ঠা ভগিনীস্বরূপা। ইহার ধ্বনিপ্রকাশক লিপির নাম — "দেবনাগরী"; যাহার বাচ্যার্থ — 'দিব্য নিবাস'। সংস্কৃত ভাষার গাণিতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদ্ মহর্ষি পানিনি বলেছেন ঃ "যিনি আমার ব্যাকরণ জানেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ।" যিনি এই ভাষার মূলে গমন করিতে পারিবেন তিনি সত্যই সর্বজ্ঞতা লাভ করিবেন।

বসে ঈশ্বরের ধ্যানই হচ্ছে স্কুলের পরীক্ষায় পাস করবার সহজ পথ, তা শুনে ত বেচারার মাথা একেবারে গোলমাল হয়ে যাবে!

যাইহোক, এই "নূতন গৌরব" লাভের পর আমি প্রকাশ্যভাবেই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে মনস্থির করলাম। আমার একটি তরুণ বন্ধু জিতেন্দ্র মজুমদারের* সঙ্গে কাশীধামের শ্রীভারত ধর্ম-মহামণ্ডলের আশ্রমে যোগদান করে সেখানকার আধ্যাত্মিক শিক্ষাগ্রহণ করতে মনস্থ করলাম।

পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বিচ্ছেদ ভাবনা একদিন মনকে খুব পীড়িত করে তুললো। মায়ের মৃত্যুর পর আমার দুই ছোট ভাই সনন্দ আর বিষ্ণু, এবং ছোট বোন থামুর উপর আমার স্নেহ আরও গাঢ়তর হয়ে উঠেছিল। আমার বহু কঠিন সাধনার† স্থল সেই চিলেকোঠার ঘরটিতে গিয়ে দ্রুত আশ্রয় গ্রহণ করলাম। প্রায় ঘণ্টা দুই অশ্রুবন্যায় প্লাবিত হবার পর আমার মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন এলো — মনে হল যেন কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমার অন্তর ধুয়ে মুছে সাফ্ হয়ে গেল। সব আকর্ষণ‡ দূরে চলে গিয়ে সকল বন্ধুর শ্রেষ্ঠ বন্ধু, একমাত্র ঈশ্বরকেই অনুসন্ধান করবার প্রবল প্রচেষ্টা আমার অন্তরে পাথরের মত দৃঢ় হয়ে চেপে বসল।

পিতার আশীর্বাদ গ্রহণ করতে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে তিনি বললেন — "আমার একটি শেষ কথা রেখো, মুকুন্দ! তুমি আমাকে আর তোমার দুঃখী ভাইবোনদের ত্যাগ করে যেয়ো না।"

বললাম, "বাবা, আপনার প্রতি আমার ভক্তির কথা আর আমি কি বলব! কিন্তু যিনি আপনার মত আদর্শ পিতা আমাকে দিয়েছেন, সেই পরম পিতার প্রতি আমার ভক্তি যে তারচেয়েও বেশি। আমাকে যেতে দিন

---

* ইনি যতীনদা (যতীন ঘোষ) নন, হিমালয়ে পলায়নের পথে যাঁর প্রবল ব্যাঘ্রভীতির কথা পাঠকের স্মরণে আছে।

† ঈশ্বরলাভের পথ বা প্রাথমিক উপায়।

‡ হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দেয় পারিবারিক আসক্তি মোহজনক, যদি তা সাধককে তার জীবনের কথা ছেড়ে দিলেও, তার স্নেহশীল আত্মীয়স্বজনসমেত যিনি সবকিছুর দাতা, সেই ভগবৎ সন্ধানের পথে বাধা উপস্থিত করে। যীশুখ্রীস্টও অনুরূপভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন, "যে আমার চেয়ে তার পিতা বা মাতাকে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়।" — ম্যাথিউ ১০ : ৩৭ (বাইবেল)।

বাবা, যাতে করে একদিন আমি আরও পরিপূর্ণ শুদ্ধজ্ঞান নিয়ে ফিরে আসতে পারি।"

পিতার অনিচ্ছাপ্রদত্ত সম্মতি সংগ্রহ করে আমি জিতেন্দ্রের সঙ্গে যোগদান করতে বেরিয়ে পড়লাম। সে ইতিমধ্যেই কাশীর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। আমি সেখানে পৌঁছতে আশ্রমের তরুণ অধ্যক্ষ স্বামী দয়ানন্দ আমায় সাদরে গ্রহণ করলেন। দীর্ঘকায়, কৃশ, চিন্তাশীল স্বামীজী মহারাজের প্রতি আমার মনে অনুকূল ধারণারই উদয় হল। তাঁর সুন্দর মুখের ওপর বুদ্ধদেবের ন্যায় একটা ধ্যানস্তিমিত গভীর প্রশান্তির ভাব।

আমার নতুন আবাসেও একটি ছোট চিলেকোঠা আছে দেখে ভারি খুশী হলাম। সেখানে আমি প্রত্যূষে এবং সকালবেলায় নিরালায় কাটাবার সুযোগ পেলাম। আশ্রমবাসীরা ধ্যানধারণার বিষয় অল্পই জানত বলে ভাবতো যে, সংগঠন কাজেই আমার সব সময়টা ব্যয় করা উচিত। সেইজন্য তাদের অফিসের কাজেই আমার বিকেলটা ব্যয় করছি দেখে আমায় প্রশংসা করতো।

একদিন সকাল সকাল সেই ছোট্ট ঘরটির দিকে চলেছি, এক সহ-আশ্রমিকের বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠস্বর কানে এসে পৌঁছল, — "ওহে, ভগবানকে এত জলদি পাকড়াতে চেষ্টা কোরো না।" স্বামী দয়ানন্দের কাছে গেলাম, দেখি যে তিনি গঙ্গার ধারে তাঁর ছোট ঘরটিতে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত!

বললাম, "স্বামীজী, আমি এখানে যে কি কাজে লাগব, তা বুঝতে পারছি না। আমি চাই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অনুভূতিলাভ। তাঁকে ছাড়া, কোন সঙ্গ, ধর্মমত বা সদাচরণ — এসব কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট নই!"

গেরুয়াবসন পরিহিত সেই সন্ন্যাসীটি সস্নেহে আমায় শুধু একটি মৃদু চপেটাঘাত করলেন। হাতের কাছে জনকতক শিষ্যকে পেয়ে তিনি কপট ভর্ৎসনার সুরে বললেন, "মুকুন্দকে তোমরা কেউ বিরক্ত কোরো না; ও আমাদের ধরণধারণ শীগ্‌গিরই শিখে নেবে।"

বিনয়ের আড়ালে আমি আমার সন্দেহ গোপন করলাম। তিরস্কার লাভ করে আদৌ অপ্রতিভ না হয়ে শিষ্যেরা সব ঘর ছেড়ে চলে গেল। দয়ানন্দজীর আমাকে আরও কিছু বলবার বাকী ছিল।

বললেন, "মুকুন্দ! দেখছি তোমার বাবা তোমায় বেশ নিয়মিত টাকা পাঠাচ্ছেন। টাকা তাঁকে ফিরিয়ে দিও; এখানে তোমার তা কিছুমাত্র দরকার নেই। আর তোমার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সংযমবিধি আহার বিষয়ে। ক্ষিদে পেলেও তুমি তা বলবে না।"

চোখে আমার ক্ষিদের আগুন জ্বলছিল কি না বলতে পারি না, তবে আমার যে দস্তুর মত ক্ষিদে পেয়েছিল তা তখন ভালরকমই টের পাচ্ছিলাম। বেলা বারটা নাগাদ আশ্রমে প্রথম আহার দেওয়া হতো। নিজের বাড়ীতে কিন্তু বেলা ন'টার মধ্যেই বেশ বড় রকমের একটি প্রাতঃরাশ খাওয়াই আমার অভ্যাস ছিল।

এই তিন ঘণ্টার ফাঁক কিন্তু দিনের পর দিনই আমার অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। হায়রে! কলকাতার সেসব দিন কবেই না চলে গেছে, — যখন দশ মিনিট দেরী করলেই রাঁধুনী বামুনকে আমি বকেঝকে অনর্থ বাধিয়ে দিতাম। এখন আর কি করি, উপায় নেই দেখে অগত্যা ক্ষিদে বশ করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। একদিন তো চব্বিশ ঘণ্টা উপোষ করেই পড়ে রইলাম। ফল এই হল যে, উদরের মধ্যে অগ্নি দ্বিগুণ বেগে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল আর আমি অধীর আগ্রহে পরদিন মধ্যাহ্নকালীন আহারের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

ভগ্নদূত জিতেন্দ্র আমার ঘরে ঢুকে এই নিদারুণ সংবাদটি ঘোষণা করে গেল, "দয়ানন্দজীর ট্রেন দেরীতে চলছে; তাঁর না এসে পৌঁছন পর্যন্ত আমরা আজ আর খেতে বসতে পাচ্ছি না।" প্রায় দু' সপ্তাহ বাইরে থাকার পর দয়ানন্দজী আজ ফিরে আসছেন; কাজেই সেই উপলক্ষ্যে নানাপ্রকার উপাদেয় ভোজ্যসামগ্রী দিয়ে তাঁর পরিপাটিরূপে সেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রবল ক্ষুধার উদ্রেককারী নানাবিধ সুখাদ্যের সৌরভে বাতাস ভরপুর। মনের তখনকার যা অবস্থা তা সহজেই অনুমেয়! কিছুই এখন না মিললে, কালকের উপবাসের দম্ভ ছাড়া আর এখন কি-ই বা নীরবে পরিপাক করা যায়?

মনে মনে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম, "তাড়াতাড়ি ট্রেনটি পৌঁছিয়ে দাও, ঠাকুর!" ভাবলাম, দয়ানন্দজী যে সব বিধিনিষেধ আমার

উপর আরোপ করে আমায় চুপ করিয়ে রেখেছিলেন, তার মধ্যে ভগবান তো আর পড়েন না। ঈশ্বরের মন হয়ত সে' সময় অন্য কোথাও ছিল! যাইহোক, ঘড়িতে অত্যন্ত মন্থর গতিতেই যেন ঘণ্টার পর ঘণ্টাগুলো কেটে যেতে লাগল। স্বামীজী যখন আশ্রমে এসে প্রবেশ করলেন, তখন সন্ধ্যা নামছে। অকৃত্রিম আনন্দেই তখন আমি তাঁকে অভ্যর্থনা করলাম।

জিতেন্দ্র একটা মূর্তিমান দুর্গ্রহের মত উদয় হয়ে এসে বলল, "এখনও খাবার দেরি আছে হে! দয়ানন্দজী এখন স্নান করবেন, ধ্যানে বসবেন, তারপর ধ্যান থেকে উঠবার পর আমরা সব খেতে বসবো।"

আমার ত' নাড়ী ছেড়ে যাবার উপক্রম! এ ধরণের ক্লেশে অনভ্যস্ত আমার তরুণ উদর, ক্ষুধার দারুণ দংশন যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হয়ে প্রবল আপত্তি জানাতে লাগল। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকেদের কঙ্কালসার মূর্তির ছবি আমার চোখের সামনে দিয়ে যেন ছায়ামূর্তির মত ভেসে যেতে লাগল।

ভাবলাম, "কাশীতে অনাহারে আর একটি মৃত্যু এই আশ্রমে এখনই ঘটল বলে।" যাক্, রাত ন'টা নাগাদ আসন্ন এ দণ্ড হতে অব্যাহতি পেলাম; আহারের জন্য অমিয় মধুর আহ্বানে। আহা! কি অমৃতবর্ষী সেই আহ্বান! স্মৃতিপটে সে রাত্রের ভোজটি জীবনের একটি স্মরণীয় মুহূর্তরূপে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে।

ভোজে গভীর মনোযোগ দেওয়া সত্ত্বেও আমি লক্ষ্য করে দেখলাম যে, দয়ানন্দজী অন্যমনস্কভাবে আহার করে চলেছেন। বেশ বোঝা গেল — তিনি আমার স্থূল ভোজনানন্দের ঊর্ধ্বে।

পরিপূর্ণ ভোজনসুখের পর স্বামীজীর পড়বার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে তিনি একলাই ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "স্বামীজী, আপনার কি আজ ক্ষিধে ছিল না?"

বললেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই, ছিল বই কি! গত চার দিন ত' আমার কোন রকম খানাপানি জোটে নি। তাছাড়া তুমি ত' জানো, ট্রেনে আমি কখনও আহার করি না। সেখানকার হাওয়া সংসারী লোকেদের নানা

কামনাবাসনায় দূষিত। আমাদের সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের শাস্ত্রীয়* বিধি নিষেধ সব আমি কঠিনভাবেই মেনে চলি।

"আমাদের আশ্রমের সংগঠন কাজের কতকগুলো জটিল বিষয় মনকে চিন্তিত করে তুলেছে। তাই আজকে আশ্রমের ভোজে আর মন দিতে পারিনি। তাছাড়া তাড়াতাড়িই বা কিসের হে? কালকেই না হয় পরিপাটিরূপে ভোজনে মন দেওয়া যাবে, কি বল?" এই বলে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন।

লজ্জায় শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু কালকের কষ্টের কথা ত' আর ভোলবার নয়, তাই সাহস সঞ্চয় করে বলে ফেললাম ঃ "স্বামীজী, আমি ত' আপনার উপদেশ ঠিক বুঝতে পাচ্ছিনা। ধরুন, আপনার উপদেশ পালন করতে গিয়ে খাবার যদি না চাই, অথবা কেউ যদি কিছু খেতেই না দেয় — তা হলে তো অনাহারে একেবারে মরেই যাব।"

"মর তাহলে।" এই নিদারুণ বাক্যে বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করে স্বামীজী বললেন, "মরতে যদি হয় তো মর, মুকুন্দ! একথা কখনও মনে ঠাঁই দিও না যে, তুমি কেবল খাওয়ার জোরেই বেঁচে আছ — ঈশ্বরের শক্তিতে নয়! যিনি সকল রকম পুষ্টির স্রষ্টা, যিনি আমাদের ক্ষুধা দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই দেখবেন যাতে তাঁর ভক্তের প্রাণরক্ষা হয়। মনেও কোরো না যে, অন্নই তোমায় বাঁচিয়ে রাখে, বা টাকাকড়ি অথবা লোকজনই তোমায় রক্ষা করে। ভগবান যদি তোমার প্রাণবায়ুটুকু টেনে নেন, তাহলে কি তারা আর তোমায় রক্ষা করতে পারবে? তারা হচ্ছে তাঁর যন্ত্র মাত্র। তোমার উদরে যে অন্ন পরিপাক হয়, তাতে তোমার নিজের কোন কৃতিত্ব আছে বলে মনে কর নাকি? মুকুন্দ, তুমি তোমার বুদ্ধিবিচারের তরবারি ধর, কর্তৃত্ববুদ্ধির শৃঙ্খল কেটে ফেল, আর সেই পরম কারণকে অনুভব করতে চেষ্টা কর।"

---

* শাস্ত্র — আক্ষরিক অর্থে "পবিত্র গ্রন্থাবলী"। শ্রেণীগতভাবে চারভাগে বিভক্ত ঃ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। এইসকল প্রবন্ধগুলিতে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ও তৎসহ আইন, ঔষধ, স্থাপত্য, শিল্পকলা প্রসঙ্গে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে। 'শ্রুতি' হলো প্রত্যক্ষ শোনা বা 'স্বয়ম প্রকাশিত শাস্ত্র, বেদ সুদূর অতীতে পৃথিবীর দীর্ঘতম মহাকাব্যদ্বয় 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ' 'স্মৃতি'গ্রন্থরূপে রচিত হয়। অষ্টাদশ "পুরাণ" হলো 'প্রাচীন' রূপকথা। "তন্ত্র" বলতে আক্ষরিক অর্থে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বোঝায়। নানাবিধ প্রতীকের আবরণে এই শাস্ত্র গভীর সত্যকেই প্রকাশ করে থাকে।

তাঁর এই সুতীক্ষ্ণ মন্তব্য আমার মজ্জার গভীরে গিয়ে প্রবেশ করল। বহু কালের ভ্রান্তি, যাতে করে দেহের দাবি আত্মাকে ছাপিয়ে চলে, তার আজ নিরসন ঘটল। সেই ক্ষণে, সেই মুহূর্তেই, আমি আত্মার সর্বার্থসিদ্ধি উপলব্ধি করলাম। পরবর্তী জীবনে অবিরাম ভ্রমণকালে কত অপরিচিত শহরে, কাশীর আশ্রমে প্রাপ্ত এই উপদেশের উপযোগিতা প্রমাণ করতে কত উপলক্ষ্য যে এসে উপস্থিত হয়েছিল, তা আর কি বলব!

কোলকাতা থেকে একটিমাত্র সম্পত্তি যা সঙ্গে করে এনেছিলাম, তা হচ্ছে মায়ের দেওয়া সাধুর সেই রূপোর মাদুলিটি। বহু বৎসর সেটিকে সযত্নে রক্ষা করে এসেছি; এখন আশ্রমে এসে সেটিকে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে আমার আশ্রমের ঘরে লুকিয়ে রাখলাম। কবচটির অলৌকিকতার কথা স্মরণ করে সেটিকে দেখে আনন্দলাভের জন্যে একদিন সকালবেলায় চাবি দিয়ে বাক্সটি খুলে ফেললাম। সীলকরা আধারটি কেউই ছোঁয় নি, কিন্তু কি আশ্চর্য! কবচটি তার ভিতর থেকে একেবারে উধাও হয়ে গেছে। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ে তার খামটা ছিঁড়ে ফেলে দেখলাম, — সত্যিই কবচটি আর নেই! সাধুটির ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে শূন্য থেকে সেটা এসেছিল, সেই শূন্যেতেই সেটা বিলীন হয়ে গেছে!

দয়ানন্দজীর শিষ্যবর্গের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ক্রমশঃই আরও অপ্রীতিকর হয়ে উঠতে লাগল। কারোর সঙ্গে মিশতাম না বলে সমস্ত আশ্রমিকরা আমায় এড়িয়ে চলত। যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা দূরে ফেলে রেখে গৃহত্যাগ করে চলে এসেছি, তার ধ্যানে আমার গভীর নিষ্ঠা কিন্তু চারদিক থেকে লঘু সমালোচনাই সৃষ্টি করেছিল।

দারুণ আধ্যাত্ম যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে একদিন সকালবেলায় সেই চিলেকোঠার ঘরটিতে প্রবেশ করলাম; প্রতিজ্ঞা করলাম যতক্ষণ না কোন নিশ্চিত উত্তর পাই, ততক্ষণ প্রার্থনা চালিয়ে যাব।

বললাম, — "করুণাময়ী মা আমার, হয় তুমি স্বপ্নে আমাকে শিক্ষা দাও, না হয় কোন সদ্‌গুরু পাঠিয়ে আমায় দীক্ষা দাও।"

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল; কত কাঁদলাম, তবুও তাঁর কোন সাড়া পেলাম না। হঠাৎ মনে হল যেন আমি অসীম শূন্যে ভেসে চলেছি!

চারপাশ হতে দেবদূতী কণ্ঠের একটি মধুর বাণী কানে ভেসে আসতে লাগল, "তোমার গুরু আজই আসছেন।"

একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আসা এক জোর আওয়াজে এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল। নীচে রান্নাঘর থেকে একটি ছোকরা পূজারী — ডাক নাম তার হাবু, — সে আমায় ডাকছে।

"মুকুন্দ, অনেক ধ্যান হয়েছে! তোমায় এক জায়গায় এক্ষুনি যেতে হবে।"

অন্যদিন হলে হয়তো একটা কড়া গোছের উত্তরও দিতাম। আজ আর কিন্তু সে সব কিছু না করে, অশ্রুস্ফীত মুখ মুছে ফেলে অত্যন্ত নিরীহভাবে হুকুম তামিল করলাম। হাবু আর আমি বেরিয়ে পড়লাম — একটু দূরে, কাশীর বাঙ্গালীটোলার ভিতর একটা বাজারের দিকে। বাজারে কেনাকাটা করবার সময় অকরুণ সূর্যদেব তখনও মধ্যগগনে আরোহণ করেন নি। আমরা তখন গৃহস্থ স্ত্রীলোক, পাণ্ডা, পুরোহিত থানপরা বিধবা, গম্ভীর স্বভাব ব্রাহ্মণ, আর সর্বত্র বিচরণশীল ধর্মের ষাঁড়ের বিচিত্র সমাবেশের ভিতর দিয়ে পথ করে এগোতে লাগলাম। হাবু আর আমি চলতে চলতে একটা অজানা সরু গলির দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি — গলির শেষ প্রান্তে, গেরুয়াকাপড় পরা যীশুখ্রিস্টের মত এক মহাপুরুষ সন্ন্যাসী নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দেখামাত্রই মনে হল যেন কত যুগযুগান্তের পরিচয় তাঁর সঙ্গে! ক্ষণেকের জন্য আমার তৃষিত দৃষ্টি তাঁর উপর আবদ্ধ হল, — পরক্ষণেই একটা সন্দেহ মনে এসে উপস্থিত হল। মনকে বোঝালাম, "মন, এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসীটিকে তোমার পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলছ। ও সব কিছু নয় স্বপ্নবিলাসী, এগিয়ে চল।"

মিনিট দশেক পরে পা দু'টো কেমন যেন অসাড় হয়ে এল। মনে হলো যেন তা পাথর হয়ে গেছে। আর এক পাও আমাকে টেনে নিতে অক্ষম। অতি কষ্টে ঘুরে দাঁড়াতেই, আশ্চর্য, তক্ষুণি পা দু'টো আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেল! বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াতেই, অদ্ভুতভাবে আবার তা ভারি হয়ে গেল।

"সাধুটি আমায় কোন আকর্ষণশক্তির বলে নিজের দিকে টানছেন!" এই ভেবে আমি হাবুর হাতে জিনিষপত্রগুলো সমর্পণ করলাম। হাবু অবাক হয়ে আমার এলোমেলোভাবে পা ফেলা দেখছিল; এখন হো হো করে হেসে উঠল।

তারপর জিজ্ঞাসা করল, — "তোমার কি হয়েছে বল ত'? মাথা খারাপ হল না কি?"

মনে তখন ভাবের উত্তাল তরঙ্গ; তাই মুখে সমুচিত কোন জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে দ্রুত ঐদিকে এগিয়ে গেলাম।

যেন হাওয়ায় উড়ে সেই সরু গলিটার ভিতর গিয়ে পৌঁছলাম। চকিতদৃষ্টিতে তাকাতেই সেই সৌম্যমূর্তি নজরে পড়ল। দেখলাম, তখনও তিনি একদৃষ্টে আমারই দিকে তাকিয়ে আছেন। দ্রুত কয়েক পা এগোতেই তাঁর চরণপ্রান্তে এসে পৌঁছলাম।

"গুরুদেব!" এই মূর্তি আমার হাজার স্বপ্নের মধ্যে দেখা তাঁর দিব্যমূর্তি ছাড়া ত' আর কারোর নয়! সিংহসদৃশ উন্নত মস্তকে ঐ দুই শান্ত চোখ, ছুঁচলো দাড়ি, আর বাবরি চুল — এ ত' প্রায়ই আমার নৈশস্বপ্নের অন্ধকার ভেদ করে উঁকি মারত, আর যে ইঙ্গিত করত, পুরোপুরি কোনদিন তাকে বুঝে উঠতে পারতাম না।

আমার গুরুদেব আনন্দকম্পিত স্বরে বাংলায় বার বার বলতে লাগলেন, "বাছা আমার, তুমি অবশেষে এলে। কত বছরধরে যে আমি তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি!"

পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে আমরা তখন দু'জনে এক হয়ে গেছি। কথা বলা তখন যেন নিতান্তই বাহুল্যমাত্র। গুরুর অন্তর থেকে শিষ্যের অন্তরে নীরব ভাষায় বাক্যের স্রোত যেন অবিরামভাবে বয়ে যেতে লাগল। অভ্রান্ত অন্তর্দৃষ্টির অ্যানটেনার সাহায্যে জানতে পারলাম যে, আমার গুরু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন আর আমাকেও তাঁর সন্নিধানে নিয়ে যেতে সক্ষম। এ জীবনের অন্ধতমিস্রা, পূর্বজন্মের স্মৃতির অচিরস্থায়ী ঊষার আলোকে অন্তর্হিত হল। একটা নাটকীয় মুহূর্ত। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ যেন তার চক্রবৎ দৃশ্যাবলী। ঐ চরণযুগলে যেন আমার এই প্রথম প্রণতি নয়।

আমার হাত ধরে তিনি কাশীর রাণামহলে তাঁর বাসা বাড়ীতে আমায় নিয়ে চললেন। তাঁর দেহ বলিষ্ঠ সুগঠিত — দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি অগ্রসর হলেন। সেইসময় তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চান্ন বছর। তাঁর দীর্ঘ ঋজু দেহ, যুবকের ন্যায় সতেজ ও কর্ম্মঠ। বড় বড় কালো সুন্দর দু'টি চোখ যেন অসীম জ্ঞানের জ্যোতিঃতে সমুজ্জ্বল। ঈষৎ কুঞ্চিত কেশ, তাঁর দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখে কোমলতা এনে দিয়েছিল। শক্তির সঙ্গে সে যেন স্নিগ্ধ পেলবতার এক মৃদু সংমিশ্রণ!

বাড়ীটি গঙ্গার ধারে। দোতলার পাথরের বারান্দায় গিয়ে বসতে, সস্নেহে তিনি আমায় বললেন, "দেখ, আমার আশ্রম আর অন্য যা কিছু আছে — সবই তোমায় দিয়ে দেব, বুঝলে?"

বললাম, "প্রভু, আমি এসেছি জ্ঞানলাভ আর ঈশ্বরোপলব্ধির আশায়; আপনার ঐসব ঐশ্বর্যগুলির ওপরেই আমার লোভ — অন্য কিছুতে নয়!"

দ্রুত ক্ষীয়মাণ গোধূলির আলো ক্রমশঃই স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল। গুরুদেবের নয়নে অতল গভীর কোমলতা। স্নেহমধুর কণ্ঠে তিনি আমায় বললেন, "তোমাকে আমি আমার নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিলাম।"

অমিয় মধুর অমূল্য সে' বাণী! পঁচিশ বছর পরে আবার তাঁর এইরকম স্নেহের আর এক একটি বাচনিক প্রমাণ পেয়েছিলাম। তাঁর ওষ্ঠে কদাচিৎ আকুলতা প্রকাশ পায়; নীরবতাই তাঁর সমুদ্রসম হৃদয়ের উপযুক্ত।

শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাসে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, — "তুমিও কি আমায় ঐ রকমই ভালবাসা দিতে পারবে?"

বললাম, — "গুরুদেব, চিরকালই আমি আপনাকে ভক্তি করব!"

নম্রমধুর স্বরে তিনি বললেন, — "সাধারণ ভালবাসা স্বার্থময়, কামনা-বাসনা পরিতৃপ্তির গাঢ় অন্ধকারের ভিতরই এর মূল দৃঢ় হয়ে থাকে। স্বর্গীয় ভালবাসা প্রতিদান চায় না; তা সীমাহীন, তার কোন পরিবর্তন নেই। অনাবিল প্রেমের পরশমণির ছোঁয়ায় মানব মনের আবিলতা চিরতরে দূর হয়ে যায়। আর দেখ, কখনও যদি তুমি আমায় ভগবদ্‌বিচ্যুত হতে দেখ, তাহলে প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার মাথা তোমার

কোলে নিয়ে আমাদের উভয়ের প্রেমের ঠাকুরের কাছে আমাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবে।"

তারপর সেই ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে তিনি উঠে পড়লেন এবং আমায় ভিতরের একটা ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। বাদামের তক্তি, আম ইত্যাদি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তার ভিতর দিয়ে আমার অজ্ঞাতসারেই তিনি আমার প্রকৃতির অন্তরঙ্গ ভাব প্রকাশ করে দিলেন। অন্তরের বিনয়নম্র ভাবের সঙ্গে তাঁর জ্ঞানের বিরাট ঐশ্বর্য দেখে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

বললেন, — "কবচের জন্যে দুঃখ কোরো না। তার কাজ ফুরিয়ে গেছে, তাই সে চলে গেছে।" আমার সারা জীবনের প্রতিচ্ছায়া আমার গুরুদেব যেন তাঁর মনের দিব্য আয়নায় প্রতিবিম্বিত হতে দেখলেন।

"আপনার সাক্ষাৎ দর্শন, গুরুদেব, দেবদর্শনের আনন্দের চেয়েও বেশি।"

"আশ্রমে তুমি এখন খুবই অস্বস্তিতে আছ দেখছি, কাজেই এখন তোমার তা বদলান দরকার।"

আমার জীবনের কোনো বিষয়ের কোনো উল্লেখই আমি করি নি। তা এখন নিতান্তই বাহুল্য বলে বোধ হল। তাঁর নিতান্ত সহজ সরল আর অত্যন্ত সাধারণভাবে কথা বলার ধরণে বুঝলাম — অলোকদৃষ্টির ক্ষমতা দেখিয়ে কাউকে তিনি চমক লাগিয়ে দিতে চান না।

তারপর তিনি বললেন, "তোমার কলকাতায় ফিরে যাওয়া উচিত। তোমার আত্মীয়স্বজনদেরই বা তোমার বিশ্বপ্রেম হতে বঞ্চিত করবে কেন, বল?"

তাঁর এই কথাতে আমার মনে কিন্তু ভয় এল! আমার পরিবারবর্গ কলকাতায় ফিরে আসবার জন্যে আমায় অনবরত তাগিদ দিচ্ছিলেন; চিঠিতে তাঁদের বহুবিধ উপরোধ অনুরোধের আমি এ পর্যন্ত কোনরকম উত্তরই দিই নি। অনন্তদা টিপ্পনী কেটে বলেছিলেন, "নবীন পাখী আধ্যাত্মিক আকাশে এখন বিচরণ করুক। সেখানকার ভারি হাওয়ায় তার ডানা শীগগিরই শ্রান্ত হয়ে পড়বে। আর আমরা এও দেখব যে সে নীড়ের

দিকে দ্রুত ফিরে আসবে আর পাখাটি গুটিয়ে আবার সে সংসারের দাঁড়ে ঠিক এসে বসবে!" এইরকম দারুণভাবে মন দমিয়ে দেওয়া উপমা — আমার মনে বরাবরই জাগ্রত ছিল; তাই কলকাতার দিকে আর "ঝাঁপিয়ে" পড়ব না বলে মনে মনে স্থির করেছিলাম।

বললাম, "প্রভু, বাড়ীর দিকে আমি আর ফিরছি না। কিন্তু আপনি যেখানে বলবেন, সেখানেই যাব। এখন আপনার নাম ঠিকানাটা একটু দয়া করে আমায় দিন।"

"স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি। প্রধান আশ্রম, রায়ঘাট লেন, শ্রীরামপুর। এখানে দিনকতকের জন্যে মাকে দেখতে এসেছি।"

ভক্তের সঙ্গে ভগবানের গূঢ়লীলার পরিচয় পেয়ে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কোলকাতা হতে শ্রীরামপুর মাত্র বার মাইল দূরে, — অথচ ঐ অঞ্চলে আমি আমার গুরুর দেখা মুহূর্তের জন্যও পাই নি। আমাদের মিলনের জন্য আমাকে লাহিড়ী মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন কাশীধাম পর্যন্ত দৌড়তে হ'ল। অবশ্য এখানকার মাটিও বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য* ও অন্যান্য যোগী মহাপুরুষদের পদরজঃপূত।

---

* শঙ্করাচার্য — ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক; তিনি ছিলেন গোবিন্দ যতি ও তাঁর গুরু গৌড়পাদের শিষ্য। গৌড়পাদকৃত 'মাণ্ডূক্যকারিকার' একটি বিখ্যাত ভাষ্য তিনি রচনা করেছিলেন। শঙ্করাচার্য তাঁর অকাট্য যুক্তি আর অপূর্ব প্রসাদগুণের সঙ্গে বিশুদ্ধ অদ্বৈত চিন্তাধারা থেকে 'বেদান্তের' ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী বহু ভক্তিপ্রেমমূলক কবিতাও রচনা করেছিলেন। তাঁর "দেব্যপরাধ ক্ষমাপণ" স্তোত্রের ধূয়া ছিল, "কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি।"

শঙ্করশিষ্য সনন্দন 'ব্রহ্মসূত্র' (বেদান্ত দর্শন)-র এক ভাষ্য রচনা করেন। পাণ্ডুলিপিখানি অগ্নিদগ্ধ হয়ে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু শঙ্করাচার্য (যিনি একবার মাত্র পুস্তকখানির মধ্যে চোখ বুলিয়ে ছিলেন), শিষ্যের কাছে তার প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তি শব্দের পর শব্দ আবৃত্তি করে যান; 'পঞ্চপাদিকা' নামে সেই গ্রন্থ, আজও বিদ্বজ্জন কর্তৃক সযত্নে অধীত হয়।

শিষ্য সনন্দন এক অনন্য ঘটনার পর একটি নতুন নাম পেয়েছিলেন। একদিন নদীতীরে বসে আছেন, এমনসময় শুনতে পেলেন গুরু শঙ্করাচার্য নদীর অপর পার হতে তাঁকে ডাকছেন। ডাক শুনেই সনন্দন জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন। গুরু শঙ্করাচার্য তাঁর বিশ্বাস আর ভক্তি অটুট রাখবার জন্য এবং নদীর উপর দিয়ে পদব্রজে গমনের জন্য, সেই ফেনোদ্বেল জলরাশির উপর কুবলয় শ্রেণীর শৃঙ্খল সৃষ্টি করলেন। সেই থেকে সনন্দনের নূতন নামকরণ হল "পদ্মপাদ"।

'পঞ্চপদিকায়' পদ্মপাদ তদীয় গুরুর উদ্দেশে বহু ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। আচার্য শঙ্কর স্বয়ং এই পঙ্‌ক্তিগুলি লিখেছিলেন, "ত্রিভুবনে প্রকৃত সদ্‌গুরুর কোন তুলনা খুঁজে পাওয়া

"তোমায় ঠিক চার সপ্তাহের মধ্যে আমার কাছে আসতেই হবে।" এই প্রথম শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কণ্ঠস্বরে কাঠিন্য প্রকাশ পেল। বললেন, — "আমার চিরন্তন স্নেহ আর তোমায় খুঁজে পেয়ে আমার কত যে আনন্দ হয়েছে তা মুখ ফুটে বললাম। এখন তুমি আমার অনুরোধ ইচ্ছে হলে উপেক্ষা করতে পারো। এর পর তোমার সঙ্গে দেখা হলে তোমার উপর আমার আগ্রহ আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। সহজে কিন্তু তোমায় আমি শিষ্য বলে গ্রহণ করছি না। আমার কঠোর শিক্ষার কাছে সম্পূর্ণ বাধ্যতা স্বীকার করে, তোমায় পরিপূর্ণভাবে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।"

তবুও আমি নিজের গোঁ ধরে চুপ করে বসেই রইলাম। গুরুদেব অবশ্য সহজেই আমার মুশকিল বুঝতে পেরে বললেন, —

"তোমার মনে বুঝি ভয় হচ্ছে, তোমার আত্মীয়স্বজনেরা তোমায় ঠাট্টা করবেন?"

"আমি বাড়ি যাব না।"

"ঠিক তিরিশ দিনের মধ্যে তোমায় ফিরতেই হবে।'

"কখনই না"। এই বলে ভক্তিভরে তাঁর চরণে প্রণাম করে মতপার্থক্যের চাপ না কাটতেই প্রস্থান করলাম। মাঝরাতের নিষ্প্রভ

যায় না। পরশপাথরকে যদি সত্যই আছে বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে সে কেবল লোহাকেই সোনায় পরিণত করতে পারে; কিন্তু তাকে আর একটা পরশপাথরে পরিণত করতে পারে না। পরমপূজ্য সদ্‌গুরু কিন্তু যে শিষ্য তাঁর চরণে আশ্রয় নেয়, তাকে নিজেরই সমকক্ষ করে গড়ে তোলেন। সদ্‌গুরু তাই তুলনাবিহীন, অপিচ তিনি লোকোত্তর।" *(Century of Verses, 1)*

আদি শঙ্করাচার্য ছিলেন একাধারে ঋষি, পণ্ডিত ও কর্মবীরের দুর্লভ সংমিশ্রণ। তিনি মাত্র বাত্রিশ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। তার অধিকাংশ সময় ভারতের নানা প্রান্তে কষ্টকর ভ্রমণ করে নিজের 'অদ্বৈত' তত্ত্ব প্রচার করেছেন। নগ্নপদ তরুণ সন্ন্যাসীর শ্রীমুখ থেকে স্বস্তিদায়ক জ্ঞানামৃত শোনার জন্যে অগণিত মানুষ সমবেত হতেন।

শঙ্করাচার্য যেসব সংস্কারসাধন করেন তার মধ্যে অন্যতম হলো প্রাচীন 'স্বামী সম্প্রদায়ের' পুনর্গঠন। তিনি ভারতের চার প্রান্তে চারটি 'মঠ' স্থাপন করেন, যথা — দক্ষিণে শৃঙ্গেরী, পূর্বে পুরী, পশ্চিমে দ্বারকা এবং উত্তরে হিমালয়ে বদরীনাথ।

রাজন্যবর্গ ও সাধারণ মানুষের অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ মহাযোগি স্থাপিত চারিটি মঠে বিনামূল্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ, ন্যায় ও বেদান্ত দর্শন শিক্ষা দেওয়া হয়। ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ স্থাপনের পেছনে শঙ্করাচার্যের উদ্দেশ্য ছিল বিশাল দেশের সর্বত্র ধর্মীয় ও জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা।

অন্ধকারে আশ্রমের দিকে চলতে চলতে ভেবে আশ্চর্য হলাম — আমাদের এই অলৌকিক সাক্ষাতের কেন এ রকম বিসদৃশ পরিণতি ঘটল। মায়ার তুলাদণ্ডে সুখের সঙ্গে সমান ভাবে আসে দুঃখ। আমার কিশোর হৃদয়, তখনও বোধহয় আমার গুরুদেবের হাতে গড়ে তুলবার মত উপযুক্ত নমনীয় হয়ে ওঠেনি!

তার পরদিন সকালেই লক্ষ্য করলাম যে, আশ্রমবাসীদের ব্যবহারে একটা বিরুদ্ধভাব বেশ বেড়ে উঠেছে। নিয়ত রুক্ষ ব্যবহারে তারা আমার দিনগুলিকে ক্রমশঃ অসহনীয় করে তুলতে লাগল। এইভাবে তিন সপ্তাহ কেটে গেল, দয়ানন্দজী বোম্বাইয়ে একটা কন্‌ফারেন্সে যোগদান করতে চলে গেলেন। আমার মাথার উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল।

একদিন কানে এসে পৌঁছল, "মুকুন্দ একটি গলগ্রহ; দিব্যি আরামে আশ্রমে আছে, প্রতিদানে কিছুই দেবার নামটি পর্যন্ত নেই।" ঐ শুনে আমি সেই প্রথম অনুতাপ করতে লাগলাম এই কথা ভেবে যে — কেন আমি পিতার কাছে টাকা ফেরৎ দেবার অনুরোধ রাখতে গিয়েছিলাম। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আশ্রমে আমার একমাত্র বন্ধু জিতেন্দ্রকে খুঁজে বার করে বললাম, "জিতেন্দ্র আমি চললাম। দয়ানন্দজী ফিরলে তাঁকে আমার ভক্তি প্রণাম জানিয়ে আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিও।"

"আমিও চলে যাব মুকুন্দ! আমারও এখানে ধ্যানধারণার চেষ্টার সুযোগ তোমার চেয়ে যে বেশি কিছু মেলে, তা নয়।" জিতেন্দ্রের স্বর দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

আমি বললাম, "জিতেন্দ্র, আমি এক ঈশ্বরকোটিক সাধুর সাক্ষাৎ পেয়েছি। চল, শ্রীরামপুরে তাঁকে দর্শন করে আসি।"

তারপর — তারপর আর কি, সেই "পাখিটি" এবার বিপজ্জনক ভাবে কলকাতার সান্নিধ্যে "ঝাঁপিয়ে" পড়তে প্রস্তুত হল।

১১ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনে দুই কপর্দকহীন বালক

"মুকুন্দ! বাবা যদি তোমায় ত্যাজ্যপুত্তুর করতেন, তাহলেই ঠিক হতো। কি বোকার মত তুমি তোমার জীবনটাকে নষ্ট করছো!" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই সুমধুর উপদেশবাণীতে আমার কর্ণকুহর আক্রান্ত হলো।

আগ্রায় তখন ট্রেন থেকে সবেমাত্র নেমেছি — সর্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত! জিতেন্দ্র আর আমি অনন্তদার বাড়ীতে এসে উঠলাম। অনন্তদা কলকাতা থেকে সম্প্রতি আগ্রায় বদলি হয়ে এসেছেন। দাদা তখন সরকারী পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের একজন সুপারভাইজিং অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট।

"অনন্তদা, আপনি ত' ভালরকম জানেন যে আমি সেই বিশ্বপিতার কাছ থেকেই আমার উত্তরাধিকার খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর কারোর কাছ থেকে নয়।"

"আরে টাকা আগে, — তোমার ঈশ্বর-টীশ্বর না হয় পরে হতে পারেন! কে জানে বাবা, জীবনটা হয়ত খুব দীর্ঘও হতে পারে!"

"ভগবানই আগে, — টাকা তাঁর দাস। কে বলতে পারে, জীবনটা স্বল্পস্থায়ীও হতে পারে!"

আমার উত্তরটা সেই মুহূর্তের প্রয়োজনে এসে জুগিয়ে গেল, কোন ভবিষ্যদ্দৃষ্টির কারণে নয়। (হায়, অনন্তদার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল তার অকালবিয়োগে)।*

"মনে হচ্ছে, আশ্রমে থেকে তোমার বেশ টনটনে জ্ঞানলাভ হয়েছে! যাক্, তুমি দেখছি যে শেষঅবধি বেনারসই ছেড়ে এসেছ!" অনন্তদার চোখ দু'টি বেশ একটা আত্মতৃপ্তির আনন্দে চক্‌চক্ করে উঠল। তখনও তিনি আমায় সংসার বন্ধনে বাঁধবার আশা করছিলেন।

---

* ২৫ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

"বেনারস যাত্রা আমার বৃথায় যায় নি। প্রাণ আমার যা চাইছিল, সেখানে তা সবই পেয়েছি। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, সেটা আপনার সেই পণ্ডিত মহারাজ বা তার পুত্রের কল্যাণে নয়!"

অনন্তদাও পূর্বকথা স্মরণ করে আমার সঙ্গে হেসে উঠলেন। তাঁকে স্বীকার করতে হল — কাশীতে যে "ভবিষ্যদ্বক্তা" তিনি জোগাড় করেছিলেন, তাঁর ভবিষ্যদৃষ্টি একেবারেই ছিল না।

"উপস্থিত ভবঘুরে ভায়ার মতলবটা কি, একটু বল দেখি!"

"জিতেনদা আমায় সঙ্গে করে আগ্রায় নিয়ে এসেছে। এখানে তাজমহল দেখে তারপর আমার সদ্যপ্রাপ্ত গুরুর কাছে যাব। শ্রীরামপুরে তাঁর আশ্রম।

অনন্তদা অবশ্য আমাদের যথোচিত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের কোন ত্রুটি করলেন না। সন্ধ্যার সময় বার কতক দেখলাম, তাঁর দৃষ্টি আমার উপর চিন্তিতভাবে নিবদ্ধ। মনে মনে ভাবলাম, "তোমার ও দৃষ্টি আমি খুব চিনি; নিশ্চয়ই একটা কিছু মতলব আঁটা হচ্ছে।"

নাটকের শেষ অঙ্কের পরিণতি ঘটল প্রাতঃরাশের সময়। কালকের কথাবার্তার সূত্রধরে অনন্তদা ফের শুরু করলেন, "তাহলে তুমি বাপের বিষয়আসয় কিছুই প্রত্যাশা কর না?" দৃষ্টি কিন্তু তাঁর নিতান্তই নিরীহ।

"ভগবানের উপরই আমার একান্ত নির্ভরতা — তিনিই আমার একমাত্র ভরসা।"

"বলা তো খুবই সোজা! জীবনটাও তোমাকে এ পর্যন্ত যা হোক রক্ষা করে চলেছে। তোমার খাকা-খাওয়ার জন্যে যদি তোমায় সেই ভগবানের অদৃশ্য হস্তের দানের প্রত্যাশায় থাকতে হত, তাহলে কি দুর্দশাটাই না আজ হত, বল দেখি? অবশ্যই তোমায় রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেড়াতে হত!"

'কখনই নয়! ভগবান ছাড়া রাস্তার লোকের উপর আমি কখনও নির্ভর করতাম না। ভিক্ষার ঝুলি ছাড়াই তাঁর ভক্তের জন্য তিনি হাজারো রকমের উপায় ঠাউরে রেখেছেন, তাও জেনে রাখবেন।"

"আরে, খুব যে বড়াই করছো! ধর, যদি তোমার কথার বড়াই-এর দাম এই সংসারের কষ্টিপাথরে যাচাই করা যায় — কেমন হয়?"

"আমি রাজি! আপনি কি মনে করেন যে, ভগবান কেবলমাত্র কল্পলোকেই বাস করেন?"

"আচ্ছা, বেশ তো দেখা যাবে। আজই তোমার সুযোগ মিলবে। তোমার না আমার, কার মতটা ঠিক, তা আজই প্রমাণ হয়ে যাবে।"

অনন্তদা একটা নাটকীয় মুহূর্তের জন্যে থামলেন। তারপর ধীরে ধীরে গম্ভীরভাবে শুরু করলেন, "শোন, আমি তোমাকে আর তোমার এই সতীর্থ জিতেন্দ্রকে আজ সকালেই এই কাছে বৃন্দাবনে পাঠাচ্ছি। সঙ্গে একটি পয়সাও নিতে পারবে না, আর খাওয়া-দাওয়া বা টাকাকড়ির জন্যেও কারোর কাছে হাত পাততে পারবে না। তোমাদের দুর্দশার কথাও কাউকে জানাতে পারবে না, অথচ না খেয়েও থাকা চলবে না বা বৃন্দাবনেও পড়ে থাকতে পারবে না। যদি আমার পরীক্ষার এই সব শর্তগুলোর একটাও না ভেঙ্গে রাত বারটার আগে আমাদের এই বাংলোয় ফিরে আসতে পার, তাহলে সত্যিই খুব অবাক হয়ে যাব!"

"আপনার চ্যালেঞ্জ স্বীকার করলাম।" আমার অন্তরে বা কথায়, কোথাও বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। ঈশ্বরের অকৃপণ দানের স্মৃতি মনের মধ্যে সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল ঃ লাহিড়ী মহাশয়ের ছবির কাছে প্রার্থনার ফলে মারাত্মক কলেরা থেকে আমার মুক্তিলাভ; লাহোরে ছাদে বেড়ানর সময় লীলাচ্ছলে আমাকে দু'টি ঘুঁড়ি প্রদান; আমার গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে আশার বাণী বহন করে বেরিলীতে সেই কবচটির আবির্ভাব; বেনারসে সেই পণ্ডিতপ্রভুর বাড়ীর উঠানের বাইরে সেই অপরিচিত সাধুর সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশ; জগন্মাতার দিব্যদর্শন ও তাঁর স্নেহসিক্ত অমিয়মধুর বাণী; আমার নগণ্য বিব্রতাবস্থায় মাস্টার মহাশয়ের মাধ্যমে তার ত্বরিত প্রতীকার; শেষমুহূর্তের সাহায্যলাভের মাধ্যমে আমার স্কুলের পরীক্ষায় সাফল্যলাভ, এবং তাঁর পরম দান — সারা জীবনের স্বপ্নকুহেলী ভেদ করে আমার জীবন্ত সদ্‌গুরুলাভ! নাঃ, কখনই আমি স্বীকার করব না যে আমার "জীবনদর্শন", সংসারের কঠিন পরীক্ষাগারে কোন লড়াইয়েরই উপযুক্ত নয়!

"তোমার আগ্রহ প্রশংসনীয় বটে! ভাল কথা, আমি তোমাদের এখুনিই ট্রেনে তুলে দিচ্ছি।" বলে অনন্তদা ব্যাদিতবদন জিতেন্দ্রের দিকে ফিরে বললেন, "শোন জিতেন্দ্র, সাক্ষী হিসেবে তুমিও ওর সঙ্গে যাবে; খুব সম্ভব ওর মত তোমারও ঠিক একইরকম দুর্দশা ঘটবে।"

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে জিতেন্দ্র আর আমি, আমাদের এই ভ্রমণের একখানি করে এক পিঠের টিকিট পেলাম। স্টেশনের একটা নির্জন কোণে আমাদের দু'জনের দেহতল্লাসী করা হল। অনন্তদা শীঘ্রই টের পেয়ে নিরস্ত হলেন যে, লুকিয়ে কোন কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিনে। আমাদের সাদাসিধে ধুতিতে, যা নিতান্ত দরকার, তার বেশি আর কোন কিছুই লুকানো ছিল না।

অর্থ বিষয়ের গুরুতর প্রশ্নে যখন বিশ্বাসের কথা উঠল তখন আমার বন্ধুটি প্রবল প্রতিবাদসহকারে বলল, "অনন্তদা, দুটো একটা টাকা অন্ততঃ আমাকে দিন, যাতে হঠাৎ দরকার হলে বা কোন ফ্যাসাদে পড়লে একটা টেলিগ্রাম অন্ততঃ করতে পারি?"

আমি চেঁচিয়ে ধমকে উঠলাম, "জিতেন্দ্র, টাকাকড়িরই উপর যদি শেষ পর্যন্ত ভরসা করতে চাও, তাহলে আমি এ পরীক্ষায় একদম যাব না, তা বলে রাখছি।"

"টাকার মিষ্টি বুলি প্রাণ ঠাণ্ডা করে হে, বোঝ তো?"

চোখ পাকিয়ে তাকাতেই জিতেন্দ্র একেবারে চুপ করে গেল।

"মুকুন্দ, আমি একেবারে হৃদয়হীন নই!" অনন্তদার কণ্ঠস্বরে একটু কোমল নম্রতার আভাস! বোধহয় তাঁর বিবেক তাঁকে দংশন করছিল হয়ত দু'টি নিঃসম্বল বালককে একটা অপরিচিত শহরে পাঠাবার জন্যে, অথবা তাঁর নিজের ঈশ্বরে বিশ্বাসের অভাবের জন্যে, তা কে জানে! "যদি কোন সুযোগে, বা ধর যদি ভগবানের দয়াতেই, তুমি বৃন্দাবনের পরীক্ষায় উৎরে আসতে পার, তাহলে আমি তোমার শিষ্য হবো।"

এই রকম একটা রীতিবর্জিত ঘটনা উপলক্ষ্যে এই ধরণের প্রতিজ্ঞার মধ্যে কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি ছিল। এদেশে বড় ভাই ছোট ভাইয়ের কাছে সাধারণতঃ কখন মাথা নীচু করে না। পিতার মতই লোকে

বড়ভাইকে সম্মান করে; কিন্তু আমার আর তখন কোন মন্তব্য প্রকাশের সময় ছিল না; ট্রেনের তখন সময় হয়ে গেছে।

ট্রেন ক্রোশের পর ক্রোশ ছুটে চলার সময় জিতেন্দ্র নীরবে বিষণ্ণ হয়েই বসে রইল। শেষে একটু নড়ে চড়ে বসে আমার উপর ঝুঁকে পড়ে শরীরের এক নরম জায়গায় একটা প্রবল চিমটি কেটে বললে, "ভগবান যে এর পর আমাদের আহার জোটাবেন তার কোন হদিশই ত' খুঁজে পাচ্ছি না।"

"ওহে অবিশ্বাসী চুপচাপ বসে থাক; ভগবান আমাদের সঙ্গেই আছেন, জান তো?"

"আচ্ছা চটপট যাতে তিনি ব্যবস্থা করেন, সেটা একটু দেখবে? এর পর অবস্থা যা দাঁড়াবে, সেকথা ভেবেও এরই মধ্যে ক্ষিদেয় আমি আধমরা হয়ে গেছি। কাশী ছেড়ে বেরিয়েছিলাম মমতাজের সমাধিস্থল দেখতে, নিজে কবরে ঢোকবার জন্যে নয়!"

"আরে ঘাবড়াও কেন জিতেন্দ্র! পুণ্যধাম বৃন্দাবনের প্রথম দর্শন আজ কি আমরা লাভ করতে যাচ্ছি না, বল ত'? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদরজঃপূত লীলাভূমিতে আজ আমাদের পদার্পণের সৌভাগ্য হবে — এ'কথা ভেবেই আমার আনন্দ হচ্ছে!"

আমাদের কম্পার্টমেণ্টের দরজা খুলে গেল। দু'টি লোক ভিতরে এসে বসল। পরের স্টেশনেই আমাদের নামতে হবে।

"ওহে বাবারা, বৃন্দাবনে তোমাদের কোন বন্ধুটন্ধু আছে না কি হে?" বলেই ঠিক আমার বিপরীত দিকে উপবিষ্ট অপরিচিত লোকটি আমাদের দিকে চাইলেন, দৃষ্টিতে তাঁর বিস্ময়কর কৌতূহল।

"আপনার তাতে কি দরকার মশাই?" বলে রুক্ষভাবে তাঁর দিক থেকে চোখ ফেরালাম।

"মনচোরার* মোহন টানে তোমরা বুঝি বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছ? আমিও একজন দীন ভক্ত, বুঝলে? তা যাক; এই অসহ্য গরমে তোমাদের

---

* মনচোরা অর্থাৎ হরি — ভক্তের নিকট শ্রীকৃষ্ণের এটি একটি প্রিয় নাম।

যাতে থাকা-খাওয়ার জোগাড় হয়, তা দেখা তো আমার এখন অবশ্য কর্তব্য!”

“না মশায়, আমাদের একলা থাকতে দিন। আপনার দয়া অসীম, কিন্তু আমরা বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছি ভেবে আপনি নিতান্তই ভুল করছেন।”

কথাবার্তা আর বেশীদূর এগোল না; গাড়ী থামল। জিতেন্দ্র আর আমি প্ল্যাটফর্মে নামতেই আমাদের সেই হঠাৎ পাওয়া সঙ্গীদ্বয় আমাদের দু'জনের দু'টি হাত জড়িয়ে ধরে একটা ঘোড়ার গাড়ী ডাকলেন।

চিরহরিৎ বৃক্ষরাজিপরিবেষ্টিত, সুবিন্যস্ত ভূমিতে অবস্থিত এক বিশাল আশ্রমের সামনে আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়াল। আমাদের উপকারী বন্ধুগণ এখানে বেশ সুপরিচিত বলেই বোধ হল। একটি সহাস্যবদন বালক এসে বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে এক প্রশস্ত বৈঠকখানায় বসাল। অনতিবিলম্বে একজন সৌম্যদর্শন বর্ষীয়সী মহিলা আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন।

ইনিই বোধ হয় আশ্রমকর্ত্রী। তাঁকে সম্বোধন করে একটি লোক বলল, “গৌরী মা, রাজকুমারেরা আজ আর আসতে পারলেন না। শেষ মুহূর্তে তাঁদের পরিকল্পনা সব বদলে গেছে; তারজন্য তাঁরা খুব দুঃখ জানিয়েছেন। কিন্তু তার জায়গায় আজ আমরা অন্য দু'জন অতিথি এনেছি। ট্রেনে তাদের উপর নজর পড়াতে কৃষ্ণভক্ত বলেই মনে হল।”

দরজার দিকে এগোতে এগোতে আমাদের পরিচিত সেই লোক দু'টি বললেন, “বন্ধুগণ, এবার তবে আসি। গোবিন্দের ইচ্ছায় আবার পরে দেখা হবে!”

মায়ের স্নেহকোমল হাসি মাখা মুখে গৌরী মা বললেন, “এস বাবা, এস; আজকের চেয়ে ভাল দিনে আর কবে তোমরা আসতে পারতে? আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক দু'জন রাজকুমারের আজ আসবার কথা ছিল। তা আর হল না। যাইহোক, আমার হাতের রান্নার কোন সমঝদার যদি না পাওয়া যেত, তাহলে বড্ডই আফশোস থেকে যেত!”

ঐ মিষ্টিমধুর কথাগুলি জিতেন্দ্রর উপর অদ্ভুত রকমের প্রভাব বিস্তার করল। বেচারা ত' আনন্দে কেঁদেই ফেলল। বৃন্দাবনে যে 'দশা' প্রাপ্ত হবে

বলে সে আশঙ্কা করেছিল, তা যে আজ এই রকম রাজোচিত সম্বর্ধনায় পরিণত হবে, তা বেচারা স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। মনের এই হঠাৎ ভাবান্তর মেনে নেওয়া তার পক্ষে অত্যধিক দুরূহ বলেই বোধ হল। আমাদের গৃহকর্ত্রী কোন কথা না বলে তাকে অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছিলেন। বোধহয় তিনি কিশোরদের খামখেয়ালীর সঙ্গে খুবই পরিচিত।

খবর এল, খাবার তৈরী। গৌরী মা আমাদের খাবার দালানে নিয়ে গেলেন; খাবারের সৌগন্ধে চারপাশ ভরপুর। সেখানে আমাদের বসিয়ে রেখে গৌরীমা পাশের রান্নাঘরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমি এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলাম! জিতেন্দ্রের শরীরে একটি মোক্ষম স্থান বেছে নিয়ে তাকে একটি মস্তবড় চিমটি কাটলাম। ট্রেনে জিতেন্দ্রের সেই মোলায়েম চিমটিটির শোধ তুলে বললাম, "হায়রে অবিশ্বাসী, দেখতে পাচ্ছ তো যে, ভগবানও কাজ করেন, এবং দ্রুতই করেন।"

গৌরী মা একটা পাখা হাতে করে ঘরে ঢুকলেন। আমরা দু'জনে চমৎকার কাজকরা দুটো কম্বলের আসনে বসতে, তিনি আস্তে আস্তে বাতাস করা শুরু করলেন।

আশ্রমের শিষ্যেরা কিছু না হোক অন্ততঃ ত্রিশ রকম আহার্যের পদ নিয়ে যাতায়াত শুরু করে দিল। "খোরাক জোটা"র চেয়ে বরং নিঃসংশয়ে একে "ভূরিভোজন" বলে বর্ণনা করাই শ্রেয়। পৃথিবীতে আগমনের পর থেকে, জীবনে এ পর্যন্ত জিতেন্দ্র আর আমি এ রকম উপাদেয় ও তৃপ্তিকর খাবার কখনও আহার করি নি।

বললাম, "মা ঠাকরুণ, এ তো রাজারাজড়াদের উপযুক্ত ভোজ! এ রকম নেমন্তন্নে না এসে আপনাদের রাজঅতিথিদের এমন কি বেশী জরুরী কাজ পড়ে গেল, তা কল্পনাও করতে পারিনা! আপনার এই ভোজন আমরা সারাজীবন মনে রাখবো!"

অনন্তদার নির্দ্দেশ মত আমাদের নীরব হয়েই থাকতে হলো — সেই করুণাময়ী মহিলাটির কাছে বলতে পারলাম না যে, আমাদের এই

ধন্যবাদের দু'টি তাৎপর্য ছিল। অন্ততঃ আমাদের আন্তরিকতা যে সুস্পষ্ট ছিল, তাতে আর কোন সন্দেহই নাই। তাঁর আশীর্বাদ মাথায় করে এবং পুনরায় আশ্রম দর্শন করবার চিত্তাকর্ষক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে, বিদায় নিলাম।

বাইরে তখন নিদারুণ গরম। জিতেন্দ্র আর আমি আশ্রমের সদর দরজার কাছে এক বিশাল কদম গাছের তলায় আশ্রয় নেবার জন্য এগিয়ে গেলাম। দু'জনার মধ্যে তীক্ষ্ণ বাক্যালাপ চলতে লাগল। জিতেন্দ্রর মনে আর এক দফা সংশয় দেখা দিল!

বললে, "তুমি আমায় আজ আচ্ছা ফ্যাসাদে ফেললে দেখছি! অবশ্য আমাদের এ ভোজটা আজকে ভাগ্যের জোরে হঠাৎ পাওয়া। কিন্তু ট্যাঁকে একটিও পয়সা না নিয়ে, কি করে এই শহরের সবকিছু দেখব বল দেখি? অনন্তদার কাছেই বা আমায় তুমি কি করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, বল?"

জবাবে বললাম, "এখন তোমার পেটটি বেশ ভরেছে কিনা, তাই ভগবানকে সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে মেরে দিলে, বেশ মজা যা হোক!" আমার কথাগুলো তিক্ত না হলেও কিন্তু অভিযোগপূর্ণ। ভগবানের করুণার কথা মানুষ কত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়! এমন কোন জীবিত মানুষ নেই যে, সে ভগবানের কাছে তার কোন না কোন প্রার্থনা পূরণ হতে না দেখেছে!

"তোমার মত বদ্ধপাগলের সঙ্গে বেরোনোর মত বোকামি আমি জীবনে কখনো করব না!"

"চুপ কর জিতেন্দ্র! যে ঈশ্বর আমাদের আজ আহার জুটিয়ে দিলেন, সেই ঈশ্বরই আবার আমাদের বৃন্দাবন দর্শন করিয়ে আগ্রায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, দেখো!"

এমন সময় এক ক্ষীণকায় প্রিয়দর্শন যুবক দ্রুতপদে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। গাছের তলায় এসে আমায় প্রণাম করে বললো, —

"বন্ধু, আপনি আর আপনার সঙ্গীটি নিশ্চয়ই আজ এখানে নতুন এসেছেন। আপনাদের অতিথিসেবা করতে আর তীর্থদর্শন করাতে আমায় অনুমতি দিন।"

ভারতীয়রা সহজে ফ্যাকাসে মারে না; কিন্তু জিতেন্দ্রের মুখ হঠাৎ যেন শুকিয়ে গেল! আমি কিন্তু সবিনয়ে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলাম।

"নিশ্চয়ই আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন না?" অন্যসময় হলে ভদ্রলোকের আতঙ্কিত মুখ দেখে হাসিই পেতো।

"নয় কেন?"

"আপনি আমার গুরু", বলে সে নিতান্ত বিশ্বাসভরে আমার দিকে চেয়ে বলল ঃ "দুপুরের পুজোর সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কল্পলোকে আবির্ভূত হয়ে এই গাছটিরই তলায় দু'টি পথহারা পথিককে দেখিয়ে দিলেন — হে গুরুদেব, তাদের মধ্যে একজন স্বয়ং আপনি, ধ্যানে যাকে আমি প্রায়ই দেখি! আমার এ দীন সেবা গ্রহণ করলে বড়ই আনন্দিত হবো!"

বললাম, "তুমি আমায় খুঁজে পেয়েছ বলে আমিও খুব খুশী হয়েছি। দেখছি, কি ভগবান কি মানুষ — কেউই আমাদের ত্যাগ করে নি!" যদিও আমি স্থির হয়ে বসে সেই ব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে হাসছিলাম, অন্তরে কিন্তু গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ভক্তিতে সেই পরম দেবতার চরণে মাথা নত করলাম।

"মশায়রা কি গরীবের বাড়ীতে একটু পায়ের ধুলো দেবেন না?"

"খুবই আপ্যায়িত হলাম! কিন্তু তা আর এখন হয় না, কারণ আমরা যে আগ্রাতে আমার দাদার বাড়ীতে এসে উঠেছি।"

"আমার অদৃষ্ট! যাক্, অন্ততঃ আপনাদের সঙ্গে বৃন্দাবন ঘুরে বেড়াবার সৌভাগ্যের স্মৃতিটুকু আমায় রাখতে দিন।"

আমি সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। যুবকটি তার নাম বললে প্রতাপ চ্যাটার্জ্জী। সে একটা ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনল। আমরা মদনমোহনের মন্দির আর শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য লীলাস্থল দর্শন করে এলাম। মন্দির দর্শন করে বেড়াতে বেড়াতে রাত হয়ে এল।

"একটু দাঁড়ান, কিছু সন্দেশ নিয়ে আসি", বলে প্রতাপ রেল স্টেশনের কাছে এক মিষ্টির দোকানে ঢুকে পড়ল। আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত একটু ঠাণ্ডা হওয়াতে জিতেন্দ্র আর আমি জনাকীর্ণ প্রশস্ত রাজপথে বেড়াতে লাগলাম। কিছুক্ষণের অনুপস্থিতির পর আমাদের বন্ধুবর নানাবিধ মিষ্টান্ন নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

"অন্ততঃ আমায় এইটুকু পুণ্য সঞ্চয় করতে দিন", বলে প্রতাপ সানুনয় হাসিতে একগোছা নোট আর সদ্যক্রীত দু'টি আগ্রার টিকিট আমাদের সামনে প্রসারিত করে ধরল।

অবশ্য তার হাত থেকে সেগুলো গ্রহণ করার সময় আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা সেই 'অলক্ষ্য হস্তের' প্রতিই সমর্পিত হল। অনন্তদা উপহাস করলেও তাঁর অজস্র দান কি আমাদের প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত ছিল না?

স্টেশনের কাছে একটা নির্জন জায়গা খুঁজে পেয়ে বললাম, "প্রতাপ, আজ তোমায় আমি বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী লাহিড়ী মহাশয়ের 'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষিত করব। তাঁর সাধন প্রণালীই হবে তোমার গুরু!"

আধ ঘণ্টার মধ্যেই দীক্ষাদান শেষ হ'ল! নবীন শিষ্যটিকে বললাম, "ক্রিয়াই তোমার চিন্তামণি।* সাধনপ্রণালী তুমি ত' দেখলে, — খুবই সহজ, এতে করে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি দ্রুত সাধিত হয়। হিন্দুশাস্ত্র বলে — দেহবদ্ধ আত্মার মায়ামুক্ত হতে দশলক্ষ বৎসর লাগে। ক্রিয়াযোগের দ্বারা এই স্বাভাবিক কাল বহুগুণ কমিয়ে ফেলতে পারা যায়। জগদীশচন্দ্র বসু যেমন দেখিয়েছেন — গাছের বৃদ্ধি তার স্বাভাবিক হার অপেক্ষা অনেকগুণ বাড়িয়ে তোলা যায়, ঠিক তেমনিভাবে মানুষের মনবৈজ্ঞানিক উন্নতিও বৈজ্ঞানিক উপায়ে দ্রুততর করে তোলা যেতে পারে। সাধনে তোমার খুব নিষ্ঠা হোক; সকল গুরুর যিনি গুরু, তাঁর কাছে তুমি নিশ্চয়ই পৌঁছবে।"

প্রতাপ ভাবতে ভাবতে বললে, "যোগের এই চাবিকাঠিটির সন্ধান বহুদিন ধরেই করেছি। আমার ইন্দ্রিয় সকলের বাঁধন ছিঁড়ে এ আমায় উচ্চলোকে পৌঁছবার পথ মুক্ত করে দেবে — এ কি কম সৌভাগ্যের কথা? আজ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলের কারণ হল।"

এক নীরব ভাবানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আমরা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম; তারপর ধীরে ধীরে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলাম। ট্রেনে যখন চাপলাম, আমার অন্তর তখন এক অপূর্ব আনন্দে উল্লসিত — কিন্তু

---

* চিন্তামণি — যে মণি অভীষ্টসিদ্ধ করতে পারে। ভগবানের একটি নাম।

আজ জিতেন্দ্রর কাঁদবার দিন। প্রতাপের কাছ হতে আমার সস্নেহ বিদায় গ্রহণ — আমার দু'টি সঙ্গীরই রুদ্ধ ক্রন্দনের আবেগে মাঝে মাঝে করুণার্দ্র হয়ে উঠছিল। এ যাত্রায় জিতেন্দ্রের দুঃখ আর এক দফা উথলে উঠল। এবার আর তা নিজের জন্যে নয়, — নিজেরই বিরুদ্ধে!

জিতেন্দ্র বলতে লাগল, "কত তুচ্ছ আমার বিশ্বাস? মন আমার একেবারে পাথর হয়ে গেছে! আর নয়, ভবিষ্যতে কখনো আমি আর ভগবানের কৃপার প্রতি কোন সন্দেহ প্রকাশ করব না।"

তখন প্রায় মধ্যরাত। দুই দীন পরিব্রাজককে কপর্দকহীনভাবে পরিভ্রমণে পাঠানর পর আবার তারা অনন্তদার শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করল। আজ আমরা সব শর্ত পালন করে এখন আবার ফিরে এসেছি! লঘু পরিহাসের ছলে বললেও এখন তাঁর মুখ বিস্ময়ে 'থ' মেরে গেল। নীরবে আমি টেবিলের উপর টাকার নোটের ধারা বর্ষণ করতে শুরু করলাম।

"জিতেন্দ্র, বলি ব্যাপার কি হে?" অনন্তদার স্বরে বিদ্রূপ মাখানো। "এ ছোকরা কোন রাহাজানি-টাহাজানি করে আসে নি তো?"

ভ্রমণ কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণনা করা হলে পর দাদা আমার প্রথমে চুপ করে থেকে পরে একেবারে গম্ভীর হয়ে গেলেন!

"চাওয়া আর পাওয়ার নিয়মটা দেখছি, যা ভেবেছিলাম তার চেয়েও সূক্ষ্মতর রাজ্যে বিস্তৃত।" অনন্তদার মধ্যে এমন আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা এর আগে কখনও দেখা যায় নি। বললেন, "আজ আমি এই প্রথম তোমার টাকার প্রতি, আর তুচ্ছ পার্থিব সঞ্চয়ে ঔদাসীন্যের কারণ বুঝলাম।"

রাত অনেক গভীর হলেও দাদা তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা* নেবার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। "গুরু" মুকুন্দকে একদিনেই দু'টি "অযাচিত" শিষ্যের ভার গ্রহণ করতে হল।

তার পরের দিনের প্রাতঃরাশ যে মধুর ঐক্য আর গভীর আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন হল, আগের দিনে তা ছিল না। আমি জিতেন্দ্রর দিকে চেয়ে

---

* দীক্ষা — আধ্যাত্মিক ব্রত গ্রহণ। সংস্কৃত 'দীক্ষ' ধাতু নিষ্পন্ন, যাহার অর্থ আত্মোৎসর্গ করা।

হেসে বললাম, "তোমাকে তাজমহল না দেখে ঠকতে হবে না। চল, শ্রীরামপুর যাবার আগে ওটা দেখেই যাই!"

অনন্তদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা শীঘ্রই আগ্রার গৌরব, তাজমহলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সূর্যকিরণোজ্জ্বল সুসমঞ্জস গঠনের এ যেন এক শ্বেত মর্মরস্বপ্ন! কৃষ্ণবর্ণ ঝাউ, চিক্কণ তৃণাস্তীর্ণ ভূমি, আর শান্ত জলাশয়ে এর পরিবেশ সুরচিত। অভ্যন্তরভাগ লেসের মত খোদাই করা অপূর্ব কারুকার্যশোভিত ও স্বল্পমূল্যের রত্নখচিত। লতাপাতার মালা ও সূক্ষ্মকারুকার্য, বেগুনী ও পীতাভ মর্মরোপরি উৎকীর্ণ। গম্বুজনিঃসৃত আলো সম্রাট শাজাহান এবং তাঁর সাম্রাজ্য ও হৃদয়রাজ্যের সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের সমাধির উপর স্নিগ্ধ মায়া রচনা করেছে!

যাক্, অনেক বেড়ান তো হল। গুরুদেবের জন্যে তখন আমার প্রাণ ব্যাকুল। জিতেন্দ্র আর আমি শীঘ্রই ট্রেনে চড়ে দক্ষিণদেশে বাংলার দিকে রওনা হলাম।

জিতেন্দ্র বলল, "মুকুন্দ, কত দিন যে হল, আমি বাড়ীর লোকজনদের মুখ দেখিনি! আমার ইচ্ছা এখন বদলেছে। পরে না হয় শ্রীরামপুরে তোমার গুরুদেবকে দর্শন করে আসা যাবে।"

বন্ধুটি, যাকে মৃদুভাবে বললে, অস্থিরচিত্ত বলা যায় — আমায় কোলকাতায় ছেড়ে রেখে গেল। কোলকাতা থেকে মাত্র বার মাইল উত্তরে শ্রীরামপুর; শীঘ্রই আমি সেখানে লোকাল ট্রেনে পৌঁছে গেলাম।

কাশীতে গুরুদেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আটাশ দিন কেটে গেছে। যখন তা বুঝতে পারলাম, সর্বশরীরে তখন একটা বিস্ময়ের শিহরণ অনুভব করলাম!

গুরুদেব বলেছিলেন, "চার সপ্তাহের মধ্যেই তোমায় আমার কাছে আবার আসতে হবে!" আজ আমি এখানে দুরু দুরু বক্ষে, শান্ত আর নির্জন রায়ঘাট লেনে, তাঁর বাড়ির উঠানে দাঁড়িয়ে। জীবনে সর্বপ্রথম আমি সেই আশ্রমে প্রবেশ করলাম, যেখানে ভারতের 'জ্ঞানাবতার'-এর সঙ্গে আমার জীবনের পরবর্তী দশবছরের বেশিরভাগটাই কাটাতে হবে!

১২ পরিচ্ছেদ

আমার গুরুর আশ্রমে কয়েক বছর

"যাক, শেষপর্যন্ত তুমি এসেই পড়লে দেখছি।" সামনে বারান্দা, তার পিছনে বসবার ঘর। সেখানে মেঝেতে বাঘছালের আসনে বসে শ্রীযুক্তেশ্বরজী, আমায় সাদর সম্ভাষণ জানালেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বর উত্তাপবিহীন, ভাব আবেগশূন্য।

নতজানু হয়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে বললাম ঃ "আজ্ঞে হ্যাঁ গুরুদেব, আপনার চরণে এখন আশ্রয় নিলাম।"।

"তা কি করে হয় বল? তুমি তো আমার কোন কথাই মান না।"

"আর কখনো হবে না! আপনার ইচ্ছাই হবে আমার কাছে আদেশ।"

"তাহলে ভাল। এখন তোমার জীবনের দায়িত্ব আমি নিতে পারি।"

"গুরুদেব! স্বেচ্ছায় আমি আমার সকল ভার আজ আপনার উপর সমর্পণ করলাম।"

"আচ্ছা, তাহলে আমার প্রথম আদেশ হচ্ছে — তুমি এখন তোমার বাড়ীতে ফিরে যাও। আমি চাই, তুমি কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করতে থাক।"

তাই হবে গুরুদেব। [illegible] বছরের পর বছর ধরে সেই একঘেয়ে বই নিয়েই কি আমায় দিন কাটাতে হবে? আগে পিতা সেই কথা বলেছেন এখন আবার শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীও ঐ একই কথা বলছেন!

"একদিন তোমায় পশ্চিমে যেতে হবে। সেখানকার লোকেরা ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞানের বিষয় আরও মন দিয়ে শুনবে, যদি তারা দেখে যে, সেই হিন্দু গুরুর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী আছে।"

"আপনিই ভাল জানেন গুরুজী।" মনের দুর্ভাবনা এখন কেটে গেল। পশ্চিমে যাওয়ার উল্লেখ আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় আর রহস্যময় বলেই বোধ হ'ল। কিন্তু এখন গুরু আজ্ঞা পালন করে তাঁর সন্তোষবিধান করাই হচ্ছে আমার একমাত্র কাজ।

"তুমি তো কাছে এই কলকাতাতেই থাকবে। তবে আর কি, ফুরসৎ পেলেই চলে এসো!"

"সম্ভব হলে রোজই আসব গুরুদেব! কিন্তু আমার জীবনের উপর আপনার সর্বময় কর্তৃত্ব আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে মানতে পারি — তবে একটি মাত্র শর্তে ...."

"কি, বল?"

"— যে আপনি আমায় ভগবদ্দর্শনলাভ করিয়ে দেবেন বলুন?"

ঘণ্টাখানেক ধরে বাগ্‌যুদ্ধ চলল। গুরুবাক্য মিথ্যা হবার নয়, আর তা লঘুভাবে দেওয়াও যায় না। এরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদানের অর্থ হচ্ছে বিশাল আধ্যাত্মিক জগৎ উন্মুক্ত হবার বিরাট সম্ভাবনা। শিষ্যকে ভগবৎ-সাক্ষাতকার লাভ করিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতির অর্থ — গুরুরও অবশ্য ঈশ্বরানুভূতি হওয়া চাই। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর ঈশ্বর-সান্নিধ্যলাভের কথা আমি অন্তরে বুঝতে পেরেছিলাম বলেই মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করেছিলাম যে, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আমায় ঐ সুযোগটি সদ্ব্যবহার করতে হবে।

বললেন, "তুমি দেখছি নেহাতই নাছোড়বান্দা!" তারপর গুরুদেব শেষপর্যন্ত সস্নেহ সম্মতিপ্রদানে ব্যাপারটির চরম নিষ্পত্তি করে বললেন ঃ

"বেশ, তোমার ইচ্ছেই হোক আমার ইচ্ছে।"

জীবনব্যাপী এক অন্ধকার যবনিকা আমার মন হতে অপসৃত হল। ইতস্ততঃ নিরর্থক অনুসন্ধানের পালা আজ শেষ! আজ আমি প্রকৃত সদ্‌গুরুর চরণে চিরআশ্রয় লাভ করলাম।

"চল, তোমায় আশ্রম দেখিয়ে নিয়ে আসি।" এই বলে গুরুদেব বাঘছালের আসন থেকে উঠে পড়লেন। চারপাশে তাকাতে তাকাতে

সবিস্ময়ে দেখলাম — দেওয়ালে একটি ছবি যুঁইফুলের মালা দিয়ে সযত্নে সাজান!"

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, "লাহিড়ী মহাশয়!"

"হ্যাঁ, আমার গুরু-দেবতা!" শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কণ্ঠস্বর ভক্তিকম্প্র। বললেন, "আমার সাধনপথে যে সব গুরুদের সাক্ষাৎ পেয়েছি, কি মানুষ আর কি যোগী হিসেবে তাঁদের যে কোন জনের চেয়ে উনি মহত্তর।"

নীরবে আমি সেই অতিপরিচিত ছবির তলায় গিয়ে ভক্তিভরে মাথানত করলাম। আমার আত্মার প্রণতি, সেই অদ্বিতীয় গুরুর চরণে গিয়ে পৌঁছল — যিনি আমার শৈশবে আমায় আশীর্বাদ করে আজকের এই শুভমুহূর্ত পর্যন্ত আমাকে পরিচালিত করে এসেছেন।

গুরুদেবের সঙ্গে আমি তাঁর বাড়ী আর তার সংলগ্ন জায়গাজমি ঘুরে দেখলাম। আশ্রম বাড়ীটি বেশ বড়, প্রাচীন ধরণের আর সুগঠিত। বড় বড় থাম দিয়ে ঘেরা উঠান। বাইরের দেওয়ালগুলি শেওলাপড়া। সমতল ছাদের উপর পায়রার দল সব উড়ে বেড়াচ্ছে। আশ্রমের নানা অংশ দখল করে তারা বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে বাস করছে। পেছন দিকের বাগান আম, কাঁঠাল, কলা ইত্যাদি নানাজাতীয় ফলের গাছে সাজান। দোতলা বাড়ীটির তিন দিকের ঘরগুলিই উঠানের দিকে মুখ করা। তার বারান্দা রেলিং দিয়ে ঘেরা। বড় বড় থামের উপর খুব উঁচু ছাদওয়ালা ঠাকুর দালান; গুরুদেব বললেন — এখানে দূর্গাপূজা হোত। একটি সরু সিঁড়ি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর বসবার ঘরে গিয়ে পৌঁচেছে। রাস্তার ধারে ঘরসংলগ্ন একটা ছোট বারান্দা। আশ্রমের সাজসজ্জা সরল ও অনাড়ম্বর। সবই বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, আর প্রয়োজনীয়। কতকগুলো বিলাতি ধরণের টেবিল চেয়ার আর বেঞ্চিও দেখা গেল।

গুরুদেব সে রাতটা আশ্রমে থেকে যেতে বললেন। দু'টি তরুণ শিষ্য নিরামিষ তরকারী আর খাবার দিয়ে গেল। শিষ্য দু'টি আশ্রমে থেকেই শিক্ষালাভ করছে।

গুরুদেবের বাঘছালের আসনের কাছে একটা কুশাসনে আমি বসেছিলাম। বললাম, "গুরুজী, আপনার জীবনের কথা কিছু বলুন।" মনে হচ্ছিল, আকাশের তারাগুলো খুব কাছেই নেমে এসেছে — বারান্দার অদূরেই।

গুরুদেব বলতে লাগলেন, "সাংসারিক জীবনে আমার নাম ছিল প্রিয়নাথ কড়ার। এই শ্রীরামপুরেই আমার জন্ম।* পিতা ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি এই পৈতৃক বাড়ীটি আমায় দিয়ে গেছেন, এখন যা আমার আশ্রম। স্কুলের সাধারণ শিক্ষা আমার বেশীদূর এগোয়নি। আমার কাছে তা অত্যন্ত মন্থর আর অগভীর বলে মনে হতো। জীবনের গোড়ার দিকে আমায় সংসারী হতে হয়েছিল। একটি মেয়ে আছে; তার বিয়ে হয়ে গেছে। মধ্যবয়স লাহিড়ী মহাশয়ের আশীর্বাদপূত! স্ত্রীর মৃত্যুর পর সন্ন্যাস গ্রহণ করি; নতুন নাম হয় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি।† এই হচ্ছে আমার সরল জীবনবৃত্তান্ত।"

আমার আগ্রহব্যাকুল মুখের দিকে চেয়ে গুরুদেব মৃদু হাসলেন। সকল জীবনালেখ্যের মত, তাঁর কথাগুলিতে কেবল বাইরের মানুষটিরই পরিচয় ছিল — ভিতরের আসল মানুষটি কিন্তু লুকোনই রয়ে গেল।

বললাম, "গুরুদেব, আপনার ছেলেবেলাকার কথা কিছু শুনতে ইচ্ছে করছে।" শ্রীযুক্তেশ্বরজী সতর্কীকরণের ভঙ্গীতে চোখ দু'টি তুলে বললেন, — "আচ্ছা, তবে দু'চারটে ঘটনা বলি শোন। মা একদিন একটা অন্ধকার ঘরে ভূত আছে বলে আমায় ভয়ঙ্কর ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। আমি তখনই সেই ঘরে ঢুকে ভূত না দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে এলাম। মা এরপরে আর কোনদিন আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেন নি। নীতি হচ্ছে — ভয়ের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াও; তাহলেই সব উৎপাত থেমে যাবে।

"ছেলেবেলাকার আর একটা কথা মনে পড়ছে। একবার আমাদের এক প্রতিবেশীর একটা অত্যন্ত কুৎসিত কুকুর নিতে আমার ভয়ানক ইচ্ছে হ'ল।

* শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী ১৮৫৫ সালের ১০ই মে তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

† যুক্তেশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত। 'গিরি' হলো দশনামী স্বামী সম্প্রদায়ের এক পদবী।

সেই কুকুরটাকে পেতে কয়েক সপ্তাহধরে আমি বাড়ীর লোকেদের একেবারে উত্যক্ত করে তুলেছিলাম। সেটার চেয়ে দেখতে আরও বেশি সুন্দর কুকুর দিতে চাইলেও তা কানে তুলতাম না। এর নীতি হচ্ছে — মোহ অন্ধ; এ প্রার্থিত বস্তুটিকে ঘিরে একটা কাল্পনিক আকর্ষণের মায়াজাল রচনা করে।

"তৃতীয় গল্পটি হলো কিশোর মনের সৌকুমার্যের উদাহরণ। মাঝে মাঝে মাকে বলতে শুনতাম ঃ 'কারোর কাছে কেউ চাকরি স্বীকার করলে সে তার ক্রীতদাসই হয়ে পড়ে।' ঐ ধারণা আমার মনে এমন দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, বিবাহের পরেও আমি সব চাকরি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। পৈতৃক ধন আমি সব জমিজমাতেই লগ্নী করে খরচপত্র চালাতাম। এখানে নীতি হচ্ছে — শিশুদের সরল মনে সৎ আর সুস্পষ্ট উপদেশ প্রদান করা উচিত। শিশু বয়সের ধারণা বহুদিন মনে দাগ কেটে বসে থাকে।"

গুরুদেব শান্ত মৌনতায় ডুবে গেলেন। রাত একটু বেশি হতে একটি সরু খাটিয়ার উপর শোবার ব্যবস্থা করে দিলেন। গুরুর আশ্রমে প্রথম রাত্রির নিদ্রা বেশ গাঢ় আর মধুরই হয়েছিল।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তার পরদিন সকালেই আমায় 'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষা দেবেন বলে স্থির করলেন। পিতা এবং আমার সংস্কৃত শিক্ষক স্বামী কেবলানন্দজী — লাহিড়ী মহাশয়ের এই দুই জন শিষ্যের কাছে ইতিমধ্যেই আমি ক্রিয়াযোগ প্রণালী শিক্ষা করেছিলাম। কিন্তু গুরুদেবের মধ্যে ছিল রূপান্তর সাধনের শক্তি। তাঁর স্পর্শমাত্রই যেন আমার সর্বশরীরে একটা প্রচণ্ড জ্যোতির প্লাবন বহে গেল। মনে হলো যেন কোটি সূর্য একসঙ্গে জ্বলে উঠলো। এক অফুরন্ত আনন্দের বন্যা আমার অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত প্লাবিত করলো। পরদিন বিকালের দিকে আশ্রম থেকে বিদায় গ্রহণ করলাম।

কলকাতার বাড়ীর দরজায় প্রবেশ করবার সময় গুরুদেব যে আমার ত্রিশ দিনের মধ্যে ফিরবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা মনে পড়ে গেল। 'উড়ন্ত পাখী'র আবার নীড়ে ফেরার টিট্‌কারি, যা আমি আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে শুনবো বলে ভয় করেছিলাম, তা অবশ্য কেউ বলেনি।

চিলেকোঠায় ঢুকে, যেন কেউ সশরীরে বর্তমান ভেবে ঘরের চারাদকে তাকিয়ে বললাম, "ঠাকুর, আপনি ত' সবই দেখেছেন, — আমার ধ্যানধারণা, সাধনায় নানা বাধাবিপত্তি, — সবকিছু। আজ আমি আমার সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছি।"

শান্ত-নীরব সন্ধ্যায় পিতার কাছে বসেছিলাম। পিতা বললেন, "বাবা, আজ আমরা দু'জনেই সুখী। আমি যেমন দৈবক্রমে আমার গুরু খুঁজে পেয়েছিলাম, তুমিও আজ তেমনি তোমার গুরু খুঁজে পেয়েছ। লাহিড়ী মহাশয়ের পুণ্যহস্তই আমাদের জীবন চালিত করছে। তোমার গুরুদেব হিমালয়ের কোন অনধিগম্য সাধু নন, — নিতান্তই কাছের লোক। আজ আমার প্রার্থনা সফল হয়েছে। তুমি ঈশ্বরের খোঁজে বেরিয়ে আমার চোখের সামনে থেকে চিরতরে আড়াল হয়ে যাও নি।"

পিতা এও শুনে খুশী হলেন যে, আমার নিয়মিত পাঠাভ্যাস আবার শুরু হতে যাচ্ছে। তিনি তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও করে দিলেন। তার পরদিনই আমি কাছাকাছি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হলাম।

খুব আনন্দে সময় কাটতে লাগল। আমার পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই সঠিক অনুমান করতে পেরেছেন যে, কলেজের ক্লাসে আমার অতি অল্পই দর্শন মিলত। শ্রীরামপুর আশ্রমের আকর্ষণ আমার কাছে দুর্নিবার। গুরুদেব আমার নিয়মিত উপস্থিতিতে কোনরকম প্রশ্ন করতেন না। পরম আশ্বাসের কথা — তিনিও কলেজের কথা কদাচিৎ উত্থাপন করতেন। যদিও সকলে পরিষ্কার জানত যে পণ্ডিত হবার জন্যে আমি তৈরী হই নি, তবুও মাঝে মাঝে অন্ততঃ পাস মার্ক রেখে চলতাম।

আশ্রমের দৈনন্দিন জীবনের ধারা প্রায় বৈচিত্র্যহীন — সহজ ও সরল। খুব ভোরেই গুরুদেবের নিদ্রা ভঙ্গ হত। শুয়ে শুয়েই অথবা কখনও কখনও বিছানার উপর বসেই, তিনি 'সমাধিস্থ' হতেন।* গুরুদেবের কখন নিদ্রা ভঙ্গ হত তা জানা অতি সহজ ছিল। এবং তা হচ্ছে গভীর নাসা গর্জন† হঠাৎ

* 'সমাধি' হলো আক্ষরিক অর্থে 'একত্রে চালিত করা'। পরমানন্দের অতীন্দ্রিয় অনুভব, যাতে করে যোগী জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য উপলব্ধি করেন।

† নাসা গর্জন — শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণের মতানুযায়ী পরিপূর্ণ বিশ্রামের লক্ষণ।

থেমে যাওয়া। দু'একবার গভীর নিঃশ্বাস, হয়ত বা একটুখানি শরীরের নড়াচড়া, তারপর শ্বাস-প্রশ্বাসহীন নিস্তব্ধভাব। তখন তিনি গভীর যোগানন্দে মগ্ন।

ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাতঃরাশ জুটত না। প্রথমে গঙ্গার ধারে খুব খানিকটা ঘুরে আসতাম। গুরুদেবের সঙ্গে সেই সব প্রাতঃভ্রমণ, আজও মনে কত গভীর ও উজ্জ্বল হয়ে গাঁথা আছে। স্মরণমাত্রই মনে পড়ে, — তাঁর পাশে আমি। ঊষার অরুণকিরণ জলে ছড়িয়ে পড়ছে। তাঁর কণ্ঠস্বর কানে এসে বাজছে — উদাত্ত, জ্ঞানগম্ভীর।

অতঃপর স্নান এবং তারপর মধ্যাহ্ন ভোজন। গুরুদেবের দৈনিক ব্যবস্থাপনার অধীনে আশ্রমের ব্রহ্মচারীদেরই সযত্নে রান্নাবান্না তৈরী করতে হতো। গুরুদেব ছিলেন নিরামিষাশী। সন্ন্যাস নেবার আগে অবশ্য মাছ ও ডিম খেতেন। শিষ্যদের কিন্তু তিনি উপদেশ দিতেন — শরীরে যা সয়, সেইরকম সাদাসিধে জিনিষই খাওয়া উচিত।

গুরুদেব ছিলেন স্বল্পাহারী। আহার ছিল — ভাত, একটু হলুদ বা বীট অথবা পালমের রস দিয়ে রাঙান, তাতে একটু ভঁয়সা বা মাখন গলান ঘি। কোনদিন বা মসুর ডাল, কিম্বা একটু ছানার ডালনা আর নিরামিষ তরকারী। সবশেষে আম কিম্বা কমলালেবু, তার সঙ্গে একটু পায়েস অথবা কাঁঠালের রস।

অভ্যাগতরা সব বিকালের দিকেই আসতেন। নানা অঞ্চল থেকে মানুষজন ঐ শান্ত আশ্রমে নিয়ত আসতেন। গুরুদেব সকল অভ্যাগতকেই সৌজন্যের সঙ্গে অভ্যর্থনা ও আপ্যায়ন করতেন। যে সদ্‌গুরু নিজেকে আত্মা বলে জেনেছেন, যাঁর কাছে দেহাভিমান বা অহঙ্কার বলে কিছু নেই, তিনি সব মানুষের মধ্যেই এক অপরূপ সমতা খুঁজে পান।

সাধুদিগের সমদৃষ্টির মূল হচ্ছে আত্মজ্ঞানে। সদ্‌গুরুদের উপর মায়ার রূপভেদী মুখসকল কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না। অজ্ঞানী লোকদের বিচারবুদ্ধি বিভ্রান্তিকর; ভাল বা মন্দ লাগা যা তাদের বিচারবুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে, তার দ্বারা সদ্‌গুরু চালিত হন না। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কোন রকম ক্ষমতাশালী, ধনী বা বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে

আলাদা করে বিশেষ আপ্যায়ন করতেন না। আবার যারা দীন বা মূর্খ, তাদেরও কোন অবহেলা করতেন না। সত্যকথা তিনি বালকের মুখ থেকেও যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গেই শুনতেন, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে আত্মম্ভরী পণ্ডিতকেও প্রকাশ্যে অবহেলা করে চলতেন।

রাত আটটার সময় নৈশভোজনের ব্যবস্থা ছিল। তাতে কখনও কখনও অপেক্ষমাণ অতিথি-অভ্যাগতগণও যোগদান করতেন। গুরুদেব কখনও একলা খেতে বসতে পারতেন না। ক্ষুধার্ত বা অতৃপ্ত হয়ে কেউ তাঁর আশ্রম থেকে ফিরতে পারত না। অপ্রত্যাশিত অতিথিসমাগমে কখনও তিনি বিব্রত বা বিরক্ত হতেন না। তাঁর উদ্যোগী পরিচালনার গুণে সামান্য উপকরণত তখন রাজভোজ হয়ে দাঁড়াত। তবুও তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন; তাঁর অল্প পুঁজিতেই অনেক কিছু ব্যবস্থা হয়ে যেত। তিনি প্রায়ই বলতেন, "তোমার যা আছে তাই দিয়েই গুছিয়ে চালাবে। অতিরিক্ত খরচে নানা অসুবিধা আর হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়।" কি আশ্রমে উৎসবের আয়োজনের খুঁটিনাটি বিষয়ে, কি ঘরদুয়ার মেরামতের কাজে, কিম্বা অন্য কোন করণীয় ব্যাপারে বা কাজে, গুরুদেব সৃজনীশক্তির মৌলিকত্ব প্রদর্শন করতে পারতেন।

স্নিগ্ধসন্ধ্যার শান্ত পরিবেশে গুরুদেবের সঙ্গে বহু তাত্ত্বিক আলোচনাই হতো। কালের বিচারে সে'সব এক অক্ষয় সম্পদ। তাঁর প্রতিটি বাক্য জ্ঞানের প্রখরতায় সমুজ্জ্বল। একটা মহান আত্মপ্রত্যয় তাঁর কথা বলার ভঙ্গীতে পরিস্ফুট হতো — যা একেবারে অনন্য! আমার জ্ঞানে তো তাঁর মত বক্তা আমি আর কাউকেই দেখিনি। শব্দের আবরণে বাইরে প্রকাশ করার পূর্বে তাঁর চিন্তাধারাকে তিনি সম্যক বিচারের সূক্ষ্ম মানে তৌল করে নিতেন। সত্যের সারাৎসার, যা শারীরিক গুণসম্পন্ন ও সর্বব্যাপী — তা আত্মার সৌরভের মতই তাঁর মধ্যে থেকে নির্গত হতো। সর্বদাই আমার মনে হত যেন ভগবানের এক মূর্তপ্রকাশ আমার সামনে উপস্থিত। তাঁর দেবত্বের গৌরবভারে আমার মস্তক আপনাআপনিই নত হয়ে আসত।

যদি অপেক্ষমাণ অতিথিরা বুঝতে পারতেন যে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী সমাধিতে মগ্ন হয়ে পড়ছেন, তাহলে তক্ষুনি তিনি তাদের সঙ্গে আলাপ

জুড়ে দিতেন। কোন চমকপ্রদ ভঙ্গী বা ভাবে মগ্ন হয়ে পড়া, বা আত্মজ্ঞান জাহির কখনো করতেন না। সর্বদাই ব্রহ্মানন্দে মগ্ন বলে, ধ্যানধারণার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় তাঁর ছিল না। ঈশ্বরোপলব্ধি যাঁর হয়েছে সেই সদ্‌গুরু ধ্যানাভ্যাসের প্রাথমিক সোপান পূর্বেই অতিক্রম করেছেন। "ফল ধরলে ফুল আপনা আপনিই খসে পড়ে।" তথাপি সাধুসন্তরা শিষ্যদিগের উৎসাহ বর্ধনের জন্যই সাধনভজনের বাহ্য অনুষ্ঠানাদিতে লিপ্ত থাকেন।

রাত গভীর হয়ে এলে পর শিশুর মতই গুরুজী ঢুলতে শুরু করতেন। বিছানাপত্র করার বিশেষ কোন হাঙ্গামা ছিল না। প্রায়ই তিনি একটা সরু লম্বা সোফায়, এমনকি বিনা বালিশেই শুয়ে পড়তেন। তার উপর তাঁর সেই সর্বদা ব্যবহার করা বাঘছালের আসনটি পাতা থাকত।

সারারাত ধরে দার্শনিক তত্ত্বালোচনাও মাঝে মাঝে হতো, — কোন শিষ্য একটু বেশি আগ্রহ প্রকাশ করলেই তা শুরু হয়ে যেত। আমার তখন কোন প্রকার ক্লান্তি বা ঘুমোবার ইচ্ছাও আসত না। গুরুদেবের প্রাণবন্ত কথাই ছিল যথেষ্ট। সারারাত আলোচনা চলবার পর হয়তো একসময় বলে উঠতেন, "ওঃ, ভোর হয়ে গেছে হে! চল, গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে আসি।" আমার বহু রাতভোর জ্ঞানানুশীলনের এইভাবে অবসান ঘটতো।

শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সাহচর্যে থাকবার সময় গোড়ার দিকে আমার একটি প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ হয় ঃ "কি করে মশার হাত এড়ান যায়।" বাড়ীতে সকলেই রাত্রিতে মশারি ব্যবহার করত। শ্রীরামপুর আশ্রমে এসে সভয়ে আবিষ্কার করলাম যে, এই সুবিবেচিত প্রথাটি পালনের বদলে লঙ্ঘনই বেশি কষ্ট হয়। শ্রীরামপুরে মশার প্রবল উৎপাত; আমাকে তো সারা দেহে কামড় দিত। তাই দেখে গুরুজীর দয়া হল।

হেসে বললেন, "তোমার জন্যে একটি মশারি কিনে এনো, আর আমার জন্যেও একটা, — কারণ তোমার নিজের জন্যে একটা মশারি কিনলে, মশাগুলো সব আমাকেই এসে ছেঁকে ধরবে!"

অতিশয় কৃতজ্ঞতা সহকারে আজ্ঞাপালনে তৎপর হলাম। শ্রীরামপুরে থাকলে প্রতিরাত্রিতেই গুরুদেব আমায় মশারি টাঙিয়ে দিতে বলতেন।

একদিন রাত্রিবেলায় মশকদল ত' প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ শুরু করল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে রাত্রিতে গুরুদেব আমায় অভ্যস্ত নির্দেশ দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। ভীতকম্পিত হৃদয়ে তাদের আবির্ভাবসূচক গুন্‌গুন্ শব্দ শুনতে লাগলাম। বিছানায় প্রবেশ করে তাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমার প্রতি প্রসন্ন হবার জন্য কাতর প্রার্থনা নিবেদন করলাম। আধ ঘণ্টাটাক বাদে আর উপায়ন্তর না দেখে গুরুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে একবার কাশির ভাণ করলাম। মনে হল কামড়ের চোটে, বিশেষতঃ এই রকম "রক্তলোলুপ" আক্রমণ চালাবার সময়, তাদের গুন্‌গুনানিতে আমি বুঝিবা পাগলই হয়ে যাব।

গুরুদেবের কিন্তু কোন সাড়াশব্দ নেই বা কোনও নড়নচড়নও নেই। অতি সন্তর্পণে তাঁর কাছে এগোলাম। এখন আর তাঁর কোন নিঃশ্বাসই পড়ছে না। যোগনিদ্রাভিভূত অবস্থায় তাঁকে আমার নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ সেই প্রথম। দেখে কিন্তু আমি মনে খুব ভয় পেয়েই গেছিলাম।

ভাবলাম, "নিশ্চয়ই তাঁর হার্টফেল হয়েছে।" নাকের নীচে একটি আরশি ধরলাম, — নিঃশ্বাসের কোন বাষ্প জমতে লাগল না। আরও সুনিশ্চিত হবার জন্যে মিনিট কতকধরে তাঁর মুখবিবর আর নাসারন্ধ্র আঙুল দিয়ে বন্ধ করে চেপে ধরে রইলাম। শরীর একদম ঠাণ্ডা আর অসাড়! হতভম্ব হয়ে সাহায্য পাবার জন্যে কাউকে ডাকতে দরজার দিকে ছুটে গেলাম।

"ও হরি! পরীক্ষা করে দেখছিলে বুঝি? হায়রে, বেচারী আমার নাক!" গুরুজীর কণ্ঠস্বর হাস্যোচ্ছ্বল। বললেন, "যাও, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়গে। আরে, তোমার জন্যে সারা দুনিয়াটা বদলে যাবে না। কি? তুমি আগে নিজেকে বদলাও; মশার কামড়ের ভাবনা একদম ছেড়ে দাও; বুঝলে?"

অত্যন্ত নিরীহভাবে বিছানায় ফিরে গেলাম। এবার আর একটা মশাও কাছে ঘেঁসল না! বুঝলাম, গুরুজী যে এর আগে আমায় মশারি টাঙ্গাতে বলেছিলেন তা কেবল আমার মনতুষ্টির জন্য, — তাঁর নিজের কোন মশার ভয় ছিল না। তাঁর যোগবল এতদূর ছিল যে, হয় তিনি তাদের দংশন

নিবারণ করতে পারতেন, অথবা ইচ্ছামত দংশনযন্ত্রণা প্রতিরোধক অবস্থাতেও প্রবেশ করতে পারতেন।

ভাবলাম, "উনি বোধহয় আমাকে যোগবল প্রদর্শন করছেন। ঐরকম যোগাবস্থা তাহলে আমাকেও লাভ করার চেষ্টা করতে হবে।" প্রকৃত যোগী জগতে সদা বর্তমান বহুবিধ চিত্তবিক্ষেপকারী বিষয়সমূহ অতিক্রম করে — তা সে কীট-পতঙ্গের বিরক্তিকর গুঞ্জনধ্বনিই হোক বা দিবালোকের প্রচণ্ড দীপ্তিই হোক — সমাধি অবস্থা লাভ করে সেখানে অবস্থান করতে পারেন। 'সমাধি'র প্রথম অবস্থায় (সবিকল্প) সাধক বহির্জগতের সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়চেতনা রোধ করেন। তারপর তিনি ইন্দ্রলোকের চেয়েও সুন্দর অন্তর্লোকের ধ্বনি ও দৃশ্যের দ্বারা পুরস্কৃত হন।*

আশ্রমের প্রাথমিক শিক্ষালাভের মধ্যে আর একটি আমি ঐ মশককুলের কাছ থেকেই লাভ করেছি। তখন শান্ত সন্ধ্যা নামছে। গুরুদেব প্রাচীনশাস্ত্রের অনুপম ব্যাখ্যায় রত। তাঁর চরণতলে আমি নীরবে বসে শুনছি। একটা দুষ্ট মশা এই মনোরম পরিবেশের মধ্যে ঢুকে পড়ে আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করবার চেষ্টা করল। উরুর উপর তার সূক্ষ্ম বিষাক্ত হুল প্রবেশ করাতেই মারবার জন্যে আমি হাত ওঠালাম। ভাগ্য তার ভাল। সদ্য প্রাণদণ্ড হতে তার অব্যাহতি লাভ হল, কারণ ঠিক সময়মত পতঞ্জলির একটি যোগাঙ্গের বিষয় মনে পড়ে গেল — তা হচ্ছে অহিংসা।†

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, শেষ করে ফেললে না যে?"

বললাম, "না গুরুদেব; আপনি কি প্রাণিহিংসা করতে বলেন?"

তিনি বললেন, "তা বলি না বটে, কিন্তু মনে মনে তুমি তো তাকে প্রাণদণ্ড দিয়েই দিয়েছ।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

---

* যোগীর সর্বব্যাপী শক্তি, যাতে করে তিনি বাইরের জ্ঞানেন্দ্রিয়র সাহায্য ব্যতীতই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদির জ্ঞানলাভ করতে পারেন, যা 'তৈত্তিরীয় আরণ্যকে' নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হয়েছে — "অন্ধটি মুক্তা ছিদ্র করলো, অঙ্গুলিহীন তাতে সূতা পরালো, মুণ্ডহীন সেটা গলায় পরলো আর জিহ্বাহীন তাকে প্রশংসা করল।"

† "অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত হইলে, তৎসন্নিধিতে সর্ব্বপ্রাণী নির্বৈর হয়।" — যোগ সূত্র ২ ঃ ৩৫

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমার মনের কথা যেন একটা খোলা বইয়ের পাতার মত পড়ে নিয়ে বললেন, "পতঞ্জলির মতে অহিংসা হল জীবহত্যার 'ইচ্ছা'কে পর্যন্ত ত্যাগ। পৃথিবীতে অহিংসা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার অসুবিধা অনেক। মানুষ অবশ্য হিংস্র প্রাণিদের বিনাশ সাধন করতে বাধ্য হতে পারে। কিন্তু ক্রোধ বা দ্বেষ পোষণ করতে অনুরূপ ভাবে সে বাধ্য নয়। এই দুনিয়ার বাতাসে সব জীবেরই সমান অধিকার। যে যোগী সৃষ্টিরহস্য ভেদ করতে সমর্থ, তিনি প্রকৃতির সংখ্যাতীত বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে একাত্মীভূত। অন্তরে প্রাণিহিংসা দমন করতে পারলে, সব মানুষই এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে।"

"গুরুজী, তাহলে কি হিংস্র প্রাণী বধ না করে তার মুখে নিজেকে বলি দিতে হবে?"

"না; মানুষের দেহ অমূল্য, — কারণ এর মধ্যে অপূর্ব মস্তিষ্ক আর মেরুদণ্ডের চক্রগুলি থাকায় এর বিবর্তনের সুযোগ সবচেয়ে বেশি। এরই কারণে সাধনপথে যাঁরা বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন, সেইসব ভক্তেরা ঈশ্বরতত্ত্বের উচ্চতম অবস্থা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে আর তাকে প্রকাশও করতে পারেন। নিম্নস্তরের কোন প্রাণীর দ্বারা তা সম্ভব নয়। অবিশ্যি একথাও সত্যি যে, কেউ যদি কোন পশু বা প্রাণী হত্যা করতে বাধ্য হয়, তাহলে তাকে ছোটখাট পাপের ভাগী হতে হয়। কিন্তু পবিত্র শাস্ত্রগুলি এই শিক্ষা দেয় যে মনুষ্য শরীরের স্বেচ্ছাকৃত নাশ হচ্ছে কর্মবিধির গুরুতর লঙ্ঘন।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। সহজাত সংস্কারের ক্ষেত্রে শাস্ত্রমতের অনুমোদন সবসময় পাওয়া যায় না।

যতদূর জানি, গুরুদেবকে কখনও বাঘ বা চিতাবাঘের সামনাসামনি হতে হয়নি। তবে এক কৃতান্তসদৃশ কেউটে তাঁর সামনে পড়েছিল বটে, কিন্তু সেও তাঁর প্রেমের প্রভাবে একেবারে বশীভূত হয়ে পড়েছিল। এই মোলাকাতের ঘটনাটি ঘটেছিল পুরীতে। সেখানে সমুদ্রের ধারে গুরুদেবের আর একটি আশ্রম আছে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শেষজীবনের প্রফুল্ল নামে একটি তরুণ শিষ্য, সেই ঘটনার সময় গুরুজীর কাছে উপস্থিত ছিল।

প্রফুল্ল আমায় বলেছিল ঃ "সে দিন আশ্রমের বাইরে আমরা বসে আছি। কাছেই একটা কেউটে সাপ দেখা গেল, চারফুট লম্বা — যেন সাক্ষাৎ যম! রাগের চোটে ফণা তুলে সেটা তীরের মত আমাদের দিকে ছুটে এল। গুরুদেব সাদরে চুক্‌চুক্ শব্দ করলেন — যেন একটি ছোট ছেলেকে আদর করে ডাকছেন। তার ছুটে আসার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে হাততালি* দিতে দেখে ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম। মূর্তিমান যমের সঙ্গে তাঁর খেলা! দারুণ আতঙ্কে আমি একেবারে কাঠ হয়ে রইলাম। মনে মনে সভয়ে ইষ্টনাম জপ করছি — সাপটা তখন গুরুদেবের একেবারে সামনে কিন্তু কোন নড়নচড়ন নেই। তাকে নিয়ে তাঁর ঐ খেলানর ভাব দেখে মনে হল যেন সাপটা একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে! সেই উদ্যত ফণা ক্রমশঃ গুটিয়ে গেল, — সাপটা গুরুদেবের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে ঝোপের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।"

প্রফুল্ল বলল, — "গুরুদেব কেনই বা হাততালি দিলেন, আর সাপটাই বা তাঁকে কামড়াল না কেন, তা তখন বুঝতে পারি নি। তারপর বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমাদের গুরুদেবতার কোনও প্রাণীর কাছ থেকে কোন রকম হিংসা বা আঘাতের আশঙ্কা ছিল না।"

আশ্রমে থাকার সময় গোড়ার দিকে একদিন বিকালবেলা দেখি যে, শ্রীযুক্তেশ্বরজী খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছেন। বললেন, "মুকুন্দ, তুমি ত' ভয়ানক রোগা!" তাঁর কথাগুলো মনের খুব কোমল জায়গায় আঘাত করল। কোটরগত চক্ষু আর ক্ষীণ দেহের জন্য আমার মনের মধ্যে বেশ দুঃখ ছিল। পুরান অজীর্ণ রোগ আমায় ছেলেবেলা থেকেই ভোগাচ্ছে। গড়পার রোডের বাড়ীতে আমার ঘরের তাকে সাজান থাকত সারি সারি টনিকের শিশি, — যদিও তাতে কিছুই উপকার হয়নি। মাঝে মাঝে নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করতাম — এমন একটা ভগ্নস্বাস্থ্য শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা আছে কি!

* নাগালের মধ্যে পেলে কেউটে সাপ যে কোন চলন্ত জিনিষের উপর বিদ্যুদ্বেগে ছোবল মারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্থির বা একেবারে নিশ্চল অবস্থাই রক্ষা পাবার একমাত্র উপায়।

"ওষুধপত্রের আরোগ্য ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; কিন্তু দৈবসঞ্জীবনী প্রাণশক্তির ক্ষমতা অসীম। এটা বিশ্বাস কোরো; তাহলেই তুমি তাতেই সেরে যাবে আর তোমার শরীরও মজবুত হবে।"

গুরুদেবের কথায় তখনই বিশ্বাস জন্মাল যে, আমিও ঐ সত্যতা আমার নিজের জীবনেই প্রয়োগ করতে পারি। আর কোনও চিকিৎসক (যদিও আমি অনেককেই দেখিয়েছি) আমার মনে এ' রকম গভীর বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারেন নি।

দিন দিন, আমার স্বাস্থ্য আর শক্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল। গুরুদেবের নীরব আশীর্বাদের ফলে দেখি যে, সপ্তাহ দু-এর মধ্যে শরীরের ওজন ও বলও বেশ বেড়ে গেছে যা আমি আগে চেয়েও পাইনি। আমার পেটের গোলমাল চিরদিনের জন্যে দূর হয়ে গেল।

পরেও বহু উপলক্ষ্যে বহুলোকের বহুমূত্র, মৃগী, যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগের হাত থেকে গুরুদেবের দৈবশক্তিতে নিরাময় হওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ লাভ করেছিলাম।

আমাকে সুস্থ করে তোলবার অল্প কয়েকদিন পরেই গুরুদেব একদিন বললেন, "বহুদিন আগে আমারও ওজন বাড়াবার খুব আগ্রহ ছিল। একবার এক ভারি অসুখ থেকে সেরে ওঠবার পর, কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

"বললাম, "গুরুদেব দারুণ অসুখে পড়েছিলাম, আর ওজনও ভয়ানক কমে গিয়েছে।'

"তিনি বললেন, 'তাইত' দেখছি যুক্তেশ্বর* — তুমি ত' নিজেই নিজের রোগ ডেকে এনেছ, আবার এখন ভাবছ তুমি বড্ডই রোগা!'

"যা' আশা করেছিলাম, তা থেকে দেখছি যে উত্তরটা সম্পূর্ণ অন্যরকম; যাইহোক, গুরুদেব আমায় একটু আশা দিয়ে বললেন,

---

* লাহিড়ী মহাশয় প্রকৃতপক্ষে সম্বোধন করেছিলেন, "প্রিয়" বলে (গুরুজীর সাংসারিক নাম ধরে) যুক্তেশ্বর নামে নয় (লাহিড়ী মহাশয়ের জীবদ্দশায় আমার গুরুদেব কর্তৃক তাঁর সন্ন্যাস জীবনের এই নামকরণ হয় নি।) পুস্তকের এই পরিচ্ছেদে এবং অপর কয়েক স্থানেও "প্রিয়" নামের জায়গায় "যুক্তেশ্বর" এই নাম বসান হয়েছে — কারণ দু'টি নাম পাঠকের মনে গোলমাল ঘটাতে পারে।

'দেখি কি করা যায়, — কাল থেকে তোমার নিশ্চয়ই ভাল হয়ে ওঠা উচিত!'

"আমার আগ্রহাকুল মনে তাঁর কথাগুলি আমাকে তাঁর গোপনে নিরাময় করবার একটা ইঙ্গিত বলেই বোধ হল। তার পরদিন সকালেই গুরুদেবের কাছে গিয়ে আনন্দে উল্লসিত হয়ে বললাম, — "আজকে বেশ ভালই বোধ করছি গুরুদেব।'

'সত্যি নাকি? তাহলে দেখছি যে আজকে তুমি নিজে নিজেই জোর পেয়েছ।'

"সবিনয় প্রতিবাদে বললাম, 'না গুরুদেব! এ আপনার দয়া। এই ক' সপ্তাহের মধ্যে দেখছি যে আজকেই যা শরীরে একটু বল পেলাম।"

"হ্যাঁ, তা বটে! অসুখ অবিশ্যি তোমার খুব গুরুতরই হয়েছিল, শরীরও তোমার দুর্বল — তবে কাল কি রকম থাক, তা কে বলতে পারে?

"আবার দুর্বলতা ফিরে আসার সম্ভাবনার কথা ভেবে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হল। পরদিন অতি কষ্টে নিজেকে কোনরকমে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ী উপস্থিত হলাম।

"গুরুদেব, আবার ত' রোগে পড়লাম!'"

"গুরুদেবের দৃষ্টি রহস্যময়। বললেন, 'তা হলে ফের তুমি নিজে নিজেই অসুখ বাধালে দেখছি!'

"ধৈর্য আমার নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল; বলে ফেললাম, 'গুরুদেব, এখন দেখছি রোজ রোজ আপনি আমায় উপহাসই করে আসছেন। আমার সত্যি কথাগুলো কেন যে আপনি বিশ্বাস করেন না, তা তো বুঝতে পারি না।'

"গুরুদেব সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আসল ব্যাপার কি জান? তোমার চিন্তাই তোমায় একবার সবল আর একবার দুর্বল করে দিচ্ছে। তুমি ত' দেখেছ, তোমার স্বাস্থ্য কেমন ঠিক তোমার অবচেতন মনের আশানুরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যুৎ অথবা মাধ্যাকর্ষণেরই মত

চিন্তাও হচ্ছে একটা শক্তি। মানুষের মন হচ্ছে সর্বশক্তিমান ভগবৎচৈতন্যের একটা স্ফুলিঙ্গ মাত্র। আম তোমায় দেখাতে পারি — তোমার শক্তিশালী মন যা কিছু গভীরভাবে বিশ্বাস করবে, তা অবশ্যই সত্য হবে।'

"লাহিড়ী মহাশয় যে অকারণ কিছু বলেন না, তা জানতাম বলে আমি সশ্রদ্ধ ও সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে বললাম ঃ 'গুরুদেব ধরুন, আমি যদি চিন্তা করি যে, আমি বেশ ভাল আছি আর আগেকার মত গায়ের ওজনও হয়েছে, তা হলে কি ঐ সব ব্যাপারগুলো ঘটবে?'

"গুরুদেব আমার চোখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করে গম্ভীরভাবে বললেন, 'নিশ্চয়ই তাই-ই হবে, এই মুহূর্তেই হবে।'

"আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে বোধ করলাম, শুধু যে শরীরের বল বাড়ল তাই নয়, ওজনও বেড়ে গেল! লাহিড়ী মহাশয় আবার মৌনাবস্থায় ফিরে গেলেন। কয়েক ঘণ্টা তাঁর চরণতলে অতিবাহিত করবার পর আমি মায়ের কাছে ফিরে এলাম। কাশীতে গেলে আমি সেখানেই থাকতাম।

"মা আমায় দেখে বললেন, 'বাছা! এ তোমার কি হয়েছে? শোথে ফুলে উঠেছ না কি?' মা ত' তাঁর নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না! আমার অসুখের আগে শরীর যেমন হৃষ্টপুষ্ট ও বলবান ছিল, ঠিক তেমনটিই হয়ে দাঁড়িয়েছে!

"শরীরের ওজন নিয়ে দেখলাম যে, মাত্র একদিনেই পঞ্চাশ পাউণ্ড ওজন বেড়ে গেছে। সেটা কিন্তু বরাবরই রয়ে গেল। বন্ধুবান্ধব, যারা সব আমার রোগা শরীর দেখেছিল, তারাও বিস্ময়ে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। এই অলৌকিক ঘটনার ফলে তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের জীবনের ধারা বদলে লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল।

"আমার ব্রহ্মজ্ঞ গুরুদেব জানতেন যে, এ জগতটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার স্বপ্নের বাস্তবরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই দৈব স্বপ্নবিলাসীর সঙ্গে একাত্মবোধের পূর্ণ জ্ঞানলাভ করে লাহিড়ী মহাশয় ইচ্ছামত ভৌত

জগতের স্বপ্নকণার মধ্যে রূপদান কিম্বা তার বিলোপসাধনসহ যে কোন পরিবর্তন আনয়ন করতে পারতেন।*

শ্রীযুক্তেশ্বরজী বললেন, "সৃষ্টিমাত্রই বিধিনিয়মের অধীন। ভৌত জগতে যে সকল বিধি ক্রিয়াশীল, বিজ্ঞানীদের যা আবিষ্কারের বিষয়, তা প্রাকৃতিক নিয়ম বলে পরিচিত। কিন্তু এমন আরও সব সূক্ষ্মতর বিধি আছে যা গুপ্ত আধ্যাত্মিক স্তর আর চৈতন্যের অন্তর্লোক নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এইসব নীতি যোগবিজ্ঞানের সাহায্যেই জানা যেতে পারে। পদার্থবিদ্ বা ভৌতবিজ্ঞানী নয়, পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানীই জড়ের সত্যকারের প্রকৃতি জানতে পারেন। এইরূপ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলেই যীশুখ্রীস্ট তাঁর এক শিষ্য কর্তৃক জনৈক ভৃত্যের কর্তিত কর্ণ পুনঃসংযোজিত করে দিতে পেরেছিলেন।†

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শাস্ত্রব্যাখ্যা ছিল অনবদ্য। আমার বহু সুখস্মৃতি তাঁর এইসব শাস্ত্র ব্যাখ্যার সঙ্গে জড়িত। তবে তাঁর ভাবরত্নগুলি অমনোযোগিতা বা নির্বুদ্ধিতার ভস্মে ছড়ান হত না। আমার শরীরের সামান্যমাত্র অঙ্গসঞ্চালন, অথবা বিন্দুমাত্র অমনোযোগিতা দেখতে পেলেই গুরুদেবের শাস্ত্রব্যাখ্যা হঠাৎ থেমে যেত।

একদিন বিকালবেলা যথারীতি শাস্ত্রালোচনা চলছে, মাঝখানে হঠাৎ শ্রীযুক্তেশ্বরজী আলোচনা থামিয়ে বললেন, "তোমার মন কিন্তু এখানে নেই।" কারণ, আগের মতই তিনি আমার মনের গতি প্রকৃতির ওপর অবিরাম লক্ষ্য রেখে চলেছিলেন। তবুও প্রতিবাদের সুরে বললাম, "গুরুজী! আমি ত' বিন্দুমাত্র নড়িনি, বা আমার চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপেনি। আপনি যা বলেছেন তার প্রতিটি কথা আমি পুনরায় আবৃত্তি করতে পারি।"

---

* "যাহা কিছু তোমার বাসনা ও তাহা যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে তাহা পাইয়াছ, তাহা তুমি পাইবেই।" — মার্ক ১১ ঃ ২৪ (বাইবেল)।

ঈশ্বর প্রণিহিত সদ্‌গুরুগণ তাঁদের ঐশী উপলব্ধি উন্নত শিষ্যদের ভিতর সঞ্চারিত করতে পারতেন, যেমন লাহিড়ী মহাশয় বর্তমান উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর জন্য করেছিলেন।

† "আর তাঁহাদের মধ্যে একব্যক্তি মহাযাজকের দাসকে আঘাত করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণ কাটিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যীশু উত্তর করিলেন ও বলিলেন ঃ এই পর্যন্ত কষ্ট পাও; তারপরে তিনি তাহার কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহাকে সুস্থ করিলেন।" — ল্যুক ২২ ঃ ৫০-৫১ (বাইবেল)।

"তা হলেও তোমার মন কিন্তু সম্পূর্ণ আমার কথায় ছিল না। তোমার মন্তব্যের প্রতিবাদে আমি বলতে বাধ্য হলাম যে, তোমার মনের পটভূমিকায় তুমি তিনটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চিন্তা করছিলে। তার একটি হবে সমতল ভূমির উপর তপোবনের মত, একটি পাহাড়ের মাথায়, আর অন্যটি সমুদ্রের ধারে।"

ঐ সব অস্পষ্ট ভাবে গড়া চিন্তাগুলো সত্য সত্যিই তখন আমার নির্জ্জন মনে উদিত হয়েছিল। ক্ষমাপ্রার্থীর চোখে আমি তাঁর দিকে তাকালাম। মনে মনে ভাবলাম, — "তাইত, এমন গুরু নিয়ে চলি কি করে, যিনি আমার বিশৃঙ্খল চিন্তারাশির মধ্যেও প্রবেশ করতে পারেন।"

গুরুজী বললেন, "তুমিই তো আমায় সে অধিকার দিয়েছ। যে সূক্ষ্মতত্ত্ব আমি ব্যাখ্যা করছি, তা পরিপূর্ণ মনোযোগ বিনা কিছুতেই বুঝতে পারবে না। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে আমি কখনও অন্যের মনের গহনে প্রবেশ করি না। মানুষের অবশ্য গোপনে নিজ মনের চিন্তায় বিচরণ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে। ভগবানকে না ডাকলে, তিনিও সেখানে প্রবেশ করেন না। আর আমিও সেখানে অনধিকার প্রবেশ করতে চাই না।"

"গুরুদেব, আপনার ত' সেখানে অবারিতদ্বার, আপনি সেখানে সর্বদাই স্বাগত।"

"যাক, তোমার বাড়ী ঘরদুয়োরের স্বপ্ন পরে একদিন সফল হবে! এখন তোমার পড়ার সময়।"

এইভাবে প্রসঙ্গক্রমে গুরুদেব আমার জীবনের তিনটি ভবিষ্যৎ প্রধান ঘটনার বিষয়, তাঁর নিতান্ত সহজ কথাবার্তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। প্রথম যৌবন থেকেই তিনটি বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে তিনটি বাড়ীর রহস্যময় ক্ষীণ আভাস আমার মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। গুরুদেব যেমনটি বলেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবেই পর্যায়ক্রমে এই স্বপ্নগুলো বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। প্রথমে হ'ল রাঁচির সমতলভূমিতে বালকদের জন্য যোগবিদ্যালয় স্থাপন। তারপর হলো লস এঞ্জেলসের পাহাড়ের মাথায় আমেরিকান হেড কোয়ার্টার্স, আর শেষে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ক্যালিফোর্ণিয়ার এন্সিনিটাসের আশ্রম।

গুরুদেব কখনও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে বলতেন না যে, "আমি ভবিষ্যদ্বাণী করে বলছি যে এই এই ঘটনা ঘটবেই!" বরং ইঙ্গিতে বলতেন, "তোমার কি মনে হয় না যে এরকম একটা কিছু ঘটতে পারে?" কিন্তু তাঁর সরল উক্তির ভিতরেও যেন বিশাল শক্তি লুকান থাকত। তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্য কখনও ভুল বলে প্রত্যাহৃত হত না; ঈষৎ রহস্যাচ্ছাদিত হলেও তাঁর ভবিষ্যবাণী কখনও মিথ্যা হত না।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী ছিলেন প্রশান্তমূর্তি, গম্ভীরপ্রকৃতির এবং আচরণেও তিনি খুব খাঁটি ছিলেন। তাঁর মধ্যে অস্পষ্টভাব বা স্বপ্নালুতা ছিল না। একদিকে ছিল তাঁর মৃত্তিকার উপর দৃঢ় পদক্ষেপ, আবার অন্যদিকে মস্তক যেন আকাশ স্পর্শ করতো। করিতকর্মা লোকদের তিনি প্রশংসাই করতেন। বলতেন, "সাধুগিরি মানে এ নয় যে, বোবা হয়ে থাকতে হবে। ঈশ্বরানুভূতি হলেই অকর্মণ্য হয়ে থাকতে হয় না। সদ্‌গুণাবলীর প্রত্যক্ষ প্রকাশেই তীক্ষ্ণবুদ্ধির বিকাশ হয়।"

গুরুদেব আধিদৈবিক রাজ্যের বিষয় আলোচনায় অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁর একমাত্র "অলৌকিক" গৌরবচ্ছটা হলো তাঁর পরিপূর্ণ সরলতা। কথাবার্তায় চমকপ্রদ ব্যাপারের উল্লেখ তিনি একেবারেই পরিহার করে চলতেন। কাজেকর্মে তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন। অনেক গুরু হয়ত নানা অলৌকিক ব্যাপারের উল্লেখ করতেন বটে, কিন্তু কাজে কিছুই করে দেখাতে পারতেন না। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কদাচিৎ সূক্ষ্ম বিধিনিয়ম সমূহের উল্লেখ করতেন, আর তা ইচ্ছামাত্র সব গোপনেই সাধিত করতেন।

গুরুদেব বোঝালেন, "আত্মজ্ঞান যাঁর লাভ হয়েছে, তিনি অলৌকিক কোন কিছু দেখান না — যতক্ষণ না মনের ভিতর থেকে তারজন্য সম্মতি পাচ্ছেন। ভগবান তাঁর সৃষ্টিরহস্য যত্রতত্র প্রকাশ করা চান না।* আর তাছাড়া প্রত্যেক মানুষেরই ত' তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার উপর একচ্ছত্র

* পবিত্র বস্তু কুকুরদিগকে দিও না, অথবা তোমাদের মুক্তাগুলিকেও শূকরদিগের সম্মুখে ফেলিও না; পাছে তাহারা পা দিয়া তাহা দলিত করে এবং ফিরিয়া তোমাদিগকে ফাড়িয়া ফেলে।" — ম্যাথিউ ৭ঃ৬ (বাইবেল)।

অধিকার আছে। কোন প্রকৃত সাধু ব্যক্তিই ঐ স্বাধীনতার উপর কখনও হস্তক্ষেপ করেন না।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর স্বাভাবিক মৌনভাব তাঁর গভীর ব্রহ্মানুভাবেরই ফল। আত্মোপলব্ধিহীন গুরুদের সীমাহীন অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন, — যা তাদের প্রধান অবলম্বন — তা দেখাবার মত তাঁর সময় ছিল না। হিন্দুদের একটি লৌকিক উক্তি হচ্ছে, "অগভীর মনের জলে অল্পবিদ্যার শফরী খুবই ফরফরায়। কিন্তু মহাসাগরের মত মনের অতল গভীরতায় তিমির মত বিরাট অনুভবও কদাচিৎ কম্পন জাগায়!"

আমার গুরুদেবের নিতান্ত সরল আর অনাড়ম্বর চালচলনের জন্য তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অতি অল্প লোকই তাঁকে অতিমানব বলে চিনতে পেরেছিলেন। প্রবাদ আছে ঃ "যে তার জ্ঞানের বিষয় লুকোতে পারে না, সে একেবারেই মূর্খ।" এ কথা কিন্তু আমার পরম জ্ঞানী আর অতি প্রশান্ত গুরুদেব সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাবে না।

অন্যদের মত মরণশীল মানুষ হয়ে জন্মালেও শ্রীযুক্তেশ্বরজী দেশ আর কালের অধিপতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। মানুষের দেবত্বে উপনীত হবার পথে কোন দুর্লঙ্ঘ্য বাধা গুরুদেব কখনো দেখতে পান নি। আম পরে জানতে পেরেছিলাম — আধ্যাত্মিক প্রেরণার বা উৎসাহের অভাব ছাড়া বাস্তবিকই তাতে আর অন্য কোন বাধা নেই।

শ্রীযুক্তেশ্বরজীর পুণ্যপাদস্পর্শ সর্বদাই আমার মধ্যে এক অপূর্ব ভাবানুভূতি সঞ্চারিত করতো। গুরুর সঙ্গে ভক্তিপূত সংস্পর্শ শিষ্যকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান করে; তাতে সর্বশরীরে একটা সূক্ষ্ম তাড়ৎপ্রবাহ জন্মায়। ভক্তের মস্তিষ্কে অনভীপ্সিত অভ্যাসের যন্ত্রগুলি যেন প্রায়ই আগুনে পুড়ে গিয়ে অগ্নিশুদ্ধ হয়ে যায় আর তার সাংসারিক প্রবৃত্তির বিচিত্র রেখাগুলিতে কল্যাণকর পরিবর্তন সাধিত হয়। সাময়িকভাবে হলেও সে দেখতে পায় যে, মায়ার আবরণ অপসারিত হয়ে যাচ্ছে; আর প্রকৃত পরমানন্দের সে আভাস পাচ্ছে। গুরুদেবের চরণতলে যখনই নতজানু হতাম, তখনই মনে হত যেন আমার সর্বশরীর মুক্তির জ্যোতিঃধারায় পরিপূর্ণ হচ্ছে।

গুরুদেব আমায় বলেছিলেন, "এমন কি লাহিড়ী মহাশয় যখন একেবারে নিশ্চুপ থাকতেন অথবা খাঁটি ধর্মতত্ত্ব ছাড়া অন্য বিষয়ে কথাবার্তা বলতেন, তখনও দেখতাম — তিনি আমার মধ্যে এক অনির্বচনীয় জ্ঞানের সঞ্চার করতেন।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর দ্বারা আমিও ঐরূপভাবে প্রভাবিত হয়েছিলাম। তাঁর আশ্রমে যদি আমি কোন রকম উদাসীন অথবা চিন্তাকুল মনে প্রবেশ করতাম, আমার মনের ভাব আমার অজ্ঞাতে কখন যেন বদলে যেত। গুরুদেবের দর্শনমাত্রই মনের উপর একটি আরামদায়ক শান্তির ভাব ছড়িয়ে যেত। তাঁর সঙ্গ থেকে প্রতিদিনই নব নব জ্ঞান, শান্তি ও আনন্দের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতাম। তাঁকে আমি কখনও বিভ্রান্ত, অথবা লোভ, ক্রোধ কিম্বা কোনরকম আসক্তির ভাবাবেগে উত্তেজিত হতে দেখি নি।

"মায়ার অন্ধকার নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে; চল এবার অন্তরে ঘরের দিকে ফেরা যাক।" এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করে তিনি শিষ্যদের, তাদের 'ক্রিয়াযোগ' সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বদাই স্মরণ করিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে কোন নতুন শিষ্য যোগাভ্যাসে তার নিজের যোগ্যতার বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করলে পর শ্রীযুক্তেশ্বরজী তাকে আশ্বাস দিয়ে বলতেন, "অতীতের কথা একদম ভুলে যাও। সব লোকেরই অতীতজীবন কোন না কোন লজ্জা বা গ্লানিতে কালিমালিপ্ত হয়ে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ ভগবানে দৃঢ়মূল হয়, ততক্ষণ তার আচরণ একেবারেই নির্ভরযোগ্য হয় না। তুমি যদি এখন থেকেই আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা শুরু কর, তাহলে ভবিষ্যতে তোমার সর্ববিষয়েই উন্নতিলাভ হবে, তা জেনে রেখো।"

আশ্রমে সব সময়েই গুরুদেবের ছোট ছোট চেলারা থাকত। তাদের আধ্যাত্মিক শিক্ষা আর মানসিক উন্নতির বিষয়ে তাঁর জীবনব্যাপী আগ্রহ ছিল। এমন কি তাঁর তিরোভাবের অল্প কিছুদিন আগেও তিনি দু'টি ছ' বছরের আর একটি ষোল বছরের ছেলেকে শিক্ষাদানের জন্য আশ্রমে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর অধীনে যারা থাকতো তাদের সযত্নে শিক্ষা দিতেন। "শিষ্য" ও "শাসন" এ দু'টি কথা শব্দ বুৎপত্তিগতভাবে এবং সক্রিয়ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত।

আশ্রমবাসীরা তাঁদের গুরুদেবকে ভালবাসতেন যেমন, তেমনি আন্তরিক শ্রদ্ধাও করতেন। একটু মৃদু হাততালির শব্দেই তাঁরা শশব্যস্ত হয়ে গুরুর সামনে এসে দাঁড়াতেন। মন যখন তাঁর গম্ভীর বা চিন্তামগ্ন থাকত, তখন কিন্তু কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা বা সাহস করত না; আর যখন কোন কারণে আনন্দে উল্লসিত হয়ে তিনি হেসে উঠতেন, নিতান্ত শিশুর দলও তখন তাঁকে তাদের একান্ত আপনজন বলে মনে করতো।

গুরুদেব কদাচিৎ কাউকে তাঁর ব্যক্তিগত কোন কাজ করে দেবার কথা বলতেন; কোন চেলার কাছ থেকে কোন সাহায্যই নিতেন না, যদি না তা আন্তরিকতা বা সানন্দে করা হত। শিষ্যরা যদি কখনও গুরুদেবের বস্ত্রধৌত করা প্রভৃতির কথা ভুলে যেত, তখন তিনি নিজহাতেই সে সব নীরবে সম্পন্ন করে নিতেন।

তাঁর পরিচ্ছদ ছিল সন্ন্যাসীদের চিরন্তন গেরুয়া বসন। বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য যোগিদের প্রথানুযায়ী তিনি বাঘের বা হরিণের চামড়ার তৈরী ফিতেবিহীন জুতোই ব্যবহার করতেন।

গুরুদেব দ্রুত ইংরাজী, ফরাসী, বাংলা ও হিন্দী বলতে পারতেন। সংস্কৃতেও তাঁর মোটামুটি ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর নিজ উদ্ভাবিত কতকগুলি সহজ পদ্ধতিতে তিনি তাঁর তরুণ শিষ্যদিগকে ধৈর্যের সঙ্গে ইংরেজী আর সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন।

দেহের প্রতি গুরুদেবের বিশেষ কোন আকর্ষণ না থাকলেও শরীর সম্বন্ধে তিনি কিন্তু সতর্কই থাকতেন। তিনি বলতেন, ভগবানের সুষ্ঠু প্রকাশ শারীরিক আর মানসিক সুস্থতার ভিতর দিয়েই হয়। কোন রকম আতিশয্য তিনি পছন্দ করতেন না। একবার এক শিষ্য দীর্ঘদিন উপবাস করার কথা বলায় গুরুদেব হেসে বলেছিলেন, "আহা, কুত্তাটাকে একমুঠো কেউ খেতে দাও না কেন?"*

* উপবাসকে গুরুদেব আদর্শ স্বাভাবিক দেহশুদ্ধিপ্রণালী বলেই অনুমোদন করতেন। কিন্তু ঐ বিশেষ শিষ্যটি তার শরীর নিয়ে অতিমাত্র ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর স্বাস্থ্য খুব ভালই ছিল। আমি তাঁকে কখনও অসুস্থ হতে দেখি নি।* সাংসারিক প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের জন্যে শিষ্যদের ইচ্ছা করলে, তিনি ডাক্তার ডাকতে অনুমতি দিতেন। তিনি বলতেন, "চিকিৎসকদের রোগ নিরাময়করণ ভৌতে আরোপিত ঈশ্বরের নিয়ম মেনেই করা উচিত।" তবে তিনি মানসিক শক্তির সাহায্যে রোগ নিরাময়করণের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশংসা করতেন, এবং প্রায়ই বলতেন — "জ্ঞানই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শুদ্ধিকারক।"

চেলাদের তিনি বলেছিলেন, "শরীরটা হচ্ছে এক বিশ্বাসঘাতক বন্ধু। যেটুকু তার প্রাপ্য সে'টুকুই তাকে দেবে — তার অতিরিক্ত নয়। সুখদুঃখ ক্ষণস্থায়ী। সব দ্বৈতভাব ধীরভাবে সহ্য করে যাবে, আর সেই সঙ্গে তাদের প্রভাব এড়াবার চেষ্টা করবে। কল্পনার দুয়ার দিয়েই ব্যাধি আর তার নিরাময় — এ দুয়েরই প্রবেশ ঘটে। অসুস্থ হয়ে গড়লেও বিশ্বাস কোরো না যে তোমার কোন রোগ হয়েছে; তাহলেই রোগ তোমাকে ছেড়ে পালাবে!"

গুরুদেবের শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই ডাক্তার ছিলেন। তিনি তাঁদের বলতেন, "যাঁরা শারীরবৃত্তের চর্চা করেছেন, তাঁদের আরও একটু অগ্রসর হয়ে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা করা উচিত। কারণ শারীরিক গঠনের ঠিক অন্তরালে একটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক কাঠামো লুকোন আছে।"†

---

* কাশ্মীরে তিনি একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে সময় আমি তাঁর কাছে ছিলাম না। (২১ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

† শারীরবৃত্তে নোবেল পরস্কারপ্রাপ্ত নির্ভীক চিকিৎসক চার্লস রবার্ট রিশে লিখেছেন : "সরকারীভাবে অধ্যাত্মবিদ্যা বিজ্ঞান বলে এখনও পরিচিতি লাভ করতে পারে নি। কিন্তু শীঘ্রই তা করবে ..... এডিনবরাতে প্রায় একশত শারীরতত্ত্ববিদের সামনে আমি প্রতিপাদন করতে সমর্থ হয়েছিলাম যে, আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ই কেবল জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় তা নয়; আর আংশিক সত্যও কখনো কখনো ভিন্ন উপায়ে বোধগম্য হয় ... কোন তথ্য সুলভ নয় মানেই কিন্তু একথা বোঝায় না যে, সেটার অস্তিত্ব একেবারেই নেই। কঠিন বলে কি কোন বিদ্যাভ্যাস অধিগত না হওয়ার পক্ষে যুক্তি হয়? ... অলীক পরশমণির সন্ধানে নিযুক্ত — এই যুক্তিতে যারা রসায়ণকে বিদ্রূপ করে, তাদের মত যারা অধিবিদ্যাকেও গুপ্তবিদ্যা বলে বিদ্রূপ করে থাকে, তারা নিজেরাই একদিন লজ্জিত হবে ... নীতিবিষয়ে কেবল আছেন ল্যাভোসিয়ে, ক্লড বার্ণার্ড, আর পাস্তর — পরীক্ষামূলক গবেষণায় অনেকেই সর্বত্র নিযুক্ত রয়েছেন। মানবচিন্তার ব্যাখ্যার পরিবর্তনকারী এই নূতন বিজ্ঞানকে অভিনন্দন জানাই।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গুণাবলীর জীবন্ত যোগসূত্র হবার জন্য শিষ্যদের প্রায়শঃই উপদেশ দিতেন। বাইরের আচার ব্যবহারে নিজে তিনি একজন সক্রিয় পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হলেও, অন্তরে তিনি এক প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদীই ছিলেন। প্রতীচ্যের প্রগতিশীল, উদ্ভাবনী আর স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাসের যেমন প্রশংসা করতেন, তেমনি প্রাচ্যের বহু শতাব্দীর জ্ঞানঋদ্ধ ধর্মীয় আদর্শেরও তিনি প্রশংসা করতেন।

নিয়মানুবর্তিতা অবশ্য আমার কাছে অপরিচিত ছিল না। বাড়ীতে পিতার শাসন ছিল কঠিন, অনন্তদাও প্রায়ই কঠোর শাসন করতেন। কিন্তু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শিক্ষাকে "কঠোর" ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। ত্রুটিশূন্যতায় বিশ্বাসী গুরুদেব শিষ্যদের ব্যাপারে কড়া সমালোচক ছিলেন — তা সে তাৎক্ষণিক ব্যাপারেই হোক বা সাধারণ আচরণের সূক্ষ্ম তারতম্যেই হোক।

একবার কোন এক উপলক্ষে তিনি বলেন, "আন্তরিকতা ছাড়া ভদ্র ব্যবহার — প্রাণহীনা সুন্দরী নারীর মত। ভব্যতা ছাড়া স্পষ্টবাদিতা যেন ডাক্তারের ছুরি — কাজ দেয় বটে, কিন্তু অপ্রীতিকর। ভব্যতার সঙ্গে সরলতা যুক্ত হলে তবেই সেটা কাজ দেয়, আর তা প্রশংসনীয়ও বটে।"

গুরুদেব আমার আধ্যাত্মিক উন্নতিতে আপাতদৃষ্টিতে সন্তুষ্টই ছিলেন, কেননা কদাচিৎ তিনি সে বিষয়ে উল্লেখ করতেন। অন্যান্য বিষয়ে কিন্তু তাঁর বকুনির হাত থেকে আমার রেহাই ছিল না। আমার প্রধান অপরাধ ছিল অন্যমনস্কতা, কখনও কখনও বিমর্ষ হয়ে পড়া, ভব্যতার কতকগুলো নীতি লঙ্ঘন, আর মাঝে মাঝে নিয়মবিরুদ্ধভাবে কাজকর্ম করা।

উপদেশচ্ছলে একদিন গুরুদেব বললেন, "দেখ, তোমার বাবা ভগবতীবাবুর কাজকর্মে সব দিকেই কেমন একটা সুশৃঙ্খলা আর সুসমঞ্জস ভাব রয়েছে।" শ্রীরামপুর আশ্রমে প্রথমবার যাবার অল্প কয়েকদিন পরেই লাহিড়ী মহাশয়ের এই শিষ্যদুটির একদিন সাক্ষাৎ হয়। পিতা আর শ্রীযুক্তেশ্বরজী পরস্পর পরস্পরের মহিমাকীর্তনে উল্লসিত। উভয়েরই অন্তর্জীবন কঠিন আর সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক শিলাভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত — যা কোন কালেই বিলুপ্ত হবার নয়।

আমার বাল্যজীবনের জনৈক সাময়িক শিক্ষকের কাছ থেকে কতকগুলো ভুলাশিক্ষা আমি পেয়েছিলাম। শুনেছিলাম, চেলাদের সাংসারিক কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্যে পরিশ্রম করার কোনই দরকার নেই। আমার করণীয় কাজগুলো যখন অবহেলা করতাম বা অযত্নে তা শেষ করতাম, তখন কিন্তু আমি তিরস্কৃত হইনি। মানুষের প্রকৃতি স্বাভাবিকভাবেই এ রকম ফাঁকি দেওয়া শিক্ষানীতি অতি সহজেই গ্রহণ করে। কিন্তু গুরুদেবের কাছে এসে তাঁর অবিরত কঠিন শাসনের ফলে আমি অতি শীঘ্রই এই আরামদায়ক দায়িত্বহীনতার মোহ থেকে মুক্তিলাভ করতে পেরেছিলাম।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একদিন বললেন, "যাঁরা এ জগতের পক্ষে অতিশয় ভাল, তাঁরা অন্য কোন জগৎ অলঙ্কৃত করছেন। যতদিন তুমি এ জগতের মুক্ত বায়ুতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করছ, ততদিন পর্যন্ত তার প্রতিদানে তোমার সকৃতজ্ঞ কর্তব্যপালনে তুমি দায়বদ্ধ। যিনি পরিপূর্ণভাবে বিগতশ্বাস* অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, তাঁর আর কোন সাংসারিক কর্তব্যপালনে বাধ্যবাধকতা থাকে না।" তারপর স্পষ্টতঃই বললেন, "তোমার পূর্ণজ্ঞান লাভ হলে পর আমি তা তোমাকে নিজেই জানাব, জেনো।"

গুরুদেবকে ভালবাসা দিয়েও অন্যায়ভাবে বশ করা যেত না। আমার মত স্বেচ্ছায় যারা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাদের প্রতিও তিনি কোন দুর্বলতা প্রদর্শন করতেন না। গুরুদেব আর আমি, কি শিষ্যদের দ্বারা, কি অপরিচিত লোকেদের দ্বারা বেষ্টিত থাকতাম, কিম্বা অন্যের অনুপস্থিতিতে একত্রে থাকতাম, তখনও তিনি সর্বদা সোজাসুজিভাবেই কথাবার্তা বলতেন, আর দরকার হলে তীক্ষ্ণভাবে তিরস্কার করতেন। তুচ্ছ, লঘু বা অসংলগ্ন ভাবের কোন কিছু দেখলে তাও তাঁর বকুনির হাত থেকে রেহাই পেত না। এইরকম অহমিকা চূর্ণ করবার চিকিৎসাপ্রণালী বাস্তবিকই বরদাস্ত করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু আমারও দৃঢ় পণ ছিল — আমার প্রত্যেক মানসিক বক্রতা শ্রীযুক্তেশ্বরজীর কঠোর হস্তের শাসনে শুদ্ধ করে নেব। তিনি যখন আমার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন সাধন

---

* সমাধি।

করবার কাজে নিযুক্ত, তখন বহুবারই আমায় তাঁর শাসনদণ্ডের তলায় মাথা পেতে দাঁড়িয়ে কম্পান্বিত হতে হয়েছে।

গুরুদেব আশ্বস্ত করে বলতেন, "আমার কোন কথা তোমার যদি পছন্দ না হয়, তবে যে কোন সময় তুমি চলে যেতে পার। তোমার উন্নতি ছাড়া আমি আর অন্য কিছু চাইনে; মনে হয় যদি উপকার হচ্ছে, তবে থাকতে পার।"

আমার প্রত্যেক অহমিকা চূর্ণ করে দেবার দারুণ আঘাতের জন্য সত্যই আমি তাঁর কাছে অপরিসীম কৃতজ্ঞ। রূপক অর্থে বলা চলে — তিনি যেন আমার চোয়াল হতে রোগগ্রস্ত ক্ষয়প্রাপ্ত সব দন্ত আবিষ্কার করে উৎপাটিত করে দিচ্ছেন। মানুষের অহংভাবের "মূলোৎপাটন" দারুণ আঘাত ছাড়া সত্যিই দুঃসাধ্য! অহমিকা দূর হলে পর তবেই ঈশ্বরাবির্ভাবের পথ সুগম হয়। ভগবান বৃথাই আত্মাভিমানীর কঠিন প্রস্তরহৃদয়ের মধ্য দিয়ে নিঃসরণের পথ খুঁজে মরেন!

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর স্বজ্ঞা এতই মর্ম্মভেদী ছিল যে অন্যের মন্তব্যে কর্ণপাত না করে, তিনি প্রায়ই কারোর না কারোর অনুক্ত ভাবনার যথাযথ উত্তর দিয়ে দিতেন। লোকে মুখে যে কথা বলে তার পিছনে সত্যিকারের যা মনোভাব থাকে — তাদের মধ্যে অনেক সময় আকাশ-পাতাল তফাৎ দেখা যায়। তাই গুরুদেব বলতেন, "মানুষের বিভ্রান্তিকর কথাবার্তার আড়ালে তার মনের প্রকৃত ভাবটি স্থির হয়ে বোঝার চেষ্টা কর।"

কিন্তু সংসারীর কানে ঐশ্বরিক অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা উদ্‌ঘাটিত তথ্য প্রায়শঃই কটু লাগে। লঘুপ্রকৃতি শিষ্যদের কাছে গুরুদেব বিশেষ প্রিয় ছিলেন না। যারা প্রকৃত জ্ঞানী — যদিও সংখ্যায় তাঁরা খুবই অল্প — তাঁরাই তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন।

আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি — শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কাঙ্ক্ষিত গুরু হতে পারতেন, যদি তাঁর কথাগুলি এত চাঁচাছোলা আর তিরস্কারমূলক না হতো।

তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন, — "আমার কাছে যারা শিখতে আসে তাদের ওপর আমি কড়া হই বটে, কিন্তু সে'টাই হচ্ছে আমার প্রকৃতি। থাকতে হয় থাক, না হয় পথ দেখ। আমি আপোসরফা

করিনা। তুমি কিন্তু তোমার শিষ্যদের কাছে খুবই সহৃদয় হবে, কারণ এটেই হচ্ছে তোমার প্রকৃতি। আমি কঠিন শাসনের অনলে পুড়িয়ে শুদ্ধ করতে চেষ্টা করি, যা সাধারণের সহ্যসীমার বাইরে। অবশ্য ভালবাসার মৃদুকোমল পরশেও পরিবর্তন ঘটে। কঠিন ও কোমল দু'রকম প্রণালীতে একই রকম ফল পাওয়া যায়, অবশ্য যদি সুবিচারের সঙ্গে তাকে প্রয়োগ করা যায়।" তারপর বললেন, "তোমায় বিদেশে যেতে হবে, যেখানে আত্মাভিমানে ঘা লাগা কথা কেউই পছন্দ করে না। কোন গুরুর পক্ষে প্রতীচ্যে ভারতের অমরবাণী প্রচার করা প্রচুর অবিচলিত ধৈর্য আর সহনশীলতা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নয়।' (আমেরিকায় থাকতে গুরুদেবের কথাগুলি যে কতবার মনে পড়েছে তা আর বলে বোঝাবার নয়।)

যদিও আমার গুরুদেবের অপ্রিয় সত্যভাষণের ফলে তাঁর জীবদ্দশায় বহুসংখ্যক শিষ্য হয় নি, তথাপি তাঁর শিক্ষাবলী চিরবর্ধনশীল নিষ্ঠাবান শিষ্যদের মাধ্যমে আজও পৃথিবীতে বিদ্যমান। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মত যোদ্ধারা চেয়েছেন পৃথিবীর উপর একচ্ছত্র আধিপত্য করতে; আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মত সদগুরুরা তার চেয়েও সুদূরতর স্থান — মানুষের অন্তররাজ্য জয় করে থাকেন।

গুরুদেবের অভ্যাস ছিল তাঁর শিষ্যদেরকে যা নিতান্তই তুচ্ছ বা ধর্তব্যের মধ্যেই নয় এমনসব সামান্য দুর্বলতা বা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ঘটনার কথাও গুরুগম্ভীরভাবে বর্ণনা করা। একদিন পিতা শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে দর্শন করতে এলেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই পিতা আশা করেছিলেন যে, সেখানে আমার প্রশংসার কথাই শুনতে পাবেন। তার বদলে আমার কর্তব্যচ্যুতির একটা দীর্ঘ তালিকা শুনে তিনি সত্যসত্যই অবাকই হয়ে গেলেন। দ্রুত আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। হাসিকান্নার মধ্য দিয়ে বললেন, "তোমার গুরুর কথা শুনে ত' ভেবেছিলাম যে, তোমার একেবারে দফারফা হয়ে গেছে।"

সেই সময়ে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর আমার প্রতি অসন্তোষের একমাত্র হেতু ছিল এই যে, তাঁর মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও জনৈক ব্যক্তিকে আমি আধ্যাত্মিক পথে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছিলাম।

রাগের চোটে ত' গুরুদেবের কাছে দৌড়লাম। সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম যে, তাঁর চোখ দু'টি মাটির দিকে নামান, যেন তিনি নিজ দোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। ঐ একটিবার মাত্র সেই বিরাট অধ্যাত্মজগতের সিংহপুরুষকে আমার সামনে নিতান্ত শান্ত ও নিরীহভাবে দেখলাম। পরম উপভোগ্য সেই অপূর্ব ক্ষণ! জিজ্ঞাসা করলাম, "গুরুদেব, বাবার সামনে আমার সম্বন্ধে নির্মমভাবে ঐ সব কথা বললেন কেন? এটা কি ঠিক হয়েছে?"

"আচ্ছা, আর কখনও বলব না।" শ্রীযুক্তেশ্বরজীর স্বর যেন অনুতপ্ত। তখনই আমার সব অভিমান ঘুচে গেল। কত শীগগির সেই বিরাট মানুষটি নিজ দোষ স্বীকার করে নিলেন! যদিও তিনি আর কখনও পিতার মানসিক শান্তির ব্যাঘাত ঘটান নি, তথাপি ইচ্ছে হলেই যখন, যেখানে পেতেন, আমাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ছাড়তেন।

অপরের সমালোচনায় নবীন শিষ্যেরাও গুরুদেবের সঙ্গে যোগ দিতেন। যেন তারাও সব গুরুদেবের মতই মহা মহা জ্ঞানী! ভাবতেন, যেন তাঁরা নিজেরা সব নির্ভুল — ভালমন্দ বিচারের এক একজন আদর্শ! কিন্তু যিনি আক্রমণ করেন, তাঁর নিজেরও প্রতিরক্ষার ক্ষমতা থাকা চাই। সেই সব ছিদ্রান্বেষী শিষ্যরাই আবার গুরুদেবের কাছ থেকে প্রকাশ্যে কঠিন সমালোচনার দু'চারটি চোখা চোখা বাণ খেয়ে একেবারে পিঠটান দিতেন।

"অন্তরের কোমল দুর্বলতা হচ্ছে মৃদু স্পর্শে কাতর শরীরের ব্যাধিগ্রস্ত স্থানের মত — সামান্য একটু কোমল তিরস্কারের ছোঁয়া তাতে একবার লাগলেই যা গুটিয়ে যায়!" এই ছিল শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পলাতক শিষ্যদিগের সম্বন্ধে সরস মন্তব্য।

বহু শিষ্যের মনেই গুরু সম্বন্ধে একটা পূর্বকল্পিত ধারণা থাকে, যার দ্বারা তারা তাঁর কথা ও কাজের বিচার করেন। এই ধরণের শিষ্যরা প্রায়ই অনুযোগ করতেন যে তাঁরা শ্রীযুক্তেশ্বরজীকে ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেন না।

আমি একবার বলেছিলাম, "তোমরা তো ঈশ্বরকেও বুঝতে চাও না। সাধুসন্ন্যাসীদের জলের মত পরিষ্কার বুঝে নিতে পারলে ত', তোমরাই সাধু হয়ে যেতে।" সারা বিশ্বজুড়ে লক্ষকোটি রহস্যের মধ্যে প্রতি নিয়তই

যেখানে অবর্ণনীয় ভাব, সেখানে সাহস করে কেউ কি বলতে পারে যে, গুরুর গহন প্রকৃতিকে এক কথায় সে বুঝে নিতে পারবে?

কত শিষ্য এল, তাদের বেশিরভাগ আবার চলেও গেল। যারা সহজ পথ খুঁজত, অর্থাৎ সদ্য সদ্য সহানুভূতি আর তাদের গুণপনার ভাল রকম আদর — তারা তা এ আশ্রমে পেত না। শিষ্যদের আশ্রয়দান ও চিরকালের জন্য তাদের জীবন পরিচালনার দায়িত্ব গুরুদেব নিতেন; কিন্তু বহু শিষ্যই কৃপণের মত তাদের অহমিকার প্রলেপ খুঁজতো। নতিস্বীকার করার চেয়ে জীবনের অসংখ্য দীনতা আর হীনতা বরণ করাকেই শ্রেয় মনে করে তারা প্রস্থান করত। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর জ্ঞানের অত্যুজ্জ্বল আলোকের তেজ, তাদের আধ্যাত্মিক দৌর্বল্যের পক্ষে নিতান্তই দুর্বিসহ ছিল। তারা খুঁজে ফিরতো অপেক্ষাকৃত সাধারণ ধরণের গুরু, যাঁরা মিঠে তোয়াজের বুলিতে তাদেরকে মাঝে মাঝে অজ্ঞানতার মোহনিদ্রায় বিশ্রাম করতে দেবেন।

গুরুদেবের আশ্রমে থাকার গোড়ার দিকে আমি প্রথম কয়েকমাস বকুনি খাবার ভয়ে কাটাতাম। আমি শীঘ্রই দেখতে পেলাম যে, তাঁর বাচনিক জীবচ্ছেদন সেইসব লোকেদের উপরই প্রযুক্ত হত, যাঁরা আমার মতই তাঁর নৈতিক শাসনের কাছে মাথা পেতে দিত। কোন মর্মাহত শিষ্য তার প্রতিবাদ করলে পর শ্রীযুক্তেশ্বরজী সে জন্য কিছু মনে করতেন না — বরং চুপ করে যেতেন। তাঁর কথায় কখনও ক্রোধ প্রকাশ পেত না। তাঁর কথাগুলি ছিল নৈর্ব্যক্তিক ও জ্ঞানগর্ভ।

গুরুদেবের তিরস্কার কোন সাময়িক আগন্তুকের প্রতিও বর্ষিত হত না। স্পষ্টভাবে দোষ [illegible], তিনি কারোর কোন দোষ প্রকাশ্যভাবে ধরিয়ে দিতেন না। কিন্তু যে সব শিষ্য তাঁর উপদেশ সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করতে আসত, তাদের জন্য তিনি গুরুদায়িত্বের ভার গ্রহণ করতেন। একমাত্র সেই গুরুরই অসীম সাহস আর ক্ষমতা, যিনি মানব মনের অহংভাবের কাঁচামাটি থেকে তার রূপান্তর সাধন করতে পারেন। খাঁটি সাধুসন্ন্যাসীদের সাহস ও শক্তির মূল উৎস হচ্ছে — এ জগতের মায়াবিভ্রান্ত পথভ্রষ্ট দৃষ্টিহীনদের প্রতি অনুকম্পা।

মনের ভিতরকার খুঁতখুঁতানি ছেড়ে দিতে দেখা গেল যে, আমার বকুনি খাওয়াও একদম কমে গেছে। অত্যন্ত সঙ্গোপনে গুরুদেব যেন আমার প্রতি অপেক্ষাকৃত আরও কোমল হয়ে উঠলেন। পরবর্তীকালে আমি সব রকম যুক্তিতর্কের বেড়া, আর আমার অবচেতন মনের* গোপন ধারণা সবই ভেঙ্গে দিলাম, সাধারণতঃ যার আড়ালে মানুষের ব্যক্তিত্ব বা তার আসল রূপটি লুকিয়ে থাকে। তার পুরস্কারস্বরূপ লাভ হল এই যে, গুরুর সঙ্গে আমার যেন এক স্বচ্ছন্দ সুছন্দ গড়ে উঠলো। তখন দেখলাম তিনি শুধু সুবিবেচকই নন, আমার পরম নির্ভরস্থলও বটে। আমার প্রতি তাঁর স্নেহের ফল্গুধারা তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে একান্ত সঙ্গোপনে বয়ে চলেছে। বাইরে কথাবার্তায় কিন্তু ঐ স্নেহের কোনরকম প্রাবল্য বা তার অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস নেই।

আমার নিজের মনের প্রকৃতি ছিল মূলতঃ ভক্তিপ্রবণ। প্রথমে দেখে কিন্তু আমি বুঝতে পারি নি যে, আমার গুরু যিনি পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছেন, তাঁর কেন কোথাও ভক্তির† ছিটেফোঁটাও নেই। কেবল যেন জ্ঞানরাজ্যের শুষ্ক কঠোর হিসাবনিকাশ দিয়েই তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে একসুরে বাঁধা হয়ে যেতে দেখতে পেলাম যে, আমার ভক্তিভাবে কোথাও কোন খামতির বদলে — তা বেশ বেড়েই চলেছে। ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু, তাঁর শিষ্যদিগকে তাদের নিজ নিজ বিশিষ্ট প্রকৃতি অনুযায়ী চালিয়ে নিয়ে যাবার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধের মধ্যে কিছুটা অস্পষ্টতা থাকলেও ভেতরে ছিল একটা অন্তর্নিহিত মুখরতা। প্রায়ই দেখতাম, আমার চিন্তাধারার মধ্যে তাঁর ভাববৈশিষ্ট্যের নীরব ছাপ পড়েছে, যেখানে

* নিউইয়র্কে এক বক্তৃতায় ইহুদী পুরোহিত ইস্রায়েল. এইচ. লেভিন্থল বলেন, "আমাদের সজ্ঞান ও নির্জ্ঞান সত্তার শীর্ষদেশে অধিসংবিৎ। বহুবৎসর পূর্বে ইংরেজ মনোবিদ্ এফ. ডব্লিউ. এইচ. মায়ার্স মন্তব্য করেন যে, 'আমাদের সত্তার গভীরে জঞ্জালের স্তূপের সঙ্গে ধনরত্নের আগারও লুক্কায়িত আছে।' মানুষের প্রকৃতিতে নির্জ্ঞান মনের বিষয়ে মনোবিদ্যার যে সকল গবেষণা কেন্দ্রীভূত, তাদের সঙ্গে তুলনায় এই অতিমানসলোকের নূতন মনোবিদ্যা সেই রত্নভূমির সন্ধানেই মনোনিবেশ করেছে একমাত্র যে রাজ্যে মানুষের মহান, নিঃস্বার্থ আর বীরোচিত কার্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।"

† জ্ঞান ও ভক্তি — ঈশ্বরলাভের দু'টি প্রধান মার্গ।

ভাষা একেবারে নিরর্থক। নীরবে তাঁর পাশে বসে অনুভব করতাম — তাঁর অযাচিত দান, শান্তির সহস্রধারায় আমার সকল সত্তাকে পরিপ্লাবিত করে চলেছে।

কলেজে ঢোকার পর প্রথম বছরের গ্রীষ্মাবকাশে গুরুদেবের নিরপেক্ষ বিচারের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখতে পেয়েছিলাম। একটানা ছুটিটা শ্রীরামপুরে গুরুর চরণতলে কাটিয়ে দেবার প্রতীক্ষায় উৎসুক হয়ে বসেছিলাম।

আশ্রমে প্রবল উৎসাহ নিয়ে পৌঁছতেই খুশী হয়ে গুরুদেব বললেন, "দেখ, আশ্রমের সব ভার এখন তোমার ওপর। তোমার কাজ হবে অতিথিরা এলে তাদের অভ্যর্থনা করা, আর অন্য সব শিষ্যদের কাজের তদারক করা।"

পক্ষকাল পরে পূর্ববঙ্গ থেকে কুমার নামে একটি শিষ্য আশ্রমে শিক্ষালাভের জন্য যোগদান করলো। অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে সে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর স্নেহ শীঘ্রই আকর্ষণ করে নিল। কোন অজ্ঞাত কারণে গুরুজীর সমালোচকের ভাবটিও নতুন আশ্রমিকটির চালচলনের প্রতি শিথিল হয়ে এল।

কুমার মাসখানেক থাকবার পর গুরুদেব একদিন আমায় নির্দেশ দিলেন, "মুকুন্দ, তোমার কাজ কুমার করুক আর তুমি তোমার নিজের সময়টুকুতে রাঁধাবাড়া আর ঝাঁটপাট দিও।"

পদোন্নতি হওয়াতে কুমার ত' আশ্রমের মধ্যে কর্তৃত্ব করা শুরু করে দিল। নীরব ক্ষোভে অন্যান্য শিষ্যরা রোজই আমার কাছে কি করা যায় তার পরামর্শ চাইতে আসত। ব্যাপারটা তিন সপ্তাহ ধরে চলল।

তারপর একদিন পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলাম যে, কুমার গুরুদেবের কাছে নালিশ করছে, "মুকুন্দকে নিয়ে আর পারা যায় না। আপনি আমায় সব দেখাশোনার ভার দিলেন, কিন্তু তবুও সব শিষ্যেরা কেবল তারই কাছে যায়, আর তার কথাই মানে।"

"সেইজন্যেই ত' আমি তাকে হেঁসেলে পাঠিয়েছি, আর তোমায় বৈঠকখানায়।" শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর আজকের কঠিন স্বর কুমারের কাছে

একেবারেই নূতন। "এইতেই তো তুমি বুঝতে পেরেছ যে উপযুক্ত দলপতি যে হয়, তার কেবল কাজ করতেই ইচ্ছে যায়, কারোর ওপর কর্তৃত্ব করতে নয়। তুমি মুকুন্দর জায়গাটা চেয়েছিলে, কিন্তু নিজের গুণে তা রাখতে পারলে না। এখন আবার রাঁধুনির যোগানদার হয়ে আগেকার কাজে ফিরে যাও।"

এইভাবে তাকে খাটো করে দেবার পরই কিন্তু কুমারের প্রতি গুরুদেবের আগেকার মত অস্বাভাবিক প্রশ্রয় আবার বেড়ে গেল। আকর্ষণের রহস্য কে ভেদ করতে পারে? কুমারের ভিতর আমাদের গুরুদেব দেখতে পেয়েছিলেন একটি মধুর ভাবের উৎস, যেটা কিন্তু অপর সহশিষ্যদের দিকে উৎসারিত হয়ে উঠত না। নতুন ছেলেটি যদিও শ্রীযুক্তেশ্বরজীর খুবই প্রিয় ছিল বটে, কিন্তু তাতে আমার কোন বিরাগ হয় নি। ব্যক্তিগত মেজাজ, যা এমনকি গুরুদের মধ্যেও দেখা যায়, তা জীবনধারায় মহার্ঘ বৈচিত্র্যই নিয়ে আসে। আমার প্রকৃতিতে খুঁটিনাটি বিশেষ কিছু স্থান পেত না। গুরুদেবের কাছ থেকে আমি আরও উচ্চতর জিনিষ লাভের সন্ধানে ছিলাম — বাইরের কোনপ্রকার স্নেহাতিশয্য বা প্রশংসা নয়।

বিনা কারণেই কুমার একদিন আমার প্রতি বিষোদ্‌গার করে কতকগুলো কথা বলল। মনে বড়ই আঘাত পেলাম।

"তোমার মাথা বড্ড গরম হয়ে উঠেছে কোনদিন তা ফেটে বসবে!" স্বজ্ঞাবলে এ'কথার যথার্থতা উপলব্ধি করে তাকে সাবধান করে দেবার জন্যে বললাম, "তোমার চালচলন এবার না শোধরালেও, একদিন না একদিন তোমায় এ আশ্রম থেকে পাততাড়ি গোটাতে হবে।"

বিদ্রূপের হাসি হেসে কুমার আমার বলা কথাগুলো সব গুরুজীকে জানিয়ে দিল। গুরুদেব সেইমাত্র ঘরে এসে ঢুকেছিলেন। খুব একচোট বকুনি খাবার ভয়ে আমি ঘরের একটা কোণে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

গুরুদেব শুধু এই ক'টি কথা বললেন, "হয়ত মুকুন্দর কথাই ঠিক।" কণ্ঠস্বর তাঁর অস্বাভাবিক গম্ভীর।

বছরখানেক পরে কুমার গুরুদেবের নীরব নিষেধ উপেক্ষা করেই তার গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গেল। গুরুদেব কখনও শিষ্যদের চলাফেরার উপর কোন অনাবশ্যক নিয়ন্ত্রণ করতেন না। কয়েকমাস বাদে কুমার শ্রীরামপুরে ফিরে আসতেই তার মধ্যে একটা বিসদৃশ পরিবর্তন দেখা গেল। অমন যে রাজোচিত সৌম্যমূর্তি, আর উজ্জ্বল মুখ, সব যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। নিতান্ত একটা নগণ্য চাষা যেন আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে! সম্প্রতি কতকগুলো বদ অভ্যাসও সে জুটিয়ে এনেছে।

গুরুদেব আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ভগ্নহৃদয়ে তার বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন — ছেলেটা এখন আর আশ্রমে সন্ন্যাসজীবন যাপনের পক্ষে উপযুক্ত নয়।

"মুকুন্দ, কুমারকে কালই আশ্রম থেকে চলে যেতে বলবার জন্যে তোমার ওপরেই ভার দিলাম। আমি বলতে পারব না!" শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর চোখে জল, কিন্তু তখনই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "ছেলেটা যদি আমার কথা শুনত আর আশ্রম ছেড়ে চলে না গিয়ে যত সব কুসঙ্গীদের সঙ্গে না মিশত, তা হলে কখনো তার এতদূর অধঃপতন হতো না। আমার আশ্রয় সে প্রত্যাখ্যান করেছে — এইবার কঠিন সংসারই হবে তার গুরু!"

কুমার চলে যাওয়াতে খুব যে খুশী হয়েছিলাম, তা নয়। মনে বড় দুঃখ হতে লাগল; ভাবলাম, গুরুদেবের স্নেহ আকর্ষণ করবার ক্ষমতা যার রয়েছে, সে কি করে এ রকম পার্থিব মোহে মুগ্ধ হতে পারে। নারী আর সুরার প্রলোভন মানুষের মজ্জাগত। তাদের উপভোগ করার জন্যে বিশেষ সূক্ষ্মবোধের দরকার করে না। ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন চিরহরিৎ করবীফুলের সঙ্গে তুলনীয়; গোলাপী রঙের ফুল সৌগন্ধে ভরা; কিন্তু গাছটির প্রতিটি অঙ্গ বিষাক্ত।* তৃপ্তি আর আরামের স্থান হচ্ছে অন্তরে, যা

---

* অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য লিখেছেন, — "জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য মানুষের অন্তহীন প্রচেষ্টা; সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্লান্ত হয়ে পড়লে পর, সে আপাতভোগ্য সুখও ভুলে গিয়ে নিদ্রা যায়, তার স্ব-ভাব আত্মাতে বিশ্রামলাভ করবার জন্য। অতীন্দ্রিয় সুখ এইজন্যই অতি সহজলভ্য, আর তা স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগের আনন্দ — যার সর্বদা পরিণতি গ্লানিতেই — তার অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।"

সুখেতে উজ্জ্বল; অথচ ঐ সুখ লোকে বাইরের জগতে নানা পথে অন্ধভাবে খুঁজে মরে।

গুরুদেব একদিন কুমারের ক্ষুরধার বুদ্ধির কথা বলতে গিয়ে বললেন, "তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দুটো ধার। ছুরির মত একে অজ্ঞানের বিষফোঁড়া কাটা, আবার নিজের গলা কাটা — এই গঠনমূলক বা ধ্বংসাত্মক — দু'কাজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। মন আধ্যাত্মিক বিধিনিয়মের অপরিহার্যতা স্বীকার করলে তবেই বুদ্ধি ঠিক পথে চলে।"

গুরুদেব, স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে নিজ পুত্রকন্যাজ্ঞানে, তাঁর সকল শিষ্যশিষ্যাদের সঙ্গেই মিশতেন। তাঁদের আত্মা যে এক, দুই নয়, এই ভেবে তাদের মধ্যে কোন পক্ষপাতিত্ব করতেন না, বা কোন পার্থক্য রাখতেন না।

তিনি বলতেন, "ঘুমিয়ে পড়লে তুমি জানতেই পার না — তুমি স্ত্রী, না পুরুষ। পুরুষ যেমন স্ত্রীরূপ ধারণ করলে কখনও স্ত্রীলোক হয়ে যায় না, তেমনি আত্মা, স্ত্রীপুরুষ উভয়বিধ রূপ ধারণ করলেও, তার কোন লিঙ্গভেদ ঘটে না। আত্মা হচ্ছে নিত্য সনাতন, ঈশ্বরের নির্গুণরূপ।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কিন্তু নারীকে "পুরুষের পতনের মূল", বলে কখনও নিন্দা বা পরিহার করতেন না। তিনি বলতেন — নারীরও তো পুরুষের কাছ থেকে প্রলোভনের আশঙ্কা আছে। আমি একবার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম — জনৈক প্রাচীন সাধু নারীকে কেন "নরকের দ্বার" বলে গেছেন?

গুরুদেব তিক্তভাবে উত্তর দিলেন, "তাঁর প্রথম জীবনে হয়ত কোন রমণী তাঁর মানাসক শান্তির বিঘ্ন ঘটিয়েছিল; তা না হলে নারীজাতিকে নিন্দা না করে নিজের আত্মসংযমের ত্রুটিগুলিকেই বর্জন করতেন।"

কোন অভ্যাগত আশ্রমে এসে যদি কোন ইঙ্গিতপূর্ণ গল্প বলবার চেষ্টা করতেন, তা হলে তিনি একেবারে নিরুত্তর নীরবতা অবলম্বন করতেন। শিষ্যদের তিনি বলতেন, "সুন্দর মুখের আকর্ষণে নিজেকে জর্জরিত করে তুলোনা; যে ইন্দ্রিয়ের দাস, সে জগতকে কি করে উপভোগ করবে? এর যে সূক্ষ্ম রসভাব আর তার অনুভূতি সেটা তাদের হাত এড়িয়ে যায়, যখন

তারা স্থূল উপভোগের ক্লেদকর্দম হাতড়ে মরে। সূক্ষ্ম ভেদাভেদ-জ্ঞান, স্থূল ইন্দ্রিয়বোধের দাসেদের কাছে একদম হারিয়ে যায়।”

শিষ্যরা মায়াসঞ্জাত যৌনমোহের হাত এড়াবার জন্য শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছ থেকে নানাবিধ সহজবোধ্য আর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ লাভ করতেন।

তিনি বলতেন, “খাওয়ার উদ্দেশ্য যেমন ক্ষিধে মেটান, লোভ মেটান নয়, তেমনি প্রকৃতিদত্ত যৌনবোধ হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে জীবনের ধারা অব্যাহত রাখা — অতৃপ্ত কামনা জাগিয়ে তোলবার জন্যে নয়। কদভিপ্রায় সব এখনই বিসর্জন দাও, নচেৎ তারা জড়দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হলেও তোমার সূক্ষ্মদেহের সঙ্গেই থেকে যাবে। শরীর দুর্বল হলেও মন যেন সদাই প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রলোভন যদি তোমায় নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করে, তা হলে তাকে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষণ আর মনের অদম্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দাবিয়ে রাখ। যে কোন স্বাভাবিক বাসনাকামনা, তা সবই দমন করা যেতে পারে।

“শক্তি সঞ্চয় করে যাও। অতল সমুদ্রের মত হও; ইন্দ্রিয়বোধের উপনদীগুলিকে নীরবে তোমার ভিতর একেবারে মিলিয়ে নাও। দৈনিক নূতন করে জাগ্রত কামনাবাসনা সকল, তোমার অন্তরের শান্তির আধারের তলায় খোঁড়া এক একটা ছিদ্র হলো জলাধারের ছিদ্রের মত যা জড়বাদের শুষ্ক মরুভূমির বুকে গিয়ে পড়ে একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে। কু-প্রবৃত্তির সক্রিয় প্রবল তাড়না হচ্ছে মানুষের সুখের পক্ষে পরম শত্রু। আত্মসংযমের সিংহের মত এ জগতে ঘুরে ফিরে বেড়াও; দেখো, যেন ইন্দ্রিয় দুর্বলতার ব্যাঙগুলো তোমাকে চারপাশ থেকে লাথি না মারে।”

প্রকৃত ভক্ত শেষ অবধি সকল প্রবৃত্তিগত বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তিলাভ করে। মানবপ্রেমের চাহিদাকে ভগবৎ আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত করে; আর সেইটাই হচ্ছে তার একমাত্র খাঁটি প্রেম, কারণ তা সর্বব্যাপী।

যেখানে আমার গুরুর প্রথম দর্শনলাভ হয়েছিল, কাশীর সেই রাণামহল অঞ্চলেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মাতাঠাকুরাণী বাস করতেন। স্নেহকোমল আর সদয়প্রকৃতির হলেও তিনি বেশ দৃঢ়মতী ছিলেন।

একদিন তাঁর বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, মাতাপুত্রের মধ্যে কথাবার্তা চলছে শুনতে পেলাম। গুরুদেবকে মনে হল, তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্তভাবে যুক্তিসহকারে তাঁর মাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বোধহয় তিনি নিষ্ফলই হলেন, কারণ তাঁর মা তখন প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বলছেন, — "না, না, বাছা, তুমি এখন যাও। তোমার ওসব উপদেশটুপদেশ এখন রেখে দাও; ও সব আমার জন্যে নয়! আমি তোমার শিষ্যা নই বাছা, বুঝলে?"

শ্রীযুক্তেশ্বরজী বিনা বাক্যব্যয়ে আস্তে আস্তে মায়ের কাছ থেকে সরে এলেন — ছোট ছেলে যেমন বকুনি খেয়ে পালিয়ে আসে। ন্যায্য কথা শুনতে না চাইলেও মায়ের প্রতি তাঁর অপার ভক্তি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শ্রীযুক্তেশ্বরজীর মা তাঁকে তাঁর ছোট্ট ছেলেটির মতই দেখতেন — সাধুসন্ন্যাসীর মত নয়। এই তুচ্ছ ঘটনাটার মধ্যেও বেশ একটা মাধুর্যের ব্যাপার ছিল; এতে আমার গুরুদেবের অসাধারণ প্রকৃতির অন্য একটা দিকে আলোকপাত হল, যা অন্তরে কোমল হলেও বাইরে কঠিন।

সন্ন্যাস ধর্মের নিয়মানুসারে কোন সন্ন্যাসী একবার সংসার আশ্রম আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগ করলে পর তার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখতে পারেন না। গৃহস্থের পক্ষে অবশ্য পালনীয় সাংসারিক বিবিধ সংস্কার তাঁর পক্ষে পালন করা সম্ভবপর নয়। তবুও প্রাচীন দশনামী স্বামী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আদিশঙ্করাচার্য এ সব বিধিনিষেধ অগ্রাহ্যই করে গেছেন। তাঁর পরম স্নেহময়ী মাতার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর উত্তোলিত হস্ত থেকে অগ্নিশিখা সৃষ্টি করে মাতার শবদাহ করেছিলেন।

শ্রীযুক্তেশ্বরজীও ঐ সব বাধাবন্ধ অগ্রাহ্যই করতেন, যদিও অত দর্শনীয়ভাবে নয়। তাঁর মাতা পরলোকগমন করলে পর তিনি কাশীর গঙ্গার ঘাটেই শ্রাদ্ধশান্তি সম্পন্ন করে প্রাচীন প্রথানুযায়ী বহু ব্রাহ্মণভোজন করিয়েছিলেন।

শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ সব সন্ন্যাসীদের ক্ষুদ্র আত্মপরিচয় জয় করার জন্যই রচিত। শঙ্করাচার্য ও শ্রীযুক্তেশ্বরজীর নিরুপাধি ব্রহ্মলাভ ঘটেছিল।

তাঁদের উদ্ধারের জন্য বিধিনিয়ম পালনের কোন আবশ্যকতাই ছিল না। কখনও কখনও গুরুরা ইচ্ছা করেই শাস্ত্রীয়বিধি লঙঘন করে চলেন কারণ তাঁদের কাছে অন্তর্নিহিত নীতিটাই সত্য — বাহ্যিক আবরণ নয়। যীশুখ্রীস্টও তাই বিশ্রামবারে ভুট্টার শীষ তুলেছিলেন। সম্ভাব্য সমালোচকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, "বিশ্রামবার মানুষের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে, মানুষ বিশ্রামবারের জন্য নয়!"*

শ্রীযুক্তেশ্বরজী শাস্ত্রগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কিছু খুব অল্পই পড়তেন। তথাপি সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা অন্যান্য জ্ঞানের অগ্রগতির বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন।† চমৎকার আলাপী ছিলেন তিনি। আশ্রমে অভ্যাগতদের সঙ্গে তিনি অসংখ্য বিষয় নিয়ে নানা আলোচনা করতে ভালবাসতেন। তাঁর অপূর্ব রসিকতা আর প্রাণবন্ত হাসিতে সব আলোচনাই যেন সরস, প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। গাম্ভীর্য নিয়ে থাকলেও, তিনি কখনও মুখ অন্ধকার করে থাকতেন না। বাইবেলের বাণী উদ্ধৃত করে তিনি বলতেন ঃ "ভগবানকে লাভ করতে গেলে মানুষের মুখবিকৃতির প্রয়োজন হয় না।‡ স্মরণ রেখো — ঈশ্বরপ্রাপ্তি মানেই সকল দুঃখের অবসান।"

দার্শনিক, অধ্যাপক, ব্যবহারজীবী, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি যাঁরা তাঁকে দর্শন করতে আসতেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের প্রথমবার আশ্রমে আগমন ঘটত, তাঁরা ভাবতেন যে, বুঝিবা একজন গোঁড়া ধর্মাচারীরই সাক্ষাৎ পাবেন। তাঁদের একটু গর্বোদ্ধত হাসি বা কৌতূকমিশ্রিত কৃপাদৃষ্টিতে প্রকাশ পেত যে, তাঁরা শ্রীযুক্তেশ্বরজীর কাছ থেকে কতকগুলি গুরুগম্ভীর হিতোপদেশ ছাড়া আর কিছুই প্রত্যাশা করেন না। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে আলোচনা করে যখন তাঁরা দেখতে পেতেন যে তাঁদের নিজ নিজ বিশেষ পড়াশুনার ক্ষেত্রেও তাঁর যথাযথ জ্ঞান আছে, তখন তাঁদের প্রস্থান হত অনিচ্ছাভরেই।

---

* মার্ক ২-২৭ (বাইবেল)।

† গুরুদেব ইচ্ছামাত্র অপরের চিত্তের সঙ্গে নিজের চিত্তের সমন্বয় সাধন করতে পারতেন (এক প্রকার বিভূতি। পতঞ্জলি যোগসূত্র — বিভূতি-পাদ ১৯ উল্লেখ আছে।) মানব রেডিওরূপে তাঁর শক্তি আর চিন্তার প্রকৃতি ১৫শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

‡ ম্যাথিউ ৬ ঃ ১৬ (বাইবেল)।

সাধারণতঃ আমার গুরুদেব অতিথি অভ্যাগতদের প্রতি খুব ভদ্র আর অমায়িক ছিলেন; একটা মধুর আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের আপ্যায়ন করতেন। তবুও দারুণ আত্মম্ভরীরা মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে বেশ একটু ভাল রকমেরই শিক্ষা পেয়ে যেতেন। গুরুদেবের ভিতর তাঁরা দেখতে পেতেন, হয় নীরব ঔদাসীন্য অথবা প্রবল প্রতিবাদ — যেমন বরফ বা লোহা আর কি!

একবার কোন বিখ্যাত রসায়ণবিদ্ শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে একদিন এক দারুণ তর্কযুদ্ধ শুরু করে দেন। ভদ্রলোকটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব কখনও স্বীকার করতেন না, যেহেতু বিজ্ঞান তাঁকে জানার কোন উপায় উদ্ভাবন করতে পারে নি।

"তা হলে কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে আপনারা টেস্ট টিউবে সেই পরমাশক্তিকে স্বতন্ত্র করে ফেলতে পারেন নি, কি বলেন?" গুরুদেবের দৃষ্টি কঠিন। বললেন, "আচ্ছা আমি একটা নতুন পরীক্ষার কথা বাতলে দিচ্ছি। নিরবচ্ছিন্নভাবে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আপনার চিন্তাগুলো সব একে একে বিশ্লেষণ করুন; তাহলেই আর ঈশ্বরের অবিদ্যমানতা সম্বন্ধে কখনও কোন সংশয় থাকবে না।"

একজন বিখ্যাত পণ্ডিতও ঐ রকম এক ধাক্কা খেয়েছিলেন। সে'বারেই তাঁর আশ্রমে প্রথম আসা। প্রবল উৎসাহে পণ্ডিতপ্রবর ত' আশ্রমের কড়ি বরগা ফাটিয়ে তুললেন। মহাভারত, উপনিষদ,* শঙ্করভাষ্য প্রভৃতি প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে অনর্গল শ্লোক সব উদ্ধৃত করে চললেন। হঠাৎ নজর পড়ল যে গুরুদেব কিছুই বলছেন না। সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাইতে গুরুদেব বললেন, "আমি কেবল আপনার কথাই শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছি, বলবার জন্যে ত' নয়।" তখন চুপচাপ! পণ্ডিত মহাশয় একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন।

---

* উপনিষদ বা বেদান্ত (বেদের অন্ত)। চতুর্বেদের কোথাও কোথাও আছে। হিন্দুধর্মের তাত্ত্বিক ভিত্তি উপনিষদের নির্গলিতার্থে রচিত। শোপেনহওয়ার উপনিষদের "গভীর, আদি ও সূক্ষ্ম চিন্তাগুলির" প্রশংসা করে বলেছেন ঃ (উপনিষদের পশ্চিমী তর্যমার মাধ্যমে প্রাপ্ত) বেদ পাঠের সুযোগ, আমার মতে, বিগত শতকগুলির থেকে এই শতকে প্রাপ্ত সর্বশ্রেষ্ঠ অধিকারলাভ।"

"শ্লোক ত' আউড়ালেন অনেক, আপনার ব্যক্তিগত জীবনের বৈশিষ্ট্য থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখাতে পারেন এমন কী মৌলিক ব্যাখ্যা আপনার আছে তাই আগে বলুন? কোন ধর্মশাস্ত্র আপনি জীবনে গ্রহণ করেছেন বা সেইমত জীবনকে গড়ে তুলতে পেরেছেন? কীভাবে এইসব চিরন্তন সত্য আপনার প্রকৃতির পরিবর্তন সাধিত করতে পেরেছে? কেবল দমদেওয়া গ্রামোফোনের মত অপরের কথাগুলো আউড়ে গিয়েই কি আপনি সন্তুষ্ট থাকতে চান?" ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটু সম্ভ্রমসূচক দূরত্বে বসে, কথাগুলো শুনে মনে মনে খুব একচোট হেসে নিলাম।

পণ্ডিতজী সখেদে বললেন, "না মশায়, আমি হার স্বীকার করছি। সত্যিই তো, অন্তরে কোন উপলব্ধিই পাই নি!" পণ্ডিতজীর খেদোক্তি তখন বেশ উপভোগ্যই হয়েছিল।

জীবনে এই প্রথম বোধহয় তিনি বুঝতে পারলেন যে, শাস্ত্রের চুলচেরা বিচার আধ্যাত্মিক অনুভবের অভাবের ফলশ্রুতি নয়।

যথেষ্ট আক্কেল সঞ্চয় করে ভদ্রলোক বিদায় নিলে গুরুদেব বললেন, "এইসব বিচারবুদ্ধিহীন পণ্ডিতরা কেবল রাত্রি জেগে জেগে পুঁথিই পড়েছেন, আর কিছুই নয়। তাদের কাছে শাস্ত্রচর্চা কেবল মৃদু বুদ্ধিবৃত্তিচালনার একটা উপায় মাত্র। তাঁদের উচ্চচিন্তাসকল, বাইরের কাজের স্থূলতা, বা তাদের কৃচ্ছ্রসাধ্য আন্তরশুদ্ধির প্রচেষ্টার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ সযত্নে পরিহার করে চলে।"

অন্যান্য উপলক্ষ্যেও গুরুদেব শুধু পুঁথিগত বিদ্যার নিরর্থকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলতেন, "বিরাট পাণ্ডিত্য আর বোধ — দুটো এক জিনিষ নয়। শাস্ত্রগ্রন্থ আত্মবোধলাভে উদ্দীপনা জাগাতে পারে, যদি একটি একটি করে শ্লোকের অর্থ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করা যায়। পাণ্ডিত্যলাভের জন্যে অবিরত অধ্যয়নে বড় জোর একটা মিথ্যা গর্ব আসতে পারে, একটা মিথ্যা তৃপ্তি আনতে পারে, বা অপরিপক্ক জ্ঞান দিতে পারে।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একবার শাস্ত্রব্যাখ্যার বিষয়ে তাঁর নিজের এক অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছিলেন। দৃশ্যটা হচ্ছে পূর্ববঙ্গের একটি তপোবন।

সেখানে তিনি দবরুবল্লভ নামে এক বিখ্যাত গুরুর শিক্ষাপ্রণালী দর্শন করেছিলেন। তাঁর প্রণালী, প্রাচীন ভারতে যা ছিল সেইরকম — একাধারে সরল আবার কঠিন।

তপোবনের নির্জনতার মধ্যে দবরুবল্লভকে নিয়ে তাঁর শিষ্যেরা চারধারে ঘিরে বসে আছে। তাদের সামনে পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাটি খোলা। আধঘণ্টা ধরে একটিমাত্র শ্লোকে মনোযোগ দিয়ে তারপর তারা চোখ বুজল। আরও আধঘণ্টা কেটে গেল। গুরুদেব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে দিলেন। স্থিরভাবে বসে তারা আরও ঘণ্টাখানেক ভাবল। অবশেষে গুরু বললেন, "এখন শ্লোকটি বুঝতে পারছ কি?"

দলের মধ্যে শুধু একজনমাত্র শিষ্য বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, গুরুদেব।"

"উঁহুঁ না, ঠিক পুরোপুরি হয়নি। এই শ্লোকগুলির ভিতর সেই আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তিকে খুঁজে বার কর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যা ভারতকে নবজীবনে উজ্জীবিত করেছে।" আরও একঘণ্টা নীরবে কেটে গেল। গুরু শিষ্যদের বিদায় দিয়ে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর দিকে ফিরে বললেন, "ভগবদ্গীতা পড়েছেন?"

"না মশায়; যদিও বহুবার এর পাতার ওপর চোখ আর মন বুলিয়েছি, কিন্তু তবুও ঠিকমত বুঝে উঠতে পারি নি।"

সেই পরম সাধু মহাপুরুষটি গুরুদেবকে সহাস্যে আশীর্বাদ করে বললেন, "হাজার জনে কিন্তু আমায় ঠিক উল্টো কথাটাই বলেছে। যদি কেউ তার শাস্ত্রজ্ঞানের ঐশ্বর্য বাইরে দেখাতেই ব্যস্ত থাকে, তা হলে তার আর অন্তরের মধ্যে নীরবে ডুব দিয়ে অমূল্য জ্ঞানরত্ন আহরণ করবার অবকাশ কোথায় থাকে, বলুন?"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীও ঠিক ঐ রকম একমুখী গভীর মননের সাহায্যে শাস্ত্রোপলব্ধির বিষয়ে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন। বলতেন, "চোখ দিয়ে জ্ঞানলাভ করা যায় না, যায় তোমার অস্তিত্বের প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে। সত্যের প্রতি দৃঢ় আস্থা যখন শুধু তোমার মনেই আবদ্ধ থাকবে না, সমস্ত সত্তা ব্যেপে ছড়িয়ে পড়বে, তখনই তুমি এর মানে বোঝবার সাহস করতে পার।" আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করতে গেলে বই পড়ে জ্ঞানলাভ করা

প্রয়োজনীয় উপায় বলে শিষ্যদের এইরকম ঝোঁকের প্রতি তিনি কোন উৎসাহ দেখাতেন না।

তিনি বলতেন, "ঋষিরা একটি মাত্র শ্লোকের বা একটি মাত্র সূত্রের মধ্যে যে গূঢ় অর্থ নিহিত করে গেছেন, তার উপর টীকাকার পণ্ডিতেরা যুগযুগান্ত ধরে ব্যাখ্যা করতেই ব্যস্ত। অন্তহীন বিদ্যার কচকচি কেবল অগভীর মনেরই জন্য। 'ঈশ্বর আছেন' — না, কেবলমাত্র 'ঈশ্বর' — এ কথাটির মত মুক্তিদায়িনী সরল চিন্তা আর কিইবা আছে?"

মানুষ কিন্তু সহজে সরল চিন্তায় ফিরে যেতে চায় না। বুদ্ধিজীবী শুধুমাত্র "ঈশ্বর" এই একটামাত্র শব্দে সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে চায় না। এই রকম একটা বিদ্যার গরিমা দেখাতে পারলে তবেই তারা আত্ম-তুষ্টিলাভ করে।

নিজেদের ঐশ্বর্য বা উচ্চ পদমর্যাদা সম্বন্ধে যাঁদের টন্‌টনে জ্ঞান ছিল, গুরুদেবের কাছে এসে অন্যান্য বিষয়ে হয়ত তাঁদের দীনতা স্বীকার করতে হত। একবার এক ম্যাজিষ্ট্রেট সমুদ্রোপকূলে পুরীর আশ্রমে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। লোকটি রুক্ষপ্রকৃতির বলে খ্যাতি ছিল। ইচ্ছে করলে তিনি আপন ক্ষমতাবলে আমাদের আশ্রম থেকে উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করতে পারতেন। ব্যাপারটা উল্লেখ করে গুরুদেবকে আমি আগে থাকতেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। তথাপি তিনি যেভাবে বসেছিলেন সেভাবে নির্বিকার বসে রইলেন — আদর আপ্যায়ন বা অভ্যর্থনার জন্যে উঠেও দাঁড়ালেন না।

একটুখানি সন্ত্রস্ত হয়ে আমি তো দরজার কাছটিতে বসে রইলাম। ঘরে ঢুকে ভদ্রলোককে একটা কাঠের বাক্সের উপরেই বসে থাকতে হল। গুরুদেব আমাকে ম্যাজিস্ট্রেটের জন্যে একটা চেয়ারও আনতে বললেন না। ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব স্পষ্টতঃই আশা করেছিলেন যে, তাঁর মত মহামান্য অতিথির অভ্যর্থনা যথোচিতই হবে, কিন্তু তা আর পূর্ণ হল না।

অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা শুরু হল। ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব পদে পদে শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করে যেতে লাগলেন। বিষয়ের শুদ্ধতা যেমনি হারাতে বসলেন, তাঁর রাগও তেমনি চড়তে লাগল। অবশেষে আর সামলাতে না পেরে তিনি বলে বসলেন ঃ "জানেন, আমি এম. এ.তে ফার্স্ট

হয়েছিলাম?" যুক্তি তাঁকে একেবারে পরিত্যাগ করে গেলেও, তখনও কিন্তু তিনি চেঁচিয়েই চলেছেন!

গুরুদেব অত্যন্ত শান্তভাবে বললেন, "ম্যাজিস্ট্রেটসাহেব, আপনি কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন যে এটা আপনার এজলাস নয়। আপনার ছেলেমানুষি কথায় অনেকে হয়ত ভাবতে পারে যে, আপনার কলেজ জীবনে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই ঘটেনি। বৈদিক জ্ঞান উপলব্ধির সঙ্গে একটা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রির কোন দিক দিয়েই কোন সম্বন্ধ নেই। খাঁটি সাধুরা কি আর বছর বছর হিসাবরক্ষকদের মত দলে দলে ইউনিভার্সিটি থেকে তৈরী হয়ে বেরোন, বলুন?"

গুম হয়ে খানিকটা চুপ করে বসে থেকে অবশেষে তিনি হা হা করে হেসে বললেন, "আজ আমি এই প্রথম একজন স্বর্গরাজ্যের ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষাৎ পেলাম।" পরে অবশ্য তিনি গুরুদেবকে যথারীতি অনুরোধ করলেন তাকে "শিক্ষানবীশ" শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে। তাকে তাঁর শিষ্য করে নিতে। কিন্তু তার অনুরোধটায় ছিল আইনের ভাষা — যা তার মজ্জাগত।

কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী, লাহিড়ী মহাশয়ের মতই সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছুক "অপরিণত" শিষ্যদের নিরুৎসাহিতই করতেন। উভয় গুরুই বলতেন, "ঈশ্বরোপলব্ধি যার হয় নি, এমন লোকের গেরুয়া বসন ধারণ করা সংসারকে ঠকান। বাইরে সংসার ত্যাগের চিহ্নধারণের কথা ভুলে যাও, যা একটা মিথ্যা অহমিকা এনে তোমার ক্ষতি করতে পারে। তোমার নিয়মিত দৈনিক আধ্যাত্মিক উন্নতি ছাড়া আর কিছুরই প্রয়োজন নেই — আর তারজন্য "ক্রিয়াযোগ" অভ্যাস কর।"

মানুষের যোগ্যতা নিরূপণ করতে গেলে সাধু সন্ন্যাসীরা এক ধ্রুবমান প্রয়োগ করেন — সংসারের সদাপরিবর্তনশীল মানদণ্ড হতে যার বিরাট পার্থক্য। মানবসমাজ — যা তার নিজ দৃষ্টিতেই কত বিচিত্ররূপে প্রতিভাত, তা কিন্তু গুরুর দৃষ্টিতে মাত্র দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত — অজ্ঞানী লোক যারা ঈশ্বরকে চায় না, আর জ্ঞানী লোক যারা ঈশ্বরকে চায়।

গুরুদেব তাঁর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণসংক্রান্ত সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার নিজেই দেখতেন। বিবেকহীন অনেকেই বহুবার তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি

দখল করবার চেষ্টা করেছিল। খুব শক্ত হাতে, এমন কি মোকর্দমা পর্যন্ত রুজু করে তিনি প্রত্যেককে হটিয়ে দিয়েছিলেন। এ রকম হাঙ্গামা পোহাবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাতে কারোর গলগ্রহ হতে না হয়, এমন কি শিষ্যদেরও উপর কোনপ্রকার নির্ভর করতে না হয়।

আমার দারুণ স্পষ্টবাদী গুরুদেবকে যে কোনরকম ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় নি তার অন্যতম কারণ হলো ঐ আর্থিক স্বাবলম্বিতা। অন্যান্য গুরুরা, যাঁরা তাঁদের অনুগামীদের মনতুষ্টি করেই চলতেন, তাঁদের মত আমার গুরুদেব অপরের ঐশ্বর্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রভাবেরই অধীন ছিলেন না। কোন উপলক্ষ্যেই তাঁকে অর্থের জন্য অনুরোধ করতে, এমন কি কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত দিতে কখনো আমি দেখিনি। আশ্রমে সব শিষ্যই বিনাখরচে তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করতো।

একবার শ্রীরামপুর আশ্রমে শমন জারি করবার জন্য আদালতের এক পিয়াদা এসে হাজির হল। কানাই নামে একটি শিষ্য আর আমি তাকে নিয়ে গুরুজীর কাছে হাজির হলাম। শ্রীযুক্তেশ্বরজীর প্রতি লোকটার ব্যবহার অত্যন্ত আপত্তিজনক ছিল। লোকটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে যখন বলল, "এই আশ্রম ছেড়ে আপনাকে যখন আদালতে হাজির হতে হবে, তখন খুব ভাল হবে বুঝি?" তখন কিন্তু আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। উচিত শিক্ষা দেবো মনে করে এগিয়ে গিয়ে বললাম ঃ "আর বেশী লম্বাইচওড়াই করেছ কি তোমায় মাটিতে শুইয়ে দেব।" কানাইও আমার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "হতভাগা, সাহস ত' ভারি দেখছি, এই পুণ্য আশ্রমে এসে আমাদের সামনেই আমাদের গুরুদেবের নিন্দে করছো?"

গুরুদেব কিন্তু নিন্দুককে আগলে দাঁড়িয়ে বললেন, "ওহে, এই তুচ্ছ ব্যাপারে অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? এ ত' কেবলমাত্র তার কর্তব্য পালন করতে এসেছে।"

লোকটা ত' একেবারে হতভম্ব। এ রকম বিপরীত ধরণের দুটো অভ্যর্থনা পেয়ে হকচকিয়ে গিয়ে সসম্মানে ক্ষমাপ্রার্থনা করে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করল।

আশ্চর্য! এমন যে গুরু যাঁর আগুনের মত তেজ, — তিনি অন্তরে এমন ধীর, এমন অবিচলিত, এমন শান্ত হলেন কি করে? বেদে ঋষিপুরুষের যে বর্ণনা আছে, "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি চ" — তা তাঁর সঙ্গে ঠিক মানিয়ে যায়।

এ জগতে এমন ধরণেরও লোক দেখা যায় যারা রবার্ট ব্রাউনিং এর কথায় —

"নিজেরা আঁধার কারা,
সহেনা আলোর ধারা।"

মাঝে মাঝে দু' একজন আগন্তুক কাল্পনিক অভিযোগ তুলে গুরুদেবকে ভর্ৎসনা করতেন। গুরুদেব অবিচলিতচিত্তে ও নম্রভাবে তাদের সব কথা ধৈর্যের সঙ্গে শুনতেন, আর মনে মনে বিচার করে দেখতেন — এরূপ অন্ধ দোষারোপের ভিতর প্রকৃতই কোন সত্য নিহিত আছে কি না। এইরকম ঘটনাগুলো গুরুদেবের অসামান্য মন্তব্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয় — "কিছু মানুষ অন্যের মাথা কেটে ফেলে দিয়ে নিজেরা বড় হতে চায়!"

প্রকৃত সাধুদের সদা শান্তভাব, যে কোন উপদেশের চেয়ে ফলপ্রদ। আর তা মনে গভীরভাবে গাঁথা হয়ে যায়। "রাগ যার দেরীতে আসে সে মহাবলশালীর চেয়েও মহাবলী; যে তার আত্মাকে শাসন করতে পারে, সে রাজ্যজয়ীর চেয়েও মহান।"*

আমি প্রায়ই ভাবতাম — আমার সুমহান গুরুদেব খুব সহজেই একজন সম্রাট বা বিশ্ববিজয়ী বড় যোদ্ধা হতে পারতেন, যদি তাঁর মন খ্যাতি বা এ জগতে কীর্তিলাভের জন্যে উন্মুখ হতো। তার বদলে তিনি অন্তরের মধ্যে আত্মম্ভরিতা আর রোষের দূর্গপ্রাচীর ভগ্ন করে চূর্ণ করবার ব্রতই নিয়েছিলেন, যার পতনেই মানুষের উন্নতি।

---

* হিতোপদেশ ১৬ঃ৩২ (বাইবেল)।

১৩ পরিচ্ছেদ

বিনিদ্র সাধু

একদিন সত্যসত্যই গুরুদেবকে আমি অকৃতজ্ঞভাবে এই কথাগুলি বলে বসলাম, "গুরুদেব, অনুগ্রহ করে আমায় হিমালয়ে যেতে অনুমতি দিন। সেখানে অখণ্ড নীরবতার মধ্যে আমি নিত্য ভগবৎসঙ্গ লাভ করব বলেই মনে করি।" মাঝে মাঝে সাধকেরা যেমন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভ্রান্তিতে প্রলুব্ধ হন, সেইরকমভাবে আমিও আশ্রমের কাজকর্মে এবং কলেজের পড়াশুনার উপর ক্রমশঃই অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম। দোষ লাঘবের একটা ক্ষীণ যুক্তি খাড়া করা যায় এই বলে যে, শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সঙ্গে পরিচিত হবার মাত্র ছ'মাস বাদেই আমি ঐ প্রস্তাব করি। তখনও পর্যন্ত আমি তাঁর গগনস্পর্শী ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করে উঠতে পারি নি।

গুরুদেব ধীরে ধীরে অথচ অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর দিলেন ঃ "হিমালয়ে তো অনেক পাহাড়ী থাকে; কই তাদের তো ঈশ্বরলাভ হয় না। জড় পাহাড়ের চেয়ে যাঁর সত্য সত্যই ঈশ্বরোপলব্ধি হয়েছে, তেমন লোকের কাছ থেকেই জ্ঞানান্বেষণ করা ভাল নয় কি?"

তিনিই আমার শিক্ষাদাতা, পাহাড় নয়, — গুরুদেবের সামান্য ইঙ্গিত উপেক্ষা করে আমার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করলাম। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আর কোন উত্তর প্রদান করলেন না। আমি তার মানে "মৌনং সম্মতিলক্ষণং বলেই ধরে নিলাম, লোকে যেমন অনিশ্চিত মানেটা নিজের সুবিধামতই আগে চট করে ধরে নেয়।

কলকাতার বাড়ীতে এসে সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি যাবার উদ্যোগে ব্যাপৃত হলাম। একটা কম্বলের মধ্যে গোটাকতক জিনিষ বাঁধাছাঁদা করবার সময় মনে পড়ল ঐরকমই আর একটা পুঁটুলির কথা, বছরকয়েক আগে যা চিলেকোঠার জানালা থেকে লুকিয়ে নীচে ফেলে দিয়েছিলাম। ভাবছিলাম — এটাও না আবার সে'বারকার হিমালয়ে পলায়নের মত

নিষ্ফল যাত্রা হয়ে বসে? প্রথমবারে আমার আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা ছিল খুবই বেশি; কিন্তু আজ রাতে গুরুদেবকে পরিত্যাগ করে যাবার চিন্তায় বিবেক দংশন হচ্ছিল। তার পরদিন সকালে আমি আমাদের স্কটিশচার্চ কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক বিহারী পণ্ডিত মহাশয়কে খুঁজে বার করলাম। দেখা হতে বললাম, "পণ্ডিত মশাই, আপনি আমায় বলেছিলেন যে লাহিড়ী মহাশয়ের একজন খুব বড় শিষ্যের সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব আছে। তাঁর ঠিকানাটা একটু দয়া করে যদি দেন!"

"ওঃ, তুমি রামগোপাল মজুমদারের কথা বলছ? তাঁকে আমি বলি 'বিনিদ্র সাধু'। সর্বদাই তিনি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। তারকেশ্বরের কাছে রণবাজপুরে তাঁর বাড়ী।"

পণ্ডিত মশাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাড়াতাড়ি তারকেশ্বরের ট্রেন ধরলাম। নির্জন হিমালয়ে গিয়ে ধ্যানধারণায় নিজেকে নিযুক্ত রাখবার বিষয়ে সেই "বিনিদ্র সাধু"টির কাছ থেকে অনুমোদন লাভ করে মনের সংশয় দূর করব বলে আশা করেছিলাম। বিহারী পণ্ডিত মশাই আমায় বলেছিলেন — রামগোপাল মজুমদার মহাশয় বাংলাদেশে নির্জন গুহায় বহু বৎসর "ক্রিয়াযোগ" সাধনের পর দিব্যজ্ঞান লাভ করেছেন।

তারকেশ্বরে এক প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। খ্রীস্টান ক্যাথলিকেরা ফ্রান্সের পবিত্র তীর্থস্থান লুর্ডসের প্রতি যেমন ভক্তি প্রদর্শন করে, হিন্দুরাও তারকেশ্বরকে তেমনি ভক্তি করে। কত অসংখ্য লোক দৈবকৃপায় এখানে আরোগ্য হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই; তার মধ্যে আমাদের পরিবারেরও একজন ছিলেন।

আমার বড়পিসিমা একদিন আমায় বলেছিলেন, "তারকেশ্বরে গিয়ে একবার আমি একসপ্তাহ ধরে 'হত্যে' দিয়ে পড়েছিলাম। নির্জলা উপোষ করে তোমার খুড়ামশায় সারদাবাবুর একটা পুরানো জটিল রোগ নিরাময়ের আশায় আমি 'হত্যে' দিয়েছিলাম। সাত দিনের দিন হাতের মুঠোয় একটা ওষুধ পেয়ে গেলাম। তার পাতা সিদ্ধ করে তোমার খুড়ামশায়কে খাওয়াতেই রোগ একদম সেরে গেল, — আর কখনও হয় নি।"

পবিত্র তীর্থ তারকেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মন্দিরের বেদীতে গোলাকার প্রস্তরমূর্তি ছাড়া আর কিছুই নেই। অনাদিলিঙ্গ মহাদেব যথার্থই অনন্তের প্রতীক। ভারতে অশিক্ষিত চাষাভুষোরাও বিমূর্ত রূপকে বুঝতে পারে যা পশ্চিমের লোকেদের কাছে একান্তই অবাস্তব ও উপহাসের বস্তু।

আমার মনের ভাব তখন এমনই উগ্র ছিল যে, পাথরের মূর্তির সামনে মাথা নোয়ানর আর ইচ্ছা হল না। ভাবলাম, আত্মার মধ্যেই শুধু ঈশ্বরের অনুসন্ধান করা উচিত। নতজানু হয়ে প্রণাম না করেই মন্দির ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম দূরবর্তী রণবাজপুর গ্রামের দিকে যাত্রার জন্যে। আমি পথ চিনতাম না। রাস্তায় এক পথিককে জিজ্ঞাসা করতে, সে ত' মহা ভাবনায় পড়ে গেল। যাক, শেষ পর্যন্ত দৈববাণীর মত করেই সে বললো ঃ "রাস্তার মোড়ে পৌঁছে ডান দিকে বেঁকে সোজা চলতে থাকবে।"

লোকটার কথামত যে রাস্তা ধরে চললাম, সেটা একটা খালের ধার দিয়ে গেছে। রাত নেমে এল; গাঁয়ের ধারে বনেজঙ্গলে জোনাকির মেলা; চার ধারে শেয়ালের হুক্কাহুয়া। চাঁদের ক্ষীণ আলো কোনই সাহায্যে এলো না। ঘণ্টা দুই ধরে হোঁচট খেতে খেতে এগোতে লাগলাম।

গরুর গলার স্বাগত ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পেলাম! বারম্বার চিৎকার করে ডাকাতে এক কৃষকপুঙ্গব তো পাশে এসে উদয় হলেন। বললাম, "এখানে রামগোপাল বাবু কোথায় থাকেন, জান?"

"ও নামে এ গাঁয়ে কেউ থাকে না।" জবাবটা রুক্ষ আর কিছু চড়া! "আপুনি মশাই বোধ হয় একটি টিকটিকি, মিছেমিছি ভাঁড়াচ্ছ!"

কি আর করি, তখনকার তার রাজনৈতিক হাঙ্গামাসন্ত্রস্ত মনের সন্দেহ দূর করবার আশায় আমার দুর্ভোগের কথা তার কাছে কাতরস্বরে ব্যাখ্যা করলাম। লোকটার কি দয়া হল, তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে ভালরকম অতিথি সৎকার করল।

যেতে যেতে বলল, "রণবাজপুর এখান থেকে বহু দূর। চৌরাস্তাটার মোড়ে আপুনি বাঁ ধারে গেলেই পেতে, ডান ধারে নয়।"

হা ভগবান! সখেদে ভাবতে লাগলাম যে, অচেনা পথে চলবার সময় পথিকদের কাছে আগের লোকটা কি রকম একটা মূর্তিমান দুর্গ্রহ আর

বিপদজনক! যাইহোক, অবশেষে মোটা চালের ভাত, মুসুরির ডাল আর তার সঙ্গে আলু-কাঁচকলার ঝোল দিয়ে পরম পরিতৃপ্তি সহকারে রাতের ভোজনক্রিয়াটি সুসম্পন্ন করে ত' উঠানের পাশে একটি ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যে শয়ন করা গেল। দূরে গ্রামবাসীরা খোল* আর করতালের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করে চলেছে। সে রাতে ঘুম সামান্যই হলো। ভগবানের কাছে গভীরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলাম, যাতে করে গুপ্তযোগী রামগোপাল বাবুর কাছে পৌঁছতে পারি।

ভোরে ঊষার প্রথম আলোর রেখা আমার কুঁড়ের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি রণবাজপুরের দিকে রওনা দিলাম। এবড়ো-খেবড়ো ধানের ক্ষেত, কাস্তে দিয়ে কাটা কাঁটাগাছের গোড়া আর শুকনো মাটির ঢিপির উপর দিয়ে মন্থরগতিতে এগিয়ে চললাম। মাঝে মাঝে দু'একজন চাষার সঙ্গে দেখা হলে, আর কতদূর জিজ্ঞাসা করলেই বলে, "এই কোশটাক, বেশী দূর নয়!" ভোর থেকে হাঁটা শুরু করে মাথার উপর সূর্য এসে পড়ল, বেলা দুপুর হয়ে গেছে, তবুও সেই "কোশটাক" পথ আর ফুরোয় না, — রণবাজপুর বরাবর একক্রোশ দূরেই রয়ে গেল!

বেলা তিন প্রহর গড়িয়ে গেল, সামনে তবুও সেই অন্তহীন ধানের ক্ষেত! খোলা আকাশ থেকে গ্রীষ্মের দারুণ দাবদাহ; আমার তো ধাত ছেড়ে যাবার উপক্রম। এমনসময় দেখলাম গদাইলস্করী চালে একজন লোক এগিয়ে আসছে। আর কতদূর আছে জিজ্ঞাসা করলাম অতি ভয়ে ভয়ে, পাছে ঐ লোকটাও সেই একঘেয়ে জবাবই দিয়ে বসে, "এই আর কোশখানেক হবে আর কি!"

অপরিচিত লোকটি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। বেঁটে আর রোগাগোছের চেহারা — দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত বিশেষ কিছুই নেই। কেবল একজোড়া অসাধারণ উজ্জ্বল আর কালো চোখ ছাড়া!

বিস্ময়স্তব্ধ মুখের সামনে আঙ্গুল নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, "রণবাজপুর ছাড়বার মতলব করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে তোমার উদ্দেশ্য ভাল; তাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। তুমি ভারি চালাক,

* খোল — ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং শোভাযাত্রায় ভক্তিমূলক গানের (কীর্তন) সঙ্গে বাজান হয়।

না? ভেবেছিলে যে, না বলেকয়েই তুমি এসে আমায় পাকড়ে ফেলবে? বেহারী পণ্ডিতের কি দরকার ছিল তোমায় আমার ঠিকানা দেবার?"

সেই মহান সাধুটির সামনে আত্মপরিচয় দেওয়া তখন নিতান্তই বাহুল্য জ্ঞান করে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইলাম। আমার অভ্যর্থনার ধরণ দেখে খানিকটা আহতও হলাম। তার পরের প্রশ্নটা আচমকাই এলো ঃ "আচ্ছা, বল তো, ভগবান কোথায় আছেন বলে তোমার মনে হয়?"

"আজ্ঞে, তিনি আমার ভিতর আর সর্বত্রই তো রয়েছেন।" উত্তর দিলাম, কিন্তু তখন আমার চেহারাতেও মনের বিহ্বল ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল।

"এ্যাঁ, সর্বব্যাপী তিনি, কি বল?" সাধুটি হেসে বললেন, "তা হলে বাছা কালকে তারকেশ্বরের মন্দিরে তুমি সেই সর্বব্যাপী ভগবানের প্রস্তরমূর্তির সামনে মাথা নোয়ালে না কেন হে?* তোমার দম্ভের দরুণ ফল কি হল জান? রাস্তায় সেই লোকটা, যার ডাইনে বাঁয়ে জ্ঞান নেই, তার দ্বারা ভুলপথে চালিত হয়ে শাস্তি পেলে। আজকেও তুমি বেশ খানিকটা ভুগলে দেখছি।"

সর্বান্তঃকরণে আমিও তা সমর্থন করলাম। বিস্ময়ে অভিভূত হলাম এই ভেবে যে, আমার সামনে এ রকম একটা অত্যন্ত সাধারণগোছের শরীরের ভিতর কি করে এমন সর্বদর্শী চক্ষু লুকিয়ে আছে। সেই অদ্ভুত যোগীর কাছ থেকে কেমন একটা আশ্চর্য নিরাময়কারী শক্তি এসে আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলল। মাঠের মাঝখানে সেই আগুনের হল্কার মধ্যেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বেশ স্নিগ্ধ আর সুস্থ হয়ে উঠলাম।

তিনি বললেন, "সাধক ভাবতে চায় যে, সে যে সাধনপথ বেছে নিয়েছে সেইটেই হচ্ছে ভগবানকে পাবার একমাত্র পথ। যে যোগের দ্বারা অন্তরে ঈশ্বরভাবের উদয় হয়, সেই যোগই হচ্ছে যে সর্বশ্রেষ্ঠ পথ তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। লাহিড়ী মহাশয়ও সেই কথাই আমাদের বলেছেন। অন্তরে ভগবানকে পেয়ে বাইরেও কিন্তু তাঁকে আমরা শীগগিরই পেতে পারি। তারকেশ্বর বা অন্যান্য তীর্থস্থানে লোকেদের যে

* "যে, কোন কিছুর সামনে মাথা নত করে না, সে নিজের ভারও নিজে বহন করতে পারে না।" — ডষ্টয়েভস্কি, 'দি পজেসড়্'।

এত ভক্তিশ্রদ্ধা তার কারণ ঐ স্থানগুলি হচ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তির কেন্দ্রস্থল।"

সাধুবরের তিরস্কারের ভঙ্গী তখন আর ছিল না। চক্ষুতে স্নিগ্ধকোমল দৃষ্টি; সস্নেহে আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "নবীন যোগী, দেখছি যে তুমি তোমার গুরুদেবের কাছ থেকে পালাচ্ছ। আরে, তোমার যা যা প্রয়োজন সবই তো তাঁর আছে, তোমার আর ভাবনা কি? তাঁর কাছেই ফিরে যাও। পর্বত কি কখনো গুরু হয় নাকি?" রামগোপাল বাবু ঠিক সেই কথারই পুনরুক্তি করলেন যা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী দিন দুই আগে করেছিলেন।

রামগোপাল বাবু আমার দিকে একটি রহস্যময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলতে লাগলেন, "বিশ্ববিধানে এমন কোন নিয়ম নেই যে গুরুদের কেবলমাত্র পাহাড় পর্বতেই বাস করতে হবে। ভারত বা তিব্বতের, হিমালয়ের সাধুসন্তদের উপর কোন একচেটে অধিকার নেই। ঐ দু'জায়গা ছাড়া ভূ-ভারতে আর কোথাও যে মুনিঋষিদের পাওয়া যায় না, তা নয়। অন্তরের মধ্যে যে জিনিস পাবার জন্যে লোকে অস্থির হয় না, তারজন্যে চারধাম ঘুরে বেড়ালেও কোন কিছুরই দর্শনলাভ হয় না। সাধক আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের জন্য যদি পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত যেতেও মনস্থ করে অমনি দেখতে পায় যে, তার গুরু কাছেই এসে হাজির হয়েছেন।"

নীরবে মনে মনে তাতে সায় দিলাম। মনে পড়ল, কাশীর আশ্রমে আমার প্রার্থনার উত্তরে জনাকীর্ণ গলিপথে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে সেই সাক্ষাৎ!

"একটা ছোটগোছের ঘর যোগাড় করে নিতে পারবে কি, যেখানে দরজা বন্ধ করে তুমি একলা থাকতে পার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" দেখলাম যে সাধারণ থেকে ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপারে সাধুমহাশয় অতি দ্রুতবেগে নেমে আসছেন।

"সেটাই হবে তোমার গুহা।" এই বলে আমার উপর তিনি যে জ্ঞানালোকদীপ্ত দৃষ্টিপাত করলেন তা আজও ভুলি নি। "সেটাই হবে তোমার পবিত্র গিরি, আর সেখানেই তুমি ভগবানকে খুঁজে পাবে বুঝলে?"

তাঁর সহজ কথাগুলো তৎক্ষণাৎ হিমালয়ের জন্য আমার জীবনব্যাপী দৌর্বল্য একেবারে দূর করে দিল। চিরন্তন তুষার আর পর্বতের স্বপ্ন থেকে আমি যেন সেই আগুনে ধানক্ষেতের মাঝে হঠাৎ জেগে উঠলাম।

"বৎস, তোমার ঈশ্বরলাভের আকাঙক্ষা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। তোমার উপর আমার প্রগাঢ় স্নেহ জন্মেছে।" বলে রামগোপাল বাবু আমার হাত ধরে কাছেই জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় একটি মনোরম কুটিরের ভিতর নিয়ে গেলেন। মাটির ঘর, নারকেলপাতা দিয়ে ছাওয়া, প্রবেশ পথে সদ্যফোটা ফুলের শোভা।

সাধুপ্রবর তাঁর ছোট্ট কুঁড়েঘরটির ভিতর একটি ছায়াশীতল বাঁশের মাচার উপর নিয়ে গিয়ে আমায় বসালেন। একখণ্ড মিছরি আর খানিকটা মিষ্টি লেবুর সরবত দিয়ে অতিথি সংকার করবার পর আমরা মাটির রোয়াকে গিয়ে পদ্মাসনে বসলাম। ঘণ্টাচারেক ধ্যানে কাটল। পরে চোখ খুলে দেখলাম যে, জ্যোৎস্নাস্নাত যোগিবরের দেহ তখনও নিথর, নিস্পন্দ! উদরে তখন ক্ষুধার আগুন জ্বলছে; রক্তচক্ষু প্রদর্শনে উদরকে শাসন করে বোঝাচ্ছি — মানুষ কেবল অন্ন ভক্ষণ করেই বাঁচে না; হেনকালে রামগোপাল বাবু আসন ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন, "আহা দেখছি বড্ড খিদে পেয়েছে, না? আচ্ছা, খাবার শীগগিরই তৈরী হচ্ছে।"

রোয়াকের এককোণে মাটির উনুন জ্বেলে ভাত আর ডাল চট্‌পট্ সিদ্ধ করে নামিয়ে কলাপাতায় বেড়ে দেওয়া হল। গৃহস্বামী রন্ধনকার্যে আমার সর্ববিধ সহায়তাই সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। কথায় আছে, "অতিথি নারায়ণ"। এ নীতি হিন্দুরা স্মরণাতীত কাল হতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করে আসছে। পরবর্তীকালে বিদেশে ভ্রমণের সময় আমি দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম যে, বহু দেশেই গ্রামবাসীদের মধ্যে এই রকম অতিথিদের আদর আপ্যায়ন বা তাদের প্রতি সসম্মান ব্যবহার প্রচলিত আছে। শহরবাসীর অতিথিসেবার উৎসাহ, অগণিত অপরিচিত মুখের আবির্ভাবের কারণে ক্রমশই ম্লান হয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গলের ভিতর সেই ছোট্ট ঘরটিতে যখন আমি যোগিবরের পাশে আসনপিঁড় হয়ে বসেছিলাম, তখন হাটবাজারের শব্দ প্রায় অভাবনীয় দূরে বলেই মনে হচ্ছিল। সেই ছোট্ট ঘরটি এক রহস্যময় মৃদু আলোয় আলোকিত। কতকগুলো ছেঁড়া কম্বল পেতে রামগোপাল বাবু আমার বিছানা করে দিলেন আর নিজে একটা মাদুরের উপরে বসলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির চৌম্বক আকর্ষণে অভিভূত হয়ে আমি ভরসা করে একটি অনুরোধ করে বসলাম ঃ "মশায়, আমায় 'সমাধি' লাভ করিয়ে দিন না কেন?"

"বাবা, ভগবৎসঙ্গ লাভ করিয়ে দিতে পারলে আমি খুব খুশীই হতাম, কিন্তু তা করবার লোক তো আমি নই।" সাধুবর তখন অর্ধোন্মীলিতনয়নে আমায় নিরীক্ষণ করে বললেন, "তোমার গুরুদেবই সে অনুভূতি তোমায় শীগগিরই দেবেন। তোমার শরীর এখনও পর্যন্ত তেমনভাবে তৈরী হয় নি। ছোট ইলেকট্রিক বাল্বে যেমন অতিরিক্ত তড়িৎ চালালে তক্ষুণি তা ফেটে যায়, তোমার তন্ত্রিকাগুলোও তেমনি সমাধিলাভের জন্যে এখনও উপযুক্তভাবে তৈরী হয়নি। তোমায় যদি আমি এখনই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করাই তা হলে তুমি এক্ষুণি জ্বলে শেষ হয়ে যাবে; মনে হবে যেন তোমার শরীরকোষের প্রতি অণুপরমাণুতে আগুন লেগে গেছে।"

চিন্তিতভাবে যোগিবর বলতে লাগলেন, "তুমি আমার কাছ থেকে ব্রহ্মজ্ঞান চাইছ! কিন্তু আমি ভাবছি, দীনাতিদীন আমি, সামান্য যেটুকু ধ্যানধারণা করতে পেরেছি — তা দিয়ে যদি আমি ভগবৎকৃপা লাভ করে থাকি, তাহলে শেষ হিসাবনিকাশের দিন তাঁর চোখে আমার কি মূল্য দাঁড়াবে, তাও তো বুঝে উঠতে পাচ্ছি নে!"

"মশায়, আপনি তো একমনে বহুদিন ধরেই ভগবানকে ডেকে আসছেন। তবে আর ভাবনা কিসের?"

"তা বটে, তবে বেশি আর আমি কি করেছি! বেহারী পণ্ডিত বোধহয় তোমায় আমার জীবনের কথা কিছু বলে থাকবে। বিশ বছর ধরে একটি নির্জন গুহায় আমি রোজ আঠার ঘণ্টা করে ধ্যানে বসতাম। তারপর ওখান

থেকে চলে গিয়ে আমি আরও একটি দুর্গম গুহায় প্রবেশ করে সেখানে পঁচিশ বছর ধরে রোজ প্রায় কুড়ি ঘণ্টা করে যোগাভ্যাস করতাম। আমার ঘুমের দরকার হোত না, কারণ আমি নিত্য ভগবৎসঙ্গ লাভ করতাম। সাধারণ অবচেতন অবস্থার আংশিক শান্তির চেয়ে সমাধির পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যেই আমার দেহ পূর্ণবিশ্রাম লাভ করত।

"ঘুমের সময় মাংসপেশীগুলো শিথিল হয়ে পড়ে; কিন্তু হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং রক্তচলাচলের কাজ তো সর্বদাই চলেছে — তাদের কোন বিশ্রাম নেই। সমাধিলাভ হলে পর মহাজাগতিক শক্তির তড়িদাঘাতে শরীরের ভিতরের যন্ত্রপাতিগুলোর প্রাণশক্তি স্তম্ভিত অবস্থায় থাকে। এই উপায়েই বহুবৎসর ধরে আমি ঘুমের কোন প্রয়োজন বোধ করি নি।" তারপর বললেন, "একটা সময় আসবে যখন তুমিও ঘুম ত্যাগ করতে পারবে।"

"কি আশ্চর্য! আপনি এতদিন ধরে ধ্যানধারণা করে এলেন, তবুও বলেন যে ভগবানের কৃপালাভ করবেন কি না? তা হলে আমাদের মত অভাগা অকিঞ্চনদের কি গতি হবে?" বলে তো অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

"বাবা, এটা বুঝছ না কেন যে, ভগবান অনন্তস্বরূপ। তাঁকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর ধ্যান করেই সব বুঝে ফেলব — এ আশা একান্ত অসংগত নয় কি? যাইহোক, বাবাজী আমাদের এই বলে আশ্বাস দিয়েছেন যে, এমন কি সামান্যমাত্র ধ্যানেই মানুষের দারুণ মৃত্যুভয় ও পরলোকের ভয় নিবারণ হবে। দেখ, তোমার আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা সামান্য একটা ছোট্ট পাহাড়ে ধরে রেখ না। তাকে একেবারে অসীম ভগবৎপ্রাপ্তির নক্ষত্রলোকে তুলে ধর। কঠোর পরিশ্রম করলে নিশ্চয়ই তুমি সেখানে পৌঁছতে পারবে।"

আশায় উল্লসিত হয়ে তাঁর কাছ থেকে আরও কিছু ঈশ্বরীয় কথা শুনতে চাইলাম। তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু, বাবাজী মহারাজের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের অদ্ভুত কাহিনী শোনালেন।* মাঝরাতের কাছাকাছি

---

* ৩৩ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রামগোপাল বাবু মৌনাবলম্বন করলেন, আর আমিও কম্বলের উপর শুয়ে পড়লাম। চোখ বন্ধ করতেই দেখলাম যে, চারধারে যেন অনবরত বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে; আমার ভিতরকার অনন্ত আকাশ যেন উজ্জ্বল জ্যোতিঃর বন্যায় প্লাবিত! চোখ মেলে বাইরে চাইলাম, — দেখলাম যে সেই একই চোখঝলসানো আলো! অন্তশ্চক্ষুতে দেখতে পেলাম, সমস্ত ঘরটা যেন সেই অনন্ত মহাকাশের একটা অংশ হয়ে গেছে!

"ঘুম আসছে না, নাকি?"

"কি করে ঘুমোই বলুন, চোখ বুজলেই বা কি আর খুললেই বা কি, চোখের সামনে যদি অনবরত বিদ্যুৎ চমকায়, তা হলে ঘুম আসবে কি করে, বলুন?"

রামগোপাল বাবু সস্নেহে বললেন, "যাক, তোমার ভাগ্য ভাল, এ রকম অনুভূতি লাভ করলে। এ রকম আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃর দর্শন সহজে কারোর ভাগ্যে হয় না।"

ভোরবেলা হতেই রামগোপাল বাবু আমায় এক টুকরো মিছরি দিয়ে বললেন, "এবার স্বস্থানে প্রস্থান কর!" তাঁর কাছে হতে বিদায় নিয়ে আসতে আমার এতদূর অনিচ্ছা হচ্ছিল যে, দুইগাল বেয়ে অশ্রুধারা অজস্রধারে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রামগোপাল বাবু তখন অত্যন্ত কোমলস্বরে বললেন, "যাক, নেহাৎ শুধুহাতে তোমায় আজ আর ফেরাব না, একটা কিছু তোমার জন্যে করতে হবে।" এই বলে একটু মৃদু হেসে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। পা দুটো যেন মাটিতে গেঁথে গেল, আর নড়তেচড়তে পারলাম না। যোগিবরের কাছ হতে নিঃসৃত শান্তির তরঙ্গ আমার সকল সত্তাকে পরিপ্লাবিত করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমার পিঠের একটা বেদনা একদম আরাম হয়ে গেল; বেদনাটা বহুবছর ধরে মাঝে মাঝেই আমায় কষ্ট দিচ্ছিল।

অপরূপ জ্যোতির্ময় আনন্দসাগরে স্নান করে উঠে যেন নবজন্ম পেলাম — আর কাঁদলাম না! সাধু রামগোপাল মজুমদারের চরণ স্পর্শ

করে জঙ্গলের রাস্তা ধরলাম। তারপর নানা ঝোপঝাড় আর ধানের ক্ষেত পার হয়ে অবশেষে তারকেশ্বরে এসে পৌঁছলাম।

সেই পবিত্র তীর্থস্থানে আবার দ্বিতীয়বার দর্শনের জন্য গিয়ে হাজির হলাম। এবার বাবা তারকেশ্বরের সামনে দণ্ডবৎ হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। অন্তর্দৃষ্টির সামনে দেখতে পেলাম — গোলাকার প্রস্তরখণ্ডটি যেন ক্রমশঃই বর্ধিত হয়ে ব্রহ্মাণ্ডে পরিণত হলো। চক্রের মধ্যে চক্র, অঞ্চলের পর অঞ্চল, সবই যেন আধ্যাত্মিক সম্পদে পরিপূর্ণ।

ঘণ্টাখানেক বাদে প্রফুল্ল চিত্তে কলকাতার ট্রেন ধরলাম। এবার আমার ভ্রমণের শেষ হলো উচ্চ পর্বতমালার মধ্যে নয়, হিমালয়ের মত সুমহান আমার গুরুমহারাজের সামনে!

১৪ পরিচ্ছেদ

সমাধির অনুভূতি

লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগল, ঘাড় হেঁট করে গিয়ে দাঁড়ালাম — "এলাম, গুরুদেব!"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বললেন, "চল, চল, রান্নাঘরে গিয়ে কিছু খাবার যোগাড় করা যাক!" তাঁর কথাবার্তা এত সহজ আর স্বচ্ছন্দ, যেন কয়েক দিন নয়, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।

"গুরুদেব, আশ্রমের কর্তব্য সব ত্যাগ করে হঠাৎ এখান থেকে চলে যাওয়াতে আপনি নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হয়েছেন; ভেবেছিলাম রাগ করবেন।"

"না হে, না। রাগ কোথা থেকে হয়, জানো? অসফল ইচ্ছা থেকেই রাগের উৎপত্তি। আমি তো কারোর কাছ থেকে কোন কিছুই প্রত্যাশা করি না; কাজেই তাদের কোন কাজ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হতে পারে না। আমার ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্যসাধনে তো তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই। তোমার প্রকৃত সুখেই আমি সুখী।"

"গুরুদেব, অহেতুক স্নেহ যে কি, সাধারণ লোকের কাছে তার ধারণা খুব বেশি স্পষ্ট নয়। আজ কিন্তু জীবনে এই প্রথম আমি আপনার দেবশরীরে তার খাঁটি উদাহরণ দেখলাম। এ সংসারে না বলে কয়ে বাপের কাজকর্ম ফেলে রেখে ছেলে যদি ঘরছাড়া হয়, তা হলে বাপও তাকে সহজে ক্ষমা করতে পারে না। কিন্তু কি আশ্চর্য, আপনার বিন্দুমাত্র বিরক্তিও এল না, — বিশেষতঃ কতসব কাজ অসম্পূর্ণ রেখে গিয়ে আপনাকে কতই না অসুবিধায় ফেলে গিয়েছিলাম!"

দু'জনেরই চোখে জল চক্‌চক্ করছে। আনন্দের ঢেউ এসে আমায় যেন ভাসিয়ে দিল। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম — গুরুরূপে ঈশ্বর আমার হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভালবাসার পরিধি, ভগবৎপ্রেমের অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে প্রসারিত করে দিচ্ছেন।

দিনকতক বাদে একদিন সকালে আমি গুরুদেবের বসবার ঘর খালি দেখে গিয়ে ঢুকলাম, — ইচ্ছে ছিল ধ্যানে বসব। কিন্তু নানা অশান্ত আর অবাধ্য চিন্তা এসে আমার সে সাধুপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল। ব্যাধের সামনে এক ঝাঁক পাখির মত তারা চার ধারে উড়তে লাগলো।

দূরের বারান্দা হতে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "মুকুন্দ!" মনটা আমার অশান্ত চিন্তার মতই বিদ্রোহী হয়ে উঠল। মনে মনে বললাম, "গুরুদেব তো আমায় সর্বদা ধ্যান করতে বলেন; আর এ ঘরে কেন এসেছি তাও তিনি জানেন; আমায় তাঁর বিরক্ত করা উচিত হয় না।"

আবার ডাক এল, গোঁয়ার্তুমি করে সাড়া না দিয়েই বসে রইলাম। তিন বারের বার ডাকেতে বেশ বকুনির ঝাঁঝ আছে টের পাওয়া গেল। তবুও প্রতিবাদের সুরে বললাম, "গুরুদেব, ধ্যান করছি।"

গুরুদেব চেঁচিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব বুঝেছি, তোমার কি রকম ধ্যান করা হচ্ছে! মন তো তোমার ঝড়ের মুখে উড়ো পাতার মত। শীগগির এখানে এস।

মনের আসল রূপটি ধরা পড়াতে আর তিরস্কৃত হয়ে, ক্ষুণ্ণমনে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। গুরুদেব অত্যন্ত স্নেহকোমল স্বরে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "বাছা, তুমি যা চাইছ পর্বতমালা তা তোমায় দিতে পারে না।" তাঁর দৃষ্টি শান্ত, গভীর, অতলস্পর্শী। তারপর বললেন, "তোমার হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ হবে।"

শ্রীযুক্তেশ্বরজী কদাচিৎ হেঁয়ালিতে কথা বলতেন। আমি কিছুটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। তিনি আমার ঠিক বুকের মাঝখানে হৃৎপিণ্ডের ওপর হাত দিয়ে একটা মৃদু আঘাত করলেন।

আমার সমস্ত শরীর যেন জমে পাথর হয়ে গেল। ফুস্‌ফুস্ হতে কে যেন একটা প্রকাণ্ড চুম্বক দিয়ে সমস্ত নিঃশ্বাস একেবারে টেনে বার করে নিল। আত্মা আর মন, জড়দেহের বন্ধন হতে সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত হয়ে তরল তীক্ষ্ণভেদী জ্যোতিঃধারার মত প্রতি লোমকূপ থেকে নিঃসৃত হতে লাগলো। শরীর মৃতবৎ; তথাপি গভীর চেতনার মধ্যে এমন জাগ্রত অবস্থা, এমন পরিপূর্ণ জ্ঞান, যেন জীবনে আর কখনও পাই নি। আমার আত্মবোধ

এখন আর ক্ষুদ্র জড় দেহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় — চতুর্দিকের সকল বস্তুর প্রতি অণুপরমাণুতে যেন তা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বহু দূরের রাস্তার লোকগুলো যেন আমারই সুদূর পরিধির মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করে ফিরছে। গাছপালা, লতাপাতার শিকড়গুলো পর্যন্ত যেন মাটির হাল্কা স্বচ্ছতার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। গাছের ভিতরকার রসসঞ্চালন অবধি আমি বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

আশপাশের সব জিনিসই চোখের সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত! আমার সাধারণ সম্মুখদৃষ্টি পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে যেন একটা বিরাট বিশ্বব্যাপী মণ্ডলাকার দৃষ্টিতে পরিণত হল, — সবকিছু একই সময়ে দৃষ্ট আর অনুভূত হতে থাকলো। মস্তিষ্কের পিছন দিয়ে দেখতে পেলাম, রায়ঘাট লেন থেকে বহুদূর পর্যন্ত মানুষ হেঁটে বেড়াচ্ছে; আরও দেখা গেল — একটা সাদা গরু ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আশ্রমের খোলা সদর দরজার সামনের জায়গাটাতে এসে দাঁড়াতে, মনে হলো তাকে যেন আমি পার্থিব চক্ষুদু'টি দিয়ে দেখছি; আবার গরুটি যখন ইঁটের পাঁচিলের ওপাশে গিয়ে পড়ল, তখনও তাকে বেশ স্পষ্টই দেখতে পেলাম।

আমার চোখের সামনে বিস্তৃত দৃশ্যপটের ভিতরকার সমস্ত জিনিসই যেন চলচ্চিত্রের ছবির মত কাঁপছিল। আমার শরীর, গুরুদেবের শরীর, থামেঘেরা দালান, আসবাবপত্র, মেঝে, গাছপালা, সূর্যকিরণ, মাঝে মাঝে হঠাৎ ভীষণভাবে আলোড়িত হয়ে উঠে এক বিরাট জ্যোতিঃসমুদ্রে গলে যাচ্ছিল — এক গ্লাস জলে চিনির দানা ফেলে দিয়ে ঝাঁকালে যেমন সেগুলো একেবারে গলে যায়, ঠিক তেমনি। সেই জ্যোতিঃসাগরে এক হয়ে বিলীন হয়ে যাবার মাঝে নানাবিধ রূপপরিগ্রহে সেই অপরূপ আলোর পরিবর্তন ঘটছিল, আর সেই রূপান্তর গ্রহণের সময় সৃষ্টির কার্য-কারণ তত্ত্বের আভাসও প্রকাশ পাচ্ছিল।

আমার আত্মার শান্ত সীমাহীন তটভূমিতে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আনন্দ এসে আছড়ে পড়ছিল। অনুভব করলাম, পরমাত্মা হলেন এক অপার অসীম চিদানন্দ; তাঁর দেহ যেন অগণিত আলোকতন্তু দিয়ে গড়া। আমার ভিতর তাঁর অপূর্ব আবির্ভাবের বিরাট মহিমা যেন ক্রমশঃ নগর,

মহাদেশ, পৃথিবী, চন্দ্রসূর্য, গ্রহনক্ষত্র, নীহারিকাপুঞ্জ, মহাশূন্যে ভাসমান জগৎসকল — সবকিছুই যেন ছেয়ে ফেলতে লাগল। রাত্রিতে দূর থেকে দেখা ঈষৎ আলোকদীপ্ত কোন এক শহরের মতই সমগ্র বিশ্ব যেন আমার অনন্ত সত্তার মধ্যে দীপ্যমান হচ্ছিল। পৃথিবীমণ্ডলের পরিস্ফুট দিকচক্রবাল রেখার ওপারের উজ্জ্বল আলো যেন তার দূরতম প্রান্তে ঈষৎ ক্ষীণ; সেখানে এক অতি মৃদু আর স্নিগ্ধ আলোর অনির্বাণ জ্যোতিঃ! এ জ্যোতিঃর স্নিগ্ধতা অবর্ণনীয়। সৌরমণ্ডলের গ্রহনক্ষত্রের অন্যান্য ছবি সব যেন অনেক স্থূল আলোয় গড়া।*

এক অনন্ত উৎসমুখ হতে স্বর্গীয় আলোকধারা উৎসারিত হয়ে নক্ষত্রপুঞ্জরূপে প্রজ্বলিত হয়ে এক অনিবর্চনীয় জ্যোতির্মণ্ডলে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। বারবার দেখতে লাগলাম, যেন সেই সৃজনকারী রশ্মিগুলো সংবদ্ধ হয়ে নক্ষত্রপুঞ্জে ঘনীভূত হচ্ছে এবং পুনরায় স্বচ্ছ অগ্নিশিখায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। যেন এক ছন্দোবদ্ধ পূর্বানুবৃত্তিতে লক্ষ কোটি ব্রহ্মাণ্ড এক স্বচ্ছ সুনির্মল জ্যোতিঃতে রূপান্তরিত হল; তারপরে বিরাট অগ্নিমণ্ডল যেন বিশাল গগনে পরিণত হল।

আমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হল — সেই অগ্নিলোকের কেন্দ্রস্থলই হচ্ছে আমার অন্তরের স্বজ্ঞালব্ধ দর্শনের স্থান। বিশ্বপ্রকৃতির সর্বাংশেই যেন আমার নিউক্লিয়াস হতে এক অপূর্ব জ্যোতিঃর ছটা ছড়িয়ে পড়ছে। দেহে, মনে পারদের মত তরল অমরত্বের অমৃতধারা প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত হচ্ছে। প্রণবধ্বনির† মধ্যে — যা হচ্ছে মহাজাগতিক শক্তি — আমি ঈশ্বরের সৃজনধ্বনি শুনতে পেলাম।

হঠাৎ আবার নিঃশ্বাস ফুসফুসের মধ্যে ফিরে এল। প্রায় অসহ্য নৈরাশ্যে অনুভব করলাম আমার সেই অসীম বিরাট সত্তা একেবারে লোপ পেল। আবার সেই সামান্য ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জরে এসে আবদ্ধ হলাম, যেখানে আত্মার অতবড় বিরাট ব্যাপ্তিকে সহজে ধরে রাখা যায় না। গৃহপলাতক

---

* আলোই যে সৃষ্টির সার তা ত্রিশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

† "আদিতে 'বাক্য' ছিল, 'বাক্য' ঈশ্বরের সহিত সংযুক্ত ছিল, আর 'বাক্যই' ঈশ্বর ছিল।" — জন ১ : ১ (বাইবেল)।

পুত্রের মত আমি যেন আমার সেই বিরাট সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের আবাস পরিত্যাগ করে পালিয়ে গিয়ে এখন এই ক্ষুদ্র ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এসে আবার নিজেকে কারারুদ্ধ করলাম।

গুরুদেব সামনেই নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। বহুদিনের বাঞ্ছিত তাঁর কৃপাদত্ত সমাধির অভিজ্ঞতালাভে আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর পদতলে পড়তে যাচ্ছিলাম দেখে, তিনি আমায় সোজা দাঁড় করিয়ে ধীরস্বরে বললেন ঃ "দেখ, ভাবাবেশের আনন্দে উন্মত্ত হয়ো না; জগতে তোমায় অনেক কাজ করতে হবে। এস, আমরা এখন বারান্দা ঝাঁটপাট দিয়ে তারপর একটু গঙ্গার ধারে গিয়ে বেড়িয়ে আসি।"

একটা ঝাঁটা সংগ্রহ করে আনলাম। জানতাম, গুরুদেব আমায় সুসম্বন্ধ জীবনযাপনের শিক্ষা দিচ্ছেন। আত্মা বিশ্বসৃষ্টির অসীম রহস্যের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকলেও দেহ কিন্তু তার দৈনন্দিন কর্তব্যগুলো ঠিক নিয়মিত করে যাবে। খানিক পরে শ্রীযুক্তেশ্বরজী আর আমি যখন বেড়াতে বেরলাম, তখনও দেহমন অনির্বচনীয় আনন্দে মত্ত। দেখলাম, আমাদের দু'টি দেহ যেন সূক্ষ্ম দু'টি ছবি — আলোকের নদীর পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছে।

গুরুদেব বোঝাতে লাগলেন, "এই বিশ্বজগতে যত রূপ, যত শক্তি আছে, সবই সেই পরমাত্মা সক্রিয়ভাবে ধারণ করে রয়েছেন; তবুও স্পন্দনশীল জগতের সীমার বাইরে অপ্রকাশিত বিশ্বে তিনি তুরীয় ও নিরাসক্ত।"* যে সব উচ্চকোটির সাধকের এই রক্তমাংসের দেহেই ঈশ্বরভাবের উপলব্ধি হয়, তাঁদের এই ধরণের দুইপ্রকার জীবনের

* "কারণ পিতা কোন মনুষ্যকে বিচার করেন না, কিন্তু তিনি পুত্রকে সমস্ত বিচারভার অর্পণ করিয়াছেন।" — জন ৫ ঃ ২২। "কোন লোকই কোন সময়ে ঈশ্বরকে দেখে নাই; তাঁর একজাত পুত্র, যিনি পিতার বক্ষে আছেন, তিনিই তাঁকে প্রচার করিয়াছেন।" — জন ১ ঃ ১৮। "ঈশ্বর .... সকল কিছুই সৃষ্টি করিয়াছেন যীশুখ্রীস্টের দ্বারা।" — এফিসিয়ান্‌স্ ৩ ঃ ৯। "যে আমায় বিশ্বাস করে, যে সকল কাজ আমি করি সে সমস্তই সেও করিতে পারিবে; ইহার অপেক্ষা আরও বড় বড় কাজও সে করিতে পারিবে, কারণ আমি আমার পিতার নিকট যাই।" — জন ১৪ ঃ ১২। "শান্তিদায়ক, যিনি হইতেছেন পবিত্রাত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠাইবেন, তিনিই তোমায় সব কিছু শিখাইবেন, আর যা কিছু আমি তোমায় বলিয়াছি, সে সবকিছুই তোমায় স্মরণ করাইয়া দিবেন।" — জন ১৪ ঃ ২৬ (বাইবেল)।

অনুভূতি থাকে। সংসারের কর্তব্য সকল বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছেন, অথচ অন্তরে ব্রহ্মানন্দসাগরে ডুবে আছেন।

"তাঁর অপার আনন্দসত্তা হতেই তো সকল প্রাণীর উৎপত্তি। এই ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জরে মানুষ যতই আবদ্ধ হোক না কেন, — ভগবান নিশ্চয়ই চান যে, তাঁর প্রতিরূপ এই সব জীবাত্মাসকল, পরিশেষে সকল ইন্দ্রিয়বোধ হতে মুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে আবার করে মিলিত হোক।"

এই আত্মদর্শনলাভে আমার কতকগুলো স্থায়ী শিক্ষা হল। দৈনিক চিন্তাস্রোত রুদ্ধ করে, আমার দেহটা যে রক্তমাংস আর হাড়ের খাঁচা, — এই জড়জগতের কঠিন ভূমিতে বিচরণ করছে, সেই ভ্রান্তভাব থেকে মুক্তি পেতাম। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস আর অস্থির মন, যেন ঝড়ের মত এক জ্যোতিঃসাগরে আছড়ে পড়ে আকাশ, পৃথিবী, মানুষ, পশুপাখি, প্রাণী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি জড়পদার্থের তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। যতক্ষণ না এই সব ঝড়কে শান্ত করা যায়, ততক্ষণ সেই অখণ্ড জ্যোতিঃরূপে অসীম সত্তাকে অনুভব করা যায় না।

যতবারই আমি ঐ দুটো প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে শান্ত করেছি, দেখেছি, সৃষ্টির অসংখ্যরূপ যেন এক অনন্ত দীপ্তিময় সাগরে গলে যাচ্ছে, ঠিক যেমন সমুদ্রের উপর ঝড় প্রশমিত হলে পর সমুদ্র এক প্রশান্ত অখণ্ড বিস্তৃতিতে পরিণত হয় — সেইমত।

শিষ্য যখন ধ্যানসাধনায় মনকে এমনভাবে শক্ত করে গড়ে তোলে, যখন কোন বিরাট অনুভূতি তাকে আর অভিভূত করে ফেলতে পারে না, তখনই গুরু ব্রহ্মানন্দলাভের অনুভূতি শিষ্যকে দান করেন। মনের ঋজুতা বা বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ বা একান্ত ইচ্ছা থাকলেই যে তা পাওয়া যায়, তা

বাইবেলের এই সব উক্তি ঈশ্বরের ত্রিমূর্তির নির্দেশক পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা (হিন্দুশাস্ত্রে সৎ, তৎ, ওঁ-রূপে বর্ণিত)। পিতারূপ ঈশ্বর অব্যয়, নির্গুণ, আর স্পন্দমান সৃষ্টির অতীত। পুত্ররূপে ঈশ্বর হচ্ছেন খ্রীস্টচৈতন্য (ব্রহ্ম অথবা কূটস্থ চৈতন্য) যা কম্পমান সৃষ্টির অধীন। এই খ্রীস্টচৈতন্য হচ্ছে একজাত অথবা অনাদি অনন্তের একমাত্র প্রতিফলন। এই সর্বব্যাপী খ্রীস্টচৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ ও তার সাক্ষী হচ্ছে (রিভিলেশনস ৩ ঃ ১৪ — বাইবেল) 'ওঙ্কার', 'বাক্য' বা 'পবিত্রাত্মা'; অদৃশ্য ঐশীশক্তি বা একমাত্র কারণ ও ক্রিয়াশক্তি, যা স্পন্দনের মধ্য দিয়ে সমস্ত সৃষ্টিকে ধারণ করে আছে। ধ্যানে এই ওঙ্কার বা প্রণব ঝঙ্কার শোনা যায়, যা "সকল বিষয় স্মরণে এনে" ভক্তের নিকট পরম তত্ত্ব প্রকাশ করে।

নয়। অবিরত যোগাভ্যাস সাধনে চৈতন্যের ব্যাপ্তি ও ভক্তিসঞ্চয় হলে পর তবেই মন সর্বব্যাপিত্বের বিরাট অনুভূতির প্রচণ্ড ধাক্কা সইতে পারে।

প্রকৃত ভক্ত যিনি, তাঁর কাছে এই স্বর্গীয় অনুভূতি একটা স্বাভাবিক পরিণতিরূপে সহজেই এসে যায়। তাঁর ঈশ্বরলাভের গভীর আকাঙ্ক্ষা, তাঁকে দুর্নিবারবেগে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। আর ভক্তের প্রেমের টানে প্রেমময় ঈশ্বরও তাঁর অন্তরে এসে বাঁধা পড়েন।

এই বিরাট ভাবের মহিমার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার প্রচেষ্টায় পরবর্তীকালে আমি "সমাধি" নামে এই কবিতাটি রচনা করেছিলাম, —

আলোছায়ার মায়াজাল ছিঁড়ে গেছে আজ,
দুঃখের বাষ্পমাত্রও নেই, —
ক্ষণস্থায়ী আনন্দের ঊষা, এবে তাও অপগত,
ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণ মরীচিকা, সেও মিলায়েছে।

প্রেম, ঘৃণা, স্বাস্থ্য, রোগ, জনম, মরণ,
মায়াপটে প্রকাশিত এ সবের অলীক ইন্দ্রিয়ছায়া পাইয়াছে লয়।
মায়ার প্রবল ঝঞ্ঝা,
স্বজ্ঞারূপ যাদুদণ্ড স্পর্শে এবে চিরশান্ত আজ।

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, আর আমা'তরে নয়,
আছে শুধু শাশ্বত, সর্বব্যাপী আমি — আমিই সর্বতঃ।
গ্রহনক্ষত্র আর নীহারিকাপুঞ্জ, — এ জগৎ,
মহাপ্রলয়ের অগ্ন্যুদ্‌গার, আর
সৃষ্টির ঢালাই করা চুল্লী,

নীরব রঞ্জনরশ্মির হিমবাহ, জ্বলন্ত "বিদ্যুতিন" বন্যা,
ভূত, বর্তমান আর অনাগত ভবিষ্যতের
মানব চিন্তাধারা,
প্রতিটি তৃণদল, আমি, মানবজাতি আর,
মহাবিশ্বের ধূলির প্রতি অণুপরমাণু,
রাগ, লোভ, শুভাশুভ, মুক্তি, কাম,

আমাতে বিলীন সবে,
যেন তারা আমার অস্তিত্বের,
রুধির সাগরে রূপান্তরিত আজ!

গভীর ধ্যানে নিঃসরিত আনন্দশিখা
রুদ্ধ করে সজল আঁখি, —
যা আনন্দের অনির্বাণ অগ্নিশিখারূপে
আমার অশ্রুধারা, দেহমন সব কিছুকে গ্রাস করে!

তুমি আর আমি, আমি আর তুমি,
জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় — সবি একাকার।
অখণ্ড পরমানন্দ, আর নিত্য নবশান্তি, চিরবর্তমান।

সমাধির অনুভূতি, সে আনন্দ আশার অতীত, আর কল্পনার পার,
এ নয় অজ্ঞান ভাব,
কিম্বা চৈতন্যের অবসাদকারী, — মানসিক ক্লোরোফর্ম,
স্বইচ্ছায় ফিরে আসতে দেয় না;
এ 'সমাধি' ব্যেপে চলে আমার চেতন পরিধি,
নশ্বর দেহ অতিক্রমি', অনন্তের সীমাহীনতায় —
যেথায় আমি, মহাবিশ্বপারাবার,
দেখিতেছি জীব "আমি", মহা আমাতেই ভাসমান আজ।

শোনা যায় অণুদের সচল মর্মরধ্বনি,
তমসাময় পৃথিবী, শৈলমালা, উপত্যকা সব, — হায়, গলিত সব তরলসম।
সাগরপ্রবাহ যেন সব নীহারিকাবাষ্পে পরিণত।

ওঙ্কারধ্বনি ঝঙ্কারিছে সে' বাষ্পের 'পর,
মুক্ত করি অপরূপ 'গুণ্ঠন তার,
প্রকাশিছে জ্যোতির্ময় অণুপরমাণুর বিশাল বারিধি;
অবশেষে মহাবিশ্বসঙ্গীতের* শেষ মূর্চ্ছনায়,

---

* ওঙ্কার — নাদব্রহ্মের স্পন্দন যা সকল সৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ।

স্থূল আলোকরশ্মি — সর্বব্যাপী মহানন্দের
অনন্ত জ্যোতিঃর মাঝে লীন হয়ে যায়।

আনন্দে আমার সৃষ্টি, আনন্দে আমার স্থিতি,
পবিত্র আনন্দেই আমার লয়।
মনসাগরে সৃষ্টির ঊর্মি আমি পান করি।

কঠিন, তরল, বায়বীয় আর আলোক —
চার অবগুণ্ঠন খুলে যায় এবে।
সর্বঘটে "আমি" লীন হই 'মহা আমি'তে।
নশ্বর স্মৃতিতে দোলায়িত ছায়া সব,
মিলাইছে চিরতরে আজ।

নিম্নে, সম্মুখে আর ঊর্ধ্বে আমার মনের আকাশ নির্মল,
আমি আর মহাকাল, এক অখণ্ড আলোক রশ্মি।
হাসির ছোট্ট ফেন আমি
আজ হয়েছি মহানন্দ সাগর।

ইচ্ছামাত্র কিরূপে এ অপূর্ব অনুভূতি লাভ করা যায়, আর যাদের ব্রহ্মনাড়ী পরিপুষ্ট হয়েছে, তাদের উপরেও এ ভাব কি করে সঞ্চারিত করা যায় — তা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমায় শিখিয়ে দিয়েছিলেন।*

প্রথম সমাধি অনুভূতির পর বেশ কয়েক মাস ধরে আমি ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে থাকতাম; তখন বুঝতাম কেন উপনিষদে তাঁকে "রসো বৈ সঃ," — রসস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

কিন্তু মনে এক প্রশ্ন দেখা দেওয়ায়, একদিন গুরুদেবের কাছে জানতে চাইলাম ঃ "প্রভু বলতে পারেন, ভগবানকে কবে পাব?"

"তুমি ত' তাঁকে পেয়েছ!"

"আজ্ঞে না মশায়, কৈ আমার তো তা বলে মনে হয় না!"

---

* প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বেশ কয়েকজন ক্রিয়াযোগীর উপর আমি এই সমাধিলাভের ভাব সঞ্চারিত করেছি। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মিঃ জেমস্ জে. লিন্ — এই পুস্তকে সমাধিমগ্ন অবস্থায় তাঁর একটি ছবি আছে।

গুরুদেব মৃদু মৃদু হাসছিলেন, — বললেন, "তুমি বোধ হয় ভাবছ এক মহিমময় মূর্তি দেখব, এই মহাবিশ্বে যিনি কোন পুণ্যস্থানে হয়তো সিংহাসন আলোকিত করে বসে রয়েছেন! যাইহোক, বুঝতে পারছি, তুমি ভাবছ কিছু সিদ্ধিটিদ্ধি লাভ হলেই ভগবানকে জানা যায়, তাই না? সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, তোমার হাতের মুঠোয় "করামলকবৎ" হলেও ভগবান যে সুদূরে সেই সুদূরেই থাকতে পারেন। বাইরে কোন সিদ্ধাইটিদ্ধাই দেখাতে পারলেই এ বোঝায় না যে, তার খুব আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে, — তা বোঝা যায় তার ধ্যানানন্দের গভীরতা দেখে, বুঝলে?

'ঈশ্বর হলেন নিত্যনবীন আনন্দ।' তিনি অক্ষয়। বছরের পর বছর ধরে জপতপ, ধ্যানধারণা করে যাও, তখনও তিনি তোমার সঙ্গে অনন্ত লীলাখেলা করে যাবেন। তোমার মত ভক্তরা, যাঁরা ভগবানের পথের সন্ধান পেয়েছেন, তাঁরাই এ সুখের সঙ্গে অন্যকোন সুখের বদলাবদলির কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারবেন না। তিনি সেইরকম এক মনচোর যার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কেউ নেই।

"দেখ, সংসারের সুখে কত শীগগিরই আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। এ জগতে বাসনা-কামনার অন্ত নেই। পার্থিব সুখের আশা অফুরন্ত। মানুষ কখনও পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে না; একটা আশা মিটলেই আবার অন্য একটার পিছনে ছোটে। তার এই 'কোনকিছুর' জন্যে সন্ধান আসলে তার ঈশ্বরসন্ধান, যিনি একমাত্র পারেন তাকে অক্ষয় আনন্দ দিতে।

"বাইরের আকর্ষণ আমাদেরকে অন্তরের স্বর্গ হতে নির্বাসিত করে দেয়। তারা যে মিথ্যা সুখ আনে, সেটাকেই আমরা আত্মারাম বলে ভুল করে থাকি। হৃতস্বর্গের আবার পুনরুদ্ধার হয় ঈশ্বরের গভীর ধ্যানে। যেহেতু ঈশ্বর হচ্ছেন অকল্পনীয় নিত্য নবীনতা, তাই ঐ সম্ভোগে ক্লান্তি আসে না। সেই অপার আনন্দের অনন্তবৈচিত্র্যে কখন কি অমিতাচার করতে পারি?"

"এখন বুঝলাম গুরুদেব, কেন মুনিঋষিরা তাঁকে অপরিমেয় বলে গেছেন। এমনকি অনন্ত জীবন পেলেও তাঁর পরিমাপ করা যায় না।"

"ঠিকই বলেছ; তথাপি তিনি অন্তরের অন্তরতম ধন। ক্রিয়াযোগ সাধনে মন থেকে ইন্দ্রিয়বোধের সব বাধাবন্ধ দূর হলে পর, ধ্যানে ঈশ্বরের দুই রকমের প্রমাণ পাওয়া যায়। চিরনবীন আনন্দ হচ্ছে তাঁর অস্তিত্বের স্বীকৃতি যা প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে আমরা উপলব্ধি করি। আর ধ্যানে পাওয়া যায় তাঁর তাৎক্ষণিক নির্দেশ, আমাদের প্রতিটি সঙ্কটের যথাযোগ্য উত্তর।"

মুখ ভরা সকৃতজ্ঞহাসিতে বললাম, "গুরুজী, আপনি আমার সন্দেহ নিরসন করেছেন। আমি এখন বুঝতে পারছি যে আমি ঈশ্বরকে পেয়েছি, কারণ যখনই আমার কাজকর্মের সময় ধ্যানের আনন্দ অবচেতন মনে এসে উদিত হয়, তখনই কে যেন আমায় সকল বিষয়ে, এমন কি অতি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও, সঠিক পথ অবলম্বন করতে অতি সূক্ষ্মভাবে পরিচালিত করে থাকেন।"

গুরুদেব বললেন, "মানুষের জীবন কেবল দুঃখেই ভরা থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে শিখি। তাঁর 'সম্যকপথ' অনেক আত্মাভিমানীর কাছেই রহস্যাবৃত। একমাত্র ভগবানই নির্ভুল পথনির্দেশ করতে পারেন, আর কেউ নয়; তিনি ছাড়া আর কেই বা এই বিশ্বসংসারের ভার বহনে সক্ষম, বল?"

১৫ পরিচ্ছেদ

ফুলকপি চুরি

"গুরুদেব, আপনার জন্যে এই গোটাছয়েক বড় বড় ফুলকপি এনেছি। ফুলকপিগুলো নিজের হাতে পুঁতেছিলুম, তারপর মায়ের মত খুব যত্নটত্ন করে এতবড় করে তুলেছি।" বলে বেশ দৃপ্ত ভঙ্গীর সঙ্গে হাতের ঝুড়িটা নামিয়ে রাখলাম।

গুরুদেব কপিগুলি পেয়ে খুব খুশী হয়ে বললেন, "বেশ বেশ, তুমি এগুলোকে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে রাখ। কালকে একটা বিশেষ ভোজে এগুলো কাজে লাগবে।"

কলেজ গ্রীষ্মের ছুটির দরুণ বন্ধ। সমুদ্রতীরে, গুরুদেবের পুরীর আশ্রমে, ছুটিটা কাটাব বলে এসেছি। গুরুদেব ও তাঁর শিষ্যগণের তৈরী মনোরম দ্বিতল বাড়ি। সামনেই বঙ্গোপসাগর।

তার পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গল; সমুদ্রের নোনা হাওয়া আর আশ্রমের স্নিগ্ধ মাধুর্যে শরীর তাজা, ফুরফুরে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শোনা গেল — আমায় ডাকছেন। ফুলকপিগুলোকে একবার দেখে নিয়ে খাটের তলায় ভাল করে গুছিয়ে রেখে দিয়ে এলাম।

"চল, সমুদ্রের ধারে যাওয়া যাক,' বলে তিনি এগিয়ে চললেন; কতকগুলি অল্পবয়সী শিষ্য আর আমি এধার-ওধার ছড়িয়ে পড়ে তাঁর পিছু পিছু চলতে লাগলাম। গুরুজী দেখতে পেয়ে বললেন, "দেখ, সাহেবরা হাঁটবার সময় দু'জনে একসঙ্গে পা ফেলে কেমন হাঁটে দেখেছ? তোমরাও তেমনি দু'জন দু'জন করে একসঙ্গে পা ফেলে হাঁটতে শুরু কর।" গুরুজী দেখতে লাগলেন, তাঁর কথামত কেমন করে চলি। তারপর সুর করে গাইলেন, "ছেলেরা সব এগিয়ে চলে, সুন্দর ছোট্ট দলে।" গুরুজীও ছোকরা শিষ্যদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছেন দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না।

"আরে থাম, থাম," গুরুজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মুকুন্দ! আশ্রমের খিড়কি দরজা বন্ধ করে এসেছো কি, মনে পড়ছে?"

"আমার ত' তাই মনে হয়, গুরুজী।"

শ্রীযুক্তেশ্বরজী মিনিটকতক চুপ করে রইলেন; ঠোঁটে তাঁর চাপা হাসি! শেষে বললেন, "না, তুমি ভুলে গেছ। দেখ, ধ্যানধারণা কর বলে সংসারের কাজে অবহেলা করার দোহাই পাড়া চলে না। আশ্রমের নিরাপত্তার ব্যাপারে যখন অবহেলা করেছ, তখন তোমায় শাস্তি পেতে হবে বই কি?" তারপর যখন বললেন যে, "তোমার ছ'টা ফুলকপি শীগগিরই পাঁচটা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, দেখগে" — তখন ভাবলাম তিনি হয়ত প্রচ্ছন্নভাবে ঠাট্টাই করছেন। যাইহোক শেষ অবধি আমরা গুরুদেবের আদেশে আবার আশ্রমের দিকে ফিরে চললাম। কাছাকাছি পৌঁছতেই, গুরুদেব বললেন, "একটু দাঁড়াও দেখি মুকুন্দ! উঠোনের বাঁ ধারে ঐ রাস্তার দিকে একটু নজর রাখ। এখুনি একটি লোক এসে হাজির হবে, আর ওর জন্যেই তোমায় বকুনি খেতে হবে, বুঝলে?"

এইসব দুর্বোধ্য কথার মানে বুঝতে না পেরে মনের বিরক্তি মনেই গোপন রাখলাম। দেখলাম, একটা চাষা গোছের লোক রাস্তার মাঝখানে এসে হাজির হল। তারপর নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে বেতালা হাত পা ছুঁড়ে নাচতে শুরু করে দিল। অবাক হয়ে স্থিরভাবে সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে লাগলাম। রাস্তার একটা জায়গায় পৌঁছে যেমনি লোকটা চোখের আড়াল হবার উপক্রম করছে, অমনি শ্রীযুক্তেশ্বরজী বললেন, "এইবার দেখ, ও ফিরে আসবে।"

চাষাটি সত্যসত্যই তখনই ফিরে এসে আশ্রমের পিছন দিকে চলল। খানিকটা বালিপথ ভেঙ্গে খিড়কি দরজা দিয়ে লোকটা বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল। গুরুদেব যেমনটি বলেছিলেন, সত্যই আমি দরজায় চাবি দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। লোকটা শীগগিরই বেরিয়ে এল — হাতে তার তখন আমার একটি সুপুষ্ট ফুলকপি। ফুলকপি লাভের গর্বে গর্বিত হয়ে লোকটা বেশ শান্ত আর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর আচ্ছা ঠকান ঠকেছি দেখে ত' রাগে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বলে গেল। লোকটার পিছনে পিছনে দৌড়লাম; অর্ধেক রাস্তায় গিয়েছি এমন সময় গুরুদেব ডাকলেন। দেখি যে তিনি হাসতে হাসতে যেন ফেটে পড়ছেন।

হাসির দমকের মাঝে মাঝে গুরুজী ব্যাপারটা বোঝালেন ঃ "দেখ, ও গরীব বেচারার একটি ফুলকপির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাই ভাবলাম আহা তোমার একটি কপি যদি ও পায়, সাবধানটাবধান হয়ে গুছিয়ে ত' রাখনি — তা হলে ভারি মজা হয়।"

শুনে ত' চক্ষু চড়কগাছ। ঘরের দিকে দৌড়লাম! গিয়ে দেখি চোরটার কেবল ফুলকপিটার উপরই নজর ছিল। কম্বলের উপর রাখা সোনার আংটি, ঘড়ি, টাকাকড়ি সবই ঠিক রয়েছে — কিছুই ছোঁয়নি দেখছি। তারবদলে খাটের তলায় ঢুকে লোকচক্ষুর আড়ালে ঝুড়িতে রাখা বাঞ্ছিত ফুলকপিটি সে তুলে নিয়েছিল।

শ্রীযুক্তেশ্বরজীকে সেদিন সন্ধ্যেবেলা তাই জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপারটা কি! কারণ আমার মনে হল এর মধ্যে একটা কিছু রহস্য আছে। তিনি ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, "একদিন এ সব তুমিও বুঝবে। বিজ্ঞান একদিন এইসব গুপ্তবিধির মধ্যে দু'চারটে শীগগির আবিষ্কার করে ফেলবে, দেখো।"

তারপর বেতারের আশ্চর্যজনক আবিষ্কার যখন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল তখন গুরুজী মহারাজের ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ল। দেশ ও কাল সম্বন্ধে প্রাচীন ধ্যানধারণা দূর হয়ে গেল। এখন আর কোন মানুষের ঘর এমন সঙ্কীর্ণ নয় যে, যেখানে লণ্ডন অথবা কোলকাতা মাথা গলাতে পারেনা! একটা বিষয়ে মানুষের সর্বব্যাপীত্বের অকাট্য প্রমাণ পেয়ে অতিনির্বুদ্ধিরও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হল।

এই "ফুলকপি" নাটকের প্লটটির বিষয় রেডিও* তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাবে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে একটি

---

* ১৯৩৯ সালে রেডিও অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার হওয়াতে এতাবৎ অজ্ঞাত এক নূতন রশ্মিজগতের সন্ধান পাওয়া গেল। এসোসিয়েটেড প্রেস বলেছেন, "মানুষের নিজে আর অনুমিত সকলপ্রকার জড়পদার্থ হতে যে রশ্মি সর্বদা বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তা এই যন্ত্র "দেখতে" পায়। যারা

চমৎকার মানব-রেডিও যন্ত্র বলা যেতে পারে। চিন্তা সকল কি? চিন্তা হলো ইথারে ভাসমান অতি মৃদু কম্পন ছাড়া আর কিছুই নয়। নিখুঁতভাবে সমসুরে বাঁধা রেডিও গ্রাহকযন্ত্র যেমন চতুর্দিকে হতে আসা অসংখ্য অনুষ্ঠানের ভিতর থেকে কাঙ্ক্ষিত অনুষ্ঠানটি ধরে নেয়, তেমনি পৃথিবীতে অগণিত লোকের দ্বারা প্রেরিত চিন্তাতরঙ্গের মধ্য হতে আমার গুরুদেব একটি প্রাসঙ্গিক চিন্তা (ঐ আধপাগলা লোকটার ফুলকপি সংগ্রহের ইচ্ছাটি) ধরে নিতে পেরেছিলেন। সমুদ্রের তীরে বেড়াতে বেড়াতে যেইমাত্র গুরুদেব চাষীটির সামান্য অভিপ্রায়টুকু জানতে পারলেন, অমনি তাকে পূরণ করতে তিনি মনস্থ করলেন। লোকটি শিষ্যদের দৃষ্টিগোচর হবার পূর্বেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর দিব্যদৃষ্টি তাকে রাস্তা দিয়ে নেচে নেচে আসতে দেখেছিল। আশ্রমের দরজা চাবি-বন্ধ করে আসতে ভুলে যাওয়াতে গুরুদেবের সুবিধাজনক ছুতা হল আমার অমন সখের কপিগুলো থেকে একটিকে সরিয়ে দিতে।

এইরূপে রেডিওর গ্রাহকযন্ত্ররূপে কাজ করবার পর, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ব্রডকাস্টার বা প্রেরকযন্ত্রের মতও কাজ করেছিলেন।* ঐ শক্তিতেই তিনি চাষীটিকে মাঝরাস্তা থেকে

টেলিপ্যাথি, অন্তরদৃষ্টি আর অলোকদর্শনে বিশ্বাস করে, তারা এই ঘোষণায় সেইসব অদৃশ্য রশ্মির অস্তিত্বের প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাবে যা এক ব্যক্তির কাছ হতে অপর ব্যক্তির নিকট ছড়িয়ে পড়ে। এই রেডিও যন্ত্র প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে রেডিও-কম্পাঙ্কের স্পেকট্রসস্কোপ। বর্ণালিবীক্ষণ যন্ত্রে যেমন রশ্মিবর্ণ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কি কি মূল উপাদানের অণুপরমাণুতে নক্ষত্রাদি গঠিত, এও ঠিক তেমনি শীতল অনুজ্জ্বল জড়পদার্থের বর্ণালি বিশ্লেষণ করে .... মানুষ আর সকল সজীব পদার্থ হতে যে এরকম রশ্মি নির্গত হয়, তার অস্তিত্বের বিষয় বৈজ্ঞানিকেরা বহু বছর ধরেই সন্দেহ করে আসছিলেন। আজকে তাদের অস্তিত্বের প্রথম পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়া গেল। এই আবিষ্কারে প্রমাণিত হল যে, প্রকৃতির মধ্যে প্রতিটি অণু আর পরমাণু হচ্ছে এক একটি অবিরাম বেতারতরঙ্গ-প্রেরক কেন্দ্র। ... এইরূপে যে বস্তুটি পূর্বে মানবরূপী ছিল, মৃত্যুর পরেও সে তার অতি সূক্ষ্ম রশ্মি প্রেরণ করতে থাকে। এইসব রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বর্তমানে ব্যবহৃত বেতারতরঙ্গের যে কোন সর্বাপেক্ষা হ্রস্ব বা দীর্ঘ তরঙ্গ অপেক্ষাও হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ। এই সব রশ্মিগুলির জটিলতা কল্পনাতীত। কোটি কোটি রকমের রশ্মি আছে। একটি মাত্র বেশ বড়গোছের অণু একই সময়ে ১০,০০,০০০ বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি পাঠাতে পারে। এই ধরনের লম্বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যসকল, বেতারতরঙ্গদের সহজ গতিতে চালিত হয় .... আলো প্রভৃতির মত পরিচিত রশ্মিদের তরঙ্গের সঙ্গে নূতন রেডিও রশ্মির একটা অদ্ভুত পার্থক্য আছে। অতি সুদীর্ঘকাল — এমন কি হাজার হাজার বছর ধরেও এই সব রেডিও তরঙ্গসকল স্থাবর জড়পদার্থ হতে অবিরতই নির্গত হতে থাকবে।"

* ২৮ পরিচ্ছেদের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

ফিরিয়ে এনে একটি ফুলকপির জন্য ঐ ঘরবিশেষের দিকে চালিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মানুষের মন যখন ধীর ও শান্ত থাকে, সেই সব মুহূর্তে মানুষের ভিতর স্বাভাবিকভাবে যে আত্মনির্দ্দেশনা আসে সেটাই হলো অপরোক্ষানুভূতি। প্রায় প্রত্যেকেরই অদ্ভুতভাবে সঠিক অনুমানের অভিজ্ঞতা আছে, অথবা সে অপর কোন লোককে সাফল্যের সঙ্গে নিজের চিন্তাতরঙ্গ পাঠাতে সমর্থও হয়েছে।

সর্ববিধ অস্থিরতার বা অশান্তির "স্থৈতিক" ঝড় থেকে মুক্ত মানুষের মন যখন একেবারে ধীর, স্থির, শান্ত হয়, তখন সে অত্যন্ত জটিল রেডিও-যন্ত্রেরই মত সবরকম কাজ করবার শক্তিবিশিষ্ট হয়; অর্থাৎ সে চিন্তাকে প্রেরণ বা গ্রহণ করতে পারে, আবার অবাঞ্ছিত বস্তুকে বিতাড়িতও করতে পারে। রেডিও সম্প্রচার কেন্দ্রের শক্তি যেমন বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষমতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তেমনি মানব-রেডিওর ক্রিয়াশীলতা মানুষের ইচ্ছাশক্তি ধারণের ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করে।

সকল চিন্তা তরঙ্গ — মহাব্যোমে অনন্তকাল ধরে অনুরণিত হতে থাকে। সদ্‌গুরুগণ গভীর ধ্যানযোগে কি জীবিত কি মৃত, যে কোন ব্যক্তির মনের খবর জানতে পারেন। চিন্তাসকলের মূল ব্যক্তিগত নয় — বিশ্বজনীন। সত্যকে সৃষ্টি করা যায় না, তা কেবল উপলব্ধিসিদ্ধ। উপলব্ধি করার ত্রুটির ফলে, তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক, অনেক সময় মানুষের চিন্তা ভুল হয়ে দাঁড়ায়। যোগবিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে মনকে একেবারে শান্ত করা — যাতে করে সে অন্তরের বাণীর নির্ভুল পথনির্দেশনা অবিকৃতভাবেই শুনতে পায়।

রেডিও আর টেলিভিশন — এরা অতি দূরের মানুষদের শব্দ আর ছবি মুহূর্তমধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরের মধ্যে এনে হাজির করছে; মানুষ যে সর্বব্যাপী আত্মা — এটা হলো তারই অতি ক্ষীণ প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক ইঙ্গিত। যদিও অহংভাব অতি বর্বর উপায়ে মানুষকে সীমাবদ্ধ করার বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছে, তবুও মানুষ কোন সীমাবদ্ধ স্থানে আবদ্ধ একটা শরীরমাত্র নয় — আসলে সে সর্বব্যাপী আত্মা।

শারীরতত্ত্বে নোবেলপ্রাইজ প্রাপ্ত চার্লস রবার্ট রিশে* বলেছেন, — "অতি বিচিত্র, অত্যাশ্চর্যজনক আর আপাতদৃষ্টিতে একান্ত অসম্ভব ব্যাপারও এখন ঘটতে পারে — আর তা একবার প্রচলিত হয়ে গেলে বিজ্ঞান গত শতাব্দীতে আমাদের যা শিখিয়েছে তাতে এখন আমরা যতটা আশ্চর্য হই, তারচেয়ে আর বেশী কিছু আশ্চর্য হব না। মনে করা হয় যে, যেসব ঘটনাকে কোনরকম আশ্চর্য না হয়েই আমরা মেনে নেই, তারা আমাদের অবাক করে না, যেহেতু তাদের আমরা বুঝতে পারি। ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়। তারা আর আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে না তার কারণ এই নয় যে তাদের আমরা সব বুঝি; তার কারণ হচ্ছে তারা সব আমাদের পরিচিত। কেননা যা বোঝা যায় না, তাতে যদি আমাদের আশ্চর্য হতে হয়, তাহলে ত' আমাদের সবকিছুতেই আশ্চর্য হওয়া উচিত — আকাশে ঢিল ছুঁড়লে তার নীচে পড়া, বটের বীজ হতে বিশাল বনস্পতি হওয়া, পারদ উত্তপ্ত হলে তার আয়তন বর্ধিত হওয়া, অথবা চুম্বক কর্তৃক লৌহ আকর্ষণ, ইত্যাদি।

"আজকের বিজ্ঞান এখন নিতান্ত লঘু ব্যাপার .... অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক সত্যসকল যা আমাদের উত্তরাধিকারীরা ভবিষ্যতে আবিষ্কার করবে — তারা এখনই, এই মুহূর্তেই আমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে — বলতে গেলে আমাদের দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে আছে। তথাপি আমরা তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু তাদের দেখতে পাচ্ছি না বললেই যথেষ্ট বলা হল না — আমরা তাদের দেখতে চাইছি না; কারণ যখনই কোন অপরিচিত বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, তখনই আমরা সেটাকে আমাদের অধিগতজ্ঞানের সাধারণ কাঠামোতে আরোপ করবার চেষ্টা করি; আর সে বিষয়ে কেউ যদি তার আরও পরীক্ষা করবার সাহস করে, তা হলে তার উপর রাগ করি।"

এমন লজ্জাকরভাবে আমার ফুলকপি চুরি হবার দিনকতক পরে একটা কিন্তু খুব মজার ঘটনা ঘটেছিল। একটা কেরোসিন ল্যাম্প পাওয়া যাচ্ছিল না। সম্প্রতি গুরুদেবের যোগদৃষ্টির ব্যাপার দেখে

---

* "Our Sixth Sense" — গ্রন্থের লেখক।

ভাবলাম যে এটার সন্ধান বলে দেওয়া তাঁর পক্ষে নেহাৎ ছেলেখেলাই হবে আর কি!

গুরুদেব আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে তিনি আশ্রমের প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন ল্যাম্পটা কোথায় গেল! একটি তরুণ শিষ্য স্বীকার করলো যে, খিড়কির দিকে কুয়োর ধারে যেতে সে আলোটা নিয়ে গিয়েছিল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী অত্যন্ত গম্ভীরভাবে আদেশ দিলেন, "কুয়োর ধারে খোঁজ।"

গেলাম দৌড়ে, — আলো নেই! অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে গুরুদেবের কাছে ফিরে এলাম। দেখলাম, আমার ভ্রান্তিনিরসনের চেষ্টা না করে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি হাসছেন। বললেন, "হারানো লম্পটার খোঁজ করে দিতে পারলাম না — কি করব বল, আমি তো আর গণৎকার নই! এমন কি ভালগোছের একজন শার্লক হোম্‌স্‌ও নই!"

বুঝতে পারলাম — পরীক্ষার জন্য অথবা তুচ্ছ কারণে তিনি কখনও তাঁর দিব্য শক্তি প্রদর্শন করবেন না।

কয়েক সপ্তাহ খুব আনন্দে কাটল। গুরুদেব একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা বার করবার কথা ভাবছিলেন। পুরী শহরের ভিতর আর সমুদ্রের ধার দিয়ে সঙ্কীর্তন নিয়ে যাবার জন্য গুরুদেব আমারই উপর ভার দিলেন। উৎসবের দিন (দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি) সকালে যা রোদ উঠল, তাতে রাস্তায় আর পা রাখা দায় হলো। হতাশভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, "গুরুজী, খালিপায়ে ছেলেদের কি করে তপ্ত বালির উপর দিয়ে নিয়ে যাই বলুন?"

গুরুদেব বললেন, "শোন, তোমায় চুপি চুপি একটা গোপন কথা বলে রাখি — ঠাকুর একটা মেঘের ছাতা পাঠিয়ে দেবেন দেখো; তার তলায় তোমরা বেশ আরামে হেঁটে যাবে, কোন কষ্টই হবেনা।"

যাক, নিশ্চিন্ত হয়ে ত' সঙ্কীর্তনের ব্যবস্থা শুরু করে দিলাম। আমাদের দল আশ্রম থেকে সৎসঙ্গের* পতাকা নিয়ে বেরোল। মাঝখানে তৃতীয়

---

* আক্ষরিক অর্থে সৎ মানে হওয়া; অর্থাৎ "নির্যাস, সত্য, বাস্তব"; "সঙ্গ" মানে "সভা"। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়েছিলেন — সৎসঙ্গ। সত্যের সাহচর্য।

নেত্রের প্রতীক একটিমাত্র চক্ষু* — জ্ঞানচক্ষু, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর নিজের পরিকল্পনা।

আশ্রম হতে বেরোনমাত্রই আকাশ যেন ভোজবাজিতেই মেঘে ছেয়ে গেল। উপস্থিত মানুষজনের বিস্ময়ধ্বনির মধ্যে আবার একটু হাল্কাগোছের বৃষ্টিও হয়ে গেল। শহরের রাস্তা, আর আগুনের মত তেতে থাকা সমুদ্র তীরের বালি — সব বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ঘণ্টাদুই ধরে আমাদের সঙ্কীর্তনের দল নগর পরিক্রমা করার সময় পর্যন্ত ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়েই চলল। আবার যে মুহূর্তে দলটি আশ্রমে পৌঁছলো, অমনি মেঘ আর বৃষ্টিও একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে কোথায় উড়ে গেল।

গুরুদেবের কাছে গিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতেই তিনি বললেন, "দেখ, ভগবান আমাদের জন্যে কত কি ভাবেন বল দেখি। সকলের ডাকেই তিনি সাড়া দেন, সকলের জন্যেই তিনি কাজ করেন। তিনি যেমন আমার প্রার্থনামত বৃষ্টি পাঠিয়ে দিলেন, তেমনি তিনি সব ভক্তেরই আন্তরিক ইচ্ছা পূরণ করে থাকেন। ভগবান যে কত রকমে আমাদের প্রার্থনা পূরণ করেন, কদাচিৎ লোকে তা উপলব্ধি করে থাকে। তিনি কারোর প্রতি পক্ষপাতী নন; যে কেউ তাঁর কাছে বিশ্বস্তহৃদয়ে এগিয়ে আসে তার কথাই তিনি শোনেন। আমরা সকলেই সেই সর্বব্যাপী বিভুর সন্তান। তাই তাঁর অপার স্নেহ আর অসীম দয়ার উপর তাঁর সকল সন্তানেরই আন্তরিক বিশ্বাস থাকা উচিত।"†

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বাৎসরিক চারটি উৎসবের প্রবর্তন করেন। মহাবিষুব, জলবিষুব, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি। এই সময় তাঁর শিষ্যবর্গ দেশদেশান্তর হতে এসে উপস্থিত হতেন।

---

* "অতএব যদি তোমার একক চক্ষু হয়, তবে তোমার সমস্ত দেহ জ্যোতিঃতে পূর্ণ হবে।" — ম্যাথু ৬ ঃ ২২ (বাইবেল)। গভীর ধ্যানের সময় আধ্যাত্মিক চক্ষু বা অন্তশ্চক্ষুঃ কপালের মধ্যভাগে দেখা যায়। এই সর্বদর্শী চক্ষু নানাশাস্ত্রে নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে, যথা — তৃতীয় নেত্র, প্রাচ্যের তারকা, অন্তশ্চক্ষু, স্বর্গ হতে অবতীর্ণ পারাবত, শিবনেত্র, জ্ঞাননেত্র ইত্যাদি ইত্যাদি।

† "যিনি কর্ণ প্রদান করেছেন, তিনি কি শুনবেন না? যিনি চক্ষুপ্রদান করেছেন, তিনি কি দেখবেন না? যিনি মানুষকে জ্ঞানলাভে শিক্ষাপ্রদান করেন, তিনি কি সব জানতে পারবেন না?" গীতসংহিতা ৯৪ ঃ ৯-১০ (বাইবেল)।

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উৎসব শ্রীরামপুরেই পালন করা হয়। প্রথমবারে যোগদান করে আমি চিরদিনের আশীর্বাদ লাভ করেছিলাম।

উৎসব আরম্ভ হত ভোরবেলায়, রাস্তায় নগ্নপদে সঙ্কীর্তনের দল বার করে; খোল-করতাল আর বাঁশীর সঙ্গে মধুর নামগান করে শিষ্যের দল নানা রাস্তায় ঘুরে আসত। সঙ্কীর্তন শুনে উৎসাহী নগরবাসীরা দলের উপর পুষ্পবৃষ্টি করত, সংসারের কাজ থেকে ক্ষণিকের জন্যও সরে এসে ভগবানের পুণ্য নামসঙ্কীর্তন শ্রবণে আনন্দ পেত। তারপর অনেক রাস্তা ঘুরে সঙ্কীর্তনের দল এসে থামত আশ্রমের উঠানে। সেখানে গুরুদেবকে ঘিরে আমাদের খুব নামগান চলত, আর শিষ্যরা উপরের বারান্দা থেকে আমাদের মাথার উপর গাঁদাফুল বৃষ্টি করত!

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অনেকে উপরে কমলালেবু আর ছানার পায়েস নিতে চলে যেতেন। একদল গুরুভাই, যাঁরা আজ রান্নার কাজে লেগেছিলেন, তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এই রকম বড় বড় উৎসব উপলক্ষ্যে বাইরে উনুন পেতে প্রকাণ্ড কড়াইতে করে রান্না করতে হত। ইঁটের উনুনে কাঠ গুঁজে দেওয়া হয়েছে — ধোঁয়াতে চোখ দিয়ে জল পড়ছিল, তবুও হাসিমুখে আমরা কাজ করে চলেছিলাম। ভারতে ধর্মোৎসবের কাজে কারোরই ক্লান্তি নেই। সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতামত চাল, ডাল, তরিতরকারি, টাকাকড়ি অথবা সাধ্যমত গতরে খেটে উৎসবটি সর্বাঙ্গসুন্দর করতে চেষ্টা করেন।

গুরুদেবও শীঘ্রই এসে পড়ে খাওয়ান-দাওয়ানর তদারক করতে শুরু করলেন। মুহূর্তমাত্র তাঁর বিশ্রাম নেই, খুব চটপটে ছোকরাদের মত সমানতালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উপরে দোতলায় হারমোনিয়াম আর বাঁয়া তবলার সঙ্গে সঙ্কীর্তন চলছিল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী খুব মন দিয়ে শুনছিলেন! তাঁর তাল, লয়, জ্ঞান একেবারে নিখুঁত ছিল।

গুরুদেব হঠাৎ বলে উঠলেন, "এঃ, একেবারে বেসুরো গাইছে।" বলেই রান্নার জায়গা ছেড়ে একেবারে গানের আসরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নীচে থেকে আমরা শুনতে পেলাম গান আবার শুরু হয়েছে, — এবার কিন্তু বিশুদ্ধ সুরতাললয়মানে।

সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম উল্লেখ আমাদের 'সামবেদে'র মধ্যেই পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, নাটক প্রভৃতি বিদ্যা স্বর্গীয় কলারূপে পরিচিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর — এই ত্রিমূর্তি, এঁরাই হচ্ছেন প্রথম সঙ্গীতকার। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, দেবনর্তক নটরাজরূপে শিব তাঁর চরণঘাতের তালে তালে অসীমের ছন্দে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় আনয়ন করেন, আর সেই নৃত্যের তালে তালে ব্রহ্মা বাজান করতাল আর বিষ্ণু মৃদঙ্গ।

জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী, তারযন্ত্রের আদি বীণাবাদনরতা রূপে কল্পিতা। বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী প্রাণমাতান মধুর স্বরে কেবলই জীবাত্মাদের ডাকছে মায়াবশে ভ্রমণ পরিত্যাগ করে নিজ আবাসে ফিরে আসবার জন্য।

হিন্দুসঙ্গীতের মূলভিত্তি হল তার রাগরাগিণী। ছয়টি মূলরাগ আর তা থেকে উৎপন্ন রাগিণী আর তাদের পুত্রগণক্রমে ১২৬টি শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত হয়েছে। প্রত্যেক রাগের আবার অন্ততঃ পাঁচটি স্বরে সুর আছে, যেমন 'বাদী' অর্থাৎ রাগরাগিণীতে যে স্বরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়, তার নাম বাদী। বাদীর সহগামী সুরকে বলে 'সংবাদী' আর বাকী সব সুরকে বলে 'অনুবাদী' বা অংশ; আর যে রাগে যে সুর সংযোজিত হলে রাগভ্রষ্ট হয়, তাকে বলে 'বিবাদী'। রাগের বাদী সুর হচ্ছে রাজা, সংবাদী সুর প্রধানমন্ত্রী, অনুবাদী সুর ভৃত্য আর বিবাদী সুর বৈরী অর্থাৎ শত্রুর মত।

প্রত্যেক মূল রাগের আবার বিশিষ্ট শক্তিপ্রদায়ক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ঋতু, দিন বা রাতে গাইবার সময়ের স্বাভাবিক উপযোগিতা, আর তা কোন্ কোন্ ভাবের উদ্দীপক তা নির্ধারণ করা আছে। যেমন —

	রাগ	ঋতু	সময়	ভাব
(১)	হিন্দোল	বসন্ত	রাত্রি তৃতীয় প্রহর	বিশ্বপ্রেম
(২)	দীপক	গ্রীষ্ম	রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর	অনুকম্পা
(৩)	মেঘ	বর্ষা	দিবা দ্বিতীয় প্রহর	সাহস
(৪)	ভৈরব	শরৎ	দিবা প্রথম প্রহর	শান্তি
(৫)	শ্রী	হেমন্ত	দিবা চতুর্থ প্রহর	নিষ্কাম প্রেম
(৬)	মালকৌশ	শীত	রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর	শৌর্য

প্রাচীন ঋষিরা মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে শব্দের ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। বিশ্বপ্রকৃতি নাদব্রহ্ম, ওঙ্কারধ্বনি বা প্রণবঝঙ্কারের জড়রূপ বলে মানুষ কতকগুলি মন্ত্রের* আবৃত্তিবলে প্রকৃতিতে সকল ব্যাপারের উপরেই নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা লাভ করতে পারে। ইতিহাসে কথিত আছে যে, মহামতি আকবরের সভায় ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিশারদ মিঞা তানসেন, অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। শোনা যায়, সম্রাট আকবর কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে মিঞা তানসেন বেলা দ্বিপ্রহরে রাত্রিকালের একটি রাগ গেয়ে রাজপ্রাসাদ অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছিলেন।

ভারতীয় সঙ্গীতে সুরসপ্তক বাইশটি 'শ্রুতি'তে বিভক্ত। শ্রুতি হচ্ছে স্বরগত শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্মবিভাগ মাত্র। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের স্বরগ্রামের মাত্র বারটি শ্রুতির সাহায্যে এ রকম সূক্ষ্ম বিস্তার দুষ্প্রাপ্য। আবার হিন্দু পুরাণে এই সপ্তসুরের প্রত্যেক সুরের একটি ক'রে বর্ণ আর কোন্ পশু বা পক্ষীর কণ্ঠস্বর হতে তাদের উৎপত্তি, তা বলা আছে; যেমন, সা — হরিৎবর্ণ, ময়ূরের কেকাধ্বনি; রে — রক্তবর্ণ, ভরতপক্ষী; গা — স্বর্ণবর্ণ, ছাগ; মা — হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণ, সারস পক্ষী; পা — কৃষ্ণবর্ণ, বুলবুল পক্ষী; ধা — হরিদ্রাবর্ণ, অশ্বের হ্রেষারব; আর নি — হচ্ছে সকল বর্ণের সমন্বয়, এর উৎপত্তি হচ্ছে হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি থেকে।

ভারতীয় সঙ্গীতে ৭২টি ঠাট আছে। এতে সঙ্গীতকার শুদ্ধরাগের মধ্যে সুরসৃষ্টি ও তার বিন্যাসে অন্তহীন সুযোগ পায়; যে কোন বিষয়ের মধ্যে রূপপ্রদানে তার ভাবের উপর চিত্ত নিবিষ্ট ক'রে তার চারপাশে

---

* সকল দেশের উপকথার মধ্যে প্রকৃতির উপর মন্ত্রশক্তির প্রভাবের বিষয় উল্লেখ পাওয়া যায়। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানগণ যে বৃষ্টি ও বায়ুর উদ্দেশে ধ্বনি প্রক্রিয়াপদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল, তা সর্বজনবিদিত। বিখ্যাত ভারতীয় সঙ্গীতকার তানসেন তাঁর গানের শক্তিবলে অগ্নি নির্বাপিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯২৬ সালে নিউইয়র্কের একটি অগ্নি নির্বাপক দলের সম্মুখে ক্যালিফোর্ণিয়ার নিসর্গবাদী চার্লস কেলগ্, অগ্নির উপর স্বরকম্পনের প্রভাব প্রদর্শন করেছিলেন। "বেহালার ছড়ির মত একটি প্রকাণ্ড ছড়ি অ্যালিউমিনিয়াম টিউনিং ফর্কের উপর দ্রুত টান দিয়ে তিনি বেতার স্ট্যাটিকের মত একটা অদ্ভুত চিৎকারের শব্দ উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা শূন্য কাঁচের নলের ভিতর দু' ফুট লম্বা হলদে লক্‌লকে এক গ্যাসের শিখা সঙ্কুচিত হয়ে গিয়ে ছয় ইঞ্চিতে দাঁড়ায়; তারপরে একটা নীলাভ আগুনে পরিণত হয়। আর একবার ছড় টান দিতেই আবার সেইরকম কম্পন চিৎকার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটি একেবারেই নিভে যায়।"

সুরের স্বপ্নজাল বুনে নিজের মৌলিকত্ব প্রদর্শন করতে পারে। হিন্দুসঙ্গীতের চর্চা শুধু কতকগুলি নির্দিষ্ট স্বরলিপিতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিবার গানের সময় রাগরূপকে অবলম্বন করে তার মধ্যে বিন্যস্ত স্বরসমূহকে নানা শব্দ যোগে প্রকাশ করা যায়, — তাকে আলাপ বলে। আলাপে গায়ক বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই তিন প্রকার গতিতে আর আশ, মীড়, কম্পন প্রভৃতি সংযোগে সুরবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে।

পাশ্চাত্য সঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে বাখ্ নানা প্রকারের জটিল উপায়ে সুরের পুনরাবৃত্তির সূক্ষ্ম তারতম্যের মধ্যে তার প্রভাব ও অপূর্ব সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছিলেন।

প্রাচীন সংস্কৃত রচনায় ১২০ প্রকার "তালে"র বিষয় উল্লিখিত আছে। কথিত আছে যে, আদি হিন্দু সঙ্গীতকার ভরতমুনি, ভরতপক্ষীর কণ্ঠধ্বনিতে ৩২ প্রকার তাল পৃথক করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তালের উৎপত্তির মূল হচ্ছে মানুষের গতিছন্দে — পদক্ষেপের দ্বিগুণ আর নিদ্রার মধ্যে যখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের দু'গুণ হয়ে দাঁড়ায়, সেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের তিনগুণ সময়।

ভারতবর্ষে মনুষ্যকণ্ঠস্বরই শব্দযন্ত্র মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচিত। হিন্দুসঙ্গীত তাই প্রধানতঃ কণ্ঠস্বরের ত্রিসপ্তকের মধ্যেই নিবদ্ধ। আর ঐ একই কারণে হিন্দুসঙ্গীতে স্বরসঙ্গতির চেয়ে সুতানেরই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

হিন্দুসঙ্গীত হচ্ছে ভাবময়, আধ্যাত্মিক আর ব্যষ্টিগত কলারূপ প্রদর্শন, যার লক্ষ্য — ঐক্যতানের চরম সৌন্দর্যে নয়, নাদব্রহ্মের সহিত ব্যক্তিগত মিলনে। ভারতে যত বিখ্যাত গান তার অধিকাংশই ভগবৎ পূজারীদের দ্বারা রচিত। তাই সঙ্গীতকারের সংস্কৃত প্রতিশব্দ, "ভাগবত, যিনি ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করেন।"

সঙ্কীর্তনও একটি ফলপ্রসূ যোগপ্রথা অথবা আধ্যাত্মিক নিষ্ঠাচার, যাতে করে চিন্তা আর শব্দবীজের গভীর মনঃসংযোগ প্রয়োজন হয়। যেহেতু মানুষ স্বয়ং নাদব্রহ্মের মূর্ত প্রকাশ, তাই তার উপর শব্দের অত্যন্ত শক্তিশালী আর সদ্যপ্রভাব বিদ্যমান। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মহান ধর্মসঙ্গীত

সব মানুষকেই পরমানন্দ দান করে কারণ এ সাময়িকভাবে তার সুষুম্নাকাণ্ডের একটি চক্রকে জাগরিত করে।* সেই পরমানন্দের ক্ষণে তার দিব্য জনমের একটা ক্ষীণ স্মৃতি ভেসে আসে।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর দোতলার বসবার ঘর থেকে সঙ্কীর্তনের যে গান ভেসে আসছিল, তা নীচে রন্ধনশালে দাঁড়িয়ে যারা রান্না করছিল, তাদেরও মাতিয়ে তুলছিল। আমরাও হাততালি দিয়ে গানের ধুয়া গাইতে শুরু করে দিলাম।

সন্ধ্যার মধ্যে শত শত অতিথিঅভ্যাগতদের খিচুড়িপ্রসাদ বিতরণ করা হল। সঙ্গে ছিল নিরামিষ তরকারী, পায়েস প্রভৃতি। খাওয়া-দাওয়ার পর সভার আয়োজন হল। উন্মুক্ত আকাশের নীচে শতরঞ্চি বিছিয়ে জায়গা করা হল। শ্রীযুক্তেশ্বরজীর শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী সমবেত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গেই নীরবে শুনতে লাগলেন। ক্রিয়াযোগের প্রয়োজনীয়তাই ছিল বক্তৃতার বিষয়। সেই সঙ্গে তিনি আদর্শজীবনে আত্মসম্মান, ধীরতা, দৃঢ়সঙ্কল্প, সাদাসিধা আহার এবং দৈনন্দিন ব্যায়ামের উপযোগিতাও বর্ণনা করেন।

---

* উল্লিখিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির (চক্র) জাগরণই যোগীর পরমপবিত্র চরম লক্ষ্য। প্রতীচ্যের শাস্ত্রব্যাখ্যাতগণ, নিউ টেষ্টামেণ্টের "রিভিলেশন" অধ্যায়ে যে প্রতীক ব্যবহারে যোগবিজ্ঞানের অনুরূপ ব্যাখ্যা আছে — যে বিষয় প্রভু যীশু, জন এবং তাঁর অন্যান্য অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিয়েছিলেন — তা আদৌ বুঝতে পারেন নি। বাইবেলের উক্ত অধ্যায়ে (১ ঃ ২০ পঙ্ক্তিতে) জন "সপ্ততারকার রহস্য" এবং 'সাতটি গির্জার' বিষয় উল্লেখ করেছেন; এই প্রতীকগুলি যোগশাস্ত্রবর্ণিত মস্তিষ্ক-কশেরুকাচক্রের সাতটি পদ্ম বা চক্রকে বোঝায়। ঈশ্বরপরিকল্পিত এই নিষ্ক্রমণপথে যোগী বিজ্ঞানসম্মত ধ্যানের সাহায্যে দেহকারা হতে মুক্তিলাভ করে তার আদি সত্তায় ফিরে যায়। (১৬ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

মস্তিষ্কস্থিত সপ্তমচক্র, "সহস্রদলকমল"ই হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মানুভূতির স্থান; দিব্যজ্ঞানলাভ হলে পর যোগী সৃজনকর্তা ঈশ্বরকে ব্রহ্মা অথবা "পদ্মজ" বা পদ্মযোনি বলে উপলব্ধি করতে পারেন।

"পদ্মাসন" অভ্যাস হলে যোগী উক্ত আসনে উপবিষ্ট হয়ে মস্তিষ্ককশেরুকাচক্রের বিচিত্রবর্ণের পদ্মসকল অথবা চক্রসমূহ দর্শন করেন। প্রত্যেক পদ্মই বিভিন্ন 'দল' অথবা প্রাণশক্তির বর্ণে রঞ্জিত। এই পদ্মসকলই চক্ররূপে বর্ণিত।

'পদ্মাসনে' মেরুদণ্ড সোজা থাকে, এবং 'সবিকল্প সমাধি' অবস্থায় দেহের সামনে, পেছনে, বা পাশে পতন রোধ করে থাকে। যোগীরা তাই এই আসনটি বিশেষ পছন্দ করেন। তবে সূচনায় পদ্মাসনে বসা নতুনদের পক্ষে কিছু কষ্টকর হতে পারে; তাই কোন 'হঠযোগী' বিশেষজ্ঞের নির্দ্দেশক্রমেই এই আসন অভ্যাস করা উচিত।

এরপর ছোট ছোট ব্রহ্মচারী বালকেরা স্তোত্রপাঠ করবার পর ভাবময় সঙ্কীর্তনের পর সভাভঙ্গ হল। বেলা দশটা থেকে রাত বারটা অবধি আশ্রমবাসীরা বাসন-কোসন মাজা-ঘষা, ধোয়াপোঁছা প্রভৃতিতে ব্যস্ত ছিল। গুরুদেব আমাকে তাঁর কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, "মুকুন্দ, উৎসবের আয়োজনের ব্যাপারে এই সাত দিন ধরে, আর আজ সারাদিন ধরে তুমি হাসিমুখে যে খাটুনি খেটেছ, তাতে আমি ভারি খুশী হয়েছি। তুমি আমার কাছে থাকবে। আর দেখ, আজ তুমি আমার বিছানায় শুতে পার।"

এই বিশেষ অনুগ্রহটি আমার কপালে কোনও দিন যে জুটবে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। দু'জনে আমরা কিছুক্ষণ গভীর প্রশান্তির মধ্যে বসে রইলাম। বিছানায় শোবার পর মিনিটদশেক কেটেছে কিনা সন্দেহ, গুরুদেব উঠে পড়ে জামাটামা গায়ে দিতে শুরু করলেন।

গুরুদেবের পাশে শয়ন করার অপ্রত্যাশিত আনন্দে সেটা কতকটা অবিশ্বাস্য বলেই যেন তখন বোধ হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হল গুরুদেব?"

"দেখ, মনে হচ্ছে যেন জনকতক শিষ্য ঠিক সময়মত ট্রেন ধরতে পারে নি; তারা হয়ত এখুনিই এসে পড়বে। চল, তাদের জন্যে কিছু খাবারদাবারের যোগাড় করে রাখা যাক।"

"গুরুজী, রাত একটায় কেউই আজ আর আসছে না, কেন ব্যস্ত হচ্ছেন; আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ুন।"

"আচ্ছা, তুমি শুয়ে থাক, সারাদিন ধরে খুব খেটেছ-খুটেছ; আমিই না হয় রান্নাটান্নার ব্যবস্থা দেখিগে।"

গুরুজীর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা দেখে, আমি তড়াক করে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ে গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে চললাম সেই দোতলার ভিতরকার বারান্দার ধারে ছোট্ট রান্নাঘরটিতে, যেখানে আমাদের প্রতিদিনের রান্না হয়। চাল-ডাল শীঘ্রই ফুটতে শুরু করলো।

গুরুদেব স্নিগ্ধমধুর হেসে বললেন, "আজ রাতে তুমি ক্লান্তি আর কঠিন কাজের ভয়কে জয় করেছ — জীবনে আর তোমার এদের থেকে কোন ভয় থাকবে না, দেখো!"

আমার চিরজীবনের এই পরম শুভ-আশীর্বাদ উচ্চরণের সঙ্গে সঙ্গে উঠানে পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। দৌড়ে নীচে নামতেই দেখা গেল, একদল শিষ্য এসে উপস্থিত।

তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, "ভাই, এত রাত্রিতে এসে গুরুদেবকে বিব্রত করতে আমাদের মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কি করব বল, ট্রেনের সময়ের গোলমাল করে ফেলেছিলাম, তাই এই বিভ্রাট ঘটে গেল। কিন্তু এসে যখন পড়েছি, তখন একবার গুরুদেবের দর্শনলাভ না করে আর কি করে ফিরে যাই, বল?"

"তিনি আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছেন — আপনাদের জন্যে একেবারে রান্না চড়িয়ে দিয়েছেন, দেখুন গে।"

গুরুদেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল — ডাকছেন; অবাক সেই শিষ্যদলকে নিয়ে একেবারে রান্নাঘরে হাজির করলাম।

গুরুদেব এইবার আমার দিকে চোখ মিটমিট করে তাকিয়ে বললেন, "যাক, এতক্ষণে তোমার সন্দেহ ভঞ্জন হল। এবার তো বুঝলে যে, এরা সত্যিসত্যিই ট্রেন ফেল করেছিল?"

আধঘণ্টাটাক বাদে, তাঁদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে পর গুরুদেবের পিছন পিছন চললাম; মনে হল, এবার অবশ্য ঠিক আমার ঈশ্বরতুল্য গুরুদেবের পাশে শয়নের সৌভাগ্যলাভ হবে।

১৬ পরিচ্ছেদ

গ্রহশান্তি

"মুকুন্দ, তুমি গ্রহশান্তির জন্য একটা তাগা ধারণ করছ না কেন?"

"করতে হবে নাকি গুরুদেব? কিন্তু ও সব জ্যোতিষশাস্ত্রে আমার কোন বিশ্বাসই হয় না।"

"না, না, এসব বিশ্বাসটিশ্বাসের কথা নয়। কোন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ধারণা করতে গেলে দেখতে হবে, সেটা 'সত্যি' কিনা। নিউটনের আবিষ্কারের পরে যেমন, তেমনি তার আগেও তো মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বেশ চমৎকারভাবেই কাজ করছিল। মানুষের বিশ্বাসের অভাবে যদি এর আইনকানুন কাজ করতে না পারে, তাহলে তো বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

"যত সব বুজরুকদের জন্যেই জ্যোতিষশাস্ত্রের এইরকম বর্তমান দুর্দশা দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকলে, কি গাণিতিক,* কি আধ্যাত্মিক, কোনভাবেই কেউ সঠিক করে জ্যোতিষের ধারণা করতে পারে না — এ এতবড়ই একটা বিরাট শাস্ত্র। মূর্খ আনাড়ি যদি আকাশে শাস্ত্রের লেখা ঠিকমত না বুঝে সেখানে হিজিবিজি দাগ দেখেই বিদ্যে ফলাতে চায়, তাহলে ফল তো ঐরকম হবেই; আর এই ত্রুটিপূর্ণ জগতে তা হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। তাই বলে এইসব 'শাস্ত্রজ্ঞ'দের সঙ্গে শাস্ত্রটাও তো বিসর্জন দেওয়া চলে না।"

---

* প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে জ্যোতিষিক উল্লেখে পণ্ডিতেরা গ্রন্থরচয়িতাদের তারিখ নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছেন। ঋষিদিগের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অতি উচ্চকোটির ছিল। 'কৌষিতকী ব্রাহ্মণে'র সুনির্দিষ্ট জ্যোতিষ বচনে আমরা দেখতে পাই যে, ৩১০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে হিন্দুরা জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, যে শাস্ত্রবলে তিথি নক্ষত্রানুযায়ী ক্রিয়াকর্মের শুভলগ্ন নির্ধারণ করা হত। ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের 'ইস্ট-ওয়েস্ট' পত্রিকায় "জ্যোতিষ" অথবা বৈদিক জ্যোতিষ তত্ত্বসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে তারা মাতা লিখেছেন, — "এর বৈজ্ঞানিক কাহিনীসমূহে জানতে পারা যায় যে, প্রাচীন জাতিসকলের মধ্যে ভারতবর্ষই সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিল এবং ভারত ছিল জ্ঞানান্বেষিগণের পক্ষে তীর্থস্বরূপ। সুপ্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র 'ব্রহ্মগুপ্তে' নিম্নলিখিত বিষয় সব

গুরুদেব বলতে লাগলেন, — "সৃষ্টির সকল অংশই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত, এবং তারা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিশ্বপ্রকৃতির সমতাছন্দ এই আদানপ্রদানের ভিতরই লুকিয়ে রয়েছে। মানুষকে তার মানব প্রকৃতি অনুসারে দুই ধরণের শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে চলতে হয়। প্রথমতঃ, তার সত্তার ভিতর 'ক্ষিত্যপতেজঃমরুদ্ব্যোম' প্রভৃতি পঞ্চভূত ও তন্মাত্রের সংমিশ্রণ হতে উদ্ভূত বিপর্যয়; আর দ্বিতীয়তঃ, বহিঃপ্রকৃতির ধ্বংসকারীশক্তি। মানুষ যতদিন মরণের সঙ্গে লড়াই করে চলে, ততদিন তাকে অগণিত পার্থিব আর অপার্থিব পরিবর্তনের ভিতর দিয়েই চলতে হয়।

"জ্যোতির্বিদ্যা হচ্ছে, মানুষের জীবনের উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবের বিষয় অধ্যয়ন। গ্রহনক্ষত্রেরা তো নিজ বুদ্ধিবলে উপকার বা অপকার করে না; তারা কেবলমাত্র ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক জ্যোতিঃ বিকিরণ করে। এদের নিজেদের কোন অনুকূল বা প্রতিকূল ক্রিয়াশক্তি নেই; এরা মানুষের সোজাসুজি কোন উপকার অথবা অপকার করতে পারে না। এরা হচ্ছে, মানুষ অতীতে কার্যকারণের যা ভারসাম্য চালিত করে এসেছে, বহির্জগতে তার ফলপ্রকাশের বিধিনির্দিষ্ট পথ।

"জাতক জন্মায় ঠিক সেই দিনক্ষণ মুহূর্ত ধরে, যখন সেটা তার প্রাক্তন কর্মফল অনুসারে গ্রহনক্ষত্রদের সংস্থানের সঙ্গে সূক্ষ্ম গাণিতিক হিসাবে একেবারে নির্ভুলভাবে মিলে যায়। তার কোষ্ঠি হচ্ছে, তার

আছে, যথা — আমাদের সৌরমণ্ডলে গ্রহাদির মন্দস্ফুট গতি, রবিপরমক্রান্তি, পৃথিবীর গোলাকৃতি, চন্দ্রের পরাবর্তিত আলোক, পৃথিবীর আহ্নিকগতি, ছায়াপথে স্থিরনক্ষত্রের অবস্থান, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্যসকল যা, কোপার্নিকাস এবং নিউটনের আগে পাশ্চাত্যজগত কখনও অনুমান করতে পারে নি।"

তথাকথিত "আরব সংখ্যা", যা পাশ্চাত্য গণিতশাস্ত্রের উন্নয়নের পক্ষে অমূল্য, তা নবম শতাব্দীতে আরব দেশের মধ্য দিয়ে ইউরোপে এসেছিল ভারতবর্ষ থেকেই, যেখানে অঙ্কলিখনপ্রণালী বহু প্রাচীনকাল হতেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল। ভারতের বিরাট বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকারের আরও অধিকতর পরিচয় লাভ করতে গেলে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "History of Hindu Chemistry", আর ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 'Positive Sciences of the Ancient Hindus', বি. কে. সরকারের 'Hindu Achievements in Exact Science' এবং তাঁর 'The Positive Background of Hindu Sociology' এবং ইউ. সি. দত্তের 'Materia Medica of the Hindus' দ্রষ্টব্য।

অতীতকর্মের অবিকল প্রতিলিপি যা বদলান যায় না, আর তা ভবিষ্যতেরও সম্ভাব্য ফল প্রকাশ করে। কিন্তু রাশিফল কেবল যাদের স্বজ্ঞাত উপলব্ধি আছে, তারাই সঠিকভাবে প্রকাশ করে বলতে পারে; কিন্তু তারা সংখ্যায় অতি অল্পই।

"জন্মমুহূর্তে গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ এ বোঝায় না যে, তার অতীত শুভাশুভ কর্মফলের সমষ্টিতে যে অদৃষ্ট রচিত হয়েছে, তা থেকে তার উদ্ধারের আর কোন উপায়ই নেই। এ সমাবেশ জাতকের চিরজীবনের জন্য অদৃষ্টের দাসত্ব হতে মুক্তিকামনার চেষ্টার উদ্রেক করার সূচনা করে। যা নিজে করেছে, তাকে সে বদলাতে পারে, তাকে সে উল্টে দিতে পারে। তার জীবনে যে সকল ফল এখন বর্তমান রয়েছে, তাদের কারণেরও সেই ত' একমাত্র প্ররোচক — তাছাড়া আর কেউ নয়। সে তার যে কোন অসামর্থ, অক্ষমতা দূর করতে পারে, কারণ প্রথমতঃ তারই কর্মফলবশতঃ সেটা সৃষ্ট হয়েছে; আর তাছাড়া তার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, যা গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবধীন নয়।

"অদৃষ্ট ছাড়া আর কোন পথ নাই, এই যে কুসংস্কার, এই যে ভয়, এ মানুষকে একেবারে প্রাণহীন যন্ত্রের মতই করে তোলে; ক্রীতদাসের মত তাকে যন্ত্রের ওপর নির্ভর করে চলতে হয়। জ্ঞানী যে, সে তার গ্রহনক্ষত্রের শক্তিকে পরাভূত করতে পারে, মানে তার প্রাক্তন কর্মফল খণ্ডন করতে পারে — সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার প্রতি তার ভক্তি অর্পণ করে। যতই সে চৈতন্যের সঙ্গে তার অভেদত্ব উপলব্ধি করতে থাকে, ততই সে জড়ের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। আত্মা চিরমুক্ত; এর মরণ নেই, কারণ এর জন্ম নেই; কাজেই এ কখনও গ্রহনক্ষত্রের প্রভাবাধীন হতে পারে না।

"মানুষ হচ্ছে একটি 'জীবাত্মা' এবং তার একটি দেহ আছে। যখন সে প্রকৃত সত্যোপলব্ধি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তখন সে আর বাইরের কোন শক্তিরই খেলাতে অভিভূত বা বিব্রত হয় না, সে অকুতোভয়ে সব ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সে সাধারণ আধ্যাত্মিক স্মৃতিভ্রংশের বশে বিভ্রান্ত হয়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিধিনিয়মের সূক্ষ্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হয়।

"ঈশ্বর হলেন ছন্দোময়; ভগবানের সঙ্গে ভক্ত এক সুরে বদ্ধ হয়ে গেলে, তার আর কোন কাজেই ভুল হবার আশঙ্কা থাকে না। তার কার্যকলাপ সব স্বাভাবিক আর সঠিকভাবেই জ্যোতিষশাস্ত্রের বিধি অনুসারে সম্পাদিত হয়, তাতে কোন বিরুদ্ধফল উৎপন্ন হয় না। গভীর ধ্যান আর প্রার্থনার বলে সে ঐ বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে এক হয়ে যায় — অন্তরের ঐ রক্ষাকবচের মত বড় শক্তি আর কিছুই নেই।"

"তা হলে গুরুদেব, আপনি আবার আমাকে তাগা ধারণ করতে বলছেন কেন?" বহুক্ষণ নীরব থাকার পর এই প্রশ্ন করলাম। এর মধ্যে আমাকে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর এই জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা খানিকটা পরিপাক করবার চেষ্টা করতে হয়েছিল। কেননা তাতে চিন্তার এমনসব খোরাক ছিল যা আমার কাছে একেবারে নূতন।

"মানেটা কি জান? পরিব্রাজক গন্তব্যস্থলে পৌঁছে তবেই সে তার ম্যাপ ফেলে দিতে পারে। পথ চলতে গিয়ে তাকে সুবিধাজনক সর্টকাট রাস্তা খুঁজে বার করে নিতে হয়। প্রাচীন ঋষিরা আমাদের এ পৃথিবীর মায়াতে নির্বাসনের কালটা কমিয়ে ফেলবার জন্যে নানা রকম উপায় আবিষ্কার করে গেছেন। অবিশ্যি কর্মবিধির মধ্যে কতকগুলো বাঁধাধরা নিয়মকানুন আছে, যাকে জ্ঞানবলে সুবিধাজনক করে নেওয়া যায়।

"মানুষের যা কিছু দুঃখকষ্ট, অমঙ্গল, তা কোন না কোন প্রকার বিশ্ববিধানের লঙ্ঘন থেকেই উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রবিধি এই নির্দেশ দেয় — ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা অস্বীকার না করে, মানুষের সব প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলা উচিত। তার এই প্রার্থনা করা উচিত ঃ 'প্রভু, একমাত্র তোমাকেই তো আমি ভক্তি করি, আর বিশ্বাস করি, — তুমিই আমায় সাহায্য করবে। কিন্তু আমিও আমার কৃত অন্যায় বা ভুল কাজের জন্যে বা তার জন্যে যদি কোন ফলের উৎপত্তি হয় তা সংশোধনের জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করব।' বহুবিধ উপায়ে — যেমন প্রার্থনার দ্বারা, ইচ্ছাশক্তি দ্বারা, যোগসাধন, গভীর ধ্যানধারণা বা সাধুসন্তদের উপদেশ, আশীর্বাদ বা অন্য কোনপ্রকার ব্যবস্থার দ্বারা অথবা উপযুক্ত তাগা প্রভৃতি ধারণ করে, অতীত জীবনের কর্মফলের গুরুত্ব হ্রাস করানো অথবা তা এড়ানো যেতে পারে।

"বাজপড়ার হাত এড়ানোর জন্যে বাড়ীর মাথার ওপর তামার শিক দেওয়া থাকে দেখেছ তো, তেমনি এই শরীরমন্দিরও কতকগুলি উপায়ে রক্ষা করা যেতে পারে। বৈদ্যুতিক আর চৌম্বক শক্তির বিচ্ছুরণ বিশ্বজগতের চতুর্দিকে প্রতিনিয়তই ছড়িয়ে পড়ছে; তারা মানব শরীরের উপর অনুকূল বা প্রতিকূল — প্রভাব বিস্তার করে। যুগযুগান্ত পূর্বে আমাদের মুনিঋষিরা সূক্ষ্ম জ্যোতিষ প্রভাবের প্রতিকূল ক্রিয়া প্রতিহত করবার গূঢ় রহস্যের বিষয় চিন্তা করে গেছেন। তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, খাঁটি ধাতু থেকে একরকম আধ্যাত্মিক শক্তিবিশিষ্ট সূক্ষ্ম আলোকরশ্মি বিনির্গত হয়, যা গ্রহনক্ষত্রের ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া তৈরী করে। কতকগুলি বৃক্ষলতাগুল্মাদির মূল প্রভৃতির সংযোগও উপকারী হয় দেখা গেছে। সবচেয়ে ফলপ্রদ হচ্ছে — বেদাগ আর নিখুঁত গ্রহরত্ন — এবং তা অন্ততঃ দু'রতি হওয়া চাই।

"ফলিত জ্যোতিষের ফলপ্রদ প্রতিরোধক ব্যবস্থার বিষয়ে ভারতবর্ষের বাইরে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা কদাচিৎ হয়েছে। আসল কথাটা কি জান — উপযুক্ত ধাতু, রত্ন বা মূল ধারণ সবই বৃথা হয়ে যায়, যদি না সে সব ঠিক যোগ্য পরিমাণের ওজনের দেওয়া হয়, অথবা প্রতিরোধী বস্তুগুলি ঠিক অঙ্গস্পর্শ না করে।"

"তা হলে ত' গুরুদেব, গ্রহশান্তির ব্যবস্থা করা দরকার। নিশ্চয়ই আমি আপনার পরামর্শ মত তাগা ধারণ করব।"

"সাধারণভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তোমায় সোনা, রূপো আর তামার তাগা ব্যবহার করবার পরামর্শ দেব; আর বিশেষ ফললাভের জন্যে তোমায় আমি রূপো আর সীসের তাগা ব্যবহার করতে বলবো।" শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী এ বিষয়ে আমায় সব খুঁটিনাটি উপদেশ দিয়ে দিলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, — "আচ্ছা গুরুজী, এই বিশেষ ফললাভটার মানে কি? কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে হবে, বলুন তো?"

"মুকুন্দ, শীগগিরই তোমার একটা দারুণ গ্রহপীড়া ঘটবে — ভয় পেয়ো না। রক্ষা পেয়ে যাবে। মাসখানেকের মধ্যেই তোমার লিভারের দোষ দাঁড়িয়ে গিয়ে তোমায় খুবই ভোগাবে। এ ভোগ তোমার ছ'মাস

পর্যন্ত চলবে; কিন্তু তাগা ধারণ করলে ভোগকালটা কমে গিয়ে মাত্র চব্বিশ দিনে এসে দাঁড়াবে।”

তার পরদিনই একটা স্যাকরা ডাকিয়ে গুরুজীর কথামত তাগা তৈরী করিয়ে নিয়ে ধারণ করলাম। স্বাস্থ্য তখন আমার খুবই ভাল ছিল; গুরুজীর ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে ভুলে গেলাম, — কিছুই মনে রইল না। তিনি শ্রীরামপুর থেকে কাশী চলে গেলেন। আমাদের এই কথাবার্তার দিন ত্রিশেক বাদে আমার লিভারের জায়গায় একটা দারুণ বেদনা উঠল। তার পরের ক'সপ্তাহ যে কি করে কেটেছিল, তা ভগবানই জানেন। সে যে কি দারুণ যন্ত্রণা আর কষ্ট! মনে মনে ভাবলাম যে, গুরুদেবকে এ নিয়ে আর বিব্রত করব না, একাই এ নিদারুণ কষ্ট নীরবে সহ্য করে যাব।

কিন্তু তেইশ দিন ধরে ভীষণ কষ্ট ভোগবার পর আর সইতে না পেরে, সে সঙ্কল্প আর বজায় রাখতে পারলাম না; কাশীর ট্রেনে চেপে বসলাম। বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছতে গুরুজী অবশ্য আমায় খুবই আদর যত্ন করলেন। দর্শনের* জন্য বহু ভক্তশিষ্যেরা সেদিন গুরুজীর কাছে এসে উপস্থিত। আমার যে কি দারুণ কষ্ট তা আর তাঁকে আড়ালে ডেকে বলবার ফুরসৎ পাই না। মন খিঁচড়ে গেল — একা একা একটা কোণে চুপ করে বসে রইলাম। রাত্রে খাওয়াদাওয়া চুকে গেলে পর তবেই সব চলে গেল; তখন গুরুদেব আমাকে বাড়ির সেই অষ্টকোণ বারান্দাটিতে ডেকে পাঠালেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী চাঁদের আলোয় পায়চারি করছিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর ছায়া এসে পড়ছিল; আমার দিকে চোখ না ফিরিয়ে তিনি পায়চারি করতে করতেই বললেন, “তোমার লিভারের যন্ত্রণার জন্যে এসেছ তো। আচ্ছা দেখি, তুমি কদ্দিন ভুগছ — দিন চব্বিশেক হবে, তাই না?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ, গুরুদেব।”

“তা হলে তোমায় যে পেটের ব্যায়ামটা শিখিয়েছিলাম, সেটা কর না কেন?”

---

* শুধু মুনিঋষিকে দেখা থেকেই যে আশিস পাওয়া যায়।

তাঁর আজ্ঞা পালনের ক্ষীণ প্রচেষ্টায় বললাম, "গুরুদেব, কি দারুণ যন্ত্রণায় যে ভুগছি, তা যদি জানতেন, তাহলে ও কথা আর মুখেও আনতে পারতেন না।"

"তুমি বলছ যে তোমার যন্ত্রণা আছে, আর আমি বলছি যে তোমার কিছুমাত্র যন্ত্রণা নেই। এ দুটো বিপরীত কাণ্ড কি করে একসঙ্গে হয় বল দেখি?" বলে গুরুদেব আমার দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে চাইলেন।

শুনে আমি তো একেবারে স্তম্ভিত আর সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আনন্দে একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লাম। এই চব্বিশদিন ধরে যে অসহ্য যন্ত্রণা অবিরত ভোগ করে এসেছি, রাত্রে বিন্দুমাত্রও ঘুমোতে পারতাম না, তা তো আর কিছুমাত্র টের পাচ্ছি না। শ্রীযুক্তেশ্বরজীর কথায় সে যন্ত্রণা একেবারে বেমালুম উড়ে গেল, যেন কোনও কালে কখনও কিছু হয় নি!

কৃতজ্ঞতার ভারে নুয়ে পড়ে পদতলে গিয়ে পড়তে যাব, তাড়াতাড়ি তিনি আমায় ধরে ফেললেন। তারপর যেন কিছুই হয়নি, এমনিভাবে বললেন, "আরে ছেলেমানুষি কোরো না, ওঠো, ওঠো; গঙ্গায় কেমন চাঁদের আলো পড়েছে, দেখ দেখি।" নীরবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাঁর চোখদু'টি আনন্দে উজ্জ্বল। তাঁর এ রকম ব্যবহারে ভাবলাম — তিনি আমাকে এই কথাই বিশ্বাস করাতে চাইছেন যে, তিনি নন — ভগবানই হচ্ছেন আমার আরোগ্যকর্তা।

সুদূর অতীতের স্মৃতিচিহ্ন, সেই রূপো আর সীসের ভারী তাগা আজও আমি ধারণ করে আছি। তখন আবার আমি নতুন করে বুঝতে পারলাম যে, সত্যিই আমি এক মহামানবের সঙ্গলাভ করেছি। পরবর্তীকালে আমি অনেক বন্ধুকে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে ভাল হবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি তাগা* কি রত্ন ব্যবহার করতে বলতেন — সব বুঝিয়ে দিয়ে ধারণ করবার উপদেশ দিয়ে তাদের ভাল করে দিতেন।

ছেলেবেলা থেকেই জ্যোতিষশাস্ত্রের ওপর আমার একটা অশ্রদ্ধা আর অবিশ্বাসের ভাব ছিল খানিকটা এই কারণে যে, যাদের কোন যুক্তি

---

* ২৫ পরিচ্ছেদের শেষে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বিচার নেই, এমন অনেকেই এর প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করে আর খানিকটা এই কারণে যে, আমাদের বাড়ীর জ্যোতিষী মহাশয় বলেছিলেন যে, "তোমার তিন তিনটে বিয়ে হবে, আর দু-দু'বার পত্নীবিয়োগ।" আমি ব্যাপারটা নিয়ে খুবই ভাবতাম — নিজেকে মনে হতো ত্রয়ী বিবাহ মন্দিরের সামনে আমি যেন যূপকাষ্ঠে সমর্পিত ছাগ।

অনন্তদা পরম নিশ্চিন্তভাবে বলেছিলেন, "এ তো তোমার কপালে ঘটবেই। কারণ তোমার কুষ্ঠিতেই তো লেখা ছিল — ছেলেবেলায় বাড়ী থেকে হিমালয়ের দিকে পালাবে, আর জোর করে তোমায় ধরে আনা হবে; তা যখন সব ঠিক ঠিক মিলে গেছে, তখন তোমার এ বিয়ের কথাও ফলে যেতে বাধ্য।"

কিন্তু একরাত্রে অন্তরের অন্তস্তলে সুস্পষ্টভাবে অনুভব করলাম যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী একেবারেই মিথ্যা। কোষ্ঠিটা আগুনে পুড়িয়ে একটা খামে তার ছাইগুলো পুরে তার উপর লিখে দিলাম ঃ "জ্ঞানের আগুনে পুড়লে প্রাক্তন কর্মের বীজ আর কখনও অঙ্কুরিত হতে পারে না।" সহজে নজরে পড়ে, এমন জায়গায় খামটা রেখে দিলাম। অনন্তদা তক্ষুনি দেখতে পেয়ে আমাকে হেসে ঠাট্টা করে বললেন, "যত সহজে কাগজে লেখা কোষ্ঠী পুড়িয়েছ, তত সহজে ভাগ্যকে পাল্টান যায় না।"

তবে একথাও সত্য যে, সাবালক হবার আগেই বাস্তবিকই তিন তিনবার আমার বিবাহের সম্বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু প্রতিবারই আমি সে ফাঁদ এড়াতে পেরেছিলাম* এই ভেবে যে, কোষ্ঠিতে লেখার ফল ঘটতে দেওয়ার চেয়ে ঈশ্বরের প্রতি আমার ভালবাসা ছিল ঢের ঢের বেশি আন্তরিক।

"মানুষের আত্মোপলব্ধি যত গভীর হয়, ততই সে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তার সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শক্তির স্পন্দনে প্রভাবিত করতে

---

* আমার ভাবীবধূরূপে যে সমস্ত কন্যা নির্বাচিত করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার খুড়তুতো ভাই প্রভাসচন্দ্র ঘোষের বিবাহ হয়। (তিনি যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ার সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ২৪শে জানুয়ারী শ্রী ঘোষ পরলোকগমন করেন।)

পারে, এবং ততই সে নিজেও তার নৈসর্গিক প্রভাব হতে মুক্ত হতে পারে।" গুরুদেবের এই কথাগুলো প্রায়ই মনের মাঝে উদয় হয়ে খুব উৎসাহের সঞ্চার করত।

মাঝে মাঝে আমি জ্যোতিষীদের জিজ্ঞাসা করতাম, আমার সবচেয়ে খারাপ সময় কবে পড়বে বলুন দেখি; আর সেই সময়টাই বেছে নিয়ে যে কাজে লেগে থাকতাম তাই-ই সফল হতো। তবে এটাও ঠিক যে, ঐ রকম সব দুঃসময়ে দারুণ কষ্টের ভিতর দিয়ে তবেই কতকটা কৃতকার্য হতে পেরেছি। কিন্তু আমার যা বিশ্বাস ছিল, তা শেষ অবধি একেবারে খাঁটি বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, ভগবানই একমাত্র রক্ষাকর্তা এই বিশ্বাস; আর মানুষের ঈশ্বরদত্ত ইচ্ছার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার — এ দুটোর এতই শক্তি যে, সারা সৌরজগতের এমন কোন ক্ষমতা নেই যা তাকে উল্টোতে পারে।

পরে জানলাম যে জাতকের জন্মকালীন রাশিচক্রের অবস্থান এ কথা বলে না যে, সে প্রাক্তন কর্মফলের দাস। এর নির্দেশ বাস্তবিকই অতি আশ্চর্য! সর্ববিধ সঙ্কীর্ণতা হতে মুক্ত হবার জন্য মানুষের দৃঢ়সঙ্কল্পকে এরা জাগিয়ে তোলে। ভগবান প্রত্যেক মানুষকেই জীবাত্মারূপে সৃষ্টি করে তাকে ব্যক্তিত্ব দান করেছেন; কাজেই তারা এই বিশ্বসৃষ্টির একটা অপরিহার্য অংশ — তা সে মহান বা ক্ষুদ্র যাই-ই হোক না কেন। তার মুক্তি তাৎক্ষণিক ও চূড়ান্ত, অবশ্য সে যদি তা একান্তই কামনা করে — আর তার জন্য বাইরের কোন শক্তিকে জয় করা দরকার করে না, অন্তরে বিজয়লাভ করাই যথেষ্ট।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমাদের বর্তমান যুগে ২৪,০০০ বর্ষব্যাপী সায়ন বৃত্তের বা চক্রের গাণিতিক প্রয়োগ আবিষ্কার করেছিলেন।* এই কালচক্র অধিরোহী-অবরোহী ভেদে দু'টি চাপ বা বৃত্তাংশে বিভক্ত; প্রত্যেকেরই ব্যাপ্তি ১২,০০০ বৎসর। প্রত্যেক বৃত্তাংশের মধ্যে আবার

* এই সব সায়নবৃত্ত স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী রচিত "দি হোলি সায়েন্সে" গ্রন্থে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া, ২১, ইউ. এন. মুখার্জী রোড, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা-৭০০ ০৭৬ হইতে প্রাপ্তব্য)।

'কলি, দ্বাপর, ত্রেতা ও সত্য' এই চারটি করে যুগ পড়ে। গ্রীকদের মতে এরা যথাক্রমে লৌহ, ব্রোঞ্জ, রৌপ্য ও স্বর্ণযুগ।

আমার গুরুদেব নানাবিধ গণনার দ্বারা স্থির করেছিলেন যে, অধিরোহী বৃত্তাংশের শেষ কলি বা লৌহযুগ প্রায় ৫০০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল। এই কলিযুগের স্থিতিকাল হচ্ছে ১২০০ বৎসর আর এটা ছিল জড়ের যুগ। এ যুগ শেষ হয় প্রায় ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে। ঐ বৎসর হতেই ২৪০০ বর্ষব্যাপী 'দ্বাপর যুগের' সূচনা। এই যুগে বৈদ্যুতিক ও আণবিক শক্তির নানাবিধ উন্নতি ঘটবে; টেলিগ্রাফ, রেডিও, বিমানাদি অন্যান্য দূরত্ববিলোপকারী যন্ত্রাদির আবির্ভাব হবে।

'ত্রেতাযুগের' আরম্ভ হবে ৪১০০ খ্রীস্টাব্দে; স্থিতিকাল ৩৬০০ বৎসর। এ যুগের লক্ষণ হবে টেলিপ্যাথি বা পরচিত্তজ্ঞান আর কালবিলোপকারী অন্যান্য বিষয়; তাতে সকলেরই সাধারণ জ্ঞান থাকবে। তারপর অধিরোহী বৃত্তাংশের শেষ যুগ, 'সত্যযুগের' আবির্ভাব ঘটবে। এর স্থিতিকাল হবে ৪৮০০ বৎসর। ঐ যুগে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি চরম উৎকর্ষ আর পূর্ণ পরিণতি লাভ করবে, তখন সে দৈবপরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সকল কর্ম সম্পাদন করবে।

তারপর আসবে অবরোহী বৃত্তাংশের ১২,০০০ বৎসর। এর সূচনায় পৃথিবীতে ৪৮০০ বর্ষব্যাপী অবরোহী সত্যযুগের আবির্ভাব ঘটবে (১২,৫০০ খ্রীস্টাব্দে)। মানবজাতি তখন ক্রমশঃ অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। এই সব কালচক্র হচ্ছে 'মায়ার'ই চিরন্তন আবর্তন — প্রাতিভাসিক জগতের বৈষম্য আর আপেক্ষিকতার ক্রিয়া।* বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে যখন তার

---

* শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কল্পিত সরল ২৪,০০০ বর্ষব্যাপী সায়নবৃত্ত অপেক্ষা হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত পৃথিবীর বয়স এক দীর্ঘতর যুগপর্যায়ে নির্দিষ্ট। শাস্ত্রে বর্ণিত ব্রহ্মাণ্ডের যুগ ৪,৩০০,৫৬০,০০০ বর্ষ আর তা এই কল্পকাল সৃষ্টির এক দিবস। ঋষিপ্রদত্ত এই বিরাট সংখ্যা, সৌরবর্ষের দৈর্ঘ্য এবং পাই (৩·১৪১৬ অর্থাৎ বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত) এর গুণিতকের সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের মতানুযায়ী মহাবিশ্বের জীবনকাল হচ্ছে ৩১৪,১৫৯,০০,০০,০০,০০০, সৌরবর্ষ অথবা "ব্রহ্মার একযুগ।"

হিন্দুশাস্ত্র বলে যে আমাদের জগতের মত কোন জগৎ লোপ পায় দু'টির মধ্যে একটি কারণে — হয় সেই জগতের অধিবাসীসকল চরম সৎ, না হয় চরম অসৎপ্রকৃতির হয়ে পড়ে। এতে করে বিশ্বময় এমন একটা প্রচণ্ড মানসশক্তি সঞ্চিত হয় যে, তার বলে পৃথিবীর গঠনে

অচ্ছেদ্য দৈব অভেদত্বের সংজ্ঞান বা কল্যাণবুদ্ধি জাগরিত হয়, তখনই মানুষ একে একে এই সৃষ্টির মায়াকারাগার হতে মুক্তি লাভ করে থাকে।

গুরুদেব শুধু যে জ্যোতিষ সম্বন্ধে তা নয়, পৃথিবীর নানা শাস্ত্রসম্বন্ধেও আমার জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়তা করেছেন। নানা শাস্ত্রগ্রন্থের উপদেশ তিনি তাঁর নিষ্কলঙ্ক মনের উপলব্ধিজাত জ্ঞানের বিচারে বিশ্লেষণ করে, আর মহাপুরুষদিগের আদিপ্রচারিত বাণী হতে টীকাকারগণ কৃত ভ্রমপ্রমাদ বা প্রক্ষিপ্ত অংশ বাদ দিয়ে, তা থেকে সারসত্য উদ্ধৃত করে দেখাতে পারতেন।

ভগবদ্‌গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে "সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং"-এর ভুল ব্যাখ্যা প্রাচ্য পণ্ডিত এবং পাশ্চাত্য অনুবাদকেরা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করাতে গুরুদেব সকৌতুকে সমালোচনা করে বলতেন, "একে ত' যোগীদের পথ অদ্ভুত, তার উপর আবার তাদের ট্যারা হবার উপদেশ দেওয়া হয় কেন, বল তো? 'নাসিকাগ্রং'-এর আসল মানে হচ্ছে 'নাসামূল', নাকের ডগা নয়। নাসিকার আরম্ভ হচ্ছে দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে, যা আধ্যাত্মিক দৃষ্টির স্থান।"*

একটি সাংখ্য† সূত্রে "ঈশ্বরাসিদ্ধে"‡ এই সিদ্ধান্তে ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ হয় না ধরে নিয়ে বহু পণ্ডিত দর্শনশাস্ত্রকে একেবারে নিরীশ্বরবাদী বলেন।

সংহত অণুপরমাণুগুলি একেবারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে মহাপ্রলয়ে বিলীন হয়ে যায়।

মাঝে মাঝে "পৃথিবীর শেষদিন উপস্থিত" বলে এক একটা ভয়ঙ্কর ঘোষণা প্রকাশিত হয়। এক সুসংহত দৈবপরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রহচক্র এগিয়ে চলেছে। উপস্থিত আমাদের এই গ্রহে হঠাৎ প্রলয়ের কোনই সম্ভাবনা নেই। অধিরোহী এবং অবরোহীভেদে সায়নবৃত্তের বহু চক্র এখনও আমাদের এই বর্তমান আকৃতির গ্রহটির জন্য সঞ্চিত আছে।

* "দেহের আলোক (জ্যোতিঃ) হচ্ছে চক্ষু; সুতরাং যখন তোমার একটিমাত্র চক্ষু (জ্ঞানচক্ষু) হবে, তখন তোমার সমস্ত শরীর জ্যোতির্ময় হয়ে উঠবে; কিন্তু যখন তোমার চক্ষু হীন হবে, তখন তোমার দেহও (অজ্ঞান) অন্ধকারে পূর্ণ হবে। সুতরাং অবহিত হও — যে জ্যোতিঃ (জ্ঞানালোক) তোমার মধ্যে আছে তা যেন (অজ্ঞান) অন্ধকার না হয়ে যায়।" — ল্যুক ১১ ঃ ৩৪-৩৫ (বাইবেল)।

† সাংখ্যদর্শন — হিন্দু ষড়দর্শনের এক দর্শন। সাংখ্যের মত হচ্ছে প্রকৃতি হতে পুরুষ বা আত্মা পর্যন্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানলাভেই পরামুক্তি।

‡ সাংখ্যদর্শন ১ ঃ ৯২।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বুঝিয়ে বললেন, "এই সূত্র আদৌ নিরীশ্বরবাদ নয়। অজ্ঞ লোকেরা, যারা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধেরই উপর নির্ভর করে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাদের কাছে ঈশ্বরের প্রমাণ অজ্ঞাতই থেকে যায়, কাজেকাজেই তার অস্তিত্বও প্রমাণসিদ্ধ হয় না। খাঁটি সাংখ্যমতাবলম্বীরা তাদের অবিচলিত ধ্যানলব্ধ অন্তর্দৃষ্টিবলে বুঝতে পারেন যে, ঈশ্বর আছেন এবং তিনি জ্ঞেয়।"

খ্রিস্টীয় বাইবেলও গুরুদেব অতি চমৎকার আর অতি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের কাছে অপরিচিত আমার এই হিন্দুগুরুর কাছ থেকেই আমি বাইবেলের অমর বাণী আর খ্রিস্টকথিত সারসত্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম, যাতে করে যীশুখ্রিস্ট আপোষহীন গলায় বলেছেন, "স্বর্গ মর্ত্য লোপ পেতে পারে, কিন্তু আমার কথা কখনও লোপ পাবে না!"*

যীশুখ্রিস্ট যে সকল ঈশ্বরাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সেই সব একই প্রকার উচ্চ আদর্শে ভারতবর্ষের মহাগুরুগণও নিজেদের জীবন রচনা করেছিলেন। এঁরা তাঁরই সমগোষ্ঠী। খ্রিস্ট বলেছেন, "যে লোক আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করবে, সেই হবে আমার ভাই, ভগ্নী, মাতা।"† তিনি আরও বলেছেন, "যদি তোমরা আমার বাক্য অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা আমার প্রকৃত শিষ্য হতে পারবে এবং সত্য উপলব্ধি করতে পারবে, এবং এই সত্যজ্ঞানেই তোমাদের মুক্তি হবে।"‡ যাঁরা সব নিজেদের সেই একমাত্র পরম পিতারই সন্তান বলে জ্ঞানলাভ করেছেন, তাঁরা সব স্বাধীন মুক্তপুরুষ; ভারতীয় যোগীঋষিগণ ঐ অমর ভ্রাতৃসঙ্ঘেরই একাংশ।

বাইবেলে বর্ণিত আদিপিতা ও আদিমাতা আদম ও ইভের রূপক বোঝবার প্রথম চেষ্টায় একদিন অধৈর্য হয়ে কিঞ্চিৎ উষ্মার সঙ্গেই মন্তব্য

---

* ম্যাথিউ ২৪ ঃ ৩৫ (বাইবেল)।

† ম্যাথিউ ১২ ঃ ৫০ (বাইবেল)।

‡ জন ৮ ঃ ৩১-৩২ (বাইবেল)। সেণ্টজন প্রতিজ্ঞা করে বলেছেন, "যে সকল লোকেরা তাঁকে গ্রহণ করলো তাঁদের সকলকে ঈশ্বরের সন্তান হবার শক্তি তিনি দান করলেন, এমন কি তাঁদেরকেও, যাঁরা তাঁর নামে বিশ্বাস করে (যাঁরা সর্বব্যাপী খ্রিস্টচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত)।" — জন ১ ঃ ১২ (বাইবেল)।

নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী
'লঘিমাসিদ্ধ সাধু'

স্বামী কেবলানন্দ
যোগানন্দজীর প্রিয় সংস্কৃত শিক্ষক

স্বামী প্রণবানন্দ
বেনারসের 'দুই দেহধারী সাধু'

মাস্টার মহাশয়
"পরম কারুণিক ভক্ত"

শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দের পারিবারিক বাসগৃহ,
গড়পার রোড, কোলকাতা
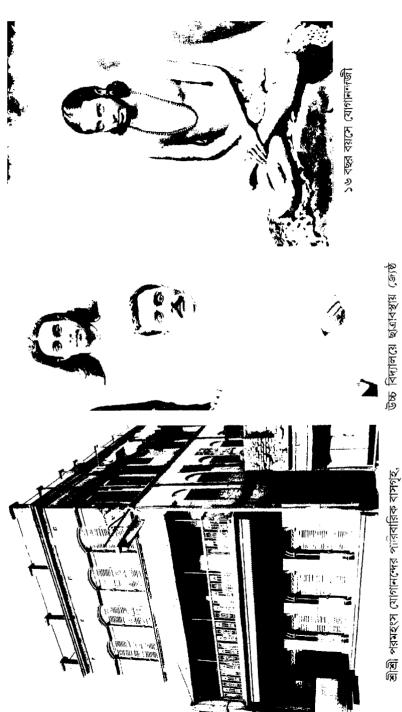
উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় জ্যেষ্ঠ
ভ্রাতা অনন্তের সঙ্গে যোগানন্দজী
(দণ্ডায়মান)

১৬ বছর বয়সে যোগানন্দজী

জ্ঞানাবতার শ্রীশ্রী স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি (১৮৫৫-১৯৩৬)
শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য; যোগানন্দজীর গুরুদেব ও সকল ওয়াই. এস. এস./
এস. আর. এফ. ক্রিয়াযোগীর পরমগুরু

পুরীতে স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সমুদ্র-কূলবর্তী আশ্রম

পদ্মাসনে উপবিষ্ট স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি

পুরীতে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সমাধি মন্দির

১৯১৫ সালে যোগানন্দজী, তাঁর বাবার দেওয়া মোটর সাইকেলের পেছনে বসে। তিনি বলেন, "আমি সব জায়গায় এতে চড়ে যাওয়া-আসা করতাম, বিশেষ করে শ্রীরামপুরে আমার গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরির আশ্রমে।"

জগদীশ চন্দ্র বোস

রামগোপাল মজুমদার
"বিনিদ্র সাধু"

কাশী
রাঁচী বিদ্যালয়ের ছাত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশ্রী মহাবতার বাবাজী

শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের গুরুদেব

হিমালয় পর্বতে বাবাজীর গুহা

রাণীক্ষেতের কাছে এই গুহাতেই নির্জনবাসী মহাগুরুর সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের সাক্ষাৎ হয় এবং বাবাজী তাঁকে ক্রিয়াযোগ সাধনায় দীক্ষিত করেন। ঐ পবিত্র তীর্থ পরিদর্শনে লাহিড়ী মহাশয়ের পৌত্র আনন্দমোহন লাহিড়ী *(শ্বেত বস্ত্র পরিহিত)* ও অন্য তিনজন ভক্ত।

শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়

"আমিই আত্মা। তোমার ক্যামেরা কি যা সর্বব্যাপী আর যা দৃষ্টিরও অগোচর, তার ছবি তুলতে পারে?" বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও যখন ফিল্মে লাহিড়ী মহাশয়ের চেহারা কিছুতেই ধরা গেল না, তখন শেষ পর্যন্ত যোগাবতার তাঁর "দেহ মন্দিরের" ছবি তোলার অনুমতি দিলেন। পরমহংসজী লিখেছেনঃ "মহাগুরু আর অন্য কোন ছবি তোলান নি, অন্ততঃ আমার চোখে তা পড়েনি।" *(পৃষ্ঠা ১৪ দ্রঃ)*

যোগানন্দজীর ১৯২০ সালের পাসপোর্ট ফটো

১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন শহরে আয়োজিত ইন্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ্ রিলিজিয়াস লিবারেলস্-এর কতিপয় প্রতিনিধির সঙ্গে পরমহংস যোগানন্দ। আমেরিকায় অবস্থানকালে এখানেই যোগানন্দজী সর্বপ্রথম ভাষণ দেন।

লুথার বারব্যাঙ্ক ও যোগানন্দজী, সান্তা রোসা, ক্যালিফোর্ণিয়া, ১৯২৪ সাল
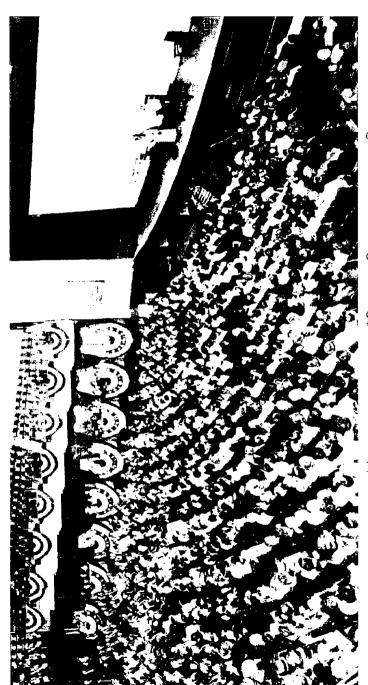
ডেনভার, কলোরাডো, ইউ.এস.এ., ১৯২৪ সাল। মঞ্চে দাঁড়িয়ে ক্লাস পরিচালনা করছেন যোগানন্দজী
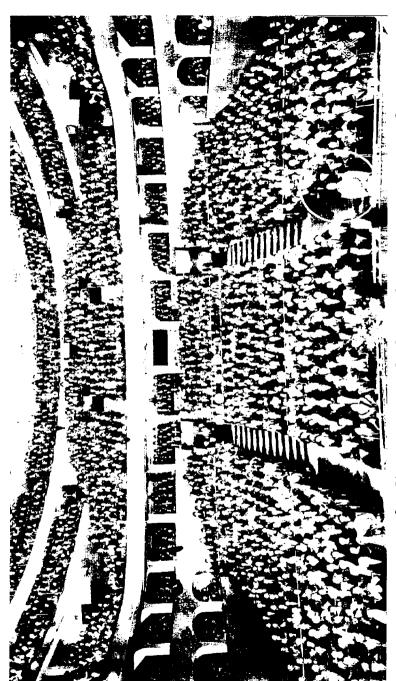
১৯২৫ সালে ক্যালিফোর্ণিয়ার লস্ অ্যাঞ্জেলসে অবস্থিত ফিলহারমোনিক প্রেক্ষাগৃহে ভাষণদানরত যোগানন্দজী

১৯২৪ সালে যোগানন্দজী তাঁর আন্তর্মহাদেশীয় বক্তৃতা সফরকালে আলাস্কার পথে স্টীমারের কেবিনে।
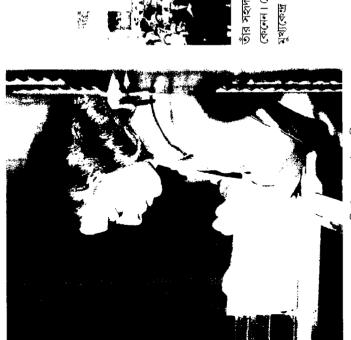
তাঁর সহৃদয় শিষ্যদের সাহায্যে যোগানন্দজী ১৯২৫ সালে মাউণ্ট ওয়াশিংটনের জমি কেনেন। বেচা-কেনার কার্য সম্পাদিত হওয়ার পূর্বেই এই জমিতেই—যা সোসাইটির মুখ্যকেন্দ্র পরিনত হবে—তিনি ইস্টারের সূর্যোদয় সার্ভিস সভার আয়োজন করেন।

করে ফেললাম, "আদম ও ইভের গল্প আমার কাছে একেবারেই অবোধ্য। ঈশ্বর শুধু দোষীদম্পতিকে শাস্তি দিয়ে ক্ষান্ত না হয়ে তাঁদের নিরীহ অজাত সন্তান-সন্ততিদেরও শাস্তি দিলেন কেন?"

গুরুদেব আমার অজ্ঞতার চেয়ে উষ্মা প্রকাশের ধরণ দেখে মনে মনে হেসে বললেন, "জেনেসিস্ হচ্ছে গভীরভাবে রূপক, আর তার আক্ষরিক ব্যাখ্যায় সব বোঝা যাবে না। এখানে 'জীবনতরু' হচ্ছে আমাদের এই মানবদেহ। এর মেরুদণ্ড হচ্ছে যেন একটা উল্টানো গাছ, তার শিকড় হচ্ছে মানুষের মাথার চুল, আর অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী তন্ত্রিকাসকল হচ্ছে তার শাখাপ্রশাখা। স্নায়ুমণ্ডলীর তরুতে নানারকম উপভোগ্য ফল ফলে অথবা — রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, এদের বিচিত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতি জন্মায়। এতে অবিশ্যি মানুষকে একটু আধটু প্রশ্রয় দেওয়া চলে। কিন্তু শরীর উদ্যানের মাঝখানে আপেল-ফলরূপে বর্ণিত যে যৌনসুখের স্থান, তার অভিজ্ঞতা গ্রহণই তার কাছে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।"*

'সর্প' হচ্ছে মেরুদণ্ডবাহিনী কুণ্ডলিনী শক্তি, যা যৌনতন্ত্রিকা উত্তেজিত করে। 'আদম' হচ্ছে যুক্তি, আর 'ইভ' হচ্ছে অনুভূতি বা ভাব। যখন কোন মানুষের ভিতর যৌন তাড়না তার মানসিক ভাবকে পরাভূত করে, তখন সে যুক্তিকে হারায় অর্থাৎ আদমের মৃত্যু ঘটে।†

"ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে নর ও নারীর দেহ সৃজন করে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করেছেন। তিনি ঐ নবসৃষ্ট জাতিকে ঐরূপ একই প্রকার অকলঙ্ক বা দৈব উপায়ে বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা অর্পণ করলেন।‡ পূর্ণ বিচারক্ষমতার সম্ভাবনাবিহীন, আর সংস্কারচালিত প্রাণিদেহে ঈশ্বরের

---

* "আমরা উদ্যানের বৃক্ষসকলের ফল ভক্ষণ করতে পারি বটে, কিন্তু উদ্যানের মধ্যস্থলে স্থিত বৃক্ষটির ফল সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেছেন, তুমি অবশ্যই এ ফল ভক্ষণ করবে না, এমন কি স্পর্শও করবে না; তাহলে তোমার মৃত্যু ঘটবে।" — জেনেসিস ৩ঃ ২-৩ (বাইবেল)।

† "যে স্ত্রীলোককে আমার সঙ্গিনী হবার জন্যে দিয়েছিলেন, সে-ই বৃক্ষ থেকে আমায় ফল দেয় এবং আমি তা ভক্ষণ করি। স্ত্রীলোকটি বলে, সর্পটি আমায় প্রলুব্ধ করে, তাইতেই আমি ফলটি ভক্ষণ করেছিলাম।" — জেনেসিস ৩ঃ ১২-১৩ (বাইবেল)।

‡ "সুতরাং ঈশ্বর মানবকে নিজ প্রতিরূপে সৃষ্টি করলেন এবং তাহাদিগকে পুরুষ ও নারীরূপে সৃষ্টি করলেন। ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করলেন এবং তাদেরকে বললেন, ফলবান হও এবং বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী সম্পদে পূর্ণ কর এবং তাকে শাসন কর।" — জেনেসিস ১ঃ ২৭-২৮ (বাইবেল)।

জীবাত্মারূপে প্রথম প্রকাশ সীমাবদ্ধ থাকার দরুণ ঈশ্বর প্রথম সৃষ্টি করলেন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যশরীর, আর তাদের আদম ও ইভ এই রূপক নাম দিলেন। এদের সুবিধাজনক ক্রমোন্নতিসূচক বিবর্তনের জন্য দুই শরীরে দুইটি প্রাণীর আত্মা বা দৈবসত্তা প্রেরণ করেন।* আদম অর্থাৎ নরের ভিতর যুক্তিই প্রবল; আর ইভ অর্থাৎ নারীর মধ্যে ভাবই প্রধান। তাই জগৎসংসারে সর্বত্র এই দ্বৈতভাবেরই প্রকাশ। সর্পরূপ ইন্দ্রিয়বৃত্তির তাড়নার দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের মন প্রলুব্ধ হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যুক্তি আর ভাব মিশ্রিত আনন্দের স্বর্গেই মানুষ বাস করে।

"তা হলে তোমার গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এই যে, মনুষ্যশরীর কোন জন্তু শরীরের ক্রমবিবর্তনের একমাত্র ফল নয়, এ তৈরী হয়েছে ঈশ্বরের বিশেষ সৃষ্টিরূপে। পশুশরীর পূর্ণ দৈব বা ঐশ্বরিক ভাববিকাশের পক্ষে অত্যন্ত স্থূল। আদি মানব-মানবীকে দত্ত তাঁর অপূর্ব দান হচ্ছে — প্রচ্ছন্ন সর্বজ্ঞতার মূল, মস্তিষ্কের 'সহস্রদল পদ্ম', আর সেইসঙ্গে, মেরুদণ্ডে পূর্ণ জাগরিত ষট্‌চক্র।

"প্রথমসৃষ্ট নরনারীযুগলের ভিতর উপস্থিত ঈশ্বরতত্ত্ব বা পরমজ্ঞান, তাদের এই উপদেশই দিয়েছিল যে, তারা যাবতীয় ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভোগ করতে পারে, শুধু একটি ছাড়া — তা হচ্ছে যৌনসম্ভোগ।† এদের উপর এত করে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল এই জন্য যাতে বংশবৃদ্ধির নিম্নস্তরের পশুপদ্ধতিতে তারা জড়িত হয়ে না পড়ে। মানুষের অবচেতন মনে অবস্থিত পাশবিক প্রবৃত্তির স্মৃতি যাতে পুনরায় জাগরিত না হয়, তার জন্যে তাদের যে সতর্ক করা হয়েছিল, কেউই তা গ্রাহ্য করল না। পশুদের মত জনন প্রক্রিয়ার পথ বেছে নিয়ে আদম আর ইভ স্বর্গীয় আনন্দ থেকে চ্যুত হল, যা আদি পূর্ণ মানবের আয়ত্তাধীন ছিল। যখন 'তারা বুঝতে পারল যে তারা উলঙ্গ', তখন তাদের অমরত্ববোধ অন্তর্হিত হল, ঈশ্বর

* "এবং প্রভু ঈশ্বর ভূমির মৃত্তিকা হতে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি করলেন এবং তার নাসিকায় প্রাণ বায়ু প্রবিষ্ট করালেন। তখন মানব একটি সজীব আত্মায় পরিণত হল।" — জেনেসিস ২ ঃ ৭ (বাইবেল)।

† "এক্ষণে সর্প (যৌনশক্তি) হল ভূমির যে কোন জন্তু (শরীরের যে কোন ইন্দ্রিয়বোধ) অপেক্ষা অধিকতর চতুর ও ধূর্ত।" — জেনেসিস ৩ ঃ ১ (বাইবেল)।

তাদের সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও; তারা এখন শারীরবিধির অধীন হল, যে নিয়ম অনুসারে দেহের জন্মের অনিবার্য পরিণতি দেহের মৃত্যু।

'সর্প' কর্তৃক 'ইভ'কে প্রতিশ্রুত 'সদসৎ' জ্ঞান, বিষম আর দ্বৈতভাব সূচিত করে — মরণশীল মানব মায়াবশে যার অধীন। আদম ও ইভ চেতনা অর্থাৎ যুক্তি আর ভাবের অপব্যবহারের দরুণ মায়াজালে জড়িত হয়ে পড়ে মানুষ তার পূর্ণ দিব্যজ্ঞানের স্বর্গোদ্যানে প্রবেশ করবার অধিকার হারিয়ে ফেলেছে।* প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিগত দায়িত্ব হচ্ছে তার আদি পিতামাতা অর্থাৎ দ্বিমুখী প্রকৃতিকে আবিষ্কার করে আবার সেই পরিপূর্ণ ঐক্য অর্থাৎ স্বর্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করা।"

শ্রীযুক্তেশ্বরজীর ব্যাখ্যা শেষ হলে বাইবেল বর্ণিত জেনেসিসের পৃষ্ঠায় নতুন করে শ্রদ্ধাভরে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলাম।

বললাম, "গুরুদেব, আজ আমি এই প্রথম আমাদের আদি পিতামাতা আদম ও ইভের† প্রতি সন্তানের যথোচিত কর্তব্যের আহ্বান অনুভব করছি।"

* "এবং প্রভু ঈশ্বর ইডেনের (স্বর্গোদ্যানের) পূর্বদিকে একটি উদ্যান রচনা করলেন; এবং তথায় তাঁর সৃষ্ট মানবকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।" — জেনেসিস ২ ঃ ৮ (বাইবেল)।

"অতএব প্রভু ঈশ্বর তাকে পাঠালেন সেই ভূমিকর্ষণ করতে যেখান হতে সে সৃষ্ট হয়েছিল।" — জেনেসিস ৩ ঃ ২৩ (বাইবেল)।

"ঈশ্বরসৃষ্ট প্রথম দিব্যমানবের জ্ঞান তার কপালের (পূর্বদেশ) সর্বদর্শী একটি মাত্র চক্ষুতেই কেন্দ্রীভূত থাকত। ঐ বিন্দুতে নিবদ্ধ নিখিলসৃজনক্ষমতাবিশিষ্ট তার ইচ্ছাশক্তি, মানুষ যখন তার জড়প্রকৃতির "ভূমিকর্ষণ" করবার চেষ্টা শুরু করলে, তখনই তা লোপ পায়।

† হিন্দুদের "আদম ও ইভ" গল্পটি সুপ্রাচীন 'শ্রীমদ্ ভাগবতে' উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম নর ও নারী (জড়দেহধারী জীব), স্বয়ম্ভুব (সৃষ্টিকর্তা হতে জাত) মনু আর তাঁর স্ত্রী শতরূপা বলে কথিত হয়েছে।

তাঁদের পাঁচটি সন্তানসন্ততি প্রজাপতিগণের (পূর্ণ জীব, যাঁরা জড়াকৃতি ধারণ করতে সক্ষম) সঙ্গে বিবাহের আদান-প্রদান প্রচলন করেছিলেন; সেই প্রথম ঈশ্বরীয় পরিবার হতেই মানবজাতির উৎপত্তি।

কি পূর্ব, কি পশ্চিম কোথাও আমি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মত এমন গভীর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিবলে খ্রিস্টিয়শাস্ত্র ব্যাখ্যা করতে কখনও শুনিনি। গুরুদেব বলতেন, "তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ, 'আমিই একমাত্র পথ, সত্য ও জীবন; আমা ভিন্ন কেউই পিতার নিকট আগমন করতে পারে না', — জন ১৪ ঃ ৬ (বাইবেল), খ্রিস্টের এই সব পঙ্ক্তিগুলির ভুল ব্যাখ্যা করে গেছেন। যীশুখ্রিস্ট কখনও একথা বলেননি যে, তিনিই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র; তিনি এই কথা বলেছিলেন যে, কোন

মানবই সেই নির্গুণ পরমব্রহ্ম, সেই ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বর, যিনি স্বয়ম্ভু, সৃষ্টির অতীত, সেই 'পিতার' ভাব প্রাপ্ত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে প্রথমে সেই 'পুত্রভাব' অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে সক্রিয় বিশ্বচৈতন্যের ভাবপ্রদর্শন করতে পারে। যীশু কূটস্থচৈতন্যের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁর জীবাত্মাবোধ একেবারেই লুপ্ত হয়েছিল।"

যখন পল লিখলেন, "ঈশ্বর .... যীশুখ্রিস্ট দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্টি করলেন," — এফিসিয়ান্স ৩ ঃ ৯ (বাইবেল), এবং যখন যীশু বললেন, "এব্রাহামের পূর্ব থেকেই আমি আছি", — জন ৮ঃ৫৮ (বাইবেল), তখন কথাগুলির সার অর্থ বোঝায় সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকতা।

কিছুটা ধর্মীয় ভীতির কারণে অনেক মানুষই স্বচ্ছন্দে এই বিশ্বাস করে থাকে যে, ঈশ্বরপুত্র বলতে কেবলমাত্র একজন মানুষকেই বোঝায়। তারা যুক্তি দেখায় ঃ "খ্রিস্ট এক অসাধারণ সৃষ্টি; তাহলে আমার মত নশ্বর মানব কিভাবে তাঁর অনুকরণ করতে পারে?" কিন্তু আসলে সমস্ত মানুষই ঐশীসৃষ্ট; তাই তাদের একদিন না একদিন খ্রিস্টের এই আদেশ অবশ্যই পালন করতে হবে ঃ "পরমেশ্বর যেরূপ নিষ্কলঙ্ক, তুমিও সেরূপ নিষ্কলঙ্ক হও।" (ম্যাথু ৫ ঃ ৪৮ বাইবেল), "ঐ দেখ, পিতা আমাদের কতটা ভালবাসেন যে আমরা নিজেদের ঈশ্বরপুত্ররূপে পরিচয় দিতে পারি।" (জন ৩ ঃ ১ বাইবেল)

কর্মবিধি ও তার অনুসিদ্ধান্ত উপলব্ধি করতে পারলে দেখা যাবে যে, পুনর্জন্মের বিষয় বাইবেলের অসংখ্য পঙ্‌ক্তিতে উল্লেখ করা আছে যথা, "যে কেহ মানুষের রক্তপাত করবে, মানুষের দ্বারাই তার রক্তপাত হবে।" — জেনেসিস ৯ ঃ ৬ (বাইবেল)। প্রত্যেক নরহন্তা যদি 'মানুষ দ্বারাই' হত হয়, তা হলে প্রতিক্রিয়ার নিয়মে স্পষ্টতঃ বহুক্ষেত্রে একাধিক জীবনের প্রয়োজন হয়।' সমসাময়িক কোন শাস্তিবিধান সদ্য সদ্য হয়ত পাওয়া যায় না বলেই।

আদি খ্রিস্টীয় ধর্মসম্প্রদায়, জ্ঞেয়বাদী এবং সুবিখ্যাত অরিজেন, অ্যালেকজান্ড্রিয়ার ক্লিমেণ্ট (উভয়ই ৩য় শতকের) এবং সেণ্ট জেরোম (৫ম শতাব্দী) সমেত বহু খ্রিস্টীয় ধর্মযাজকগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত পুনর্জন্মবাদ তত্ত্ব গ্রহণ করেছিল। ৫৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যাণ্টিনোপলের দ্বিতীয় কাউন্সিল কর্তৃক এই মতবাদ প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধাচারী বলে ঘোষিত হয়। সেই সময় বহু খ্রিস্টানই ভেবেছিলেন যে, পুনর্জন্মবাদ মানুষকে সদ্যমুক্তি লাভের প্রচেষ্টায় উৎসাহিত করতে দেশ আর কালের একটা অতি বড় সুযোগ দান করেছিল। কিন্তু সত্য চাপা দেওয়ার কুফলে হয় একগাদা ভুলের সৃষ্টি। লক্ষ লক্ষ লোক তাদের "একটি জীবন কাল" ঈশ্বরানুসন্ধানে ব্যয় করেনি, — ব্যয় করেছে দুর্লভরূপে প্রাপ্ত এই সংসারকে ভোগ করবার জন্য, যা শীঘ্রই চিরতরে হারিয়ে যাবে। সত্য হচ্ছে এই যে, মানুষ ততক্ষণ পৃথিবীতে পুনর্জন্মগ্রহণ করে, যতক্ষণ না সে সজ্ঞানে ঈশ্বরের পুত্ররূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারছে।

১৭ পরিচ্ছেদ

শশী ও তিনটি নীলা

ডাক্তার নারায়ণচন্দ্র রায় একদিন আমায় বললেন, "ওহে, স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সম্বন্ধে তোমার আর আমার ছেলেরও খুব উচ্চ ধারণা শুনতে পাই — তা চল, একদিন নাহয় দর্শনলাভ করেই আসা যাক্, কি বল?" ডাক্তারবাবুর কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল যে, তিনি যেন দুটো আধপাগলার খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্য একটু ব্যাঙ্গ করেই কথাগুলো বললেন। অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করলাম।

ডাক্তারবাবু ছিলেন পশুচিকিৎসক, আর দারুণ নাস্তিক। তাঁর ছোট ছেলে সন্তোষ তার বাপের প্রতি আমায় একটু নজর রাখতে বলত। কিন্তু এ পর্যন্ত আমার অমূল্য সাহায্যের ফল বাইরে বিশেষ কিছুই প্রকাশ পায় নি।

যাক্, তারপরদিন ত' ডাক্তার রায় আমার সঙ্গে শ্রীরামপুরের আশ্রমে গেলেন। গুরুদেবের সঙ্গে সামান্য আলাপ পরিচয় হলো। কিন্তু যতটুকু সময় সেখানে রইলেন, তার অধিকাংশ সময় উভয়েরই চুপচাপ করে কেটে গেল। তারপর ডাক্তারটি হঠাৎ উঠে প্রস্থান করলেন।

ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর দরজা বন্ধ হতে না হতেই গুরুদেব আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "আশ্রমে তুমি মরা মানুষ আনো কেন বলত?"

"বলেন কি গুরুদেব! ডাক্তারবাবুর মত এমন জলজ্যান্ত আর কেউ আছে না কি?"

"কিন্তু শীগ্‌গিরই বেচারা মারা যাবে যে, তা জান?" শুনে তো হাত পা হিম হয়ে এল, বললাম, "গুরুদেব, তার ছেলেটা তো তাহলে দারুণ আঘাত পাবে। আহা বেচারা! সন্তোষ এখনও আশা করে যে, তার বাপের নাস্তিকতা ঘুচোবার সময় আছে। আপনার পায়ে পড়ি গুরুদেব, বেচারাকে বাঁচান!"

"আচ্ছা বেশ, তোমার জন্যেই কেবল আমি চেষ্টা করে দেখব।" গুরুদেবের মুখ ভাবলেশহীন। বললেন, "দেখ, তোমার ঐ দাম্ভিক ঘোড়ার ডাক্তারটির বহুমূত্র রোগ ভিতরে ভিতরে অনেক দূর এগিয়েছে, তা ও বেচারা কিছুই জানে না। দিন পনেরোর ভেতরই বিছানায় পড়ল বলে। ডাক্তারেরা একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে বসবেন দেখো। তাঁর স্বাভাবিক আয়ু আজ হতে আর বড়জোর মাসদেড়েক। কিন্তু যাইহোক, তোমার আগ্রহে ঐদিনেই সে ভাল হয়ে উঠবে। তবে একটা কথা আছে ঃ তোমার ডাক্তারবাবুকে একটি তাগা ধারণ করাতে হবে — তবেই সে সুস্থ থাকবে; কিন্তু অপারেশন করার সময় ঘোড়ার লাথিছোঁড়ার মত সে তাতে দারুণ আপত্তি করবে, তোমার কথা কিছুতেই মানবে না, তা দেখে নিও।" বলেই গুরুদেব উচ্চহাস্য শুরু করে দিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল। ভাবতে লাগলাম কি করে সন্তোষ আর আমি এই বিদ্রোহী নাস্তিকটিকে বুঝিয়েসুঝিয়ে কাজ হাসিল করতে পারবো; এমন সময় শ্রীযুক্তেশ্বরজী আবার বলতে শুরু করলেন, "দেখ, তোমার ডাক্তারবাবু সুস্থ হয়ে গেলেই বোলো, যেন কিছুতেই আর মাংসটাংস না খান — তা হলেই বিপদ ঘটবে! সে অবিশ্যি একথা কানেই তুলবে না, আর এখন যেমন সে ভাবছে যে তার স্বাস্থ্য খুব ভালই আছে, তখনও সে তেমনই ভাববে। তা'সত্ত্বেও দেখবে — মাসছয়েকের ভেতরেই সে ঠিক মারা পড়বে। আর এই যে ছ'মাস আয়ু বাড়ল, তা কেবল তোমার অনুরোধ-উপরোধের জন্যেই।"

তার পরদিন সন্তোষকে বলে এক স্যাকরাকে দিয়ে একটা তাগা তৈরী করার ব্যবস্থা হল। হপ্তাখানেকের ভিতরই তা তৈরীও হয়ে গেল বটে, কিন্তু ডাক্তার সেটা পরতে রাজী হলেন না। বললেন, "না, না, আমার স্বাস্থ্য এখন খুবই ভাল। তোমার ও জ্যোতিষীট্যোতিষীদের বুজরুকি সব এখানে আর চলবে না হে!" বলেই আমার প্রতি একটি ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

সকৌতুকে স্মরণ করলাম, গুরুদেব এক বগ্‌গা ঘোড়ার সঙ্গে ডাক্তারবাবুর কি রকম সঠিক তুলনাই না করেছিলেন। যাক্, আরও

দিনসাতেক কাটল; তারপর ডাক্তারবাবু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কি আর করেন, একান্ত নিরূপায়ে তিনি তাগা ধারণ করতে রাজী হলেন। আরও হপ্তা দুই কাটল, ডাক্তার এবার একেবারে জবাব দিয়ে গেলেন — বাঁচবার আর কোন আশা নেই। তিনি আমাকে বললেন — বহুমূত্ররোগ নারায়ণবাবুর শরীরে এত ক্ষতি করেছে যে, এ যাত্রা তাঁর আর রক্ষে নেই। তারপর বহুমূত্ররোগের উপসর্গসকল আমার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। আমি মাথা নেড়ে বললাম, "উঁহুঁ, আমার গুরুদেব বলেছেন যে, মাসখানেক ভোগবার পর ডাক্তার রায় ঠিক ভাল হয়ে উঠবেন, দেখবেন।"

ডাক্তারবাবু তো নিতান্ত অবিশ্বাসের সঙ্গে আমার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন।

হপ্তা দুই বাদে একদিন সেই ডাক্তারবাবু আমার সঙ্গে দেখা করে যেন ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক ভাবে বললেন, "কি আশ্চর্য, নারায়ণবাবু একেবারে সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে গেছেন। আমার অভিজ্ঞতায় এমন অদ্ভুতভাবে রোগমুক্তি একটা অলৌকিক ব্যাপার। যমের মুখ থেকে এ রকম আশ্চর্যভাবে ফিরে আসা আমি জীবনে কখনও দেখিনি। তোমার গুরুদেবের রোগ নিরাময়ের অদ্ভুত দৈবশক্তি আছে দেখছি!"

এরপর নারায়ণবাবুর সঙ্গে একটিবার মাত্র সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং সেইসময় শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সাবধানবাণী তাঁকে শুনিয়ে সতর্ক করে দিয়ে এসেছিলাম এই বলে যে, জীবনে তিনি যেন আর কখনও মাংস আহার না করেন। তারপর মাসছয়েকের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার আর কোনরকম দেখাসাক্ষাৎ হয়নি।

এরপর একদিন সন্ধ্যায় আমি আমাদের বাড়ীর বারান্দায় বসে আছি। ডাক্তার রায় আমায় দেখে দাঁড়িয়ে পড়লেন, কথায় কথায় তিনি বললেন, "দেখ, তোমার গুরুদেবকে বোলো যে, নিয়মিত মাংস খেয়ে আমি পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছি। মাংস ছাড়ার অবৈজ্ঞানিক পরামর্শ দিয়ে তিনি আমায় টলাতে পারেন নি।" সত্যিই তখন ডাক্তার রায়কে সুস্বাস্থ্যের একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি বলেই দেখাচ্ছিল।

কিন্তু তার পরদিনই সন্তোষ আমার কাছে ছুটে এল। পাশেই তাদের বাড়ী। বললে, "সকালবেলা বাবা হঠাৎ মারা গেলেন।" গুরুদেবের নানা অলৌকিক ঘটনাবলী আমি যা দেখেছি, তার মধ্যে এটা অন্যতম আশ্চর্য ঘটনা। সেই বিদ্রোহী পশুচিকিৎসকটিকে গুরুদেব তাঁর দারুণ অবিশ্বাস সত্ত্বেও সুস্থ করে তুললেন, ছ'মাস তাঁর আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দিলেন, কেবলমাত্র আমার অনুরোধের জন্যই। ভক্তের ব্যাকুল প্রার্থনা পূরণ করতে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর দয়ার তুলনা হয় না।

আমার কলেজের বন্ধুদের গুরুজীকে দর্শন করানো আমার একটা বিশেষ গর্বের বস্তু ছিল। অন্ততঃ আশ্রমে পৌঁছে সন্দেহবাদীদের অনেকেই তাদের কেতাদুরস্ত পাণ্ডিত্যাভিমানের মুখোস খুলে রেখে আসতো।

আমার একটি বন্ধু ছিল, নাম শশী। প্রায়ই হপ্তার শেষে শ্রীরামপুরের আশ্রমে এসে সে থাকতো। গুরুদেব ছেলেটিকে খুব ভালবেসে ফেলেছিলেন, কিন্তু দুঃখ করতেন এই বলে যে, ছেলেটির ব্যক্তিগতজীবন বড়ই উচ্ছৃঙ্খল আর অসংযত।

একদিন গুরুদেব একটু সস্নেহে অসহায়তার ভঙ্গিতেই বললেন, "দেখ শশী, তুমি যদি না এখন থেকে শোধরাও, তাহলে ঠিক এক বছর বাদেই তুমি কিন্তু সাংঘাতিক অসুখে পড়বে, তা জেনে রেখো। মুকুন্দ সাক্ষী রইল; পরে যেন আমায় দোষ দিও না যে, সময় থাকতে আমি তোমায় সাবধান করে দিই নি।"

শশী হেসে বলল, "গুরুদেব, আমার পোড়াকপালে ভগবানের দয়া জোটানোতে যা কিছু করবার, তার ভার আপনার ওপরেই দিলাম। আমার প্রাণ তার বটে, কিন্তু মন যে বড়ই দুর্বল। পৃথিবীতে কেউ যদি আমায় বাঁচাতে পারেন তো সে আপনি — এ ছাড়া আমি আর কিছুই বিশ্বাস করিনা।"

"অন্ততঃ দু'রতির একটা নীলা ধারণ কোরো, এতেও অনেকটা কাজ হবে।"

"ও সব কেনার ক্ষমতা আমার নেই। তবে গুরুদেব, বিপদ যদি একান্তই আসে, তাহলে আপনিই আমায় রক্ষা করবেন — এ বিশ্বাস আমার পুরোমাত্রায় আছে।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একটু রহস্যজনকভাবে উত্তর দিলেন, "দেখ, আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে এই বছরখানেকের মধ্যেই তুমি তিন তিনটি নীলা নিয়ে আসবে। তখন কিন্তু তাদের আর কোন দরকারই থাকবে না, তাও জেনে রেখো।"

এই প্রসঙ্গে নানাবিধ আলোচনা নিয়মিতভাবেই চলত। কখনও বা শশী কৃত্রিম হতাশার সুরে বলত, "আমি আর শোধরাতে পারলাম না দেখছি। তাছাড়া গুরুদেব, আমি এও বলে রাখছি ও সব রত্নটত্নর চেয়ে আপনার ওপর আমার বিশ্বাস, ঢের ঢের বেশি!"

বছরখানেক বাদে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর এক শিষ্য নরেনবাবুর কলকাতার বাড়ীতে গুরুদর্শন করতে গিয়েছি। তেতলার বৈঠকখানায় শ্রীযুক্তেশ্বরজী আর আমি চুপচাপ বসে আছি। বেলা তখন দশটা। সদর দরজা খোলার শব্দ পেলাম। গুরুদেব বেশ শক্ত আর সোজা হয়ে বসলেন। তারপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, "নিশ্চয়ই শশী; বছর শেষ হয়েছে, তাই এখন এসেছে। এখন আর এলে কি হবে? ওর দুটো ফুসফুসই একেবারে গেছে। আমার কথা ত' শুনল না। ওকে বলে দাও — আমি ওর সঙ্গে আর দেখা করতে চাই না।"

শ্রীযুক্তেশ্বরজীর রূঢ়তায় স্তম্ভিত হয়ে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে গিয়ে দেখি, শশী উপরে উঠছে।

"ওহে মুকুন্দ, আশা করি গুরুদেব এখানে আছেন; আমার কেমন মনে হলো তিনি নিশ্চয়ই এখানে হবেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু কেউ তাঁকে বিরক্ত করে, তিনি তা চান না।" শুনে তো শশী একেবারে কেঁদেই ফেলল, তারপর আমাকে হঠিয়ে দৌড়ে উপরে উঠে গেল। গুরুদেবের চরণতলে প্রণাম করে সেখানে তিনটি অতি সুন্দর নীলা রেখে বলল, "সর্বদর্শী গুরুদেব, ডাক্তারেরা বলছেন যে আমার রাজযক্ষ্মা হয়েছে — আর বড়জোর মাসতিনেক। গুরুদেব আপনার চরণতলে আশ্রয় নিলাম। আমি নিশ্চয় জানি একমাত্র আপনিই আমায় বাঁচিয়ে তুলতে পারেন!"

"এতক্ষণে তোমার মরাবাঁচার ভাবনা এসে জুটেছে বুঝি, তাই না? এখন বেজায় দেরী হয়ে গেছে শশী। তোমার রত্নটত্ন সব এখান থেকে

নিয়ে যাও, ওদের দ্বারা আর কিচ্ছু ফল পাওয়া যাবে না।" শশীর উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনজড়িত দয়াভিক্ষার মাঝে গুরুদেব নিষ্করুণ নীরবতার এক পাথরের মূর্তির মতই অনড় হয়ে বসে রইলেন।

হঠাৎ আমার মনে কেমন একটা দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী দৈবশক্তিতে রোগ আরামের বিষয়ে শশীর বিশ্বাসের গভীরতা পরীক্ষা করছেন। কিছু আর বললাম না। চুপচাপ আমি বসেই রইলাম। দারুণ উৎকণ্ঠায় ঘণ্টাখানেক কাটবার পর গুরুদেব ভূমিষ্ঠ শশীর উপর সস্নেহদৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, "ওঠ, ওঠ শশী, পরের বাড়ীতে এসে তুমি কিসব হাঙ্গামা শুরু করেছ, বল দেখি? তোমার ও সব নীলাটীলা স্যাকরাকে ফেরৎ দিয়ে দাও; এখন আর ওতে বাজে খরচ করে কোন লাভ নেই। তুমি একটা তাগা তৈরী করিয়ে সেইটাই এখন ধারণ কর, বুঝলে? তোমার কোন ভয় নেই; দু'এক সপ্তাহর মধ্যেই তুমি ভাল হয়ে যাবে।"

হঠাৎ কালো মেঘ সরে গেলে উজ্জ্বল সূর্যকিরণে যেমন বৃষ্টিতে ভেজা চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আলোয় ঝলমল করে ওঠে, তেমনি শশীর অশ্রুকলঙ্কিত মুখে একটি পরম নির্ভরতার গভীর আনন্দসূচক হাসি দেখা দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "গুরুদেব, ডাক্তারের ওষুধ খাব কি?"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কিছুটা অগ্রাহ্যের সঙ্গেই বললেন, "তোমার যা ইচ্ছে করগে যাও; খাও, ফেলে দাও, তাতে কিচ্ছু এসে যাবে না। চন্দ্রসূর্য তাদের জায়গা বদলাতে পারে, কিন্তু যক্ষ্মায় আর তোমার কিছুতেই মৃত্যু হবে না, এ নিশ্চয় জেনে রেখো।" তারপর হঠাৎ বললেন, "পালাও পালাও, এক্ষুনি পালাও, নইলে আবার আমার মন বদলে যেতে পারে!"

টিপ করে একটা প্রণাম করেই শশী তাড়াতাড়ি পালাল। তারপর ক'সপ্তাহ ধরে আমি শশীকে দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে, তার অবস্থা দিনকে দিন খারাপ হয়ে আসছে।

শশীর আজ আর রাতটা কাটবে না — ডাক্তারের কাছে একথা শুনে আর তার সেই একেবারে কঙ্কালসার চেহারা দেখে থাকতে পারলাম না;

পড়িমরি করে দৌড়লাম শ্রীরামপুরে। কাঁদতে কাঁদতে সব খবর দিলাম গুরুদেবকে। নিতান্ত নিস্পৃহভাবেই তিনি সব শুনে গেলেন। তারপর বললেন, "তুমি আমায় এখানে বিরক্ত করতে এসেছ কেন বল তো? শশী আরাম হয়ে উঠবে আমি তো কথা দিয়েছি; তবে আবার ফের এখানে আসা কেন, অ্যাঁঃ?"

প্রগাঢ়ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে তাড়াতাড়ি আমি দরজার দিকে এগোলাম। যাবার সময় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একটা কথাও বললেন না; নীরবতার মধ্যে ডুবে গিয়ে অর্ধোন্মীলিতনয়নে অপলক স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন — দৃষ্টি তাঁর অন্যলোকে প্রসারিত।

কলকাতায় শশীর বাড়ীতে ফিরলাম তখনই। ঘরে ঢুকে দেখি যে, শশী বিছানার ওপর বসে, — দুধ খাচ্ছে! আমাকে দেখেই বলে উঠল, "আরে শোনো শোনো মুকুন্দ! কি আশ্চর্য ব্যাপার বল দেখি। এই ঘণ্টাচারেক হল দেখি যে গুরুজী আমাদের এই ঘরে এসে সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁকে দেখেই আমার যা কিছু যন্ত্রণা কষ্ট সব যেন এক নিমেষে উবে গেল। বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে, তাঁর অসীম কৃপাতেই আজ আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।"

কয়েক সপ্তাহের ভিতরেই শশী বেশ সুস্থ আর মোটাসোটা হয়ে উঠল। আর তার স্বাস্থ্যও আগেকার চেয়ে খুব ভাল হয়ে গেল।* কিন্তু তার আরোগ্যলাভের পর একটি মাত্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, যাতে একটু অকৃতজ্ঞতার ছোঁয়াচ ছিল। সেটা হচ্ছে — সে আর বড় একটা শ্রীযুক্তেশ্বরজীর কাছে যেত না। শশী একদিন আমায় বলল — তার পূর্বজীবনের পাপের জন্য সে এতদূর দুঃখিত যে, গুরুজীর সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে তার বড়ই লজ্জা করে।

আমি শুধু ভাবলাম — দারুণ রোগভোগের পর শশীর মন বড় শক্ত হয়ে গেছে আর তার চালচলনেও পরিবর্তন ঘটেছে।

স্কটিশ চার্চ কলেজে প্রথম দু'বছর প্রায় শেষ হবার মুখে। মাঝে মাঝে ক্লাসে হাজির হতাম বটে, কিন্তু তার কিছু ঠিক ছিল না। যেটুকু পড়াশোনা

---

* ১৯৩৬ সালেও জনৈক বন্ধুর কাছে খবর পেয়েছি যে, শশীর স্বাস্থ্য তখনও বেশ চমৎকার।

করতাম, তা বাড়ীর লোকেদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যেই। আমার দু'জন গৃহশিক্ষক বাড়ীতে নিয়মিতভাবে হাজিরা দিতেন, আর আমিও নিয়মিতভাবে অনুপস্থিত থাকতাম। পাঠ্যাবস্থায় এই একটিমাত্র বিষয়েই আমার যা ঠিক নিয়মনিষ্ঠা ছিল!

দু'বছর কলেজে পড়ে পাশ করবার পর প্রথমে আই. এ., তারপর আরও দু'বছর কলেজে পড়া শেষ করে তবে ছাত্ররা বি. এ. ডিগ্রি পায়। আই. এ. পরীক্ষার দিন বিপজ্জনকভাবে ঘনিয়ে আসতে লাগল। পুরীতে পালালাম, গুরুদেব তখন সেখানে কয়েক সপ্তাহ কাটাবার জন্যে গিয়েছিলেন। ক্ষীণ আশায় ভাবলাম যে, হয়ত তিনি বলবেন আমার আর পরীক্ষা দিয়ে কাজ নেই; তাই পরীক্ষার জন্যে তৈরী হতে পারিনি বলে আমার যে দূরবস্থা দাঁড়িয়েছে তা সবিস্তারে তাঁকে নিবেদন করলাম।

গুরুদেব কিন্তু হেসে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "তুমি ত' অন্তর দিয়ে আধ্যাত্মিক কর্তব্য পালন করেছ, তাতে করে অবিশ্যি তোমার কলেজের পড়াশুনা খানিকটা অবহেলা হয়েছে। সামনে সপ্তাহটা খুব মন দিয়ে পড়াশুনা কর — তাইতেই তুমি পরীক্ষায় ঠিক পাস করে যাবে, দেখো।"

কোলকাতায় ফিরলাম। মনের মধ্যে অবশ্য দু'একটা যুক্তিযুক্ত সন্দেহ যে উঁকি দিয়ে ভয় আনেনি তা নয়, কিন্তু মনের মধ্যেই তাদের চেপে রাখলাম। টেবিলের উপর বইয়ের পাহাড় দেখে মনে হতো, যেন এক দুর্গম বনের মধ্যে পথিক আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি।

বহুক্ষণ ধ্যান করার পর একটা খাটুনি বাঁচাবার মতলব মাথায় এল। প্রত্যেক বইটা একবার খুলে ফেলে যে জায়গাটা বেরিয়ে পড়বে, কেবল সেই জায়গাটুকুই তৈরী করে যাব, তাতে যা হয় হবে। এমনি করে সপ্তাহখানেক দিনে আঠারঘণ্টা খেটে ভাবলাম যে, এইবার মুখস্থ বিদ্যায় একেবারে দিগ্‌গজ হয়ে গেছি।"

তারপর কয়েকদিন বাদে পরীক্ষা দেবার পর মনে হল — আপাতদৃষ্টিতে আমার ঐ রকম উদ্দেশ্যবিহীন প্রণালীই যেন অনেকটা ঠিক। সব পরীক্ষাগুলোতেই পাস হলাম বটে, কিন্তু একেবারে কান ঘেঁসে।

বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজনদের অভিনন্দন আর তাদের আনন্দ কলোচ্ছ্বাসের সঙ্গে হাস্যকরভাবে মিশ্রিত ছিল এক অকৃত্রিম বিস্ময়!

পুরী থেকে ফিরে এসে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমায় যা বললেন, তাতে করে আনন্দে আর বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইলাম! তিনি বললেন, "তোমার কোলকাতার পড়া এখন শেষ হল। এবার তুমি শ্রীরামপুরে থেকেই বাকী দু'বছর কলেজে পড়বে।"

কিন্তু তবুও আমার মাথা গুলিয়ে গেল, কারণ শ্রীরামপুর কলেজে বি. এ. পড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। উচ্চশিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র শ্রীরামপুর কলেজে কেবল দু'বছরের আই. এ. পড়ার ব্যবস্থাই ছিল। তবুও জিজ্ঞাসা করলাম, "গুরুদেব, কলেজে তো বি. এ. পড়ার কোন ব্যবস্থা নেই, কি করে এখান থেকে পড়ব?"

গুরুজী একটু দুষ্টুহাসি হেসে বললেন, "আমার এ বুড়োবয়সে লোকেদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে তোমার জন্যে বি. এ. পড়ার কলেজ ত' আর তৈরী করে দিতে পারি না। মনে হয়, কাউকে দিয়ে তোমার জন্যে ব্যবস্থাটা করে ফেলতে হবে।"

মাস দুই পরে, শ্রীরামপুর কলেজের সভাপতি অধ্যাপক হাওয়েলস্ সাহেব প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, শ্রীরামপুর কলেজে বি. এ. পর্যন্ত পড়ার ক্লাস খোলবার জন্য তিনি পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। শ্রীরামপুরে বি. এ. ক্লাশের প্রথমদল ছাত্রের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। শ্রীরামপুর কলেজ এইভাবে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজে পরিণত হয়।

উচ্ছ্বাসত কৃতজ্ঞতাভরে বললাম, "গুরুজী, আমার ওপর আপনার কি অসীম কৃপা! বহুদিন থেকে ভাবছি যে, কলকাতা ছেড়ে কবে আপনার কাছে দিনরাত থাকতে পাব! আর প্রফেসর হাওয়েলস্ হয়ত স্বপ্নেও জানবেন না, আপনার নীরবদানের কাছে তিনি কতটা ঋণী!"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাক্, এখন আর তোমায় ট্রেনে যাতায়াতে এতটা করে সময় নষ্ট করতে হবে না; তাতে করে তুমি মনোযোগ দিয়ে ভালভাবে লেখাপড়া

করতে পারবে। আর শেষমুহূর্তে বইয়ের গোটাকতক পাতা উল্টে মুখস্থ করে পাস করার চেয়ে ভাল ছাত্রই হতে পারবে, কি বল?"

কিন্তু যাই হোক, কথায় তাঁর কিঞ্চিৎ সন্দেহের আভাস ছিল।*

---

* শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী অন্য বহু সাধু মহাত্মাদের মতই আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির জড়বাদী ভূমিকায় দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। অতি অল্প বিদ্যালয়েই সুখলাভের অধ্যাত্মবিধির শিক্ষা দেওয়া হয় অথবা "ঈশ্বরকে ভয়" অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করে নিজের জীবন পরিচালনাতেই জ্ঞান লাভ করা যায় — ছাত্রদের এই শিক্ষা দেয়।

তরুণবয়স্কেরা আজকাল উচ্চবিদ্যালয় অথবা কলেজে প্রায়ই শুনে থাকে যে মানুষ হচ্ছে "একটি উচ্চতর প্রাণী মাত্র"; ফলে তারা প্রায়ই নাস্তিক হয়। তারা আত্মানুসন্ধানের কোন চেষ্টাই করে না অথবা তাদের নিজেদের মূল সত্তা যে "ঈশ্বরের প্রতিরূপ", সে কথাও ভাবে না। ইমার্সন বলেছেন, "আমাদের অন্তরে যেটুকু আছে, একমাত্র সেইটুকু বাইরে দেখতে পারি। যদি আমরা কোন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ না পাই, তার কারণ হচ্ছে অন্তরে আমরা তেমন কোন ভাব পোষণ করি না।" পশু প্রকৃতিকেই যে তার একমাত্র সত্তা বলে ভাবে, ঈশ্বরাকাঙ্ক্ষা থেকে তার বিচ্যুতি ঘটে।

যে শিক্ষাব্যবস্থা পরমাত্মাকে মানব জীবনের প্রধান বা চরম তথ্য বলে শিক্ষা না দেয়, সে ব্যবস্থা বিদ্যার পরিবর্তে "অবিদ্যা"ই দান করে, অজ্ঞানতা এনে দেয়। "তুমি বলছ যে তুমি ধনী, এবং নানাসম্পদ সম্পন্ন আর কোন কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু তুমি জান না যে, তুমি হতভাগ্য, তুমি দুঃখী, দরিদ্র, জ্ঞানহীন অন্ধ আর আশ্রয়হীন।" — রেভ্যেলেশন ৩ ঃ ১৭ (বাইবেল)।

প্রাচীন ভারতে তরুণদের শিক্ষাব্যবস্থা ছিল এক আদর্শ। নয় বৎসর বয়সে ছাত্ররা "গুরুকূলে" (শিক্ষাকেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত গুরুর পারিবারিক গৃহ) "সন্তান"রূপে গৃহীত হত। "একজন আধুনিক ছাত্র বিদ্যালয়ে তার শিক্ষাকালের অষ্টমাংশ ব্যয় করে (বৎসরে); ভারতীয় ছাত্র কিন্তু তার সব সময়টাই করে থাকে।" "ইণ্ডিয়ান কালচার থ্রু দি এজেস" (প্রথম খণ্ড) নামক পুস্তকে অধ্যাপক এস. ভি. ভেঙ্কটেশ্বর লিখছেন, "তখন বেশ একটা ঐক্য ও দায়িত্ববোধের স্বাস্থ্যকর মনোভাব ছিল এবং আত্মনির্ভরতা আর ব্যক্তিত্বের অনুশীলনেরও প্রচুর সুযোগ ছিল। সেখানে ছিল সৌচিত্ত্য আর স্বেচ্ছাগৃহীত নিয়মনিষ্ঠার একটা উচ্চমান; আর ছিল কর্তব্য, নিষ্কাম কর্ম আর ত্যাগের একটা কঠোর নিষ্ঠা; তার সঙ্গে ছিল আত্মসম্মানবোধ এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধা, উচ্চ বৈদগ্ধ ... তৎসহ মানবজীবনের বিরাট উদ্দেশ্য ও মহত্ত্ববোধ।"

১৮ পরিচ্ছেদ

জনৈক মুসলমান যাদুকর

শ্রীরামপুর কলেজে প্রবেশ করেই আমি কাছাকাছি একটা বোর্ডিং হাউসে ঘর নিয়েছিলাম। গঙ্গার ধারে পুরানো ধরণের পাকাবাড়ী, নাম "পন্থী"।* আমার নূতন আবাসে প্রথম যেদিন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বেড়াতে এলেন, সেদিন তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করেই একটি অদ্ভুত কথা বললেন ঃ "দেখ, অনেক বছর আগে, ঠিক তোমার এই ঘরেতেই, আমার সামনে একটি মুসলমান যাদুকর চারটি ভোজবাজির খেলা দেখিয়েছিল।" শুনে উদ্দীপ্ত কৌতূহলে সামান্য আসবাবভরা ঘরের চারদিকে তাকিয়ে বললাম, "কি আশ্চর্য! এই নতুন সজ্জিত ঘরেরও কিছু পুরোণ ইতিহাস আছে তাহলে!"

গুরুজী অতীত স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে হেসে বললেন, "তা আছে বই কি! সে এক লম্বা কাহিনী। মুসলমানটি ছিল একজন ফকির,† — নাম আফজল খাঁ। এক হিন্দুযোগীর হঠাৎ দেখা পেয়ে গিয়ে সে তাঁর কাছ থেকে ঐরকম অদ্ভুত বিদ্যা লাভ করেছিল।

"আফজলের বাড়ী ছিল পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে। ছেলেবেলায় সে একদিন দেখে যে, ধূলায় ধূসরিত এক সন্ন্যাসী তাদের গাঁয়ে এসে উপস্থিত। সন্ন্যাসীটি তাঁকে বললেন, 'বাবা, বড়ই তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল এনে দিতে পার?'

"আফজল বলল, 'সাধু মহারাজ, আমি মুসলমান; আপনি হিন্দু হয়ে আমার হাত থেকে জল খাবেন কি করে?'

---

* ছাত্রাবাস; 'পন্থ' শব্দ থেকে উৎপত্তি; অর্থ — পথিক, জ্ঞানান্বেষী।

† মুসলমান যোগী; আরবী শব্দ ফকির থেকে গৃহীত — ভিক্ষুক; ভিক্ষুক জীবনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দরবেশদের এই আখ্যা দেওয়া হয়।

"সন্ন্যাসী বললেন, 'বাছা, তোমার সত্যি কথায় ভারি খুশী হলাম। আমি ওসব অশাস্ত্রীয় জাতিভেদের ছোঁয়াছুঁয়ির নিয়ম মানি না। যাও, চট করে আমায় জল এনে দাও।'

"আফজলের ভক্তিপূর্ণ ব্যবহারে যোগীটি তার প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে গম্ভীরভাবে বললেন, 'তোমার পূর্বজীবনের কর্মফল খুবই ভাল। আমি তোমায় একটি যোগের কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছি। এতে করে অদৃশ্য জগতের অংশবিশেষকে তোমার নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা জন্মাবে। তাকে কেবল উপযুক্ত ক্ষেত্রেই ব্যবহার করবে; কিন্তু খবরদার! তোমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তা কখনো ব্যবহার করো না যেন। কিন্তু হায়! দেখতে পাচ্ছি — পূর্বজন্মের কতকগুলো সর্বনাশা কুকর্মের বীজও তুমি সঙ্গে বহন করে এনেছ। দেখো যেন, আবার নতুন কুকর্ম করে আর সেগুলোকে ফুটিয়ে তুলো না। তোমার পূর্বজীবনের কর্মফল এত জটিল যে, এ জন্মে তোমায় যোগাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের মঙ্গলসাধন করেই তা কাটাতে হবে।'

"তারপর সেই হতভম্ব ছেলেটিকে এক জটিল প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিয়ে যোগী অন্তর্ধান করলেন।

"আফজল বিশ বৎসর ধরে সেই যোগ প্রক্রিয়াগুলি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যাস করেছিল। তার অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা বহু মানুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে শুরু করল। মনে হয় এক অদৃশ্য আত্মা, যাকে সে 'হজরত' বলে ডাকত, সে সর্বদাই তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরত। ফকিরের সামান্যতম ইচ্ছাও সে তৎক্ষণাৎ পূরণ করে দিত।

"গুরুর সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করে আফজল ক্রমশঃ তার ক্ষমতার অপব্যবহার করতে শুরু করল। যে কোন জিনিস সে একবার মাত্র ছুঁয়ে আবার রেখে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে সেটা একেবারে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যেত। এই রকম হাতসাফাই-এর ব্যাপার দেখে লোকে কেউ বড় একটা তাকে আর ঘরে আনতে চাইত না।

"মাঝে মাঝে সে কলকাতার বড় বড় সোনারূপার দোকানে গিয়ে উপস্থিত হতো। দোকানদার ভাবত, বুঝিবা বড়দরের কোন খদ্দের এল।

আফজল কোন গহনা নেড়েচেড়ে রেখে দিয়ে দোকান থেকে বেরোবার পরই সে'সব একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেত!

"তার কেরামতি শিখে নেবার আশায় শত শত ছাত্র তাকে প্রায়ই ঘিরে থাকত। সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য আফজল মাঝে মাঝে তাদের ডাকত। স্টেশনে গিয়ে একগোছা টিকিট নিয়ে দেখেশুনে তা আবার ফিরিয়ে দিয়ে বলত, 'নাঃ, আজ আর আমাদের যাওয়া হল না, এখন আর টিকিট কিনব না।' বলে কেরাণীকে টিকিটগুলো ফেরৎ দিয়ে সটান রেলে গিয়ে চেপে বসত। তখন দেখা যেত যে, ঠিক সেই টিকিটগুলোই আবার তার হাতে এসে পৌঁছে গেছে।*

"এইরকম লোকঠকানো জবরদস্তি আর জুলুমবাজি দেখে লোকে রেগে আগুন হয়ে উঠল। বাঙ্গালী গহনা ব্যবসায়ী আর স্টেশনের টিকিটবেচা কেরাণীর দল তো ভয়ে কাঁটা। পুলিশও প্রমাণের অভাবে তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে নিরুপায় হয়ে পড়ে। আফজল কেবল একবারমাত্র বললেই হল, 'হজরত এসব হটাও!' ব্যাস্, সঙ্গে সঙ্গে সাফ্!"

শ্রীযুক্তেশ্বরজী আসন ছেড়ে উঠে পড়ে গঙ্গার ধারে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম, উদ্দেশ্য — আফজলের এইসব আশ্চর্য কাণ্ডকারখানার আরও কিছু ব্যাপার শুনব।

গুরুজী বলে চলেন, "এই 'পন্থী' বাড়ীটি আগে আমার এক বন্ধুর ছিল। আফজলের সঙ্গে আলাপ হতে সে একদিন তাকে এখানে ডেকে আনল। সেই সঙ্গে বন্ধুটি আরও জনাকুড়িক পাড়াপ্রতিবেশীদেরও ডাকলো; তাদের মধ্যে আমিও একজন। আমার তখন যুবা বয়স আর এই দুষ্টু ফকিরের ভোজবাজির খেলা দেখবার জন্যে মনে তখন খুবই আগ্রহ।" গুরুদেব হেসে বললেন, "এধারে কিন্তু ঠিক হুঁশিয়ার ছিলাম। দামী কোন কিছুই পরে যাই নি। আফজল আমার আপাদমস্তক বেশ ভালভাবে নিরীক্ষণ করে নিয়ে বলল, 'দেখছি তোমার হাত দু'টি বেশ মজবুত। আচ্ছা নীচে বাগানে চলে যাও; গিয়ে একটা বেশ চকচকে পাথর নিয়ে তার ওপর

---

* আমার পিতা পরে আমায় বলেছিলেন যে, তাঁদের বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানীও আফজলের হাতে এমনিভাবে ঠকেছিল।

তোমার নাম লিখে গঙ্গার জলে যতদূর পারো জোরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এস।'

"হুকুম তো তামিল করে এলাম। যখন গঙ্গার জলের ভিতর পাথরটি টুপ করে পড়ে ডুবে গেল, ফকিরসাহেব তখন বলল, 'একটা পাত্রে গঙ্গার জল ভরে এই বাড়ীর সামনে এনে রাখ।' পাত্রটি জল ভরে এনে রাখতেই ফকিরসাহেব চিৎকার করে বলে উঠল, 'হজরত, এই পাত্রের ভিতর পাথরটি এনে রাখ!'

"তখনই পাথরটি তার ভিতর এসে গেল। হাত ঢুকিয়ে পাথরটি বার করে নিয়ে দেখলাম যে, আমার সই যেমনটি করেছিলাম ঠিক তেমনি পরিষ্কারই রয়েছে।

"— বাবু* আমার এক বন্ধুও, সেই ঘরে উপস্থিত ছিল। সে একটি ভারী পুরোন সোনার ঘড়ি আর তার চেন পরেছিল। ফকিরসাহেব তাদের হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে খুব তারিফ করল। সঙ্গে সঙ্গেই সে দু'টি হাওয়া হয়ে গেল!

"—বাবু ত' প্রায় কেঁদেই ফেলে। কাকুতিমিনতি করে বলতে লাগল, 'আফজল, ও আমার বহুদিনের পৈতৃকসম্পত্তি, দয়া করে আমায় ফিরিয়ে দাও।'

ফকিরসাহেব নিতান্ত অনাসক্তভাবে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, তারপর বলল, 'দেখ, তোমার লোহার সিন্ধুকে পাঁচশ টাকা আছে। সেগুলো নিয়ে এসো; তবেই বলে দেব কোথায় তোমার ঘড়ি ও ঘড়ির চেন আছে।'

"উদ্‌ভ্রান্ত" —বাবু ত' তখনি দৌড়ল বাড়ীর দিকে। খুব শীগগির ফিরে এসে পাঁচশটি টাকা আফজলের হাতে তুলে দিল।

"ফকিরসাহেব তখন যেন নিতান্ত অনুকম্পাবশতঃই বাবুকে বলল, 'তোমার বাড়ীর কাছে যে ছোট্ট সাঁকোটা আছে সেখানে যাও আর দেখ,

* শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সেই বন্ধুটির নাম আমার ঠিক মনে নেই বলে শুধু "—বাবু" সম্বোধন করলাম।

যেতে যেতে হজরতকে ডেকে তোমার ঘড়ি, ঘড়ির চেন সব ফেরৎ দিয়ে দিতে বোলো; তা হলেই তুমি তোমার সব জিনিস ফেরৎ পাবে।'

"—বাবু তো তাড়াতাড়ি ছুটলো। ফিরল কিছুক্ষণ বাদে। মুখে নিশ্চিন্ত হাসি — তবে সঙ্গে আর ঘড়িটড়ি কিছুই নেই!

"—বাবু বলল, 'ফকিরসাহেবের কথামত যেমনি হজরতকে ডেকেছি অমনি যেন শূন্য থেকে ঘড়িটড়ি সব আমার ডান হাতের উপর ঝুপ করে এসে পড়ল। বাব্বাঃ, আর তা এখানে নিয়ে আসি! সোজা বাড়ীতে গিয়ে একেবারে সিন্দুকে তাদের বন্ধ করে রেখে তবে তোমাদের এখানে আসছি।'

"ঘড়ির মুক্তিপণ আদায়ের এই আনন্দ-নিরানন্দের নাটকের সাক্ষী, —বাবুর বন্ধুরা সব অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে আফজলের দিকে তাকাল। ফকিরসাহেব তখন যেন সান্ত্বনা দেবার মতলবেই আবার আরম্ভ করল, 'আচ্ছা, তোমরা কি পানীয় চাও বল। হজরত এখনি তা এনে দেবে।'

"জনকতক দুধ চাইল, কেউ কেউ আবার ফলের রস খেতে চাইল। বাবু খেতে চাইল হুইস্কি —যদিও তাতে আমি খুব বেশি আশ্চর্য হই নি। ফকিরসাহেব হুকুম করল। অনুগত হজরত মুখবন্ধ পানীয়ের পাত্রগুলো সব যেন শূন্য থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল, আর তা সব ঠকাস ঠকাস করে মেঝের উপর এসে পড়তে লাগল। একে একে সবাই তাদের ফরমাসী জিনিসগুলো পেল।

"তারপর চার নম্বরের ব্যাপারটি হচ্ছে আরও অদ্ভুত!

"আফজল বলল যে, সে এখানে বসে বসেই সবাইকে এক বিরাট ভোজ খাওয়াতে পারে। প্রস্তাবটি আমাদের গৃহস্বামীর কাছে অতিশয় মনোরম ও সুখপ্রদ বলেই বোধ হল।

"—বাবুর ঘা তখনও শুকোয় নি, মনে তখনও দারুণ জ্বালা ছিল। মুখটা হাঁড়ি করে বলল, 'আমার পাঁচশ টাকা তো গেছে, তা যাক, তার বদলে আমি রাজারাজড়াদের মত সোনার থালায় বিরাট ভোজ চাই।'

উপস্থিত সবাই নিজের নিজের পছন্দের কথা জানানো মাত্র, ফকিরসাহেব তখন সেইসব হজরতকে হুকুম করল। সঙ্গে সঙ্গে বাসনপত্রের একটা ঝনঝনানির শব্দ উঠল আর সোনার থালার উপর গরম লুচি, নানারকমের অতি উপাদেয় আর সুস্বাদু তরকারী, ব্যঞ্জন প্রভৃতি নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর সুখাদ্য, বহুপ্রকারের অসময়ের ফল — সব যেন শূন্য থেকেই আবির্ভূত হয়ে আমাদের পায়ের কাছে এসে পড়তে লাগল। খাবারদাবার ছিল অতি চমৎকার। ঘণ্টাখানেক ধরে খাওয়াদাওয়া শেষ করে আমরা ঘর ছেড়ে বেরোতে গেলাম। একটা ভীষণ শব্দ — বাসনপত্রের ঝনঝনানির মত, মনে হল কেউ যেন থালাবাটি সব গুছোচ্ছে। শুনে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি ঝকঝকে সোনার বাসনকোসন, এমন কি উদ্বৃত্ত ভোজ্যদ্রব্যের কোন চিহ্নমাত্রও নেই!" জিজ্ঞাসা করলাম, "গুরুজী, আফজল যদি এমনভাবে সোনার বাসনকোসন আমদানি করতে পারে, তবে আবার তার পরের ধনে লোভ করা কেন?"

শ্রীযুক্তেশ্বরজী ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন, "দেখ, ঐ ফকিরের কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি খুব বেশি দূর হয়নি। তার যোগের একটা প্রক্রিয়াবিশেষের উপর দখল থাকাতে সে তার যে কোন ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ কার্যে পরিণত করতে পারত। হজরত নামে জনৈক বিদেহীর সাহায্যে, ফকিরসাহেব তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে যে কোন ঈপ্সিত বস্তুর অণুপরমাণু নিয়ে ইথার বা ব্যোমশক্তি দিয়ে সেই জিনিসটি তৈরী করে নিতে পারত। কিন্তু এই রকম ভৌতিকপ্রক্রিয়ার তৈরী জিনিস বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।* কাজেই আফজলকে এই পৃথিবীরই ধনরত্ন আহরণ করবার চেষ্টায় থাকতে হত, যা কষ্ট করে উপার্জন করলে দীর্ঘস্থায়ী হয়।" আমি হেসে বললাম, "কিন্তু তাও ত' কখন কখন একেবারে বিনা কারণেই উড়ে যায়, ধরে রাখতে পারা যায় না।"

গুরুজী বলতে লাগলেন, "আফজলের কোনরকম ঈশ্বরানুভূতি বা ভগবদ্‌জ্ঞান ছিল না। স্থায়ী আর মঙ্গলজনক কোন অলৌকিক ক্রিয়া

---

* যেমন শূন্য থেকে আসা আমার রূপোর মাদুলিটি শেষ পর্যন্ত এ পৃথিবী থেকে অদৃশ্যই হয়ে গিয়েছিল। (৪৩ পরিচ্ছেদে সূক্ষ্মলোকের কথা দ্রষ্টব্য)।

কেবল খাঁটি সাধুসন্তরাই দেখাতে পারেন, কারণ তাঁরা সর্বশক্তিমান জগৎস্রষ্টার সঙ্গে একইসুরে বাঁধা। আফজল ছিল নেহাৎই সাধারণগোছের একজন মানুষ; কেবল তার এইটুকুমাত্র অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, সে এমন এক সূক্ষ্মস্তরে প্রবেশ লাভ করতে পারত, যেখানে সাধারণতঃ কোন মরজগতের লোক মৃত্যু না হলে প্রবেশ করতে পারে না।"

"এখন সব বুঝলাম, গুরুদেব! তা হলে পরজগতেও বেশ কিছু আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে দেখছি।"

গুরুদেব বললেন, "তা আছে বৈকি। কিন্তু সেদিনের পর থেকে আমি আর আফজলকে কখনও দেখিনি। বছরকতক পরে —বাবু আমার বাড়ীতে এসে খবরের কাগজ খুলে দেখাল যে, সেই মুসলমান যাদুকরটির একটা প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি সেখানে বেরিয়েছে। তাই থেকেই আমি তোমায় এইমাত্র যা বললাম, সেই আফজলের ছেলেবেলায় এক হিন্দুগুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার কথা জানতে পারি।"

খবরের কাগজে আফজলের যে স্বীকারোক্তি বেরিয়েছিল, তার শেষ অংশের সারটুকু শ্রীযুক্তেশ্বরজীর যেটুকু স্মরণে ছিল, তা মোটামুটি হচ্ছে এইরকম : "আমি আফজল খাঁ, আমার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আর যারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে চায় তাদের সাবধান করে দেবার জন্যে এই কথাগুলো লিখছি। ভগবৎকৃপায় আর গুরুদত্ত ক্ষমতাবলে আমি যে অদ্ভুতশক্তি হস্তগত করেছিলাম, বছরের পর বছর ধরে তার অপব্যবহার করে এসেছি। আত্মগরিমায় পূর্ণ হয়ে ভেবেছিলাম যে, আমি সুনীতি-দুর্নীতির সাধারণ নিয়মকানুনের বহু ঊর্ধ্বে। আমার শেষবিচারের দিন অবশেষে ঘনিয়ে এল।

"সম্প্রতি কলকাতার বাইরে একটি বৃদ্ধলোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। লোকটি অতিকষ্টে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল; হাতে ছিল একটি চক্‌চকে জিনিস, দেখতে সোনারই মত। মনে দারুণ লোভ হল। লোকটিকে ডেকে বললাম, 'দেখ, আমি একজন বড় দরের ফকির, নাম আফজল খাঁ। তোমার হাতে ওটা কি?'

"এটি একটি সোনার তাল; সংসারে এইটিই আমার সর্বস্ব। তা এতে আপনার মত ফকির মানুষের কি দরকার বলুন? যাইহোক মশায়, আপনাকে মিনতি করি — আমার খুঁড়িয়ে হাঁটাটা সারিয়ে দিন!"

"আমি সোনার তালটি ছুঁয়ে কোন কথাবার্তা না বলেই চলতে শুরু করে দিলাম। বুড়োমানুষটি আমার পিছন পিছন খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, 'সোনা, কৈ আমার সোনা কোথায় গেল, এ্যাঁ?'

"তার দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না করে এগোতেই লোকটি হঠাৎ বজ্রনির্ঘোষে বলে উঠল, 'কি, তুমি আমায় চিনতে পারছ না?'

"ফিরে তাকাতেই আমার বাক্‌শক্তি একেবারে লোপ পেল। ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেলাম। দেখি যে সেই নেহাৎ সাধারণগোছের বৃদ্ধ খঞ্জব্যক্তিটি আর কেউ নন — সেই সাধুশ্রেষ্ঠ স্বয়ং, যিনি বহুদিন পূর্বে আমায় যোগসাধনে দীক্ষিত করেছিলেন। তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, সঙ্গে সঙ্গে শরীরও দেখতে দেখতে বেশ জোয়ান আর শক্তিশালী হয়ে গেল।

"গুরুদেবের চোখে তখন আগুন জ্বলছিল। বললেন, 'বটে, তোমার এই কীর্তি? আজ আমি নিজের চোখে দেখলাম যে, তুমি দীনদুঃখীর উপকারের জন্যে না করে, একটা সাধারণ চোরের মত তোমার ক্ষমতার অপব্যবহার করছ! যাক্, আজ থেকে আর তোমার কোন গুপ্ত ক্ষমতাই থাকবে না, সব আমি কেড়ে নিলাম। হজরত এখন তোমার কাছ থেকে মুক্তি পেল — বাংলাদেশে কেউ আর তোমায় এখন ভয় করবে না।'

"উদ্বেগাকুল কণ্ঠে হজরতকে ডাকলাম; এই প্রথম আমি অনুভব করলাম, অন্তরে আর তার কোন সাড়া পাচ্ছি না। কিন্তু হঠাৎ যেন চোখের উপর থেকে একটা কালো পর্দা সরে গেল; আমার ঘৃণ্য অপবিত্রজীবনের ছবি আজ আমি স্পষ্টরূপে দেখতে পেলাম।

"গুরুজী, আপনি আমার জীবনের সুদীর্ঘ ভ্রান্তি দূর করে দিতে এসেছেন বলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ — বলে তাঁর পা জড়িয়ে

ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললাম ঃ 'গুরুদেব, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, সংসারের যা কিছু কামনা-বাসনা সব আজ থেকে ত্যাগ করলাম। এবার আমি পাহাড়ে গিয়ে নির্জনে ভগবচ্চিন্তায় কাল কাটাব; মনে হয় তাতে আমার পাপজীবনের প্রায়শ্চিত্ত হবে।'

"আমার গুরু নীরব অনুকম্পায় আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে অবশেষে বললেন, 'তোমার কথায় আন্তরিকতা আছে বুঝতে পারছি। যাইহোক, তোমার ছেলেবেলায় গুরুআজ্ঞাপালন আর বর্তমান অনুতাপ দেখে তোমায় আমি একটিমাত্র বর দিয়ে যাব। যদিও তোমার অন্য সব ক্ষমতা এখন চলে গেছে, তবুও যখনই তোমার কেবলমাত্র অন্নবস্ত্রের অভাব হবে, হজরতকে ডাকলে তা এনে দেবার জন্যে তখনই তার সাড়া পাবে। যাও, এখন কোন পাহাড়ের নির্জনতায় ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ করবার জন্যে মনপ্রাণে তপস্যা কর।'

"আমার গুরুদেব এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সম্বল রইল কেবল শুধুই চোখের জল আর ভাবনা। আজ আমি সেই পরমদয়াল পরমপিতার ক্ষমালাভের আশায় যাত্রা শুরু করলাম। বিদায়! এ সংসার, বিদায়!"

১৯ পরিচ্ছেদ

কলিকাতাস্থ গুরুদেবের শ্রীরামপুরে আবির্ভাব

"পন্থী" ছাত্রাবাসে আমার ঘরে আর একজন সঙ্গী থাকতেন, নাম তাঁর দ্বিজেনবাবু। দ্বিজেনবাবুকে আমার গুরুদর্শনের জন্যে আহ্বান জানাতে তিনি একদিন বলে ফেললেন, "দেখুন, ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমার প্রায়ই সন্দেহ হয়। তবুও মাঝে মাঝে চিত্তবিক্ষোভকারী একটা অনুমান গোছের ভাব মনকে বড়ই উতলা করে তোলে ঃ আত্মিক ব্যাপারের অনেক কিছু সম্ভাবনা অনাবিষ্কৃত থাকতে পারে না কি? মানুষ যদি সে সব খুঁজে বার করতে নাই পারে, তাহলে সেকি তার আসল নিয়তিকেই হারিয়ে ফেলে না?"

আমি বললাম, "গুরুদেব আপনাকে 'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষিত করলে, তাতেই আপনার অন্তরে ঈশ্বরে বিশ্বাস এনে দিয়ে মনের সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দেবে, দেখবেন।"

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা দ্বিজেনবাবু আমার সঙ্গে আশ্রমে গেলেন। গুরুদেবের কাছে এসে বন্ধুবর মনে এমন এক অপূর্ব গভীর আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করলেন যে, শীগগিরই তিনি নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে দিলেন।

দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ কর্মপ্রচেষ্টা মানুষের গভীরতম প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়; জ্ঞানাকাঙক্ষাও মানুষের মনের স্বাভাবিক ক্ষুধা। শ্রীযুক্তেশ্বরজীর কথায় দ্বিজেনবাবু তাঁর এই নশ্বর জীবনে ক্ষুদ্র 'আমি'র জায়গায় অন্তরের মধ্যে তাঁর পূর্ণ আত্মস্বরূপকে খুঁজে বার করবার চেষ্টায় উৎসাহ পেলেন।

দ্বিজেন ও আমি একসঙ্গে শ্রীরামপুর কলেজে বি. এ. পড়তাম। ক্লাস শেষ হলেই বেড়াতে বেড়াতে উভয়ে মিলে আশ্রমে গিয়ে হাজির হতাম।

প্রায়ই দেখতে পেতাম — দোতলার বারান্দায় শ্রীযুক্তেশ্বরজী আমাদের আসতে দেখে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

একদিন বৈকালে দেখি যে, কানাই নামে একটি বালক ব্রহ্মচারী দ্বিজেন আর আমাকে দরজায় ঢুকতে দেখেই দুঃসংবাদ দিল, "গুরুদেব এখানে নেই; কি একটা জরুরী খবর পেয়ে তিনি কলকাতায় চলে গেছেন!"

তার পরদিনই গুরুদেবের কাছ থেকে একটি পোষ্টকার্ড পেলাম। তিনি লিখেছেন, "বুধবার সকালে কলকাতা থেকে রওনা দেব। তুমি আর দ্বিজেন শ্রীরামপুর স্টেশনে সকাল ন'টার ট্রেনটা দেখো।"

বুধবার সকালে প্রায় সাড়ে আটটার সময় অনবরত মনে হতে লাগল, যেন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছ হতে টেলিপ্যাথিযোগে একটা সংবাদ আসছে — তা হচ্ছে এই, "আমি আটকা পড়ে গেছি। ন'টার গাড়ী আর দেখো না।"

টাটকা খবরটা দ্বিজেনকে যখন দিলাম, স্টেশনে যাবার জন্যে তখন সে জামাকাপড় পরে একেবারে তৈরী।

বন্ধুবর বিদ্রূপের স্বরে বললেন, "রাখুন আপনার ও সব মনের ভিতরকার অনুভূতি! আমি গুরুদেবের লেখা কথাই বেশি বিশ্বাস করি।"

কি আর করি, একটু নড়েচড়ে চুপচাপ বসেই রইলাম। রাগে গজগজ করতে করতে দ্বিজেন দড়াম করে দরজা বন্ধ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

ঘরটা কিছু অন্ধকার বলে আমি রাস্তার ধারের জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ক্ষীণ সূর্যালোক হঠাৎ যেন এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃতে ঝলসে উঠল, আর তাতে লোহার গরাদ দেওয়া জানলা একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই আলোকের পটভূমিতে পরিষ্কার দেখতে পেলাম, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে আবির্ভূত হয়েছেন।

এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপারের হঠাৎ ধাক্কাতে বিভ্রান্ত হয়ে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে তাঁর পায়ের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে বসলাম।

চিরাভ্যস্তভাবে তাঁর পাদুকাযুগল স্পর্শ করে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করলাম। দড়ির সোলদেওয়া গেরুয়ারঙের ক্যাম্বিসের তাঁর সেই পাদুকাযুগল আমার অতিপরিচিত। তাঁর গেরুয়াবসন হাওয়ায় উড়ে আমার গাত্রস্পর্শ করছিল। তাঁর পরিধেয় বসনই শুধু নয়, তাঁর সেই ধূলোবালিমাখা জুতোজোড়া আর তার ভিতরে চেপেবসা তাঁর পায়ের আঙুলগুলোও বেশ স্পষ্টই অনুভব করলাম। বিস্ময়ে অবাক হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কেবল তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

"তুমি যে আমার টেলিপ্যাথি বার্তা জানতে পেরেছ, তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি।" গুরুদেবের স্বর শান্ত আর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। "আমার কলকাতার কাজ এবার শেষ হয়েছে। দশটার গাড়ীতে শ্রীরামপুর আসছি।"

হতবাক হয়ে তখনও ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি দেখে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, "এ আমার 'ভূত' নয়, আমার রক্তমাংসেরই শরীর। ঈশ্বরের আজ্ঞায় তোমায় এ অভিজ্ঞতা দিলাম, পৃথিবীতে যা লাভ করা একান্তই দুর্লভ। স্টেশনে এসো; তুমি আর দ্বিজেন আমায় এই বেশেই তোমাদের দিকে আসতে দেখবে। আর সেই সঙ্গে আমার আগে আগে একটি ছোট ছেলে একটা রূপোর জগ নিয়ে আসছে — তাও দেখতে পাবে।"

মাথার উপর তাঁর দু'টি হাত রেখে গুরুদেব অস্ফুটস্বরে আমায় আশীর্বাদ করলেন। তারপর "তবে আসি" এই দু'টি কথা বলা যেই শেষ হলো, অমনি একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড়ানি শব্দ শোনা গেল।*

সেই চোখঝলসানো আলোর মধ্যেই তাঁর শরীর যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে লাগল। প্রথমে তাঁর পায়ের পাতা আর পা দু'টি অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তাঁর দেহকাণ্ড আর মস্তক — ঠিক যেন একটা ছবি গুটিয়ে যাবার মত। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারছিলাম যে, তাঁর আঙুলগুলি আলতোভাবে আমার চুল ছুঁয়ে রয়েছে। সেই অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃও সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। গরাদ দেওয়া জানলা, আর ম্লান সূর্যের আলো ছাড়া সামনে আর কিছুই রইল না।

---

* শরীরকোষের অণুপরমাণু বিশ্লিষ্ট হওয়ার বিশিষ্ট শব্দ।

খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম; মনে মনে ভাবতে লাগলাম, ছায়াবাজি দেখলাম না কি? ভগ্নমনোরথ দ্বিজেন সেইমুহূর্তে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলো।

বন্ধুবর খানিকটা অনুতপ্ত স্বরেই বলল, "গুরুদেব ন'টার গাড়ীতে এলেন না, সাড়ে ন'টারটাতেও নয়।"

"তাই না কি? আমি কিন্তু ঠিক জানি তিনি দশটার গাড়ীতেই আসছেন।" "আসুন, আসুন," বলেই তাঁর আপত্তিতে কর্ণপাত না করে তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে স্টেশনের দিকে ছুটলাম। মিনিটদশেকের ভিতরে স্টেশনে এসে পৌঁছিলাম; ট্রেন এর মধ্যে পৌঁছে গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

আনন্দে চিৎকার করে বলে উঠলাম, "দেখুন, দেখুন, সারা ট্রেনটা গুরুদেবের জ্যোতিঃর ছটায় পূর্ণ হয়ে গেছে। ঐ তিনি ওখানে।"

দ্বিজেন ঠাট্টা করে হেসে বলল, "স্বপ্ন দেখছেন না কি?"

বললাম, "আসুন, এখানে দাঁড়ান যাক।" তারপর কি রকম করে গুরুজী আমাদের কাছে আসবেন তাও বন্ধুবরের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে দেখা গেল — সেই একই জামাকাপড় পরা যা একটু আগেই দেখেছিলাম। ধীরে ধীরে তিনি আসছিলেন, সামনে একটি ছোট ছেলেও আসছিল রূপোর জগ হাতে করে।

আমার অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা স্মরণ করে মনের মধ্যে একটা ভয়ের শীতল শিহরণ বয়ে গেল। মনে হল, এই বিংশ শতাব্দীর জড়যুগে আমাদের এই বর্তমান জগৎ যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে; আমি কি সেই প্রাচীন যুগে ফিরে গেছি, যখন যীশুখ্রিস্ট সমুদ্রের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে পিটারের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন?

বর্তমান যুগের মহাযোগী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন, যেখানে দ্বিজেন আর আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বন্ধুর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে গুরুদেব বললেন, "তোমাকেও তো আমি খবর পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তা ধরতে পারনি।"

দ্বিজেন নীরবই ছিলেন, কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। গুরুদেবকে আশ্রমে পৌঁছিয়ে দিয়ে দ্বিজেন আর আমি শ্রীরামপুর কলেজের দিকে এগোলাম। রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে দ্বিজেন বললেন, "ওঃ, তাই বলুন! গুরুদেব আমাকেও খবর পাঠিয়েছিলেন আর আপনি তা চেপে রেখেছেন! এর কি কৈফিয়ৎ আপনার আছে, বলুন তো?" রাগে তার সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছিল।

আমি উত্তর দিলাম, "আপনার মনের আয়না যদি এতই চঞ্চল হয়ে পড়ে যে তাতে গুরুদেবের উপদেশের কোন ছাপ পড়তে না পায়, তাহলে আমি আর কি করব বলুন?"

দ্বিজেনবাবুর মুখ থেকে ক্রোধের ছায়া অন্তর্হিত হল। তিনি অনুতপ্তস্বরে বললেন, "এখন আমি আপনার কথার মানে বুঝতে পারছি। আচ্ছা, রূপোর জগ নিয়ে ঐ ছেলেটার আসার কথা কি করে জানতে পারলেন?"

সেইদিন সকালে আমাদের ছাত্রাবাসে গুরুজীর আবির্ভাবের অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা যখন শেষ করলাম, ততক্ষণে আমরা কলেজে পৌঁছে গেছি।

সব শুনে দ্বিজেনবাবু শুধু বললেন, "গুরুদেবের অলৌকিক ক্ষমতার কথা যা এইমাত্র আপনার মুখ থেকে শুনলাম, তাতে মনে হয় — পৃথিবীর যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় এ সবের কাছে একটা শিশুপাঠশালা ছাড়া আর কিছুই নয়!"*

* "মধ্যযুগের দার্শনিকদের রাজা" সেণ্ট টমাস্ একুইনাস্‌কে তাঁর কর্মসচিব "Summa Theologiae" শেষ করবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করাতে, প্রত্যুত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, "এমন সব জিনিস আমার সামনে প্রকাশিত হয়েছে যে, আমি এ পর্যন্ত যা কিছু লিখেছি, তাদের মূল্য আমার চোখে একগাছি তৃণের চেয়ে বেশি নয়।" ১২৭৩ সালে একদিন নেপল্‌স্-এর একটি গির্জায় ভজন গানের সময় সেণ্ট টমাসের এক গভীর অতীন্দ্রিয় অন্তর্জ্ঞান লাভ হয়। আর এই দিব্যজ্ঞানলাভের মহিমা তাঁকে এতদূর অভিভূত করেছিল যে, তারপর থেকে তিনি আর বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞানানুশীলনে তেমন কোন আগ্রহ বোধ করেন নি।

(প্লেটোর ফিড্রাসে) সক্রেটিসের বাক্যগুলি তুলনীয় ঃ— "আমার বিষয়ে যা কিছু আমি জানি তা হচ্ছে এই যে, আমি কিছুই জানি না।"

২০ পরিচ্ছেদ

কাশ্মীর ভ্রমণে বাধা

পিতার কাছে গিয়ে একদিন বললাম, "বাবা, গ্রীষ্মের ছুটিতে গুরুদেব আর জনচারেক বন্ধুকে নিয়ে হিমালয়ের দিকে একটু বেড়িয়ে আসব বলে মনে করছি। খানছয়েক রেলের পাস আর বেড়াবার খরচের জন্যে কিছু টাকা দেবেন কি?"

যা মনে করেছিলাম তাই, পিতা শুনে হো হো করে হেসে উঠে বললেন, "এইবার নিয়ে তিনবার হল তোমার ও সব আজগুবী মতলব শোনাচ্ছ। গত বছর গ্রীষ্মের ছুটির সময়, আর তার আগের বছরেও কি ও রকম কথা শোনাওনি? শেষমুহূর্তে শ্রীযুক্তেশ্বরজী বেঁকে বসবেন আর তাঁর যাওয়াও হবে না!"

"সত্যি বাবা, গুরুদেব কেন যে কাশ্মীরে যাবার পাকা কথা দেন না, তা জানি না।* কিন্তু যদি আমি এবার বলি যে, কাশ্মীরে যাবার জন্যে আপনার কাছ থেকে এর মধ্যেই পাস নিয়ে রেখেছি, তাহলে মনে হয় কোন না কোন রকমে বেড়াতে যাবার জন্যে এবার তাঁকে রাজি করাতে পারব।"

আমার কথায় পিতার যে খুব বিশ্বাস হল তা নয়; তবে তার পরদিন সকালে পিতা আমার হাতে ছ'টি রেলপাস আর খানকতক দশটাকার নোট দিয়ে একটু রসাল টিপ্পনী কেটে বললেন, "দেখ, তোমার ওরকম ফাঁকা মতলবে এমন সব নিরেট জিনিসের প্রয়োজন কেন, তাও তো বুঝতে পারছি না। তা যাইহোক, এগুলো এখন তোমার কাছেই রাখ।"

সেই দিনই বিকালবেলা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে আমার যোগাড়যন্ত্রের সব ব্যবস্থা দেখালাম। আমার উৎসাহ দেখে যদিও তিনি

---

* দু'বার গ্রীষ্মের ছুটিতে কাশ্মীর ভ্রমণে অনিচ্ছায় গুরুদেব কোন কিছু কারণ না দর্শালেও মনে হয় যে, সেখানে তাঁর অসুস্থ হয়ে পড়ার সময় যে তখনও উপস্থিত হয় নি, তার পূর্বাভাস তিনি পেয়েছিলেন।

হাসলেন, কিন্তু কিছু পাকা কথা দিলেন না, শুধু বললেন, "যেতে তো ইচ্ছে, দেখা যাক কি হয়।" আশ্রমের তরুণ শিষ্য কানাইয়ের আমাদের সঙ্গে যাওয়ার কথাতে কোন মন্তব্যই প্রকাশ করলেন না। আরও তিনটি বন্ধুকে যাবার জন্য বললাম — রাজেন্দ্রনাথ মিত্র, যতীন আঢ্য ও আর একটি ছেলে। তার পরের সোমবার আমাদের যাত্রার দিন স্থির হল।

শনি, রবি — এ দু'দিন কোলকাতাতেই রইলাম। আমাদের বাড়ীতে এক খুড়তুতো ভাইয়ের তখন বিয়ে লেগেছে। সোমবার খুব সকালেই মালপত্র নিয়ে শ্রীরামপুর পৌঁছলাম। আশ্রমের দরজায় রাজেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। বলল, "গুরুদেব বেড়াতে বেরিয়েছেন। তিনি যাবেন না বলে দিয়েছেন।"

ক্ষোভ যেমনি হল, জেদও তেমনি চাপল। বললাম, "কাশ্মীর যাওয়ার ফাঁকা কথা বলে বাবাকে আর এবার নিয়ে তৃতীয় কষ্টের জন্য খোঁটা দেবার সুযোগ দিচ্ছিনা। চল, আমরাই সব এবার যাব।"

রাজেন্দ্র রাজী হয়ে গেল; আমি আশ্রম ছেড়ে বেরুলাম একটা চাকর জোগাড় করবার জন্যে। আমি জানতাম — কানাই গুরুদেবকে ছেড়ে কোথাও বেরোবে না। আর মালপত্র প্রভৃতি দেখাশোনা করবার জন্য একজন লোকও তো চাই। বেহারীর কথা মনে এল, আগে আমাদের বাড়ীতে কাজ করতো, তখন শ্রীরামপুরে এক স্কুল শিক্ষকের কাছে রয়েছে; তাড়াতাড়ি করে এগোতে গিয়ে শ্রীরামপুরের কাছারির কাছে খ্রিস্টান গির্জার সামনে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় চলেছ?" শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মুখে এতটুকুও হাসি নেই। বললাম, "গুরুদেব, শুনলাম যে আপনি আর কানাই আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না। এখন বেহারীকে খুঁজছি। আপনার বোধহয় মনে আছে — গতবার সে কাশ্মীর যাবার জন্যে এতদূর আগ্রহ দেখিয়েছিল যে, আমাদের সঙ্গে বিনা মাইনেতেও যেতে রাজী ছিল।"

"মনে আছে। যাইহোক, বেহারীর এবার যে যাবার ইচ্ছে আছে বলে তো আমার বোধ হয় না।"

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, "সে যাবার জন্যে এবার পা বাড়িয়ে বসে আছে, দেখবেন!"

গুরুজী নীরবে আবার চলতে শুরু করলেন। শীগগিরই সেই স্কুল শিক্ষকের বাড়ী পৌঁছলাম। বেহারী তখন উঠানে কি করছিল, আমাকে দেখেই একগাল হেসে কাছে এসে দাঁড়াল; কিন্তু কাশ্মীর যাওয়ার নাম শুনেই তার সব হাসি উড়ে গেল। মনে মনে কিছু বলতে বলতে বেহারী মনিবের বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল। আধঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছি, মনে মনে ভাবছি যে, যাবার জন্যে বাঁধাছাঁদা গোছগাছ করছে বলেই বুঝি বেহারীর দেরি হচ্ছে। শেষে আর থাকতে না পেরে সদর দরজায় ঘা দিলাম। একটা লোক বেরিয়ে এসে বলল যে, বেহারী প্রায় আধঘণ্টা আগে খিড়কিদরজা দিয়ে সরে পড়েছে। একটু মুচকিহাসিও তার ঠোঁটে দেখা গেল।

কি করি, নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে প্রস্থান করলাম। ভাবলাম তাকে নিয়ে যেতে চাওয়াটা কি খুব বেশি জবরদস্তি হয়েছে নাকি গুরুজীর অদৃশ্য প্রভাব এখানেও কাজ করছে। খ্রিস্টানদের গির্জা পেরিয়ে দেখি, গুরুদেব আস্তে আস্তে আমার দিকেই আসছেন। আমার কথা শোনবার অপেক্ষা না করেই তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "তাহলে বেহারীও আর যাচ্ছে না। এখন তোমাদের মতলব কি?"

রাশভারী বাপের কথাও যে অমান্য করে, তেমনি একগুঁয়ে ছেলের মত আমি জবাব দিলাম, "গুরুদেব, এখন খুড়োমশায়ের কাছে গিয়ে একবার দেখি, তাঁর চাকর লালধারীকে পাওয়া যায় কি না!"

একটু হেসে শ্রীযুক্তেশ্বরজী বললেন, "দেখতে চাও, দেখ। কিন্তু মনে হয় না যে বেড়াতে গিয়ে খুব বেশি আনন্দ পাবে।"

ভয় হলেও, তবু জেদ করেই গুরুদেবকে ছেড়ে শ্রীরামপুরের কাছারি বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলাম। খুড়োমশায় শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ, ওখানকার সরকারী উকিল, আমায় সস্নেহে অভ্যর্থনা করলেন।

তাঁকে বললাম, "গুটিকতক বন্ধুবান্ধব নিয়ে আজ আমি কাশ্মীর বেড়াতে যাচ্ছি। অনেকদিন ধরেই এই হিমালয়ে বেড়ানোর ইচ্ছেটা রয়েছে।"

"তাই না কি, মুকুন্দ, শুনে খুশী হলাম; তা যাক, তোমাদের বেড়ানটুকু যাতে বেশ আরামের হয়, তার জন্যে আমি কি করতে পারি, বল?"

এই স্নেহমধুর সম্ভাষণে বুকে অনেকটা সাহস এল। বলে ফেললাম, "ন'কাকা, আপনার লালধারীকে আমাদের সঙ্গে যদি যেতে দেন, তাহলে ভারী উপকার হয়।"

ব্যাস, আর যায় কোথায়। একেবারে ভূমিকম্প আর অগ্ন্যুৎপাত একসঙ্গে ঘটে গেল! খুল্লতাতমহাশয় এরূপ প্রবলবেগে লাফিয়ে উঠলেন যে তাঁর চেয়ারটি উল্টে গেল, ডেস্কের উপরকার কাগজপত্র চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, হাত থেকে হুঁকো মাটির উপর ঠকাস করে পড়ে গিয়ে এক তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললো।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে বললেন, "তুমি ত' ভারি স্বার্থপর ছোকরা হে! কি আব্দার দেখ, তোমরা সব ফুর্তি করতে আমার চাকরটি নিয়ে যাবে, তাহলে আমায় এখানে কে দেখবে, বলতো?"

মনের মধ্যে বিস্ময় চেপে রাখলাম এই ভেবে যে, আমার অমায়িক খুল্লতাত মহাশয়ের প্রকৃতির সহসা এরূপ বিপর্যয় নিশ্চয়ই আরও একটা রহস্য, যাতে করে আজকের সারা দিনটাই পরিপূর্ণ। কাছারিবাড়ী হতে আমার পশ্চাদপসরণ সম্মানজনকের চেয়ে বরং কিছুটা আতঙ্কের সঙ্গেই ঘটলো।

আশ্রমে ফিরে এলাম। বন্ধুরা সব সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। মনে মনে এই বিশ্বাস দাঁড়াচ্ছিল যে, হয়ত গুরুদেবের মনোভাবের পিছনে যদিও অত্যন্ত গূঢ়, তবুও যথেষ্ট কোন উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে। মনে অনুতাপ এল গুরুদেবের ইচ্ছা লঙ্ঘনের চেষ্টা করছি বলে।

গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "মুকুন্দ, আমার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাক না কেন? রাজেন্দ্র আর বাকি সব এখন এগিয়ে কোলকাতায় তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে। কোলকাতায় গিয়ে কাশ্মীরের রাতের শেষ ট্রেন ধরবার এখনও ঢের সময় আছে।"

ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, "গুরুদেব, আপনাকে ছেড়ে আমার মোটেই যেতে ইচ্ছে নেই!"

বন্ধুগণ আমার কথায় বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করল না। তারা একটা ভাড়াটে গাড়ী ডাকিয়ে মালপত্র সব তুলে নিয়ে তখনই রওনা হয়ে গেল। কানাই আর আমি গুরুদেবের চরণপ্রান্তে নীরবে বসে রইলাম। আধঘণ্টা চুপচাপ থাকার পর, গুরুদেব উঠে পড়ে দোতলায় খাবার ঘরের বারান্দার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, "কানাই, মুকুন্দর খাবার দাও। তার গাড়ী ছাড়বার সময় হয়েছে।"

কম্বলের আসন ছেড়ে উঠতেই হঠাৎ একটা বমি-বমি ভাব এসে হাত পা যেন এলিয়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে পেট গুলিয়ে গিয়ে পাকস্থলীর ভিতর মোচড় দিয়ে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হল। পেটের ভিতর কে যেন ছুরি দিয়ে চিরে ফেলছে। যন্ত্রণা এতই ভীষণ, মনে হল কেউ যেন আমায় নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক নরককুণ্ডে ছুঁড়ে ফেলে দিল। গুরুদেবের দিকে অন্ধভাবে হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে তাঁর পায়ের তলায় ধড়াস করে পড়ে গেলাম — সাঙঘাতিক এসিয়াটিক কলেরার সব লক্ষণই তখন প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আর কানাই দু'জনে আমাকে পাঁজাকোলা করে বৈঠকখানায় নিয়ে এলেন।

যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে বললাম, "গুরুদেব, আপনার হাতে আমার জীবন মরণ — যা করবার হয় করুন"; কারণ মনে তখন স্থির বিশ্বাস হল — প্রাণ অতি দ্রুত আমার শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীযুক্তেশ্বরজী তাঁর কোলে আমার মাথাটি তুলে নিয়ে সস্নেহে অতি সুকোমলভাবে কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "দেখলে তো, স্টেশনে যদি এখন তোমার বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে তাহলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াতো। আমাকেই তো তোমায় এইরকম অবস্থায় দেখতে হত — কারণ ঠিক এই সময়টাতে তোমার যে বেড়াতে বেরোন উচিত নয়, আমার সে বিবেচনায় ত' তুমি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলে।"

শেষে সবই বুঝতে পারলাম। যেহেতু মহাগুরুগণ প্রকাশ্যে তাঁদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করাটা কদাচিৎ উপযুক্ত বলে মনে করেন, সেহেতু একজন দর্শক সে দিনের ঘটনাগুলো দেখলে নিশ্চয়ই বিবেচনা করত যে তাদের পরপর ঘটে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। গুরুদেবের আমাকে

নিবারণের প্রচেষ্টা এত সূক্ষ্ম যে, তা ধরতেই পারা যায় না। তাঁর ইচ্ছা বেহারী, খুড়োমশায়, রাজেন্দ্র, আর অপরাপরদের মধ্যে এমন অদৃশ্যভাবে কাজ করছিল যে, বোধহয় আমি ছাড়া আর সকলেই ভেবেছিল — ঘটনা পরম্পরা যা ঘটে যাচ্ছে তা সঙ্গত আর একান্তই স্বাভাবিক।

সাংসারিক দায়িত্ববোধ শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে উপেক্ষিত হত না বলেই তিনি কানাইকে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিয়ে খুড়োমশায়কে খবর দিতে বললেন।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম, "গুরুদেব, একমাত্র আপনিই কেবল আমাকে নিরাময় করতে পারেন — এখন আমি ডাক্তারের নাগালের বাইরে।"

"বাছা, ঈশ্বরের কৃপাই তোমায় রক্ষা করছে। ডাক্তারের বিষয়ে আর ভেবো না। এসে তাঁকে আর তোমায় এই অবস্থায় দেখতে হবে না। তুমি একদম ভাল হয়ে গেছ।"

গুরুদেবের কথার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ মোচড়ানি আর যন্ত্রণা একেবারে মিলিয়ে গেল। অত্যন্ত দুর্বলতা নিয়ে উঠে বসলাম। একজন ডাক্তার তখনই এসে পড়লেন, এবং আমাকে অতি যত্নের সঙ্গেই দেখলেন।

পরীক্ষা করে বললেন, "মনে হচ্ছে তুমি সঙ্কটময় অবস্থাটা কাটিয়ে উঠেছ। যাক্, আমি পরীক্ষার জন্যে তোমার এসব বমি আর মলের কিছু কিছু নমুনা নিয়ে যাচ্ছি।"

তার পরদিন সকালবেলা ডাক্তারবাবু একরকম ঊর্ধ্বশ্বাসেই ছুটে এলেন। আমি তখন বসে আছি, মন খুব হাল্কা।

অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে আমার হাতের উপর হাত বুলোতে বুলোতে ডাক্তারবাবু বললেন, "বাঃ বাঃ, এখন তো বসে বসে খুব হাসি-গল্প হচ্ছে, যম যে ছুঁয়ে চলে গেল — তার খবর রাখ কি? নমুনা পরীক্ষায় তোমার এসিয়াটিক কলেরা ধরা পড়ার পর থেকে তুমি যে বেঁচে উঠবে, তা কখনো ভাবতেও পারি নি। রোগ দূর করতে এমন দৈবশক্তিসম্পন্ন গুরু পেয়েছ ছোকরা, তুমি ত' মহা ভাগ্যবান হে! তাঁর প্রতি আমার এখন দারুণ বিশ্বাস হয়ে গেছে, বুঝলে!"

আমিও সর্বান্তকরণে সায় দিলাম। ডাক্তারবাবু উঠবার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় রাজেন্দ্র আর আভিভ এসে হাজির হল। প্রথমতঃ ডাক্তার, তারপরে আমার ম্লান আর রুগ্ন চেহারা দেখে তাদের মুখচোখের রাগ অনুকম্পায় পরিবর্তিত হল।

"যখন দেখলাম কথামত কলকাতায় ট্রেন ধরবার সময় তুমি হাজির হলে না, তখন মনে মনে বড়ই রাগ হচ্ছিল। অসুখ করেছিল বুঝি?"

বললাম, "হ্যাঁ"। তারপর যখন দেখলাম যে, বন্ধুরা কালকে যে কোণ থেকে মালপত্র নিয়ে গিয়েছিল আবার সেই কোণেই সে সব ফিরিয়ে এনে রাখছে, তখন আর হাসি চাপতে পারলাম না। মনে মনে একটা ছড়া কাটলাম, —

"জাহাজটির যাত্রা শুরু হল স্পেনে যাবার,
পৌঁছবার আগেই সেটি ফিরে এল আবার।"

গুরুদেব ঘরে ঢুকলেন। রোগী হবার সুবাদে তাঁর হাত সসম্ভ্রমে ধরে বললাম, "গুরুজী, বারবছর বয়স থেকে আমি হিমালয়ে যাবার নিষ্ফল চেষ্টা করে মরছি। এখন আমার স্থির বিশ্বাস হয়েছে যে, আপনার আশীর্বাদ ছাড়া দেবী পার্বতী* আর আমায় গ্রহণ করবেন না!"

---

* পুরাণে পার্বতী হিমালয় রাজকন্যা বলে বর্ণিতা হয়েছেন, যাঁর বাসস্থান হচ্ছে তিব্বতসীমান্তে কোনও পর্বতশিখরে। বিস্ময়বিমুগ্ধ পথিকগণ সেই দুরধিগম্য পর্বতচূড়ার তলদেশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পান — দূরে একটি বিরাট তুষারস্তূপ, নানা আকারের বরফে তৈরী চূড়া ও গম্বুজসমন্বিত — প্রকাণ্ড এক রাজপ্রাসাদের সঙ্গে যার সাদৃশ্য রয়েছে।

জগন্মাতার বিভিন্নরূপ — পার্বতী, কালী, দুর্গা, উমা প্রভৃতি নানারূপে তিনি অভিহিতা হয়েছেন, বিশেষ লীলা, [illegible]। ঈশ্বর অর্থাৎ শিব তাঁর পরাপ্রকৃতি বা সৃষ্টিকার্যে অংশগ্রহণ করেন না। তাঁর 'শক্তি', তাঁর স্ত্রীরূপে বিরাজিতা; সৃজনকারিণী স্ত্রী শক্তিরূপে তা এই বিশ্বরচনায় অসীম অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকে।

পৌরাণিক কাহিনীতে হিমালয়কে মহাদেবের বাসস্থান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হিমালয় হতে উৎপন্ন নদীসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে গঙ্গাদেবী আকাশ হতে নেমে এসেছেন। গঙ্গাকে কাব্যে ত্রিমূর্তির সংহার-সৃষ্টিকর্তা, মহাযোগীশ্বর শিবের জটাজুটের মধ্য দিয়ে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে প্রবাহিতা হন বলে বর্ণিত হয়েছে। ভারতের শেক্সপীয়র কবি কালিদাস হিমালয়কে মহাদেবের "পুঞ্জীভূত অট্টহাসি" বলে বর্ণনা করেছেন। "দি লিগেসি অফ্ ইণ্ডিয়া" পুস্তকে এফ. ডব্লিউ. টমাস লিখেছেন, "পাঠক হয়ত বিরাট শুভ্র দন্তপঙ্ক্তির বিস্তারের কল্পনা করলেও করতে পারেন। কিন্তু তার সম্পূর্ণ অর্থ তবুও তাঁর নিকট লুক্কায়িতই থেকে যাবে যতক্ষণ না তিনি সেই

মহাযোগীশ্বর শিবের মূর্তি কল্পনা করতে পারছেন, যিনি অভ্রংলিহ পর্বতচূড়ায় চিরসমাসীন, যেখানে স্বর্গ হতে মর্ত্যে অবতরণকালে গঙ্গা চন্দ্রমৌলি মহাদেবের জটাজূটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিতা হয়েছেন।”

হিন্দু চিত্রকলায় দিগম্বর শিবের একমাত্র আবরণ ঘোরকৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণসার চর্ম বলে প্রদর্শিত হয়েছে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হচ্ছে রাত্রির অন্ধকার আর রহস্যের প্রতীক; কতকগুলি শৈবায়ত, শিবের প্রতি সম্মানে দিগম্বর হয়েই ভ্রমণ করেন — যাঁর কিছুই নেই অথচ সবই আছে।

কাশ্মীরের এক পুণ্যবতী সাধ্বী, চতুর্দ্দশ শতকের লালা যোগীশ্বরীও ছিলেন একজন দিগম্বরা, শিব উপাসিকা। তদানীন্তন এক সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তি, তিনি নগ্নতা অবলম্বন করে চলেন কেন জিজ্ঞাসা করাতে যোগীশ্বরী তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দেন, “কেনই বা নয়? আমি তো কোথাও পুরুষ দেখতে পাই না!” যোগীশ্বরীর কতকটা উগ্রধরণের মত হচ্ছে এই যে ঈশ্বরানুভূতি যার হয় নি, সে পুরুষ পদবাচ্য নয়। তিনি ‘ক্রিয়াযোগের’ সঙ্গে ঘনিষ্ঠসম্বন্ধবিশিষ্ট একপ্রকার প্রণালী অবলম্বন করে সাধনা করতেন, যার অপূর্ব মুক্তিদায়ী গুণ তিনি অসংখ্য চৌপদীতে বর্ণনা করে গেছেন। তার একটির অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল, —

“দুঃখের কালকূট আমি কত না করেছি পান?
সংখ্যাতীত জনম-মরণে চলে মোর অভিযান!
হায়! অমৃত বিনা যে হিয়ার পাত্রখানি,
শ্বাসের চুমুকে পূর্ণ হবে না তা জানি।”

জড়মৃত্যুর অধীন না হয়ে তিনি নিজ দেহকে অগ্নিতে পরিণত করে দেহের বিলোপসাধন করেছিলেন। পরে তিনি শোকসন্তপ্ত নগরবাসীদের সম্মুখে আবির্ভূতা হয়েছিলেন — জীবন্তমূর্তি পরিগ্রহ করে স্বর্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিতা হয়ে — শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিতা হয়েই।

২১ পরিচ্ছেদ

এবার কাশ্মীর যাত্রা

এসিয়াটিক কলেরার হাত থেকে অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পাবার দিন দুই পরে শ্রীযুক্তেশ্বরজী বললেন, "এখন তুমি বেড়াতে যাবার মত বেশ বল পেয়েছ দেখছি। এবার আমিও তোমার সঙ্গে কাশ্মীর যাব।"

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা জন ছয়েক মিলে উত্তরে যাবার ট্রেন ধরলাম। প্রথমে গিয়ে নামলাম সিমলা শহরে। সিমলা হচ্ছে হিমালয় পর্বতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা রাজ্ঞী সদৃশা এক নগরী। চারদিকের অপরূপ দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে আমরা খাড়া পথ দিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

একটা খোলা জায়গায় বাজার বসেছে। জায়গাটি ছবির মত চমৎকার। এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক হাঁকছে, "বিলিতি স্ট্রবেরী চাই!"

অপরূপ লাল লাল ফলগুলি দেখে গুরুদেবের কৌতূহল উদ্রিক্ত হল। কানাই আর আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। গুরুদেব এক ঝুড়ি ফল কিনে আমাদের দু'জনকে খেতে দিলেন। আমি একটাতে কামড় দিয়েই থু থু করে মাটিতে ফেলে দিলাম।

"কি ভীষণ টক, গুরুদেব! ও স্ট্রবেরী আমার কোন কালেই ভাল লাগে না।"

গুরুদেব হাসতে হাসতে বললেন, "আচ্ছা, আমেরিকায় গিয়ে সেখানে তোমার ভাল লাগবে। সেখানে এক ডিনারে বাড়ীর গিন্নী যখন ক্রীম আর চিনি মিশিয়ে তোমায় স্ট্রবেরী খেতে দেবে, তখন কাঁটা দিয়ে তুলে খেতে খেতে বলবে, 'কি চমৎকার স্ট্রবেরী!' তখন তোমার সিমলার এই আজকের দিনটির কথা মনে পড়বে, দেখো!"

(শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর ভবিষ্যদ্বাণী মন থেকে তখন অন্তর্হিত হল বটে, কিন্তু বহুদিন বাদে আবার জেগে উঠল, যখন আমেরিকায় যাবার অল্প

কিছুদিন বাদেই ম্যাসাচুস্টেস্ প্রদেশের ওয়েস্ট সমারভিলির মিসেস এলিস. টি. হেসি-র ডিনারে নিমন্ত্রিত হলাম। টেবিলে ফলটল দেওয়ার সময় আমাদের গৃহকর্ত্রী কাঁটা দিয়ে ক্রীম আর চিনির সঙ্গে স্ট্রবেরীগুলো মেখে আমায় খেতে দিয়ে বললেন, “ফলগুলো কিছু টক হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এইরকম করে তৈরী করে দিলে আপনার খেতে ভালই লাগবে।” একমুখ পুরে দিয়েই বলে উঠলাম, “কি চমৎকার স্ট্রবেরী!” সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির অতল গভীর হতে সিমলায় গুরুদেবের সেই ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ে গেল। বহুদিন পূর্বেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর ভগবদ্ভাবিত মনে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত কর্মপ্রসূত ঘটনাবলীর তালিকা যে ধরা পড়েছিল, তা ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়।)

আমাদের দলটি শীগগিরই সিমলা ছেড়ে রাওয়ালপিণ্ডির গাড়ীতে চড়ে বসল। সেখানে একটা ছাদঢাকা ল্যাণ্ডো জুড়িগাড়ী ভাড়া করে আমরা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। পৌঁছতে দিন সাতেক লাগবে। আমাদের উত্তরাপথ ভ্রমণের দ্বিতীয় দিনে হিমালয়ের আসল বিরাট দৃশ্য চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। গরম পাথুরে রাস্তা দিয়ে গাড়ীর লোহার চাকা ঘড় ঘড় শব্দ তুলে চলতে লাগল। পার্বত্য সৌন্দর্যের মুহুর্মুহুঃ দৃশ্য পরিবর্তনে আমাদের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

আড্ডি গুরুদেবকে বলল, “গুরুজী, আপনার পবিত্র সঙ্গে এমন বিরাট দৃশ্য দেখতে পেয়ে কি যে আনন্দ হচ্ছে, তা আর কি বলব!”

ভ্রমণের ব্যবস্থা আমারই করা; কাজেই আড্ডির প্রশংসা শুনে মনটা আনন্দে ফুলে উঠল। শ্রীযুক্তেশ্বরজী আমার মনের কথা জানতে পেরে আমার দিকে ফিরে ফিস ফিস করে বললেন, “শুনে ফুলে উঠো না। ও আমাদের খানিকক্ষণ ছেড়ে একটান সিগারেট খাবার আশায় যতটা উৎফুল্ল, তোমার ওসব দৃশ্যটৃশ্য দেখে ততটা নয়, বুঝলে?”

শুনে আমি তো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। চাপাগলায় বললাম, “গুরুদেব, দয়া করে আর অপ্রিয় কথাগুলো শুনিয়ে আমাদের দল ভাঙাবেন না। আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারছিনা যে, আড্ডির সিগারেট খাবার

এতটাই বাসনা জেগেছে!" গুরুদেব সহজে হটবার পাত্র নন — সভয়ে তাঁর দিকে তাকালাম।

গুরুদেব মৃদু হেসে বললেন, "আচ্ছা বেশ, আড্ডিকে আমি কিছু বলব না। কিন্তু তুমি শীগগিরই দেখবে, ল্যাণ্ডো থামলেই আড্ডি ঐ সুযোগটি নেবে।"

একটা ছোট সরাই-এর কাছে এসে গাড়ী থামল। ঘোড়াদুটোকে জল খাওয়াতে নিয়ে যেতেই আড্ডি জিজ্ঞাসা করল, "গুরুজী, গাড়োয়ানের পাশে বসেই এবার খানিকক্ষণ যাই, কিছু মনে করবেন না ত'? গাড়ীর ভিতর বড় গরম। বাইরে একটু টাটকা হাওয়া খাওয়া যাবে।"

শ্রীযুক্তেশ্বরজী অনুমতি দিলেন: কিন্তু আমায় বললেন, "আড্ডির চাই টাটকা হাওয়া নয়, টাটকা ধোঁয়া!"

ধূলিধূসরিত রাস্তার উপর দিয়ে আমাদের ল্যাণ্ডো আবার চলতে শুরু করল। গুরুদেবের চোখ হাসিতে মিট্ মিট্ করছিল; তিনি আমায় হুকুম করলেন, "গাড়ীর দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখ তো আড্ডি হাওয়া নিয়ে কি করছে?"

আদেশ পালন করতে গিয়ে অবাক হয়ে দেখি যে আড্ডি মুখ দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে ছাড়ছে। ক্ষমাপ্রার্থীর দৃষ্টিতে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর দিকে তাকিয়ে বললাম, "গুরুদেব, বরাবরই দেখছি যে, আপনার কথাই ঠিক! আড্ডি এখন চারধারের শোভা দেখতে দেখতে বেশ ধোঁয়া ছাড়ছে!' অনুমান করলাম — বন্ধুবর গাড়োয়ানের কাছ থেকে সিগারেটটি বাগিয়েছে; কেননা আমি জানতাম যে, কলকাতা থেকে আড্ডি কোন সিগারেট সঙ্গে করে আনে নি।

পাহাড়ের উপর রাস্তা সাপের মত এঁকে বেঁকে উঠে গেছে। চার ধারের দৃশ্য কি অপূর্ব আর মনোরম! নদী, উপত্যকা, গভীর খাদ, বন্ধুর পথ ও পাহাড়ের পর পাহাড়ের উচ্চশৃঙ্গ! প্রতি রাতে আমরা পথের ধারে কোন গ্রাম্য সরাইয়ে উপস্থিত হতাম; সেখানে আমরা নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরী করে নিতাম। শ্রীযুক্তেশ্বরজী আমার পথ্যের ভার নিজেই নিয়েছিলেন; তিনি নজর রাখতেন যেন প্রত্যেকবার খাবার সময় আমায়

লেবুর রস দেওয়া হয়। তখনও আমি বেশ দুর্বল, কিন্তু রোজই একটু একটু করে সুস্থ হয়ে উঠছিলাম। হলে কি হবে, ঘোড়ার গাড়ীর ঘরঘরানিতে হাড়পাঁজরা সব একেবারে ঢিলে হয়ে আসত।

কাশ্মীরের মধ্যভাগে যতই অগ্রসর হতে লাগলাম, ততই আমাদের হৃদয় আশায় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগল। চারদিকে হিমালয় পরিবেষ্টিত কমল-সরোবর, ভাসমান উদ্যান, উজ্জ্বলভাবে সজ্জিত শিকারা (হাউসবোট), বহুসেতুশোভিত ঝিলাম নদী, আর ফুলে ফুলে ভরা তৃণভূমি — সেখানে যেন স্বর্গ রচনা করে রেখেছে।

শ্রীনগরে প্রবেশ পথের দুইদিকে সুদীর্ঘ গাছের সারি — আমাদের সাদর আহ্বানের জন্যই যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি দ্বিতল সরাইয়ে আমরা ঘর ভাড়া নিলাম। সামনে উত্তুঙ্গ শৈলমালা আপন মহিমায় বিরাজমান। কাছাকাছি কোথাও ঝরনার জল না থাকাতে, আমরা নিকটস্থ একটা কুয়া থেকেই জল সংগ্রহ করতাম। গ্রীষ্মকালটা এখানে খুব আরামদায়ক — দিনে গরম, রাতে ঈষৎ ঠাণ্ডা।

শ্রীনগরে আদি শঙ্করাচার্যের প্রাচীন মন্দির একদিন দর্শন করতে যাওয়া হলো। নীল আকাশে উন্নতশির পর্বতশিখরস্থ সেই প্রাচীন মন্দির দর্শন করতে করতে আমি ভাবাবেশে ডুবে গেলাম। দূর বিদেশভূমিতে পাহাড়ের উপর একটি অট্টালিকার দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই সুউচ্চ শঙ্করাচার্যের আশ্রম তখন পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে সেই স্থানটিতে পরিণত হল, যেখানে আমি বহুবৎসর বাদে আমেরিকার সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপের সদরকেন্দ্র স্থাপন করেছিলাম। (যখন আমি প্রথম ক্যালিফোর্নিয়ার লস এঞ্জেলসে গিয়ে মাউণ্ট ওয়াশিংটনের চূড়ায় প্রকাণ্ড বাড়ীটি দেখলাম, তখনই আমি চিনতে পেরেছিলাম যে, কাশ্মীর আর অন্যত্র আমার স্বপ্নে দেখা এটাই হোলো সেই বাড়ী।)

কাশ্মীরে কয়েকদিন কাটিয়ে তারপর আরও আট হাজার পাঁচশো ফুট উঁচুতে অবস্থিত গুলমার্গে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি সেই প্রথম বড় ঘোড়ার উপর চড়ি। রাজেন্দ্র একটি ছোট টাট্টুঘোড়ার উপর চড়ল। ঘোড়াটা খুব তেজী আর দৌড়বার জন্য একেবারে অস্থির। মতলব

করলাম খিলানমার্গে যেতে হবে। জায়গাটা খুব খাড়াই আর রাস্তাটা গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে; ওখানে প্রচুর "ব্যাঙের ছাতা", আর জায়গাটা কুয়াশা ঘেরা বলে পথ চলাও খুব বিপদজনক। রাজেন্দ্রের ছোট টাট্টুঘোড়াটি কিন্তু আমার অতবড় অশ্ববরকে মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম দিত না, ছুটেছে ত' ছুটেই চলেছে, এমন কি বিপজ্জনক বাঁকের মুখেও তার গ্রাহ্য নেই! রাজেন্দ্রের ঘোড়া বাজি মারবার আনন্দে অক্লান্তভাবে ছুটে চলেছে, দৌড়, দৌড়, দৌড় — তাকে থামান দায়!

ঘোড়দৌড়ের বাজির শেষে যা পুরস্কার পেলাম তাতে আনন্দে আর বিস্ময়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল। জীবনে এই প্রথম তুষারমৌলি হিমালয়ের চারদিকে তাকালাম — দেখি শৃঙ্গের পর শৃঙ্গগুলি যেন বিশাল শ্বেত ভাল্লুকের মত নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি মহান গম্ভীর দৃশ্য! সূর্যকিরণোজ্জ্বল সুনীল আকাশের গায়ে তুষারাবৃত পর্বতমালার অনন্ত বিস্তার — দুই চক্ষু দিয়ে সেই অপূর্ব শোভা পান করতে লাগলাম!

সকলেরই গায়ে ওভারকোট ছিল। উজ্জ্বল বরফে ঢাকা সেই ঢালু জমির উপর স্ফূর্তি করে গড়াগড়ি খাওয়া গেল। ফিরবার পথে দূরে দেখা গেল, কে যেন একখানা হলুদ রঙের ফুলের কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে, তাতে বর্ণহীন পর্বতগাত্রের রূপটাই একেবারে বদলে গেছে।

এবার যাত্রা করলাম সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৈরী বিখ্যাত শালিমার আর নিশাতবাগে রাজপ্রমোদউদ্যান দেখতে। নিশাতবাগের প্রাচীন রাজপ্রাসাদ একটা পাহাড়ী জলপ্রপাতের ঠিক উপরেই তৈরী; পাহাড় হতে দ্রুতবেগে নেমে আসবার সময় জলের গতিকে নানা উপায়ে আর অতি সুকৌশলে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে যাতে তারা রঙবেরঙের ধাপের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে নানাবর্ণোজ্জ্বল পুষ্পকুঞ্জের মাঝখানে ফোয়ারা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ছে। স্রোতটি রাজপ্রাসাদের কয়েকটি ঘরের ভিতর দিয়ে বয়ে গিয়ে শেষে যেন পরীর মত নিচেকার হ্রদে গিয়ে মিশে গিয়েছে। বিশাল উদ্যানে রঙের সে কি বিচিত্র বাহার! নানাবর্ণের গোলাপ, জুঁই, পদ্ম, স্ন্যাপড্র্যাগন, ল্যাভেণ্ডার, প্যান্সি, পপি আরও কত রকমেরই ফুল! লম্বা লম্বা চিনার, সাইপ্রেস, চেরী প্রভৃতি গাছ দিয়ে ঘেরা, যেন

চারদিকটা পান্নাবসান। দূরে হিমালয়ের অভ্রংলিহ শুভ্র গিরিশিখর গর্বোদ্ধত মস্তকে দণ্ডায়মান।

তথাকথিত কাশ্মীরী আঙুরকে কলকাতায় উত্তম সুখাদ্য বলেই ধরা হয়। রাজেন্দ্র বরাবরই বলত যে কাশ্মীরে পৌঁছে আমাদের কি আঙুরটাই না খাওয়া হবে। কিন্তু গিয়ে দেখল যে সেখানে বড়গোছের কোন আঙুরক্ষেত নেই। তার এই ভুল ধারণার জন্য যখন তখন আমি তাকে ঠাট্টা করতাম।

মাঝে মাঝে বলতাম, — "ওঃ, আঙুর খেয়ে খেয়ে পেট আমার এমন জয়ঢাক হয়ে গেছে যে আর চলতে পারি না। অদৃশ্য আঙুরের রস পেটে গিয়ে মদ হচ্ছে।" পরে শুনেছিলাম — কাশ্মীরের পশ্চিমে, কাবুল প্রদেশে প্রচুর আঙুর জন্মায়। আঙুর তেমন পাওয়া গেল না বটে, তবে গোটা পেস্তা দেওয়া রাবড়ি মালাই খেয়েই ঠাণ্ডা থাকতে হল।

ডাল হ্রদে লাল শামিয়ানা ঢাকা শিকারা বা হাউসবোট চড়ে বেশ কিছুটা বেড়ান গেল। এই হ্রদ নানা শাখাপ্রশাখায় এমন বিস্তৃত যে মনে হয় যেন একটা জলের তৈরী প্রকাণ্ড মাকড়সার জাল। এখানে অসংখ্য ভাসমান উদ্যান — কাঠের উপর মাটি ফেলে তৈরী করা। বিশাল জলরাশির মাঝখানে শাকসব্জি আর তরমুজ জন্মেছে — প্রথম দর্শনে এত অদ্ভুত বলে মনে হয়। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে এক একজন চাষী "মাটিতে শিকড় বসা" অপছন্দ করে তার "ক্ষেত"টি লগি দিয়ে ঠেলে নিয়ে বহু শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট হ্রদের এক জায়গা থেকে অন্য একটা নতুন জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

এই বহুধাপবিশিষ্ট উপত্যকায় পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের একত্র সমাহার ঘটেছে। কাশ্মীরসম্রাজ্ঞী — মস্তকে শৈলমুকুটধারিণী, হ্রদবলয়িতা, পুষ্পাভরণসজ্জিতা। পরে আমি বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে বুঝতে পারি — কেন কাশ্মীরকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিসর্গ দৃশ্যের স্থান বলা হয়। এখানে দেখা যায় সুইস আল্পস, স্কটল্যাণ্ডের লমণ্ড হ্রদ আর ইংলণ্ডের চমৎকার হ্রদগুলির কিছু পরিচয়। কাশ্মীরে কোন আমেরিকান ভ্রমণকারীকে তাদের আলাস্কা প্রদেশের পার্বত্যসৌন্দর্য আর ডেনভারের নিকটস্থ পাইকস পীকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

নিসর্গ সৌন্দর্যদৃশ্য প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম পুরস্কার দিই — হয় মেক্সিকোর জচিমিলকোকে — যেখানে পর্বত, আকাশ আর পপলার গাছ হাজার দিক থেকে আসা জলধারায় প্রতিফলিত, যেখানে মাছেরা খেলা করে, না হয় হিমালয়ের কঠিন প্রহরার মধ্যে সুরক্ষিত সুন্দরী কুমারীর মত কাশ্মীরের হ্রদগুলিকে। পৃথিবীতে এই দুটি স্থানই সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলে আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

তবে যখন আমি ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক, আর কলোরাডো এবং আলাস্কার গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন দর্শন করি, তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। ইয়েলোস্টোন পার্ক সম্ভবতঃ পৃথিবীতে একমাত্র স্থান যেখানে অসংখ্য উষ্ণপ্রস্রবণ বছরের পর বছর ধরে ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিতভাবে, প্রচণ্ডবেগে জল উদ্‌গীরণ করছে। এই আগ্নেয়গিরি প্রদেশে, প্রকৃতি যেন তার আদিম সৃষ্টির একটা নমুনা এখনও ফেলে রেখেছে; এখানে আছে উষ্ণ গন্ধকজলের প্রস্রবণ, উপল ও নীলকান্তবর্ণের জলাশয়, গরম জলের বিশাল ফোয়ারা, আর অবাধ বিচরণশীল ভাল্লুক, নেকড়ে, বাইসন এবং অন্যান্য বন্য জন্তুসকল। উয়োমিং-এর রাস্তা দিয়ে মোটরে করে "ডেভিল্‌স্ পেণ্ট পট" — যেখানে গরম কাদা ফুটছে — সেখানে যেতে গিয়ে পথে কলকলনাদে উচ্ছ্বলিত ঝরণা, প্রচণ্ডবেগে উদ্‌গীরণশীল উষ্ণজলের প্রস্রবণ, আর বাষ্পময় ফোয়ারা প্রভৃতি দেখে বলতে ইচ্ছা হয় যে, ইয়েলোস্টোন পার্ক তার অপরূপ দৃশ্যাবলীর জন্য একটি বিশেষ পুরস্কারের যোগ্য।

যোশেমাইটের প্রাচীন বিরাট বনস্পতি সিকোইয়া সকল তাদের বিশাল কাণ্ড আকাশের দিকে বহুদূরে উত্তোলিত করে দণ্ডায়মান — যেন দিব্য কারিগরী দিয়ে গড়া হরিৎবর্ণের প্রাকৃতিক গির্জা। প্রাচ্যে বহু আশ্চর্য আশ্চর্য জলপ্রপাত থাকলেও কানাডার সীমান্তের কাছে নিউইয়র্কে নায়াগ্রা প্রপাতের প্রবল জলধারার সৌন্দর্যের সঙ্গে কেউই তুলনীয় নয়। কেণ্টাকির বিরাট বিরাট গুহা আর নিউমেক্সিকোর কার্লসবাডের মাটির নিচেকার গুহাগুলির ভিতরকার রঙীন বরফঝুরি দেখলে অপরূপ পরীরাজ্য বলেই ভ্রম হয়। গুহার ছাদ হতে স্ট্যালাক্টাইটের লম্বা ঝালর

ঝুলে পড়েছে, আর তাদের ছায়া মাটির নিচের জলে প্রতিফলিত হয়ে দেখাচ্ছে যেন স্বপ্নলোকের চকিত স্ফুরণ।

কাশ্মীরের অধিকাংশ লোকই দেখতে অতি সুন্দর। দেহসৌন্দর্যের জন্য তারা জগদ্বিখ্যাত। ইউরোপীয়দের মত তারা শ্বেতবর্ণ, আর তাদের দেহাকৃতি আর অস্থিসংস্থানও তদ্রূপ; অনেকেরই চোখ নীল আর চুল সুন্দর সোনালী। সাহেবী পোষাকে তাদের আমেরিকানদের মতই দেখায়। হিমালয়ের শৈত্য তাদেরকে উষ্ণ সূর্যকিরণ হতে রক্ষা করে, তাতে তাদের গৌরবর্ণও রক্ষা পায়। দাক্ষিণাত্যের দিকে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে, সেখানকার অধিবাসীদের গায়ের রঙ ক্রমশঃ কালো হতে আরও কালো হয়ে আসছে।

কয়েক সপ্তাহ কাশ্মীরে ভ্রমণসুখে অতিবাহিত করবার পর বাংলাদেশে ফিরতে বাধ্য হলাম। কেননা গ্রীষ্মের ছুটির পর কলেজ খুলবে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী, কানাই আর আড্ডির সঙ্গে আরও কিছু দিনের জন্য শ্রীনগরে রয়ে গেলেন। আমার ফেরার অল্প কিছুদিন আগে গুরুদেব একদিন আভাসে জানালেন যে, কাশ্মীরে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

আমি প্রতিবাদের সুরে বললাম, "গুরুদেব, আপনি তো নিটোল স্বাস্থ্যের একটি পরিপূর্ণ ছবি, তবে আর আপনার ভাবনা কিসের?"

"এমনও সম্ভব, আমাকে হয়তো সংসার ত্যাগ করেও চলে যেতে হতে পারে।"

শুনে দারুণ বিচলিত হয়ে তাঁর পদতলে পড়ে অনুনয় করে বললাম, "গুরুজী, আপনি প্রতিজ্ঞা করুন — এখনই দেহরক্ষা করবেন না। আপনি ছাড়া যে আমি একপাও চলতে পারব না।"

শ্রীযুক্তেশ্বরজী নীরব হয়ে রইলেন; তারপর আমার দিকে চেয়ে এমন স্নিগ্ধমধুর হাসি হাসলেন যে, তাতে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই তাঁকে ছেড়ে চলে আসতে হল।

শ্রীরামপুরে ফেরবার অল্প কিছুদিন বাদেই আড্ডির কাছ থেকে টেলিগ্রাম এল, "গুরুজী সাঙঘাতিক পীড়িত।"

উন্মত্তের মত তার পাঠালাম, "গুরুদেব, আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে আমায় ছেড়ে যাবেন না। দেহকে রক্ষা করুন, নইলে আমিও আর বাঁচব না!"

কাশ্মীর হতে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর উত্তর এল, "তোমার যখন ইচ্ছে, তাই হোক্।"

দিনকতকের মধ্যেই আড্ডির কাছ থেকে চিঠি এল — গুরুদেব আরোগ্যলাভ করেছেন। তারপরে পক্ষকাল মধ্যে গুরুদেব শ্রীরামপুরে ফিরলেন; দেখে কষ্ট হল — তাঁর শরীর একেবারে আধখানা হয়ে গেছে।

তাঁর শিষ্যদের নিতান্ত সৌভাগ্যক্রমে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কাশ্মীরে তাঁর দারুণ জ্বরভোগের মাধ্যমে তাদের বহু পাপ পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক উপায়ে অপরের শরীর থেকে নিজের শরীরে রোগ নিয়ে তাকে ভোগ করে খণ্ডন করে দেওয়া, উচ্চকোটি যোগীদের জানা আছে। শক্তিমান লোক যেমন দুর্বলকে গুরুভার বহন করতে সাহায্য করতে পারে, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের অতিমানবও তাঁর শিষ্যদের প্রাক্তন কর্মফলের অংশ গ্রহণ করে তাদের দৈহিক বা মানসিক দুঃখক্লেশ লাঘব করতে পারেন। ঋণে জর্জরিত অমিতব্যয়ী পুত্রের বিরাট ঋণের বোঝা কমিয়ে দিতে ধনী পিতা যেমন কিছু অর্থদণ্ড দেয়, যাতে করে সে বেচারা তার নির্বুদ্ধিতার ভীষণ পরিণাম থেকে বেঁচে যায় — তেমনি সদ্‌গুরুরা তাঁদের শিষ্যদের দুঃখমোচন করবার জন্য নিজেদের স্বাস্থ্যগৌরবের কতক অংশ স্বেচ্ছায় বিসর্জন করেন।

গুপ্ত যৌগিক প্রণালীতে যোগী তাঁর মন আর আধ্যাত্মিক সংবাহনশক্তি পীড়িত ব্যক্তির সঙ্গে সংযুক্ত করেন; তাতে করে সেই রোগ যোগীর দেহে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সঞ্চারিত হয়। জড়জগতে ভগবানকে লাভ করে সদ্‌গুরু গ্রাহ্যই করেন না যে, তাঁর জড়শরীরের কি দশা ঘটবে। যদিও তিনি অপর লোকদের মুক্তি দেবার জন্য নিজ শরীরে তাদের রোগ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন, তাহলেও কিন্তু তাতে তাঁর নিষ্কলুষ মন অভিভূত হয় না। বরং এ রকম সাহায্য করতে পেরে তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেই মনে করেন। ভগবৎসান্নিধ্যে চরম মুক্তিলাভের প্রকৃত

অর্থ হচ্ছে এই যে, পার্থিব শরীর তার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সাধিত করেছে। সদ্‌গুরু তখন যেমন উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তেমনিভাবেই তাকে ব্যবহার করেন।

এ জগতে সদ্‌গুরুর একমাত্র কর্ম হচ্ছে মানবজাতির দুঃখকষ্ট প্রশমিত করা, — তা সে আধ্যাত্মিক উপায়েই হোক, আর জ্ঞানোপদেশেই হোক বা ইচ্ছাশক্তি বলে অথবা শারীরিক রোগপরিচালনা করেই হোক। ইচ্ছামাত্র ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে সদ্‌গুরুরা শারীরিক যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারেন। কখনও কখনও শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেবার জন্য গুরু একান্ত নীরবে শারীরিক ক্লেশ বহন করে থাকেন। যোগীরা অন্যান্যদের রোগভোগ নিজ শরীরে গ্রহণ করে তাদের হয়ে কার্যকারণজনিত কর্মফলের দোষ খণ্ডন করতে পারেন। এ বিধি যন্ত্রের মত বা অঙ্কের হিসাবমত কাজ করে থাকে। ভগবদ্‌জ্ঞান যাঁদের লাভ হয়েছে, তাঁরাই বৈজ্ঞানিকভাবে একে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

কোন সদ্‌গুরু যখন অপরের রোগ নিরাময় করেন, তখন আধ্যাত্মিকবিধানে তাঁকে যে পীড়া ভোগ করতেই হবে, এমন কোন আবশ্যকতা নেই। সাধুসন্তদের সদ্য সদ্য রোগনিরাময়ের নানা উপায় জানা আছে; তাতে করেই রোগ আরাম হয়, আর তাতে করে আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন গুরুর কোনই ক্ষতি হয় না। কেবল বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গুরু যদি ইচ্ছা করেন যে, তাঁর শিষ্যের অতি দ্রুত উন্নতি সাধিত হোক, তাহলে তখনই কেবল তিনি স্বেচ্ছায় নিজশরীরে শিষ্যের অশুভ কর্মফল একসঙ্গে গ্রহণ করে সেসব ভোগান্তে তাদের খণ্ডন করেন।

যীশুখ্রিস্টও এমনি করেই বহুলোকের পাপের মুক্তিপণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর দৈবশক্তিপ্রভাবে* তাঁর শরীর ক্রুশবিদ্ধ হয়েও কখন মৃত্যুমুখে পতিত হত না, যদি না তিনি কার্যকারণের সূক্ষ্ম দৈববিধি পালিত

---

* যীশুখ্রিস্টকে ক্রুশে দিতে নিয়ে যাবার অব্যবহিত পূর্বেই তিনি বলেছিলেন, "তুমি কি মনে কর যে আমি আমার পিতার কাছে প্রার্থনা করতে পারি না যাতে করে তিনি দ্বাদশ বাহিনী অপেক্ষা বেশি দেবদূতদের আমার জন্য পাঠিয়ে দিতে পারেন? কিন্তু তাতে করে শাস্ত্রের এইসব বচন কি করে পূর্ণ হবে যার, এই রকম হওয়া আবশ্যক?" — ম্যাথিউ ২৬ঃ ৫৩-৫৪ (বাইবেল)।

হতে দিতে স্বেচ্ছায় না সাহায্য করতেন। তিনি এইরকম করে অন্যের কর্মফল নিজশরীরে গ্রহণ করেছিলেন, বিশেষতঃ তাঁর শিষ্যদের। এই প্রকারে বিশেষভাবে পরিশুদ্ধ হলে তাঁদের উপর পবিত্রাত্মার আবির্ভাব ঘটে অর্থাৎ তাঁরা পরিশেষে ভগবদ্‌জ্ঞানলাভের উপযুক্ত হয়ে ওঠেন।*

আত্মোপলব্ধ সদ্‌গুরুই কেবলমাত্র তাঁর প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করতে পারেন, অথবা অপরের রোগ নিজশরীরে গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণ মানুষ অবশ্য এরূপ রোগ নিরাময়ের যোগপ্রণালী প্রয়োগ করতে পারে না, আর তার পক্ষে এসব করতে যাওয়াও উচিত নয়; কারণ অপটু শরীর ঈশ্বরপ্রণিধানের পক্ষে বাধাস্বরূপ। শাস্ত্রে বলে, আগে স্বাস্থ্য ভাল করতে হবে তারপর ধর্মসাধন; তা না হলে ভগবদ্‌চিন্তায় মন নিবিষ্ট রাখা খুবই দুরূহ।

খুব দৃঢ় মন সমস্ত শারীরিক বাধাবন্ধ অতিক্রম করে ঈশ্বরোপলব্ধি করতে পারে। বহু সাধুসন্ত রোগশোক জয় করে ঈশ্বরানুসন্ধানে সফলকাম হয়েছেন। আসিসির সেণ্টফ্রান্সিস্‌ নিজে গুরুতররূপে পীড়িত হয়েও অপরকে সুস্থ করেছেন — এমন কি মৃতের পুনর্জীবনও দান করেছেন।

আমি এমন এক ভারতীয় সাধুকে জানতাম প্রথম জীবনে যাঁর অর্ধেক শরীর ছিল ক্ষতে পরিপূর্ণ। তার উপর তাঁর বহুমূত্ররোগ এতই প্রবল ছিল যে, পনেরমিনিটের বেশি তিনি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর ঈশ্বরলাভের আকাঙক্ষা ছিল অদম্য। তিনি ঈশ্বরকে এই বলে প্রার্থনা করতেন ঃ "প্রভু, তুমি কি আমার এই ভাঙা মন্দিরে আসবে?" প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে সাধুটি ক্রমশঃ প্রত্যহ একাদিক্রমে আঠার ঘণ্টা পদ্মাসনে বসে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, "তিন বছর বাদে আমার এই ভাঙা ঘরে সেই অনন্ত জ্যোতিঃর প্রকাশ হল। সেই জ্যোতিঃসাগরে নিমজ্জনের আনন্দে আমার শরীরের কথাই আর মনে রইল না। একসময় দেখলাম ভগবৎকৃপায় আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে।"

---

* এক্টস্‌ ১ ঃ ৮ এবং ২ ঃ ১-৪ (বাইবেল)।

ভারতে মোগলসাম্রাজ্যের স্থাপয়িতা সম্রাট বাবরের (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রিঃ অঃ) নিজ জীবনে ঐতিহাসিক নিরাময়দানের কথা সকলেই জানেন। পুত্র হুমায়ুন সাঙ্ঘাতিকরূপে পীড়িত। পিতা আকুল হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন যে, তাঁকে রোগটি দিয়ে তাঁর পুত্রটি যেন বেঁচে ওঠে। হুমায়ুন* বেঁচে উঠলেন বটে, তবে বাবর কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুত্রের রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন।

অনেকেই মনে করেন — আধ্যাত্মিক গুরুদের স্যাণ্ডোর† মত গায়ের জোর ও স্বাস্থ্য থাকা উচিত। এই অনুমান একেবারেই অমূলক। জন্মাবধি পরিপূর্ণ সুদেহী হওয়াটা যেমন ঈশ্বরজ্ঞান লাভের দ্যোতক নয়, তেমনি চিররুগ্ন শরীরও এ কথা বলে না যে, গুরুর আদৌ কোন ভগবৎশক্তি নেই। সদ্‌গুরুর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তাঁর দেহেতে নয় — আধ্যাত্মিক গুণাবলীর মধ্যেই পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্যের বহু বিভ্রান্ত তত্ত্বান্বেষী ভুলবশতঃ মনে করেন যে, দর্শনশাস্ত্রের বিখ্যাত বাগ্মী বা প্রাজ্ঞ লেখকরা অবশ্যই সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরুর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে — ইচ্ছামাত্র 'সবিকল্প সমাধিতে' প্রবেশ লাভের সামর্থ থাকা আর পরে অক্ষয় আনন্দ বা 'নির্বিকল্প সমাধি' লাভ করা।‡ ঋষিরা বলেছেন — কেবলমাত্র এই কৃতিত্বের বলেই মানুষ প্রমাণ করতে পারে যে, সে 'মায়া' অতিক্রম করতে পেরেছে। তাঁর অন্তরের গভীর অনুভূতি থেকে একমাত্র তিনিই বলতে পারেন, "একম্ সৎ" — "কেবল একজন মাত্রই আছেন।"

---

* হুমায়ুন ছিলেন সম্রাট আকবরের পিতা। ঐস্লামিক ধর্মোন্মত্ততায় আকবর প্রথম প্রথম হিন্দুদের উপর অত্যাচার করতেন। পরে তিনি বলেছিলেন, "আমার জ্ঞান যখন ক্রমশঃ বাড়তে লাগল, তখন লজ্জায় একেবারে অভিভূত হলাম।" "সকল ধর্মমতের মন্দিরেই অলৌকিক ব্যাপার ঘটে।" তিনি ফারসী ভাষায় ভগবদ্‌গীতার অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন আর তাঁর রাজসভায় রোম থেকে কতিপয় জেসুইট ফাদারকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। আকবর ভ্রমক্রমে যদিচ সশ্রদ্ধভাবে নিম্নলিখিত উক্তি (আকবরের দ্বারা নবনির্মিত ফতেপুর সিক্রীর বিজয়স্তম্ভে উৎকীর্ণ) যীশুখ্রিস্টে আরোপ করেছিলেন — "যীশু, মেরীর পুত্র (শান্তি হউক) বলিলেন ঃ "জগত একটি সেতু; অতিক্রম করে যাও, কিন্তু এর উপর কোন গৃহ নির্মাণ কোরো না।"

† জার্মান ব্যায়ামবীর (মৃত্যু—১৯২৫); "পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বলশালী মানব" বলে পরিচিত।

‡ ২৬ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতবাদী শঙ্কর লিখে গেছেন, "অজ্ঞানতাজাত যে দ্বৈতভাব, তাতে পরমাত্মা হতে সকল জীবেরই ভেদজ্ঞান জন্মে। যেখানে সর্বভূতে আত্মজ্ঞান জন্মে, সেখানে (দ্রষ্টা) এমনকি প্রতিটি পরমাণুতেও পরমাত্মাকে দেখে থাকেন .... জাগ্রত হলে পর যেমন স্বপ্ন আর থাকে না, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে পর প্রাক্তন কর্মফল আর ভোগ করতে হয় না।"

মহাগুরুগণই কেবলমাত্র শিষ্যদের কর্মফল গ্রহণ করতে সক্ষম। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী শ্রীনগরে* কখনই রোগভোগ করতেন না, যদি না তিনি ঐ রকম অদ্ভুত উপায়ে শিষ্যদের উপকার করার জন্য অন্তরে ঈশ্বরের আদেশ পেতেন। ভগবৎপরায়ণ আমার গুরুদেব ব্যতীত অতি অল্প সংখ্যক সাধুরাই ঈশ্বরাদেশ পালনের উপযুক্ত সূক্ষ্মজ্ঞান লাভ করতে পেরেছিলেন।

তাঁর জীর্ণশীর্ণ ক্ষীণ দেহ দেখে সহানুভূতিসূচক দু'একটা কথা বলতে যেতেই গুরুদেব হেসে বলে উঠলেন, "দেখ, এরও একটা লাভজনক দিক আছে বইকি। কতকগুলো গেঞ্জি ছোট হয়ে গেছে, অনেকবছর ধরে সে সব পড়ে আছে; এবার সেগুলো পরতে পারব।"

গুরুদেবের উচ্ছ্বসিত হাসি শুনে সেন্ট ফ্রান্সিস দ্য সেল্‌সের কথাগুলো স্মরণে এলো, "যে সাধু নিরানন্দ, তার জীবনই বৃথা!"

* খ্রিঃ পূঃ তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোক কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি সেখানে ৫০০ মঠ নির্মাণ করেছিলেন। এক হাজার বছর পরে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাং যখন কাশ্মীর পরিভ্রমণ করেন তখনও সেখানে একশো মঠ ছিল। আর একজন চীন লেখক, ফা-হিয়েন (পঞ্চম শতাব্দী) পাটলিপুত্রে (আধুনিক পাটনা) অশোকের বিরাট রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করে বলেছেন যে, হর্ম্যরাজি নির্মাণকৌশলে ও ভাস্কর্যের অলঙ্করণে এর গঠন এরূপ আশ্চর্য সুন্দর যে মনে হয় "কোন মরজগতের শিল্পীর হাতের কাজ নয়।"

২২ পরিচ্ছেদ

পাষাণ দেবতার হৃদয়

আমার জ্যেষ্ঠাভগিনী রমাদিদি কোলকাতার গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনে থাকত। অল্প কিছুদিনের জন্য আমি তাদের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। রমাদিদি একদিন বলল, "দেখ, পতিব্রতা হিন্দু স্ত্রী হিসেবে অবিশ্যি স্বামীর বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ করা উচিত নয়; তথাপি আমার একান্ত ইচ্ছে যে নাস্তিকতার পথ থেকে তিনি ফিরুন। আমার ঠাকুরঘরে সাধুসন্ন্যাসীদের ছবিটবিগুলোকে উপহাস করে তাঁর ভারি উল্লাস! ভাইটি আমার, তুমিই তাকে সাহায্য করতে পারবে — এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

দিদির এ'রকম কাতর অনুনয়ে আমার অন্তর গলে গেল, কারণ আমার বাল্যজীবনে রমাদিদি খুব একটা আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করেছিল, আর মায়ের মৃত্যুর পর পরিবারে সেই শূন্যস্থান স্নেহভালবাসা দিয়ে পূরণ করবার তার চেষ্টার আর অবধি ছিল না।

আমি হেসে বললাম, "তা করব বই কি দিদিমণি, যতদূর পারি আমি তা নিশ্চয়ই করব।" আমারও মনে একান্ত আগ্রহ যে শান্ত, নিরীহ, সদাহাস্যময়ী দিদিটির মুখ হতে চিরঅন্ধকার যেন ঘুচাতে পারি।

অন্তরে নির্দেশ পাবার জন্য রমাদিদি আর আমি নীরবে প্রার্থনায় বসলাম। বছরখানেক আগে রমাদিদি আমায় তাঁকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিতা করতে বলেছিল, আর তাকে তাঁর ক্রমশঃ উন্নতিও হচ্ছিল।

মনে একটা প্রেরণা এল। বললাম, "দেখ, কালকেই আমি দক্ষিণেশ্বরের মা কালী মন্দিরে যাচ্ছি। তুমিও আমার সঙ্গে চল, আর জামাইবাবুকেও সঙ্গে আনবার চেষ্টা কোরো। আমি মনে মনে বেশ টের পাচ্ছি — ঐ পুণ্যপীঠের পবিত্র প্রভাবেই মা কালী তাঁর মন গলিয়ে দেবেন। তবে সঙ্গে আনবার সময় আমাদের উদ্দেশ্য যে কি, তা তাঁকে বোলো না যেন, বুঝলে?"

দিদিও আশান্বিতা হয়ে তখনই রাজী হয়ে গেল। তার পরদিন খুব ভোরে উঠে দেখলাম যে, রমাদিদি আর জামাইবাবু যাবার জন্য তৈরী। ছ্যাকরাগাড়ী আপার সারকুলার রোড* দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের দিকে এগোতে লাগল। ভগিনীপতি সতীশচন্দ্র বসু মহাশয় গুরুদের যোগ্যতা নিয়ে উপহাস করে মজা করতে লাগলেন। দেখলাম, রমাদিদি গাড়ীর এক কোণে বসে নীরবে অশ্রুপাত করে চলেছে।

কানে কানে বললাম, "দিদি, কিচ্ছু ভেব না; জামাইবাবুকে জানতেই দিওনা যে, তাঁর হাসিঠাট্টা আমরা সত্যিসত্যিই সব বিশ্বাস করছি।"

সতীশবাবু তখন বলছেন, "মুকুন্দ, আরে তোমরা এই সব অপদার্থ বুজরুকদের কি করে যে ভক্তিটক্তি কর, তা ভেবেই পাইনা। সাধুসন্ন্যাসীদের চেহারা দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়। হয় পাঁকাটির মত রোগা হবে, নইলে একেবারে হাতীর মত মোটা!"

আমি সশব্দে হেসে উঠলাম। আমার ভালমানুষী প্রতিক্রিয়া সতীশবাবুর কাছে বিরক্তিকর লাগলো। তিনি গুম হয়ে চুপ করে বসে রইলেন। আর একটি কথাও বললেন না। দক্ষিণেশ্বরের মন্দির চত্বরে গাড়ী প্রবেশ করবার সময় তিনি দন্তবিকশিত করে উপহাসের সঙ্গে বললেন, "তোমাদের দক্ষিণেশ্বর ভ্রমণের উদ্দেশ্য বোধহয় আমাকে সংশোধন করার চেষ্টা, কি বল?"

কোন কথা না বলে মুখ ফেরাতেই তিনি খপ করে হাতটি ধরে বললেন, "ওহে নবীন সন্ন্যাসী, দুপুরে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাটি ঠিক করে রাখবার জন্যে মন্দিরের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলতে ভুলো না যেন!" সতীশবাবু নিজে পূজারীদের সঙ্গে কোন প্রকার কথাবার্তা বলতে চান না।

তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দিলাম, "আমি এখন ধ্যানে বসতে যাচ্ছি। আপনার খাওয়াদাওয়ার বিষয়ে ভাবতে হবে না — মা কালীই সব দেখবেন।"

সতীশবাবু শাসিয়ে বললেন, "তোমার ও মা কালী আমার জন্যে এক বর্ণও যে কিছু করবেন, তা আমি বিশ্বাস করি না। আমার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থার জন্যে তুমিই দায়ী, বুঝলে ভায়া?"

---

* বর্তমানে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।

আমি কালীমন্দিরের সামনে নাটমন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। একটা থামের কাছে একটু আড়ালগোছের জায়গা বেছে নিয়ে পদ্মাসনে বসলাম। বেলা যদিও তখন সাতটা, কিন্তু রোদ বাড়লে গরম অসহ্য হয়ে উঠবে।

গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে যেতে সারা পৃথিবী যেন আমার মন থেকে মুছে গেল। মনে মনে ভবতারিণীমায়ের ধ্যান করতে লাগলাম। যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-এই মূর্তি পূজা আর ধ্যান করেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর আকুল কান্নাতে মন্দিরের এই পাথরের মূর্তিই জীবন্ত আকৃতি পরিগ্রহ করে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই কথা বলতেন।

প্রার্থনা করলাম, "মাগো, তুমি তো কথাটি অবধি বল না। কিন্তু তুমিই তো মা, প্রিয়ভক্ত রামকৃষ্ণদেবের আকুল আহ্বানে জীবন্ত হয়ে উঠেছিলে; তবে কেন মা তোমার এই দীনসন্তানের ব্যাকুল কান্নায় কর্ণপাত করছ না?"

আমার সাধনা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে মনে এল এক ঐশ্বরিক প্রশান্তি। পাঁচঘণ্টা কেটে গেলেও এবং মাকে অন্তরে দর্শন করলেও যখন কোন উত্তর পেলাম না, তখন একটু হতাশ হলাম। প্রার্থনা পূরণ করতে বিলম্ব করে ঈশ্বর মাঝে মাঝে ভক্তকে পরীক্ষা করেন। কিন্তু তিনি শেষপর্যন্ত তাঁর দৃঢ় একনিষ্ঠ ভক্তের কাছে তার ইষ্টমূর্তিতেই দেখা দেন। খ্রিস্টানভক্ত যীশুখ্রিস্টের মূর্তি দর্শন করে, হিন্দু তার আরাধ্যদেবতা শ্রীকৃষ্ণ অথবা মা কালীর দর্শন পায়, অথবা কোন মূর্তিসাধক না হলে ভক্ত ক্রমবিকাশমান বিরাট জ্যোতিঃর দর্শনলাভ করে থাকে।

অনিচ্ছায় চক্ষুদু'টি উন্মুক্ত করলাম; দেখি যে মন্দিরদ্বার একজন পূজারী তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করছে — দুপুরে দ্বারবন্ধ করাই প্রথা। নাটমন্দিরের সেই নির্জনস্থান হতে বেরিয়ে উঠানে গিয়ে দাঁড়ালাম। পাথরের মেঝে মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রচণ্ড কিরণে অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত। খালি পা যেন পুড়ে যেতে লাগল।

মনে মনে নীরব অভিমানে বললাম, "দয়াময়ী, তুমি তো মা আমায় দর্শন পর্যন্ত দিলে না আর এখন তো তুমি মন্দিরের বন্ধ দরজার পিছনে

লুকিয়েই রইলে। ভগ্নীপতির জন্যে যে মা তোমার কাছে বিশেষ প্রার্থনা জানাতে এসেছিলাম। তা তুমি মা আমার কথা শুনলে কই?”

সঙ্গে সঙ্গে আমার আন্তরিক প্রার্থনার উত্তর পেয়ে গেলাম। প্রথমে সব অস্বস্তি দূর করে মধুর শীতল শিহরণ আমার পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে পায়ের তলা পর্যন্ত পৌঁছল। তারপর কি আশ্চর্য! মন্দিরটি বিরাট আকৃতি ধারণ করল আর তার বড় দরজাটি ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয়ে মা ভবতারিণীর পাষাণ প্রতিমা প্রকাশিত হল। ক্রমশঃ তা রূপান্তরিত হয়ে জীবন্তমূর্তি পরিগ্রহ করলো — মুখে কি অপরূপ মধুর হাসি। মাথা নেড়ে যেন আমায় ডাকছেন! সে কি অপরিসীম রোমাঞ্চকারী আনন্দ! তা বর্ণনা করবার ভাষা আমার জানা নেই। মনে হলো কেউ যেন অদৃশ্য পিচকারি দিয়ে আমার সমস্ত শ্বাসবায়ু ফুসফুস হতে টেনে বের করে নিয়েছে; শরীর নিস্পন্দ কিন্তু তাতে জড়ত্ব নেই।

ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি এল। বাঁ ধারে গঙ্গার উপর দিয়ে কয়েক মাইল দূরের সব জিনিস স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এবং মন্দির ছাড়িয়ে দক্ষিণেশ্বরের চারদিকের সব তল্লাটও দেখছি। বাড়ীঘরগুলোর দেওয়াল সব যেন ঝক্‌ঝক্ চক্‌চক্ করছে; তার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি দূরে লোকজনেরা সব চলাফেরা করছে।

যদিও আমার শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে না আর শরীরও অদ্ভুত স্থির, তবুও আমি হাত পা অবলীলাক্রমে নাড়তে পারছিলাম। মিনিট কতক ধরে আমি চোখ একবার খুলে আর বুঁজে পরীক্ষা করে দেখলাম। চোখ খোলাই থাক আর বন্ধই হোক, সমানভাবে আমি সারা দক্ষিণেশ্বরের সমস্ত দৃশ্য স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, এক্স-রে-র মত সব জড়পদার্থেরই ভিতর ভেদ করে যেতে পারে। দিব্যচক্ষুর কেন্দ্র সর্বত্রই, কোথাও তার পরিধি নেই। সেই রৌদ্রদগ্ধ বিরাট প্রাঙ্গনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি নূতন করে উপলব্ধি করলাম যে, বুদ্বুদের মতই অন্তঃসারশূন্য এই জড়জগতের স্বপ্নে মগ্ন ঈশ্বরের পথভ্রষ্ট সন্তানের অবস্থা হতে মানুষ যখন নিজেকে মুক্ত বলে অনুভব করতে পারে, তখন আবার সে তার অনন্তরাজ্য ফিরে পায়। যদি

"অব্যাহতিলাভ" করাই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বে আবদ্ধ মানুষের একান্ত কাম্য হয়. তবে অন্য কোন অব্যাহতিই কি সর্ব্বব্যাপিত্বের গৌরবের সঙ্গে উপমিত হতে পারে?

দক্ষিণেশ্বরে আমার যে ঈশ্বরীয় অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল তাতে দেখলাম — অসাধারণভাবে বর্ধিত একমাত্র বিরাট বস্তু হচ্ছে মন্দির আর তার ভিতরকার দেবীমূর্তি। বাকি সব কিছুরই স্বাভাবিক আকৃতি, যদিও প্রত্যেক জিনিসটি যেন একটা মৃদু আর স্নিগ্ধ সাদা, নীল আর বিচিত্র বর্ণের রামধনু রঙের আলোর ছটা দিয়ে ঘেরা। শরীরটা মনে হল যেন বায়বীয় পদার্থে গড়া — এখনিই হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে। আশপাশের সবকিছু যে জড়পদার্থে তৈরী, তার পরিপূর্ণ জ্ঞান তখনও আছে। চারদিকে তাকালাম, আর সে আনন্দস্বপ্ন ভাঙতে না দিয়ে দু'এক পা করে এগোতেও লাগলাম।

মন্দিরের দেওয়ালের পিছনে হঠাৎ দেখতে পেলাম, ভগ্নীপতি একটি কাঁটাওয়ালা পবিত্র বেলগাছের নীচে বসে আছেন। তাঁর চিন্তাধারা কোন্ দিকে বইছে তাও বিনা আয়াসেই বুঝতে পারলাম। দক্ষিণেশ্বরের স্থানমাহাত্ম্যে যদিও তাঁর মন কতকটা উন্নত হয়ে উঠেছিল তথাপি আমার প্রতি মনে মনে তাঁর বিরাগ থেকেই গিয়েছিল। বরাভয়প্রদায়িনী মা ভবতারিণীর মূর্তির দিকে চেয়ে প্রার্থনা জানালাম, "মাগো! তুমি কি আমার ভগ্নীপতির মতিগতি ফিরিয়ে দেবে না মা?"

সেই অপরূপা দেবীমূর্তি, যা এতাবৎকাল নীরবই ছিল, শেষপর্যন্ত কথা বলল ঃ "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।"

অত্যন্ত সন্তোষের সঙ্গে ভগ্নীপতি সতীশবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। যেন কোন আধ্যাত্মিকশক্তি তার ভিতর কাজ করছে, অন্তরের মধ্যে সহসা এইরূপ ভাবের উদয় হওয়াতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে ভূমিআসন ত্যাগ করে উঠে পড়লেন। দেখলাম, মন্দিরের পিছনদিক দিয়ে তিনি দৌড়ে আসছেন; ঘুঁসি বাগাতে বাগাতে তিনি আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

সর্ব্বব্যাপী স্বপ্নদৃশ্য অন্তর্হিত হল। সেই মহিমময়ী দেবীমূর্তিকে আর দেখতে পেলাম না; বিরাট মন্দির তার স্বাভাবিক আকৃতি ধারণ করল,

সঙ্গে সঙ্গে তার স্বচ্ছতাও অন্তর্হিত হল। আবার সর্বশরীর প্রখর রৌদ্রকিরণে ঝলসে যেতে লাগল। দৌড়ে নাটমন্দিরে উঠে পড়লাম। সতীশবাবুও রাগের চোটে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঘড়িতে দেখলাম — বেলা তখন একটা। দেবীদর্শন একঘণ্টাটাক স্থায়ী হয়েছিল।

ভগ্নীপতি রাগে চিৎকার করে বললেন, "দুষ্টু কোথাকার, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তুমি আসনপিঁড়ি হয়ে আর চোখ কপালে তুলে এখানে ঠায় বসে রয়েছ। তোমার খোঁজে বার বার আমি এখানে এসেছি আর গেছি। আমাদের খাবারের কি ব্যবস্থা হল? এখন ত' মন্দির বন্ধ হয়ে গেল আর তুমিও মন্দিরের লোকদের বলে রাখ নি — এখন আর খাওয়াদাওয়া জুটবে কি করে?"

দেবীমূর্তি আবির্ভাবে যে পরম আনন্দ পেয়েছিলাম, তা অন্তরে তখনও বিদ্যমান। পরম নির্ভরতার সঙ্গেই জবাব দিলাম, "মা কালীই আমাদের খাওয়াবেন।"

সতীশবাবু তো ক্রোধে অন্ধ হয়ে চিৎকার করে বললেন, "আচ্ছা বেশ, দেখি আগে হতে বন্দোবস্ত না থাকলে তোমার মা কালী কেমন করে আমাদের আজ এখানে খাওয়ান।"

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই মন্দিরের একজন পূজারী উঠান পেরিয়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

আমায় ডেকে বললেন, "বাবা, তোমার ধ্যানের সময় দেখলাম যে, তোমার মুখ এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত। তোমাদের দল আজ সকালে এখানে এসেছে, তাও দেখেছি। আর তা দেখে তোমাদের খাওয়াদাওয়ার জন্যে প্রচুর খাবারও গুছিয়ে রেখেছি। অবিশ্যি আগে থাকতে বলে না রাখলে মন্দিরের নিয়ম অনুযায়ী কাউকে খেতে দেওয়া হয় না, কিন্তু আমার কাছে তোমাদের কথা আলাদা।"

আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে সোজাসুজি সতীশবাবুর দিকে তাকালাম। ভাবাবেগে উত্তেজিত হয়ে, নীরব অনুতাপে তিনি চোখ নামিয়ে নিলেন। যখন একটি বেশ ভালমত ভোজের বন্দোবস্ত হল — এমন কি তার মধ্যে অসময়ের আম অবধিও ছিল, — তখন দেখা গেল যে ভগ্নীপতি-

মহাশয়ের ক্ষুধা অতি অল্প। তাঁর চিত্ত তখন উদ্‌ভ্রান্ত, চিন্তাসমুদ্রে ডুবে গেছেন।

কলকাতায় ফিরবার পথে সতীশবাবু অত্যন্ত কোমলভাবে সানুনয় দৃষ্টিতে আমার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলেন। সতীশবাবুর স্পর্দ্ধাস্ফালনের সাক্ষাৎ উত্তর হিসাবেই যখন সেই পূজারীঠাকুর এসে আমাদের খেতে ডাকলেন, সেইমুহূর্ত থেকে তিনি আর একটি কথাও বলেন নি।

তার পরদিন বৈকালে দিদির বাড়ী গেলাম। দিদি সস্নেহে আমায় ডেকে উপরে নিয়ে গেল। বলল, "ভাই মুকুন্দ! কি আশ্চর্য ব্যাপার শুনেছ? কাল সন্ধ্যেবেলা তোমার ভগ্নীপতি আমার সামনে বসেই কাঁদছিলেন।

"তিনি কি বললেন জান, 'তুমি দেবী! তোমার ভাইয়ের আমার এই মতিগতি বদলাবার মতলবে আমি যে কি পর্যন্ত সুখী হয়েছি, তা আর মুখে কি বলবো। তোমার উপর যা কিছু আমি অন্যায় অবিচার করেছি, তার সব প্রায়শ্চিত্ত আমি করব। আজ রাত থেকে আমাদের বড় শোবার ঘরটা পূজোর ঘর হিসাবে ব্যবহার করব; আর তোমার ছোট্ট পূজোর ঘরটি আমাদের শোবার ঘর করে নেব। তোমার ভাইকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছি বলে সত্যি অনুতপ্ত। যে নির্লজ্জ ব্যবহার আমি তার সঙ্গে করেছি তার শাস্তি হিসেবে যতদিন না সাধনপথে আমি বেশ অগ্রসর হতে পারি, ততদিন আর আমি মুকুন্দের সঙ্গে কোন কথা বলব না। আজ থেকে জগন্মাতার গভীর ধ্যান করব। কোন না কোন দিন নিশ্চয়ই আমি তাঁর দর্শন পাব বই কি।"

বহুবছর বাদে (১৯৩৬ সালে) দিল্লীতে ভগ্নীপতির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। দেখে অত্যন্ত আনন্দ হল যে, তাঁর খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, জগন্মাতার দর্শনলাভও তাঁর ভাগ্যে ঘটেছিল। তাঁর সঙ্গে অবস্থানকালে আমি দেখেছিলাম যে, যদিও তিনি তখন একটা গুরুতর অসুখে ভুগছিলেন আর দিনেরবেলায় তাঁকে অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকতে হত, তবুও সতীশবাবু রোজ রাত্রের অধিকাংশ সময় গুপ্তভাবে ধ্যানধারণাতেই অতিবাহিত করতেন।

মনে কেমন যেন একটা ধারণা হলো যে, ভগ্নীপতি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। দিদিও আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিল। বলল, "ভাই, আমি তো বেশ ভাল আছি কিন্তু তোমার ভগ্নীপতির অসুখ! তুমি জেনে রেখো যে, আমি সতী স্ত্রী — মরণ আমারই আগে হবে।* আমার আর বেশিদিন নয়, তাও জেনো।"

তার এই অমঙ্গলসূচক কথায় আমি হতভম্ব হয়ে গেলেও তার মধ্যে সত্যের দৃঢ়তা অনুভব করলাম। তার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রায় বছরদেড়েক পরে আমার দিদি যখন মারা যায়, তখন আমি আমেরিকায়। আমার ছোটভাই বিষ্ণু তার বিস্তৃত সংবাদ দিয়েছিল।

বিষ্ণু লিখেছিল, "মরবার সময় রমাদিদি আর সতীশবাবু কোলকাতাতেই ছিলেন। যেদিন মারা যান, সেদিন সকালে দিদি সাজলেন যেন বিয়ের কনে। সতীশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত সাজগোজ কিসের গো?' দিদি বললেন, 'পৃথিবীতে তোমার চরণসেবার আজই আমার শেষ দিন।' কিছুক্ষণ বাদেই তাঁর বুকধড়ফড়ানি শুরু হল। তাঁর ছেলে যখন ডাক্তার ডাকবার জন্যে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল, দিদি তাকে বারণ করে বললেন, 'বাবা, আমায় ছেড়ে আর কোথাও যেও না। ডাক্তার ডাকবার এখন আর দরকার নেই; তোমার ডাক্তার আসার আগেই আমি চলে যাব।' মিনিটদশেক বাদে, স্বামীর চরণে মাথা রেখে, পরিপূর্ণ শান্তিতে, আর বিনা কষ্টে রমাদিদি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।"

বিষ্ণু লিখেছিল, "দিদি মারা যাবার পর সতীশবাবু একলা থাকতেই ভালবাসতেন। একদিন তিনি আর আমি দিদির একটা বড় ফটোগ্রাফ দেখছি — দিদির হাসিমাখা মুখ। দিদি যেন সামনে দাঁড়িয়ে, সতীশবাবু চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'হাঁসছ কেন গো?' মনে ভেবেছ যে আমার আগে পালিয়ে গেছ বলে তুমি বড় চালাক, না? সেটি হবে না, তা জেনে রেখো। দেখিয়ে দেব যে তুমি বেশিদিন আর আমার কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারবে না। শীগগিরই আমি তোমার কাছে যাচ্ছি।'"

---

* হিন্দু স্ত্রীর বিশ্বাস — একান্ত চিত্তে স্বামীসেবার প্রমাণস্বরূপ "সধবা অবস্থায়" মৃত্যু পুণ্যলাভের চিহ্ন।

"যদিও এই সময়ে সতীশবাবুর সম্পূর্ণ রোগমুক্তি ঘটেছিল আর তাঁর স্বাস্থ্যও বেশ চমৎকার ছিল — কিন্তু সেই ফটোগ্রাফের সামনে তাঁর ঐ অদ্ভুত উক্তির অল্প কিছুকাল পরেই তিনি মারা গেলেন। তার কারণ জানা গেল না।"

এমনি করেই দু'টি প্রাণ নিঃশেষিত হয়েছিল, একটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বড়দিদি রমা, আর ভগ্নীপতি সতীশবাবু — দক্ষিণেশ্বরে যাঁর পরিবর্তন ঘটেছিল একজন নিতান্ত সাধারণ সংসারীলোক থেকে এক নীরব সাধুতে।

২৩ পরিচ্ছেদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীলাভ

শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক ডি. সি. ঘোষাল ছিলেন খুব কড়া প্রকৃতির মানুষ। একদিন তিনি বললেন, "দেখ, তোমার ফিলজফির পাঠ্যপুস্তক না পড়ে তুমি তাদের অবহেলাই করছ। বোধহয় ভেবেছ যে বিনা পরিশ্রমে তোমার 'অনুভূতি'র জোরেই পরীক্ষায় পাশ করে যাবে। কিন্তু বাপু মনে রেখো — খেটেখুটে যদি তুমি না পড়, তাহলে তোমার বি. এ. পাশ করা কি করে হয়, তা আমি দেখব।"

ব্যাপার হলো — তাঁর ক্লাসের টেস্ট পরীক্ষায় যদি আমি পাশ না করি, তাহলে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়াই দায় হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ দ্বারা এ সব বিধিবদ্ধ। শ্রীরামপুর কলেজ তার এক অনুমোদিত শাখা। বি. এ. পরীক্ষায় একটা বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরের বছরে আবার সব বিষয়ে ছাত্রকে পরীক্ষা দিতে হয় — ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এই ছিল নিয়ম।

শ্রীরামপুর কলেজে আমার প্রফেসরেরা মজার ছলে আমাকে কতকটা অনুকম্পা করেই রেহাই দিতেন। বলতেন, "মুকুন্দ খুব ধর্মিষ্ঠি হয়ে পড়েছে দেখছি।" সংক্ষেপে আমার সম্বন্ধে এটাই ছিল তাঁদের ধারণা; তাই ক্লাসে কোন প্রশ্ন করে তাঁরা আর আমায় বিব্রত করতেন না। তাঁরা ভেবে রেখেছিলেন যে, টেস্ট পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে না পারলেই তো ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় আমায় আর পাঠান হবে না। আমার সহপাঠীরা আমার নাম দিয়েছিল "পাগলা সন্ন্যাসী" — সেটাই ছিল আমার সম্বন্ধে তাদের মূল্যায়ণ!

দর্শনশাস্ত্রে যাতে প্রফেসর ঘোষাল আমায় ফেল করাতে না পারেন, তার জন্যে একটা চালাকি করে রেখেছিলাম। টেস্ট পরীক্ষার ফল বেরবে বেরবে করছে, এমনি সময় একদিন ক্লাসের একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে

অধ্যাপকের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। যেতে যেতে তাকে বললাম, "আজকে প্রফেসর সাহেবকে কি ঠকানটাই না ঠকাই দেখ; তোমাকে সাক্ষী রাখবার জন্যে সঙ্গে নিচ্ছি, এসো।"

ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলাম আমার পরীক্ষার খাতায় কত নম্বর দিয়েছেন। তিনি মাথা নেড়ে বিজয়গর্বে বললেন, "তুমি পাশটাশ করনি হে বাপু, বুঝলে?" বলেই ডেস্কের উপর একগাদা পরীক্ষার খাতা হাঁটকাতে শুরু করে দিলেন। খানিক পরেই বললেন, "তোমার খাতা এখানে নেই দেখছি; যাক, তুমি নির্ঘাত ফেলই করেছ বুঝতে পারছি — অন্ততঃ পরীক্ষায় হাজির না হয়ে।"

আমি হেসে বললাম, "স্যার, পরীক্ষা আমি নিশ্চয়ই দিয়েছি; খাতার বাণ্ডিলটা আমি একবার দেখতে পারি কি?"

বিভ্রান্ত প্রফেসর মহাশয় তো আমায় অনুমতি দিলেন। আমি তক্ষুনি খাতাটি টেনে বের করলাম। তাতে শুধু আমার রোলনম্বর ছাড়া নামধাম কিছুই লিখিনি। আমার নামের "লাল ধ্বজা" সেখানে দেখতে না পেয়ে অধ্যাপক মশাই আমার খাতায় খুব ভাল নম্বরই দিয়েছিলেন, যদিও আমার লেখাতে পাঠ্যপুস্তক থেকে কোনও "উক্তি" ছিল না।*

আমার চালাকি টের পেয়ে তিনি গর্জে উঠে বললেন, "ওঃ, নেহাতই তোমার ভাগ্য ভাল!" তারপর পরম নির্ভরতার সঙ্গে বললেন ঃ "ইউনিভার্সিটির পরীক্ষায় তুমি নিশ্চয়ই ফেল করবে, দেখো!"

টেস্টের সময় অন্যান্য বিষয়ে আমি কিছু "কোচিং" পেয়েছিলাম, বিশেষতঃ আমার প্রিয়বন্ধু আর খুড়তুতো ভাই, খুড়োমশায় সারদাবাবুর ছেলে প্রভাসচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে। তাতে টেস্টের সব পরীক্ষা-গুলোতেই পাশ করতে পেরেছিলাম — যদিও অতিকষ্টে কোন রকমে পাশমার্ক রেখে।

* অবশ্য এ কথা স্বীকার না করলে প্রফেসর ঘোষালের প্রতি নিতান্তই অবিচার করা হবে যে, আমাদের মধ্যে যে অপ্রীতিকর সম্বন্ধ ছিল তা তাঁর দোষে নয়, তা হচ্ছে আমার ক্লাস থেকে অনুপস্থিতি আর তাতে অমনোযোগ। প্রফেসর ঘোষাল ছিলেন একজন খ্যাতনামা বাগ্মী আর দর্শনশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। পরে অবশ্য আমাদের মধ্যে হৃদ্যতা স্থাপিত হয়েছিল।

এইভাবে চার বছর কলেজে পড়ার পর বি. এ. পরীক্ষায় বসার যোগ্যতা আমি পেলাম। তবে ঐ পরীক্ষা যে পাশ করতে পারব এমন আশা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষার তুলনায় শ্রীরামপুর কলেজের টেস্ট পরীক্ষা ছেলেখেলা। প্রায় রোজই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে যাওয়া-আসা করতাম বলে ক্লাসে যোগদেবার আর বিশেষ সময় পাইনি। ক্লাসে আমার অনুপস্থিতির চেয়ে আবির্ভাবই ছেলেদের কাছে বেশি বিস্ময়ের সৃষ্টি করতো।

আমার প্রতিদিনের রুটিন ছিল, সকাল সাড়ে ন'টার সময় বাইসাইকেলে চড়ে বেরিয়ে পড়া। একহাতে থাকত গুরুদেবের জন্য কিছু শ্রদ্ধার্ঘ্য — আমাদের "পন্থী" ছাত্রাবাসের বাগানের গুটিকতক ফুল। মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করে গুরুজী দুপুরে আমায় খেয়ে যেতে বলতেন। আমিও বিনাবাক্যব্যয়ে সেদিনের কলেজের চিন্তা মন থেকে উড়িয়ে দিয়ে তা সানন্দে গ্রহণ করতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে থেকে তাঁর অননুকরণীয় জ্ঞানোপদেশ শ্রবণ করে বা আশ্রমকর্তব্যসকল পালনে কিছু সাহায্য করে, মাঝরাতের কাছাকাছি নিতান্তই অনিচ্ছুক মনে "পন্থী"র দিকে ফিরে যেতাম। মাঝে মাঝে হয়ত বা সারারাতই কেটে যেতো গুরুসঙ্গলাভে। কথাবার্তার আনন্দে চিত্ত এতই মগ্ন থাকতো যে, রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে কখন যে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে, তাও টের পেতাম না।

একদিন রাত তখন বোধহয় এগারটা — ছাত্রাবাসে ফেরবার উদ্যোগে জুতো পরছি, গুরুদেব গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বি. এ. পরীক্ষা কবে শুরু হচ্ছে?"

"পাঁচদিন পরে, গুরুদেব।"

"সব পড়া তৈরী হয়েছে তো?"

ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম — হাতের জুতো একহাতে ধরাই রইল! আপত্তির সুরে বললাম, "গুরুদেব, আপনি তো জানেন যে প্রফেসরদের চেয়ে আপনারই সঙ্গে আমার পড়ার দিনগুলো কেমন ভাবে কেটেছে। এ'রকম শক্ত পরীক্ষা দিতে গিয়ে লোক-হাঁসিয়ে কি আর হবে বলুন?"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমায় বিদ্ধ করল। কঠিন কণ্ঠে তিনি বললেন, "দেখ, আশ্রমজীবনের উপর তোমার টানের জন্য তোমার বাবা বা তোমার আত্মীয়স্বজনদের কারোর সমালোচনা করবার কোন কারণ ঘটাতে আমি দেব না। শুধু প্রতিজ্ঞা কর যে, তুমি পরীক্ষায় হাজির হবে। যতটুকু যা ভাল পার, তাই উত্তর দেবে, কেমন?"

অশ্রুধারা আর বাঁধ মানতে চাইল না — দু'গাল দিয়ে ঝরে পড়তে লাগলো। বুঝলাম যে গুরুদেবের আজ্ঞা অযৌক্তিক, আর তাঁর আগ্রহ, আর যাই হোক না কেন, নিতান্তই বিলম্বে এসেছে।

কাঁদতে কাঁদতেই কোনমতে উত্তর দিলাম, "আপনার যদি ইচ্ছে হয় তবে অবশ্যই পরীক্ষা দেব; কিন্তু ঠিকমত তৈরী হবার তো আর বেশি সময় নেই, গুরুদেব।" মনে মনে বললাম, "কি আর করব, খাতাগুলোর পাতা সব কেবল আপনার উপদেশ লিখেই ভরিয়ে দেব।"

পরদিন যথাকালে আশ্রমে প্রবেশ করে অত্যন্ত বিমর্ষ আর গম্ভীরভাবে যখন ফুলের তোড়াটি উপহার দিলাম, শ্রীযুক্তেশ্বরজী আমার শোকাকুল মূর্তি দর্শনে হাস্য করে বললেন, "মুকুন্দ, ভগবান কি তোমায় কোথাও সাহায্য করতে ভুলে গেছেন, কি পরীক্ষায়, কি অন্য কোথাও?"

উৎসাহিত হয়ে উত্তর দিলাম, "না গুরুদেব।" কৃতজ্ঞ-স্মৃতির বন্যার ধারা মনকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলল।

গুরুদেব স্নেহকোমল স্বরে বললেন, "দেখ, তোমার আলস্যে নয়, তোমার ঈশ্বরলাভের জ্বলন্ত আগ্রহই কলেজে সাফল্যলাভের পথে তোমার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাইবেল থেকে একটা কথা উদ্ধৃত করে গুরুদেব বললেন, "প্রথমে ভগবানের রাজ্যের সন্ধান কর আর তাঁর ন্যায়পরায়ণতার উপর বিশ্বাস রাখ; তাহলে এ সব জিনিসই তোমার এসে যাবে।*

---

* ম্যাথিউ ৬ঃ৩৩ (বাইবেল)।

বহু বারের মত এবারেও গুরুদেবের সামনে আমার মনের সব গুরুভার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হল। সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া শেষ হলে পর তিনি আমায় "পন্থী"তে ফিরে যেতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত কি এখনও তোমাদের ছাত্রাবাসে থাকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তার কাছেই যাও; তোমায় পরীক্ষাতে সাহায্য করবার জন্যে ঠাকুরই তার মনে প্রেরণা জাগিয়ে দেবেন, তোমার কোন ভাবনা নেই।"

"তা যাচ্ছি, গুরুজী, কিন্তু রমেশ বড্ড ব্যস্ত। বি. এ.তে অনার্স নিয়েছে, বইও আমাদের চেয়ে ঢের বেশি পড়তে হয়।"

গুরুদেব আমার আপত্তিতে কর্ণপাত না করে বললেন, "তোমার জন্যে রমেশের ঠিক সময় হবে, দেখো। এখন যাও দিকিনি।"

বাইসাইকেলে "পন্থী"তে ফিরলাম। ছাত্রাবাসে ঢুকে প্রথমেই দেখতে পেলাম আমাদের ক্লাসের ভালছেলে রমেশকে। আমার অত্যন্ত কুণ্ঠিত অনুরোধে সে বরং খুশি হয়েই বলল — "নিশ্চয়ই, তোমার কাজ করে দেব বই কি!"

সেইদিন বিকালে, আর তারপর দিনকতক ধরে কয়েকঘণ্টা করে নানাবিষয়ে সে আমায় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করে যেতে লাগল।

রমেশ বলল, "আমার মনে হয় — ইংরেজি সাহিত্যে 'চাইল্ড হ্যারল্ডের' ভ্রমণপথের বর্ণনা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। আমাদের তো এক্ষুনি একটা মানচিত্র চাই।"

তাড়াতাড়ি খুড়োমশায় সারদাবাবুর বাড়ীতে গিয়ে একটা মানচিত্র সংগ্রহ করে আনলাম। বায়রনের রোমাণ্টিক ভ্রমণকারী যে যে পথ দিয়ে গিয়েছিল, রমেশ ইউরোপের ম্যাপে পথের সেই সেই জায়গা সব দাগ দিয়ে দিল।

রমেশের পড়াবার সময় জনকতক ছেলে সেখানে জড় হয়েছিল। পড়াশুনার শেষে তাদের মধ্যে একজন বলল, "রমেশ তোমায় ভুল

উপদেশ দিচ্ছে! সাধারণতঃ পঞ্চাশ নম্বর বই থেকে আর বাকী পঞ্চাশ লেখকদের জীবনী থেকে আসে।"

এরপর যখন ইংরেজী সাহিত্যের পরীক্ষা দিতে বসলাম, প্রশ্নগুলোর উপর প্রথম দৃষ্টিপাতেই আমার কৃতজ্ঞাশ্রু ঝরে পড়ে পরীক্ষার খাতা ভিজিয়ে দিতে লাগল। হলের নিরীক্ষক আমার টেবিলের কাছে এসে সহানুভূতির সঙ্গে কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে বললাম, "আমার গুরুমহারাজ বলেছিলেন যে রমেশ আমায় পরীক্ষায় খুব সাহায্য করবে। দেখুন, রমেশ আমায় যে সব প্রশ্নগুলো বলে দিয়েছিল, ঠিক সেই প্রশ্নগুলোই আজ এসে গেছে। আমার বরাতজোরে ইংরেজি সাহিত্যের লেখকদের সম্বন্ধে প্রশ্ন এ'বার খুব কমই এসেছে; আর তাদের জীবনী, অন্ততঃ আমার কাছে তো তা একেবারেই অজানা।"

পরীক্ষা দিয়ে যখন ফিরলাম, ছাত্রাবাসে তখন হৈচৈ পড়ে গেছে। যে ছেলেগুলো রমেশের "কোচিং" নিয়ে ঠাট্টা করেছিল, তারাই এখন আমার দিকে একটু সম্ভ্রমের চোখে চাইল। তাদের সোল্লাস অভিনন্দনে কানে তালা লাগবার জোগাড়! পরীক্ষার সপ্তাহে রমেশের সঙ্গে বহুঘণ্টা কাটাতে হত। সেই সময় সে পরীক্ষকদের কাছ থেকে যে সব প্রশ্ন আসবার সম্ভাবনা, সেগুলি বাতলে দিত। দিনের পর দিন রমেশ যে ধরণের প্রশ্ন বলে দিত, মোটামুটি সেই একই ধরণের ভাষায় প্রশ্নগুলি পরীক্ষায় আসছে দেখা যেত।

কলেজে একটা হৈচৈ পড়ে গেল যে, অলৌকিক গোছের একটা কিছু ব্যাপার ঘটছে, আর এই উদাসী "পাগলা সন্ন্যাসীর" সফলতার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। আমি অবশ্য এ ঘটনার কোন কিছু গোপন রাখবার চেষ্টাই করিনি। প্রশ্নপত্র ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছে — কাজেই স্থানীয় প্রফেসররা তাকে বদলাতে একেবারেই অক্ষম।

ইংরেজি সাহিত্যে পরীক্ষার বিষয়ে ভাবতে গিয়ে একদিন সকালে মনে হলো যে আমি একটা অত্যন্ত গুরুতর ভুল করে এসেছি। কতকগুলি প্রশ্ন দুইভাগে বিভক্ত করা ছিল; এ কিম্বা বি, আর সি কিম্বা ডি। প্রত্যেক ভাগ থেকে একটা করে প্রশ্নের উত্তর না লিখে ভুল করে প্রথম ভাগ

থেকেই একসঙ্গে দুটো প্রশ্নেরই উত্তর লিখে দিয়ে এসেছি, আর দ্বিতীয় ভাগটা নজর না দিয়ে ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

সেই খাতায় খুব জোর ৩৩ নম্বর পেতে পারি — কিন্তু পাসমার্ক হচ্ছে ৩৬। তিন নম্বর কম পড়ছে। দৌড়লাম গুরুদেবের কাছে আমার দুঃখের কাহিনী তাঁকে নিবেদন করতে! বললাম, "গুরুদেব, আমার তো দেখছি পরীক্ষায় এক অমার্জনীয় অপরাধ ঘটে গেছে। রমেশের মাধ্যমে ভগবানের করুণা পাবার আমি যোগ্য নই। আমি নিতান্ত অনুপযুক্ত।"

"কিচ্ছু ভেবো না, মুকুন্দ!" শ্রীযুক্তেশ্বরজীর কণ্ঠস্বর একেবারে সহজ আর নিরুদ্বিগ্ন। তিনি নীল আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, "আকাশে চন্দ্রসূর্য তাদের স্থান পরিবর্তন করলেও করতে পারে, কিন্তু পরীক্ষায় তোমায় কেউ ফেল করাতে পারবে না, তা দেখে নিও।"

হিসেবেতে হদিসই পেলাম না যে আমি কি করে পাশ করব, তবুও আমি অপেক্ষাকৃত শান্তমনে আশ্রম ত্যাগ করলাম। সভয়দৃষ্টিতে আকাশের দিকে দু'একবার তাকালাম; দিনমণি তাঁর স্বস্থানে সুদৃঢ়ভাবে সমাসীন — স্থান পরিবর্তনের কোনই লক্ষণ নেই।

"পন্থী"তে পৌঁছতে ক্লাসের একটি ছেলের মন্তব্য কানে গেল, "এই মাত্র শুনলাম যে এ'বছরে এই প্রথম ইংরেজির পাশমার্ক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।" ঝড়ের বেগে সেই ছেলেটির ঘরে প্রবেশ করাতে ছেলেটি তো ভয় পেয়ে আমার দিকে তাকাল। সাগ্রহে সবকথা তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

হেসে বলল, "ওহে জটাধারী সন্ন্যাসী, তোমার আবার এসব লেখাপড়ার খবরের হঠাৎ কি দরকার পড়ল? আর এখন কেঁদেই বা কি ফল, বল? তবে একথা সত্যি যে পাশমার্ক ৩৩শে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।"

আনন্দে লাফাতে লাফাতে আমার ঘরে ফিরে এসে নতজানু হয়ে সেই পরম করুণাময়কে পাশমার্কের ঠিক অঙ্কটি পূরণ করে দেওয়াতে অন্তরের অন্তঃস্তল হতে উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতাভরে ভক্তিতে প্রণাম জানালাম।

রমেশের ভিতর দিয়ে একটা আধ্যাত্মিক শক্তি যে কাজ করছে তা প্রতিদিন অতি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরে আমি পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতাম। বাঙলা পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটেছিল। রমেশ কিন্তু বাঙলার বিষয়ে আমায় কোন সাহায্য করে নি।

একদিন সকালে বোর্ডিং হাউস ছেড়ে বেরিয়েছি পরীক্ষা হলের দিকে যাব বলে, রমেশ আমাকে পিছন থেকে ডাকল।

ক্লাসের একটি ছেলে অধৈর্য হয়ে আমায় বলল, "ঐ দেখ, রমেশ তোমায় ডাকছে। আর ফিরে কাজ নেই, তা হলে পরীক্ষার হলে পৌঁছতে দেরী হয়ে যাবে।" তার পরামর্শ উপেক্ষা করে আবার বাড়ীর দিকে ছুটলাম।

রমেশ বলল, "বাঙালী ছেলেদের কাছে বাঙলাটা পাশ করা মোটামুটি সহজ। কিন্তু আমার এইমাত্র কি মনে হচ্ছে জান? এ'বছর পরীক্ষকেরা মতলব করেছেন যে, অবশ্য-পাঠ্য বই থেকে প্রশ্ন দিয়ে ছেলেদের একেবারে ফাঁসিয়ে দেবেন।" বন্ধুবর তারপর উনবিংশ শতাব্দীর লোকহিতৈষী দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী থেকে দু'টি গল্প সংক্ষেপে বিবৃত করল।

রমেশকে ধন্যবাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইসাইকেলে চেপে কলেজ হলের দিকে দৌড়লাম। বাঙলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে দুটো অংশ ছিল। প্রথম প্রশ্ন ছিল, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দয়ার দুইটি উদাহরণ লিখ।"* সবেমাত্র শোনা গল্প দু'টি লিখতে লিখতে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম এইজন্য যে, রমেশের শেষ মুহূর্তের ডাক শুনে আমি কি ভালই না করেছি! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের করুণার (শেষপর্যন্ত আমিও এর অন্তর্গত) বিষয় যদি না জানতাম, তাহলে বাঙলায় আমার পাশ করাই দুর্ঘট হত।

---

* প্রশ্নের ঠিক কথাগুলো ভুলে গেছি, কিন্তু আমার মনে আছে যে, তা ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্বন্ধে রমেশ আমায় এইমাত্র যে সব গল্প বলল, সেই সব বিষয়ে। প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার জন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শুধু "বিদ্যাসাগর" নামেই অধিক পরিচিত।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, "যে ব্যক্তি তোমায় সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁর বিষয় একটি রচনা লিখ।" পাঠক মহাশয়, রচনার বিষয়ে কার নাম নির্বাচন করেছিলাম তা বোধহয় আর এখন বলে দিতে হবে না। পাতার পর পাতা যখন আমি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে ভরিয়ে তুলছিলাম, তখন আমি মনে মনে এই ভেবে হাসলাম যে, আমার এই স্বগতঃ ভবিষ্যদ্বাণী ফলে যাচ্ছে — "পরীক্ষার খাতার সব পাতা আপনার উপদেশেই ভরিয়ে তুলব।"

ফিলজফির বিষয়ে আর রমেশকে বিশেষ কোন প্রশ্ন করি নি।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর অধীনে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করে আমি পাঠ্যপুস্তকের ব্যাখ্যা নিশ্চিন্তেই পরিত্যাগ করেছিলাম। সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিলাম ঐ ফিলজফিতেই। আর বাকি সব বিষয়ে অতিকষ্টে কেবলমাত্র পাশমার্ক রাখতে পেরেছিলাম।

আর আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই জানাচ্ছি যে আমার নিঃস্বার্থ বন্ধু রমেশচন্দ্র তার ডিগ্রী খুব উচ্চ প্রশংসার সঙ্গেই লাভ করেছিল।

গ্র্যাজুয়েট হতে পেরেছি দেখে পিতার মুখ হাসিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি স্বীকার করেছিলেন, "মুকুন্দ, তুমি তোমার গুরুর সঙ্গে এত সময় কাটাও যে, আদৌ তুমি যে পাশ করতে পারবে, তা মোটেই ভাবতে পারিনি।" গুরুদেব কিন্তু পিতার নীরব ভর্ৎসনা ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন।

বহুবছর ধরে আমার মনে একটা অনিশ্চয়তা ছিল — আমার নামের পিছনে বি. এ অক্ষর দু'টি কখনও দেখতে পাব কি না। অক্ষর দু'টি বসাতে গিয়ে আমি সর্বদাই ভাবি এ হলো ভগবানের দান — কি কারণে তিনি আমায় দিয়েছেন তা যেন অনেকটা রহস্যাবৃত। মাঝে মাঝে আমি কলেজের ছেলেদের কাছ থেকে শুনি যে, গ্র্যাজুয়েট হবার পর তাদের মুখস্থবিদ্যা অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে। আমায় লেখাপড়ার অসম্পূর্ণতায় অবশ্য এই স্বীকারোক্তি অনেকটাই আমায় সান্ত্বনা দেয়।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ১৯১৫ সালের জুন মাসে যে দিন ডিগ্রী নিয়ে এলাম, সেদিন গুরুদেবের জীবন* হতে অজস্র আশিসধারা আমার জীবনের উপর ঝরে পড়ছে বলে কৃতজ্ঞতায় তাঁর চরণে নতজানু হয়ে প্রণাম করে এলাম।

তিনি পরিতুষ্ট হয়ে বললেন, "ওঠ, ওঠ, মুকুন্দ! ঠাকুর দেখলেন যে, চন্দ্র-সূর্যের গতি বদলানর হাঙ্গামার চেয়ে তোমায় গ্র্যাজুয়েট বানিয়ে দেওয়াই ঢের সহজ, তাই তোমায় গ্র্যাজুয়েটই করে দিলেন।"

---

* পতঞ্জলির 'যোগসূত্রের' 'বিভূতিপাদের' ৩ঃ২৪ শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, অপরের মন এবং ঘটনাসকলের গতিনিয়ন্ত্রণ করবার শক্তি হচ্ছে একপ্রকার বিভূতি; সেখানে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, "সর্বজনীন সহানুভূতি"। ["সূত্র" সম্বন্ধীয় দু'টি বৈদগ্ধ্যপূর্ণ গ্রন্থ হলো যথাক্রমে 'Yoga System of Patanjali (Vol. 17, Harvard University) ও দাশগুপ্তের 'Yoga Philosophy']

সকল শাস্ত্রই বলে যে ঈশ্বর তাঁর নিজের সর্বশক্তিমান প্রতিরূপে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বের উপর প্রভাব অতিপ্রাকৃত বলেই বোধহয়. কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে — যাঁদের দৈবসত্তার বিষয়ে "সম্যক স্মৃতির" উদয় হয়, তাঁদের প্রত্যেকেরই কাছে এই শক্তি সহজ আর স্বাভাবিকভাবেই থাকে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মত ঈশ্বরোপলব্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা অহঙ্কার এবং তজ্জনিত কামনাবাসনাশূন্য হন। প্রকৃত সদ্‌গুরুদের ক্রিয়াকলাপ "ঋতের" মতই অনায়াসলব্ধ! ইমার্শনের কথায়ঃ "মহৎ ব্যক্তিরা 'গুণবান্' নয় — গুণই হয়ে যান; তাহলেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়, আর ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হন।"

ব্রহ্মজ্ঞানী যে কোন ব্যক্তিই অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করতে পারেন, কারণ তিনি খ্রিস্টের মত বিশ্বসৃষ্টির সূক্ষ্ম বিধিনিয়মের বিষয় অবগত থাকেন। কিন্তু সকল সদ্‌গুরুগণই যে ঐরূপ অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করতে চান, তা নয়। প্রত্যেক ঋষিই তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করেন। আর এ জগতে এই ব্যষ্টিগত প্রকাশই হচ্ছে মূলীভূত কারণ, যেখানে দুইটি বালুকণা একেবারে সমান দেখতে হয় না।

ভগবদ্‌জ্ঞানসম্পন্ন সাধুদের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট বিধিনিয়ম রচনা করা যায় না; কেউ কেউ অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন, কেউ বা করেন না। কেউ কেউ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকেন আর অন্যেরা হয়ত (রাজর্ষি জনক অথবা আভিলার সেন্ট থেরেসার মত) বৃহৎ কর্মে লিপ্ত থাকেন। কেউ কেউ উপদেশ দান করেন, ভ্রমণ করেন, অথবা বহু শিষ্য গ্রহণ করেন; আবার কেউ কেউবা নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে ছায়ার মত আত্মগোপন করে থাকেন। পৃথিবীতে এমন কোন সমালোচক আবির্ভূত হন নি যিনি প্রত্যেক সাধুর অতীত কর্মফলের রহস্য ভেদ করে তাদের জন্য নির্ধারিত বিভিন্ন কর্মপন্থা জানতে পারেন।

২৪ পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাস লইয়া 'স্বামী' আখ্যা গ্রহণ

বহু দিনের আশা হৃদয়ে বহন করে একদিন গুরুদেবকে বললাম, "গুরুদেব, বাবার একান্ত ইচ্ছা যে, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে* একটি কর্মকর্তার পদ গ্রহণ করি। আমি কিন্তু তা একেবারে প্রত্যাখ্যান করে এসেছি; আপনি কি আমায় সন্ন্যাস দেবেন না?" — বলে অত্যন্ত কাতরনয়নে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। আগে আগেও বরাবরই তিনি আমার এ অনুরোধ এড়িয়ে এসেছেন, আমার মনের দৃঢ়তা পরীক্ষা করবার জন্য। আজকে কিন্তু তিনি প্রসন্নহাসি হাসলেন।

শান্ত স্বরে সহাস্যে তিনি বললেন, "আচ্ছা, কালই তোমায় সন্ন্যাস দেব। সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছে যে তোমার অটুট আছে তাতে আমি খুব খুশি হয়েছি। লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই বলতেন, 'জীবনের বসন্তেই যদি তুমি ভগবানকে ডেকে না আন, তবে তোমার জীবনের শীতে তিনি কেন আসবেন, বল?'"

"পূজনীয় গুরুদেব, আপনার মত আমিও সন্ন্যাস নেবার ইচ্ছা কখনও পরিত্যাগ করি নি," বলে অপরিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে তাঁর দিকে চেয়ে হাসলাম।

বাইবেলে আছে, "যে অবিবাহিত, সে প্রভুর বিষয়ে চিন্তা করে, কিরূপে সে প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে, কিন্তু যে বিবাহিত, সে সংসারের বিষয় চিন্তা করে, কিরূপে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে।"† আমার নানা বন্ধুর জীবন পর্যালোচনা করে দেখেছি, তারা আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সাধনার মধ্য থেকেও শেষপর্যন্ত বিয়েই করে ফেলেছে। তারপর সংসারের বোঝা ঘাড়ে পড়াতে তাদের গভীর ধ্যানধারণার প্রতিজ্ঞা সব একেবারে ভুলে গেছে।

---

* বর্তমানে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে।

† ১ করিন্থিয়ানস ৭ ঃ ৩২-৩৩ (বাইবেল)।

জীবনে ঈশ্বর গৌণ বা অপ্রধান* স্থান অধিকার করে থাকবেন, এ চিন্তা আমার কাছে একেবারে অকল্পনীয়। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তিনি। তাঁর অযাচিত করুণার দান জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের উপরে নীরবে বর্ষিত হচ্ছে। প্রতিদানে মানুষের একটি জিনিসই দেবার আছে — যা দেওয়া বা না দেওয়াতে আছে তারই অধিকার — সেটা হচ্ছে তার প্রেম।

সৃষ্টির প্রতি অণুপরমাণুতে তাঁর অস্তিত্ব রহস্যাবৃত করবার উদ্দেশ্যে স্রষ্টার অপরিসীম যত্ন নেওয়ার একমাত্র অভিপ্রায় হলো একটি সংবেদনশীল ইচ্ছা — মানুষ যেন তার স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েই তাঁকে সন্ধান করে। তাঁর সর্বশক্তিমত্তার বজ্রমুষ্টিকে প্রতিটি বস্তুর সহজসাধ্যভাবের কি কুসুমপেলবতাতেই না ঢেকে রেখেছেন!

তার পরের দিনটি হচ্ছে আমার জীবনের একটি অতীব স্মরণীয় দিন। সেদিনের কথা আজও আমার মনে পড়ে। কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে বেরোবার কয়েক সপ্তাহ বাদেই — সেটা ছিল ১৯১৫ সালের জুলাই মাসের এক বৃহস্পতিবার — সূর্যকরোজ্জ্বল দিবসে শ্রীরামপুর আশ্রমের ভিতরকার বারান্দায় গুরুদেব একখণ্ড সাদা সিল্ক গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত করলেন — চিরকালের সন্ন্যাসীর বসন। শুকিয়ে গেলে পর গুরুদেব সেই গৈরিক বস্ত্র দিয়ে আমার সর্বাঙ্গ আবরিত করে বললেন, "একদিন তোমায় পশ্চিমে যেতে হবে যেখানে সিল্কই লোকে বেশি পছন্দ করে। তাই, প্রচলিত সূতার কাপড়ের বদলে তোমার জন্যে আমি এই সিল্কই বেছে নিয়েছি।"

অবশ্য ভারতবর্ষে, যেখানে ভিক্ষাই সন্ন্যাসীর জীবনাদর্শ, সেখানে রেশমবস্ত্রাবৃত সন্ন্যাসী একটা অসাধারণ দৃশ্য বটে। অনেক যোগীই কিন্তু সিল্কের আচ্ছাদন পরিধান করেন; তাতে করে তুলোর চেয়ে বেশি তাদের শরীরের সূক্ষ্মশক্তিপ্রবাহকে রক্ষা হয়।

শ্রীযুক্তেশ্বরজী বললেন, "আমি ওসব অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান বিশেষ পছন্দ করি না। আমি তোমায় 'বিদ্বৎ' উপায়ে (বিনা অনুষ্ঠানে) সন্ন্যাস দেব।"

---

* "জীবনে ঈশ্বরকে যে গৌণ বা অপ্রধান স্থান দেয়, সে তাঁকে কোন স্থানই দেয় না।"
— রাস্কিন।

'বিবিদিষা' অর্থাৎ সানুষ্ঠানিক দীক্ষাতে হোম ইত্যাদি করতে হয়; সেই সময় প্রতীক শ্রাদ্ধও করতে হয়। এতে করে শিষ্যের জড়দেহ মৃত বলেই গণ্য হয়ে থাকে — জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ! নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী পরে একটি মন্ত্রোচ্চারণ করেন, যথা, — "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"* অথবা "তত্ত্বমসি" কিম্বা "সোহহং"। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কিন্তু সরল অনাড়ম্বরভাবে, সব লৌকিকবিধি পরিহার করে, আমায় শুধু একটি নূতন নাম নির্বাচন করে নিতে বললেন।

তিনি হেসে বললেন, "তুমি নিজেই নিজের নাম বেছে নেবে — এ বিশেষ অধিকার আমি তোমায় দিচ্ছি।"

মুহূর্তমাত্র চিন্তা করে আমি বললাম, "যোগানন্দ"!† (যোগের মাধ্যমে আনন্দ)

"তাই হোক! আজ থেকে তুমি সাংসারিক জীবনের নাম মুকুন্দলাল ঘোষ পরিত্যাগ করে স্বামী সম্প্রদায়ের 'গিরি' উপাধি নিয়ে যোগানন্দ নামে অভিহিত হবে।"

নতজানু হয়ে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পদতলে প্রণাম করতে, সর্বপ্রথম তাঁর মুখ থেকে আমার নূতন নাম শুনে আমার সর্বশরীর কৃতজ্ঞতায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কত স্নেহের সঙ্গে, কত অক্লান্তভাবে তিনি পরিশ্রম করে এসেছেন, যাতে করে বালক মুকুন্দ এক দিন সন্ন্যাসী যোগানন্দতে পরিণত হতে পারে। সানন্দে আমি শঙ্করদেবের (শঙ্করাচার্যের)‡ স্তোত্র হতে কয়েক ছত্র আবৃত্তি করলাম ঃ—

* "এই আত্মাই ব্রহ্ম" — পরব্রহ্ম, অজ, নির্বিশেষ (নেতি, নেতি; এ নয়, এ নয়) — কিন্তু বেদান্তে এঁর বিষয় প্রায়ই সৎ-চিৎ-আনন্দ রূপেই উল্লিখিত হয়েছে।

† সন্ন্যাসীদের মধ্যে এই নাম খুবই প্রচলিত।

‡ আদি শঙ্কর, শঙ্করাচার্য নামেই অভিহিত। আচার্য মানে "ধর্মোপদেষ্টা"। শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের তারিখ পণ্ডিতগণের তর্কের বিষয়ীভূত। কতকগুলি লিখিত বিবরণ হতে জানতে পারা যায় যে সেই জগৎপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদী খ্রিঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। ঋষি আনন্দ গিরির মতে সময়টা হলো খ্রিঃ পূঃ ৪৪—১২ অব্দ। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ তাঁর আবির্ভাবকাল অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ বা নবম শতাব্দীর প্রথমভাগ বলে নির্দিষ্ট করেন। বহু শতাব্দীব্যাপী তাঁর অবস্থিতিকালই বটে!!

"ওঁ মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং।
ন চ শ্রোত্র ন জিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুঃ।
চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।। ১।।
ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ।
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য—।
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।। ২।।
অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো।
বিভুত্বাচ্চ সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তি র্ন ভীতি—।
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্।। ৩।।"

স্বামী উপাধিধারী প্রত্যেক সন্ন্যাসীই স্মরণাতীত কাল হতে ভারতে সম্মানিত অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের একজন। বহুশতাব্দী পূর্বে শঙ্করাচার্য কর্তৃক বর্তমান আকারে পুনর্গঠিত এই সম্প্রদায়, তখন হতেই ঋষিকল্প ধর্মোপদেষ্টাদের অবিচ্ছিন্ন অধ্যক্ষতার ধারায় পরিচালিত (প্রত্যেকেই পরম্পরাক্রমে জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য উপাধি ধারণ করেন)। বহু সন্ন্যাসী, বোধ হয় দশ লক্ষেরও বেশি, এই

পুরীস্থ সুপ্রাচীন গোবর্দ্ধন মঠের স্বর্গত জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য, মহামান্য ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ, ১৯৫৮ সালে তিনমাসের জন্য আমেরিকা পরিভ্রমণে যান। কোন শঙ্করাচার্যের পাশ্চাত্যভ্রমণ সেই প্রথম। তাঁর ঐতিহাসিক ভ্রমণের আয়োজক ছিল সেলফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ এবং যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া। জগদ্‌গুরু আমেরিকার প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন এবং সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ আর্নল্ড টয়েনবীর সহিত বিশ্বশান্তি প্রসঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/ সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপের গুরুগণের প্রতিনিধি হয়ে যোগদা সৎসঙ্গের দু'জন সাধুকে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য পুরীর শ্রীশঙ্করাচার্য ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে সঙ্ঘমাতা শ্রীশ্রী দয়ামাতার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। উক্ত দীক্ষানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল পুরীস্থ যোগদা সৎসঙ্গ আশ্রমের শ্রীযুক্তেশ্বর মন্দিরে।

(প্রকাশকের নিবেদন)

সম্প্রদায়ভুক্ত; আর এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করতে গেলে একটি আবশ্যিক নিয়ম পালন করতে হয়, এবং তা হচ্ছে — যাঁরা স্বয়ং স্বামী উপাধিধারী এমন ব্যক্তির নিকট হতে দীক্ষাগ্রহণ। স্বামী সম্প্রদায়ের সকল সন্ন্যাসীরাই তাঁদের আধ্যাত্মিক ধারা, তাঁদের একমাত্র সাধারণ গুরু আদি শঙ্করাচার্য হতে অনুসরণ করেন। তাঁরা দারিদ্র্যবরণ, সাধুজীবনযাপন এবং অধ্যক্ষ বা আধ্যাত্মিক গুরুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের ব্রত গ্রহণ করেন। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে বহুবিষয়ে প্রাচীনতম স্বামী সম্প্রদায়ের সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়।

নূতন নামগ্রহণ করে তার সঙ্গে স্বামী উপাধি যুক্ত হলে বোঝায় যে দশনামী সম্প্রদায়ের একটির সঙ্গে ঐ ব্যক্তির লৌকিক সম্বন্ধ আছে। 'দশনামী' সম্প্রদায়ে 'গিরি' উপাধি আছে। স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর 'গিরি' ছিলেন, সুতরাং আমিও 'গিরি'! অপরাপর শাখার নাম সাগর, ভারতী, পুরী, সরস্বতী, আরণ্য ও তীর্থ প্রভৃতি।

কোন "স্বামী"র সন্ন্যাসজীবনে সাধারণতঃ "আনন্দান্ত" নাম গ্রহণের অর্থ হচ্ছে কোন বিশেষ পথ, অবস্থা বা ঐশ্বরিক ভাব বা গুণ, যথা — প্রেম, জ্ঞান, বিবেক, ভক্তি, সেবা, যোগ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর মুক্তিলাভের আকাঙক্ষা।

নিখিল মানবজাতির প্রতি নিঃস্বার্থ সেবা এবং ব্যক্তিগত আশা-আকাঙক্ষা ও বন্ধন পরিহারের আদর্শ স্বামী সম্প্রদায়ের অধিকাংশকে ভারতবর্ষে মানবহিতৈষণা এবং শিক্ষাবিষয়ক কার্যে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত রাখে; কখনও কখনও ভারতের বাইরেও এঁদের বহু কার্যকলাপের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। জাতিধর্মবর্ণ অথবা স্ত্রীপুরুষ বা শ্রেণী নির্বিশেষে ইঁহারা বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ অনুসরণ করে চলেন। তাঁদের চরমলক্ষ্য মোক্ষ। শয়নে, স্বপনে, "সোহহং" এই জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রসন্নচিত্তে তিনি এই সংসারেই চলাফেরা করেন বটে, কিন্তু এ সংসারের একজন হয়ে নয়। এইরূপে তিনি "স্ব" অর্থাৎ আত্মার সহিত একীভূত হয়ে 'স্বামী' নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একাধারে সন্ন্যাসী এবং যোগী। স্বামী, যিনি উচ্চতর সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন বলেই যে তিনি যোগী হবেন, তা নয় — ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য যে কোন ব্যক্তি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সাধন করে যোগী হতে পারে — হোক না সে বিবাহিত কি অবিবাহিত, বা কোন স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত।

সন্ন্যাসীর পথ শুষ্কজ্ঞান — নিস্পৃহ কঠিন ত্যাগের পথ; কিন্তু যোগী সুনির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করে ক্রমপ্রচেষ্টায় সাধনপথে অগ্রসর হতে থাকেন, যাতে করে তাঁর দেহ, মন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশিক্ষিত হবার পর আত্মারও ক্রমশঃ মোক্ষলাভ হয়। ভাবাবেগে পরিচালিত বা কোন বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে, যোগীরা প্রাচীন ঋষিপরিকল্পিত সুপরীক্ষিত প্রণালীসমূহ অবলম্বনে যোগপ্রক্রিয়া সাধন করেন। এই যোগসাধনেই ভারতবর্ষে যুগে যুগে বহু সাধুসন্ন্যাসী প্রকৃত মুক্ত, প্রকৃত যোগাবতার রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন।

যে কোন বিজ্ঞানের মত যোগও দেশকালপাত্রে আবদ্ধ নয় — সর্বকালের সকল দেশের লোকের দ্বারাই সাধনীয়। কতকগুলি অজ্ঞ লেখকদের ধারণা — "প্রতীচ্যের লোকেদের পক্ষে যোগ বিপজ্জনক অথবা অনুপযোগী" — তা একেবারেই ভুল। আর এই ধারণা প্রচার করে প্রতীচ্যের আগ্রহশীল, শ্রদ্ধাবান, সমুৎসুক শিক্ষার্থীদের এর বহুবিধ শুভফল পাবার পক্ষে যে কি শোচনীয় প্রতিবন্ধক তৈরী হয়েছে তা আর বলা যায় না।

সকল দেশের সকল জাতির মানুষের মনে যে চিন্তাধারার উচ্ছৃঙ্খলতা, যা তার আপন স্বরূপের পরিচয় নিতে গেলে সমানভাবে সকলেরই পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে — সেই উচ্ছৃঙ্খল চিন্তারাশিকে সংযত করার, সুনিয়ন্ত্রিত করার বিধিনিবদ্ধ প্রণালীর নামই হচ্ছে যোগ। সূর্যালোকের উপকারিতার মত যোগও প্রাচী ও প্রতীচী — উভয় বিশ্বের লোকেদের পক্ষে সমভাবে উপকারী। অধিকাংশ মানুষের চিন্তা উচ্ছৃঙ্খল ও উৎকল্পনাশ্রয়ী; এইখানেই মনঃসংযমনের বিজ্ঞান যোগের বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায়।

মহর্ষি পতঞ্জলি* বলে গেছেন, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ"।† হিন্দু ষড়দর্শনের মধ্যে তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা "যোগসূত্র" হচ্ছে অন্যতম। প্রতীচ্য দর্শনশাস্ত্রের সহিত তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, হিন্দুর ষড়দর্শনে শুধু তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনাই যে আছে তা নয় — তার সাধনের ব্যবহারিক প্রণালীও প্রদর্শিত হয়েছে। দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যার সর্ববিধ সম্ভাব্য প্রশ্নের অনুসন্ধানের পর ছয়টি দর্শনে ছয় প্রকার সুনির্দিষ্ট বিধি প্রদর্শিত হয়েছে, যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুঃখের চিরতরে নিবৃত্তি আর পরমানন্দলাভ।

পরবর্তী উপনিষদসমূহ এই মতই পোষণ করে যে, ষড়দর্শনের‡ মধ্যে "যোগসূত্র"তেই পরমসত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির জন্য সর্বাপেক্ষা ফলপ্রদ উপায় আছে। যোগপ্রণালীর সক্রিয়সাধনে মানুষ চিরতরে নিষ্ফল অনুমানের ক্ষেত্র পরিহার করে সেই পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎ অনুভূতিলাভ করতে পারে।

পতঞ্জলি যে অষ্টাঙ্গযোগের বিষয় বর্ণনা করে গেছেন — তার মধ্যে (১) যম হচ্ছে — সত্য, ব্রহ্মচর্য, আর (২) নিয়ম হচ্ছে — দেহ ও মনের শৌচ, সর্ব সন্তোষ, তপঃ, এবং ঈশ্বর ও গুরুভক্তি।

তারপর (৩) আসন। মেরুদণ্ড ঋজু আর শরীর দৃঢ় ও স্থিরভাবে রেখে ধ্যানের জন্য নিশ্চলভাবে আর আরামে উপবেশন করাকে আসন

---

* পতঞ্জলির আবির্ভাবের তারিখ জানা যায় না, যদিও বহু পণ্ডিত তাঁর কাল খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক বলে নির্দিষ্ট করেছেন। ঋষিগণ বিভিন্ন বিষয়ে এক বিরাট সংখ্যার তথ্য এত গভীর অন্তর্দৃষ্টিবলে রচনা করে গেছেন যে, কালের প্রভাব তাতে কোন প্রাচীনত্ব আনতে পারে নি। তবুও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকেরা বিব্রত হয়েছেন এইহেতু যে, ঋষিগণ তাঁদের রচনায় তৎকালীন সময় বা তারিখের উল্লেখ বা তাঁদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেবার কোন চেষ্টাই করেন নি। তাঁরা জানতেন যে, তাঁদের জীবন হলো অনন্ত মহাজীবনের কেবল একটা সাময়িক স্ফুরণমাত্র, আর সত্য হচ্ছে কালাতীত — তাকে ট্রেডমার্কে চিহ্নিত করা যায় না আর সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও নয়।

† যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ — (যোগসূত্র, ১ ঃ ২)। এর অর্থ — মনের সঙ্কল্প-বিকল্পের লয় ভাব। চিত্ত — চিন্তন ব্যাপারের অন্তর্গত নীতি, যার মধ্যে আছে প্রাণশক্তিসমূহ, মানসসত্তা, অহঙ্কার, বুদ্ধি ইত্যাদি। 'বৃত্তি' = চিন্তা ও ভাব, যা মানুষের সংজ্ঞান মনে অবিরত উত্থিত ও বিলীন হয়। 'নিরোধ' অর্থে চিত্তকে স্থির, নিশ্চল, নিয়ন্ত্রিত রাখা।

‡ ষড়দর্শন — ছয়টি প্রামাণ্য (বেদমূলক) দর্শন হচ্ছে, সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, মীমাংসা, ন্যায় ও বৈশেষিক।

বলে। (৪) প্রাণায়াম। প্রাণ — সূক্ষ্ম প্রাণশক্তির নিয়ন্ত্রণ। প্রাণায়ামের পর (৫) প্রত্যাহার অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হতে মনকে দূরে রাখা।

তার পরের চারটি অঙ্গই হচ্ছে প্রকৃত যোগের অঙ্গ, যথা ঃ— (৬) ধারণা (মনকে একমুখী চিন্তায় নিবিষ্ট রাখা)। (৭) ধ্যান (চিন্তা); তারপর (৮) সমাধি। এই অষ্টাঙ্গ যোগসাধনের* পর "কৈবল্যপ্রাপ্তি" হয়। যোগীর, সকল বোধশক্তির অতীত সত্যোপলব্ধি ঘটে।

কেউ কেউ হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারেন, "আচ্ছা, সন্ন্যাসী বড় না, যোগী বড়?" বলাবাহুল্য, কৈবল্যপ্রাপ্তি ঘটলে বা ঈশ্বর সাযুজ্য লাভ হলে আর পথের বিভিন্নতার কোনই গুরুত্ব থাকে না, সবই তখন অদৃশ্য হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় কিন্তু বর্ণিত হয়েছে যে, যোগসাধনের প্রণালী সর্বতোমুখী, কারণ এর সাধনপ্রক্রিয়া কেবল যে কতকগুলি বিশেষ শ্রেণী বা মনোভাবের লোকেদের যথা, সন্ন্যাসী, সাধুসন্ত প্রভৃতি জন্যই উপযোগী তা নয়; এ সকলের পক্ষেই উপযোগী। যোগ সাধনার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্মমতাবলম্বী হবার দরকার নেই। যোগবিজ্ঞান একটা সার্বজনীন অভাব পূরণে প্রয়োজন বলেই এর একটা স্বাভাবিক সর্বগত আবেদন আছে।

প্রকৃত যোগী সংসারে নির্লিপ্ত থেকে আপনার কর্তব্য সম্পাদন করে যেতে পারেন — জলে যেমন মাখন ভাসে আর কি; অমন্থিত, সহজে জলে মিশে যাওয়া নীতিশূন্য মানবিকতার দুগ্ধের মত নয়। সাংসারিক কর্তব্য পালন করতে ঈশ্বর থেকে দূরে থাকার প্রয়োজন হয় না, অবশ্য যোগী যদি আপনার আত্মচিন্তা প্রণোদিত কামনাবাসনায় জড়িত না হয়ে পড়ে ঈশ্বরের হস্তে চালিত যন্ত্রের ন্যায় নিজ জীবনের কর্তব্য পালন করে যান — তবেই।

---

* বৌদ্ধধর্মের অষ্টাঙ্গ মার্গ হচ্ছে ঃ—

১। সম্মা দিঠ্‌ঠি	সম্যক্ দৃষ্টি	৫। সম্মা আজীবো	সম্যক্ জীবনযাত্রা
২। সম্মা সংকপ্পো	সম্যক্ সঙ্কল্প	৬। সম্মা ব্যায়ামো	সম্যক্ প্রচেষ্টা
৩। সম্মা বাচা	সম্যক্ বাক্	৭। সম্মা সতি	সম্যক্ আত্মস্মৃতি
৪। সম্মা কম্মন্তো	সম্যক্ কর্ম	৮। সম্মা সমাধি	সম্যক্ সমাধি

পতঞ্জলির এই অষ্টাঙ্গযোগ বৌদ্ধধর্মের উপরিউক্ত মানব আচরণের বা 'শীলের' নৈতিক আদর্শ, "অষ্টাঙ্গ মার্গর' সহিত কেউ যেন না ভুল করেন।

পৃথিবীতে বহু মহাপুরুষেরা আছেন, যাঁরা আজ আমেরিকা, ইউরোপ অথবা অন্যান্য অহিন্দু দেহের মধ্যে অবস্থিতি করছেন, তাঁরা হয়ত যোগী কি সন্ন্যাসী কথাগুলো জন্মেও কখনো শোনেন নি। অথচ তাঁরাই হচ্ছেন ঐ সব সংজ্ঞার্থের আদর্শ উদাহরণ। মানবজাতির প্রতি নিষ্কামসেবা, প্রবল রিপুদমন অথবা চিন্তাসংযমনে অদ্ভুত ক্ষমতা, অথবা তাঁদের একনিষ্ঠ ঈশ্বরপ্রেম বা গভীর ধ্যানশক্তির জন্য এক হিসাবে তাঁরা প্রকৃতই যোগী; তাঁরা নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্যস্থল বেছে নিয়েছেন — যোগ বা আত্মসংযম। যদি যোগ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট পন্থায় এঁদের উত্তমরূপে শিক্ষিত করা যায়, যাতে করে এঁদের জীবন ও মন অধিকতর সচেতনতার সঙ্গে পরিচালিত করা সম্ভব হয়, তা হলে এঁরা আরও উচ্চতর স্তরে আরোহণ করতে পারেন।

প্রতীচ্যের কিছু কিছু লেখক যোগসম্বন্ধে ভ্রান্তধারণা করে থাকেন; কিন্তু যাঁরা এর সমালোচনা করেন, তাঁরা কোনকালেই যোগ সাধনের কোনপ্রকার চেষ্টাই করেন নি। যোগ সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে সুইস্ মনস্তাত্ত্বিক ডাঃ সি. জি. য়ুং* বলেছেন ঃ—

"যখন কোন ধর্মসাধন প্রণালী 'বিজ্ঞান সম্মত' বলে অভিহিত হয়, তখন সেটা প্রতীচ্যেও সাধারণের গ্রহণযোগ্য হবে বলে নিশ্চিত হতে পারা যায়। যোগ সেই আশাটাই পূরণ করে থাকে। নূতনত্বের আকর্ষণ আর অল্পশিক্ষিতদের মোহ ছাড়াও বহুলোকের এ পথ অবলম্বন করবার যথেষ্ট কারণ আছে। এতে সংযম্য ভূয়োদর্শনের সম্ভাবনা থাকে এবং তাতেই 'তথ্য'লাভের বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনও মেটে। আর তা ছাড়া এর ব্যাপকতা ও গভীরতা, এর প্রাচীনত্ব, এর মত ও পথ, যেখানে জীবনের সকল স্তরের উপর অধিকার বিস্তার করেছে, সেখানে এর স্বপ্নাতীত সম্ভাবনা আছে।

"ধর্মই হোক আর আধ্যাত্মিক সাধনাই হোক, সকলের মধ্যেই একটা মনস্তাত্ত্বিক নিয়মানুবর্তিতা আছে, যার মানে হচ্ছে এ একটি মানসিক

---

* ডাঃ য়ুং ১৯৩৭ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক উপাধিতে ভূষিত হন।

স্বাস্থ্যগঠন প্রণালী। কেবলমাত্র বিবিধ শারীরিক যোগকৌশলও* শরীরস্বাস্থ্য সূচনা করে, যা সাধারণতঃ জিমন্যাস্টিকজাতীয় শারীরক্রীড়াকৌশল এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের সংযমসাধন প্রণালীর চেয়েও উন্নততর; যেহেতু এ শুধু যে শারীরযান্ত্রিক বা বৈজ্ঞানিক তা নয় — এর মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবও আছে। শরীরের অংশবিশেষের সাধনায় এ তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আত্মার সঙ্গে একীভূত করে। এর প্রত্যক্ষ উদাহরণ পাওয়া যায় প্রাণায়ামে। প্রাণায়ামসাধন শুধু যে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিনিয়ন্ত্রণ করে প্রাণশক্তির সংযম করাকে বোঝায় তাই নয়, শ্বাসের সঙ্গে যে প্রাণ বিশ্বপ্রাণের সঙ্গে জড়িত — তার সাধনা করাকেও বোঝায়।

"যোগ যে মূলভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার অনুসরণ বিনা যোগসাধন কল্পনাই করা যায় না, আর তা করাও নিরর্থক। যোগে শারীরিক আর আধ্যাত্মিক ভাব অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে এক অপূর্ব সুসামঞ্জস্যতা আনয়ন করে।

"প্রাচ্যে, যেখানে এইসব ভাবধারা আর প্রক্রিয়ার উৎকর্ষসাধন হয়েছে, আর যেখানে সহস্র সহস্র বৎসরের প্রচলিত অখণ্ড প্রথায় প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক ভিত্তি গঠিত হয়েছে, সেখানে আমার বিশ্বাস, যোগই হচ্ছে সম্পূর্ণ ও বিধিসম্মত প্রণালী, যার দ্বারা শরীর আর মনের এমন একটা একীভবন সাধিত হয়, যার উপর আর কোন প্রশ্নই করা চলে না। এই ঐক্য এমন একটা মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার সৃষ্টি করে, যাতে করে এমন এক অপরোক্ষানুভূতি জন্মায় — যা চেতনাকে অতিক্রম করে।"

পাশ্চাত্যে সেইদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন আত্মসংযমের অন্তর্বিজ্ঞান, বহিঃপ্রকৃতিকে জয় করার বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টারই মত একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠবে। নূতন আণবিকযুগে দেখা যাবে যে, জড়পদার্থ যে আসলে ঘনীভূত শক্তি — এই বৈজ্ঞানিক, অবিসম্বাদিত সত্যে মানুষের মন আরও স্থির, প্রশান্ত, প্রশস্ত আর বিস্তৃততর হবে। মানবমনের সূক্ষ্মশক্তি,

* ডাঃ য়ুং এখানে 'হঠযোগের' বিষয় উল্লেখ করেছেন। হঠযোগে শরীরের আসনাদি এবং স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভের উপায়ের প্রণালী বর্ণিত হয়েছে। হঠযোগ অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অদ্ভুত শারীরিক ফল প্রদর্শন করে; কিন্তু যোগের এই শাখা আধ্যাত্মিক মুক্তিকামী যোগীদের দ্বারা অতি অল্পই অনুসৃত হয়।

প্রস্তর বা ধাতুর মধ্যে যে সব আণবিকশক্তি নিহিত আছে তার চেয়েও প্রবলতর শক্তির সৃষ্টি করতে পারে এবং তা করবেও; নচেৎ জড় আণবিকশক্তির দানব সারা পৃথিবীর উপর তার নির্ম্মম ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা শুরু করে দেবে। আণবিক বোমার বিষয়ে মানবজাতির উদ্বেগের একটা পরোক্ষ সুফল হবে এই যে যোগবিজ্ঞান* সম্বন্ধে ব্যবহারিক আগ্রহ বর্ধিত হবে — যা প্রকৃতপক্ষেই এক 'বোমাপ্রতিরোধী আশ্রয়' হবে।

---

* অনভিজ্ঞ লোকেরা প্রায়ই যোগকে 'হঠযোগ' বা চমকপ্রদ শক্তিলাভের জন্য এক গুপ্ত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রণালী বা ম্যাজিক বলে উল্লেখ করেন। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা যখন যোগ সম্বন্ধে উল্লেখ করেন, তখন তাঁরা পতঞ্জলির যোগসূত্রে বর্ণিত প্রণালীর বিষয় বা 'রাজযোগ'কেই বোঝান। পুস্তকটিতে এমন অপূর্ব সুন্দর দার্শনিক তত্ত্বসকল সঙ্কলিত হয়েছে যে, পরমজ্ঞানী সদ্‌গুরু সদাশিবেন্দ্র প্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্‌গণ তার টীকা বা ব্যাখ্যা রচনাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। (৪১ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ষড়দর্শনের অপর পাঁচটি প্রাচীন বেদমূলক দর্শনশাস্ত্রের মত 'যোগসূত্রে' নৈতিক পবিত্রতার (যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ) "ম্যাজিকের" বিষয় আলোচিত হয়েছে, যা প্রাথমিক দার্শনিক তত্ত্বানুসন্ধানের পক্ষে একেবারে অপরিহার্য। এই ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা — পশ্চিমে যার অভাব দেখা যায়, ভারতীয় ষড়দর্শনের মধ্যে চিরস্থায়ী প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করেছে। 'ঋত', যাতে এই বিশ্বজগৎবিধৃত, তা মানুষের অদৃষ্টনিয়ামক নীতিশাসন হতে পৃথক নয়। বিশ্বের মূল নীতিসূত্রগুলি যে পালনে অনিচ্ছুক, সে সত্যানুসন্ধানে কখনও দৃঢ়ব্রতী নয়।

যোগসূত্রের তৃতীয়পাদে 'বিভূতি ও সিদ্ধি' বিষয়ে যোগের নানা অলৌকিক শক্তির কথা উল্লিখিত হয়েছে। সত্যজ্ঞানই সর্বদা প্রকৃত শক্তি। যোগপন্থা চারিটি অংশে বিভক্ত, আর তার প্রত্যেক অংশে বিভূতি প্রকাশের বিষয়ে উল্লেখ আছে। কোন একটা শক্তি অধিগত হলে যোগী বুঝতে পারেন যে তিনি ঐ চারটি অবস্থার একটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিশিষ্ট শক্তি সমূহের সহসা আবির্ভাব যোগপ্রণালীর বৈজ্ঞানিক গঠনের সাক্ষ্য প্রদান করে, যেখানে সাধকের "আধ্যাত্মিক উন্নতির" বিষয়ে ভ্রান্ত কল্পনা দূরীভূত হয়; কেননা প্রমাণ তো চাই।

যোগের পথে অগ্রসর হতে গিয়ে হঠাৎ 'বিভূতিদর্শন' ইত্যাদি একটা সাময়িক ফললাভ মাত্র। পতঞ্জলি সাধকদের সাবধান করে দিয়ে গেছেন এই বলে যে, পরমাত্মার সহিত পরিপূর্ণ সংযোগসাধনই চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই 'অনন্ত দাতারই' অনুসন্ধান করা উচিত — তাঁর বিস্ময়কর দানের বিষয় নয়। তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি, যে কতকগুলি তুচ্ছ প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকে, ঈশ্বর কখনও তার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। কাজেই সত্যপথাশ্রয়ী যোগী তাঁর বিভূতি বা সিদ্ধিশক্তি প্রভৃতির প্রদর্শনে সর্বদাই বিরত থাকেন, যাতে সে সব মনে একটা মিথ্যা গর্ব এনে পরিণামে কৈবল্যপ্রাপ্তির চরম অবস্থালাভের পথ থেকে তাকে বিচ্যুত না করে।

যোগী সাধন লক্ষ্যে পৌঁছবার পর ইচ্ছামত বিভূতিপ্রদর্শনে অথবা তা হতে বিরত থাকতে পারেন। তাঁর সকলপ্রকার ক্রিয়াকলাপ — অলৌকিক হোক বা অন্যবিধ হোক — কর্মফলপ্রসূ না হয়েই তখন সম্পন্ন হয়। যেখানে অহঙ্কারের চুম্বক বিদ্যমান থাকে, কেবল সেখানেই কর্মের লৌহচূর্ণ সকল আকৃষ্ট হয়।

২৫ পরিচ্ছেদ

ভ্রাতা অনন্ত ও ভগিনী নলিনী

একদিন সকালে গভীর ধ্যানে বসে আছি — হঠাৎ যেন এই সাংঘাতিক কথাগুলো অন্তরের অন্তস্তলে ভেসে এল ঃ "অনন্তদা আর বেশিদিন বাঁচবেন না; ইহজীবনে তাঁর কর্ম শেষ হয়ে এসেছে।"

সন্ন্যাসগ্রহণ করবার অল্প কিছুদিন পরেই আমি আমার জন্মস্থান গোরখপুরে জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনন্তদার বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলাম। হঠাৎ অসুখ হয়ে পড়াতে অনন্তদা শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন; প্রাণপণে আমি তাঁর সেবা করতে লাগলাম।

মনের মধ্যে এই গুরুতর কথার আবির্ভাবে অন্তর শোকে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ভাবলাম, আমার অসহায় দৃষ্টির সামনে থেকে দাদাকে তুলে সরিয়ে নিয়ে যাবে — এদৃশ্য আমি দেখতে পারবো না। কাজেই গোরখপুরে আর বেশি দিন থাকা উচিত হবে না। আত্মীয়স্বজনদের হৃদয়হীন আর তীক্ষ্ণ সমালোচনা সত্ত্বেও প্রথম যে জাহাজ পেলাম তাতেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করলাম। বর্মা হয়ে চীনসমুদ্র দিয়ে জাহাজ জাপানের দিকে চলল। জাপানে কোবে শহরে নামলাম — মাত্র কয়েকদিনের জন্য। শহর বেড়িয়ে দেখবার মত তখন ঠিক মনের অবস্থা ছিল না।

ভারতবর্ষে ফেরবার পথে জাহাজ সাংহাইয়ে থামল। সেখানে, জাহাজের চিকিৎসক ডাক্তার মিশ্র আমাকে নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য শিল্পসামগ্রীর দোকান ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলেন। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী, আমার পরিবার আর বন্ধুবান্ধবদের জন্য সেখান হতে কিছু কিছু পছন্দসই উপহার কিনলাম। অনন্তদার জন্য খুব চমৎকার কাজকরা বাঁশের তৈরী একটি জিনিস কিনলাম। চীনা দোকানদারটি আমার হাতে জিনিসটি তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মেঝের উপর সেটা হাত থেকে পড়ে যেতে দেখেই চেঁচিয়ে

বলে উঠলাম, "হায় হায়, কার জন্যে এখন এ জিনিস কিনছি, দাদা ত' মারা গেছেন!"

একটা বেশ সুস্পষ্ট অনুভূতি এল যে, দেহ হতে অনন্তদার আত্মার উৎক্রমণ এখন শুরু হয়েছে। স্মৃতিচিহ্নটি ইঙ্গিতপূর্ণভাবে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল — একটা দারুণ অমঙ্গলের চিহ্ন! ক্রন্দনোদ্বেলিত হৃদয়ে সেই বংশখণ্ডের উপরিভাগে লিখলাম, "আমার প্রিয় অনন্তদার জন্য, যিনি এক্ষণে পরপারে!"

আমার সঙ্গী সেই ডাক্তারবাবুটি কিন্তু সবই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন, মুখে তাঁর বিদ্রূপের হাসি।

তিনি বললেন, "আপনার কান্না এখন থামান দেখি, মিছামিছি কাঁদছেন কেন বলুন ত'? যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছেন যে সত্যিই তিনি মারা গেছেন, ততক্ষণ বৃথা চোখের জল ফেলে লাভ কি?"

কলকাতায় এসে জাহাজ ভিড়ল — ডাক্তার মিশ্রও সঙ্গে এলেন। আমার ছোটভাই বিষ্ণু জাহাজঘাটে আমায় অভ্যর্থনা করবার জন্য উপস্থিত। কোন কথা বলবার আগেই আমি বিষ্ণুকে বললাম, "আমি জানি যে অনন্তদা চলে গেছেন। আচ্ছা, আমায় আর এই ডাক্তারবাবুকে বল তো, ঠিক কখন দাদা মারা গেলেন?"

বিষ্ণু একটা তারিখের উল্লেখ করল; তারিখটা হচ্ছে সাংহাইয়ে যে দিন সেই বাঁশের জিনিসটা কিনেছিলাম, ঠিক সেইদিন!

ডাক্তারবাবু বলে উঠলেন, "দেখুন, এ নিয়ে আর বেশি কথা বলে লাভ নেই। ডাক্তারীশাস্ত্র ত' এমনিতেই বিশাল, তার উপর আবার টেলিপ্যাথি বিদ্যা তারসঙ্গে যুক্ত হলে আরও এক বছর পড়া বেড়ে যাবে!"

বাড়ীতে ঢুকতেই পিতা সস্নেহে আমায় আলিঙ্গন করে স্নেহকোমল স্বরে শুধু দু'টি কথাই বললেন, "তুমি এসেছ"! দু'টি বড় বড় অশ্রুবিন্দু তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ল। সাধারণতঃ তিনি বাইরে ভাবাবেগবিহীন; কিন্তু আমার প্রতি তাঁর স্নেহের আতিশয্যের এমন বহিঃপ্রকাশ তিনি আগে আর কখনও দেখান নি। পিতা বাইরে কঠিন প্রকৃতির হলেও, অন্তরে ছিল তাঁর মায়ের মত কোমল স্নেহবিগলিত মন। পারিবারিক

সকল ব্যাপারে তাঁর এই অপূর্বসুন্দর দ্বৈত পিতৃমাতৃভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যেত।

অনন্তদার মৃত্যুর স্বল্পকাল পরেই আমার কনিষ্ঠা ভগিনী নলিনী দৈবশক্তিবলে মরণের মুখ থেকে ফিরে এসেছিল। ঘটনাটা বলবার আগে এখানে আমাদের বাল্যজীবনের কতকগুলি ব্যাপারের উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শৈশবে নলিনী আর আমার মধ্যে খুব মধুর সম্বন্ধ ছিল না। আমি তো রোগা ছিলামই, সে ছিল আরো রোগা। কোন এক অজ্ঞাত কারণে — মনোবিজ্ঞানীরা যা সহজেই আবিষ্কার করতে পারবেন, — আমি প্রায়ই তার অস্থিচর্মসার দেহ নিয়ে উপহাস করতাম। সেও ছেলেমানুষি চাঁচাছোলা সোজা উত্তর দিত। কখনও কখনও মা, (বয়সে বড় বলে) আমারই কান মলে দিয়ে আমাদের ছেলেমানুষি ঝগড়া থামিয়ে দিতেন।

স্কুলের পড়া শেষ হলে পর ডাঃ পঞ্চানন বসু নামে কলকাতার একটি তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে নলিনীর বিবাহের কথাবার্তা পাকা হল।

যথাকালে বিবাহের বিরাট আয়োজন শুরু হল। বিবাহ হল আমাদের কোলকাতার বাড়ীতেই। বাসরঘরে একদল আনন্দমুখর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে গিয়ে জুটলাম। সোনালীজরির কাজকরা প্রকাণ্ড এক তাকিয়ার উপর ভর দিয়ে বর বসে — পাশে নলিনী। কিন্তু হায়, খুব দামী জরির কাজকরা ময়ূরপঙ্খী রঙের সিল্কের শাড়ীও তার অস্থিচর্মসার দেহটিকে ঢেকে দিতে পারেনি। নতুন ভগ্নীপতির তাকিয়ার পিছনে গিয়ে বসে তার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলাম। বর বেচারা বিয়ের আগে নলিনীকে কখনও দেখে নি; সেই রাত্রেই সে প্রথম টের পেলে — বিয়ের লটারীতে তার ভাগ্যে কি উঠেছে।

আমার সহানুভূতি পেয়ে ডাক্তার বসু ইঙ্গিতে নলিনীকে দেখিয়ে কানে কানে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করলো, "আচ্ছা বলত, ব্যাপারটা কি!"

আমি বললাম, "কেন ডাক্তারবাবু, একটি তো কঙ্কাল লাভ হল, এনাটমি মনে রাখবার খুব সুবিধে হবে!"

বছর কাটতে লাগল। ডাক্তার বসু বাড়ীর সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে; বাড়ীতে অসুখ হলেই তার ডাক পড়ে। ডাক্তারের সঙ্গে আমার খুব গাঢ় বন্ধুত্ব। প্রায় ঠাট্টাতামাশা চলত আর তা সাধারণতঃ নলিনীকে নিয়েই।

একদিন ভগ্নীপতি বলল, "দেখ, তোমার বোনটি হচ্ছে ডাক্তারী শাস্ত্রের এক গবেষণার বিষয়! তোমার ঐ রোগা বোনটির ওপর আমি সব কিছু বিদ্যাই খাটাবার চেষ্টা করেছি — কডলিভার তেল, মাখন, মল্ট, মধু, মাছ, মাংস, ডিম, টনিক, কি না দিয়েছি বল! কিন্তু তবুও এক ইঞ্চির শতাংশের একাংশও বাড়ল না।"

দিনকতক পরে ভগ্নীপতির বাড়ী গেলাম একটা কাজে, মিনিট কতকের জন্যে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসছি — মনে হল নলিনী দেখতে পায় নি। সদর দরজার কাছে পৌঁছতেই কিন্তু তার গলা শোনা গেল — স্বর আন্তরিক কিন্তু দৃঢ়।

"দাদা শোন; এবারে কিন্তু আর পালাতে পারবে না, তা বলে দিচ্ছি। তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে।"

আবার সিঁড়ি বেয়ে তার ঘরের দিকে চললাম। অবাক হয়ে গেলাম, তার চোখে জল দেখে।

নলিনী বলল, "দাদা, আমাদের পুরোন কথা সব এখন একদম ভুলে যাও, বুঝলে। এখন দেখছি যে সাধনপথই তুমি পাকাপোক্ত ভাবে বেছে নিয়েছ। আমিও ঐসব বিষয়ে তোমার মতই হতে চাই।" তারপর সাগ্রহে আশান্বিত হৃদয়ে বলল, "তুমি ত' বেশ মোটাসোটা হয়েছ; আমি কি করে হব, বল না? স্বামী কাছে আসেন না, তবুও তাঁকে আমি এত ভালবাসি! কুশ্রী আর রোগা হয়ে থাকলেও আমি কিন্তু ঈশ্বরলাভের পথে এগিয়ে যেতে চাই।"

তার এই সকাতর অনুরোধে আমার মন বিগলিত হল। আমাদের নূতন সখ্য ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল। একদিন সে আমার শিষ্যা হতে চাইল।

"যেমন ভাবে তোমার ইচ্ছে তেমনি ভাবে তুমি আমায় গড়ে নাও; তোমার ও সব ওষুধটষুধের উপর আমার বিশেষ ভরসা নেই, আমার

ভগবানের উপরেই বেশি বিশ্বাস।" বলে একগাদা ওষুধের শিশি সংগ্রহ করে এনে সব জানালার বাইরের নর্দমা দিয়ে ফেলে দিল! তার বিশ্বাসের গভীরতা পরীক্ষা করবার জন্য আমি প্রথমেই তার খাওয়া থেকে মাছ, মাংস, ডিম — সব বাদ দিতে বললাম।

মাসকতক পরে — এর মধ্যে নলিনী আমার নির্দিষ্ট নানারকম ব্যবস্থা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছে আর নানা অসুবিধার মধ্যেও নিরামিষ আহার বজায় রেখে এসেছে — আমি একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

একটু দুষ্টু হাসি হেসে বললাম, "বোন, তুমি অবশ্য বিধিনিয়মগুলো খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছ দেখছি; যাক্, তোমার পুরস্কার এবার এসে পড়ল বলে। কি রকম মোটা হতে চাও বল দেখি, আমাদের খুড়ীমার মত, — সোজা হয়ে দাঁড়ালে পায়ে যার নজর পড়ে না, সেই রকম নাকি?"

"না! তোমার মত বেশ শক্তসমর্থ হতে চাই।"

আমি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম, "ভগবানের দয়ায় আমি যেমন সর্বদা সত্য কথা বলে এসেছি, এখন সেইরকম সত্য করেই বলছি,* ঈশ্বরের আশীর্বাদে আজ থেকে তোমার শরীর নিশ্চয়ই বদলাতে শুরু করবে। একমাসের মধ্যে আমার মতই তোমার সমান ওজন হবে, দেখে নিও।"

আমার এই আন্তরিক ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। ত্রিশ দিনের মধ্যেই নলিনীর দেহের ওজন আমার সমান হয়। সুস্বাস্থ্য তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল এবং স্বামীও তার প্রতি গভীর আকৃষ্ট হন। যে অশুভের মধ্য

---

* হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, যিনি সর্বদা সত্যকথা বলেন, তিনি বাক-সিদ্ধি লাভের ক্ষমতা অর্জন করেন; মনেপ্রাণে তাঁরা যে অনুজ্ঞাই উচ্চারণ করেন, সত্যসত্যই তা ফলে যায়। (যোগসূত্র, ২ ঃ ৩৬)

সত্য হতে যখন বিশ্বসৃষ্টি, তখন সকল শাস্ত্রই একে একটা গুণ বলে প্রশংসা করে যার দ্বারা মানুষ সেই পরম সত্য, সেই অসীমের সঙ্গে একীভূত হতে পারে। মহাত্মা গান্ধী প্রায়ই বলতেন, "সত্যই ঈশ্বর"; তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা ও প্রচেষ্টা ছিল কায়মনোবাক্যে পরিপূর্ণ সত্য অবলম্বন করা। হিন্দু সমাজে যুগ যুগ ধরে সত্যের আদর্শ অনুশীলিত হয়ে আসছে। মার্কো পোলো বলেন ঃ "ব্রাহ্মণরা পৃথিবীতে কোন কিছুর জন্যই মিথ্যা কথা বলবেন না।" ভারতে ইংরেজ বিচারক উইলিয়াম স্লীম্যান তাঁর 'জারণি থ্রু আউধ্, ১৮৪৯-৫০' নামক পুস্তকে বলেন ঃ "আমার সামনে শত শত মোকর্দমা এসেছে যাতে মানুষের সম্পত্তি, স্বাধীনতা এবং জীবন কেবল একটিমাত্র মিথ্যাকথা বলার উপর নির্ভর করেছে; কিন্তু তাও সে বলতে অস্বীকার করেছে।"

দিয়ে তাদের বিবাহিত জীবন শুরু হয়েছিল তা শেষপর্যন্ত আদর্শ সুখেই পরিণত হয়।

জাপান থেকে ফিরে এসে শুনলাম যে আমার অনুপস্থিতির সময় নলিনী টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল। গেলাম দৌড়ে তার বাড়ীতে, গিয়ে সব দেখে আমি একেবারে হতভম্ব। দেখি একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেছে, ঘোর আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে আছে।

ভগ্নীপতি বলল, "অসুখে তার মাথার গোলমাল শুরু হবার আগে সে প্রায়ই বলত, 'মুকুন্দদা যদি এখানে থাকত, তাহলে আজ আমার এ দশা হতো না।'" তারপর হতাশ গলায় বলল, "অন্য ডাক্তারেরা আর আমিও কোন আশাই দেখতে পাচ্ছি না। টাইফয়েডের সঙ্গে এতদিন যোঝবার পর এখন রক্ত আমাশয় দেখা দিয়েছে।"

গভীর প্রার্থনা দিয়ে স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করা শুরু করে দিলাম। একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স রাখলাম, সে আমায় সর্বদা সাহায্য করত। রোগ নিরাময়ের বিবিধ যৌগিকপ্রণালী ভগ্নীর উপর প্রয়োগ করতে লাগলাম। রক্তামাশয় সেরে গেল।

কিন্তু ডাক্তার বসু সখেদে মাথা নেড়ে বলল, "যতই কর না কেন কিন্তু ওর শরীরে ত' আর এক ফোঁটাও রক্ত নেই; কি করে যে সেরে উঠবে, সেইটাই ত' মহা ভাবনা।"

আমি জোর দিয়ে বললাম, "নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে, কোন ভাবনা নেই — সাত দিনের মধ্যেই জ্বর ছেড়ে যাবে দেখবে।"

এক সপ্তাহ কেটে গেল। দেখে ভারি আনন্দ হল নলিনী চোখ মেলে চাইছে, আর আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে আছে। চিনতে পারল। সেইদিন থেকে তার আরোগ্যলাভ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হতে লাগল। স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরে পেলেও তার এই মারাত্মক রকমের অসুখের একটা সাংঘাতিক চিহ্ন কিন্তু রয়েই গেল — তার পা দু'টি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ল। দেশী বিলাতী সব ডাক্তারেরা বলে গেলেন যে চিরজন্ম খোঁড়া হয়েই তাকে থাকতে হবে, সারবার আর কোন আশা নেই।

তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য জীবনমরণ যুদ্ধ যা আমি প্রার্থনার বলে শুরু করেছিলাম, তাতে আমায় একেবারে ক্লান্ত আর শক্তিহীন করে তুলেছিল। শ্রীরামপুরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে গেলাম তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করতে। আমার কাছ থেকে নলিনীর অবস্থার কথা শুনে তাঁর স্নেহকোমল চক্ষু দু'টি করুণায় সজল হয়ে উঠল।

শুনে তিনি বললেন, "তোমার ভগ্নীর পা দু'টি একমাসের ভিতরেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আর দেখ, আংটা দিয়ে আটকান একটা দু'রতির মুক্তো, ছ্যাঁদা যেন না হয়, তাগায় বসিয়ে পরতে বোলো — যেন গায়ে লেগে থাকে।"

আনন্দে একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি গুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম। বললাম, "আপনি সদ্‌গুরু; আপনার কথাই যথেষ্ট। কিন্তু আপনি যদি অবিশ্যি জোর করে বলেন, তাহলে আমি তাকে এখুনি একটা মুক্তো পরিয়ে দেব বই কি।"

গুরুদেব ঘাড় নেড়ে বললেন, "হ্যাঁ, তাই করো।" তারপর তিনি নলিনীর শারীরিক আর মানসিক বৈশিষ্ট্যসকল সঠিকভাবে বর্ণনা করতে লাগলেন, যদিও জীবনে তিনি তাকে কখনও দেখেন নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "গুরুদেব, এটা কি কোনরকম জ্যোতিষের বিচার? আপনি তো তার জন্মক্ষণ বা তারিখটারিখ কিছুই জানেন না।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী হেসে বললেন, "দেখ, এ হচ্ছে এক রকমের গুপ্ত জ্যোতিষশাস্ত্র, এতে আমাদের দিনক্ষণ পাঁজিপুঁথির কিছুই দরকার করে না। প্রত্যেক মানুষই সৃষ্টিকর্তার অথবা বিশ্বমানবের এক একটি অংশ; তার একটা জড় আর একটা দৈব বা সূক্ষ্মশরীর আছে। মানুষের বহির্দৃষ্টি তার জড় শরীরটাকেই দেখে কিন্তু অন্তশ্চক্ষু আরও গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করতে পারে, এমন কি এই বিশ্বলীলার মধ্যেও — যেখানে প্রত্যেক মানুষই হচ্ছে তার এক একটা স্বতন্ত্র আর অবিচ্ছেদ্য অংশ।"

কোলকাতায় ফিরে এসে আমি নলিনীর জন্য একটা মুক্তা* কিনলাম। একমাস পরেই তার পা দু'টি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গেল।

ভগিনী আমাকে তার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতা গুরুদেবকে জানাতে বলল। নলিনীর সব কথা তিনি নীরবে শুনলেন। উঠে আসছি যখন, তখন তিনি একটি কথা বললেন, যা খুবই অর্থপূর্ণ। তিনি বললেন, "ডাক্তারেরা ত' সব বলে গেছে যে তোমার ভগ্নীর কোন ছেলেপুলে হবে না। তাকে নিশ্চিত থাকতে বোলো; বছর কয়েকের মধ্যেই তার দু'টি কন্যা লাভ হবে।"

বছরকতক পরে নলিনীর একটি কন্যা হল, — তারপর আরও বছরকয়েক বাদে সে আরও একটি কন্যার মা হলো।

---
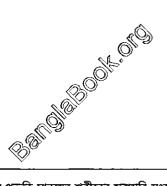
* মুক্তা এবং অন্যান্য রত্নসকল এবং ধাতু ও মূল প্রভৃতি মানুষের শরীরের সরাসরি সংস্পর্শে এলে তার দেহকোষের উপর এক তড়িচ্চুম্বক প্রভাব বিস্তার করে। মনুষ্যশরীরে অঙ্গার এবং নানাবিধ ধাতুর যে সব মৌলিক উপাদান আছে সে সমস্তই বৃক্ষমূল, ধাতু বা রত্নের মধ্যেও বর্তমান আছে। ঋষিদের এই সব আবিষ্কার নিঃসন্দেহে একদিন শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের কাছে স্বীকৃতি লাভ করবে। বৈদ্যুতিক প্রাণপ্রবাহবিশিষ্ট মানুষের স্পর্শপ্রবণ দেহ বহু রহস্যের কেন্দ্রভূমি, যার আজ পর্যন্ত কোন সমাধান হয় নি।

যদিও রত্ন ও ধাতুনির্মিত তাগা শরীরের পক্ষে রোগনিরাময়কারী, তবুও তাদের ব্যবহারের জন্য শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর নির্দেশদানের অন্য একটা কারণ ছিল। প্রকৃত সদ্‌গুরুরা নিজেরা কখনও ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হতে ইচ্ছা করেন না; ঈশ্বরই হচ্ছেন একমাত্র সর্বরোগহর। সেইজন্য প্রকৃত সাধুসন্তরা ঈশ্বরের নিকট হতে যে সব শক্তি সযত্নে লাভ করেছেন, সে সব নানা ছদ্মবেশের আবরণে লুক্কায়িত রাখেন। মানুষ সাধারণতঃ প্রত্যক্ষদর্শনেই বেশি বিশ্বাস করে। রোগমুক্তিকামনায় লোকেরা যখন আমার গুরুদেবের কাছে আসত, তখন তিনি তাদের কোন তাগা বা রত্ন ধারণ করবার উপদেশ দিতেন, — প্রথমতঃ তাঁদের বিশ্বাস উৎপাদন করবার জন্য আর দ্বিতীয়তঃ তাঁর থেকে মনোযোগ অপসারিত করবার জন্যে। এইসকল তাগা বা রত্ন, তাদের অন্তর্নিহিত তড়িৎ-চুম্বকীয় রোগনিরাময়কারক শক্তি ব্যতীত গুরুদেবের গুপ্ত আশীর্বাদপূতও ছিল।

২৬ পরিচ্ছেদ

ক্রিয়াযোগ বিজ্ঞান

"ক্রিয়াযোগ" বিজ্ঞান, যা এখানে বারম্বার উল্লিখিত হয়েছে, তা আমার পরমগুরু লাহিড়ী মহাশয়ের কৃতিত্বেই সমগ্র ভারতে বিস্তৃতি লাভ করেছে। ক্রিয়াশব্দ সংস্কৃত "কৃ" ধাতু থেকে নিষ্পন্ন — মানে কোন কিছু করা, এবং তার প্রতিক্রিয়াও বোঝায়; কার্যকারণের স্বাভাবিক বিধি "কর্ম" শব্দও "কৃ" ধাতু থেকে এসেছে। সুতরাং "ক্রিয়াযোগ" মানে "কোন কাজ বা ক্রিয়ার দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগস্থাপন বা যোগ।" কোন যোগী খুব নিষ্ঠাসহকারে এই প্রণালী অবলম্বন করে প্রক্রিয়াসাধনে যত্ন করলে পর ক্রমশঃ "কর্মফল" থেকে অথবা কার্যকারণ তত্ত্বের সাম্যবিধির শৃঙ্খল হতে মুক্ত হন।

কতকগুলি প্রাচীন যৌগিক বিধিনিষেধবশতঃ সাধারণের জন্য লিখিত এই পুস্তকে "ক্রিয়াযোগে"র পূর্ণব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নয়। প্রকৃত প্রণালী একজন সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ/ যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া থেকে প্রাধিকৃত "ক্রিয়াবান্" বা "ক্রিয়াযোগী"র কাছ থেকেই শিক্ষা করতে হয়।* এখানে তার একটা মোটামুটি বিবরণ দিলেই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি।

"ক্রিয়াযোগ" একটি সহজ শরীরমনস্তাত্ত্বিক প্রণালী, যাতে করে মানবদেহের রক্ত অঙ্গারমুক্ত হয়ে অম্লজান (অক্সিজেন) দ্বারা প্রতিপূরিত হয়। এই অতিরিক্ত অম্লজানের পরমাণু প্রাণধারায় রূপান্তরিত

---

* যারা তাঁর পরে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/ সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপের সভাপতি ও অধ্যাত্ম-প্রধান হবেন, শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ তাঁদের যোগ্য সাধককে 'ক্রিয়াযোগ' বিদ্যাদান ও দীক্ষাদানের অধিকার দিয়েছেন, অথবা তারজন্য যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটির স্বামীদের নিযুক্তির অধিকারও দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তাঁর 'যোগদা সৎসঙ্গ লেশ্যনস্' (Yogoda Satsanga Lessons), যা যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ায় পাওয়া যায়, তার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে 'ক্রিয়াযোগ' বিজ্ঞানের প্রচারেরও ব্যবস্থা করেছেন।

হয়ে মস্তিষ্ক আর মেরুদণ্ডের কেন্দ্রগুলিকে সঞ্জীবিত করে। দূষিত রক্তসঞ্চয়ন বন্ধ করে যোগী শরীরের তন্তুক্ষয় হ্রাস বা নিবারণ করতে পারেন। যিনি উচ্চকোটির যোগী, তিনি শরীরকোষগুলিকে শক্তিতে রূপান্তর সাধন করতে পারেন। ইলাইজা, যীশুখ্রিস্ট, কবীর এবং অন্যান্য মহাপুরুষগণ এই "ক্রিয়াযোগ" বা অনুরূপ কোন প্রক্রিয়াসাধনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, যাতে করে তাঁরা ইচ্ছামাত্র দেহধারণ করতে বা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারতেন।

"ক্রিয়াযোগ" একটি সুপ্রাচীন বিজ্ঞান। লাহিড়ী মহাশয় তাঁর মহান গুরু বাবাজী মহারাজের কাছ থেকে এ বিদ্যাটি পেয়েছিলেন। বাবাজীই "ক্রিয়াযোগ"কে বহু যুগের বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে পুনরুদ্ধার করে এর প্রণালীর বিশুদ্ধতা সম্পাদন করেন এবং এর সরল নামকরণ করেন — "ক্রিয়াযোগ"।

বাবাজী মহারাজ লাহিড়ী মহাশয়কে বলেছিলেন, "আজকে এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে তোমার হাত দিয়ে আমি জগৎকে যে 'ক্রিয়াযোগ' দান করছি, তা হচ্ছে সেই একই বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন, যা শ্রীকৃষ্ণ হাজার হাজার বছর আগে অর্জুনকে দিয়েছিলেন, এবং যা পতঞ্জলি তথা যীশুখ্রিস্ট, ও সেণ্ট জন, সেণ্ট পল প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য শিষ্যেরাও পরে অবগত হন।"

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দুইবার এই "ক্রিয়াযোগে"র বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। একটি শ্লোকে আছে ঃ "অপান বায়ুতে প্রাণের আহুতি প্রদান করে, এবং প্রাণে অপানের হোম করে, যোগী উভয় বায়ুকে প্রশমিত করেন। এইভাবে তিনি হৃৎপিণ্ড থেকে প্রাণের মুক্তিসাধন করে প্রাণশক্তিকে আত্মনিয়ন্ত্রণে আনয়ণ করেন।"* এর ব্যাখ্যা হচ্ছে — যোগী ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া শান্ত করে অতিরিক্ত প্রাণশক্তি সঞ্চয় করে শরীরের ক্ষয় নিবারণ করেন এবং শরীরস্থ অপানবায়ু সংযমন করে শরীরের বৃদ্ধির রূপান্তরও নিবারণ করেন। এইরূপে ক্ষয় আর বৃদ্ধির সাম্যাবস্থা আনয়ণ করে যোগী প্রাণশক্তির সংযমন শিক্ষা করেন।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — চতুর্থ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক।

গীতার অপর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, — যিনি রূপ রসাদি বাহ্যবিষয়বাসনা হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি সংস্থাপিত করিয়া নাসিকামধ্যবাহী প্রাণ ও অপানবায়ুর ঊর্ধ্ব ও অধোগতি রোধ অর্থাৎ কুম্ভক দ্বারা সমান (স্থির) করতঃ ইন্দ্রিয়গত মন ও বুদ্ধির সংযম করিয়াছেন, যিনি মোক্ষপরায়ণ এবং বাসনা, ভয় ও ক্রোধপরিশূন্য, তাদৃশ মুনি জীবিত থাকিয়াও সতত মুক্ত।"*

শ্রীকৃষ্ণ বলে গেছেন যে, তাঁর এক পূর্বতন আবির্ভাবকালে তিনিই এই অক্ষয় যোগসাধনপ্রণালী প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানী বিবস্বতকে দিয়েছিলেন, বিবস্বত তা আইনপ্রণেতা মনুকে† দান করেন। মনু আবার তা সূর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইক্ষ্বাকুকে দান করেন। এমনি করে লোকপরম্পরাক্রমে রাজযোগ ঋষিদের দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে এসেছে এই জড়যুগ পর্যন্ত।‡ তারপর, ব্রাহ্মণদের মন্ত্রগুপ্তি আর মানুষের উদাসীনতার কারণে এই পরমপবিত্র বিদ্যা ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে পড়ে।

যোগের সর্বপ্রধান ব্যাখ্যাতা মহর্ষি পতঞ্জলি "ক্রিয়াযোগে"র বিষয় দুইবার উল্লেখ করে গেছেন। তিনি লিখেছেন, "ক্রিয়াযোগ হচ্ছে শরীরনিষ্ঠা, মানসিক সংযম, আর প্রণবধ্যান।"§ পতঞ্জলি ব্রহ্মকে নাদরূপে বর্ণনা করে গেছেন, ধ্যানে যা শোনা যায়।** এই ওঙ্কারধ্বনিই সৃষ্টির

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — পঞ্চম অধ্যায়, ২৭-২৮ শ্লোক।

† 'মানব ধর্মশাস্ত্র' বা মনুসংহিতার সুপ্রাচীন রচয়িতা। এই সকল মানব-ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত রীতিনীতি বা প্রথা অদ্যাবধি ভারতবর্ষে প্রচলিত।

‡ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ৩১০২ খ্রিঃ পূর্ব জড়যুগের আরম্ভ। ঐ বৎসর বিষুব চক্রের শেষ অবরোহী দ্বাপরযুগের সূচনা (১৬ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এবং বিশ্বচক্রের কলিযুগের আরম্ভ। ১০,০০০ বছর পূর্বে মানবজাতি যে এক আদিম প্রস্তরযুগে বাস করতো — এই কথা বিশ্বাস করে অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিদেরা লেমুরিয়া, অ্যাটলাণ্টিস, ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, মিশর, মেক্সিকো ও অন্যান্য বহু দেশের সুপ্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্যাদি ও সংস্কৃতি প্রভৃতি সবকিছুকে "কাল্পনিক" বলে হেসে উড়িয়ে দেন।

§ যোগসূত্র, (সাধনপাদ ১ সূত্র)। "ক্রিয়াযোগ" কথাগুলির ব্যবহারে পতঞ্জলি হয় সেই প্রণালীর বিষয় উল্লেখ করেছেন, যা পরে বাবাজী কর্তৃক উপদিষ্ট হয়, নয়ত এর কাছাকাছি কোন প্রক্রিয়া। পতঞ্জলি যে প্রাণসংযমনের একটা নির্দিষ্ট প্রণালীর বিষয় উল্লেখ করেছেন, তার প্রমাণ পাতঞ্জলদর্শনে সাধনপাদের ৪৯ শ্লোকেই পাওয়া যায়।

** পাতঞ্জলদর্শন, ১ঃ ২৭ সূত্র।

আদিমূল, আর এর ঝঙ্কারই হচ্ছে শক্তিকেন্দ্রের স্পন্দনধ্বনি, ঈশ্বরাস্তিত্বের সাক্ষ্য।* এমন কি নতুন যারা যোগসাধন শুরু করেছেন, তাঁরাও এই অদ্ভুত প্রণবঝঙ্কার শীঘ্রই শুনতে পান। এইরূপ একটা স্বর্গীয় আনন্দময় আধ্যাত্মিক প্রেরণা লাভ করে যোগীর স্থিরবিশ্বাস হয় যে, তিনি প্রকৃতই স্বর্গরাজ্যের সংস্পর্শে এসেছেন।

পতঞ্জলি প্রাণসংযম বা "ক্রিয়াযোগে"র বিষয় দ্বিতীয়বার এই বলে উল্লেখ করেছেন যে, "শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ করে যে প্রাণায়াম সাধিত হয়, তাতেই মুক্তিলাভ ঘটে।"†

সেণ্ট পলও "ক্রিয়াযোগ" বা তদনুরূপ কোন প্রণালী জানতেন, যার সাহায্যে তিনি ইন্দ্রিয়সমূহতে বা তা থেকে প্রাণপ্রবাহকে চালিত করতে পারতেন। তাই তিনি একথা বলতে পেরেছেন যে, "যীশুখ্রিস্টে যে পরমানন্দ আমরা লাভ করি, তাতে আমি নিশ্চয় করে বলছি যে প্রত্যহই আমার মৃত্যু ঘটে।""‡ প্রক্রিয়াবিশেষে শরীরস্থ সমস্ত প্রাণশক্তিকে (যা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্মুখী, জগতে পরিচালিত হয় এবং তাতে করে আপাত বৈধতা পায়) অন্তরে বশীভূত করে সেণ্ট পল প্রত্যহই কূটস্থচৈতন্যে পরমানন্দের সঙ্গে প্রকৃত যোগসাধন করতে পারতেন। সেই পরমানন্দময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে তিনি সজ্ঞানে বুঝতে পারতেন যে, এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মায়িক জগতে তিনি বাহ্যতঃ একেবারে মৃত বা ইন্দ্রিয়বিকার রহিত।

---

* "যিনি আমেন, যিনি বিশ্বাস্য ও সত্য সাক্ষ্যস্বরূপ, যিনি ঈশ্বরের সৃষ্টির আদি, তিনি এই কথা বলেন।" — রিভিলেশন ৩ : ১৪ (বাইবেল)।

"আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের কাছে (সংযুক্ত) ছিলেন, এবং বাক্যেই ঈশ্বর ছিলেন ... সব কিছুই তাঁহার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল (বাক্য, নাদ বা প্রণব); যাহা হইয়াছে তাহার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই।" — জন ১ : ১-৩ (বাইবেল)।

বেদের "ওম্" তিব্বতীদের পবিত্র মন্ত্র "হুঁ", মুসলমানদের 'আমিন' আর মিশরীয়, গ্রীক, রোমান, ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের "আমেন"-এ পরিণত হয়েছে। হিব্রুতে এর অর্থ হচ্ছে নিশ্চিত, বিশ্বস্ত।

† পাতঞ্জলদর্শন, (সাধনপাদ ৪৯ সূত্র)।

‡ ১ করিন্থিয়ান ১৫ : ৩১ (বাইবেল)। সেণ্ট পল এখানে 'কূটস্থ চৈতন্যে'র সর্বজনীনতার কথা উল্লেখ করেছেন।

'সবিকল্প সমাধির' প্রাথমিক অবস্থায় সাধকের চৈতন্য পরমাত্মার মধ্যে লীন হয়ে যায়; শরীর হতে প্রাণশক্তি প্রত্যাহৃত হওয়ায় শরীরকে নিশ্চল, কঠিন বা মৃতবৎ দেখায়। যোগী তাঁর শরীরের স্তম্ভিত প্রাণশক্তিসম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন। 'নির্বিকল্প সমাধির' মত উচ্চতর অবস্থায় যোগী শরীর স্থির না করেও সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায়, এমন কি সাংসারিক কর্তব্য সম্পাদন করবার মধ্যেও, পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হতে পারেন।*

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাঁর শিষ্যবর্গকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলেন ঃ "'ক্রিয়াযোগ' হচ্ছে এমন একটি উপায় যার দ্বারা মানবজাতির বিবর্তন খুব দ্রুত সাধিত হতে পারে। প্রাচীন যোগীরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের রহস্য শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে এ হচ্ছে ভারতবর্ষের অনন্য আর অমর অবদান। প্রাণশক্তি — যা সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ড পরিচালনায় ব্যয়িত হয় — তা অবিরাম শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি স্থির করবার প্রণালী দ্বারা উচ্চতর সাধনের জন্য মুক্ত করা আবশ্যক।"

"ক্রিয়াযোগী" মানসিক প্রক্রিয়ায় প্রাণশক্তিকে তাঁর মেরুদণ্ডের ছয়টি চক্রের (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা) মধ্য দিয়ে আরোহণ ও অবরোহণ করান। এই ছয়টি চক্র বিশ্বমানবের প্রতীক দ্বাদশটি রাশিচক্রের সমান। মানুষের অনুভূতিসম্পন্ন মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে আধমিনিট ঐ শক্তিকে আবর্তিত করলে পর, তার বিবর্তনের সূক্ষ্ম উন্নতি সাধিত হয়। আধমিনিট এইরূপ "ক্রিয়া", একবৎসরের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের সমান।

সর্বদর্শী তৃতীয় নেত্ররূপ সূর্যের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ছয়টি (মেরুপ্রবণতা দ্বারা দ্বাদশটি) নক্ষত্রমণ্ডলবিশিষ্ট মানুষের সূক্ষ্ম

---

* বিকল্প — ভেদ, সংশয়। "সবিকল্প" — সমাধি-বিশেষ; এতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনের বোধ লুপ্ত হয় না। "নির্বিকল্প সমাধি" — অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্বভেদরহিত চিত্ত সংস্থান। সবিকল্প সমাধি অবস্থায় ভক্ত তখনো অনুভব করেন যে তিনি ঈশ্বরের থেকে সামান্য পৃথক রয়েছেন। কিন্তু 'নির্বিকল্প সমাধি' অবস্থায় ভক্ত নিজেকে পরমাত্মারূপে বুঝতে পারেন।

(আতিবাহিক) দেহের সঙ্গে, বহির্জগতের সৌরমণ্ডলস্থিত সূর্য ও রাশিচক্রের দ্বাদশ রাশির একটা পারস্পরিক সম্বন্ধ আছে। সকল মানুষই তাই অন্তঃ-বহির্বিশ্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাচীন ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন যে, মানুষের পার্থিব আর দিব্য পরিবেশ প্রতি দ্বাদশ বৎসরের আবর্তনে, তাকে তার স্বাভাবিক পথে আগুয়াণ করে দেয়। শাস্ত্র অবিসংবাদিতরূপে এ সত্য নির্ধারিত করে গেছে যে, মানবমস্তিষ্ককে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য যথোচিতভাবে উপযোগী করে তুলতে হলে মানবের দশলক্ষ বৎসরের স্বাভাবিক আর রোগমুক্ত বিবর্তনের প্রয়োজন।

সাড়ে আটঘণ্টায় এক হাজারবার "ক্রিয়া"যোগের অভ্যাস করলে পর একদিনে যোগীর একহাজার বছরের স্বাভাবিক বিবর্তনের সমান উন্নতি সাধিত হয়; অর্থাৎ এক বৎসরে ৩,৬৫,০০০ হাজার বৎসরের বিবর্তন। আর তিন বৎসরে "ক্রিয়াযোগী" সুনিয়ন্ত্রিত আত্মপ্রচেষ্টার দ্বারা সেই একই ফললাভ করতে পারেন, যা সম্পন্ন করতে প্রকৃতির লাগে দশ লক্ষ বৎসর! অবশ্য খুব উচ্চকোটির যোগীরা "ক্রিয়া"সাধনের আরও দ্রুততর আর সুগম পন্থা অবলম্বন করতে পারেন। উপযুক্ত গুরুর সাহায্যে এরূপ যোগীরা গভীর সাধনাবলে তাঁদের শরীর আর মস্তিষ্ককে সেই অপরিমেয় শক্তিধারণের উপযোগী করে সযত্নে গড়ে তোলেন।

"ক্রিয়াযোগ" সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধক দৈনিক দুইবার, চৌদ্দ হতে আটাশবার ঐ সাধনের অভ্যাস করেন। কিছু যোগীর ছয়, বার, চব্বিশ অথবা আটচল্লিশ বৎসরের মধ্যেই মুক্তিলাভ ঘটে। পূর্ণজ্ঞানলাভের পূর্বেই যে যোগীর মৃত্যু ঘটে, তাঁর "ক্রিয়াযোগ" সাধনজনিত শুভ কর্মফল তাঁর সঙ্গেই যায়। আর তাই তাঁর নূতন জীবনেও সেই অনন্তের লক্ষ্যপথে তিনি স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে চলেন।

সাধারণ মানবদেহ একটা পঞ্চাশওয়াট ইলেকট্রিক বাতির মত; কাজেই তা "ক্রিয়াযোগ"সাধনজনিত দশকোটিওয়াটের মত অত্যধিক শক্তিধারণক্ষম হতে পারে না। "ক্রিয়াযোগে"র নির্ভুল সহজ সাধনপ্রণালীর নিয়মিত আর ক্রমান্বয়িক অনুশীলন দ্বারা মনুষ্যশরীরে দিন

দিন আধ্যাত্মিক রূপান্তর সাধিত হয়; এবং শেষপর্যন্ত পরব্রহ্মের সগুণ ও সক্রিয় প্রথম প্রকাশ সেই দেহ, অসীম বিশ্বশক্তি প্রকাশের আধার হবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

কতকগুলি ভ্রান্ত "হাতুড়ে" গোছের লোকদের দ্বারা প্রদত্ত অবৈজ্ঞানিক শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধের প্রণালীর সঙ্গে "ক্রিয়াযোগের" কোনই সামঞ্জস্য নেই। জোর করে ফুস্‌ফুসের মধ্যে বায়ু পুরে রাখবার চেষ্টা শুধু যে অস্বাভাবিক তা নয়, অত্যন্ত অস্বস্তিকরও বটে। কিন্তু "ক্রিয়া" সাধনের প্রথম অবস্থা থেকেই সাধকের মনে একটা অভূতপূর্ব শান্তির অনুভূতি আর মেরুদণ্ডে নবশক্তি সঞ্চারজনিত একটা অত্যন্ত আরামদায়ক অনুভূতি জন্মায়।

এই প্রাচীন যৌগিকপ্রক্রিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসকে মানস-সত্তায় রূপান্তরিত করে। আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাধক শ্বাসপ্রশ্বাসকে মনেরই ক্রিয়া, একটা মানসিক ধারণা বলে জানতে পারেন — যেন স্বপ্নের শ্বাসপ্রশ্বাস।

মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি আর তার চেতনা বা বাহ্যজ্ঞানের অবস্থার তারতম্যের মধ্যে যে একটা গাণিতিক সম্বন্ধ আছে, তার বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। কোন মানুষের প্রগাঢ় মনঃসংযোগের সময়, যেমন কোন কূটবিষয়ের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্ক অনুধাবন করবার সময় অথবা কোন কঠিন, দুঃসাধ্য বা বিপজ্জনক শারীরিক ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শনের সময়, তার শ্বাসপ্রশ্বাস আপনা-আপনিই অতি ধীরে ধীরে চলে। মনঃসংযোগের প্রগাঢ়ত্বও ধীর শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর নির্ভর করে। খুব দ্রুত অথবা অসমান নিশ্বাসপ্রশ্বাস ভয়, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ক্ষতিকর ভাবাবেগ থেকে জন্মায়। অস্থির বানরের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি মিনিটে ৩২ বার; সেক্ষেত্রে মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি মিনিটে সাধারণতঃ ১৮ বার। হাতী, কচ্ছপ, সাপ প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণী যাদের আয়ু বেশি, তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস মানুষের চেয়েও কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে মহাকূর্ম, যারা ৩০০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচতে পারে, তারা মিনিটে কেবলমাত্র ৪ বার নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

নিদ্রার যে ক্লান্তি অপনোদনকারী সঞ্জীবনীশক্তি আছে, তার কারণ মানুষ সাময়িক তার শরীর আর শ্বাসপ্রশ্বাসের কথা ভুলে যায়। ঘুমন্ত মানুষ একজন যোগীই হয়ে যায়; প্রতিরাত্রেই নিজের অজ্ঞাতসারে সে নিজেকে দেহাত্মবোধ হতে মুক্ত করবার যৌগিকপ্রক্রিয়া সাধনা করে, আর তার প্রাণশক্তিপ্রবাহকে মস্তিষ্কের প্রধানস্থল আর মেরুদণ্ডের ছয়টি চক্রস্থিত শক্তি-উৎসের সঙ্গে মিলিত করে। নিদ্রিতমানব এই প্রকারে নিজের অজ্ঞাতসারে বিশ্বশক্তির দ্বারা প্রতিপূরিত হয়, যা সকল জীবন বাঁচিয়ে রাখার আশ্রয়স্থল।

সাধনেচ্ছুক যোগী, মন্দগতি নিদ্রিত মানবের মত অজ্ঞাতসারে নয়, জ্ঞাতসারেই একটি সহজ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সাধনা করেন। "ক্রিয়া"যোগী তার শরীরকোষগুলি অমর প্রাণের আলোকে পূর্ণ করে তাদের আধ্যাত্মিক চুম্বকধর্মী অবস্থায় রাখবার জন্য প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে তিনি শ্বাসপ্রশ্বাসকে একেবারে অপ্রয়োজনীয় করে তোলেন; ফলে (সাধনকালে) তাঁকে আর নিদ্রা, চৈতন্য বা মৃত্যুর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় প্রবেশ করতে হয় না।

'মায়া' বা প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনে মানুষের প্রাণশক্তিপ্রবাহ বহির্জগতের দিকে ধাবিত হয়; এই শক্তিপ্রবাহ ইন্দ্রিয়কামনার অপব্যবহারে ও অবক্ষয়ে নাশপ্রাপ্ত হয়। "ক্রিয়া"সাধন দ্বারা উক্ত প্রবাহের গতি বিপরীতমুখী হয়; মানসিক প্রক্রিয়ায় প্রাণশক্তি অন্তর্জগতের দিকে পরিচালিত হয় এবং মেরুদণ্ডস্থিত সূক্ষ্ম শক্তিধারার সহিত পুনর্মিলিত হয়। প্রাণশক্তির এরূপ সুদৃঢ়ীকরণে যোগীর দেহ এবং মস্তিষ্কের কোষগুলি আধ্যাত্মিক সুধায় নবজীবন লাভ করে।

উপযুক্ত আহার, সূর্যালোক আর সুসমঞ্জস চিন্তার মধ্য দিয়ে মানুষ, যারা কেবলমাত্র প্রকৃতি ও তার দৈবী পরিকল্পনার দ্বারাই চালিত হয় — তাদের স্বানুভূতি লাভ করতে সময় লাগবে দশলক্ষ বৎসর। মস্তিষ্কের গঠনে ঈষৎ পরিবর্তন সাধিত করতে হলেও অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্যময় জীবনযাপন আবশ্যক; আর ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশের জন্য মস্তিষ্কের স্থান যথোপযুক্তরূপে শুদ্ধ করে নিতে গেলে অন্ততঃ দশলক্ষ

বৎসর একান্ত আবশ্যক। "ক্রিয়াযোগী" কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়মের সযত্ন-পালনের প্রয়োজনীয়তা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারেন।

শরীরের সঙ্গে আত্মার বন্ধনকারী শ্বাসগ্রন্থিচ্ছেদ করে দিয়ে "ক্রিয়া" জীবনকে দীর্ঘতর আর জ্ঞানকে অনন্তের দিকে প্রসারিত করে থাকে। যোগসাধনা মন আর জড়সংবদ্ধ ইন্দ্রিয়দের মধ্যে টানাটানি থামিয়ে দিয়ে সাধককে তার অনন্ত-সাম্রাজ্য পুনরধিকারের জন্য মুক্ত করে দেয়। তখন সে জানতে পারে যে তার প্রকৃত সত্তা জড়শরীরে বা শ্বাসপ্রশ্বাসে আবদ্ধ নয় — যেটা মানবের প্রাকৃতিক শক্তির নিকট নতিস্বীকার — বায়ুর দাসত্বের প্রতীক!

শরীর ও মনের অধীশ্বর হয়ে "ক্রিয়া"যোগী অবশেষে তার "অন্তিম শত্রু"* মৃত্যুকে পরাজিত করে।

"মরণের 'পরে জয়ী হবে তুমি, মানুষেরে যে করে জয়,
'মরণ' একবার মরিলে তখন রবে না মরণভয়।"†

"অন্তদর্শন বা মৌনবলম্বন", প্রাণশক্তির দ্বারা আবদ্ধ মন ও ইন্দ্রিয়দের জোর করে পৃথক করার এক অবৈজ্ঞানিক পন্থা। চিন্তাশীল মন যখন দিব্যত্বে ফিরে যাবার চেষ্টা করে, তখন প্রাণপ্রবাহ নিয়ত তাকে ইন্দ্রিয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে। প্রাণশক্তির মাধ্যমে মনকে প্রত্যক্ষভাবে সংযত করবার জন্য "ক্রিয়া"ই হচ্ছে আত্মজ্ঞানলাভের সর্বাপেক্ষা সহজ, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক উপায়। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের পথে

* "শেষ শত্রু যা বিনষ্ট হবে তা হচ্ছে মৃত্যু" — [১ করিন্থীয় ১৫ : ২৬ (বাইবেল)।] শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দর উৎক্রমণের পর তাঁর দেহের অবিকৃতি প্রমাণ করেছে যে, তিনি একজন পূর্ণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত "ক্রিয়াযোগী" ছিলেন। সকল মহান্ গুরু যে মহাপ্রয়াণের পর দেহের অবিকৃতি প্রদর্শন করেন, তা নয়। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, এরূপ অলৌকিক ব্যাপার ঘটে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। পরমহংস যোগানন্দজীর ক্ষেত্রে এই "বিশেষ উদ্দেশ্য"টি ছিল নিঃসন্দেহে প্রতীচ্যকে যোগের মূল্য বিশ্বাস করান। প্রতীচীকে সেবা করার জন্যে বাবাজী মহারাজ ও শ্রীযুক্তেশ্বরজী যোগানন্দজীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন; পরমহংসজী তাঁর জীবনে ও মরণে সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন। *(প্রকাশকের মন্তব্য)।*

† শেক্সপিয়্যার — সনেট ১৪৬।

পরমহংস যোগানন্দ ভার্জিনিয়ার ভার্নন জর্জ ওয়াশিংটনের সমাধি সৌধে ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৭এ পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করছেন।

হোয়াইট হাউসে পরমহংস যোগানন্দ

পরমহংস যোগানন্দ ও মিঃ জন ব্যালফুর হোয়াইট হাউস থেকে বেরোচ্ছেন, প্রেসিডেণ্ট ক্যালভিন কুলিজের সঙ্গে দেখা করে, যিনি জানলা থেকে বাইরে তাকিয়ে আছেন।

দ্য ওয়াশিংটন হেরাল্ড ২৫শে জানুয়ারী, ১৯২৭-এর প্রতিবেদন জানায়, স্বামী যোগানন্দ স্পষ্টতঃই আনন্দের সঙ্গে মিঃ কুলিজ কর্তৃক অভ্যর্থিত হন, যিনি তাঁকে বলেন যে, তাঁর সম্বন্ধে অনেক লেখাই তিনি পড়েছেন। ভারতের ইতিহাসে একজন স্বামীজীর, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হওয়ার ঘটনা এই প্রথম।
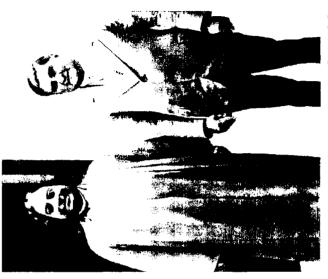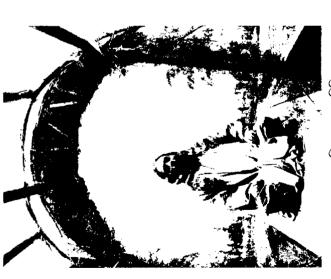
পরমহংস যোগানন্দ মেক্সিকোয় জোচিমিলকো হ্রদে ১৯২৯ সালে একটি নৌকায় ধ্যানরত।

পরমহংস যোগানন্দ যখন ১৯২৯ সালে মেক্সিকো সিটি সন্দর্শনে যান মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি মহামান্য এমিলিও গিল, তাঁকে আতিথ্য প্রদান করেন।

গুরু ও শিষ্য ঃ ধ্যানরত পরমহংস যোগানন্দ এবং জেমস জে. লীন, পরে যাঁর নাম হয় শ্রী রাজর্ষি জনকানন্দ, ওয়াই. এস. এস./এস. আর. এফ.-এর লস অ্যাঞ্জেলসে আন্তর্জাতিক প্রমুখ কার্যালয়ে ১৯৩৩ সালে।
পরমহংস যোগানন্দ বলেন, "কেউ কেউ বলেন যে পাশ্চাত্যেরা ধ্যান করতে পারেনা। সে কথা সত্য নয়। মিঃ লীন ক্রিয়াযোগ লাভ করার পর থেকে, আমি তাঁকে কখনই দেখিনি যে তিনি অন্তরে ঈশ্বরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত নন।"

পরমহংসজী এবং ফে. রাইট, পরে যাঁর নাম হয় শ্রীদয়ামাতা, (ফটো বিভাগ ৩-এর ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য), এস. আর. এফ.-এর এন্সিনিটাস আশ্রমে, ১৯৩৯ সালে। ১৯৩১ সালে এস. আর. এফ.-এর আশ্রমে প্রবেশের স্বল্পকাল পরেই গুরু তাঁকে বলেন ঃ "তুমি আমার পাখির বাসার প্রথম ডিম। তুমি যখন এলে, আমি জানলাম আরও অনেক প্রকৃত ভক্ত এই মার্গে আকৃষ্ট হবে।" একবার তিনি প্রীতি ভরে মন্তব্য করেন, "আমার ফে, কত কিছু ভালো কাজই সে করবে। ... আমি জানি, আমি ওর মাধ্যমে কাজ করতে পারবো, কারণ ও সুগ্রহীতা।"

স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি ও শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ
কোলকাতা, ১৯৩৫ সাল

স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর ও পরমহংস যোগানন্দ
১৯৩৫ সালে কোলকাতায় এক ধর্মীয় শোভাযাত্রায়

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী কর্তৃক অনুষ্ঠিত শেষ দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তি উৎসব। শ্রীরামপুর আশ্রম প্রাঙ্গণে টেবিলের ধারে নিজ মহান গুরুর *(মধ্যে)* পাশে উপবিষ্ট যোগানন্দজী

শ্রীরামপুর আশ্রম, ১৯৩৫ সাল — পরমহংস যোগানন্দজী *(মাঝখানে উপবিষ্ট)* ও স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী *(দক্ষিণে দণ্ডায়মান)*

স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর ধ্যান মন্দির, শ্রীরামপুরে তাঁর আশ্রমের মাটিতে, ১৯৭৭ সালে উৎসর্গিত হয়। পুরনো আশ্রমের অনেক ইঁট এর প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। এই মন্দিরের স্থাপন পদ্ধতি পরমহংস যোগানন্দজী প্রদত্ত নির্দেশ অনুযায়ী হয়।
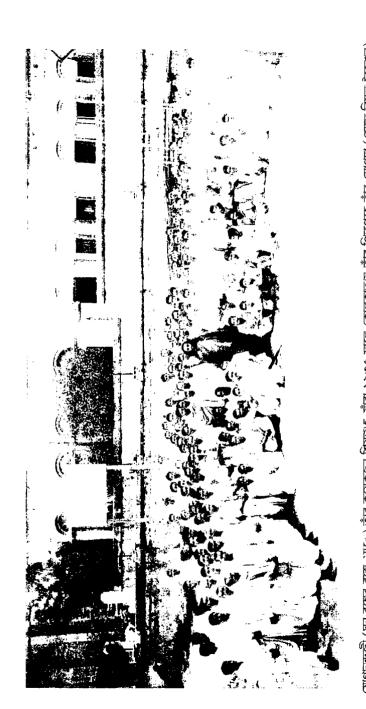
যোগানন্দজী (ঘন রঙের বস্ত্রে, মাঝে) তাঁর কয়েকজন শিষ্যসহ, যাঁরা ১৯৩৫ সালে কোলকাতায় তাঁর পিতৃগৃহে তাঁর যোগদা (সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন) ক্লাসে যোগদান করেন। বহুল সমাবেশের কারণে, ক্লাসটি যোগানন্দজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিশিষ্ট ক্রিয়াবিদ বিষ্ণুচরণ ঘোষের খোলা আখড়ায় আহূত হয়।

মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম—ওয়ার্ধায়

যোগানন্দজী ডানদিকে উপবিষ্ট গান্ধীজীর সদ্যলেখা এক মন্তব্য পাঠ করছেন। (দিনটি ছিল সোমবার, মহাত্মাজীর মৌন দিবস)। পরের দিন ২৭শে আগস্ট, ১৯৩৫ সালে, যোগানন্দজী গান্ধীজীকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা প্রদান করেন।

যোগানন্দজী, শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মা ও তৎসহ তাঁর স্বামী ভোলানাথ,
কোলকাতা, ১৯৩৫ সাল

পরমহংস যোগানন্দ

১৯৩৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ভারতে দামোদরে এই আলোকচিত্রটি নেওয়া হয় —যখন তিনি নিকটস্থ ডিহিকাতে ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রথম বিদ্যালয়ের স্থানে যান। তিনি একটি ভেঙ্গে পড়া স্তম্ভের নীচে ধ্যানরত, যা তাঁর একান্ত বাসের এক প্রিয় জায়গা ছিল।

শ্রী যোগানন্দজী রাঁচীতে যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটির বালক বিদ্যালয়ে, শিক্ষক ও ছাত্রগণসহ। এই বিদ্যালয়, যা যোগানন্দজী প্রতিষ্ঠা করেন, বাঙলার ডিহিকা থেকে ১৯১৮ সালে কাশিমবাজার মহারাজের তত্ত্বাবধানে স্থানান্তরিত হয়।

যোগানন্দজী (*মধ্যে*) এবং তাঁর সেক্রেটারী শ্রী সি. রিচার্ড রাইট (*ডানদিকে*) ১৯৩৬ সালের ১৭ই জুলাই। তাঁরা যোগানন্দজীর আদিবাসী বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রীদের দ্বারা পরিবৃত।

ভগবান কৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যকালের স্মৃতি বহণকারী মথুরায় যমুনা নদীর ওপর এক নৌবিহারে ১৯৩৫ সালে যোগানন্দজী। (মাঝখানে বসা) যোগানন্দজীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রী অনন্তলাল ঘোষের কন্যা, যোগানন্দজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সনন্দলাল ঘোষ ও সি. রিচার্ড রাইট।

গিরিবালা
নিরাহারা যোগিনী

থেরেসা নুমান, সি. রিচার্ড রাইট ও পরমহংস যোগানন্দ
ব্যাভেরিয়র এইখস্যাটে, ১৯৩৫ সাল।
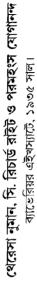
১৯৩৮ সালে হরিদ্বার 'কুম্ভমেলায়' ত্রৈলঙ্গ স্বামীর একমাত্র জীবিত শিষ্যা শঙ্করী মাঈ জিউ। যোগিনীর বয়স তখন ১১২ বৎসর *(পৃষ্ঠা ৩৯১ দ্রঃ)*

পঞ্চানন ভট্টাচার্য
শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য

স্বামী কৃষ্ণানন্দ — ১৯৩৬ সালে এলাহাবাদ কুম্ভমেলায় পোষা নিরামিষাশী সিংহী, যার গম্ভীর আকর্ষণীয় গর্জনে 'ওম্' ধ্বনিত হয়। *(পৃষ্ঠা ৫৩৮ দ্রঃ)*

স্বামী কেশবানন্দ (বামে দণ্ডায়মান) যিনি লাহিড়ী মহাশয়ের নব্বই বর্ষীয় শিষ্য, যোগানন্দজী ও সি. রিচার্ড রাইট—১৯৩৬ সালে বৃন্দাবনে, কেশবানন্দজীর আশ্রমে।
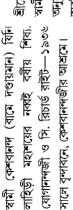
শ্রীযোগানন্দ ও মহামণ্ডল আশ্রমের স্বামী দয়ানন্দের গুরু স্বামী জ্ঞানানন্দ, বেনারস, ফেব্রুয়ারী ৭, ১০৩৬। প্রথা অনুযায়ী, যোগানন্দজী আশ্রম অধ্যক্ষ জ্ঞানানন্দজীর পদপ্রান্তে অবস্থিত। যোগানন্দজী ১৯১০ সালে তাঁর গুরু স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরের সন্ধান পাওয়ার পূর্বে বাল্যাবস্থায় এই আশ্রমেই সাধন অভ্যাস করেন।

রমণ মহর্ষি ও যোগানন্দজী

মহর্ষির অরুণাচল আশ্রমে
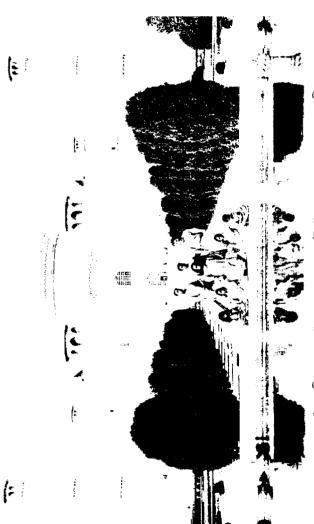
... ও তাঁর সঙ্গীগণ আগ্রায় "শ্বেতপাথরের স্বপ্ন-সৌধ" তাজ মহল ১৯৩৬ সালে পরিভ্রমণকালে

মন্থরগতি, অনিশ্চিত গরুরগাড়ীর মত চলার ব্যবস্থার জায়গায় "ক্রিয়া"কে বলা যেতে পারে এরোপ্লেনের গতি।

যোগবিজ্ঞান সর্বপ্রকার মনঃসংযোগ আর ধ্যানসাধন প্রক্রিয়ার ভূয়োদর্শনের ফলের উপর প্রতিষ্ঠিত। যোগ সাধনার দ্বারা সাধক ইচ্ছামাত্র পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় থেকে প্রাণশক্তি প্রত্যাহার বা তাতে সংযোগ করতে পারেন। ইন্দ্রিয়বোধ হতে বিচ্ছিন্ন হবার এই শক্তি পেয়ে যোগী ইচ্ছামাত্র তাঁর মনকে ঈশ্বরভাবে অথবা সাংসারিকভাবে যুক্ত করতে পারেন। তাঁকে আর তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, প্রাণশক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, উচ্ছৃঙ্খল চিন্তা আর উন্মত্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারবিশিষ্ট এ পার্থিব জগতে ফিরে আসতে হয় না।

উন্নত "ক্রিয়াযোগী"র জীবন, তাঁর প্রাক্তন কর্মফলের দ্বারা নয়, কেবলমাত্র তাঁর আত্মার নির্দেশ দ্বারাই প্রভাবিত হয়। সাধক এই প্রকারে সাধারণ জীবনের সদসৎ, অহংকারী, কর্মের কুটিলতা এড়িয়ে যায়, যা দৃপ্ত হৃদয়ের কাছে শম্বুকগতির বলে মনে হয়।

এইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের সমুন্নত প্রণালী দ্বারা যোগী তাঁর দেহাত্মবোধের কারা থেকে মুক্ত হন ও সর্বব্যাপিত্বের গভীর মুক্তবায়ুর আস্বাদ গ্রহণ করেন। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক জীবনযাপন যেন দাসত্বে আবদ্ধ হওয়া, আর তার গতিও অত্যন্ত মন্থর। কেবলমাত্র বিবর্তনের ধারার সাথে জীবনকে বেঁধে মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে কোন সুবিধাজনক দ্রুতোন্নতি আদায় করে নিতে পারে না। শরীর আর মনের নিয়ন্ত্রণবিধি ভুলক্রমে লঙঘন না করে জীবনযাপন করলেও পরামুক্তিলাভের জন্য তাকে দশলক্ষ বৎসর ধরে জীবনমরণের মিছিলে নানাবর্ণের রূপ ধরে চলতে হয়।

তাই, যারা এই লক্ষ লক্ষ বৎসরের বিবর্তনধারার মধ্য দিয়ে অতিদীর্ঘ অনিশ্চিত সাধনার পথের দিকে ক্লান্তি, ভয় আর বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রোহদৃষ্টিতে তাকায়, তাদের জন্য আত্মোৎকর্ষসাধনের পক্ষে জীবভাব বা দেহাত্মবোধের হাত হতে মুক্ত হবার জন্য যোগীদের এই অতিদ্রুত ফলপ্রসূ প্রণালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোন পন্থা নেই। সাধারণ মানুষ, যারা আত্মার কথা দূরে থাক, কেবলমাত্র প্রকৃতির সঙ্গেও সামঞ্জস্য বা যোগ রেখে চলতে পারে না, — যে প্রকৃতির শান্ত ও স্নিগ্ধ সাম্যভাব অবহেলা

করে তার পরিবর্তে অস্বাভাবিক চিত্তবৈকল্যই অনুসরণ করে চলে, তার জন্যে এই সংখ্যার পরিধি খুবই বর্ধিত হয়। তার জন্য দশলক্ষ বৎসরের দ্বিগুণ সময়ও মুক্তিলাভের পক্ষে যথেষ্ট হবে কি না সন্দেহ।

জড়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হয়ত কচ্চিৎ অথবা কদাপি বুঝতে পারে না যে, তার দেহ একটি সাম্রাজ্য বিশেষ, আর তা সম্রাট পরমাত্মারই অধীন; মেরুদণ্ডে অবস্থিত ছয়টি চক্র অথবা জ্ঞানকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত সহায়ক রাজপ্রতিনিধিদল নিয়ে তিনি ব্রহ্মরন্ধ্রের সিংহাসনে বসে তা শাসন করছেন। এই ঈশ্বরতন্ত্র এক বিরাট অনুগত প্রজামণ্ডলীর উপর বিস্তৃত; তার মধ্যে আছে ২৭ লক্ষ কোটি কোষ — (সুনিশ্চিত আর সহজবুদ্ধিতে প্রদীপ্ত, যার দ্বারা তারা শরীরের বৃদ্ধি, রূপান্তর এবং ক্ষয়সাধন — এ সব দায়িত্ব পালন করে); আর মানুষের গড়পড়তা ষাট বছরের জীবনে পাঁচকোটি অধস্তন স্তরের চিন্তা, ভাবাবেগ এবং জ্ঞানরাজ্যের বৈচিত্র্য, সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক বিভিন্ন অবস্থাসমূহ ইত্যাদি।

পরমাত্মা-সম্রাটের বিরুদ্ধে কোন শরীর বা মনের আপাতদৃষ্ট বিদ্রোহ, যা রোগ বা মানসিক বিশৃঙ্খলারূপে প্রকাশিত হয় — তা সম্রাটের প্রতি ঐসব অনুগত প্রজাদের কোন বিরুদ্ধাচরণজনিত নয়, — তা কেবল মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের, অতীত বা বর্তমান অপব্যবহারের ফলশ্রুতি — যে স্বাধীন ইচ্ছা ভগবান তার আত্মার সঙ্গে তাকে দিয়েছেন, এবং যা কখনো প্রত্যাহার করা যাবে না।

একটা সঙ্কীর্ণ অহংভাবে মত্ত হয়ে মানুষ মনে করে যে, একমাত্র সে-ই কেবল চিন্তা করে, ইচ্ছাপ্রকাশ করে, অনুভব করে, অন্ন পরিপাক করে, নিজের চেষ্টাতেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে — কিন্তু কখনও চিন্তা করে (সামান্যমাত্র হলেই যথেষ্ট হয়!) স্বীকার করে না যে তার সাধারণজীবনে সে কেবলমাত্র তার প্রাক্তন কর্ম আর প্রকৃতি বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাসমাত্র — তাদের হাতে কাষ্ঠপুত্তলিকা। প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, অনুভূতি, ভাবধারা, মানসিকগতি আর অভ্যাস সবই অতীত কারণে সীমিত — তা সে এ'জন্মেরই হোক বা পরজন্মেরই হোক। এসব প্রভাবের বহু বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত তার রাজকীয় আত্মা। অচিরস্থায়ী সত্য

আর স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে "ক্রিয়া"যোগী যাবতীয় মায়ামোহ পরিহার করে মুক্তাত্মায় পরিণত হন। সকল শাস্ত্রেই বলে — মানুষ ক্ষয়শীল দেহমাত্র নয় — সে প্রাণবন্ত আত্মা; আর এই "ক্রিয়া"সাধন তাকে এমন এক পথের সন্ধান দেয় যা ঐ শাস্ত্রীয় সত্যকে প্রমাণিত করে।

শঙ্করাচার্য তাঁর সুবিখ্যাত "বৈরাগ্যশতকে" লিখে গেছেন ঃ "জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই উভয়ের অভেদজ্ঞান না জন্মালে বাহ্য অনুষ্ঠান অজ্ঞানতা নাশ করতে পারে না, কেবল আত্মোপলব্ধিজাত জ্ঞানই অজ্ঞানান্ধকার দূর করতে পারে ... পরিপ্রশ্ন ব্যতীত জ্ঞানের উদ্‌গম হয় না। 'আমি কে? নিখিল বিশ্বের উৎপত্তি হয়েছিল কিরূপে? কে তার স্রষ্টা? এর আধিভৌতিক কারণই বা কি?' এইগুলিই হচ্ছে প্রশ্নোল্লিখিত বিষয়।"

শুধু বুদ্ধিতে এসব প্রশ্নের কোন উত্তর মেলে না — তাই ঋষিরা আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার উত্তর জানার জন্য যোগবিদ্যা উদ্ভাবন করে গেছেন।

প্রকৃত যোগীরা তাদের সকল প্রকার মনন, ইচ্ছা আর দেহ-কামনাজাত বিভিন্ন প্রকার অনুভূতির সঙ্গে মিথ্যা একাত্মবোধ সযত্নে পরিহার করে, মেরুদণ্ডস্থিত চক্রসমূহের অতীন্দ্রিয়জ্ঞানশক্তির সহিত মনকে সংযুক্ত করে, ঈশ্বরকল্পিত এ জগতে বসবাস করেন। অতীতের কোন প্রেরণাবশতঃ নয় বা মানব প্রবৃত্তিজাত নূতন কোন প্রজ্ঞাহীনতার জন্যও নয়। এরূপ যোগীরাই তাঁদের চরম আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা লাভ করে সেই অসীম অনন্ত ব্রহ্মানন্দের নিরাপদ আশ্রয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হন।

সুসম্বন্ধ প্রণালীতে যোগসাধনের নিশ্চিত ফললাভের প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে নিষ্ঠাবান যোগীর বিষয় প্রশংসা করে বলেছেন ঃ "কঠোর তপঃনিরত তপস্বীগণ অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ; এমনকি যারা জ্ঞানমার্গী (জ্ঞান যোগ) বা কর্ম্মমার্গী (কর্ম যোগ), তাঁদের অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ; অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী হও!"*

---

* আধুনিক বিজ্ঞান শরীর আর মনের উপর শ্বাসহীনতার অসাধারণ নিরাময়কারী ও পুনরুজ্জীবক ফলের বিষয় আবিষ্কার করতে শুরু করেছে। নিউইয়র্কস্থিত কলেজ অফ্ ফিজিসিয়ান্স এণ্ড সার্জন্স-এর ডাঃ অ্যালভান এল. ব্যারাক একটি স্থানীয় শ্বাসযন্ত্র বিরাম

ক্রিয়াযোগই হচ্ছে সেই আসল "অগ্নিযজ্ঞ", ভগবদ্‌গীতায় যার বিষয় উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করা হয়েছে। যোগী সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত অদ্বৈতবাদের অগ্নিযজ্ঞে তার যা কিছু পার্থিব বাসনাকামনা আহুতি প্রদান করেন। এই হচ্ছে প্রকৃত যৌগিক অগ্নিযজ্ঞ, যাতে অতীত ও বর্তমান কামনাবাসনা ঈশ্বরপ্রেমের অগ্নিতে যজ্ঞোপকরণরূপে ভস্মসাৎ করা হয়। সেই "চরম শিখা" মানবের সকল প্রকার ভ্রান্তিপ্রমাদের আহুতি গ্রহণ করে — আর মানব সর্বপ্রকার ক্লেদ থেকে মুক্ত হয়। কর্মের কঙ্কালাস্থিসকল কামনাবাসনার মেদ-মাংস মুক্ত হয়ে, জ্ঞানসূর্যের বিশুদ্ধকারী কিরণের তেজে শুচিশুভ্র হয়ে, মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তা উভয়েরই কাছে নির্দোষ থেকে, অবশেষে সে একেবারে পরিশুদ্ধ হয়।

চিকিৎসার উদ্ভাবন করেছেন যাতে বহু ক্ষয়রোগী স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে। সমপ্রেষ কক্ষের ব্যবহারে রোগী শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করতে পারে। ১৯৪৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী 'নিউইয়র্ক টাইম্‌সে' ডঃ ব্যারাকের নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি প্রকাশিত হয় ঃ—

"কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে শ্বাসের বিরতির ফল অতীব আগ্রহোদ্দীপক। হস্তপদাদির ঐচ্ছিক পেশীসকল সঞ্চালনের বেগ অদ্ভুতভাবে কমে যায়। রোগী তার হাত না নেড়ে বা অবস্থানের কোন পরিবর্তন না করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শুয়ে থাকতে পারে। ঐচ্ছিক শ্বাসপ্রশ্বাস যখন বন্ধ হয় তখন ধূমপানেচ্ছাও অন্তর্হিত হয়, — এমন কি তাদের মধ্যেও, যারা দৈনিক দু'প্যাকেট করে সিগারেট খেতে অভ্যস্ত। বহু ক্ষেত্রে এই বিরাম এরূপ ধরণের হয় যে তার কোন আমোদপ্রমোদেরও প্রয়োজন হয় না।" ১৯৫১ সালে ডাঃ ব্যারাক এই চিকিৎসার উপকারিতা প্রকাশ্যে সমর্থন করে বলেছিলেন যে, "এ শুধু যে ফুস্‌ফুস্‌কেই বিশ্রাম দেয় তা নয়, সমস্ত শরীরটাকেও এবং আপাতদৃষ্টিতে মনকেও বিশ্রাম দেয়। যেমন, হৃৎপিণ্ডের কাজ এক তৃতীয়াংশ কমে যায়। আমাদের রোগীদের উদ্বেগ কমে যায় — কেউই বিরক্তি বোধ করে না।"

এই সব ঘটনা থেকে লোক বুঝতে পারে যে, চাঞ্চল্য প্রকাশের কোন মানসিক বা শারীরিক বেগবিহীন হয়ে যোগীরা কি করে দীর্ঘকাল ধরে নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারে। কেবলমাত্র এইরকম শান্ত নীরবতার মধ্য দিয়েই জীবাত্মা পরমাত্মায় প্রত্যাবর্তনের পথের সন্ধান পায়। শ্বাসহীনতার কতকগুলি উপকারিতা লাভ করতে গেলে যদিও সাধারণ মানুষকে সমপ্রেষ কক্ষে অবশ্যই থাকতে হয়, যোগীর কিন্তু শরীর ও মনে এবং আত্মবোধের পুরস্কার লাভ করতে গেলে "ক্রিয়াযোগের" প্রণালী ছাড়া আর কিছুরই দরকার করে না।

২৭ পরিচ্ছেদ

রাঁচিতে যোগবিদ্যালয় স্থাপন

গুরুদেব একদিন হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, "সংগঠন কাজে তোমার বিরাগ কেন?"

শুনে চমকে উঠলাম। সত্যিই সে সময়ে আমার ব্যক্তিগত ধারণা ছিল যে প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুই "ভীমরুলের চাক।"

বললাম, "এসব কাজে কোনই লাভ নেই গুরুদেব। পরিচালক কিছু করুক আর নাই করুক — সমালোচনা তার হবেই!"

প্রখরদৃষ্টির সঙ্গে গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন, "স্বর্গের সুধা তুমি কি সবটা একলাই পান করতে চাও নাকি? যদি না দয়ার অবতার সদ্গুরুগণ অপরকে তাঁদের জ্ঞান বিতরণ করতে ইচ্ছুক হতেন, তা হলে তুমি বা অন্য কেউ, কখন কি যোগের দ্বারা ভগবৎসঙ্গ লাভ করতে পারতে?" তারপর তিনি বললেন, "ভগবান হচ্ছেন মধু, আর প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সব মধুচক্র; অতএব দুটোরই প্রয়োজন আছে। অবশ্য পরমাত্মার সংস্পর্শবিহীন বাহ্যিক কোন সংগঠন নিরর্থক বটে, কিন্তু তুমিই বা অধ্যাত্ম অমৃতপূর্ণ কর্মমুখর মধুচক্র তৈরী করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে না কেন?"

তাঁর উপদেশ আমার মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে তুলল। প্রকাশ্যে কোন উত্তর না দিলেও আমার মনে এক দৃঢ়সঙ্কল্পের উদয় হল। গুরুপদতলে বসে যে মুক্তিপ্রদ সত্যের শিক্ষালাভ করেছি — তা আমার ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব, আমার সাথীদের সঙ্গে সমানভাবে ভাগ করে নেব। প্রার্থনা করলাম, "ভগবান, আমার ভক্তিতীর্থে তোমারই প্রেম যেন চিরউজ্জ্বল থাকে, আর আমি যেন তোমার প্রেম সকলের অন্তরে জাগিয়ে তুলতে পারি।"

সন্ন্যাস গ্রহণ করবার পূর্বে কোন এক উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্তেশ্বরজী একটি অপ্রত্যাশিত মন্তব্য করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, "দেখ, বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রীর সাহচর্যের প্রয়োজন যে কত বেশি, তা কি জান? আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না যে, ঘরসংসারী মানুষ স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণরূপ কর্তব্যে নিযুক্ত থেকে ভগবানের চক্ষে পুণ্য কাজই করেন?"

সভয়ে আমি প্রতিবাদের সুরে বলে উঠলাম, "গুরুদেব, আপনি তো জানেন যে, এ জীবনে আমার একমাত্র কামনা সেই পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া, বিয়েটিয়ে করা নয়।"

গুরুদেব এত উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন যে তখনই আমি বুঝতে পারলাম, তিনি আমার বিশ্বাসের গভীরতা পরীক্ষা করবার জন্যই মন্তব্যটি করেছেন, অন্য কিছু নয়।

তারপর তিনি ধীরে ধীরে বললেন, "মনে রেখো, কেউ যদি তার সাংসারিক কর্তব্য পরিহার করে, তাহলে তার সমর্থনে তাকে আরও বৃহত্তর পরিবারের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।"

শিশুদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদানের পরিকল্পনা আমার মনে সর্বদাই জাগরূক ছিল। সাধারণ শিক্ষা, যার লক্ষ্য কেবল শরীর আর বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন, তার বিষময় ফল আমি স্পষ্টই দেখেছি। গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতিতে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নীতি, যার অভাবে কোন লোকই প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে পারে না — তার প্রয়োজন এখনও রয়েছে। মনে মনে স্থির করলাম, এমন একটি বিদ্যালয় স্থাপন করব যাতে সুকুমারমতি বালকগণ পূর্ণ মানবত্বের আদর্শে গড়ে উঠতে পারে। সেই লক্ষ্যে আমার প্রথম প্রচেষ্টা হল বাংলার এক ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম, ডিহিকায়, সাতটিমাত্র ছেলে নিয়ে কাজ আরম্ভ করা।

বছরখানেক পরে, ১৯১৮ সালে, কাশিমবাজারের মহারাজা স্যার মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহাশয়ের বদান্যতায় আমার দ্রুতবর্ধনশীল ছাত্রদলটিকে রাঁচিতে স্থানান্তরিত করা হল। কোলকাতা হতে প্রায় দু'শ মাইল দুরে, বিহারের এই শহরটি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ। রাঁচিতে কাশিমবাজারের রাজপ্রাসাদকে নূতন বিদ্যালয়ের

প্রধানকেন্দ্রে পরিণত করে নাম দিলাম — "যোগদা সৎসঙ্গ ব্রহ্মচর্য* বিদ্যালয়।"।

রাঁচিতে প্রাথমিক আর উচ্চ বিদ্যালয় — এই উভয়বিধ ধারা অনুযায়ী পাঠদানের কার্যক্রম প্রবর্তন করা হল। এখানে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও বিদ্যালয়ে পঠিতব্য শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা আছে। মুনিঋষিদের বিদ্যাদানের আদর্শ (যাঁদের অরণ্য-আশ্রম ছিল ভারতীয় তরুণদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের প্রাচীন স্থান) অনুসরণ করে আমি ঠিক করেছিলাম যে, বিদ্যালয়ের অধিকাংশ পড়াশুনা মুক্ত আকাশতলেই হবে।

রাঁচি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শেখান হয় যোগ ধ্যান, আর একটি স্বাস্থ্য আর শারীরিক উন্নতিসাধনের অপূর্ব প্রণালী, "যোগদা", যার সূত্রগুলি আমি ১৯১৬ সালে আবিষ্কার করেছিলাম।

মানুষের শরীর ইলেকট্রিক ব্যাটারীর মত, — এই উপলব্ধি থেকে মনে মনে যুক্তিবলে স্থির করলাম যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগে এতে শক্তি পুনঃসঞ্চারিত করা যেতে পারে। যেহেতু "ইচ্ছা" ব্যতীত কোন প্রকার কার্য করাই সম্ভবপর নয়, সেহেতু মানুষ এই "আদ্যাশক্তি" ইচ্ছার সাহায্য নিয়ে, জটিল যন্ত্রপাতি বা কোন রকম যান্ত্রিকব্যায়ামের সাহায্য ব্যতিরেকেই, শরীরতন্তুগুলিতে আবার নূতন শক্তি সঞ্চার করতে পারে। সরল "যোগদা" প্রণালী দ্বারা মহাশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সজ্ঞানে আর সদ্যসদ্য প্রাণশক্তি (সুষুম্না শীর্ষক কেন্দ্রে অবস্থিত) পুনঃ সঞ্চারিত করে নেওয়া যায়।

রাঁচির ছেলেদের "যোগদা" প্রণালী শিক্ষার ফল খুবই ভাল হল। তারা প্রাণশক্তিকে শরীরের একস্থান হতে অন্যস্থানে চালিত করবার আর অত্যন্ত কঠিন আসনে সম্পূর্ণ ধীরস্থির হয়ে বসে থাকবার অসাধারণ

* ব্রহ্মচর্য — এই 'ব্রহ্মচর্য' মনুষ্যজীবনে বৈদিক চতুরাশ্রমের একটি আশ্রম; বাকী তিনটি, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। জীবনে এই চারটি আশ্রমের আদর্শ যদিও আধুনিক ভারতে বিস্তৃতভাবে এখন অনুসৃত হয় না, তবু এর প্রতি নিষ্ঠাবান অনেকেই আছেন। জীবনব্যাপী গুরুনির্দেশের অধীনে থেকে অতীব নিষ্ঠার সঙ্গে এই চতুরাশ্রম পালন করা হয়। রাঁচিস্থ যোগদা সৎসঙ্গ বিদ্যালয় সম্বন্ধে আরও তথ্য ৪০ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

দক্ষতা লাভ করল। সহ্যগুণ আর শক্তিপ্রদর্শনের নানাবিধ কৌশল তারা যা দেখিয়েছিল, তা অনেক শক্তিমান বয়স্ক ব্যক্তিরাও দেখাতে পারেন কি না সন্দেহ।

আমার কনিষ্ঠভ্রাতা শ্রীমান বিষ্ণুচরণ ঘোষ* রাঁচি বিদ্যালয়ে যোগ দেয়; পরে সে একজন প্রথিতযশা ব্যায়ামবিদ্ হয়ে দাঁড়ায়। সে এবং তার একটি ছাত্র ১৯৩৮-৩৯ সালে পশ্চিমদেশ ভ্রমণে বহির্গত হয়ে শক্তি ও পেশী সঞ্চালনের দক্ষতা প্রদর্শন করে। নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকা আর ইউরোপের অন্যান্য বহু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ শরীরের উপর মনের ক্ষমতার প্রভাব দর্শনে চমৎকৃত হন।

রাঁচীতে প্রথম বৎসরের শেষে বিদ্যালয়ে প্রবেশলাভের জন্য প্রায় দুই হাজার আবেদনপত্র এসেছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ে সে সময় কেবলমাত্র আবাসিক ছাত্রদের জন্য বন্দোবস্ত থাকায়, একশতের বেশি আবাসিক রাখার জায়গা ছিল না। পঠনপাঠনের জন্য দিবাবিভাগ শীঘ্রই খোলা হয়।

বিদ্যালয়ের শিশুদের কাছে আমায় পিতামাতা উভয়েরই স্থান গ্রহণ করতে হত, আর সেইসঙ্গে সংগঠনকাজের জন্য অনেক ঝক্কিও সামলাতে হত। যীশুখ্রিস্টের সেই কথাগুলি আমি প্রায়ই স্মরণ করতাম, "আমি নিশ্চয় করে বলছি, এমন কোন লোক নেই যে আমার নিমিত্ত এবং বাইবেলের সত্যের নিমিত্ত বাড়ীঘর, ভ্রাতাভগিনী, পিতামাতা, অথবা স্ত্রীপুত্র বা জমিজমা ছেড়েছে — সে কিন্তু অত্যাচার সহ্য করলে এখন, ইহকালে, ভাইভগিনী, মাতাপুত্র, জমিজমা শতগুণ ফিরে পাবে, আর জন্মান্তরে অনন্ত জীবন পাবে।"†

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কথাগুলির এইরকম ব্যাখ্যা করেছেন ঃ— "যে ভক্ত, বিবাহ আর সংসারে প্রবেশলাভের অভিজ্ঞতা ত্যাগ করে ক্ষুদ্রসংসার

---

* বিষ্ণুচরণ ঘোষ ১৯৭০ সালের ৯ই জুলাই কলকাতায় পরলোকগমন করেন। *(প্রকাশকের মন্তব্য)*

† মার্ক ১০ ঃ ২৯-৩০ (বাইবেল)।

আর সঙ্কীর্ণ কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তে সাধারণভাবে সমাজসেবার (ইহজীবনে এখন শতগুণ বাড়ীঘর এবং ভাইভগিনী) বৃহত্তর দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাতে করে সে এমন একটা কর্মভার গ্রহণ করে যাতে অবুঝ সংসারের অত্যাচার জড়িত থাকে বটে, কিন্তু এরূপ একটা বৃহত্তর ঔদার্যে সাধকের সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা দূরীভূত হয়ে তার এক স্বর্গীয় পুরস্কার লাভ হয়।"

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়েতে* চাকরী গ্রহণ না করার দরুণ পিতা মনে আঘাত পেয়েছিলেন বলে অনেক দিন তাঁর সাক্ষাৎ পাইনি; একদিন তিনি রাঁচিতে এলেন স্নেহাশীর্বাদ দান করবার জন্য। বললেন, "বাবা, জীবনে তুমি যে পথ বেছে নিয়েছ, তা আমি মেনে নিয়েছি। এইসব আনন্দোৎসুক দিব্য শিশুদলের মধ্যে তোমায় দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। রেলের শুষ্ক, প্রাণহীন সময়সূচী আর হিসাবপত্রের মধ্যে ডুবে থাকার চেয়ে এখানেই তোমায় মানায় ভাল; এই-ই হচ্ছে তোমার আসল স্থান।" ডজনখানেক ছোট ছোট শিশুরদল পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; আনন্দচঞ্চল দৃষ্টিতে তাদের দেখিয়ে পিতা হেসে বললেন, "আমার আটটি সন্তান, কিন্তু তোমার — যাক্, আমি বেশ টের পাচ্ছি!"

এখানে প্রায় ২০ একর বিরাট উর্বর জমি আছে। ছাত্র, শিক্ষকগণ ও আমি — সকলে মিলে প্রাত্যহিক উদ্যান পরিচর্যা ও বাইরের কাজে বহুসময় আনন্দে কাটিয়েছি। আমাদের অনেকগুলি প্রিয় পোষা জীবজন্তু ছিল, তার মধ্যে একটি ছিল হরিণ — ছেলেদের চোখের মণি। হরিণশিশুটিকে আমিও এত ভালবাসতাম যে সেটিকে আমার ঘরেই রাত্রে ঘুমোতে দিতাম। ভোরের আলো ফুটে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে হরিণশিশুটি আমার বিছানার কাছে খুটখুট করে চলে আসত, সকালবেলায় একটু আদর পাবার লোভে!

একদিন আমি বাচ্ছাটিকে একটু সকাল-সকালই খাইয়ে দিলাম। রাঁচিশহরে একটা কাজে যেতে হবে তাই একটু তাড়াতাড়ি ছিল। যাবার আগে ছেলেদের সাবধান করে দিয়ে গেলাম এই বলে — হরিণশিশুটিকে

---

* বর্তমানে সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে।

কেউ যেন আর কোন কিছু না খাওয়ায়। একটা ছেলে ছিল খুবই অবাধ্য, বাচ্ছাটাকে বেশ খানিকটা দুধ খাইয়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে শুনলাম, অত্যন্ত দুঃসংবাদ — "অতিরিক্ত খাওয়ানর ফলে হরিণশিশুটি মরমর!"

সাশ্রুনয়নে প্রায় জীবন্মৃত হরিণশিশুটিকে সযত্নে কোলে তুলে নিলাম। ভগবানের কাছে সকাতরে প্রার্থনা জানাতে লাগলাম — অসহায় জীবটির যেন তিনি প্রাণরক্ষা করেন। ঘণ্টাকতক বাদে, শাবকটি চোখ খুলল, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে অত্যন্ত দুর্বলভাবে চলাফেরা করতে আরম্ভ করল। সারা স্কুল আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল।

কিন্তু সেই রাত্রে এক দারুণ শিক্ষা পেলাম — যা আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। রাত দুটো অবধি হরিণশিশুটিকে নিয়ে বসে, তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখি হরিণশিশুটি আমায় বলছেঃ

"তুমি আমায় আটকে রেখেছ কেন? দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও, আমায় যেতে দাও!"

স্বপ্নেই উত্তর দিলাম, "আচ্ছা বেশ।"

তক্ষুণি জেগে উঠেই চেঁচিয়ে বললাম, "ওরে ছেলেরা, হরিণশিশুটি যে মারা যাচ্ছে!" ছেলের দল দৌড়ে আমার কাছে ছুটে এল।

ঘরের কোণের দিকে দৌড়ে গেলাম — সেখানেই হরিণশিশুটিকে শুইয়ে রেখেছিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে একবার ওঠবার শেষ চেষ্টা করল; তারপর মুখ থুবড়ে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল — তারপরই সব শেষ।

কর্মফল, যা জীবজন্তুদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, সেই কর্মফল অনুসারে হরিণশিশুটির আয়ু শেষ হয়েছে, এবং সে আরও উচ্চতর রূপ পরিগ্রহের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু আমার নিজের গভীর আকর্ষণ — পরে অবশ্য জানতে পেরেছিলাম যে তা নিঃস্বার্থ নয় — আর আমার ঐকান্তিক প্রার্থনার দ্বারাই আমি তাকে এই পশু আকৃতির সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সমর্থ হয়েছিলাম, যা থেকে তার আত্মা মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করছিল। হরিণশিশুটির আত্মা স্বপ্নে আমায় তাকে মুক্তি দেবার জন্য অনুনয়বিনয়

করেছিল, কারণ আমি ভালবেসে অনুমতি না দিলে হয় সে যাবে না, বা যেতে পারবে না। যেইমাত্র রাজী হলাম, অমনি সে চলে গেল।

সব শোক দূর হল; নতুন করে জানলাম যে, ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের কাছে এইটুকু চান যে তারা যেন সবকিছু তাঁরই অংশ বলে ভালবাসে, আর ভ্রান্তিবশতঃ যেন মনে না করে যে মরণেই সব শেষ। অজ্ঞলোকেরা ভাবে যে, দুর্লঙ্ঘ্য মৃত্যু-প্রাচীরের অন্তরালেই তাদের প্রিয় বন্ধুবান্ধব আপাতদৃষ্টিতে চিরকালের জন্য একেবারে হারিয়ে যায়। কিন্তু যে নিরাসক্ত, যে অপরকে ভগবানেরই প্রকাশ বলে ভালবাসে, সে জানে যে, মৃত্যুতে তার প্রিয় আত্মীয়স্বজন ঐশ্বরিক পরমানন্দে মগ্ন হবার জন্যই ফিরে যায়।

ক্ষুদ্র এবং সামান্য সূচনা থেকে ক্রমশঃ বর্ধিত হয়ে রাঁচি বিদ্যালয় এখন এমন একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা বিহার ও বঙ্গদেশে খুবই সুপরিচিত। প্রাচীন মুনিঋষিদের আদর্শে শিক্ষাপ্রদান প্রচলিত রাখায় যাঁদের উৎসাহ, তাঁদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অর্থসাহায্যেই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ব্যয়নির্বাহ হয়। মেদিনীপুর ও লক্ষ্মণপুর প্রভৃতি স্থানে বিকাশমুখী শাখা-বিদ্যালয়সকলও স্থাপিত হয়েছে।

রাঁচি আশ্রমে একটি চিকিৎসা বিভাগ আছে যেখান থেকে বিনামূল্যে ঔষধ আর চিকিৎসকদের সাহায্য স্থানীয় দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার ক্ষেত্রেও বিদ্যালয় বেশ সুনাম অর্জন করেছে; আর শিক্ষাক্ষেত্রেও রাঁচির বহু স্নাতক বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে প্রভূত কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছে।

গত তিন দশকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহু খ্যাতনামা নারী ও পুরুষ বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করে একে সম্মানিত করেছেন। কাশীর সেই "দুই দেহধারী" সাধু স্বামী প্রণবানন্দ ১৯১৮ সালে কয়েকদিনের জন্যে রাঁচিতে এসেছিলেন। উন্মুক্ত আকাশের নীচে বৃক্ষতলে ছাত্রদের শিক্ষাদান এবং সন্ধ্যাকালে ছোট ছোট ছেলেদের যোগসাধনাকালীন ধ্যানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চলভাবে বসে থাকতে দেখে, মহান গুরু প্রণবানন্দজীর অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল।

তিনি বলেছিলেন, "দেখে ভারি আনন্দ হচ্ছে যে বালকদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্যে লাহিড়ী মহাশয়ের আদর্শ এই বিদ্যালয়ে অনুসৃত হচ্ছে। আমার গুরুর আশীর্বাদ এর উপর বর্ষিত হোক।"

একটি ছোট ছেলে আমার পাশেই বসেছিল; ভরসা করে সে যোগিবরকে একটা প্রশ্ন করে বসল। বলল, —

"স্বামীজী, — আমি কি সন্ন্যাসী হব? ভগবানের জন্যই কি আমার জীবন উৎসর্গ করা?"

স্বামী প্রণবানন্দজী যদিও হাসছিলেন, তবুও তাঁর দৃষ্টি সুদূরে নিবদ্ধ, যেন ভবিষ্যতের রহস্যভেদ করবার চেষ্টা করছেন। তিনি উত্তর দিলেন, "বাছা, তুমি যখন বড় হবে, তখন তোমার একটি টুকটুকে বউ হবে, দেখো!" (ছেলেটি বহুবছর ধরে সন্ন্যাসী হবার মতলব করবার পর শেষ অবধি বিয়েই করে ফেলল।)

স্বামী প্রণবানন্দ রাঁচি থেকে ফিরে গেলে পর আমি পিতার সঙ্গে একদিন তাঁর কোলকাতার অস্থায়ী আবাসে গেছিলাম। স্বামীজী সেখানে কিছুদিনের জন্য ছিলেন। বহু বছর আগেকার স্বামী প্রণবানন্দজীর ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়ল : "পরে তোমার বাবা আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

পিতা স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি দাঁড়িয়ে উঠে সসম্মানে পিতাকে আলিঙ্গন করলেন। বললেন, "ভগবতীবাবু, আপনি নিজে কি কচ্ছেন? দেখছেন না, আপনার ছেলে ভগবানকে পাবার জন্যে কি রকম দ্রুত উন্নতি করছে?" পিতার সামনে প্রশংসার কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠলাম। স্বামীজী বলতে লাগলেন, "আপনার মনে আছে নিশ্চয়ই, আমাদের পূজনীয় গুরুদেব কিরকম প্রায়ই বলতেন, 'বনত, বনত, বন্ যায়।'* তাই 'ক্রিয়া'সাধনা অবিরাম করে

---

* লাহিড়ী মহাশয়ের একটি প্রিয় উক্তি, যার দ্বারা তিনি তাঁর শিষ্যদের ধ্যানপ্রচেষ্টায় উৎসাহবর্ধন করতেন। আক্ষরিক অর্থে এতে বোঝায়, "করতে করতে একদিন করা শেষ।" ভাবটির স্বচ্ছন্দ অনুবাদ হচ্ছে, "চেষ্টা করতে করতে একদিন দেখবে যে লক্ষ্যস্থানে পৌঁছে গেছ, ঈশ্বরসঙ্গ লাভ করেছ।"

যান, যাতে করে শীগগিরই ঈশ্বরসাক্ষাৎকারের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারেন।"

প্রণবানন্দজীর শরীর, আমার প্রথম কাশীদর্শনের সময় যা বেশ স্বাস্থ্যবান আর মজবুত দেখেছিলাম, তা এখন সুস্পষ্টভাবে জরাগ্রস্ত, যদিও তাঁর চেহারা এখনও চমৎকার ঋজু ও সবল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "স্বামীজী, আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো, আপনি কি শরীরে বার্ধক্যের আগমন বুঝতে পারছেন না? শরীর দুর্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি আপনার ঈশ্বরানুভূতিও হ্রাস পাচ্ছে না?"

অতি মধুর হেসে তিনি বললেন, "আহা, প্রাণের ঠাকুর যে আমার অনেক কাছে এগিয়ে এসেছেন!" তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস আমার মনপ্রাণ অভিভূত করে ফেলল। তারপর তিনি বলতে লাগলেন, "আমি এখনও দু'টি পেন্সন ভোগ করছি; একটি ভগবতীবাবুর দরুণ আর অন্যটি স্বর্গরাজ্যের!" বলে আকাশের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে এক গভীর চিদানন্দে মগ্ন হয়ে পড়লেন, মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত, — আমার প্রশ্নের প্রকৃষ্ট উত্তর পেয়ে গেলাম।

প্রণবানন্দজীর ঘরে নানাজাতীয় গাছ আর বীজের প্যাকেট দেখে আমি তাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে ওঠাতে তিনি বললেন, "আমি চিরকালের জন্যে কাশী পরিত্যাগ করে এসেছি। এখন আমি হিমালয়ের পথে চলেছি। সেখানে শিষ্যদের জন্যে আমি একটি আশ্রম খুলব। বীজগুলো থেকে শাকপাতা আর কয়েকটা তরিতরকারি হবে। আমার প্রিয়শিষ্যেরা খুব সহজ সরল ভাবেই জীবন-যাপন করবে — আনন্দময় ঈশ্বরসঙ্গলাভেই তাদের সময় কাটবে, আর কিছুরই দরকার নাই।"

পিতা তাঁর গুরুভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন কবে তিনি কোলকাতায় ফিরবেন। সাধুপ্রবর উত্তর দিলেন, "আর কখনও নয়। লাহিড়ী মহাশয় আমায় বলেছিলেন যে এই বছরই আমি আমার প্রিয় কাশী চিরকালের জন্যে পরিত্যাগ করে হিমালয়ে যাব, আর সেখানেই দেহত্যাগ করবো!"

তাঁর কথা শুনে আমার চক্ষুদু'টি অশ্রুপূর্ণ হয়ে এল, কিন্তু স্বামীজী অতি প্রশান্ত মধুরহাসি হাসলেন। তাঁকে দেখে মনে হল যেন এক স্বর্গের শিশু জগজ্জননীর অভয়ক্রোড়ে পরম নির্ভরতার আশ্রয়ে বসে আছে। শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকশক্তিতে পূর্ণশক্তিমান যোগিবরের দেহে বার্ধক্যজনিত কোন রেখাপাতই হয় নি। তিনি অবশ্য শরীরকে ইচ্ছামাত্র নবভাবে গঠিত করে তুলতে পারেন, কিন্তু তবুও তিনি কখন জরার আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টা করেন না; বরং তিনি এই ভৌতজগতে তাঁর কর্মক্ষয় হতে দিয়েই চলেন। শরীরটা তিনি এমনভাবে ব্যবহার করেন যেন তাঁর এই জরাগ্রস্ত দেহেই সব কর্মক্ষয় হয়ে যায়, নবজন্মে তাঁকে যেন আর কোন কর্মফল ভোগ করতে না হয়।

মাসকতক বাদে এক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল, নাম সনন্দন — প্রণবানন্দজীর ঘনিষ্ঠ শিষ্য।

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের মাঝে সনন্দন বলতে শুরু করল, "আমার পূজনীয় গুরুদেব আর নাই, তিনি দেহরক্ষা করেছেন। হৃষীকেশের কাছে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে আমাদের সযত্নে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। যখন আমরা বেশ ভাল করে গুছিয়ে বসে তাঁর সৎসঙ্গে দ্রুত আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করছি, তখন তিনি একদিন প্রস্তাব করলেন যে হৃষীকেশের অনেক লোককে খাওয়াতে হবে। জিজ্ঞাসা করলাম — এত লোককে খাওয়ান কেন? বললেন, 'এই আমার শেষ উৎসবপালন।' তাঁর কথার সম্পূর্ণ অর্থ তখন আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি।

"প্রণবানন্দজী বিরাট রন্ধনব্যাপারের আয়োজনে স্বহস্তে সাহায্য করেছিলেন। প্রায় দু'হাজার লোকের সেবা করানো হয়েছিল। ভাণ্ডারার পর তিনি একটা উঁচু পাটাতনের উপর বসে পরমাত্মা সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী আর ভাবপূর্ণ উপদেশ দিলেন। সেই উঁচু পাটাতনের উপর তখন আমি তাঁর পাশেই বসেছিলাম। ভাষণ শেষ হলে তিনি হাজার হাজার লোকের সামনে আমার দিকে ফিরে অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'সনন্দন, প্রস্তুত হও, — আমি দেহত্যাগ করতে যাচ্ছি।'

"বাক্‌শক্তি লোপ পেয়ে গেল; কিছুক্ষণ নীরব থাকবার পর আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'গুরুদেব, করবেন না, করবেন না, দোহাই আপনার — আপনি এ কাজ করবেন না।' সমবেত জনতা ভয়ে, বিস্ময়ে হতবাক — সাগ্রহে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে। গুরুদেব আমার দিকে চেয়ে শুধু একটু হাসলেন মাত্র, কিন্তু দৃষ্টি তাঁর ইতিমধ্যেই অনন্তের দিকে নিবদ্ধ!

"তিনি বললেন, 'দেখ, স্বার্থপর হয়ো না আর আমার জন্যে দুঃখও কোরো না। তোমাদের সকলের জন্যেই তো এতদিন ধরে হাসিমুখে খাটলাম। এখন আনন্দ কর; আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও যাতে আমি সেই পরমানন্দময় প্রিয়তমের শান্তিময় ক্রোড়ে গিয়ে আশ্রয় পাই!" তারপর অর্ধস্ফুটস্বরে প্রণবানন্দজী বলতে লাগলেন, 'শীগগিরই আবার আমি জন্ম নিচ্ছি। অল্প কিছুকাল পরমানন্দ ভোগ করে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসছি বাবাজীর* সঙ্গে মিলিত হতে। কবে আর কোথায় নতুনদেহে আমার আত্মা এসে জন্মগ্রহণ করবে, তা তোমরা শীগগিরই জানতে পারবে।'

"আবার তিনি চিৎকার করে বললেন, 'সনন্দন, এই দেখ, দ্বিতীয় ক্রিয়াবলে আমি এ নশ্বরদেহ ত্যাগ করলাম।'†

"তিনি আমাদের সম্মুখে জনতার মুখের দিকে একবার তাকালেন, তারপর সকলকে আশীর্বাদ করলেন। এরপর কূটস্থে দৃষ্টি-সংলগ্ন করে

---

* লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু — এখনও তিনি জীবিত আছেন। (৩৩ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

† বস্তুতঃ, স্বামী প্রণবানন্দজী যে প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়েছিলেন, যোগদা সৎসঙ্গের উন্নত ক্রিয়াবানদের কাছে সেটাই তৃতীয় 'ক্রিয়াযোগ' নামে পরিচিত। শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয় যখন ক্রিয়াটি স্বামী প্রণবানন্দজীকে শেখান, তখন সেটি ছিল তাঁর [illegible] দ্বিতীয় ক্রিয়া। যে ভক্ত এই ক্রিয়ায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে সে ইচ্ছেমত যে কোন সময় শরীর ত্যাগ করতে আবার শরীরে ফিরেও আসতে পারে। উচ্চকোটির যোগী মৃত্যুকালে শেষবারের মত দেহ ত্যাগ করার সময় — যেটি তাঁরা পূর্বাহ্নেই জানতে পারতেন — এই 'ক্রিয়া' পদ্ধতিটি কাজে লাগান।

মুক্তিলাভের জন্য প্রাণের নক্ষত্র "দুয়ার", শিবনেত্রের মধ্যে দিয়ে মহাযোগীরা "আগমন ও নির্গমন" করে থাকেন। যীশুখ্রিস্ট বলেছেন ঃ "আমিই দরজা; যে আমার ভেতর দিয়ে প্রবেশ করবে, সেই রক্ষা পাবে, আসা-যাওয়া করবে ও তৃণভূমির সন্ধান পাবে। চোর (মায়া) আসে চুরি করতে, হত্যা করতে, এবং ধ্বংস করতে। আমি (কূটস্থ চৈতন্য) এসেছি যাতে তারা প্রাণ পায় — অপর্যাপ্তভাবে পায়।" — জন ১০ ঃ ৯-১০ (বাইবেল)।

তিনি স্থির নিশ্চল হয়ে পড়লেন। বিস্মিত জনতা যখন ভাবছিল যে তিনি পরমানন্দময় সমাধিতে লীন হয়েছেন, তখন কিন্তু তাঁর আত্মা এই রক্ত-মাংসের দেহ পরিত্যাগ করে পরমাত্মার অখণ্ড উদার বিস্তৃতির মাঝে মিলিয়ে গিয়েছে! পদ্মাসনে উপবিষ্ট তাঁর জড়দেহ শিষ্যেরা স্পর্শ করে দেখল যে তাতে আর শরীরের উত্তাপ নেই। মরণের অকরুণ স্পর্শে কেবল একটি হিমশীতল কঠিন দেহ সেখানে পড়ে রয়েছে। আর প্রাণপাখি অমৃতের কূলের দিকে পাখা মেলেছে।

সনন্দন তার বর্ণনা শেষ করতে আমি ভাবলাম, "দুইদেহধারী সাধুজীর জীবনে-মরণে দু'দিকেই নাটকীয় ভাব।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "প্রণবানন্দজী আবার কোথায় জন্ম নেবেন?" সনন্দন উত্তর করল, "সে একটা অত্যন্ত গোপনীয় কথা, বলা বারণ; কাউকে আমি তা এখন বলতে পারব না। আপনি বোধহয় অন্য কোন উপায়ে তা জানতে পারবেন।"

বহুবৎসর পরে আমি স্বামী কেশবানন্দজী* মহারাজের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম যে, প্রণবানন্দজী তাঁর নবকলেবরে জন্মগ্রহণ করবার কয়েক বছর বাদে হিমালয়ে বদরীনারায়ণে গিয়ে মহাযোগী বাবাজী মহারাজের সাধুসন্তদের দলে যোগদান করেছেন।

---

* কেশবানন্দজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ৪২ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

২৮ পরিচ্ছেদ

কাশীর পুনর্জন্ম ও আবিষ্কার

তখন আমি রাঁচিতে। মাঝে মাঝে ছেলেদের নিয়ে এখানে ওখানে প্রমোদভ্রমণে বেরোনো হয়। সেদিন মাইল আষ্টেক দূরে এক পাহাড়ে বেড়াতে গেছি, ছেলেরাও সঙ্গে রয়েছে। সামনে পুকুরের জলটি টলটল করছে; দেখে ভারি লোভ হয়, কিন্তু আমার মনে কি রকম একটা বিতৃষ্ণা এল। আমি বালতি করে জল তুলে তাইতে স্নান করতে লাগলাম। ছেলেদের সাবধান করে দিলাম, "দেখ, তোমরা কেউ জলে নেমো না; বালতি করে জল তুলে তাইতে সবাই স্নান কর।"

বেশিরভাগ ছেলে আমার দেখাদেখি বালতি করেই জল তুলে স্নান করা আরম্ভ করে দিল; কতকগুলো ছেলে কিন্তু ঠাণ্ডা জলের লোভ আর সামলাতে পারল না। জলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জলে ঝাঁপ দিতে না দিতেই বড় বড় জলঢোঁড়া সাপ সব তাদের চারধারে কিলবিল করে বেড়াতে লাগল। ছেলেগুলো তো ভয়ে চেঁচিয়েই অস্থির। সে রকমভাবে হুড়মুড় করে জলছিটিয়ে ছুটে পালিয়ে আসতে লাগল, তা দেখে হাসি সামলানই দায়।

একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় আমাদের চড়িভাতির আয়োজন হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে আমি একটি গাছতলায় বসলাম, ছেলেরা চারদিকে ঘিরে বসলো। আমায় একটু ভাবাবিষ্ট দেখে তারা নানা প্রশ্ন করতে লাগল।

একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করল, "স্বামীজী, বলুন না, আমি এই সন্ন্যাসের পথে বরাবর আপনার সঙ্গে থাকতে পারব তো?" বললাম, "উঁহুঁ না; তোমায় জোর করে বাড়ীতে ধরে নিয়ে যাবে, তারপরে তোমার বিয়েও হবে।"

কিছুতেই তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। দারুণ আপত্তি জানিয়ে বলল, "মরি যদি তবেই আমায় বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে, তার আগে নয়!" (কিন্তু

মাসকয়েকের ভিতরেই তার বাবা-মা এসে তার অশ্রুসজল আপত্তিতে কোন কর্ণপাত না করেই তাকে বাড়ীতে টেনে নিয়ে গেল আর বছরকতক বাদে তার বিয়েও হল।)

এইরকম নানাপ্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে কাশী বলে একটি ছেলে আমায় একটা প্রশ্ন করে বসল। ছেলেটির বয়স বছর বার, ভারি বুদ্ধিমান, আর সবাই তাকে খুব ভালবাসে।

জিজ্ঞাসা করল, "স্বামীজী, আমার ভাগ্যে কি হবে?"

কে যেন জোর করেই উত্তরটা আমার মুখ থেকে বার করাল ঃ "তোমার শীগগিরই মৃত্যু হবে!"

এই হঠাৎ আর অপ্রত্যাশিত উত্তরে আমার আর উপস্থিত সকলেরই মনে গভীর আঘাত আর দুঃখ উপস্থিত হল। মনে মনে নিজেকে ঠোঁটকাটা বলে তিরস্কার করে নীরব হয়ে বসে রইলাম — আর কারও প্রশ্নের উত্তর দেব না বলে স্থির করলাম।

বিদ্যালয়ে ফিরে আসবার পর কাশী আমার ঘরে দেখা করতে এল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "যদি আমি মরি, তা হলে বলুন স্বামীজী যে, আমার পুনর্জন্ম হলে আপনি আমায় খুঁজে বার করবেন আর আবার আমায় আধ্যাত্মিক পথে নিয়ে আসবেন?"

এই কঠিন গূঢ় ইন্দ্রিয়াতীত দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেও কিন্তু মনে কষ্ট হল। তারপর কয়েক সপ্তাহধরে কাশী আমায় অনবরতই পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তার অত্যন্ত ভয়ত্রস্ত ভাব দেখে শেষপর্যন্ত তাকে আশ্বস্ত করে প্রতিশ্রুতি দিলাম, "আচ্ছা বেশ, দয়াময় ভগবান যদি সাহায্য করেন, তাহলে অবশ্যই তোমায় খুঁজে বার করবার চেষ্টা করব।"

গ্রীষ্মের ছুটিতে অল্প কিছুদিনের জন্য বাইরে গেছিলাম। কাশীকে সঙ্গে নিতে পারব না বলে আফশোষ হলো; তাই যাবার আগে আমি তাকে নিজের ঘরে ডেকে বিশেষ করে উপদেশ দিলাম — যতই পীড়াপীড়ি হোক না কেন, সে যেন বিদ্যালয়ের আধ্যাত্মিক আবহাওয়ার ভিতরেই থাকে, বাইরে কোথাও যেন না যায়। কেন জানি মনে হল যে,

যদি সে বাড়ীতে না যায়, তাহলে হয়ত আসন্ন বিপদের হাত এড়াতে পারে।

আমি চলে আসতে না আসতেই কাশীর বাবা রাঁচিতে গিয়ে হাজির হলেন। পনেরদিন ধরে তাঁর চেষ্টা চলল কাশীর মন ভাঙাতে। কেবলই বোঝাতে লাগলেন যে, কাশী যদি মাত্র দিনচারেকের জন্যও কোলকাতায় তার মাকে একবার দেখতে যায়, ব্যস্‌ — তাহলেই সে ফিরে আসতে পারবে, আর সেখানে তাকে থাকতে হবে না।

কাশীও দৃঢ়ভাবে সব অস্বীকার করে যেতে লাগল, কিছুতেই আর রাজী হয় না। অন্য কোন উপায় না দেখে কাশীর বাবা শেষে বললেন, তিনি পুলিশের সাহায্যে ছেলেকে জোর করে ধরে নিয়ে যাবেন। এইরকম ভয় দেখানোতে কাশী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল। এই ভেবে সে ভয় পেল — হয়ত এইরকম ব্যাপারে বিদ্যালয়ের দুর্নাম হবে, আর একটা অযথা হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে, যা হতে দিতে সে একান্ত অনিচ্ছুক। কাজেই যাওয়া ছাড়া তার আর অন্য কোন উপায়ই রইল না।

দিনকতক বাদেই রাঁচিতে ফিরলাম। যখন শুনলাম যে কাশীকে কি ভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখনই ছুটলাম কোলকাতার ট্রেন ধরতে। কোলকাতায় নেমে একটা ঘোড়ারগাড়ী ভাড়া করলাম। গাড়ী যখন হাওড়ার পোলের উপর তখন দেখি যে, কাশীর বাবা আর তার অন্যান্য আত্মীয়েরা অশৌচ ধারণ করে চলেছেন। গাড়োয়ানকে চিৎকার করে গাড়ী থামাতে বলে তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। হতভাগ্য পিতার দিকে খানিকক্ষণ শুধু কটমট করে চেয়ে রইলাম। তারপর কতকটা যেন অসঙ্গতভাবেই বলে উঠলাম, "আপনি খুনী, আমার বাছাকে আপনিই খুন করেছেন, আর কেউ নয়!"

কাশীকে জোর করে কোলকাতায় নিয়ে আসাতে যে কি পরিমাণ অন্যায় করেছিলেন তা তার পিতা ইতিমধ্যে বেশ ভালই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যে সামান্য ক'দিন কাশী কোলকাতায় ছিল, তারই মধ্যে কাশী দূষিত খাদ্য গ্রহণ করে কলেরায় আক্রান্ত হয়, এবং তাতেই মারা যায়!

কাশীর প্রতি আমার ভালবাসা আর তার মৃত্যুর পর তাকে খুঁজে বার করবার আমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি — দিবারাত্র মনকে তোলপাড় করতে লাগল। যেখানেই যাই না কেন, তার মুখটি চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আমার পরলোকগতা জননীর জন্য যে রকম খোঁজাখুঁজি শুরু করেছিলাম, সেইরকমই খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম কাশীর জন্য; এও একটা খুব স্মরণীয় ব্যাপার।

মনে মনে ভাবলাম, ভগবান আমায় যে বিচারশক্তি দিয়েছেন, তাই আমি এখন কাজে লাগাব, আর আমার যা কিছু শক্তি আছে তার চূড়ান্ত প্রয়োগ করব সেইসব সূক্ষ্ম বিধিনিয়ম আবিষ্কার করতে, যাতে করে আমি জানতে পারি সে তার সূক্ষ্মদেহে এখন কোথায় অবস্থান করছে। আমি জানতে পেরেছিলাম যে তার আত্মা এখনও অপূর্ণ কামনাবাসনায় জড়িত। কোথায় কোন সূক্ষ্মস্তরে লক্ষকোটি জ্যোতিষ্মান আত্মিকদের মধ্যে একটা জ্যোতিঃপিণ্ডের মত সে আজ ভেসে বেড়াচ্ছে! ভাবতে লাগলাম, কি করে এত অসংখ্য আত্মিক জ্যোতিষ্মানদের মাঝখান থেকে তাকে খুঁজে বার করে তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করব।

একটি গুপ্ত যৌগিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করে আমি দুই ভ্রূমধ্যস্থ* কূটস্থের ভিতর দিয়ে কাশীর আত্মার কাছে আমার ভালবাসার আহ্বান প্রেরণ করতে লাগলাম।

স্বজ্ঞাবলে আমি অনুভব করছিলাম যে কাশী শীঘ্রই মর্ত্যে ফিরে আসবে, এবং আমি যদি নিয়ত তাকে আহ্বান জানাতে থাকি, তাহলে তার আত্মা প্রত্যুত্তর দেবে। আমি এও জানতাম — কাশীর পাঠানো সামান্যতম স্পন্দনও আমার আঙ্গুল, বাহু এবং মেরুদণ্ডে অনুভূত হবে। আমার

* যোগীরা অবগত আছেন যে ইচ্ছাশক্তি, দুই ভ্রূর মধ্যস্থিত বিন্দু হতে প্রক্ষেপিত হলে চিন্তাতরঙ্গ প্রেরক যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। হৃদয়ে যখন কোন ভাব বা আবেগ শক্তি ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয় তখন সে একটা মানসিক রেডিও যন্ত্রেরই মত কাজ করে থাকে যা আর দূর বা নিকট হতে প্রেরিত অন্য লোকেদের সংবাদও গ্রহণ করতে পারে। টেলিপ্যাথি বা পরচিত্তজ্ঞানে মানুষের মনের চিন্তাধারার সূক্ষ্ম স্পন্দনগুলি প্রথমতঃ মহাকাশের ইথারের সূক্ষ্ম স্পন্দন দ্বারা, এবং তারপর আরও স্থূল পার্থিব ইথারের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎতরঙ্গরূপে পরিচালিত হয়, যা আবার অপরের মানসপটে চিন্তাতরঙ্গরূপে পরিণত হয়।

উত্তোলিত বাহুকে অ্যানটেনার মত করে কাজে লাগিয়ে আমি প্রায়ই চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতাম, যে দিকে সে গর্ভস্থ ভ্রূণের মধ্যে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছে — সে দিক নির্ণয় করা যায় কি না। আশা হল — অন্তরের রেডিওর ভিতর গভীর মনঃসংযোগবলে আমি তার কাছ থেকে প্রত্যুত্তর পাব।

কাশীর মৃত্যুর পর অদম্য উৎসাহে আমি যৌগিকপ্রক্রিয়াটি মাসছয়েক ধরে একনাগাড়ে অভ্যাস করে যেতে লাগলাম। জনকতক বন্ধুবান্ধব নিয়ে কোলকাতায় বৌবাজারে ভিড়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে অভ্যাসমত একবার হাত তুললাম। সেই প্রথমবার একটা সাড়া পেলাম। ঠিক যেন একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আমার আঙুল আর হাতের তালু বেয়ে নেমে আসছে টের পেয়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এই তরঙ্গগুলো যেন গাঢ় সংবদ্ধ হয়ে আমার চেতনার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে অবিরত ধ্বনিত হতে লাগল, "আমি কাশী, আমি কাশী, আমার কাছে আসুন।"

আমার হৃদয় রেডিওতে মনঃসংযোগ করাতে ঐ চিন্তাটি যেন তখন আরও স্পষ্ট করে শোনা যেতে লাগল। বারম্বার আমি কাশীর ডাক শুনতে পেলাম, অদ্ভুত তার সেই ঈষৎ ভাঙ্গাগলায়* চুপিচুপি স্বরে। নাঃ, এ কাশীই ত' বটে! আমার জনৈক সঙ্গী প্রকাশ দাসের হাত টেনে ধরে আনন্দে হেসে উঠে বললাম, "মনে হচ্ছে, এবার কাশীর খোঁজ পেয়েছি।"

আমি আবার সেইরকম করে হাত তুলে চারিদিকে ঘুরতে আরম্ভ করলাম। আমার বন্ধুদের আর পথচারীদের তা দেখে বড়ই মজা লাগল। আমি এধারে ঘুরেই চলেছি। মজা হচ্ছে এই যে, যেই মাত্র আমি কাছেরই একটা গলি "সার্পেণ্টাইন লেনের" দিকে মুখ করি, অমনি সেই বিদ্যুৎস্রোত আমার আঙুল দিয়ে বইতে আরম্ভ করে; আবার অন্যদিকে মুখ ফিরালেই ঐ সূক্ষ্মতরঙ্গ একেবারে অন্তর্হিত হয়!

---

* জীবাত্মা মাত্রেই শুদ্ধ অবস্থায় সর্বদর্শী। কাশীর আত্মা, কাশীর পূর্বজন্মের বালকাবস্থার গলাকার বৈশিষ্ট্য স্মরণপথে রেখেছিল, আর সেই জন্যই আমাকে তার পরিচয় জ্ঞাপন করবার জন্য ভাঙাগলার স্বরের অনুকরণ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

তখন আমি বলে উঠলাম, "ওহে, এই গলির ভিতরেই একটা বাড়ীতে কোন মায়ের গর্ভে কাশীর আত্মা এসে বাস করছে, এস ত' দেখি!"

সঙ্গীরা আর আমি ত' সার্পেণ্টাইন লেনের দিকে এগোতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার উত্তোলিত হস্তে অনুকম্পনও ক্রমশঃ আরও প্রবল ও সুস্পষ্ট হতে লাগল। চলতে চলতে বোধ হল যেন একটা চুম্বক আমায় রাস্তার ডানধারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। একটা বাড়ীর দরজার কাছে এসে আমার পা একদম আটকে গেল! অবাক হয়ে গেলাম। দারুণ উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ — দরজায় ঘা দিতে লাগলাম। বুঝলাম যে আমার এই সুদীর্ঘ, আর অত্যদ্ভুত সন্ধানের জন্য পরিশ্রম করা আজ সফল ও সার্থক হতে চলেছে।

একটা ঝি এসে দরজা খুলে দিল। জিজ্ঞেস করাতে বললে যে, মনিব তার বাড়ীতেই আছেন। তিনি তেতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন কি চাই? মুশকিলে পড়ে গেলাম; কি বলি তা ভেবে পাইনা, আমার প্রশ্ন যে একাধারে সঙ্গত আর অসঙ্গত দুই-ই!

যাক্, ভরসা করে বলেই ফেললাম, "মশায়, কিছু যদি না মনে করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; দয়া করে বলবেন কি — আপনারা কি একটি সন্তান আশা করছেন, এই ধরুন মাস ছয়েক হল?"*

আমাকে গেরুয়াপরা একজন সন্ন্যাসী দেখে ভদ্রলোক সবিনয়ে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই বটে! কিন্তু দয়া করে বলুন ত', আপনি আমার বাড়ীর খবর সব জানলেন কি করে?"

---

* জড়দেহ হতে উৎক্রান্ত হয়ে বহু লোকের আত্মা যদিও ৫০০ হতে ১০০০ বৎসর পর্যন্ত সূক্ষ্মজগতে অবস্থান করে, তবুও দেহ হতে দেহান্তরগ্রহণের মধ্যবর্তীকালের সময়ের কোন অপরিবর্তনীয় বা নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। (৪৩ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। জড় অথবা সূক্ষ্ম দেহে অবস্থানের নির্দিষ্ট কাল, কর্মানুযায়ী পূর্ব হতেই স্থিরীকৃত হয়ে থাকে।

মৃত্যু আর নিদ্রা, যা প্রকৃতপক্ষে "ক্ষুদ্র মরণ" ছাড়া আর কিছু নয়, তা মরজগতে প্রয়োজন কেননা তা অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবকে ইন্দ্রিয়বোধের মায়াজাল হতে সাময়িকভাবে মুক্ত করে। আত্মা মানুষের পরম সত্তা বলে সে নিদ্রা বা মহানিদ্রাকালে তার অশরীরিত্বের কতকগুলি সঞ্জীবনী স্মারক চিহ্ন পায়।

তারপর যখন কাশীর ব্যাপার আর আমার প্রতিশ্রুতির কথা সব শুনলেন, তখন বিস্ময়ে স্তম্ভিত ভদ্রলোক সমস্ত কথাই বিশ্বাস করলেন।

আমি তাঁকে বললাম, — "আপনার একটি ছেলেই হবে। গৌরবর্ণ, চওড়া মুখ, কপালে উল্টান ঝুঁটি — ধর্মভাব তার খুবই প্রবল হবে।" মনে মনে তখন স্থিরনিশ্চয় হয়েছিলাম যে, ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হলে কাশীর এইসব লক্ষণের সঙ্গে তার সৌসাদৃশ্য থাকবেই।

পরে আবার ছেলেটিকে দেখতে গিয়েছিলাম। বাপ মা তার পূর্বজন্মের সেই পুরাতন নাম কাশীই রেখেছিলেন। অতি শৈশবেও আমার প্রিয়শিষ্য কাশীর সঙ্গে তার আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য ছিল। শিশুটি আমায় দেখেই তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। পূর্বজন্মের যাবতীয় আকর্ষণ এজন্মে দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে ফিরে এসেছে।

বছরকয়েক বাদে, আমি আমেরিকায় থাকার সময় সে আমায় চিঠি লিখেছিল। তখন সে কিশোর বালক। সন্ন্যাসগ্রহণে তার গভীর আগ্রহের কথা সে আমায় জানিয়েছিল। আমি তাকে হিমালয়ের এক গুরুর সন্ধান দিই যিনি সেই পুনর্জাত কাশীকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুসারে কর্মসূত্রের সাম্যসাধক নিয়ম হচ্ছে — ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, কার্য ও কারণ, আবাদ ও ফসল; স্বাভাবিক ন্যায়ানুসারে (ঋত) সুনির্দিষ্ট কর্মধারায় মানুষ তার চিন্তা আর কার্যের দ্বারা তার নিজের ভাগ্য নিজেই রচনা করে। যে কোন বিশ্বশক্তিই সে স্বয়ং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সঞ্চালিত করুক না কেন, বৃত্ত যেমন অবশ্যম্ভাবীরূপে তার সূচক বিন্দুতে ফিরে আসে, সেইরূপ সে সবই তার কাছে ফিরে আসে। "পৃথিবীকে যেন অঙ্কশাস্ত্রের সমীকরণের মতই বোধ হয়। তাকে যেমন করেই ঘোরানো যাক না কেন, সে ঠিক তার ভারসাম্য বজায় রাখবে। সকল রহস্যই প্রকাশিত হয়, সমস্ত পাপেরই শাস্তি হয়, সব পুণ্যই পুরস্কৃত হয়, প্রত্যেক অন্যায়েরই প্রতিবিধান হয় — নীরবে আর নিশ্চিতভাবে।" (ইমার্শনকৃত "কম্পেন্সেসন।") জীবনে অসামঞ্জস্যের পিছনে কর্মকে ন্যায়ের বিধানরূপে বর্তমান বিবেচনা করতে পারলে, ঈশ্বর আর মানুষের বিরুদ্ধে আক্রোশ বা বিদ্বেষ হতে মানবমন মুক্ত হতে পারবে।

২৯ পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্রনাথ ও আমার বিদ্যালয় প্রসঙ্গে আলোচনা

রাঁচি বিদ্যালয়ে ভোলানাথ নামে একটি বছর চৌদ্দবয়সী ভারি বুদ্ধিমান ছাত্র ছিল। একদিন সকালে সে রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাইছিল। শুনে ভারি খুশি হয়ে তাকে প্রশংসা করাতে ভোলানাথ বলল, "রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — আত্মপ্রকাশের স্বাভাবিক মাধ্যমরূপে আমরা যেন পাখির মতই অনায়াসে গান করি।" বিনা অনুরোধ-উপরোধেই আবার সে গান আরম্ভ করে সুরের মাধুর্যে আকাশ-বাতাস ভাসিয়ে দিল। ছেলেটি কিছুদিন বোলপুরে 'শান্তিনিকেতনে' ছিল।

ভোলানাথকে বললাম, "ছেলেবেলা থেকে আমিও রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে আসছি। সারা বাংলা, এমন কি অশিক্ষিত চাষাভুষোরাও, তাঁর উচ্চ ভাবময় সঙ্গীতে ভারি আনন্দ পায়।"

ভোলা আর আমি রবিঠাকুরের কয়েকটি গান একসঙ্গে গাইলাম। তিনি অসংখ্য বাংলা কবিতাতে সুর সংযোজনা করেছেন, তার মধ্যে অনেকগুলি তাঁর নিজের মৌলিক রচনা, আর বাকি সব প্রাচীন কবিতা।

গানের শেষে আমি বললাম, "রবিঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাবার কিছুদিন পরেই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম কেন জান? কারণ তাঁর সাহিত্যিক সমালোচকদের আক্কেল দেবার জন্যে তাঁর সরল সাহসোক্তি আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল বলে" — বলেই হেসে উঠলাম।

ঘটনাটা শোনবার জন্য ভোলার কৌতূহল খুবই বেড়ে গেল।

আমি শুরু করলাম, "বাংলা কবিতায় নতুন ধারা প্রবর্তন করাতে সাহিত্যসেবীরা তাঁর যৎপরোনাস্তি নির্মম সমালোচনা আরম্ভ করল। তাঁর

অপরাধ — তিনি ব্যাকরণনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ভেঙে দিয়ে লেখ্য আর কথ্য ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। সাহিত্যের প্রচলিত গতানুগতিক ধারা উপেক্ষা করলেও তাঁর গানে সুগভীর ভাবময় ভাষায় গভীর দার্শনিকতত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে।"

"একজন প্রভাবশালী সমালোচক রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে তাচ্ছিল্য করে 'পায়রা কবির বকবকানি, তাও ছাপালে পদ্য হল — নগদ মূল্য একটাকা' বলে উল্লেখ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিশোধের সুযোগও তারপরেই এসে গেল; 'গীতাঞ্জলির' স্বকৃত ইংরেজি অনুবাদ বার হওয়ামাত্রই সারা পাশ্চাত্যজগৎ তাঁর পদতলে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করল। দেখেশুনে ধুরন্ধর সব সাহিত্যিক দল — তাঁদের মধ্যে তাঁর পূর্বেকার সমালোচকপ্রভুরাও ছিলেন — ট্রেন বোঝাই হয়ে ত' শান্তিনিকেতনে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে ছুটলেন।

"রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করেই একটু বিলম্ব করে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তারপর নীরবে নির্বিকারে তাদের প্রশংসা শুনে অবশেষে তিনি তাঁদেরই সমালোচনায় ব্যবহৃত আক্রমণাস্ত্র তাঁদের ফিরিয়ে দিয়ে বললেন ঃ 'ভদ্রমহোদয়গণ, আজ এখানে আমার কাছে যে সম্মানের সৌরভ বিতরণ করতে এসেছেন, তার সঙ্গে কিন্তু আপনাদের অতীতের ঘৃণার পূতিগন্ধ অত্যন্ত বিসদৃশভাবেই মিশে রয়েছে। আমার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সঙ্গে আপনাদের এই হঠাৎ কাব্যোপলব্ধির মধ্যে সম্ভাব্য কোন সংযোগ আছে না কি? বাংলার কাব্য-সরস্বতীর বেদীতলে যখন আমি আমার প্রথম দীন উপচার শ্রদ্ধাকুসুম নিবেদন করে আপনাদের বিরাগভাজন হয়েছিলাম, সেই কবি তো আমি এখনও একই রকম রয়েছি।'

"খবরের কাগজে রবীন্দ্রনাথের এই দারুণ তিরস্কার খুব বড় বড় করেই ছাপা হয়েছিল। চাটুকারিতার মোহমুক্ত কবিগুরুর এই স্পষ্টোক্তিতে আমি যারপরনাই খুশি হয়েছিলাম। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর সেক্রেটারী মিঃ সি. এফ. এণ্ড্রজ।*

* ইংরেজ লেখক এবং প্রচারবিদ্ এণ্ড্রজ সাহেব ছিলেন মহাত্মা গান্ধীরও অন্তরঙ্গ বন্ধু।

এণ্ড্রুজ সাহেবের পরিধানে সাদাসিধে ধুতি। রবীন্দ্রনাথকে এণ্ড্রুজ সাহেব সশ্রদ্ধভাবে 'গুরুদেব' বলে সম্বোধন করতেন।

"রবীন্দ্রনাথ আমায় সাদরে গ্রহণ করলেন। তাঁর মধ্য থেকে যেন একটা কৃষ্টি, সৌজন্য আর শান্তিময় মাধুর্যের ছটা বেরোচ্ছিল। তাঁর সাহিত্যের পটভূমি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি আমায় বলেছিলেন যে, মূলতঃ আমাদের ধর্মীয় মহাকাব্য এবং চতুর্দশ শতকের লোকপ্রিয় কবি বিদ্যাপতির পদাবলীই তাঁকে প্রভাবিত করেছে।"

মন যখন এইসব স্মৃতির সৌরভে ভরপুর, আমি তখন রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রূপান্তরিত একটি পুরানো বাংলা গান, "আমার এ ঘরে, আপনার করে, গৃহ-দীপখানি জ্বালো" গাইতে শুরু করলাম।

বিদ্যালয়প্রাঙ্গণে ভ্রমণের সময় আবার উৎফুল্লহৃদয়ে ভোলাতে আর আমাতে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে শুরু করলাম।

রাঁচি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রায় বছর দুই পর আমি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেলাম শান্তিনিকেতনে যাবার জন্যে — আমাদের উভয়ের শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করতে। খুব খুশি হয়েই গেলাম। আমি যখন তাঁর কাছে গেলাম, কবি তখন তাঁর পাঠাগারে বসেছিলেন। আমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় যেমনটি আমার মনে হয়েছিল, এবারও তেমনি মনে হল যেন সামনে বসে রয়েছেন যেকোন চিত্রকরের একান্ত কাম্যবস্তু শ্রেষ্ঠ মানবত্বের এক অপূর্ব সুন্দর প্রতিমূর্তি। দীর্ঘকেশ আর আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রুজালে শোভিত সুগঠিত প্রশান্ত সৌম্য আনন, দীর্ঘ আয়ত চক্ষুদুটিতে স্বপ্নময় স্নিগ্ধকোমল দৃষ্টি, মুখে স্বর্গীয় হাসি; কণ্ঠস্বর বংশীধ্বনির মত — সত্যিই এককথায় যেন প্রাণ কেড়ে নেয়! দীর্ঘ, ঋজু সৌম্যদেহে রমণীর কোমলতার সঙ্গে যেন শিশুর আনন্দচঞ্চলতা মিশ্রিত হয়েছে। কোনও কবির সম্বন্ধে আদর্শধারণা এই প্রিয়দর্শন প্রশান্তমূর্তির চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত রূপপরিগ্রহ করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ও আমি — আমাদের উভয়ের বিদ্যালয়ের তুলনামূলক আলোচনায় শীঘ্রই গভীরভাবে নিমগ্ন হলাম। উভয় স্কুলই গতানুগতিক

ধারার বাইরে গড়ে উঠেছে। অবশ্য উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও ছিল যথেষ্ট — যেমন মুক্ত আকাশতলে শিক্ষাদান, অনাড়ম্বর সরল জীবনযাপন, শিশুদের সৃজনীশক্তির উন্মেষণে প্রচুর অবকাশ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে সাহিত্য ও কবিতার উপরেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, আর জোর দিয়েছেন সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আত্মবিকাশ, যা আমি ভোলার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি। শান্তিনিকেতনে ছাত্রেরা কিছুটা সময় মৌনব্রত পালন করত বটে, কিন্তু বিশেষ কোন যোগশিক্ষা তাদের দেওয়া হত না।

"যোগদা" ব্যায়াম প্রণালীর অভ্যাস এবং যৌগিক উপায়ে মনঃসংযোগের প্রক্রিয়াগুলি যা রাঁচি বিদ্যালয়ের সব ছাত্রদেরই শিক্ষা দেওয়া হয়, তার বর্ণনা কবি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারেই শুনলেন।

তারপর কবি তাঁর বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার কাহিনী বর্ণনা করতে আরম্ভ করে হেসে বললেন, "ফিফ্‌থক্লাস থেকেই স্কুলে যাওয়ায় ইস্তফা দিয়েছিলাম।" আমি তখনই বুঝলাম — তাঁর কবিমন, বিদ্যালয়ের শুষ্ক নিয়মানুগত শ্বাসরোধী বদ্ধবায়ু পরিত্যাগ করে, কোন মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত কাব্যগগনে কল্পনার পাখা বিস্তার করে উড়তে চেয়েছিল।

"এই জন্যেই আমি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠা করলাম, ছায়াঘন তরুতলে উদার আকাশের নীচে," বলেই তিনি সুন্দর একটি উপবনতলে শিক্ষারত ছোট্ট একটি শিশুর দলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। তারপর তিনি বলতে লাগলেন, "শিশুর স্বাভাবিক পরিবেশ হচ্ছে ফুল আর পাখির গান। সেখানেই সে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, তার অন্তরের গুপ্ত ঐশ্বর্যসম্ভার পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে। সত্যিকারের শিক্ষা তো বাইরে থেকে কখনও মগজে ঠেসে দেওয়া যায় না; বরং ভিতরের অসীম জ্ঞানরাশি যাতে বাইরে প্রকাশিত হয়, এ যেন স্বতঃই তাতে সাহায্য করতে পারে।"*

---

* "আত্মা বহুবার পুনর্জন্মলাভ করে বলে, অথবা হিন্দুরা যেভাবে বলে 'হাজার হাজার জন্মের মধ্যে দিয়ে অস্তিত্বের পথে এগিয়ে চলা' ... এর ফলে সব জ্ঞাতব্যই তার জানা হয়ে যায় ... কিবা আশ্চর্য যে তার পূর্বেকার জ্ঞান আবার স্মরণ করতে পারে ... কেননা অনুসন্ধান ও শিক্ষা সবকিছুকে মনে করিয়ে দেয়।" — এমার্সন।

আমি সায় দিয়ে বললাম, "সাল তারিখ আর হিসাবনিকাশের একঘেয়েমিতে ছেলেদের বীরপূজার প্রেরণা আর কল্পনার আদর্শ, সব যেন একেবারে শুকিয়ে যায়।"

শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সূচনা হয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহে; কবি তাই পিতার বিষয় সসম্ভ্রমে উল্লেখ করে বললেন, "বাবামশাই আমায় এই উর্বরা জমিটুকু দান করেন; এখানে অতিথিশালা আর মন্দির ইতিমধ্যেই তিনি তৈরী করে দিয়েছেন। এখানে আমি শিক্ষাদানের পরীক্ষা শুরু করি ১৯০১ সালে দশটি মাত্র ছেলেকে নিয়ে। নোবেল পুরস্কারের আটহাজার পাউণ্ডের সবটাই বিদ্যালয় সংরক্ষণের জন্যে ব্যয় করা হয়।"

দেশেবিদেশে দেবেন্দ্রনাথ "মহর্ষি" নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর 'আত্মজীবনী' পাঠেই তাঁর অসাধারণত্বের কথা জানা যায়। যৌবনে তিনি দুই বৎসর হিমালয়ে ধ্যানসাধনে অতিবাহিত করেন। আবার মহর্ষির পিতা, দ্বারকানাথ ঠাকুর সারা বাংলার মধ্যে লোকহিতৈষণায় তাঁর অপূর্ব বদান্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। এই খ্যাতনামা সম্ভ্রান্তবংশ থেকে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তির এক বৃহৎ গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, — তাঁর পরিবারের প্রায় সকলেই কোন না কোন সৃজনশীল বিষয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য স্থাপনা করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর দুই ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্র ও অবনীন্দ্র ভারতবর্ষে অগ্রগণ্য চিত্রশিল্পীদের মধ্যে অন্যতম।* জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন গভীর তত্ত্বদর্শী দার্শনিক। বনের পশুপক্ষীরাও তাঁর কাছে নিঃসঙ্কোচে আসত, বিন্দুমাত্র ভয় পেত না।

রবীন্দ্রনাথ আমায় অতিথিশালায় রাত্রিযাপনের নিমন্ত্রণ করলেন। সন্ধ্যায় বারান্দাতে আলোছায়ার ঘেরা পরিবেশের মধ্যে ছোট্ট একটি দল বেষ্টিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ নীরবে উপবিষ্ট — সে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য! সময় যেন বহু যুগ পিছিয়ে গেছে। সম্মুখের দৃশ্যটি যেন কোন প্রাচীন আশ্রমের — আনন্দগীতিরসিক গায়কের চতুর্দিকে ভক্তদল ঘিরে বসে

---

* রবীন্দ্রনাথের যখন ৬০ বছর বয়স, তখন থেকে তিনি চিত্রাঙ্কণে গভীর মনোনিবেশ করেন। কয়েকবছর আগে য়ুরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে এবং নিউ ইয়র্কে তাঁর অঙ্কিত ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল।

আছে — সবারই মুখ স্বর্গীয় প্রেমের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত। একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য, ঐক্য ও সঙ্গতির সুষমা স্থানটিতে এনে তিনি তাকে পরম রমণীয় আর লোভনীয় করে তুলেছেন। আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নয়, একটা স্নিগ্ধপেলব মধুরপরশ দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের দুর্নিবার চৌম্বক আকর্ষণে রবীন্দ্রনাথ আমার হৃদয় যেন জোর করে কেড়ে নিলেন। ভগবৎপ্রেমের উদ্যানে দুর্লভ কবিতাপ্রসূত ফুলগুলি — স্বভাবমধুর গন্ধে চারিদিকে সবাইকে আকৃষ্ট করে তুলেছেন, সৌরভে সব মাতোয়ারা।

সঙ্গীতের ঝঙ্কারের মত তাঁর কণ্ঠস্বর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুটিকতক সদ্যরচিত অপূর্ব কবিতা আমাদের সামনে পাঠ করে শোনালেন। ছাত্রদের আনন্দপরিবেশনের জন্য লেখা তাঁর কবিতা আর নাটকের অধিকাংশই শান্তিনিকেতনে রচিত হয়েছে। আমার কাছে তাঁর লেখার সৌন্দর্য হচ্ছে, প্রায় প্রতি ছন্দতে ঈশ্বরের অবতারণা করা হয়েছে, কিন্তু কদাচিৎ সেই পুণ্যনামের উল্লেখ সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। এক স্থানে তিনি লিখেছেন ঃ "সুরের আনন্দে মগ্ন থেকে আমি নিজেকে ভুলে যাই, আর তোমাকে, হে আমার প্রভু, সখা বলে সম্বোধন করি।"

পরদিন আহারাদি শেষ করে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে বিদায়গ্রহণ করতে হল। আমার আনন্দ হচ্ছে এই জন্যে যে, সেই ছোট্ট স্কুলটি আজ আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় "বিশ্বভারতী"তে* পরিণত হয়েছে, যেখানে দেশ-দেশান্তর থেকে আগত ছাত্ররা এক আদর্শ পরিবেশের সন্ধান পায়।

> "চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
> জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
> আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
> বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,

---

* ১৯৪১ সালে সর্বলোকপ্রিয় মহাকবি পরলোকগমন করলেও, তাঁর বিশ্বভারতী এখনও সতেজে বিদ্যমান।

১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে বিশ্বভারতী হতে পঁয়ষট্টিজন ছাত্র ও শিক্ষক রাঁচির যোগদা সৎসঙ্গ বিদ্যালয়ে এসে দশ দিন থেকে গেছেন।

যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় —
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা — নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা —
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"*

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

---

* গীতাঞ্জলি — বিশ্বভারতী। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ রচিত কবি সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত প্রবন্ধ "The Philosophy of Rabindranath Tagore" দ্রষ্টব্য।

৩০ পরিচ্ছেদ

অলৌকিক ঘটনার নিয়ম

সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক লেভ তলস্তয়* "তিন সন্ন্যাসী" (The Three Hermits) নামে একটি চমৎকার রূপকথা লিখেছিলেন। তাঁর বন্ধু নিকোলাস রোয়েরিক নিম্নলিখিতভাবে গল্পটি সংক্ষেপিত করেন ঃ

"কোন এক দ্বীপে তিন প্রবীণ সন্ন্যাসী বাস করতেন। তাঁরা এতই সরল ছিলেন যে, প্রার্থনাকালে তাঁরা শুধু এই ক'টি কথাই বলতেন ঃ 'আমরা তিনজন, আপনিও ত্রিমূর্তি — আমাদের প্রতি দয়া করুন'। এই অত্যন্ত সরল সাধাসিধা প্রার্থনার সময় নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার সব ঘটতে লাগল।

"স্থানীয় বিশপ† এই তিন সন্ন্যাসী আর তাঁদের অশাস্ত্রীয় প্রার্থনার কথা শুনতে পেয়ে ভাবলেন যে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করে শাস্ত্রানুযায়ী তাঁদের কেতাদুরস্ত প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই প্রয়োজন। তিনি সেই দ্বীপটিতে এলেন; সন্ন্যাসীদের বললেন — ঈশ্বরের কাছে তাঁদের দিব্য প্রার্থনা ঠিক যথোপযুক্তভাবে হচ্ছে না; তিনি তাঁদের নানারকম শাস্ত্রবিধিসম্মত প্রার্থনা করার শিক্ষা আর উপদেশও দিলেন। তারপর বিশপ মহোদয় ত' একটি নৌকো করে স্থান ত্যাগ করলেন। যেতে যেতে দেখলেন যে, একটা উজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডল নৌকার পিছন পিছন ছুটে আসছে। জ্যোতিটি কাছে এসে পৌঁছতেই তিনি দেখলেন ঐ তিন সন্ন্যাসী হাত ধরাধরি করে ঢেউয়ের উপর দিয়ে ছুটে আসছেন নৌকটি ধরবার জন্য।

---

* মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের সঙ্গে তলস্তয়ের বহু আদর্শের সামঞ্জস্য ছিল; দুজনে অহিংসা বিষয়ে পত্রালাপ করতেন। তলস্তয়ের মতে খ্রিস্টের মূল শিক্ষা হচ্ছে ঃ "(অন্যায়ের দ্বারা) অন্যায়ের প্রতিরোধ কোরো না।" — ম্যাথিউ ৫ ঃ ৩৯ (বাইবেল)। পাপের প্রতিকার করা উচিত তার যুক্তিসিদ্ধ কার্যকরী বিপরীত ব্যবস্থায় — মঙ্গলসাধন বা প্রেম দিয়ে।

† গল্পটির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে ঐতিহাসিক উপাদান আছে। এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে জানা যায় যে, বিশপ মহোদয় যখন আর্কেঞ্জেল থেকে স্লোভেটস্কি মঠে যাচ্ছিলেন, তখন দীনা নদীর মোহানায় তিনি ঐ তিন সন্ন্যাসীর দেখা পান।

"বিশপের কাছে পৌঁছতেই তাঁরা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনি যে প্রার্থনাগুলি শিখিয়েছিলেন তা আমরা ভুলে গেছি; তাই তাড়াতাড়ি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, সেগুলো আর একবার বলে দিন।' দেখে শুনে তো বিশপ মশাই ভীষণ অবাক। ভয়ে ভীত হয়ে মাথা নেড়ে সবিনয়ে বললেন, 'সাধু মহোদয়গণ, আপনারা পুরানো প্রার্থনাই বলতে থাকুন; নূতন কিছুর আর দরকার নেই।'"

প্রশ্ন হলো ঃ সাধু তিনটি জলের উপর দিয়ে হেঁটে এলেন কি করে?

যীশুখ্রিস্ট তাঁর ক্রুশবিদ্ধ দেহকে পুনরুত্থিত করলেন কেমন করে?

লাহিড়ীমশাই আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করতেন কি করে?

আধুনিক বিজ্ঞান আজ পর্যন্তও এর কোন সদুত্তর দিতে পারেনি, যদিও আণবিক যুগের আগমনে বিশ্বমানস হঠাৎ প্রসারতা লাভ করেছে। মানুষের অভিধানে "অসম্ভব" কথাটা ক্রমশঃই গুরুত্ব হারিয়ে ফেলছে।

প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, এই জড়জগৎ দ্বৈতবাদ আর সাপেক্ষন্যায় বা আপেক্ষিকবাদ যার উপর 'মায়াবাদ' প্রতিষ্ঠিত, সেই একটিমাত্র মূলবিধি দ্বারাই পরিচালিত হয়; সকল প্রাণের প্রাণ পরমাত্মা হচ্ছেন অদ্বয়তত্ত্ব; সৃষ্টলোকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও বৈচিত্র্যময় প্রকাশ করার জন্যে তিনি একটা মিথ্যা বা অসত্য আবরণে নিজেকে আবরিত করেন। ভ্রান্তিজনক মোহময় সেই দ্বৈত আবরণই হচ্ছে 'মায়া'। আধুনিককালের বহু বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই ঋষিদিগের এই সরল সত্য উক্তিকে সমর্থন করেছে।

নিউটনের গতিতত্ত্বও হচ্ছে 'মায়ার' বিধি ঃ "প্রত্যেক ক্রিয়ার সর্বদাই একটা সমান আর বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকে। যে কোন দুইটি বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়া সর্বদাই সমান আর বিপরীতভাবে ক্রিয়াশীল।" কাজেই, ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়া অবিকল সমান। "স্বতন্ত্র একটিমাত্র শক্তি তাই অসম্ভব; সেই জন্য সর্বদাই দুইটি করে শক্তি থাকবে, যারা সমান আর বিপরীত।"

এ'কারণে সকল মৌলিক স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা থেকেই মায়িক উৎপত্তি প্রকাশ পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে — বিদ্যুতের

ক্রিয়া হচ্ছে আকর্ষণ আর বিকর্ষণ; এর ইলেক্ট্রন আর প্রোটন দুই বিপরীত বিদ্যুৎধর্মী। আরেকটা উদাহরণ — পরমাণু অর্থাৎ জড়কণার চূড়ান্ত অবস্থা হচ্ছে একটি পৃথিবীরই মত, যেন একটি চুম্বক, যার ধনাত্মক আর ঋণাত্মক, দুইটি মেরু আছে। সমগ্র প্রাতিভাসিক জগৎ অথবা জগতপ্রপঞ্চ হচ্ছে মেরুপ্রবণতার অদম্য প্রভাবের অধীন; দেখা গেছে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণশাস্ত্র অথবা অন্য যে কোন বিজ্ঞানই হোক না কেন, তারা সহজাত বিরুদ্ধবাদিতা বা বিপরীত নীতিশূন্য নয়।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান তাই মায়ার অতীত কোন নিয়ম বিধিবদ্ধ করতে পারে না — বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে যা ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। প্রকৃতি নিজেই হচ্ছে 'মায়া'; কাজেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে অবশ্যই তার অপরিহার্য সারাংশকে নিয়েই কাজ চালাতে হবে। প্রকৃতি তার নিজরাজ্যে অফুরন্ত আর চিরন্তন। ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানীরা তার অনন্তবৈচিত্র্যের এক রূপ থেকে অন্য রূপের মধ্যে প্রবেশ করা ছাড়া আর বেশি কিছু করতে পারবেন না। বিজ্ঞান এক অনন্ত রহস্যস্রোতে ভেসে চলেছে — অন্ত আর খুঁজে পাচ্ছে না। বিজ্ঞান অবশ্য পূর্ব হতে বর্তমান আর ক্রিয়াশীল বিশ্বের নিয়ম আবিষ্কার করতে সক্ষম বটে, কিন্তু সেই বিধির "বিধি" আর তার একমাত্র যিনি নিয়ন্তা, তাঁকে খুঁজে বার করতে তা একেবারেই অক্ষম। মহাকর্ষ আর বৈদ্যুতিক শক্তির অপূর্ব আর বিরাট ক্রিয়া সব জানা গেছে বটে, কিন্তু মহাকর্ষ আর বিদ্যুতের শক্তিটা আসলে যে কি জিনিষ, তা কোন মানুষই আজ পর্যন্ত জানতে পারে নি।*

প্রাচীন মুনিঋষিরা এই মায়া অতিক্রম করবার ভার মানবজাতির হাতেই সমর্পণ করে গেছেন। বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এই দ্বৈতভাব অতিক্রম করে স্রষ্টার সহিত একাত্মবোধই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। মায়াবদ্ধ জীবেরা, যারা এই বিশ্বনাট্যলীলার ছবি আঁকড়ে ধরে রয়েছে, তারা জোয়ার-ভাঁটা, দিবা-রাত্র, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, উত্থান-

---

* জগদ্বিখ্যাত আবিষ্কারক মার্কনি চরমতত্ত্বের সম্মুখে বিজ্ঞানের অপ্রতুলতার কথা স্বীকার করে বলেছেন যে, "জীবনরহস্য ভেদ করা একেবারেই বিজ্ঞানের ক্ষমতার বাইরে। বিশ্বাস জিনিষটি না থাকলে সত্যই এ অতি ভয়াবহ ব্যাপার হত। মানবের চিন্তাধারার সম্মুখে জীবনরহস্য হচ্ছে এক চিরন্তন সমস্যা।"

পতন, জন্ম-মৃত্যু — এই সব মেরুপ্রবণতার দ্বৈতভাবের মূলবিধি মানতে বাধ্য। কয়েক হাজার জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে এই চক্রে ঘুরে ঘুরে মানুষ শ্রান্ত আর ক্লান্ত হয়ে মায়াতীত কোন বস্তুর সন্ধানে আশাপূর্ণ হৃদয়ে তাকিয়ে থাকে।

এই মায়ার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করার মানেই হচ্ছে সৃষ্টিরহস্য ভেদ করা। যে যোগী এইভাবে বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য ভেদ করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত অদ্বৈতবাদী। আর বাকি সব প্রাণহীন মূর্তিপূজা করেই ক্ষান্ত। মানুষ যতদিন প্রকৃতির এই দ্বৈতভাবের অধীন হয়ে থাকবে, ততদিন এই দ্বিমুখিনী মায়াই হবে তার উপাস্যা দেবী। সে কখনই একমাত্র সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে জানতে পারবে না।

বিশ্বপ্রকৃতির "মায়া" মানুষের মনের ভিতর প্রকাশিত হয় 'অবিদ্যা'রূপে। অবিদ্যা মানে "অ-জ্ঞান", ভ্রান্তি বা মোহ। মায়া বা অবিদ্যা, বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধন বা বিশ্লেষণ দ্বারা কখনও দূর করা যায় না, তা কেবল করা যায় 'নির্বিকল্পসমাধি' লাভের মাধ্যমে। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের ধর্মোপদেষ্টারা এবং সকল দেশের সকল যুগের সাধুসন্তরা সেই অনুভবলব্ধ অবস্থা থেকেই এ'কথা বলে গেছেন।

বাইবেলে এজেকিয়েল* বলছেন, "তারপর সে আমাকে একটি দ্বারপ্রান্তে উপনীত করল, দ্বারটি পূর্বমুখী; ঐ দেখ পূর্বদিকের পথ ধরে ইস্রায়েলের প্রভুর দৈবমহিমা শোনা যাচ্ছে; তাঁর স্বর জল কল্লোলের মত, আর সারাজগৎ তাঁর গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।" যোগী ললাটের (পূর্বদিক) তৃতীয় নেত্রের ভিতর দিয়ে তাঁর জ্ঞান সর্বব্যাপিত্বের দিকে প্রসারিত করেন আর ওঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করতে পান — এই হচ্ছে 'জল কল্লোল', আলোকের স্পন্দন, যা হচ্ছে সৃষ্টির একমাত্র সত্য।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লক্ষকোটি রহস্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য জিনিষ হচ্ছে আলো। শব্দতরঙ্গ পরিচালিত হয় বায়ুস্তর বা অন্য কোন জড়

---

* এজেকিয়েল ৪৩ ঃ ১-২ (বাইবেল)।

মাধ্যমের ভিতর দিয়ে, কিন্তু আলোকতরঙ্গ আন্তঃনাক্ষত্রিক মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে অব্যাহতভাবে চলে যেতে পারে, কোন বাধা পায় না। এমন কি তথাকথিত ইথর, যা তরঙ্গবাদে আলোকের গ্রহ হতে গ্রহান্তরে বিচ্ছুরিত হবার মাধ্যম বলে স্বীকৃত, তাও আইনস্টাইনের এই মতানুসারে পরিত্যক্ত হতে পারে যে, আকাশ বা মহাশূন্যের জ্যামিতিক গুণানুসারে ইথর মতবাদ অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। যাইহোক, উভয় মতবাদেই আলো হচ্ছে অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বা তন্মাত্র, আর স্বাভাবিকভাবে প্রকাশকালে তা কোন জড়পদার্থের উপর আদৌ নির্ভর করে না।

আইনস্টাইনের বিরাট কল্পনায় সেকেণ্ডে ১,৮৬,৩০০ মাইল যে আলোর গতি, তা সারা অপেক্ষবাদকে প্রভাবিত করে। তিনি গাণিতিক উপায়ে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের সীমাবদ্ধ মনে আলোই হচ্ছে এই অনিত্য জগৎ অভিবাহের মধ্যে একমাত্র পরম ধ্রুবাঙ্ক। একমাত্র আলোকের গতির অনন্যসাপেক্ষতার উপরই মানবজগতের দেশ ও কালের মান নির্ভর করে। দেশ আর কাল, যা এতাবৎকাল চিরন্তন বলেই বিবেচিত হয়ে এসেছে, আসলে তারা তা নয়; তারাও হচ্ছে আপেক্ষিক আর সসীম অংশ। আর তাদের শর্তসাপেক্ষ পরিমাণ-বৈধতা নির্দিষ্ট হয় কেবলমাত্র আলোর গতির মানদণ্ডে।

মহাকাশকে অপেক্ষবাদের মাত্রা বা আয়তনরূপে বর্ণনা করতে গিয়ে সময়ের প্রকৃতরূপ এখন বেরিয়ে পড়েছে — একটি দ্ব্যর্থ মৌলিক প্রকৃতির সহজ সার আর কি! কলমের গোটাকতক সমীকরণের অঙ্কের আঁচড় কেটে আইনস্টাইন বিশ্বজগৎ থেকে একমাত্র আলো ছাড়া বাকি সব ধ্রুবসত্যের বিষয় বাতিল করে দিয়েছেন।

তারপরে এই তত্ত্বের আরও উন্নতি সাধিত হল তাঁর যুগান্তরকারী ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরিতে (Unified Field Theory)। এই মহান পদার্থবিদ্ একটিমাত্র অঙ্কসূত্রে মাধ্যাকর্ষণ আর তড়িৎ-চুম্বকতত্ত্ব একত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। বিশ্বসৃষ্টিকে একটিমাত্র নিয়মের অধীনে এনে আইনস্টাইন যুগযুগান্তর পার হয়ে প্রাচীন ঋষিদের কাছে উপস্থিত

হয়েছেন, যাঁরা বিশ্বসৃজনে একমাত্র বহুরূপিনী মায়াই যে কার্যকর, তা বহুপূর্বেই ঘোষণা করে গিয়েছেন।*

চূড়ান্ত অণুর আবিষ্কারের গাণিতিক সম্ভাবনা, যুগান্তকারী আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টি করেছে। বড় বড় বিজ্ঞানীরা এখন সদর্পে ঘোষণা করছেন যে, পরমাণুকে জড়ের চেয়ে শক্তি বলাই শুধু যে বিধেয় তা নয়, পারমাণবিক শক্তি বস্তুতঃ চিন্ময়-পদার্থ।

"দি নেচার অফ্ দি ফিজিক্যাল ওয়ার্লডে" স্যার আর্থার স্ট্যানলি এডিংটন লিখছেন, "পদার্থবিজ্ঞান যে ছায়ার জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এই সহজ উপলব্ধি একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। পদার্থ জগতে আমরা পরিচিত জীবনের নাটক যেন ছায়াবাজির অভিনয়ের ভিতর দিয়েই দেখি। ছায়া কাগজের উপর যখন ছায়া কালির দাগ টেনে চলেছি, তখন আমার ছায়া কনুই ছায়া টেবিলের উপর রয়েছে। এ সবই প্রতীক এবং পদার্থবিদ্ এদের প্রতীক গণ্য করেই তাদের বাদ দেন। তারপর আসেন রাসায়নিক 'মন', যিনি এই সব প্রতীকদের রূপান্তর সাধন করেন ... মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, এই জগৎ-বস্তু আসলে হচ্ছে চিন্ময়পদার্থ।"

সম্প্রতি ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণের মাধ্যমে পরমাণুতত্ত্বের সার যে আলো এবং প্রকৃতির অপরিহার্য দ্বৈতভাব — তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৯৩৭ সালে 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকা 'আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি এডভান্সমেণ্ট অফ্ সায়েন্সে'র এক সভায় ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ প্রদর্শনের নিম্নলিখিত বিবরণী প্রকাশ করেছে ঃ—

"টাংস্টেনের কেলাসিক গঠন, যা কেবল এক্স-রে দ্বারাই এ যাবৎ পরোক্ষভাবে পরিচিত ছিল, তার রেখাচিত্র একটা প্রতিপ্রভ পর্দার উপর

---

* এই বইটি যখন লেখা হচ্ছিল তখন আইনস্টাইনের মনে এই নিশ্চিত ধারণা জন্মেছিল যে, তড়িৎ চুম্বকীয় ও মহাকর্ষ সম্পর্কীয় বিধিগুলির যোগসূত্র একটি গাণিতিক সূত্র (Unified Field Theory)-র দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব। তখন তিনি এই বিষয়েই কাজ করছিলেন। যদিও জীবদ্দশায় তিনি কাজটি শেষ করে যেতে পারেন নি, তথাপি আজ অনেক বৈজ্ঞানিকই আইনস্টাইনের বিশ্বাসের সঙ্গে সহমত যে, এরূপ এক যোগসূত্র খুঁজে বার করা সম্ভব।

(প্রকাশকের মন্তব্য)

খুব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠল; তাতে দেখা গেল যে, নয়টি পরমাণু ঘন আয়তনের মত স্থানে জালের আকারে ঠিক তাদের নিজ নিজ জায়গায় রয়েছে — প্রত্যেক কোণে একটি করে, আর মাঝখানে একটি। টাংস্টেনের এই যে কেলাস (দানা) গঠনের জালের মধ্যে পরমাণুগুলি, তা প্রতিপ্রভ পর্দার উপর জ্যামিতিক আকৃতিতে সাজান আলোকবিন্দুর মতই প্রতিভাত হল। আর আলোর এই কেলাসের ঘন আয়তনের উপর অবিরাম বায়ুর সংঘাতকে নৃত্যশীল আলোকবিন্দুর মত দেখা যাচ্ছে — ঠিক যেমন সূর্যের উজ্জ্বল কিরণগুলি জলপ্রবাহের মাথায় নৃত্য করে ...

১৯২৭ সালে, নিউ ইয়র্ক শহরের বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরীর ডাক্তার ক্লিণ্টন জে. ডেভিসন আর ডাক্তার লেস্টার এইচ. জারমার দ্বারা "ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ" প্রথম আবিষ্কৃত হয়। তাঁরা দেখতে পেলেন — ইলেক্ট্রন একটি কণা আর একটি তরঙ্গ,* এই উভয়ভাবেরই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে। এই তরঙ্গের গুণই ইলেক্ট্রনকে আলোকের বিশেষত্ব প্রদান করেছে; তখন গবেষণা শুরু হয় প্রতিফলক কাচের দ্বারা আলোকে যেমন কেন্দ্রীভূত করে স্থানবিশেষে ফেলা যায়, তেমনি করে ইলেক্ট্রনকেও কেন্দ্রীভূত করে কোন স্থানবিশেষে ফেলবার কোন উপায় বার করা যায় কি না।

"ইলেক্ট্রনের জেকিল-হাইড গুণ আবিষ্কারে দেখা যায় যে, সারা প্রকৃতি রাজ্যে একটা দ্বৈতভাব বর্তমান। এই আবিষ্কারের জন্যে ডাঃ ডেভিসন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

স্যার জেমস্ জিনস্ তাঁর 'দি মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স' গ্রন্থে লিখেছেন, "জ্ঞানের স্রোত ক্রমশঃই অযান্ত্রিক সত্যের দিকে এগোচ্ছে; বিশ্বপ্রকৃতিকে এখন একটা বিরাট যন্ত্রের চেয়ে একটা বিরাট চিন্তা বলেই বোধ হতে আরম্ভ হয়েছে।"

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আজকের বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকে শোনাচ্ছে যেন প্রাচীন বেদের অন্তর্গত কোন একটি পৃষ্ঠা!

---

* অর্থাৎ জড় এবং শক্তি, উভয়ই।

যদি অবশ্য প্রয়োজন হয়, বিজ্ঞান থেকে মানুষ এই দার্শনিক সত্যই শিক্ষা করুক যে, জড়জগৎ বলে কিছুই নেই; এর টানাপোড়েন হচ্ছে মায়া বা অবিদ্যা। বিশ্লেষণে বাস্তবতার সব ছদ্মরূপ অলীক হয়ে যায়। মানুষের কাছে জড়বিশ্বের প্রত্যয়কারী খুঁটিগুলি যখন একে একে ভেঙ্গে পড়তে থাকে, তখন সে তার মূর্তির উপর নির্ভরতা, তার অতীতে ঈশ্বরাদেশ অমান্যের কথা ক্ষীণভাবে উপলব্ধি করতে পারে — "আমি ছাড়া তোমার আর কোন ঈশ্বর নাই।"*

আইনস্টাইন তাঁর বিখ্যাত সমীকরণে, যেখানে তিনি ভর আর শক্তির তুল্যতা প্রদর্শন করেছেন, সেখানে তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, কোন জড়কণার মধ্যস্থিত শক্তি হচ্ছে তার ভর বা ওজন ও আলোকগতির বর্গফলের দ্বারা গুণিত সংখ্যার সমান। জড়কণার বিনাশেই আণবিক শক্তির মুক্তি। জড়ের "মৃত্যু"তেই আজ আণবিক যুগের "জন্ম"।

আলোর গতি গণিতশাস্ত্রের যে একটা মান বা ধ্রুবক, তার কারণ এই নয় যে তার এক সেকেণ্ডে ১,৮৬,৩০০ মাইলের একটা স্থিরগতি আছে। তার কারণ হচ্ছে এই যে, কোন জড়দেহ, যার ভর তার গতির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে, সে কখনও আলোর সমান গতি লাভ করতে পারে না। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, কেবলমাত্র সেই জড়দেহ যার ভর অসীম, সে-ই আলোর সমান গতি পেতে পারে।

এই ধারণা থেকেই আমরা অলৌকিক ঘটনার নিয়মে পৌঁছতে পারি।

যে সব সিদ্ধপুরুষেরা তাঁদের শরীর এবং অন্য যে কোন পদার্থ বা বস্তুকে ইচ্ছামত প্রকাশ অথবা শূন্যে বিলীন করতে পারেন, বা আলোর গতির বেগে চলতে পারেন, অথবা সৃজনকারী আলোকরশ্মিকে ব্যবহার করে যে কোন জড় পদার্থের বাহ্যরূপের প্রকাশকে তৎক্ষণাৎ পরিদৃশ্যমান করতে পারেন, তাঁরা এই অতি প্রয়োজনীয় শর্তটি পূরণ করতে পেরেছেন যে, তাঁদের ভর হচ্ছে অসীম।

---

* এক্সোডাস ২০ ঃ ৩ (বাইবেল)।

সিদ্ধযোগীর সম্বিৎ বা চেতনা, বিনা আয়াসেই কেবল তাঁর সীমাবদ্ধ দেহের সঙ্গে নয়, একেবারে নিখিল বিশ্বরচনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। মাধ্যাকর্ষণ, তা সে নিউটনের "বল"ই হোক অথবা আইনস্টাইনের "জড়ত্বের প্রকাশ"ই হোক — সকল জড় পদার্থের মহাকর্ষাবস্থার পরিচয় যে গুরুত্ব বা "ভার" — তার গুণপ্রকাশে কোন সিদ্ধযোগীকে বাধ্য করতে অপারগ। যিনি নিজেকে সর্বব্যাপী পরমাত্মা বলে জানতে পেরেছেন, তিনি দেশ আর কালের অধীন দেহের সসীমতায় আর আবদ্ধ নন। তাঁর সব সসীম বাধাবন্ধ দূর হয়ে গিয়ে দাঁড়ায় তাঁর চরম অবস্থা, আমিই তিনি — "সোঽহং"।

বাইবেলে আছে, "ঈশ্বর বললেন ঃ আলো হোক্। তারপরেই আলোর উৎপত্তি হল।"* ঈশ্বর তাঁর বিশ্বরচনার প্রধানতম উপাদান আলোর প্রকাশের নির্দ্দেশ দিলেন। এই অবস্তুবাচক মাধ্যমের ভিতর দিয়েই সমস্ত দৈবপ্রকাশ ঘটে থাকে। সকল যুগের ভক্তজন জ্যোতিশিখা বা আলোক রূপে ঈশ্বরের আবির্ভূত হবার কথা বলে থাকেন। সেণ্ট জন ভগবদ্দর্শনের বিষয় বর্ণনা করে বলেছেন যে, "তাঁর চক্ষুদ্বয় অগ্নিশিখার মত ... আর তাঁর মুখমণ্ডল প্রখর সূর্য-তেজের মত উজ্জ্বল।"†

যে যোগী গভীর ও পরিপূর্ণ ধ্যানের দ্বারা তাঁর চৈতন্যকে স্রষ্টার মধ্যে বিলীন করতে পেরেছেন, তিনিই উপলব্ধি করেছেন যে বিশ্বজগতের মূল হচ্ছে আলো (জীবনীশক্তির স্পন্দন); তাঁর কাছে জল আর মৃত্তিকা সৃজনকারী দুই বিভিন্ন আলোকরশ্মির মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। জড়চেতনামুক্ত, আর দেশ বা আকাশের তিনটি মাত্রা আর কালের চতুর্থ মাত্রা শূন্যহয়ে সিদ্ধযোগী ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ ইত্যাদির ভৌতিক আলোকরশ্মির উপর দিয়ে তাঁর আলোর শরীর অতি সহজেই পরিচালিত করতে পারেন।

---

* জেনেসিস ১ ঃ ৩ (বাইবেল)।

† রিভিলেশন ১ ঃ ১৪-১৬ (বাইবেল)।

"অতএব তোমার চক্ষু যদি একক হয়, তোমার সর্বশরীরই আলোকদীপ্ত হবে।"* মুক্তিপ্রদায়ক তৃতীয় নেত্রে দীর্ঘসময় গভীর আর প্রগাঢ় মনঃসংযোগবলে যোগী জড় মোহ ও তার মাধ্যাকর্ষণের ভার বিনষ্ট করতে পারেন; এবং পরমেশ্বর নিখিল বিশ্ব যেমনভাবে সৃষ্টি করেছেন, অর্থাৎ এক নির্বিশেষ আলোকপিণ্ড — তা তিনি দেখতে পান।

হার্ভার্ডের ডাঃ এল. টি. ট্রোল্যাণ্ড বলেন, "সাধারণ হাফটোন এনগ্রেভিং যেভাবে তৈরী হয়, অপটিক্যাল ইমেজও সেইভাবেই তৈরী হয়; তারা অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর দ্বারা তৈরী — এত ছোট যে খালি চোখে দেখাই যায় না ... অক্ষিপটের স্পর্শপ্রবণতা এতই বেশি যে তুলনামূলকভাবে অতি সামান্য পরিমাণের উপযুক্ত আলোও দর্শনানুভূতি জাগিয়ে তোলে।"

"অলৌকিক ঘটনার নিয়ম যে কোন ব্যক্তিই কার্যকর করতে পারেন, যিনি উপলব্ধি করতে পেরে থাকেন যে, সৃষ্টির সারবস্তু হচ্ছে আলোক।" সিদ্ধযোগী, আলোক সংক্রান্ত দৈবজ্ঞানবলে সর্বব্যাপী আলোক রশ্মিকণাগুলিকে সংযোজিত করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে তৎক্ষণাৎ প্রক্ষেপণ করতে পারেন; আর এইরূপ প্রক্ষেপণ করার প্রকৃতরূপ (তা সে কোন গাছ বা ওষুধ বা মনুষ্যশরীর যাই হোক না কেন) যোগীর ইচ্ছা আর প্রত্যক্ষীভূত করে তোলবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

রাত্রিতে মানুষ যখন স্বপ্নলোকে প্রবেশ করে তখন সে তার প্রতিদিনের মিথ্যা দেহাত্মবোধ যা তাকে চারপাশে ঘিরে আছে, তাকে ভুলে যায়। ঘুমন্ত অবস্থায় তার মনের সর্বশক্তিমত্তার প্রদর্শন শুরু হয়। কি দেখা যায় সেখানে? স্বপ্নে দেখা যায় বহুকালমৃত বান্ধবদের, দূরতম প্রদেশ, বিস্মৃতির অতলগহ্বর হতে পুনরুত্থিত শৈশবের নানা ঘটনাবলী।

সেই মুক্ত আর স্বতঃস্ফূর্ত চেতনা, যার পরিচয় সকল মানুষই স্বপ্নের মধ্য দিয়ে স্বল্প পরিমাণে পেয়ে থাকে, তা হচ্ছে ঈশ্বরোপলব্ধ সাধুমহাত্মার পরিপূর্ণ আর নিত্য অবস্থা। স্বার্থলেশ হয়ে আর স্রষ্টাদত্ত সৃজনশীল

---

* ম্যাথিউ ৬ : ২২ (বাইবেল)।

ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে, যোগী ভক্তের আন্তরিক প্রার্থনা পূরণ করতে, বিশ্বপ্রকৃতির আলোকরশ্মির পুনঃসংযোজন করতে পারেন।

বাইবেলেও একই কথা বলা হয়েছে, "তারপর ঈশ্বর বললেন, আমাদেরই স্বরূপের মত করে, আমাদেরই ভাবমূর্তিতে মানুষ সৃজন করা যাক্। আর তারা সমুদ্রের মৎস্য, আকাশের পক্ষী, পশু এবং সমস্ত পৃথিবীর উপর এবং ভূমিতে বিচরণশীল প্রতিটি সরীসৃপের উপর আধিপত্য করুক।"*

সেই উদ্দেশ্যেই মানুষ এবং জগৎ সৃষ্ট হয়েছে যাতে করে মানুষ নিখিল বিশ্বের ওপর আপন আধিপত্যের কথা জানতে পেরে 'মায়া'কে জয় করতে পারে।

সন্ন্যাসগ্রহণের অল্প কিছুকাল পরেই, ১৯১৫ সালে, আমার একবার অদ্ভুত অলৌকিক স্বপ্নদর্শন ঘটেছিল। তাতে মানবজ্ঞানের আপেক্ষিকতা আমি বুঝতে পারি; এবং দুঃখক্লেশজনক মায়ার দ্বৈতভাবের পিছনে অনন্ত আলোকের অখণ্ডত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম। স্বপ্নদর্শনটি ঘটেছিল আমাদের বসত বাটিতে এক সকালবেলায়, যখন আমি আমার ছোট্ট চিলেকোঠাটিতে বসেছিলাম। ইউরোপে তখন প্রথম মহাযুদ্ধ কয়েকমাস ধরে চলছে; অত্যন্ত বিষণ্ণহৃদয়ে এই মহাযুদ্ধে মানবজীবনের বিরাট মরণাহুতির কথা নিয়ে ভাবছিলাম।

চক্ষু মুদ্রিত করে গভীর ধ্যানে বসে আছি, হঠাৎ আমার সম্বিৎ যেন এক যুদ্ধজাহাজ পরিচালনকারী কাপ্তেনের দেহের মধ্যে স্থানান্তরিত হল। জাহাজ আর তীরের উপর থেকে কামানের গোলাগুলি বর্ষণের বজ্রনির্ঘোষ বায়ুমণ্ডল বিদীর্ণ করতে লাগল। একটা প্রকাণ্ড গোলা জাহাজের বারুদঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আমার জাহাজটাকে টুকরো টুকরো করে উড়িয়ে দিল। আমি এবং অন্য যে ক'জন নাবিক বিস্ফোরণের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম — সবাই জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম।

---

* জেনেসিস ১ ঃ ২৬ (বাইবেল)।

বুক তখন ঢিপ ঢিপ করছে; যাইহোক, তীরে ত' নিরাপদে পৌঁছিলাম। কিন্তু হায়! একটা বন্দুকের ছুটন্ত গুলি এসে বিঁধল আমার বুকে। যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করতে করতে মাটির উপর পড়ে গেলাম। সমস্ত শরীরটা একেবারে অসাড় হয়ে গেছে, তবুও দেহটা রয়েছে এটা বেশ টের পাচ্ছি, একটা পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলে লোকে যেমন বোধ করে।

ভাবলাম, "শেষ অবধি মরণের রহস্যময় পদধ্বনি ঐ বুঝি শোনা যায়!" একটা অন্তিম শ্বাস ছেড়ে অচৈতন্যতার অন্ধকারে ডুবে যেতে গিয়ে দেখলাম যে — আরে বাঃ, আমি যে গড়পার রোডের বাড়ীতে পদ্মাসনে বসে আছি।

তারপর উল্লাসে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল; আমি নিঃশঙ্ক আনন্দে টিপেটুপে চিমটি কেটে দেখতে লাগলাম যে, নাঃ, শরীর ঠিক গোটাটাই ফেরৎ পেয়েছি, কই বুকে তো কোন গুলিটুলি ঢুকে ছ্যাঁদা করেনি। এধার-ওধার নড়েচড়ে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস টেনে ফেলে নিশ্চিত হলাম যে হ্যাঁ, সত্যিই আমি পরিপূর্ণভাবেই বেঁচে রয়েছি। মনে মনে যখন এই রকম আত্মশ্লাঘা অনুভব করছি, তখন হঠাৎ দেখলাম যে আমার জ্ঞান আবার সেই রক্তপ্লাবিত সমুদ্রতীরে শায়িত কাপ্তেনের মৃতদেহে ফিরে গেছে। মনে একটা বিরাট দ্বন্দ্ব দেখা দিল।

প্রার্থনা করে বললাম, "বল প্রভু, আমি বেঁচে আছি, না মরে গেছি?" সমগ্র দিক্‌চক্রবাল এক অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃর বিকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একটা মৃদু গুরুগুরু কম্পনধ্বনি বাণীতে রূপান্তরিত হল ঃ "জ্যোতিঃর সঙ্গে জীবনমরণের কি সম্বন্ধ আছে? আমার আলোর প্রতিমূর্তিতেই তোমায় গড়েছি। জীবনমৃত্যুর আপেক্ষিকসম্বন্ধ একটা মহাজাগতিক স্বপ্ন। তোমার স্বপ্নহীন সত্তাকে নিরীক্ষণ কর! জাগ বৎস, জাগ!"

মানুষের অধ্যাত্ম জাগরণের পর্যায় হিসেবে, ঈশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগকে উপযুক্ত স্থান ও কালে, তাঁর সৃষ্টিরহস্য আবিষ্কার করতে অনুপ্রাণিত করেন। নানা আধুনিক আবিষ্কারের সাহায্যে মানুষ বুঝতে পেরেছে — এই যে বিশ্বজগৎ, তা হচ্ছে একটিমাত্র শক্তির বৈচিত্র্যময় প্রকাশ বা আলোকমাত্র; এই আলোক ঐশ্বরিক বোধির দ্বারা পরিচালিত। চলচ্চিত্র,

রেডিও, টেলিভিশন, রেডার, বা ফটোইলেকট্রিক সেল — যা হচ্ছে সর্বদর্শী বৈদ্যুতিক চক্ষু এবং আণবিক শক্তি — সে'সবই হচ্ছে আলোর তড়িৎচুম্বক প্রকাশ।

চলচ্চিত্র শিল্প যে কোন আশ্চর্য ব্যাপার প্রদর্শন করতে পারে। চিত্তাকর্ষক দর্শনগ্রাহ্য বিষয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে ফটোগ্রাফির কৌশলের কাছে কোন অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন আর দুঃসাধ্য থাকে না। দেখা যাবে যে, মানুষ জড়দেহ হতে মুক্ত হয়ে তার স্বচ্ছ সূক্ষ্মদেহ থেকে বেরিয়ে আসছে; দেখা যাবে, জলের উপর সে হাঁটতে পারে, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, স্বাভাবিক ঘটনার ধারা উল্টে দিতে পারে, দেশ ও কাল নিয়ে একেবারে ওলটপালট ঘটিয়ে দিতে পারে। একজন সিদ্ধপুরুষ প্রকৃত আলোকরশ্মিদ্বারা যা সংসাধিত করেন, একজন সুদক্ষ ফটোগ্রাফার, ফটোগ্রাফের চিত্রগুলিকে নিজের ইচ্ছামত সাজিয়ে ঐ একই রকমের দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করতে পারেন।

চলচ্চিত্রের জীবন্ত ছবিতে বিশ্বসৃষ্টির বিষয়ে অনেক সত্যের উদাহরণ মেলে। বিশ্বরঙ্গমঞ্চের পরিচালক তাঁর নিজের নাটক নিজেই রচনা করেছেন, আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রদর্শনের জন্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের বিরাট সমাবেশ করেছেন। অনন্তের গভীর তমসাচ্ছন্ন যন্ত্রগৃহ হতে পরম্পরাগত যুগসমূহের ফিল্মের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সৃজনকারী আলোকরশ্মি প্রেরণ করেন, আর এই মহাকাশের চিত্রপটে ছবির পর ছবি সব জীবন্তরূপে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে।

চলচ্চিত্রের ছবিকে যেমন প্রকৃতপক্ষে আসল বলেই প্রতীয়মান হয়, কিন্তু আসলে তারা কেবলমাত্র আলোছায়ার সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়, তেমনি এই বৈশ্বিক বৈচিত্র্যে একটা আপাতপ্রতীয়মান সত্যভাবের উদয় হয়। এই জগৎসংসার আর তার নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবজগৎ বিশ্বচলচ্চিত্রের ছবি ছাড়া আর কিছুই নয়। কেবল যখন সেই অসীম সৃজনীরশ্মি দ্বারা মানুষের জ্ঞানের পটভূমিতে ক্ষণস্থায়ী দৃশ্যসকল প্রক্ষেপিত হয়, তখন কেবল পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ে ক্ষণিকের জন্য তা সত্য বলে প্রতিভাত হয়।

সিনেমা দর্শকবৃন্দ উপর দিকে তাকালেই দেখতে পায়, পর্দার উপরে প্রতিফলিত ছবিগুলো একটিমাত্র প্রতিকৃতিহীন আলোকরশ্মির মাধ্যমে আকৃতি ধারণ করছে। ঠিক সেইরকম, রূপ, রস আর রঙে সঞ্জীবিত এই বিশ্বনাট্য মহাব্যোম উৎস হতে নির্গত একটি মাত্র শ্বেত আলোকরশ্মি থেকেই বেরিয়ে আসছে। ভগবান এইসব গ্রহনক্ষত্রের বিশ্বনাট্যশালায় তাঁর মানবসন্তানদের আনন্দবিধানের জন্য তাদের সব একসঙ্গে অভিনেতা আর দর্শক দুই করে কি অভাবনীয় কৌশলেই না এক অতি বিরাট নাট্যলীলা করে চলেছেন!

একদিন আমি একটি সিনেমা হলে প্রবেশ করলাম, ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদচিত্র দেখার জন্যে। প্রথম মহাযুদ্ধ তখনও পশ্চিম রণাঙ্গনে চলেছে; সংবাদচিত্রে যুদ্ধক্ষেত্রের হত্যালীলা এমন বাস্তবরূপে প্রদর্শিত হয়েছিল যে তা দেখে খুবই ব্যথিতহৃদয়ে আমি প্রেক্ষাগৃহ পরিত্যাগ করে চলে এলাম।

সে দিন ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ "ভগবান, কেন তুমি এত দুঃখকষ্ট ঘটতে দিচ্ছ?"

অত্যন্ত অবাক হয়ে দেখলাম যে, আমার প্রার্থনারই যেন সদ্যসদ্য উত্তর হিসাবে ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রের একটি বাস্তবচিত্র আমার নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মৃত আর মুমূর্ষুতে পরিপূর্ণ সেই যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকা আর বীভৎসতা, সংবাদচিত্রের চেয়ে ঢের ঢের বেশি।

আমার অন্তশ্চেতনায় একটি অতিমৃদু শান্তস্বর যেন কথা বলে উঠল, "খুব ভাল করে মন দিয়ে দেখ! দেখতে পাবে, ফ্রান্সে এখন এই যে সব দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে, তা আলোছায়ার একটা সাদা আর কালো রঙে আঁকা ছবি ছাড়া কিছুই নয়! তারা হচ্ছে বিশ্বচলচ্চিত্র — এখনই যে সব সংবাদচিত্র দেখে এলে সেইরকম, একাধারে সত্য আর অসত্য, দুই-ই — নাটকের ভিতর নাটক যেমন!"

আমার অন্তর তবুও শান্ত হল না। সেই দৈববাণী আবার শোনা গেল, "সৃষ্টি হচ্ছে আলোছায়া দুয়েরই সমন্বয় — তা না হলে কোন ছবিই সম্ভবপর হয় না। মায়ার সদসৎ গুণ বরাবরই একটার চেয়ে অপরটা এক একবার প্রবল হয়ে উঠবে। ইহলোকে আনন্দ যদি অবিরাম আর অন্তহীনই

হত, তাহলে কি আর মানুষ অন্য কোন জগৎ চাইত? দুঃখক্লেশ ভোগ না করলে সে কখনই স্মরণ করতে চাইত যে, সে তার অমৃতধাম পরিত্যাগ করে এখানে এসেছে। দুঃখকষ্টই হচ্ছে তাকে স্মরণ করাবার অঙ্কুশাঘাত! তা থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে জ্ঞান। মরণের বিয়োগব্যথা হচ্ছে একেবারেই অসত্য। যারা এতে ভয়ে কেঁপে মরে, তারা হচ্ছে সেই রকম আনাড়ী অভিনেতা, যারা থিয়েটারের মঞ্চে একটা ফাঁকা গুলির আওয়াজে সত্যিসত্যিই ভয়ে পড়ে মরে যায়! আমার সন্তানেরা আলোকের সন্তান — তারা তো আর মায়ায় আবদ্ধ হয়ে চিরকাল মোহনিদ্রায় ঘুমোবে না!"

শাস্ত্রে যদিও আমি মায়ার বিষয় আর তার নানা ব্যাখ্যা পড়েছিলাম, কিন্তু সেসব আমার এই প্রত্যক্ষদর্শন আর তার সাথে এই সান্ত্বনাবাণীর সঙ্গে পাওয়া গভীর অন্তর্দৃষ্টি, এমনভাবে দিতে পারে নি। মানুষের মূল্যবোধ গভীরভাবেই পরিবর্তিত হয় যখন তার মনে এই চরম বিশ্বাস দৃঢ় আর বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায় যে, এই সৃষ্টি একটা বিরাট চলচ্চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়; আর এর ভিতরে নয়, বরং বাইরেই আছে তার আসল স্বরূপ।

এই অধ্যায় লেখা শেষ করে আমি বিছানার উপর পদ্মাসনে বসলাম। দু'টি ঘেরাটোপ দেওয়া আলোতে ঘরটি* মৃদু আলোকিত। চোখ তুলে দেখলাম যেন ঘরের ছাদ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিষাবর্ণের আলোকবিন্দুর দ্বারা আচ্ছাদিত — রেডিয়ামের মত ঔজ্জ্বল্যে স্পন্দিত হচ্ছে, ঝকমক করছে। লক্ষকোটি আলোকরেখা বৃষ্টির ধারার মত একটি স্বচ্ছ আলোকদণ্ডে পরিণত হয়ে আমার উপর এসে নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার এ ভৌত দেহের জড়ত্ব নষ্ট হয়ে গিয়ে অতি সূক্ষ্ম আর লঘু দেহে পরিণত হল। মনে হল যেন হাওয়ার উপর ভাসছি। বিছানা নামমাত্র ছুঁয়ে ভারশূন্য শরীরটা একবার এদিক, একবার ওদিক পর্যায়ক্রমে ঈষৎ দুলতে লাগল। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম — দেওয়াল আসবাবপত্র সবই ঠিক রয়েছে, কিন্তু সেই স্বল্প আলোকপিণ্ডই এতদূর বর্ধিত হয়েছে যে ঘরের ছাদ আর দেখা যাচ্ছে না। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

---

* এন্সিনিটাস্, ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ হার্মিটেজ। *(প্রকাশকের মন্তব্য)*

"এই হচ্ছে বিশ্বচলচ্চিত্রের কলকব্জা" — আলোর ভিতর থেকেই যেন স্বরটা বেরিয়ে এল। "তোমার বিছানার সাদা চাদরের উপর এর আলোক-রশ্মিপাতে এ তোমার শরীরের ছবি ফুটিয়ে তুলছে। এইবার দেখ, তোমার শরীর আলো ছাড়া আর কিছুই নয়।"

আমি হাতদুটোর দিকে তাকালাম, সামনে পিছনে একবার ঘুরিয়ে দেখলাম — কিন্তু তাদের কোন ভার আছে বলে মনে হল না। একটা তুরীয়ানন্দ আমায় অভিভূত করে ফেলল। এই মহাব্যোমের আলোকস্তম্ভ আমার শরীরের রূপ পরিগ্রহ করে দেখাচ্ছে যেন কোন সিনেমার যন্ত্রগৃহ হতে প্রক্ষেপিত আলোকরশ্মি প্রবাহে নির্মিত একটি দৈবপ্রতিলিপি, আর তা পর্দার উপর প্রতিফলিত একটি চিত্রের মতই প্রকাশ পাচ্ছে।

ঈষৎ আলোকিত আমার নিজেরই শয়নগৃহের রঙ্গমঞ্চে আমার শরীরের চলচ্চিত্র বহুক্ষণ ধরেই উপভোগ করলাম। বহু অপ্রাকৃত ঘটনাদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটেছে, কিন্তু এমন অসাধারণ ব্যাপার আগে কখনও ঘটেনি। আমার জড়দেহের ভ্রান্তি যখন সম্পূর্ণরূপে ঘুচে গেল, আর সকল পদার্থের সার যে আলোক, তার যথার্থ পূর্ণ উপলব্ধি ঘটল, তখন আমি ঊর্ধ্বে স্পন্দনশীল "প্রাণকণিকা" স্রোতের দিকে তাকিয়ে মিনতিভরা কণ্ঠে বললাম, "হে মহাজ্যোতি, দয়া করে আমার এই তুচ্ছ দেহপট আপনার মধ্যেই মিলিয়ে দিন — বাইবেলের ইলাইজা যেমন করে অগ্নিরথের দ্বারা স্বর্গে উত্তোলিত হয়েছিলেন তেমনি।*

এই প্রার্থনাটি অবশ্যই খুব চমকপ্রদ; কাজেই আলোকরশ্মি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হলো। আমার শরীর আবার পূর্বেকার মত স্বাভাবিক ভারপ্রাপ্ত হয়ে বিছানার উপর এলিয়ে পড়ল; ছাদের উজ্জ্বল আলোকের কণাগুলি

---

* II কিংস্ ২ঃ ১১ (বাইবেল)।

সাধারণতঃ 'অতিপ্রাকৃত' ঘটনাসকল বিধিনিয়মবিহীন বা তার বহির্ভূত কোন ব্যাপার বা কার্যের ফলস্বরূপ বলেই বিবেচিত হয়। কিন্তু আমাদের এই সুবিন্যস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে সকল ঘটনাই বিধিনিয়মের অধীন হয়ে ঘটে আর বিধিসঙ্গতভাবে তার ব্যাখ্যাও করা যায়। বড় বড় সিদ্ধ মহাগুরুগণের তথাকথিত অলৌকিক শক্তি, সংবিতের অন্তর্বিশ্বে যে সব সূক্ষ্ম শক্তি ক্রিয়াশীল আছে, তাদের সঠিক উপলব্ধির স্বাভাবিক অনুষঙ্গ।

জগতে যা কিছু ঘটে, তা সবই আশ্চর্য ব্যাপার — এই গভীর অর্থ ছাড়া কোন কিছুকেই সত্যসত্যই অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলা চলে না। আমাদের প্রত্যেকেই যে এক একটি

মিটমিট করে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝলাম, এই পৃথিবী ত্যাগ করার সময় আমার তখনও আসে নি।

একটা দার্শনিক চিন্তাও তখন মনের মধ্যে উদয় হল, "আর তাছাড়া ইলাইজা হয়ত আমার এ ধৃষ্টতায় অসন্তুষ্টও হতে পারেন।"

জটিলভাবে সংগঠিত শরীরে আবদ্ধ এবং এমন এক জগতে প্রতিষ্ঠিত, যা মহাশূন্যে গ্রহনক্ষত্রদের মধ্যে দিয়ে দ্রুতবেগে ঘূর্ণায়মান — এর চেয়ে অতি সাধারণ, বা অধিকতর আশ্চর্য ব্যাপার আর কি হতে পারে?

যীশুখ্রিস্ট বা লাহিড়ী মহাশয়ের মত মহান ধর্মোপদেষ্টাগণই সাধারণতঃ বহু অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করে থাকেন। এরূপ ধর্মগুরুগণ মানবজাতির কল্যাণসাধনের জন্য কঠিন ও বিরাট আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভূত হন; আর শোকদুঃখপীড়িত নরনারীদের অলৌকিক উপায়ে সাহায্য করা তাঁদের সেই কর্মজীবনের একটা অংশ বলেই বোধ হয়। দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে আর মানবজীবনের জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য দৈবনির্দেশের প্রয়োজন হয়। ক্যাপারনউম নামক স্থানে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক মুমূর্ষু পুত্রটিকে আরোগ্য করবার জন্য অনুরুদ্ধ হলে যীশুখ্রিস্ট কিঞ্চিৎ বক্রোক্তির সঙ্গে উত্তর দিলেন, "অলৌকিক ঘটনা বা আশ্চর্য ব্যাপার সব না দেখলে তো আর তুমি কিছুই বিশ্বাস করবে না।" তবুও যীশু বললেন, "যাও; তোমার ছেলে প্রাণ পেয়েছে।" — জন ৪ ঃ ৪৬-৫৪ (বাইবেল)।

এই পরিচ্ছেদে আমি, জড়জগতে যে মায়া অথবা ভ্রান্তির অলৌকিক শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে, তার বৈদিক ব্যাখ্যা দিয়েছি। আণবিক "জড়" পদার্থের মধ্যে যে অনিত্যতার একটা "ইন্দ্রজাল" লুক্কায়িত আছে, তা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই আবিষ্কার করে ফেলেছে। যাইহোক, কেবলমাত্র যে প্রকৃতি তা নয়, মানুষও (তার নশ্বর রূপে) মায়া, অর্থাৎ আপেক্ষিকতা, বৈপরীত্য, দ্বৈতভাব, বিলোম ক্রিয়া, বিরুদ্ধাবস্থার অধীন।

এ মনে করলে ভুল করা হবে, মায়ার তত্ত্ব কেবলমাত্র ঋষিরাই অবগত ছিলেন। ওল্ড টেস্টামেন্টের ধর্মোপদেষ্টাগণ মায়াকে স্যাটান বা শয়তান (হিব্রুঃ অর্থে শত্রু) বলে অভিহিত করেছেন। গ্রীক টেষ্টামেণ্টে শয়তানের প্রতিশব্দ রূপে ডায়াবোলাস্ বা ডেভিল ব্যবহৃত হয়েছে। শয়তান বা মায়া হচ্ছে বিশ্বরাজ্যের যাদুকর, যে এক অখণ্ড, অরূপ, মহাসত্যকে ঢাকবার জন্য নানা রূপের আবরণ সৃষ্টি করে। আর ঈশ্বরের পরিকল্পনা আর লীলায় এই শয়তান বা মায়ার একমাত্র কাজ হচ্ছে মানুষকে আত্মা থেকে জড়ে, সৎ থেকে অসতের [illegible] পরিচালিত করা।

যীশুখ্রিস্ট মায়াকে শয়তান, নরঘাতক ও মিথ্যাবাদী বলে চিত্রিত করেছেন। "ডেভিল (শয়তান) ... আদিকাল থেকেই নরঘাতক; সত্যে কখনও প্রতিষ্ঠিত থাকে নি, কারণ তার মধ্যে কোন সত্য নাই। যখন সে কোন মিথ্যা কথা বলে, তখন সে নিজের কথাই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী, আর সে-ই মিথ্যার জনক।" — জন ৮ ঃ ৪৪ (বাইবেল)

"ডেভিল (শয়তান) প্রথমাবধিই পাপ করছে। এই কারণেই ঈশ্বরের পুত্র আবির্ভূত হলেন, যাতে করে তিনি শয়তানের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বিনষ্ট করতে পারেন।" — ১ জন ৩ ঃ ৮ (বাইবেল)। অর্থাৎ মানবের নিজস্ব কূটস্থ চৈতন্য অবলীলাক্রমে মায়ার "ক্রিয়া" অথবা ভ্রান্তিসকল লোপ করতে পারে। মায়া অনাদি, কারণ জড়বিশ্বের সৃষ্টিকার্যে এ ওতোপ্রোতভাবে বিজড়িত; আর সেই দৈব নিত্যতার সতত বিরোধে এ চিরপরিবর্তমান।

৩১ পরিচ্ছেদ

পুণ্যশীলা মাতা কাশীমণি দেবীর সহিত সাক্ষাৎকার

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনসঙ্গিনী শ্রীমতী কাশীমণি দেবীর সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা বহুদিন হতেই মনের মধ্যে সুপ্ত ছিল। অল্প কিছুদিনের জন্যে কাশীতে গিয়ে আমার সে বাসনা পূর্ণ করবার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

কাশীর গরুড়েশ্বর মহল্লায় লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতে কাশীমণি দেবী আমায় সাদরে গ্রহণ করলেন। বার্ধক্যসত্ত্বেও তাঁর চেহারাটি যেন পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্মের মত — অদৃশ্যভাবে আধ্যাত্মিক সৌরভ যেন তা থেকে নির্গত হচ্ছে। তিনি মধ্যমাকৃতি, সরু গ্রীবা, গৌরবর্ণা এবং তাঁর চক্ষু দুটি অতীব উজ্জ্বল।

প্রণাম করে বললাম, "পূজনীয়া মা, আপনার মহাপুরুষ স্বামীর কাছে আমি শৈশবেই দীক্ষিত হয়েছিলাম। তিনি আমার পিতামাতা আর আমার নিজগুরু শ্রীযুক্তেশ্বরজীরও গুরু ছিলেন। তা হলে আপনার পুণ্যজীবনের কিছু কাহিনী শোনবার সুযোগ আমি নিশ্চয়ই পেতে পারি, কি বলেন?"

তিনি আমাকে স্নেহভরে ডেকে বললেন, "এস বাবা, এস — ওপরে চল!

কাশীমণি পথ দেখিয়ে ওপরে নিয়ে চললেন একটি অতিক্ষুদ্র ঘরে যেখানে কিছুদিন তিনি স্বামীর সঙ্গে বসবাস করেছিলেন। এই সেই পবিত্র তীর্থ যেখানে অদ্বিতীয় মহাগুরু মানবজীবনের বিবাহনাটক অভিনয় করবার সৌজন্য প্রকাশ করেছিলেন, — তীর্থদর্শন করে কৃতার্থবোধ করলাম। সেই মহিমময়ী মাতা তাঁর পাশের একটি গদির উপর আমায় বসতে ইঙ্গিত করলেন।

তারপর তিনি বলতে লাগলেন, "স্বামীর দিব্য মাহাত্ম্য বুঝতে আমার অনেক দিনই লেগেছিল। একদিন রাত্রিবেলা এই ঘরেতেই একটা পরিষ্কার স্বপ্ন দেখলাম — আমার মাথার উপর মহান দেবদূতেরা কল্পনাতীত মনোরম ভঙ্গীতে ভেসে বেড়াচ্ছেন। দৃশ্যটা এতদূর বাস্তব বলে বোধ হল যে আমি তখনই জেগে উঠলাম; ঘরটি তখনও উজ্জ্বল আলোয় ছেয়ে রয়েছে!

"পদ্মাসনে উপবিষ্ট আমার স্বামী ঘরের মাঝখানে; তাঁর দেহ শূন্যে ভাসমান, আর দেবদূতেরা সব করজোড়ে তাঁর স্তবস্তুতি করছেন। এতদূর আশ্চর্য হয়ে গেছি যে, তখনো আমার বিশ্বাস হচ্ছিল যেন আমি স্বপ্ন দেখছি।

"লাহিড়ী মহাশয় বললেন, 'কল্যাণী, এ তোমার স্বপ্ন নয়! তোমার মোহনিদ্রা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ কর!' তারপর ধীরে ধীরে যখন তিনি মাটিতে নেমে এলেন, তখন আমি তাঁর পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম।

"বললাম, 'গুরুদেব, বার বার আমি আপনাকে প্রণাম করি। আপনাকে স্বামী বলে ভাবাতে আমার যে অপরাধ হয়েছে তা ক্ষমা করুন। লজ্জায় মরে যাই এ কথা ভেবে যে, যিনি সাক্ষাৎ দেবতা, আমি কিনা তাঁরই পাশে অজ্ঞান-আচ্ছন্ন হয়ে এতদিন মোহঘোরে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। আজ রাত থেকে আর আপনি আমার স্বামী নন, আমার গুরু। এই দীনহীনা নারীকে আপনার শিষ্যা বলে গ্রহণ করবেন কি?'"*

"গুরুদেব আমায় মৃদুস্পর্শ করে বললেন, 'হে পবিত্র আত্মা, ওঠ, তোমায় গ্রহণ করলাম।' তারপর তিনি দেবদূতদের দেখিয়ে বললেন, 'এইসব পুণ্যাত্মা সাধুসন্তদের একে একে প্রণাম কর।'

"যখন আমি নতজানু হয়ে সবাইকে প্রণাম করা শেষ করলাম, তখন সেই দেবদূতগণের কণ্ঠস্বর একসঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠল — যেন কোন প্রাচীন শাস্ত্র থেকে সমবেত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ হচ্ছে।

---

* "স্বামী কেবল ঈশ্বরের জন্য, আর স্ত্রী তাঁর মধ্যস্থিত ঈশ্বরের জন্য।" — মিলটন।

"'দেবতার সঙ্গিনী, আপনি পুণ্যবতী, আপনাকে আমরা প্রণাম করি।" বলে তাঁরা সব আমার পদতলে প্রণাম করলেন, আর আশ্চর্য! — সঙ্গে সঙ্গে সেই সব জ্যোতির্ময় মূর্তিসকল একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ঘর অন্ধকার।

"আমার গুরু আমায় ক্রিয়াযোগে দীক্ষা নিতে বললেন। আমি বললাম, নিশ্চয়ই নেব। হায়রে, আমার এমনই পোড়াকপাল যে ক্রিয়াযোগের আশীর্বাদ অনেকদিন আগেই পাইনি।'

"লাহিড়ী মহাশয় সান্ত্বনার হাসি হেসে বললেন, 'তখনও সময় হয় নি তাই, বুঝলে? তোমার অনেক কর্মফল আমি নীরবে খণ্ডন করে দিয়েছি; এখন তুমি যোগ্য হয়েছ বলেই তোমার ইচ্ছা হয়েছে।'

"এইবলে তিনি আমার ললাট স্পর্শ করলেন। একটা ঘূর্ণায়মান জ্যোতিঃপিণ্ড দেখা দিল। সেই জ্যোতিঃপ্রভা ক্রমশঃ ওপ্যালের মত নীল আধ্যাত্মিক চক্ষুতে পরিণত হল — সোনার বেড়দেওয়া, মাঝখানে একটি সাদা পঞ্চকোণ তারকা।

"'তোমার চৈতন্যকে ঐ তারা ভেদ করে অনন্তজগতের দিকে প্রসারিত কর'; আমার গুরুদেবের কণ্ঠে নতুন স্বর — দূর হতে ভেসে আসা গানের মত মৃদু ও কোমল।

"সমুদ্রের ঢেউয়ের মত স্বপ্নের পর স্বপ্ন আমার আত্মার তটপ্রান্তে এসে আছড়ে পড়তে লাগল; তারপর চারদিকের দৃশ্যমান জগৎ মিলিয়ে গিয়ে আনন্দসাগরে পরিণত হল। সেই আনন্দসাগরের তরঙ্গে ডুবে গিয়ে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলাম। ঘণ্টাকতক পরে যখন আবার আমার বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল, গুরুদেব তখন আমায় ক্রিয়াযোগের প্রণালী শিক্ষা দিলেন।

"সেই রাত থেকেই লাহিড়ী মহাশয় আমার ঘরে আর কখনও শোন নি। তিনি নিদ্রাই ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নীচেকার সামনের ঘরে দিনরাত থাকতেন।"

এই কথাগুলি বলে সেই মহিমময়ী নারী চুপ করলেন। সেই মহান যোগীর সঙ্গে তাঁর অপূর্ব সম্বন্ধ উপলব্ধি করে আমি তখন তাঁর জীবনের আরও কিছু কথা শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম।

"বাবা, তোমার লোভ বড্ড বেড়ে গেছে দেখছি। যাক্, বেশি কিছু আর বলব না, তবে আর একটিমাত্র ঘটনা তোমায় বলব।" বলে একটুখানি সলজ্জ হাসি হেসে আবার শুরু করলেন, "আমার গুরু-স্বামীর কাছে একটি যে পাপ করেছিলাম আজ তা স্বীকার করব। আমার দীক্ষার মাসকতক পরে আমি নিজেকে তাঁর কাছে পরিত্যক্ত আর অবহেলিত বলে বোধ করতে আরম্ভ করলাম। একদিন লাহিড়ী মহাশয় এই ছোট্ট ঘরটিতে কিছু একটা জিনিষ নিতে ঢুকলেন; আমিও তাড়াতাড়ি তাঁর পিছন পিছন এলাম। দারুণ মোহঘোরে অন্ধ হয়ে তাঁকে খোঁটা দিয়ে বললাম, 'আপনার সব সময়টাই শিষ্যদের নিয়ে কাটে। আপনার স্ত্রীপুত্রের জন্য কি কোন কর্তব্য নেই? সংসার চালাবার জন্য আরো যে টাকার দরকার, তা যোগাবার আপনার কোন গরজই নেই।'

"গুরুদেব একটিবার মাত্র আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, তারপরেই ব্যস, একেবারে হাওয়া। ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে শুনলাম একটাই মাত্র কণ্ঠস্বর ঘরের চারদিক থেকে ধ্বনিত হচ্ছে, 'দেখছ না, এ একেবারে শূন্য! আমার মত একটা শূন্য পদার্থ তোমার জন্য টাকা আনবে কি করে, বল?'

"আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, "গুরুদেব, আমি কোটি কোটিবার আপনার কাছে মাপ চাইছি। আমার পাপচক্ষু আপনাকে তো আর দেখতে পাচ্ছে না। দয়া করে আপনি আপনার পুণ্যদেহে আবার ফিরে আসুন!'

"মাথার উপর শূন্য থেকে উত্তর ভেসে এল, 'এই যে, আমি এখানে'। মাথা তুলে দেখি শূন্যে গুরুদেবের দেহ — মস্তক ঘরের ছাদ স্পর্শ করে রয়েছে। চক্ষু দু'টি যেন জ্বলন্ত অগ্নিশিখা! নিঃশব্দে তিনি মেঝের উপর নেমে এলে পর ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

"তিনি বলতে লাগলেন, 'নারী, সেই পরমধনকে খোঁজ, এ সংসারের তুচ্ছ টাকাকড়ি নয়। অন্তরে ঐশ্বর্য সঞ্চয় করলে পর দেখতে পাবে যে, বাইরের সাহায্য সর্বদাই আসছে। তারপর আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আমার একটি অধ্যাত্মপুত্র তোমায় সব ব্যবস্থা করে দেবে দেখো, কিছু ভাবনা নেই!"

"গুরুজীর কথা সত্যিসত্যিই ফলে গেল; একটি শিষ্য আমাদের সংসারের জন্যে অনেক টাকা দিয়ে গিয়েছিল।"

তাঁর অপূর্ব সব অভিজ্ঞতার বিষয় শ্রবণ করে আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিলাম।* তার পরদিন পুনরায় তাঁদের বাড়ীতে গেলাম। দেখা হল তাঁদের দুই ছেলের সঙ্গে — তিনকড়ি আর দু'কড়ি লাহিড়ী। মহাগুরুর দুই সন্তানই দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, বলিষ্ঠ, ঘন শ্মশ্রুবিশিষ্ট, কণ্ঠস্বর কোমল আর বনিয়াদী ব্যবহারে স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য। ঘণ্টাকতক ধরে তাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনা চললো। ভারতের শ্রেষ্ঠ গৃহীযোগীর এই সাধুপ্রকৃতি পুত্রদ্বয় পিতার আদর্শ পদচিহ্ন অতি নিবিড়ভাবেই অনুসরণ করে চলতেন।

কাশীমণি দেবীই যে লাহিড়ী মহাশয়ের একমাত্র শিষ্যা ছিলেন — তা নয়; আরও শত শত শিষ্যা ছিলেন; আমার মা হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে একজন। জনৈকা মহিলাশিষ্যা মহাগুরুর কাছ থেকে একবার তাঁর একটি ফটোগ্রাফ চাইলেন। তিনি তাঁর হাতে ছবিখানি দিয়ে বললেন, "তুমি যদি এটাকে রক্ষাকবচ বলে মনে কর, তবে এ তাই-ই হবে; আর তা না হলে এটা কেবল ছবি হয়েই থাকবে।"

দিনকতক পরে উক্ত স্ত্রীলোকটি আর লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্রবধূ একদিন একটা টেবিলের উপর গীতা রেখে পড়ছিলেন। টেবিলটার পিছনেই সেই ফটোগ্রাফটি টাঙান ছিল। হঠাৎ তখন প্রচণ্ড জল ঝাড় বজ্রপাত শুরু হয়ে গেল।

ভয়ে স্ত্রীলোক দু'টি ছবির সামনে করজোড়ে বলতে লাগলেন. "লাহিড়ী মহাশয়, আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের রক্ষা করুন।" একটা বাজ এসে পড়ল তাঁরা যে বই পড়ছিলেন তার উপর; কিন্তু ভক্তদ্বয় অক্ষত দেহে রক্ষা পেয়ে গেলেন। সেই শিষ্যাটি পরে বলেছিলেন, "আমার মনে হল যেন একটা বরফের চাঁই আমায় চারধারে ঘিরে রয়েছে, ঐ বাজের আগুনে ঝলসে যাবার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে।"

---

* পরমারাধ্যা মাতা ২৫শে মার্চ, ১৯৩০ সালে বারাণসীতে পরলোকগমন করেন।

অভয়া নামে আর একটি শিষ্যার বেলাতেও লাহিড়ী মহাশয়কে দু'টি অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করতে হয়েছিল। অভয়া আর তার স্বামী, কলকাতার একজন উকীল, গুরুদর্শনের জন্য একদিন কাশী যাত্রা করলেন। রাস্তায় খুব ভিড় থাকাতে ভাড়াটে গাড়ীর পৌঁছতে দেরী হয়ে গেল। স্টেশনে ঢুকতে ঢুকতেই শুনতে পেলেন, কাশীর গাড়ী ছেড়ে যাবার বাঁশি দিচ্ছে।

এধারে অভয়া টিকিট ঘরের কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। মনে মনে নীরবে তার গভীর প্রার্থনা চলেছে, "লাহিড়ী মহাশয়, আপনার পায়ে পড়ি, গাড়ীটা থামিয়ে দিন, থামিয়ে দিন! আপনার দর্শনলাভে আরও একদিন বিলম্ব হবে — এ যে আমি কিছুতেই সইতে পারব না।"

ব্যস্! এধারে ট্রেনের চাকা ঘর্ঘর করে ঘুরেই চলেছে অথচ গাড়ী এক পাও আর এগোচ্ছে না। গাড়ীর ইঞ্জিনচালক, আরোহীরা সবাই প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল এই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনের জন্যে। রেলের একজন সাহেব গার্ড, অভয়া আর তাঁর স্বামীর কাছে এসে দাঁড়াল, আর যা কখনও করে না তাই সে করে বসল — বলল, "বাবু, আমায় টাকা দিন; আমি আপনাদের টিকিট কিনে এনে দিচ্ছি। আপনারা ততক্ষণ গাড়ীতে উঠে বসুন।"

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে যেমনি গাড়ীতে উঠে বসল আর টিকিটও পেয়ে গেল, অমনি ট্রেনও ধীর গতিতে চলতে শুরু করলো! ইঞ্জিনচালক, গাড়ীর যাত্রীরা তো সব ভয়েময়ে হুড়মুড় করে গাড়ীতে ঢুকে পড়ল — তারা জানতেও পারল না কি করেই বা প্রথমে ট্রেনের গতি বন্ধ হয়েছিল, আর কি করেই বা তা ফের চলতে শুরু করল।

কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে পৌঁছে অভয়া তো নীরবে গুরুর সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিতে গেল। লাহিড়ী মহাশয় বললেন, "একটু স্থির হও অভয়া, একটু ঠাণ্ডা হও; তুমি আমায় কি জ্বালাতনটাই না কর, বল দেখি! যেন এর পরের ট্রেনটায় আর আমার এখানে আসতে পারতে না!"

আর একটি ব্যাপারে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে উক্ত শিষ্যা গিয়ে ধরে পড়েছিল, সেটিও একটি স্মরণীয় ঘটনা। এবার গুরুদেবের কাছে

অভয়ার আবেদন আর ট্রেনের জন্য নয় — এবার তার সন্তানের জন্যে।

অভয়া তো যথারীতি গুরুদেবের পাদবন্দনা করে তারপর তার অন্তরের বাসনা জানাল ঃ "গুরুদেব, এবার আমার নবম সন্তানটি যেন বেঁচে থাকে। আমার আটটি সন্তান হল; কিন্তু সব ক'টিই জন্মাবার পরই মারা গেছে — একটিও আর বেঁচে নেই।"

মধুর হাসিতে প্রসন্নবদন গুরুদেব বললেন, "এবার তোমার সন্তানটি নিশ্চয়ই বাঁচবে, দেখো। আমার উপদেশগুলো বেশ করে মন দিয়ে শোন। এবার তোমার একটি কন্যাসন্তান হবে, রাত্রিতেই ভূমিষ্ঠ হবে। শুধু এইটুকু নজর রেখো যেন পিদিমটা ভোর অবধি জ্বলতে থাকে — কিছুতেই যেন নিভে না যায়। ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন, তাহলেই পিদিমটা নিভে যাবে।"

অভয়া একটি কন্যাসন্তান প্রসব করলো, রাত্রেই ভূমিষ্ঠ হল — সর্বদর্শী গুরু যেমনটি বলে দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি। প্রসূতি ধাইকে প্রদীপটা তেলে ভর্তি করে রাখতে বলেছিলেন। স্ত্রীলোক দু'টি সারারাত জেগে শেষরাত অবধি পাহারা দিলে বটে, কিন্তু শেষপর্যন্ত তারা ঘুমিয়েই পড়ল। এধারে প্রদীপের তেল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে; আলোটা ক্ষীণ হয়ে গিয়ে 'দপ্‌দপ্‌' করছে!

আঁতুড় ঘরের দরজার খিলটা ঘটাং করে খুলে গিয়ে দরজার পাল্লা দুটো ঝন্‌ঝন্‌ করে দু'ধারে খুলে গেল। স্ত্রীলোক দু'টি ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে আশ্চর্য হয়ে দেখে যে লাহিড়ী মহাশয় সামনে দাঁড়িয়ে; প্রদীপটা দেখিয়ে দিয়ে লাহিড়ী মহাশয় বললেন, "অভয়া, দেখ দেখ, আলোটা এবার নিভল বলে।" ধাইটা দৌড়ে তেল এনে ভর্তি করে দিল। যেই আলোটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, অমনি গুরুদেব অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ হয়ে গেল আর খিলও পড়ে গেল, কিন্তু কে যে দিয়ে দিল তা চোখে দেখা গেল না।

অভয়ার নবম সন্তানটি বেঁচে গেল; ১৯৩৫ সালে আমি খবর নিয়েছিলাম — কন্যাটি তখনও জীবিত।

লাহিড়ী মহাশয়ের অপর একটি শিষ্য, শ্রদ্ধেয় কালীকুমার রায় মহাশয় গুরুর সঙ্গে তাঁর জীবনযাপনের বহু কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী আমায় শুনিয়েছিলেন।

কালীবাবু বললেন, "কাশীর বাড়ীতে আমি প্রায়ই কয়েক সপ্তাহ ধরে লাহিড়ী মহাশয়ের অতিথি হয়ে থাকতাম। দেখতাম, বহু সাধুসন্ত, দণ্ডীস্বামীরা* রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁর চরণতলে এসে সমবেত হতেন। কখনও কখনও ধ্যানযোগ বা দার্শনিকতত্ত্ব সম্বন্ধেও আলোচনা হত। ঊষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই পূজনীয় অতিথিবর্গ সব একে একে প্রস্থান করতেন। তাঁর বাড়িতে থাকার সময় দেখেছিলাম — লাহিড়ী মহাশয় ঘুমোবার জন্যে একবারও শুতেন না, বা চোখের পাতা বুজোতেন না।"

কালীবাবু বলতে লাগলেন, "গুরুদেবের সঙ্গে প্রথম প্রথম সঙ্গ করবার সময় আমার মনিবের কাছ থেকে বিস্তর বাধাবিপত্তি সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি ভীষণ বিষয়সর্বস্ব ছিলেন। টিটকারি দিয়ে শ্লেষপূর্ণস্বরে বলতেন, "আমার কর্মচারীদের ভেতর ধর্ম ধর্ম করে পাগল কোন লোক আমি চাই না — আর, আমি যদি তোমার সেই বুজরুক গুরুটিকে একবার দেখতে পাই তো তাহলে তাঁকে এমন গুটিকতক কথা শুনিয়ে দেব যে, বহুদিন তাঁর তা মনে থাকবে।"

"কিন্তু এইরকম করে ভয় দেখালেও আমার রোজকার যাওয়া-আসা কিছুমাত্র কমল না। রোজ সন্ধ্যায় আমি গুরুর কাছে যেতাম। একদিন সন্ধ্যায় আমার মনিবটি আমায় অনুসরণ করে এসে লাহিড়ী মহাশয়ের বৈঠকখানায় উদ্ধতভাবে সবেগে ঢুকে পড়লেন। মনে মনে ভেবে রেখেছিলেন যে, একবার দেখা হলে হয়, তাহলে যেমনটি সেদিন বলেছিলেন তেমনি দারুণ বচন শুনিয়ে দেবেন। ঘরে তখন গুটি বারো শিষ্য বসে। যাক্, প্রভু যেমনি ঘরের মধ্যে গুছিয়েটুছিয়ে বেশ সুস্থির হয়ে

* দণ্ডীরা এক সন্ন্যাস সম্প্রদায়; 'ব্রহ্মদণ্ডের' প্রতীকস্বরূপ তাঁরা 'দণ্ড' (বাঁশের তৈরী) ধারণ করে থাকেন। মানবশরীরে এটাই মেরুদণ্ডের প্রতীক। মেরুদণ্ডের সাতটি চক্র ভেদই হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথ।

বসলেন, অমনি লাহিড়ী মহাশয়ও শুরু করলেন। তাঁর সেই সব শিষ্যদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দেখ, তোমরা সবাই একটা ছবি দেখতে চাও তো বল?

"আমরা যখন ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম, তখন তিনি ঘরটি অন্ধকার করতে বলে বললেন, "আচ্ছা, তোমরা একজনের পিছনে একজন এমনি করে চক্রাকারে গোল হয়ে বস, আর প্রত্যেকেই তার সামনের লোকের চোখের উপর হাত দিয়ে টিপে বন্ধ করে ধর।'

"আশ্চর্য, আমার মনিবটি কিঞ্চিত অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুরুদেবের নির্দেশ পালন করে গেলেন। মিনিটকতক পরে লাহিড়ী মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা কি দেখছি তা তাঁকে বলতে।

"আমি বললাম, 'মহাশয়, একটি অতি সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখা যাচ্ছে, পরণে তার লালপেড়ে শাড়ী, একটা কচুগাছের কাছে দাঁড়িয়ে।' অন্যান্য শিষ্যেরাও সব একই বর্ণনা দিল। গুরুদেব আমার মনিবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্ত্রীলোকটিকে চেন না কি?'

"লোকটির মনে তখন এক অদ্ভুত ভাবের ঝড় উঠেছে, সামলাতে পারছেন না; শেষ অবধি বলেই ফেললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি বইকি, কি বলব বলুন; ঘরে সুন্দরী সাধ্বী-স্ত্রী থাকতেও আমি স্ত্রীলোকটির পিছনে বোকার মত টাকা খরচ করছি। যে মতলব করে আমি এখানে এসেছিলাম, তার জন্যে মনে মনে আমি বাস্তবিক বড়ই লজ্জিত; আপনি কি আমায় ক্ষমা করে আপনার শিষ্য করে নেবেন?'

"'যদি তুমি অন্ততঃ মাসছয়েক খুব সৎভাবে জীবনযাপন করতে পার, তবেই তোমায় আমি গ্রহণ করব', তারপর যেন একটু হেঁয়ালিভেহ বললেন, 'তা না হলে তোমায় দীক্ষা দেবার কোন প্রয়োজনই হবে না।'

"মাস তিনেক ধরে তো আমার মনিবটি বাসনা সংবরণ করে রইলেন, কিন্তু তারপরই আবার সেই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তাঁর পূর্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হল। মাস দুই পরেই তিনি মারা গেলেন। এইবার বুঝতে পারলাম — আমার মনিবের দীক্ষার অসম্ভাব্যতার বিষয়ে কেন গুরুদেব হেঁয়ালিতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।"

লাহিড়ী মহাশয়ের এক বরেণ্য বন্ধু ছিলেন — নাম ত্রৈলঙ্গ স্বামী। লোকে বলে তাঁর বয়স তিনশ বছরেরও বেশি। মহাযোগিদ্বয় প্রায়ই একত্র ধ্যানে বসতেন। ত্রৈলঙ্গ স্বামী এত বেশি সুপরিচিত আর তাঁর যশ এত সুদূরবিস্তৃত ছিল যে, তাঁর অলৌকিক ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে কেউ কোন প্রশ্নই উত্থাপন করে না। আজকে যদি যীশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে নিউইয়র্ক শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলতে গিয়ে তাঁর দৈবশক্তি প্রদর্শন করতেন, তাহলে যে উত্তেজনা সৃষ্টি হতো, ত্রৈলঙ্গ স্বামী বহু বৎসর পূর্বে কাশীর গলি দিয়ে হেঁটে যেতে সেই রকমই উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ছিলেন সেইসব সিদ্ধপুরুষদিগের মধ্যে একজন, যাঁরা ভারতবর্ষকে কালের গ্রাস হতে রক্ষা করে এসেছেন।

অনেক সময় ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে দেখা যেত — কালকূট তিনি পান করেছেন, তবু তাতে তাঁর কোনই কুফল হয় নি। হাজার হাজার মানুষ, যাদের মধ্যে জনকতক এখনও বেঁচে — তাঁরা গঙ্গার জলের উপর ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে ভাসতে দেখেছেন। দিনের পর দিন তিনি জলের উপর বসে থাকতেন অথবা জলের তলায় বহুক্ষণ ধরে লুকিয়ে পড়ে থাকতেন। কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে প্রচণ্ড সূর্যকিরণে উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর ত্রৈলঙ্গ স্বামী নিস্পন্দভাবে পড়ে রয়েছেন — এ অতি সাধারণ দৃশ্য ছিল।

এই সকল অলৌকিক ক্রিয়াকলাপে তিনি মানুষকে এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন যে, যোগীর জীবন শুধু অক্সিজেন অথবা কতকগুলি অবস্থাবিশেষ বা কোনপ্রকার সাবধানতার উপর নির্ভর করে না। জলের উপরেই হোক আর জলের নিচেই হোক, কিম্বা উত্তপ্ত প্রস্তরখণ্ডের উপর তার নিস্পন্দ উলঙ্গদেহ পড়েই থাকুক — ত্রৈলঙ্গ স্বামী প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি ঈশ্বরচৈতন্যের মধ্যেই সঞ্জীবিত; মৃত্যু তাঁকে স্পর্শও করতে পারে না।

যোগিবর যে শুধু আধ্যাত্মিকতাতেই বিরাট ছিলেন তা নয়, তাঁর দেহটিও ছিল বিপুল। দেহের ওজন ছিল তিনশত পাউণ্ড অর্থাৎ আয়ুর প্রত্যেকটি বছরের দরুণ এক পাউণ্ড হিসাবে আর কি! আহার করতেন ক্বচিৎ কদাচিৎ; কাজেই দেহ কেমন করে যে এরূপ বিশাল হল, তা

বাস্তবিকই রহস্যজনক। সিদ্ধযোগীরা স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মকানুন সব উপেক্ষা করে চলতে পারেন, যদি কোন বিশেষ কারণে তা করার দরকার হয়। ঐ কারণ অতি সূক্ষ্ম, অতি গূঢ়, কেবল তিনি নিজেই জানেন।

বড় বড় সাধুসন্তরা, যাঁদের মায়াস্বপ্ন টুটে গেছে আর এই বিশ্বজগতকে ঈশ্বরের মনের একটা পরিকল্পনা বলেই বোধ হয়েছে, তাঁরা শরীরকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। তাঁরা জানেন যে, দেহ আর কিছুই নয়, ঘনীভূত বা হিমায়িত শক্তির একটা কার্যসাধক আকার আর কি। যদিও পদার্থবিজ্ঞানীরা আজকাল বুঝতে আরম্ভ করেছেন যে, জড় পদার্থ আসলে ঘনীভূত শক্তি মাত্র, পূর্ণজ্ঞানী যোগীরা কিন্তু জড়বস্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বহুদিন আগেই তত্ত্ব থেকে ব্যবহারের পারদর্শিতায় পৌঁচেছেন।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী সর্বদাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন, আর কাশীর পুলিশকেও তাঁকে নিয়ে দারুণ বিব্রত থাকতে হত। দিগম্বর স্বামীজী স্বর্গোদ্যানে আদি নর আদমের মত তাঁর উলঙ্গ অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। পুলিশ কিন্তু এবিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিল। একদিন তারা তাঁকে জেলেই পুরে দিল। চারধারে গোলমাল শুরু হল। কিছুক্ষণ বাদেই দেখা গেল — বিরাটবপু ত্রৈলঙ্গ স্বামী কারগারের ছাতের উপর পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর কুঠুরিতে তখনও মজবুত তালাচাবি ঝুলছে। কি করে যে বেরলেন, তা কেউই বলতে পারে না।

হতাশ হয়ে গিয়ে পুলিশের লোকেরা আবার তাঁকে জেল কুঠুরিতে ঢোকাল, এবং দরজার কাছে একজন প্রহরীও রাখা হল। কিন্তু হলে কি হবে? দৈবশক্তির কাছে আইন আবার হেরে গেল। আবার দেখা গেল, ত্রৈলঙ্গ স্বামী পরম ঔদাসীন্যে ছাতের উপর পদচারণ করে বেড়াচ্ছেন, কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। বিচারের দেবতা অন্ধ; বিভ্রান্ত পুলিশের লোকেরা তাঁকেই অনুসরণ করতে চাইল।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী সর্বদা মৌনব্রত অবলম্বন করে থাকতেন।* তাঁর সুডৌলমুখ আর বিরাট পিপার মত উদর থাকা সত্ত্বেও, স্বামীজী কদাচিৎ

---

* যিনি মৌন ব্রতী, তিনিই মুনি। সংস্কৃত 'মুনি' শব্দটির সঙ্গে গ্রীক monos বা 'একাকী' শব্দের মিল আছে। তাই থেকেই ইংরাজী 'monk' এবং 'monism' শব্দের উদ্ভব।

আহার করতেন। হয়ত কয়েক সপ্তাহ ধরে উপবাসে কাটাবার পর তাঁর ভক্তদের আনা কিছু ঘোল খেয়ে তিনি উপবাস ভঙ্গ করতেন। জনৈক অবিশ্বাসী ব্যক্তি একবার মনে করল যে ত্রৈলঙ্গ স্বামীকে একটা ভণ্ড বা বুজরুক বলে প্রমাণ করে দেবে। একটা বড় বালতিতে করে একবালতি কলিচূণগোলা এনে স্বামীজীর সামনে রেখে কপট ভক্তিসহকারে নিবেদন করল, "প্রভু, আপনার জন্যে এই একটু ঘোল এনেছি, দয়া করে পান করুন।"

ত্রৈলঙ্গ স্বামী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করেই অবিচলিতভাবে শেষবিন্দুটি পর্যন্ত তা পান করে ফেললেন। মিনিট কয়েকের মধ্যে সেই দুষ্টলোকটি মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি দিতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল, "বাঁচান, স্বামীজী বাঁচান! আগুনে জ্বলে গেলাম, জ্বলে গেলাম। ভেতরে সব জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছে; এ দুষ্টু পরীক্ষা করে বড় অন্যায় করেছি, মাপ করুন, স্বামীজী, এবারকার মত মাপ করুন।"

ত্রৈলঙ্গ স্বামী তাঁর মৌনব্রত ভঙ্গ করে তখন বললেন, "ঠাট্টা করতে এসেছ, বোঝনি তো যে, যখন তুমি আমায় বিষ খেতে দিলে তখন তোমার জীবন আর আমার জীবন এক সঙ্গে বাঁধা হয়ে গেল। দেখ, যদি না আমার এ জ্ঞানটুকু থাকত যে, যেমন সৃষ্টির প্রতি অণুপরমাণুতে ঈশ্বর আছেন তেমনি আমার উদরের মধ্যেও আছেন, তাহলে এ চূণগোলা জল তো আমায় একেবারে সাবাড় করে দিত। এখন তো ভগবানের সূক্ষ্মবিচারের সম্বন্ধে তোমার কিছু ধারণা হল, আবার যেন অন্য কারোর সঙ্গে কোনরকম চালাকি করতে যেও না।"

ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সদুপদেশে চৈতন্যোৎপাদন হতে লোকটা আস্তে আস্তে চুপি চুপি সরে পড়ল।

এই যে যন্ত্রণাভোগের স্থানপরিবর্তন, এটা স্বামীজীর কোন প্রকার ইচ্ছাপ্রসূত যে তা নয়; এ হচ্ছে ভগবানের অমোঘ বিচার,* যাতে করে সৃষ্টির সুদূরতম গ্রহও পরিচালিত হয়। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত যাঁদের

---

* II কিংস ২ঃ ১৯-২৪ (বাইবেল)। জেরিকোতে এলিশা, "জলশোধনের অলৌকিক ব্যাপার" সম্পন্ন করবার পর কিছু ছেলে তাঁকে উপহাস করে; "সেখানে দুটো স্ত্রী-ভল্লুক বন থেকে বেরিয়ে এল আর তাদের মধ্য থেকে বিয়াল্লিশ জন ছেলেকে একেবারে ছিঁড়ে ফেলল।"

ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়েছে তাঁদের জন্য ঈশ্বরের অমোঘ বিধি অবিলম্বে কার্যে পরিণত হয়। তাঁরা তাঁদের সাধনপথের প্রতিবন্ধক যে অহংভাব, তা বহুদিন আগেই দূর করতে পেরেছেন।

এই যে স্বয়ংক্রিয় ন্যায়ের বিধান, তার প্রতিফল কোন্ ধার দিয়ে আর কিভাবে যে আসে তা কেউ বলতে পারে না, (যেমন এই ত্রৈলঙ্গ স্বামী আর তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টাকারী সেই দুষ্ট লোকটার বেলা ঘটল); তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে মানুষের অন্যায় অবিচারের প্রতি আমাদের তাৎক্ষণিক ক্রোধের কিছুটা উপশম হয় বই কি! যীশুখ্রিস্ট বলেছিলেন, "প্রতিশোধ লওয়া আমারই কাজ; আমিই প্রতিফল দেব"।* মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষমতা আর সামান্য উপায়ের আর প্রয়োজন কিসের? জগৎসংসারই ঠিক এর হিসেবনিকেশ করে তার নিশ্চয় প্রতিফল দেবে।

অজ্ঞানীমনে ভগবানের বিচার, প্রেম, সর্বদর্শিতা, অমরত্ব — এ সবের সম্ভাবনার কথা অবজ্ঞা করেই উড়িয়ে দেওয়া হয় — "মনে হয়, শাস্ত্রের ও সব ফাঁকা আওয়াজ, অমূলক কল্পনা।" এই রকম অবিবেচকের মত যাদের ধারণা, এতবড় বিশ্বপ্রকৃতির বিরাট ব্যাপারেও যাদের মনে কোন ভয়ের সঞ্চার করে না, তাদের জীবন ঘটনা পরম্পরায় এমন একটি বিপরীত ঘটনার সৃষ্টি করে যে, তাতে করে তাদের শেষপর্যন্ত জ্ঞানান্বেষণে বাধ্য করে।

জেরুসালেমে যীশুখ্রিস্টের বিজয় অভিযানের সময় ভগবৎবিধির সর্বশক্তিমত্তার বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর শিষ্যবর্গ আর বিরাট জনতা যখন আনন্দে চিৎকার করে বলছিল, "স্বর্গে শান্তি প্রতিষ্ঠিত, ভগবানের মহিমা অপার," কয়েকজন ফ্যারিসী তখন একে অগৌরবের দৃশ্য বলে প্রতিবাদ করল। তারা আপত্তি করে বলল, "প্রভু, আপনার শিষ্যদের তিরস্কার করুন।"

যীশুখ্রিস্ট উত্তর দিলেন — "যদি তাঁর শিষ্যদের চুপ করান হয়, তাহলে "পাথরেরা তক্ষুণি চিৎকার করে উঠবে।"†

---

* রোম্যান্স ১২ ঃ ১৯ (বাইবেল)।

† ল্যুক ১৯ ঃ ৩৭-৪০ (বাইবেল)।

ফ্যারিসীদের প্রতি এইরূপ তিরস্কারে যীশুখ্রিস্ট এটাই দেখাতে চেয়েছিলেন যে, ভগবানের বিচার কোন রূপক কল্পনামাত্র নয়; আর শান্তস্বভাবের লোক, যদি তার জিভ উপড়েও ফেলা যায়, তাহলেও সে এই বিশ্ববিধানের মূল, সৃষ্টির আদিশক্তি থেকে সে তার বাক্‌শক্তি আর আত্মরক্ষার শক্তি ফিরে পাবে — কেউ তা রুখতে পারবে না।

যীশুখ্রিস্ট বলতে লাগলেন, "ভগবৎপরায়ণ লোকদের তোমরা চুপ করিয়ে দিতে চাও? তাহলে তোমরা তো ঈশ্বরের কণ্ঠরোধও করতে পার — যাঁর মহিমা, যাঁর সর্বব্যাপিত্ব, এমনকি প্রস্তর পর্যন্ত কীর্তন করে চলেছে। তোমরা কি চাও যে স্বর্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে লোকে একত্রিত হয়ে উৎসব করবে না? আর লক্ষ লক্ষ লোক মিলে তারা কেবল পৃথিবীতে যুদ্ধের সময় একত্রিত হোক — এই পরামর্শ দেবে? তাহলে ওহে ফ্যারিসীগণ, তোমরা পৃথিবীর ভিতটাকেই উল্টে ফেলার জন্যে যাবতীয় আয়োজন কর। কারণ কি জান? এই সব সাধুস্বভাব লোকেরাই শুধু নয়, তাঁর এই সৃষ্টির মধ্যে দৈব সঙ্গতির সাক্ষীস্বরূপ প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি, — সবই তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।"

যোগিশ্রেষ্ঠ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর অসীম কৃপা একবার আমার সেজমামার উপর বর্ষিত হয়েছিল। সেজমামা একদিন দেখলেন যে স্বামীজী ভক্তপরিবেষ্টিত হয়ে কাশীর গঙ্গার ঘাটে বসে আছেন। তিনি কোন রকমে পাশ কাটিয়ে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে, ভক্তিভরে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলেন। প্রণাম করে উঠতেই দেখলেন যে, তাঁর বহুদিনের এক পুরাতন ব্যাধি একদম সেরে গেছে!*

জানা গেছে যে, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর এখন একমাত্র জীবিতা শিষ্যা হচ্ছেন শঙ্করী মায়ী জিউ। ইনি তাঁর এক শিষ্যের কন্যা — শৈশব থেকেই

---

* ত্রৈলঙ্গ স্বামী এবং অন্যান্য মহাগুরুগণের জীবনকথা যীশুখ্রিস্টের এই বাণীটিকে স্মরণ করায়, "বিশ্বাসীরাই এই সব নিদর্শন দেখতে পাবে; আমার নামে (অর্থাৎ খ্রিস্টচৈতন্য লাভ হলে) তারা শয়তানকে দূর করতে পারবে; তাদের মুখে আসবে নূতন বাণী; তারা সর্পকে জয় করতে পারবে। আর তারা যদি কোন কালকূটও পান করে, তাহলে ঐ কালকূটও তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির উপর হস্তস্পর্শ করলেই তারা আরোগ্যলাভ করবে"। — মার্ক ১৬ঃ ১৭-১৮ (বাইবেল)।

স্বামীজীর কাছে শিক্ষা পান! হিমালয়পর্বতে বদরীনাথ, কেদারনাথ, অমরনাথ, পশুপতিনাথ প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন গুহায় প্রায় চল্লিশ বৎসর তিনি অতিবাহিত করেন। ব্রহ্মচারিণী শঙ্করীমায়ী ১৮২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এখন তাঁর বয়স একশত বৎসরের উপর। চেহারায় বার্ধক্যের বিশেষ কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। চুল কাল, দাঁতগুলি ঝকঝকে পরিষ্কার, আর অদম্য শক্তি ও উৎসাহ এখনও তাঁর বজায় আছে। এখন তিনি মেলা বা ঐ জাতীয় কোন ধর্মোৎসবের সময় মাঝে মাঝে তাঁর নির্জনবাস হতে বেরিয়ে আসেন।

শঙ্করী মায়ী জিউ লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে প্রায়ই আসতেন। তিনি একবার বলেছিলেন যে, একদিন কোলকাতার কাছে ব্যারাকপুরে যখন তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে বসেছিলেন, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু বাবাজী মহারাজ নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করে উভয়ের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করেন।

তিনি স্মৃতি রোমন্থন করে বললেন, "অমর মহাগুরু তখন একটি ভিজে কাপড় পরেছিলেন। মনে হল, যেন তিনি এইমাত্র নদী থেকে স্নান করে আসছেন। কতকগুলি উপদেশ দিয়ে তিনি আমায় আশীর্বাদ করেন।"

বারাণসীতে কোন এক উপলক্ষ্যে একবার ত্রৈলঙ্গ স্বামী তাঁর স্বাভাবিক মৌনব্রত পরিত্যাগ করে প্রকাশ্যে লাহিড়ী মহাশয়কে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করেন। তাঁর এক শিষ্য এতে আপত্তি জানালেন।

শিষ্যটি বললেন, "গুরুদেব, আপনি সন্ন্যাসী, সংসার ত্যাগ করেছেন; আপনি কেন একজন গৃহীকে এ রকম সম্মান দেখাবেন?"

ত্রৈলঙ্গ স্বামী তাকে বললেন, "বেটা, লাহিড়ী মহাশয় হচ্ছেন মায়ের আদুরে ছেলে; মা তাঁকে যেখানে রাখবেন সেখানেই থাকবেন। সাংসারিক লোক হিসাবে কর্তব্যপালন করতে করতে তিনি সেই পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, যা পাবার জন্যে আমি লেংটিটাও অবধি ত্যাগ করে এসেছি, বুঝলে?"

৩২ পরিচ্ছেদ

মৃত রামের পুনর্জীবন

"তারপর ল্যাজারাস নামে জনৈক ব্যক্তি পীড়িত হয়ে পড়ল ... যীশু যখন শুনলেন, তিনি বললেন যে এ পীড়াতে মৃত্যু হবে না, ভগবানের মহিমা প্রকাশের জন্যেই এ পীড়া, যাতে করে ঈশ্বরের পুত্রও মহিমান্বিত হন।"*

শ্রীরামপুর আশ্রমের বারান্দায় বসে এক রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল প্রভাতে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী খ্রিস্টীয় ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করছিলেন। গুরুদেব ছাড়া তাঁর আরও জনকতক শিষ্য সেখানে ছিলেন; আমিও রাঁচির কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

গুরুদেব ব্যাখ্যা করলেন, "এই কথাগুলোতে যীশু নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে অভিহিত করলেন। যদিও তিনি আসলে ঈশ্বরের সহিত একাত্মীভূত, তবুও এখানে এইরূপ উল্লেখে তাঁর একটা গভীর নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্য রয়েছে। ঈশ্বরের পুত্র হচ্ছেন মানুষের ভিতরের কূটস্থ বা ব্রহ্মচৈতন্য। মরজগতের কেউ ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করতে পারে না। মানুষ তাঁর স্রষ্টাকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারে একমাত্র তাঁকে অনুসন্ধান করে; মানুষ কি কোন 'নিরুপাধিক সত্তাকে' মহিমান্বিত করতে পারে যার সে কিছুই জানে না? সাধুসন্তদিগের মস্তকোপরি যে 'জ্যোতির্মণ্ডল অর্থাৎ ছটা', তা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের ক্ষমতার নিদর্শন।"

ল্যাজারাসের পুনরুজ্জীবনের অত্যাশ্চর্য কাহিনীটি শ্রীযুক্তেশ্বরজী পড়ে যেতে লাগলেন। পড়া শেষ হলে পর গুরুদেব গভীর নীরবতার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন, কোলের উপর সেই পবিত্র ধর্মশাস্ত্র খোলাই পড়ে রইল।

---

* জন ১১ ঃ ১-৪ (বাইবেল)।

গুরুদেব অবশেষে গভীর ভাবোদ্দীপনায় বলতে লাগলেন, "আমারও ঐ রকম একটি অলৌকিক ব্যাপার দর্শনের সুযোগ ঘটেছিল। লাহিড়ী মহাশয়ই আমার একটি বন্ধুকে মৃতাবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিলেন।"

গল্প শোনবার গভীর আগ্রহে ছেলেদের মুখে হাসি দেখা দিল। আমিও উৎসাহিত হয়ে উঠলাম, কারণ শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে শুধু দার্শনিক আলোচনা নয়, বিশেষ করে তাঁর গুরুদেবের যেকোন অলৌকিক ঘটনার বিবরণ শোনবার মত আমার মধ্যেও যথেষ্ট বালকসুলভ গভীর উৎসাহ আর আগ্রহও ছিল।

গুরুজী শুরু করলেন ঃ "রাম আর আমি ছিলাম অভিন্নহৃদয় বন্ধু। লাজুক আর বেশি লোকজন তেমন পছন্দ করতো না বলে, রাম মাঝরাত থেকে ভোরবেলায় আমাদের গুরুদেব লাহিড়ী মহাশয়কে দর্শন করতে আসত। সে সময় দিনের বেলাকার লোকেদের ভিড় থাকত না। রামের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলাম বলে সে আমাকে অনেক গভীর আধ্যাত্মিক অনুভবের কথা গোপনে বলেছিল। তার আদর্শ সাহচর্যে আমারও প্রেরণা আসত।" কথাগুলি স্মরণ করতে করতে গুরুদেবের মুখ মধুর স্মৃতিতে কোমল হয়ে উঠল।

গুরুজী বলতে লাগলেন, "হঠাৎ রাম এক কঠিন পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গেল। সে এসিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত হ'ল। গুরুতর অসুখের সময় গুরুদেব অবশ্য ডাক্তার ডাকতে বারণ করতেন না; কাজেই দু'জন বিশেষজ্ঞকে ডাকা হল। চিকিৎসা খুব জোর চলতে লাগল বটে, আমিও কিন্তু এধারে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে গভীরভাবে প্রার্থনা করতে লাগলাম। সেই সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে চোখের জলে ভেসে ব্যাপারটা তাঁকে জানালাম। কিন্তু গুরুদেব বেশ প্রফুল্ল মুখে হেসে বললেন, 'আরে ডাক্তারেরা তো রামকে দেখছে; তবে আর ভাবনা কি? সে ভাল হয়ে যাবে বই কি।'

"শুনে মনটা একটু হাল্কা হল। বন্ধুর বাড়ি ফিরে এলাম; এসে দেখি অবস্থা খুবই খারাপ — মরণ শিয়রে!

"হতাশকরুণ স্বরে একজন ডাক্তার আমাকে বললেন, 'আর ঘণ্টাখানেক কি বড় জোর দু'ঘণ্টা!' আবার দৌড়লাম লাহিড়ী মহাশয়ের কাছে।

"ডাক্তারেরা তো বিবেচক লোক। রাম নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে, দেখো!' বলেই তিনি আমাকে প্রফুল্লভাবে বিদায় দিলেন।

"রামের বাড়ীতে এসে দেখলাম যে ডাক্তার দু'জনাই চলে গেছেন। একজন আবার একছত্র লিখেও রেখে গেছেন, 'আমাদের যতদূর করবার সবই করেছি, কিন্তু এর আর বাঁচার কোনো আশাই নেই!'

"বন্ধুর অবস্থা দেখে বোধ হল যে, সত্যিই তার মরণ ঘনিয়ে আসছে। আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম না লাহিড়ী মহাশয়ের কথা কেমন করে সত্য না হয়ে যায়; অথচ রামের মুমূর্ষু অবস্থা। দেখে মনে হতে লাগল যে 'এবার সব শেষ'। একবার বিশ্বাস আবার পরক্ষণেই অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান হয়ে বন্ধুর জন্য যতটা করার সে সময় তা সবই করলাম। একটু ঘোর কেটে যেতেই সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'যুক্তেশ্বর, গুরুদেবের কাছে দৌড়ে যাও; তাঁকে বল গিয়ে যে, আমি চললাম। আর বোলো যে, আমার অন্ত্যেষ্টির আগে যেন তিনি আমার দেহকে আশীর্বাদ করেন।' এই কথাগুলি বলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাম মরণের কোলে ঢলে পড়ল।*

"তার মৃত্যুশয্যার পাশে বসে তো ঘণ্টাখানেক ধরে খুব খানিকটা কাঁদলাম। নীরবতার যে চির উপাসক — সে এখন মৃত্যুর গভীরতর নীরবতায় নিমগ্ন। অন্য একজন শিষ্য ঘরে এল। তাকে, যতক্ষণ না ফিরি বাড়ীতে থাকতে বলে, অর্ধোদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে, শ্রান্ত-ক্লান্তপদে চললাম গুরুর বাড়ীর দিকে।

"লাহিড়ী মহাশয় একগাল হেসে বললেন, 'রাম এখন কেমন আছে হে?' আর সামলাতে না পেরে একেবারে সোজাসুজি মুখের উপর বলে দিলাম, 'মশায়, শীগগিরই দেখতে পাবেন সে কেমন আছে। ঘণ্টাকতক বাদেই দেখবেন তাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' এই বলে প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম।

---

* কলেরা রুগী সাধারণতঃ বুদ্ধিবৃত্তি হারায় না — মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তারা সম্পূর্ণ সচেতন থাকে।

"'যুক্তেশ্বর, যুক্তেশ্বর একটু ধৈর্য ধর, একটু ঠাণ্ডা হও। শান্ত হয়ে বসে একটু ধ্যান কর ত' দেখি।' বলে গুরুদেব সমাধিতে মগ্ন হলেন। সেদিন বিকেল আর রাতটা এক অখণ্ড নীরবতার মধ্য দিয়েই কাটল। মনকে শান্ত করবার জন্যে বৃথাই চেষ্টা করতে লাগলাম।

"ভোরের দিকে লাহিড়ী মহাশয় আমার দিকে আশ্বাসসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'আঃ! দেখছি যে তোমার মন এখনও শান্ত হয় নি! আরে কালকে তুমি আমায় বললে না কেন যে, ওষুধটষুধ গোছের একটা প্রত্যক্ষ কিছু সাহায্য চাই?' তারপর রেড়ির তেলের প্রদীপটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'একটা ছোট শিশিতে ঐ প্রদীপটা থেকে খানিকটা তেল ঢেলে নিয়ে রামের মুখে সাতটা ফোঁটা ঢেলে দাওগে যাও?'

"আমি তো তীব্র আপত্তি করে উঠলাম, 'গুরুদেব, ছেলেটা কাল দুপুরবেলা মারা গেছে! এখন আর তেলের কি প্রয়োজন বলুন?'

"'সে যাকগে, এখন যা বলি তাই কর দেখি।' লাহিড়ী মহাশয়ের স্ফূর্তির কারণ কিছুই বোধগম্য হল না। শোকের দারুণ বেদনা তখনও আমার প্রশমিত হয়নি। যাক্, খানিকটা তেল তো ঢেলে নিয়ে রামের বাড়ীর দিকে রওনা হলাম।

"গিয়ে দেখি মৃত্যুর আলিঙ্গনে রামের দেহ হিমশীতল। তার এ বীভৎস অবস্থার দিকে দৃক্‌পাত না করে ডান হাতের আঙুল দিয়ে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে, বাঁ হাত আর ছিপির সাহায্যে তার দাঁতকপাটিলাগা মুখে ফোঁটা ফোঁটা করে সেই তেল ঢালতে লাগলাম।

"এক, দুই, তিন, ... চার, পাঁচ, ... ছয় ... সাত, যেমনি সপ্তম ফোঁটাটি তার মরণ-নীল হিমশীতল ওষ্ঠাধর স্পর্শ করল, অমনি রামের দেহ ভীষণভাবে থর থর করে কেঁপে উঠল। ধড়মড় করে উঠে বসে রাম আশ্চর্য হয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার দেহের মাংসপেশীগুলো সব সবেগে স্পন্দিত হচ্ছে।

"বেশ পরিষ্কার গলায় সে বলল, 'লাহিড়ী মহাশয়কে দেখলাম এক অতি উজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডলের মাঝখানে — যেন সূর্যের মত জ্বলছেন।

তিনি আমায় আদেশ করলেন, "ওঠ ওঠ, ঘুম থেকে উঠে পড় আর যুক্তেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে চলে এস।'"

"বলে ত' রাম বেশ ঝেড়েফুড়ে উঠে পড়ে, জামাকাপড় পরে আমার সঙ্গে চলল গুরুদর্শনের জন্যে। এই রকম সাঙঘাতিক রোগের পর সে হাঁটবার মত বলই বা পেল কি করে আর বেশ দিব্য সপ্রতিভভাবে গুরুদর্শনেই বা চলল কেমন করে, তা ভেবে তো বুদ্ধি আমার লোপ পাবার উপক্রম। রাম সোজাসুজি গুরুদেবের কাছে পৌঁছে তাঁর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল — চক্ষে তার কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারা।

"গুরুদেব আনন্দে একেবারে আত্মহারা। আমার দিকে চোখ মিট্ মিট্ করে একটু দুষ্টামির হাসি হেসে বললেন, 'যুক্তেশ্বর, এবার থেকে তুমি নিশ্চয়ই একটি রেড়ির তেলের শিশি সঙ্গে রাখতে ভুলবে না, কি বল? যখনই কোন মৃতদেহ দেখবে, তখনই তার মুখে এই রেড়ির তেলের গোটাকতক ফোঁটা ফেলে দিও; তা হলেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসবে! আরে এই রেড়ির তেলের সাতটি ফোঁটা তোমার যমকেও নিশ্চয় হার মানাবে, তা দেখে নিও।"

"'গুরুজী, আমায় আর ঠাট্টা করবেন না। ব্যাপারটা যে কি হলো, তা এখনও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না; কোথায় আমার ভুল হয়েছে বলুন দেখি?'

"লাহিড়ী মহাশয় বোঝাতে লাগলেন, 'দেখ, দু'দুবার আমি তোমায় বললাম যে রাম ভাল হয়ে উঠবে, তবুও আমার কথায় তোমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হল না। অবিশ্যি এ কথা আমি বলিনি যে ডাক্তারেরাই ওকে ভাল করে তুলবেন। আমি শুধু এই কথাটি বলতে চেয়েছিলাম যে তারা কাছে রয়েছে তবে আর ভাবনা কি! ডাক্তারদের কাজে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাইনি; তাদেরও তো রোজগারপাতি করে বাঁচতে হবে!' তারপর আনন্দোচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, 'সর্বদা মনে রেখো সেই সর্বশক্তিমান পরমাত্মাই যে কোন লোককে নিরাময় করে তুলতে পারেন — ডাক্তার থাকুক আর নাই থাকুক।'

"অত্যন্ত অনুতপ্ত চিত্তেই স্বীকার করলাম, 'এখন আমার ভুল বুঝতে পারছি। এখন আমি জানলাম যে আপনার সামান্য দু'টি কথায় জগৎসংসার উল্টে যেতে পারে।'"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী এই অপূর্ব রোমাঞ্চকর কাহিনী শেষ করতেই স্তম্ভিত শ্রোতৃবর্গের মধ্য থেকে একটি ছোট ছেলে প্রশ্ন করে বসল — যার দুটো অর্থ হয়, "ঠাকুর, আপনার গুরু রেড়ির তেল খেতে দিলেন কেন?"

"বাবা, তেল দেওয়ার কোন মানেই হয় না — কেবল এইটুকুমাত্র ছাড়া যে আমি প্রত্যক্ষ একটা কিছু চাই। তাই লাহিড়ী মহাশয় হাতের কাছে তেল পেয়ে তাই দিলেন, আমার বিশ্বাস আরও জাগিয়ে তুলতে। গুরুদেব রামকে মরে যেতে দিলেন কেন জান? আমি খানিকটা সন্দেহ করেছিলাম বলে। কিন্তু আমার দেবতুল্য গুরুমহারাজ জানতেন যে, যেহেতু তিনি বলেছেন শিষ্যটি ভাল হয়ে যাবে, তাকে সুস্থ হতেই হবে — এমন কি মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়েও — যা সাধারণতঃ একেবারে চরম পরিণাম!"

তারপর শ্রীযুক্তেশ্বরজী ছেলেদের দলটিকে বিদায় দিয়ে আমাকে তাঁর পায়ের কাছে একটি কম্বল আসনে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের সঙ্গে তিনি বলতে লাগলেন, "যোগানন্দ, তোমায় তো লাহিড়ী মহাশয়ের সাক্ষাৎ শিষ্যেরা ছেলেবেলা থেকেই ঘিরে রয়েছেন। আমাদের মহাগুরু তাঁর মহিমময় জীবন আংশিক স্বাতন্ত্র্যতার মধ্যেই কাটিয়েছেন, আর তাঁর অনুচরবর্গদের তাঁর শিক্ষা নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে বরাবরই নিষেধ করে এসেছেন। যাইহোক্, তিনি একটি অর্থপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, বলছি শোন।"

"তিনি বলেছিলেন, 'আমার তিরোভাবের পঞ্চাশ বৎসর পরে আমার জীবন কথা লিখিত হবে, কারণ প্রতীচ্যে যোগ সম্বন্ধে তখন একটা গভীর আগ্রহ দেখা দেবে। এই যোগের বার্তা সে সময় সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়বে আর মানবজাতি যে একই পিতার সন্তান, তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে এক বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠবে।'

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, "বৎস যোগানন্দ, যোগের বাণী প্রচার করতে আর তাঁর পবিত্র জীবনকথা লিপিবদ্ধ করতে, তুমি অবশ্যই তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করবে।"

১৮৯৫ সালে লাহিড়ী মহাশয়ের তিরোভাবের পর থেকে ৫০ বৎসর পূর্ণ হয় ১৯৪৫ সালে; আর ঐ বছরেই বর্তমান পুস্তক রচনার কাজ শেষ হয়। আর এই ১৯৪৫ সালেই বৈপ্লবিক আণবিক যুগের সূচনা। এই অদ্ভুত যোগাযোগ দেখে আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই! চিন্তাশীল মনীষীরা শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের সমস্যা আশু সমাধানের জন্য আগের চেয়ে এখন বেশি করে মনঃসংযোগ করছেন, পাছে অবিরত জড়শক্তিপ্রয়োগে এই সব সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও চিরতরে না লুপ্ত হয়ে যায়।

যদি মানবজাতি আর তাদের কার্যকলাপ সময়ের প্রভাবে অথবা বোমার প্রসাদে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়ও, তাহলেও সূর্যদেব যথারীতি তার নিজপথেই চলবে, এবং গ্রহ-নক্ষত্র তো যে যার স্থানে বসে ঠিক নিয়মিত পাহারা দিয়ে যাবে। মহাজাগতিক নিয়ম তো কখনও স্থগিত বা পরিবর্তিত করা যায় না; তাই মানুষ এদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চললে ভালই করবে। যদি বিশ্বপ্রকৃতি শক্তিপ্রদর্শনের বিরোধী হয়, সূর্য যদি গ্রহনক্ষত্রের সঙ্গে লড়াই না করে তাদের ক্ষুদ্র অধিকারটুকু ছেড়ে দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত যায়, তবে আর আমাদের মুষ্টি আস্ফালনের প্রয়োজন কি? সত্যিই কি এ থেকে কোন শান্তি আসবে? কাটাকাটি হানাহানি নয়, ক্রূরতা নয়, সদিচ্ছা আর প্রেমের শক্তিতেই বিশ্বপ্রকৃতির স্নায়ু শক্তিমান; পরিপূর্ণ শান্তিতে অবস্থান করেই মানবজাতি জানতে পারবে বিজয়লাভের অনন্ত ফল, আর তা শোণিতসিঞ্চিত মৃত্তিকাজাত বৃক্ষ হতে উৎপন্ন ফলের চেয়ে ঢের ঢের বেশি সুমধুর।

এই যে এতবড় লীগ অফ্ নেশন্স, তা তখন একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, নামহীন, মানবহৃদয়ের মিলনক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াবে। পৃথিবীর দুঃখনিবারণের জন্য উদার সহানুভূতি আর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, মানব-বৈচিত্র্যের কেবলমাত্র একটা খুব বিজ্ঞ বিশ্লেষণ আর বিচার থেকে পাওয়া যাবে না, তা পাওয়া যাবে মানুষের গভীর ঐক্যবোধের ভিতর থেকে — ভগবানের সঙ্গে তার

আত্মীয়তার মধ্য থেকে। পৃথিবীর সর্বোত্তম আদর্শ উপলব্ধির পথে — বিশ্বভ্রাতৃত্বের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠা — ঈশ্বরের সহিত ব্যক্তিগত সংযোগস্থাপনের বিজ্ঞান এই যোগই যেন সকল দেশে সকল লোকের ভিতর কালক্রমে প্রসারলাভ করে।

যদিও ভারতবর্ষের সভ্যতা যে কোন জাতির চেয়ে প্রাচীন, তাহলেও অতি অল্প ঐতিহাসিকেরাই খবর রাখেন যে, জাতি হিসাবে তার বেঁচে থাকার কৃতিত্ব কোন দিক দিয়েই একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। তার কারণ, ভারতবর্ষ যুগে যুগে তার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের মাধ্যমে শাশ্বত সত্যকে যে ভক্তি অর্ঘ্য প্রদান করে এসেছে, তারই এ একটা ন্যায়সঙ্গত পরিণতি মাত্র। শুধু বাঁচার জন্যেই বেঁচে থাকা, যুগে যুগে কর্মহীনতার পরিচয়ে — (কোন ক্লান্ত, প্রাচীন গবেষক কি আমাদের সত্যিই বলতে পারেন তা কতগুলি?) কালের আহ্বানে যে কোন জাতির চেয়ে ভারতবর্ষই তার যোগ্যতম উত্তর প্রদান করতে পেরেছে।

বাইবেলের গল্পে আছে — এব্রাহাম ভগবানের কাছে আবেদন জানিয়েছিল* যে যদি দশটি সদাচারপরায়ণ লোক পাওয়া যায় তাহলে সোডম নগরী যেন ধ্বংসের হাত থেকে অব্যাহতি পায়, তাতে এই দৈববাণী হয়েছিল যে, "আমি ঐ রকম দশটি লোকের জন্যেই এ আর ধ্বংস করব না," — ভারতবর্ষ যে বিস্মৃতির গর্ভে বিলুপ্ত হবার হাত এড়িয়ে বেঁচে গেছে — উপরোক্ত উক্তির আলোকে এটি বিচার করলে ঐ কথাগুলি নতুন অর্থপ্রদ হয়ে ওঠে। আজ মিশর, ব্যাবিলন, গ্রীস, রোম আর অন্যান্য মহাপরাক্রমশালী যুদ্ধপটু জাতিসমূহের সাম্রাজ্য, যারা এক সময়ে ভারতবর্ষেরই সমসাময়িক ছিল, তারা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ভগবানের উত্তরে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোন দেশের অস্তিত্ব তার জড় উন্নতিতে নয়, তার মহামানবদের কৃতিত্বেই বজায় থাকে।

আজকের এই বিংশ শতাব্দী যা ৫০ বছর পূর্ণ হবার পূর্বেই দুইটি মহাযুদ্ধের রক্তধারায় রঞ্জিত হয়েছে, সেখানে আজ যেন ঈশ্বরের সেই

---

* জেনেসিস ১৮ঃ ২৩-৩২ (বাইবেল)।

বাণীই ধ্বনিত হয়ে ওঠে — যে জাতির মধ্যে অন্ততঃ দশজনও প্রকৃত ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যায় — যারা সেই অমোঘ ন্যায় বিচারকের চক্ষে শ্রেষ্ঠ — সে জাতি কখনও ধ্বংস হতে পারে না।

এই উপদেশ অনুসরণ করে ভারতবর্ষ প্রমাণ করেছে যে, মহাকালের সহস্র চাতুরীর মাঝখানেও সে কখনো তার বুদ্ধি হারায় নি। প্রতি শতাব্দীতেই সিদ্ধগুরুগণ তার মৃত্তিকা পবিত্র করে এসেছেন। আধুনিক খ্রিস্টতুল্য ঋষিগণ, যেমন লাহিড়ী মহাশয় বা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী — আজ এ কথা ঘোষণা করতে দণ্ডায়মান হয়েছেন যে, মানুষের সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর জাতির আয়ুষ্কালের জন্য ঈশ্বরোপলব্ধির বিজ্ঞান, যোগ বিদ্যা জানা একান্তই প্রয়োজন।

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন আর তাঁর সার্বজনীন মতবাদ সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্যই ছাপার অক্ষরে পাওয়া যায়।* ভারত, আমেরিকা আর ইউরোপে প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে আমি দেখে এসেছি যে, তাঁর মুক্তিদায়ী যোগের বাণী সম্বন্ধে লোকেদের কি গভীর আর আন্তরিক আগ্রহ। এখন প্রতীচীতে, যেখানে আধুনিক যোগীশ্রেষ্ঠদের সম্বন্ধে লোকে অল্পই জানে, সেখানে — তিনি যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন — ঠিক সেই রকম মহাযোগীর একটি লিখিত জীবনচরিতের একান্তই প্রয়োজন।

১৮২৮ সালে ৩০ সেপ্টেম্বর, লাহিড়ী মহাশয় এক ধর্মনিষ্ঠ প্রাচীন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের কাছে ঘূর্ণি নামক গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা পূজ্যপাদ গৌরমোহন লাহিড়ী; লাহিড়ী মহাশয় হচ্ছেন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী মুক্তকেশীর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র সন্তান (গৌরমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের প্রথমা পত্নী তিনটি সন্তানকে জন্মদান করার পর তীর্থ ভ্রমণকালে পরলোক গমন করেন)। তাঁর অতি শৈশবেই মাতৃবিয়োগ

---

* "শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়" — স্বামী সত্যানন্দ প্রণীত, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। বঙ্গভাষায় লিখিত এক ক্ষুদ্র জীবনচরিত। লাহিড়ী মহাশয়ের বিষয়ে এই অংশে আমি উক্ত পুস্তক হতে কয়েক পঙ্‌ক্তি অনুবাদ করে সংযোজিত করেছি।

ঘটে। তাঁর মাতাঠাকুরাণী মহাযোগীশ্বর শিবের ভক্ত উপাসক ছিলেন — এই সামান্য তথ্যটুকু ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে আর বেশি কিছু জানা যায় না।

বালকের পিতৃদত্ত নাম হ'ল শ্যামাচরণ; ঘূর্ণিতে তাঁদের পৈতৃক বাসস্থানেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। তাঁর বয়স যখন তিন কি চার বছর, তখন প্রায়ই দেখা যেত যে তিনি বালির তলায় বিশেষ কোন যোগাসনে বসে আছেন — শরীরটি বালির মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত, কেবল মাথাটি বার করা আছে।

১৮৩৩ সালে শীতকালে লাহিড়ীদের সম্পত্তি সব বিনষ্ট হয়ে যায়, যখন নিকটস্থ জলঙ্গী নদী তার গতি পরিবর্তন করে ও গঙ্গাগর্ভে অদৃশ্য হয়। বাড়ীর ভিটার সঙ্গে লাহিড়ীদের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দিরও গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়। জনৈক ভক্ত শিবলিঙ্গটি ঘূর্ণায়মান জলস্রোত থেকে উদ্ধার করে একটি নূতন মন্দিরে তাকে প্রতিষ্ঠা করেন। এখন তা ঘূর্ণি শিবমন্দির নামে সুপরিচিত।

গৌরমোহন লাহিড়ী মহাশয় পরিবারবর্গসহ নদীয়া পরিত্যাগ করে বারাণসীর অধিবাসী হন। সেখানেও তিনি একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৈদিক নিষ্ঠার সঙ্গে সংসারধর্ম পালন করতেন; নিয়মিত পূজা অর্চনা, দানধ্যান, শাস্ত্রাধ্যয়ন করতেন। ন্যায়পরায়ণ ও সংস্কারমুক্ত বলে, তিনি আধুনিক মতের উপযোগিতাকেও অস্বীকার করতেন না।

বালক শ্যামাচরণ কাশীর পাঠাগারে হিন্দী ও উর্দুতে পাঠগ্রহণ করেন। জয়নারায়ণ ঘোষাল পরিচালিত বিদ্যালয়ে তিনি সংস্কৃত, বাংলা, ফরাসী ও ইংরাজি ভাষায় শিক্ষাগ্রহণ করেন। বেদাধ্যয়নে গভীর মনোনিবেশ করে বালক-যোগী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রবিচার আগ্রহসহকারে শুনতেন। তাঁদের মধ্যে তখন নাগভট্ট নামে একজন মারাঠী পণ্ডিতও ছিলেন।

শ্যামাচরণ ছিলেন শান্ত, দয়াশীল আর সাহসী যুবক। তাঁর সঙ্গীরা সকলেই তাঁকে ভালবাসত। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, সুসমঞ্জস, বলিষ্ঠ ছিল তাঁর দেহ।

সন্তরণে তিনি পটু ছিলেন; তাছাড়া শারীরিক ব্যায়ামে তিনি অপূর্ব পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারতেন।

১৮৪৬ সালে শ্রীদেবনারায়ণ সান্যালের কন্যা শ্রীমতী কাশীমণি দেবীর সঙ্গে শ্যামাচরণ লাহিড়ীর বিবাহ হয়। কাশীমণি দেবী ছিলেন আদর্শ ভারতীয় পত্নী — অতিথি আর দরিদ্রনারায়ণের সেবা এবং সমস্ত সাংসারিক কর্তব্য হাসিমুখে সম্পন্ন করতেন। বিবাহের ফলে তাঁদের তিনকড়ি আর দু'কড়ি নামে দু'টি সাধুপ্রকৃতির পুত্র আর দু'টি কন্যালাভ হয়।

১৮৫১ সালে তেইশ বছর বয়সে, লাহিড়ী মহাশয় ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অধীন সামরিক পূর্তবিভাগে হিসাবরক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কার্যকালে তাঁর বহু পদোন্নতি হয়। শুধু ভগবানের কাছেই যে তিনি একজন মহাযোগী বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন তাই নয়, এ সংসার নাট্যমঞ্চে ক্ষুদ্র মানবজীবনের নাটকে তিনি সামান্য অফিসকর্মচারীর ভূমিকা অভিনয়েও কৃতকার্য হয়েছিলেন।

পূর্তবিভাগ নানা সময় লাহিড়ী মহাশয়কে গাজিপুর, মির্জাপুর, দানাপুর, নৈনিতাল, কাশী ও অন্যান্য স্থানে তাদের অফিসে বদলি করেছিল। পিতার মৃত্যুর পর, লাহিড়ী মহাশয়ের উপর সংসারের সম্পূর্ণ ভার এসে পড়ল। পরিবারবর্গের জন্য তিনি কাশীতে নিরালা গরুড়েশ্বর মহল্লায় একটি বাড়ী খরিদ করেন।

তাঁর তেত্রিশ বৎসর বয়সের সময় লাহিড়ী মহাশয় তাঁর পুনর্জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে দেখতে পান। হিমালয়ে রাণীক্ষেতের কাছে নিজ মহাগুরু বাবাজী মহারাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয়, তিনিই তাঁকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করেন।

এই মঙ্গলপ্রদ ঘটনা শুধু তাঁর একার ক্ষেত্রেই নয় সমগ্র মানবজাতির কাছে একটা পরম মাহেন্দ্রক্ষণ। অবলুপ্ত অথবা বহুকাল বিলুপ্ত উচ্চতম যোগশিক্ষা আবার সাধারণ্যে প্রকাশিত হল।

পুরাণে কথিত ভগীরথের তপস্যায় প্রীত হয়ে আকাশবাহিনী গঙ্গা* যেমন স্বর্গ হতে মর্ত্যে আগমন করেছেন, এই "ক্রিয়াযোগ"ও তেমনি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে হিমালয়কন্দর হতে নির্গত হয়ে মানবের সংসারদাবদগ্ধ হৃদয়ে অমিয়ধারার প্লাবন বহাবার জন্যেই ছুটে চলেছে।

---

* পুণ্যসলিলা গঙ্গার উৎপত্তি হয়েছে চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের একটি নিস্তব্ধ বরফগুহার ভিতর থেকে। শত শত বৎসর ধরে অসংখ্য সাধুসন্ন্যাসী গঙ্গার তীরে বাস করে আনন্দ লাভ করেছেন — গঙ্গাতীর তাই তাঁদের আশীর্বাদপূত পুণ্যময় স্থান।

গঙ্গানদীর একটা অসাধারণ আর অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অদূষ্যতা। তার অপরিবর্তনীয় নির্বীজ জলে কোন বীজাণুই বাঁচতে পারে না। লক্ষ লক্ষ হিন্দু এর জল স্নান ও পানের জন্য ব্যবহার করেন ... তাতে কোনই ক্ষতি হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানীদের কাছে ব্যাপারটি খুবই বিভ্রান্তিকর। তাঁদের মধ্যে ডাঃ জন হাওয়ার্ড নর্থপ — ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে রসায়ণশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কারের যুগ্ম অধিকারী — সম্প্রতি বলেছেন, "আমরা জানি, গঙ্গার জল ভীষণভাবে দূষিত; কিন্তু ভারতবাসীরা এই জল খায়, এতে সাঁতার কাটে, কিন্তু আপাতভাবে তাতে তাদের কোনই ক্ষতি হয় না।" তারপর আশা প্রকাশ করে বলছেন, "বোধহয় ব্যাকটীরিয়াফাজ (বীজাণুভুক্) নদী জলকে বীজাণুশূন্য করে।"

বেদে সকল নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রতিই ভক্তি প্রদর্শনের কথা বলা আছে। ভক্ত হিন্দু আসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিসের এই উক্তি ভালভাবেই অবধান করতে পারেন, "আমাদের ভগিনী প্রবাহিনীর জন্য আমাদের প্রভুর জয় হোক, যার জল এত প্রয়োজনীয়, এত সুলভ, পবিত্র আর অমূল্য।"

৩৩ পরিচ্ছেদ

বাবাজী—আধুনিক ভারতের মহাযোগী

বদরীনারায়ণের কাছে উত্তর হিমাচলপ্রদেশের শৈলশিখর লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু বাবাজী মহারাজের দিব্য উপস্থিতিতে এখনও এক পুণ্যস্থান। নিঃসঙ্গ মহাগুরু তাঁর নশ্বরদেহ্ শতাব্দীর পর শতাব্দী, হয়তোবা যুগযুগান্ত ধরে রক্ষা করে আসছেন। মরণজয়ী বাবাজী একজন 'অবতার'। এই সংস্কৃত শব্দটির অর্থ হোল — 'অবতরণ'। 'অব' (নীচে) এবং 'তৃ' — এই ধাতুদ্বয় থেকে শব্দটির উৎপত্তি। হিন্দু শাস্ত্রে অবতার কথার মানে হ'ল — দেবগণের শরীরিরূপে মর্ত্যে আগমন।

শ্রীযুক্তেশ্বরজী একদিন আমায় আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, "বাবাজীর আধ্যাত্মিক অবস্থা মানবকল্পনারও অতীত। মানুষের ক্ষুদ্রদৃষ্টি তাঁর অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ ভেদ করতে অক্ষম। এই অবতারের যোগৈশ্বর্য কল্পনাই করা যায় না। এ একেবারে ধারণার অতীত।"

'উপনিষদে' আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতিটি অবস্থার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। "সিদ্ধ" মহাপুরুষগণ 'জীবন্মুক্ত' অবস্থায় (জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভ) উন্নীত হবার পর 'পরামুক্ত' অবস্থা (পূর্ণ মুক্তিলাভ ঘটে, মরণের অতীত হওয়া) লাভ হয়; এই পরামুক্তি যাঁর ঘটেছে, তিনি মায়ার নাগপাশ ছেদন আর জন্ম-মৃত্যুর হাত সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে গেছেন। কাজেই পরামুক্ত যিনি, তিনি কদাচিৎ নশ্বরদেহে প্রত্যাবর্তন করেন; আর যদিই বা করেন, তা অবতার হবার জন্য, সংসারের উপর দেবতার আশীর্বাদ বর্ষণ করতে তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষ হয়েই এ জগতে আগমন করেন। অবতার কখনও প্রাকৃতবিধির অধীন হন না। তাঁর শুদ্ধদেহ, যা কেবল আলোকনির্মিত প্রতিমূর্তির মতই পরিদৃশ্যমান, তার উপর প্রকৃতির কোনই আধিপত্য থাকে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে অবতারের আকৃতিতে কোনই বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয় না; কিন্তু

সময়বিশেষে এর কোন ছায়া বা পদচিহ্ন মাটির উপর পড়তে দেখা যায় না। মায়ান্ধকার আর জড়বন্ধনের হাত হতে অন্তর যে মুক্ত — এইসব লক্ষণগুলিই হচ্ছে তাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এরূপ পরম ভাগবতেরাই কেবল জীবনমৃত্যুর আপেক্ষিক সম্বন্ধের পিছনে আসল সত্যকে অবগত আছেন। ওমর খৈয়াম, যাঁর কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবসম্বন্ধে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা, তিনি তাঁর অমর কবিতা "রুবায়েতে", এইরূপ মুক্তপুরুষ সম্বন্ধে বলে গেছেন ঃ—

> "অন্তরে মোর আনন্দেরি রাকাশশীর হাসির মাঝ,
> এই গগনের উজলকিরণ চাঁদের উদয় আবার আজ;
> বৃথাই আমার খোঁজের তরে, উদয়পথে চলার কাল,
> এই বাগিচার কুঞ্জমাঝে, মেলবে সে তার দৃষ্টিজাল।"

এই "আনন্দের রাকাশশী" হচ্ছেন ঈশ্বর — সেই চিরন্তন ধ্রুবতারা, কালের বুকে যিনি অটল স্থির। আর "এই গগনের চাঁদ" হচ্ছে বাইরের বিশ্বজগৎ, যা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের নিয়মাধীন। পারস্যের এই দ্রষ্টাকবি তাঁর আত্মোপলব্ধিবলে "এই বাগিচা" অর্থাৎ এই পৃথিবীতে প্রকৃতি বা মায়ার বশবর্তী হয়ে পুনঃ পুনঃ ফিরে আসার হাত থেকে চিরতরে মুক্তিলাভ করেছেন। "বৃথাই আমার খোঁজার তরে, ... মেলবে সে তার দৃষ্টিজাল" — চিরমুক্তির জন্য ঘূর্ণায়মান বিশ্বের কি নিষ্ফল অনুসন্ধান!

যীশুখ্রিস্ট তাঁর মুক্তিসম্বন্ধে আর এক উপায়ে বর্ণনা করে গেছেন ঃ "তারপর জনৈক লিপিকর এসে তাঁকে বলল, প্রভু, আপনি যেখানেই যান না কেন, আমি আপনাকে অনুসরণ করব। তখন যীশু তাকে বললেন, শিয়ালদের গর্ত আছে, আকাশের পাখিদেরও নীড় আছে, কিন্তু মানবপুত্রের মাথা রাখবার ঠাঁই নাই।"*

সর্বব্যাপিত্বের দ্বারা দিক্‌দিগন্তবিস্তৃত যীশুখ্রিস্টকে সত্যই কি কোথাও অনুসরণ করা যায় — কেবল সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মার ভিতর ছাড়া?

* ম্যাথিউ ৮ ঃ ১৯-২০ (বাইবেল)।

শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, পতঞ্জলি — এঁরাই হচ্ছেন প্রাচীন ভারতীয় অবতার। অগস্ত্য নামে দক্ষিণ ভারতের এক অবতারের নামে তামিল ভাষায় বহু কাব্যসাহিত্য রচিত হয়েছে। খ্রিস্টিয় যুগের পূর্বে এবং পরে বহু শতাব্দী ধরে তিনি নানা অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কথিত আছে যে, অদ্যাবধি তিনি নশ্বরদেহে বর্তমান।

ভারতবর্ষে বাবাজীর জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাববাদীদের বিশেষ কর্তব্য পালনে সহায়তা করা। শাস্ত্রীয় লক্ষণানুসারে তিনি 'মহাবতার' পদবাচ্য। তিনি বলেছেন যে, তিনি স্বামী সম্প্রদায়ের পুনর্গঠক জগৎগুরু শঙ্করাচার্য,* আর মধ্যযুগের মহাগুরু সন্ত কবীরকে যোগদীক্ষা দেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর প্রধান শিষ্য হচ্ছেন, লুপ্ত ক্রিয়াযোগের পুনরুদ্ধারক লাহিড়ী মহাশয়।

মহাবতার সর্বদা খ্রিস্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রয়েছেন; সর্বদাই তাঁরা যুক্তভাবে মুক্তির স্পন্দন প্রেরণ করছেন আর বর্তমান যুগে মুক্তির জন্য আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়ারও ব্যবস্থা করেছেন। এই দুই পূর্ণজ্ঞানী মহাগুরুদের একজন শরীরী আর অন্যজন অশরীরী। এঁদের কাজ হচ্ছে যুদ্ধ, জাতিবৈষম্য, ধর্মের গোঁড়ামি আর জড়বাদের অশুভ প্রতিক্রিয়া — এ সকল পরিত্যাগ করবার জন্য সকল জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা। বাবাজী আধুনিক কালের গতিপ্রকৃতি বেশ ভালরকমই জানেন, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব আর তার জটিলতা প্রসঙ্গে; এবং সেই সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে আত্মোন্নতিবিধায়ক যোগের ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেন।

বাবাজীর সম্বন্ধে যে কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় না, এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এর কারণ — কোন শতাব্দীতেই মহাগুরু কখনও প্রকাশ্যে আবির্ভূত হন নি। তাঁর যে যুগযুগান্তব্যাপী কর্মপ্রচেষ্টা,

* ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ যতীর শিষ্য শঙ্করাচার্য কাশীতে বাবাজী মহারাজের কাছ থেকে ক্রিয়াযোগ দীক্ষা প্রাপ্ত হন। লাহিড়ী মহাশয় এবং স্বামী কেবলানন্দজীকে এই কাহিনী বলবার সময় বাবাজী সেই জগদ্বরেণ্য অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্যের সহিত সাক্ষাতের বহু হৃদয়গ্রাহী ব্যাপারও বর্ণনা করেছিলেন।

তাতে প্রচার কার্যের চিত্তবিভ্রমকারী আলোর ধাঁধা লাগাবার কোন স্থানই নেই। একমাত্র নীরব মহাশক্তিমান বিশ্বস্রষ্টারই মত বাবাজী দীন আত্মগোপনের মাধ্যমে নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছেন।

শ্রীকৃষ্ণ বা যীশুখ্রিস্টের মত বিরাট ভাববাদীরা এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন বিশেষ লীলাপ্রদর্শনের জন্য, এবং তা শেষ হলেই তাঁরা অন্তর্ধান করেন। কিন্তু বাবাজী মহারাজের মত অন্যান্য অবতারেরা ইতিহাসে কোন একটি বিশেষ আর প্রধান ঘটনা সৃষ্টি করা অপেক্ষা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবজাতির ক্রমোন্নতি সাধিত করবার ব্যাপারেই নিযুক্ত থাকেন। এইরূপ মহাগুরুগণ জনতার স্থূলদৃষ্টি থেকে সর্বদাই আত্মগোপন করে থাকেন, আর ইচ্ছামাত্র অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতাও তাঁদের থাকে। এইসব কারণে আর যেহেতু তাঁরা নিজেদের শিষ্যবর্গকে তাঁদের সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করবার উপদেশ দেন সেইজন্যও, বহু বিরাট বিরাট আধ্যাত্মিক মহাপুরুষেরা জগতের কাছে অপরিচিত হয়েই থাকেন। এই বইয়ের কয়েকটি পাতায় আমি বাবাজীর জীবন সম্বন্ধে একটু আভাসমাত্র দেব — কেবলমাত্র সেই ঘটনাগুলিই উল্লেখ করবো, যা তিনি সাধারণের উপকারের জন্য প্রকাশ্যে বিবৃত করবার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেন।

বাবাজীর জন্মস্থান বা তাঁর পরিবারবর্গ বা সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের কৌতূহলনিবারক কোনও ক্ষুদ্র তথ্যও এতাবৎ আবিষ্কৃত হয় নি। সাধারণতঃ যদিও তিনি হিন্দীতে কথাবার্তা বলেন, তবুও তিনি যে কোন ভাষায় অবলীলাক্রমে আলাপ করতে পারেন। তিনি নিজে "বাবাজী"* এই অত্যন্ত সাদাসিধে নামটি গ্রহণ করেছেন। লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যেরা আরও যেসব সম্মানজনক উপাধিসংযোগে তাঁকে অভিহিত করেন, সেগুলি হলো — মহামুনি বাবাজী মহারাজ, মহাযোগী, ত্র্যম্বকবাবা, শিববাবা (সবই শিবাবতারের নাম)। পরামুক্ত, জন্মমৃত্যুবন্ধনের অতীত

---

* বাবাজী একটা সাধারণ উপাধি মাত্র। ভারতের বহু নামের প্রতি প্রযুক্ত এই বাবাজী নামের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের কারোরই সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু "বাবাজী" কোন সম্পর্ক নেই। মহাবতার বাবাজীর অস্তিত্বের বিষয় ১৯৪৬ সালে সর্বপ্রথম "অটোবায়োগ্রাফি অফ্ এ যোগী"তে প্রকাশিত হয়।

এই মহাগুরুর সংসারজীবনের কোন নাম আমাদের জানা নেই বলে কি কিছু আসে যায়?

লাহিড়ী মহাশয় বলতেন, "যখনই কেউ ভক্তিভরে বাবাজীর নাম উচ্চারণ করে, সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তের উপর বাবাজীর আধ্যাত্মিক আশীর্বাদ বর্ষিত হয়।"

অমর মহাগুরুর দেহে বয়সের কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হয় না। দেখলে তাঁকে পঁচিশ বছরের এক যুবা ছাড়া আর কিছুই বোধ হয় না। উজ্জ্বলবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, বাবাজীর অনিন্দ্যসুন্দর বলিষ্ঠ দেহ হতে একটা অপূর্ব জ্যোতিঃ বিনির্গত হচ্ছে। চক্ষু দু'টি ঘন কৃষ্ণবর্ণ, শান্ত, স্নিগ্ধোজ্জ্বল। তাঁর সুদীর্ঘ উজ্জ্বল কেশপাশ তাম্রবর্ণ। কখনও কখনও লাহিড়ী মহাশয়ের মুখের সঙ্গে বাবাজীর মুখের নিকট সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। সময় বিশেষে এই সাদৃশ্য এত অদ্ভুত হয় যে, পরবর্তীকালে লাহিড়ী মহাশয়, যুবকের মত দেখতে বাবাজী মহারাজের পিতা বলে অনায়াসে পরিচিত হতে পারতেন।

আমার সাধুপ্রকৃতি সংস্কৃতের শিক্ষক মহাশয় স্বামী কেবলানন্দজী, বাবাজী মহারাজের সঙ্গে হিমালয়ে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন।

কেবলানন্দজী আমায় বলেছিলেন, "সেই অদ্বিতীয় মহাগুরু হিমালয়ে তাঁর দলবল নিয়ে স্থান হতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করেন। তাঁর ছোট্ট দলটির মধ্যে খুব উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক অবস্থাসম্পন্ন দু'জন আমেরিকান শিষ্যও আছেন। কোন জায়গায় কিছুকাল থাকবার পরই বাবাজী বলেন, 'ডেরা ডাণ্ডা উঠাও!' তিনি হচ্ছেন দণ্ডধারী। তাঁর এই কথাগুলোই হচ্ছে দলবল সমেত তৎক্ষণাৎ স্থানান্তর গমনের নির্দেশ। সর্বদাই যে তিনি এইরূপ সূক্ষ্মভাবে পরিভ্রমণ করেন তা নয়, কখনও কখনও শিখর হতে শিখরান্তরে তিনি পদব্রজেই গমনাগমন করে থাকেন।

"তিনি ইচ্ছা করলে তবেই কেউ তাঁকে দেখতে বা চিনতে পারে, তা না হলে নয়। জানা গেছে যে, তিনি ঈষৎ পরিবর্তিত বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে তাঁর নানা শিষ্যদের সম্মুখে উপস্থিত হতেন — কখনও শ্মশ্রুগুম্ফ বিশিষ্ট, কখনও বা শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন। তাঁর অক্ষয়দেহ পোষণের জন্য কোন

প্রকার আহারের প্রয়োজন হয় না বলে তিনি কদাচিৎ কোনও খাদ্য গ্রহণ করেন। শিষ্যদের দর্শনদানের সময় লৌকিকতা হিসাবে কখনও কখনও তিনি ফল, পায়েস বা ঘৃতান্ন গ্রহণ করেন।"

কেবলানন্দজী বলতে লাগলেন, "বাবাজীর জীবনের দু'টি অতি আশ্চর্য ঘটনা আমার জানা আছে। পবিত্র বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য এক রাতে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড রচনা করা হয়েছে, তার চারপাশ ঘিরে শিষ্যেরা সব বসে আছে। মহাগুরু হঠাৎ একটা জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ড গ্রহণ করে অগ্নিকুণ্ডের নিকটে উপবিষ্ট জনৈক শিষ্যের স্কন্ধে মৃদু আঘাত করলেন।

"লাহিড়ী মহাশয় তখন সেখানে উপস্থিত। তিনি প্রতিবাদে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'এ কি মশায়, কি নিষ্ঠুর আপনি!'

"বাবাজী বললেন, 'ওর প্রাক্তন কর্মফলে ওকে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হয়। চোখের সামনে তুমি কি তাই দেখতে চাও?'

"কথাগুলি বলেই তিনি তাঁর পদ্মহস্ত সেই চেলাটির ক্ষতবিক্ষত কাঁধের উপর বুলিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'আজ রাতে আমি তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি দিলাম। সামান্য একটু আগুনে পোড়া থেকেই তোমার কর্মফল খণ্ডন হয়ে গেল।'

"আর একবার — বাবাজীর সঙ্গেকার সেই সাধুসঙঘকে জনৈক অপরিচিতের আগমনে বিশেষ বিব্রত হতে হয়েছিল। গুরুর আস্তানার কাছে, পাহাড়ের একটা দুর্গম পাড় বেয়ে লোকটা সে সময় আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সেই জায়গায় উঠে পড়েছিল।

"অপরিসীম ভক্তিতে উজ্জ্বলবদন আগন্তুক বাবাজীকে দেখেই বলে উঠল, 'প্রভু, আপনি নিশ্চয়ই সেই মহাগুরু বাবাজী! এইসব দুর্গম পাহাড়ে পর্বতে কতমাস ধরে যে আমি আপনাকে অবিরাম সন্ধান করে ফিরেছি, তা আর কি বলব। আপনার পায়ে পড়ি, দয়া করে আমায় আপনার শিষ্য করে নিন।"

"গুরুজী কোনই উত্তর দিলেন না দেখে লোকটি পায়ের নীচে এক গভীর পাহাড়ের খাদ দেখিয়ে বলল, 'যদি আপনি প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আমি এই পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়বো। ভগবানকে লাভ করতে

গেলে আপনার মত লোকের কাছ থেকেই যদি না উপদেশ পেলাম তবে আর আমার জীবনের মূল্য রইল কি?”

“বাবাজী ভাবলেশহীন মুখে শুধুমাত্র বললেন, ‘পড় তা হলে লাফিয়ে। তোমার এখনকার অবস্থায় আমি তোমায় গ্রহণ করতে পারি না।’

“লোকটি তৎক্ষণাৎ সেই পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে পড়ল। সেখানে উপস্থিত সাধুদের তো ভয়ে বিস্ময়ে বাক্‌শক্তি লোপ পেল। বাবাজী তাঁর হতবাক শিষ্যদের সেই অপরিচিতের দেহটি কুড়িয়ে আনতে বললেন। তাঁরা যখন ক্ষতবিক্ষত, পিণ্ডাকার দেহটি নিয়ে উপরে উঠে এলেন তখন সেই মহাগুরু আবার তাঁর দৈবহস্ত ঐ মৃতদেহের উপর বুলিয়ে দিলেন। আশ্চর্য! লোকটি চোখ দু'টি মেলে সেই সর্বশক্তিমান গুরুর পদতলে গভীর ভক্তির সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

“বাবাজী মহারাজ তখন তাঁর পুনরুজ্জীবিত চেলাটির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করে বললেন, ‘এখন তুমি শিষ্য হবার জন্যে উপযুক্ত হলে। তুমি খুব একটা কঠিন পরীক্ষা অতি সাহসের সঙ্গেই উৎরে গেছ।* মৃত্যু আর তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না; এখন তুমি আমাদের এই অমর সাধুসঙ্ঘের একজন হলে।’ তারপরেই তাঁর সেই সোজা কথা, ‘ডেরা ডাণ্ডা উঠাও’, আর সমগ্র দলটিও সঙ্গে সঙ্গে সেই পাহাড় থেকে অন্তর্ধান করল।

অবতার সর্বব্যাপী পরমাত্মাতেই অবস্থান করেন; তাঁর জন্য কোন দূরত্বেরই কোন পরিমাপ নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাবাজীর ভৌতদেহ ধারণ করবার একটি মাত্রই কারণ থাকতে পারে এবং তা হচ্ছে — মানবজাতিকে তার ভবিষ্যসম্ভাবনার প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেওয়া। মানুষ যদি রক্তমাংসের শরীরে দেবত্বের ক্ষণিক আভাসেরও আশা না পায়, তাহলে কখনও সে মরণ অতিক্রম করতে পারবে না — মায়ার এই গুরুতর ভ্রান্তির বশবর্তী হয়েই চিরকাল কাটিয়ে দিতে হবে।

---

* পরীক্ষাটি আনুগত্যের। যখন মহাজ্ঞানী গুরুমহারাজ বললেন, “পড় লাফিয়ে”, লোকটি তৎক্ষণাৎ তা পালন করল। যদি সে বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ করত তা হলে সে যে বাবাজীর নির্দেশ বিনা তার জীবন বৃথাই বলে মনে করে, তার এই দৃঢ় উক্তি প্রমাণিত হত না। যদি সে ইতস্ততঃ করত, তাহলে এটাই প্রকাশ পেত যে কখনই গুরুর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস তার নেই। কাজেই ব্যাপারটা অসাধারণ আর অতি কঠিন হলেও, এরূপ ক্ষেত্রে পরীক্ষাটি একটি আদর্শ পরীক্ষা।

যীশুখ্রিস্ট পূর্ব হতেই তাঁর জীবনধারার বিষয় অবগত ছিলেন। যে সব ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছে, তার প্রত্যেকটার ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর নিজের জন্য বা কর্মফলজনিত কারণে নয় — সবকিছু সহ্য করেছেন কেবলমাত্র চিন্তাশীল মানবজাতির উদ্ধারের জন্যে। তাঁর বাণীপ্রচারক চারজন শিষ্য ম্যাথ্যু, মার্ক, ল্যুক আর জন — তাঁর অমর নাট্যলীলা আগামী দিনের মানুষের উপকারের জন্যই লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বাবাজীর কাছেও অতীত, বর্তমান, আর ভবিষ্যৎ বলে কোন আপেক্ষিকতার ছেদ নেই; আদিকাল থেকেই তাঁর জীবনের সর্বাবস্থার কথা তিনি জানতেন। তবু মানবের সীমাবদ্ধ বোধশক্তির গ্রহণযোগ্য করে, তিনি এক বা একাধিক সাক্ষীর সম্মুখে, তাঁর দৈবজীবনের বহুলীলা প্রকটিত করেছেন। এইরূপ একটা ব্যাপার ঘটেছিল যখন বাবাজী মহারাজ তাঁর নশ্বর দেহের অমরত্বের সম্ভাবনা ঘোষণা করবার পক্ষে সময় উপস্থিত হয়েছে বলে বিবেচনা করলেন। সে সময় লাহিড়ী মহাশয়ের একজন শিষ্যও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই প্রতিশ্রুতি রামগোপাল মজুমদারের সমক্ষে করেছিলেন, যাতে করে ঘটনাটি অবশেষে সুবিদিত হয়ে অনুসন্ধিৎসু মনে অনুপ্রেরণা জাগায়। বড় বড় মহাত্মারা তাঁদের বাণী প্রদান করেও আপাতদৃশ্য স্বাভাবিক ঘটনার ধারাই অবলম্বন করেন — একমাত্র মানুষের মঙ্গলের কারণে। যীশুখ্রিস্টও ঐ কথাই বলেছেন, "পিতঃ ... আমি জানি যে তুমি আমার কথা সর্বদাই শুনে থাক; কিন্তু এই যে সব লোক চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের জন্যেই এ কথা বললাম, যাতে করে এরা বিশ্বাস করতে পারে যে তুমিই আমায় প্রেরণ করেছ।"*

রণবাজপুরের সেই "বিনিদ্র সাধু"† রামগোপাল বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তিনি বাবাজীর প্রথম দর্শনলাভের অদ্ভুত ঘটনাটি বর্ণনা করেছিলেন।

---

* জন ১১ ঃ ৪১-৪২ (বাইবেল)।

† সেই সর্বদর্শী যোগী যিনি তারকেশ্বর তীর্থে আমার মাথা না নোয়ানোর কথা জানতে পেরেছিলেন। (১৩শ অধ্যায়)

রামগোপালবাবু বলেছিলেন, "কখনও কখনও আমি নির্জন গুহা পরিত্যাগ করে কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়ের চরণপ্রান্তে এসে উপস্থিত হতাম। একদিন গভীর রাত্রে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নীরবে ধ্যানে বসেছি, গুরুদেব আমায় এক অদ্ভুত আদেশ করলেন, 'রামগোপাল, এক্ষুণি তুমি দশাশ্বমেধ ঘাটে চলে যাও।'

"অতিদ্রুত সেই নির্জন স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। উজ্জ্বল নক্ষত্র আর চন্দ্রালোকে রাত তখন হাসছে। খুব ধৈর্য ধরে চুপ করে অনেকক্ষণ বসে আছি, হঠাৎ পায়ের কাছেই একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। ধীরে ধীরে পাথরটা উপরে উঠতে লাগল, নীচে দেখা গেল মাটির তলায় একটি গুহা। কোন এক অজ্ঞাত উপায়ে পাথরটি উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর একটি সুসজ্জিতা অপরূপ রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী রমণীমূর্তি সেই গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে উচ্চে শূন্যে এসে দাঁড়ালেন। মূর্তিটির চতুর্দিক একটি মৃদুস্নিগ্ধ জ্যোতির্মণ্ডলে বেষ্টিত। ধীরে ধীরে তিনি অবতরণ করে আমার সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন — অন্তর গভীর ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন। অবশেষে একটু নড়েচড়ে আমায় অতি ধীর শান্তস্বরে বললেন, 'আমি মাতাজী,* বাবাজী মহারাজের ভগিনী। আমি তাঁকে আর লাহিড়ী মহাশয়কেও আজ রাত্রে আমার এই গুহায় আসতে বলেছি একটি গুরুতর বিষয় আলোচনা করবার জন্যে।'

"বলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে নীহারিকাপুঞ্জের মত যেন একটা আলোকপিণ্ড অতি দ্রুতবেগে গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়ে ভেসে আসছে দেখা গেল। সেই অপূর্ব জ্যোতিঃ গঙ্গার অস্বচ্ছ জলের উপর প্রতিফলিত হচ্ছিল। ক্রমশঃই সেটা নিকট হতে নিকটতর হতে লাগল, এবং অবশেষে নয়নান্ধকারী বিদ্যুৎস্ফুরণের মত একটা জ্যোতির্বিকাশে সেটা মাতাজীর পার্শ্বে এসে উপস্থিত হওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ তা ঘনীভূত হয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের মানবমূর্তিতে পরিণত হল। তিনি সেই মহাযোগিনী সাধ্বীর পদপ্রান্তে ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করলেন।

---

* মাতাজীও বহু শতাব্দী ধরে জীবিতা আছেন। তিনিও প্রায় তাঁর ভ্রাতার মতই আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্না। তিনি কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট মাটির নীচে এক গুপ্ত গুহার মধ্যে ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে অবস্থান করেন।

"এই অভুতপূর্ব বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আবার দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম যে, রহস্যময় একটি চক্রাকার আলোকপিণ্ড আকাশপথে পরিভ্রমণ করছে। সেই ঘূর্ণায়মান জ্বলন্ত অগ্নিপুঞ্জ আমাদের দলটির কাছে দ্রুতবেগে নেমে এসে একটি সুন্দর যুবকের দেহে পরিণত হল। দেখে তখনিই বুঝতে পারলাম যে ইনিই বাবাজী মহারাজ। দেখতে ঠিক লাহিড়ী মহাশয়েরই মত — একমাত্র পার্থক্য এই যে, বাবাজী মহারাজ দেখতে আরও অল্পবয়স্ক আর তাঁর ছিল উজ্জ্বল, সুদীর্ঘ কেশপাশ।

"লাহিড়ী মহাশয়, মাতাজী ও আমি সেই মহাগুরুর পুণ্য পাদপদ্মে নতজানু হয়ে প্রণাম নিবেদন করলাম। তাঁর সেই দৈবীতনু স্পর্শ করা মাত্র অবর্ণনীয় আনন্দগরিমার একটা স্বর্গীয়ানুভূতি আমার সকল সত্তা পরিপ্লাবিত করে তার প্রতি অণুপরমাণুকে পুলকাঞ্চিত করে তুললো।

"বাবাজী বললেন, 'কল্যাণীয়া ভগিনী, আমি আমার এ দেহ বিসর্জন দিয়ে পরব্রহ্মসাগরে বিলীন হতে মনস্থ করেছি।'

"সেই মহিমময়ী মিনতিভরা নয়নে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পূজ্যপাদ গুরুমহারাজ, আমি আপনার অভিপ্রায়ের আভাস ইতিমধ্যেই পেয়েছি। সেই জন্যেই আজ রাত্রে আমি আপনার সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই। দেহত্যাগ করবেন কেন বলুন তো?'

"'পরব্রহ্মসাগরে আমার আত্মার তরঙ্গ দৃশ্যই হোক আর অদৃশ্যই হোক — তাতে প্রভেদ কতটুকু?'

"মাতাজী এবার অপরূপ চতুরতার সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'মরণজয়ী গুরুদেব! যদি কোন প্রভেদ নাই থাকে, তবে দয়া করে আপনি আর কখনো দেহত্যাগ করবেন না।'*

---

* এই ঘটনা থেলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। জগদ্বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এই কথাই বলেছিলেন যে, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একজন সমালোচক জিজ্ঞাসা করেছিল, "তা হলে আপনি মরেন না কেন?" তাতে থেলস উত্তর দেন, "কারণও একই কথা, তাতেও কোন পার্থক্য নেই।"

"বাবাজী গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'তবে তাই হোক্। আমি কখনও আমার এ জড়দেহ আর পরিত্যাগ করব না। এই দেহ পৃথিবীতে, অন্ততঃ জনকতকের কাছেও সর্বদাই দৃশ্য হয়ে থাকবে। পরমেশ্বর তোমার মুখ দিয়েই তাঁর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন।'

"পরম শ্রদ্ধাস্পদ এই তিন ব্যক্তির কথোপকথন যখন সভয়ভক্তির সঙ্গে শুনছিলাম, সেই মহাগুরু তখন আমার দিকে ফিরে প্রসন্নভাবে বললেন, 'ভয় পেয়ো না রামগোপাল, এই অমর প্রতিজ্ঞার দৃশ্যে সাক্ষী হতে পেরে তুমি সত্যিই ভাগ্যবান।'

"বাবাজীর মধুর কণ্ঠস্বরের ঝঙ্কার শেষ হতে না হতেই তাঁর আর লাহিড়ী মহাশয়ের মূর্তি ধীরে ধীরে শূন্যে ভেসে উঠে দুলতে দুলতে গঙ্গার উপর দিয়ে আবার পিছু হটে চলল। নিশাকাশে তাঁদের দেহ অদৃশ্য হবার সময় অত্যুজ্জ্বল আলোকের একটা ছটা তাঁদের সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। মাতাজীর দেহও শূন্যে উঠে ভাসতে ভাসতে গুহার কাছে গিয়ে তার মধ্যে অবতরণ করল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডটিও নেমে এসে গুহা মুখটি আচ্ছাদিত করল — যেন কোন অদৃশ্য হস্তেরই এ কাজ।

"অপরিসীমভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ির দিকে ধীরে ধীরে ফিরে চললাম। পৌঁছলাম যখন, তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে; তাঁর সামনে গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতে তিনি সমস্তই বুঝে আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'রামগোপাল, আমি তোমার জন্যে আনন্দিতই হয়েছি। বাবাজী আর মাতাজীকে দর্শনের অভিলাষ যা তুমি আমার কাছে প্রায়ই ব্যক্ত করতে, অবশেষে তার একটা অত্যাশ্চর্য পরিণতি ঘটল।'

"আমার গুরুভাইয়েরা আমায় জানালেন যে, মধ্যরাত্রিতে আমি চলে যাবার পর থেকে লাহিড়ী মহাশয় তাঁর আসন থেকে বিন্দুমাত্রও নড়েন নি।

"একটি চেলা বললেন, 'আপনার দশাশ্বমেধ ঘাটে চলে যাবার পর তিনি অমরত্ব সম্বন্ধে একটি অপূর্ব ব্যাখ্যা প্রদান করলেন।' শাস্ত্রে লেখা সেই সত্য তখন সর্বপ্রথম পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম যে, পূর্ণ

ব্রহ্মজ্ঞান যাঁর লাভ হয়েছে, তিনি একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে দুই বা ততোধিক শরীরে আবির্ভূত হতে পারেন।

রামগোপাল বাবু তাঁর কাহিনীর সমাপ্তিতে বললেন, "লাহিড়ী মহাশয় পরে এই জগৎসংসার সম্বন্ধে গূঢ় দৈবপরিকল্পনার বহু দার্শনিক তথ্য আমায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমাদের এই জগৎসংসারের অবস্থিতিকাল পর্যন্ত বাবাজী স্বদেহে অবস্থান করবেন, এইটাই ভগবানের অভিপ্রায়। যুগযুগান্তর আসবে, আবার চলেও যাবে — কিন্তু আমাদের মরণবিজয়ী মহাগুরু* শতাব্দীর পর শতাব্দীর নাট্যাভিনয় দেখবার জন্য এই সংসার-নাট্যমঞ্চে উপস্থিত থাকবেন।"

---

* "সত্যসত্যই আমি তোমাদিগকে বলছি যে, কেউ যদি আমার বাক্য পালন করে (কূটস্থচৈতন্যে অখণ্ডভাবে অবস্থান করে), তাহলে তার কখনও মৃত্যুর সাক্ষাৎকার লাভ হবে না" (জন ৮ ঃ ৫১ (বাইবেল)।

এই কথাগুলিতে যীশুখ্রিস্ট জড়দেহে অমরজীবন লাভের কথা বলছেন না — যে একঘেয়ে জীবনের কারাবাসের শাস্তি পাপীদেরও দেওয়া যায় না, সাধুদের তো দূরের কথা! যীশুখ্রিস্ট যাঁর কথা বলছেন তিনি হচ্ছেন আত্মোপলব্ধ সেই লোক, যিনি অজ্ঞানের মহানিদ্রা হতে অনন্ত জীবনে উত্থিত হয়েছেন। (৪৩শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

মানুষের আসল প্রকৃতি হচ্ছে সর্বব্যাপী অরূপ আত্মা। বাধ্য হয়ে বা কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জড়দেহ ধারণ করা হচ্ছে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার ফল। হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা দেয় যে, জন্ম ও মৃত্যু মায়ারই লীলা বা প্রকাশ। জন্ম ও মৃত্যুর অর্থ কেবল আপেক্ষিক জগতেই সীমাবদ্ধ।

বাবাজী কোন জড়শরীরে বা মর্ত্যলোকে কোন বিশেষরূপে আবদ্ধ নন। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে এ পৃথিবীতে কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত আছেন।

স্বামী প্রণবানন্দজীর মত সদ্‌গুরুগণ, যাঁরা নব্যকলেবর ধারণ করে এই পৃথিবীতে ফিরে আসেন, তাঁরা নিজেরাই তার কারণ জানেন, অপর কেউ নয়। এ জগতে তাঁদের আবির্ভাব কর্মফলপ্রসূত নয়! এরূপ স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনকে 'ব্যুত্থান' অর্থাৎ মায়াপাশ ছেদ করে পার্থিব জীবনে প্রবেশ করা বোঝায়।

সাধারণ কি অসাধারণ — যেরূপ ভাবেই তাঁর দেহত্যাগ হোক না কেন, পূর্ণজ্ঞানী সদ্‌গুরু নূতনদেহ ধারণ করে জগৎবাসীদের চক্ষের সম্মুখে পুনরায় আবির্ভূত হতে পারেন। মহান সৃষ্টিকর্তা, যাঁর সৌরমণ্ডলীর সংখ্যা গণনা করা যায় না, সেই পরমেশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে জড়শরীর ধারণে অণুপরমাণুদের আকার দানে তাঁর শক্তির কোন অপচয় ঘটে না।

যীশুখ্রিস্ট ঘোষণা করেছেন, "আমি আপন প্রাণ সমর্পণ করি, যাতে করে পুনরায় আমি তা গ্রহণ করতে পারি। কোন মানুষ আমার কাছ থেকে তা গ্রহণ করে না — আমি নিজেই তা সমর্পণ করি। আমার তা সমর্পণ করবার ক্ষমতা আছে এবং তা পুনরায় গ্রহণ করারও ক্ষমতা আমার আছে।" (জন ১০ ঃ ১৭-১৮, বাইবেল)।

৩৪ পরিচ্ছেদ

হিমালয়ে প্রাসাদ সৃষ্টি

স্বামী কেবলানন্দজী একবার বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে এক অলৌকিক ব্যাপারের বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, "বাবাজীর সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ — সে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা! আর এই সব ঘটনা থেকেই সেই অমর গুরুর বিষয়ে বিস্তারিত অনেক কিছু জানতে পারা যায়।"

প্রথম যখন কেবলানন্দজী এ ঘটনা বিবৃত করেন, তখন তা শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই! এর পরে আরও বহু উপলক্ষ্যে আমি আমার সেই সদাশয় সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয়কে গল্পটি বলতে বলেছি, আর ঘটনাটি পরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীও মোটামুটি একইভাবে আমায় বলেছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের এই উভয় শিষ্যই তাঁদের গুরুমুখনিঃসৃত এই লোমহর্ষণ কাহিনী শুনেছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় বলেছিলেন, "বাবাজী মহারাজের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে যখন আমার বয়স তেত্রিশ বৎসর। ১৮৬১ সালের শরৎকালে সামরিক পূর্তবিভাগে হিসাবরক্ষক হিসেবে আমি দানাপুরে ছিলাম। একদিন সকালে অফিসে যেতে ম্যানেজার সাহেব ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'লাহিড়ী, আমাদের হেড অফিস থেকে একটি টেলিগ্রাম এসেছে। তোমায় রাণীক্ষেতে যেতে হবে, সেখানে সেনাদের একটা ঘাঁটি* তৈরী হচ্ছে।'

"একটি ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে চললাম রাণীক্ষেতে† — পাঁচশত মাইল রাস্তা। ঘোড়ার পিঠে ও এক্কাগাড়িতে করে আমাদের হিমালয়ে রাণীক্ষেত পৌঁছতে লাগল পুরো একটি মাস।

---

* পরে একটি সামরিক স্বাস্থ্যনিবাস। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতে টেলিগ্রাফে সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

† হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরগুলির অন্যতম নন্দাদেবীর (২৫,৬৬১ ফুট) পাদদেশে আলমোড়া জেলায় রাণীক্ষেত অবস্থিত।

"অফিসের কাজ যে খুব বেশি ছিল তা নয়। আমি সেই বিরাট পাহাড়পর্বতে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে বহু সময় কাটাতাম। লোকমুখে শোনা গেল — জায়গাটিতে খুব বড় বড় সাধুসন্ন্যাসীরা বাস করেন। তাঁদের দেখতে মনে বড়ই বাসনা হল। একদিন বিকেলের দিকে একটা পাহাড়ে বেড়াতে বেড়াতে শুনতে পেলাম খুব দূর থেকে আমার নাম ধরে কে যেন ডাকছে। শুনে তো ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলাম। যাইহোক, সেই পাহাড়ে — পাহাড়টার নাম ছিল দ্রোণগিরি — চড়াই ভেঙ্গে তখন খুব দ্রুত উঠতে লাগলাম। মনে মনে কিছুটা অস্বস্তিও বোধ হতে লাগল এই কারণে যে, জঙ্গলে যদি অন্ধকার নেমে আসে তা হলে আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া দুঃসাধ্য হবে!

"যাক্ — শেষপর্যন্ত একটা ফাঁকা জায়গায় উঠে এলাম, যার চারধারে সব ছোট ছোট গুহা। দেখি, সেই পাহাড়ের একটা উঁচু পাথরের উপর দাঁড়িয়ে একটি সহাস্যবদন যুবক, স্বাগত ভঙ্গীতে তাঁর হাতটি বাড়িয়ে রয়েছে। দেখে আরো আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে একমাত্র তামাটে রঙের তাঁর ঘন চুল ছাড়া আমার সঙ্গে তাঁর চেহারার এক অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য রয়েছে!

"সাধুটি সস্নেহে আমায় হিন্দীতে সম্বোধন করে বললেন, 'লাহিড়ী,* তুমি এসেছ! যাক্, এই গুহাতে এখন একটু বিশ্রাম কর; আমিই তোমায় ডাকছিলাম।'

"একটি পরিষ্কার ছোট্ট গুহাতে প্রবেশ করে দেখলাম যে, কতকগুলো পশমের কম্বল আর কমণ্ডলু সেখানে রয়েছে। একটা কোণে ছিল ভাঁজকরা একটি কম্বল — তা দেখিয়ে যোগীটি জিজ্ঞাসা করলেন

---

* লাহিড়ী মহাশয় তাঁর পূর্বজন্মে যে নামে পরিচিত ছিলেন বাবাজী মহারাজ প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সেই 'গঙ্গাধর' নামেই সম্বোধন করেছিলেন। গঙ্গাধর (অর্থাৎ যিনি গঙ্গানদীকে ধারণ করেন) হ'ল পরমেশ্বর শিবেরই একটি নাম। পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়েছে — এই পবিত্র গঙ্গানদী স্বর্গ হতে অবতরণ করেছেন।

এই অবতরণের বেগ ধারণ করতে পৃথিবী অসমর্থ হবে — এরূপ চিন্তা করেই শিব গঙ্গার বারিবেগকে স্বীয় জটাজুটের মধ্যে ধারণ করেন এবং পরে তাকে মুক্ত করে দেন করুণাধারায় মর্ত্যে প্রবাহিত হবার জন্যে। গঙ্গাধর শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ হচ্ছে : "মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রবহমান 'জীবন নদী'র গতিবেগকে নিয়ন্ত্রিত করার বিষয়ে যিনি সমর্থ।"

'লাহিড়ী, তুমি ঐ আসনটিকে চিনতে পার?' বললাম, 'না, মশায়!' তারপর আমার দুঃসাহসিক কাজে কতকটা যেন ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েই বললাম, 'আমায় এখনই যেতে হবে, রাত এসে পড়ল। সকালে অফিসে অনেক কাজ আছে।'

"সেই রহস্যময় সাধুটি তখন ইংরেজিতে উত্তর দিলেন, 'অফিসকেই তোমার জন্যে এখানে আনা হয়েছে, তোমাকে অফিসের জন্যে নয়, বুঝলে?'

"শুনে অবাক হয়ে গেলাম — এই অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীটি শুধু ইংরেজিতেই কথাবার্তা বলতে পারেন যে তা নয়, যীশুখ্রিস্টের বাণীর ভাবার্থও করতে পারেন।* তারপর বললেন, 'দেখছি যে আমার টেলিগ্রামের ফল ফলেছে।' যোগীটির কথাগুলি আমার কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য ঠেকল, তাই এ কথার মানে কি জিজ্ঞাসা করলাম।

"'আমি তোমার সেই টেলিগ্রামের কথা বলছি যা পেয়ে তুমি এই নির্জন প্রদেশে এসেছ। আমিই তোমার উপরওয়ালার মনে নীরবে এই ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছিলাম যে তোমার এখন রাণীক্ষেতে বদলি হওয়া দরকার। মানবজাতির সঙ্গে যার মনের গভীর ঐক্য সংসাধিত হয়েছে, তার কাছে সব মনই সংবাদপ্রেরক যন্ত্রের মত হয়ে দাঁড়ায়, আর তার মধ্য দিয়ে সে তার ইচ্ছামত কাজ করতে পারে।' তারপর তিনি শান্তস্বরে বললেন, 'লাহিড়ী, নিশ্চয়ই এই গুহা তোমার কাছে পরিচিত বলেই বোধ হচ্ছে?'

"হতবুদ্ধি হয়ে নিস্তব্ধভাবে বসে রয়েছি, এমন সময় সাধুটি কাছে এসে আমার কপালে মৃদুভাবে আঘাত করলেন। তাঁর হস্তের চৌম্বকস্পর্শে আমার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে একটা অদ্ভুত প্রবাহ বয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আমার পূর্বজীবনের বহু ছোটখাট মধুরস্মৃতি মনের মধ্যে জাগরিত হয়ে উঠল।

"আনন্দের আবেগে অবরুদ্ধস্বরে বললাম, 'মনে পড়েছে, মনে পড়েছে! আপনিই আমার গুরু বাবাজী, আহা, চিরজনমেরই আপনি

---

* যীশুখ্রিস্ট বলেছিলেন, "বিশ্রামদিবস মানুষের জন্যেই সৃষ্ট হয়েছে — মানুষ তার জন্যে নয়।" মার্ক ২ঃ২৭ (বাইবেল)।

আমার। এখন মনে অতীতের সব দৃশ্য স্পষ্ট জেগে উঠছে — আমার গতজীবনে বহু বছর ধরে এইখানে, এই গুহাতেই আমি অতিবাহিত করেছিলাম।' অনির্বচনীয় স্মৃতির উচ্ছ্বাসে অভিভুত হয়ে আমি সাশ্রুনয়নে আমার গুরুদেবের পদযুগল ধারণ করলাম।

"স্বর্গীয় প্রেমে বিগলিতকণ্ঠে বাবাজী বললেন, 'তিরিশ বছরেরও বেশি সময়ধরে আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি — অপেক্ষা করছি এই জন্যে যে তুমি আবার আমার কাছে ফিরে আসবে। কিন্তু তুমি পালিয়ে গেলে আমার কাছ থেকে; পালিয়ে গিয়ে, মরণের পারে যে নতুন জীবনের উদ্দাম স্রোত বইছে সেই স্রোতের মধ্যে তুমি অদৃশ্য হলে। প্রাক্তনকর্মের যাদুদণ্ড তোমায় স্পর্শ করল, আর তুমি হলে অদৃশ্য। তুমি আমায় দেখতে না পেলেও আমি কিন্তু তোমার উপর বরাবরই নজর রেখে এসেছি। স্বর্গের মহিমময় দেবদূতেরা যে জ্যোতিঃসাগর পরিক্রমণ করেন, সেখানেও তোমাকে অনুসরণ করেছি। ঘনান্ধকার, প্রবল ঝড়, ভীষণ উত্থানপতন, বা অনন্ত আলো — সবারই ভিতর দিয়ে তোমায় অনুসরণ করে এসেছি — পক্ষিমাতা তার শাবককে রক্ষা করবার জন্যে যেমন করে ছুটে আসে, তেমনি মাতৃজঠরে অবস্থানকাল কাটিয়ে শিশুরূপে যখন তুমি ভূমিষ্ঠ হলে, আমার দৃষ্টি তখন সতত তোমার উপর নিবদ্ধ ছিল। ঘূর্ণির বালুভূমিতে পদ্মাসনে বসে যখন ছোট্ট দেহটিকে বালির মধ্যে ঢাকা দিতে, তখনও আমি অদৃশ্যভাবে সেখানে উপস্থিত থাকতাম। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আমি এই শুভদিনটির জন্যে প্রতীক্ষা করে তোমার উপর নজর রেখে আসছি; এখন তুমি আমার কাছে এসেছ। এই তোমার কতকালের সাধের পুরানো গুহা! আমি তোমার জন্যেই একে সর্বদা পরিষ্কার করে রেখে এসেছি। এই তোমার পবিত্র কম্বলাসন, যার উপর তুমি অন্তরে ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য প্রত্যহ ধ্যানে বসতে। ঐ দেখ তোমার পাত্র, যাতে করে তুমি আমার তৈরী সুধা পান করতে। আবার দেখ, তোমার পিতলের কমণ্ডলুটি কেমন ঝকঝকে করে রেখেছি, যাতে করে আবার তুমি এ থেকে পান করতে পার। বৎস আমার! এখন সব বুঝতে পারছ কি?'

"'গুরুদেব! আমি আর কি বলব, বলুন?' কোন গতিকে অস্ফুটস্বরে কথা ক'টি বললাম, 'এরূপ অমর প্রেমের কথা কে কোথায় কবে শুনেছে?' আমার জীবনমরণের গুরু, আমার চিরন্তন পরমনিধি — আমি চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে অসীম অবর্ণনীয় আনন্দে, অপরিসীম শ্রদ্ধায়!

"'লাহিড়ী, তোমার শুদ্ধি দরকার। এই বাটি থেকে খানিকটা তেল নিয়ে খেয়ে ফেল। তারপর নদীর ধারে গিয়ে শুয়ে থাক।'

"বাবাজী হচ্ছেন কাজের লোক, সে কথা স্মরণ করে একটু হাসলাম। কাজের কথা তাঁর সবার আগে।

"তাঁর আজ্ঞা পালন করতে গেলাম। হিমালয়ের তুহিনশীতল রাত্রি যদিও তখন নেমে আসছে, তবুও বেশ আরামদায়ক উষ্ণতার একটা আভ্যন্তরীণ বিচ্ছুরণ যেন আমার শরীরের প্রতি কোষে স্পন্দিত হতে লাগল। আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম ঃ এই অজানা তেলটুকুতে কি কোন প্রকার আকাশের উত্তাপ সঞ্চিত আছে?

"অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া আমার শরীরের উপর হু হু করে বইতে লাগল! প্রস্তরময় নদীতীরে লম্বমান আমার দেহের উপর দিয়ে গোগশ নদীর হিমশীতল তরঙ্গমালা অবিরত বয়ে যেতে লাগল। কাছেই কোথাও বাঘের ভীষণ গর্জন মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। মনে কিন্তু আমার তখন এতটুকুমাত্রও ভয় নেই; আমার মধ্যে নবজাত তাপবিকিরণশক্তি মনে দুর্ধর্ষ সাহস এনে দিল। অতি দ্রুত কয়েকঘণ্টা কেটে গেল; গতজীবনের অস্পষ্টস্মৃতি আর এ'জীবনে আমার গুরুদেবতার সঙ্গে পুনর্মিলনের চিন্তা নিয়ে মনে মনে উজ্জ্বল কল্পনার জাল বুনে চললাম।

"আমার একান্ত চিন্তায় বাধা পড়ল — দূরাগত কোন লোকের পদধ্বনি ক্রমশঃই নিকটতর হয়ে আসছে। অন্ধকারে একটি মানুষের হাত সযত্নে আমাকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল, এবং তারপর পরার জন্যে কিছু শুকনো কাপড়-চোপড়ও দিল।

লোকটি বলল, 'এস ভাই, গুরুদেব তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

"জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লোকটি আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। তমসাচ্ছন্ন রাত্রির বুকে কোথাও দূরে একটা স্থির উজ্জ্বলপ্রভা হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'সূর্য উঠল না কি? কই রাত তো এখনও শেষ হয় নি।'

"আমার পথপ্রদর্শক মৃদু হেসে বলল, 'এখন মধ্যরাত্রি। ঐ যে দূরের আলো দেখা যাচ্ছে, ও হচ্ছে আমাদের অদ্বিতীয় মহাগুরু বাবাজী মহারাজের দ্বারা এই রাত্রেই তৈরী একটি সোনার রাজপ্রাসাদের আলোর ছটা। সুদূর অতীতে তুমি একবার রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য দেখবার বাসনা করেছিলে। আমাদের গুরুদেব তাই তোমার সেই ইচ্ছা আজ পূরণ করছেন — তাতে করে তোমার শেষ কর্মবন্ধন আজ ছিন্ন হল।'* 'এই অপূর্ব রাজপ্রাসাদেই আজ রাত্রে তুমি "ক্রিয়াযোগে" দীক্ষিত হবে। তোমার সব গুরুভাইয়েরা আজ তোমার দীর্ঘনির্বাসনের পরিসমাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ করছে, চেয়ে দেখ!'

"আমাদের চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল স্বর্ণনির্মিত, অসংখ্য মণিমাণিক্যখচিত এক বিরাট রাজপ্রাসাদ। চতুর্দিকে মনোরম উদ্যানবেষ্টিত শান্ত সরোবরে যা প্রতিবিম্বিত — সে এক অতুলনীয় অনুপম সৌন্দর্য। সূক্ষ্ম কারুকার্যময় বিরাট তোরণসমূহ বৃহদাকৃতি ও অত্যুজ্জ্বল হীরা, মুক্তা, নীলা, পান্না প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরে খচিত। দেবতার মত রূপবান পুরুষেরা সব দ্বারে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। পদ্মরাগমণির রক্ত আভায় দ্বারসকল রক্তিমবর্ণ।

"সঙ্গীটির সঙ্গে একটি প্রশস্ত অভ্যর্থনাকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলাম। বায়ুতরঙ্গে ধূপধুনা আর গোলাপের সুগন্ধ ভেসে আসছে; ক্ষীণ প্রদীপগুলি থেকে নানা বিচিত্রবর্ণের মৃদু স্নিগ্ধ আলোর সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভক্তদল কেউ শ্যাম, কেউ বা গৌরবর্ণ, — মধুর স্বরে স্তোত্র পাঠ করে চলেছেন অথবা নীরব ধ্যানে উপবিষ্ট, হৃদয়ের শান্তিতে নিমগ্ন। সেখানকার আবহমণ্ডলে যেন উচ্ছল আনন্দের আবেগকম্পন!

---

* কর্মবিধি অনুসারে প্রত্যেক মানবের বাসনাকামনার চরম পরিপূর্ণতা লাভ হওয়া চাই। এই অনাধ্যাত্মিক বাসনাকামনাই হচ্ছে পুনর্জন্মগ্রহণচক্রে বন্ধনের শৃঙ্খল।

"দেখে শুনে অবাক হয়ে বিস্ময়ে অস্ফুটধ্বনি করে উঠছি দেখে আমার পথপ্রদর্শকটি সহানুভূতির সঙ্গে মৃদু হেসে বললেন, 'দেখ, দেখ, ভাল করে চারদিক বেশ করে চোখ মেলে দেখ। কারণ এ কেবলমাত্র তোমার সম্মানের জন্যেই এখানে তৈরী হয়েছে।' আমি বললাম, 'ভাই, এই রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য মানুষের কল্পনারও অতীত। এর সৃজন রহস্যটুকু আমায় খুলে বলুন না!'

"সঙ্গীটির কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু দু'টি জ্ঞানের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠল; তিনি বললেন, 'খুব আনন্দের সঙ্গেই তোমায় আজ সব বলব! শোন, বস্তুতঃ এর সৃষ্টির মূলে অবোধ্য বলে কিছুই নেই। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার চিন্তার প্রতিরূপ। এই যে ভারী, মাটির তৈরী পৃথিবীগ্রহ শূন্যে ভাসমান — এ ত' ঈশ্বরের স্বপ্নমাত্র! তিনি তাঁর মন থেকে এ সব তৈরী করেছেন — মানুষ যেমন তার স্বপ্নবোধ থেকে অধিবাসী সমস্ত প্রাণীসমেত একটা স্বপ্নজগৎ তৈরী করে তা প্রত্যক্ষ করেন — ঠিক তেমনি।

"ঈশ্বর প্রথমে এই জগৎ তৈরী করেছিলেন একটা ভাব নিয়ে। তারপর তাতে তিনি প্রাণ সঞ্চার করলেন; আণবিক শক্তি ও তারপর জড়ের উদ্ভব হল। তারপর সেই পরমাণুগুলি সুসমঞ্জসভাবে সজ্জিত করে এই নিরেট মাটির জগৎ তৈরী হল। এর যাবতীয় অণুপরমাণু, তাঁরই ইচ্ছাশক্তিবলে পরস্পর দৃঢ়সন্নদ্ধ। যখন তিনি ইচ্ছা সংবরণ করে নেবেন, তখন আবার এই পৃথিবীর অণুপরমাণু বিলীন হয়ে শক্তিতে পরিণত হবে — আণবিক শক্তি আবার তার উৎস চৈতন্যে ফিরে যাবে। তাতে করে এই জগৎপরিকল্পনা দৃশ্য অবস্থা থেকে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

"স্বপ্নের যে সার, স্বপ্নদ্রষ্টার অন্তর্জ্ঞান চিন্তা থেকেই তা উদ্ভূত হয়। জাগ্রত অবস্থায় যখন সেই সংহতিকারক চিন্তা অপসারিত হয়, তখন সেই স্বপ্ন আর তার উপাদানসমূহ বিলীন হয়ে যায়। মানুষ চোখ বন্ধ করে স্বপ্নে কিছু একটা সৃষ্টি করে, যা আবার জেগে উঠে বিনা আয়াসে সে লোপ করে দেয়! সে ঈশ্বরের আদি দৈব কল্পনাই অনুসরণ করে মাত্র, আর কিছু নয়। একইভাবে যখন সে ব্রহ্মচেতনায় জাগরিত হয়, তখন সে বিনা আয়াসে এই জগৎমায়াস্বপ্ন ঘুচিয়ে দিতে পারে।

"সেই সর্বার্থসাধক অনন্ত ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে একীভূত হয়ে বাবাজী সৃষ্টির মূল উপাদান অণুপরমাণুদের সংহত করে যে কোন আকারে প্রকাশিত করতে পারেন। মুহূর্তমধ্যে প্রস্তুত এই স্বর্ণনির্মিত রাজপ্রাসাদ, এ প্রকৃতই সত্য — আমাদের এই বিশ্বজগৎ যতটা বাস্তবসত্য — ঠিক তেমনি! ঈশ্বর যেমন এই পৃথিবী সৃষ্টি করে তাকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করে আছেন, বাবাজীও তেমনি তাঁর মন থেকে এই প্রাসাদ রচনা করে তাঁর ইচ্ছাশক্তিবলে এর অণুপরমাণুদের সংহতি রক্ষা করে তাকে ধারণ করে আছেন।' অতঃপর তিনি বললেন, 'আবার এর কাজ যখন ফুরিয়ে যাবে, বাবাজীর ইচ্ছায় তখন এও অদৃশ্য হয়ে যাবে!'

"সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলাম! আমার পথপ্রদর্শক মহাশয় এক বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীসহকারে বললেন, 'এই যে দীপ্তোজ্জ্বল রাজপ্রাসাদ, নানা বহুমূল্য প্রস্তরে অপরূপ কারুকার্যখচিত, এ কোন মানবপ্রচেষ্টায় নির্মিত হয় নি, অথবা বহু পরিশ্রমে খনি থেকে তোলা স্বর্ণ বা হীরকাদিতেও রচিত হয় নি। এ মানবশক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করে সগর্বে উন্নতশিরে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান!* যে নিজেকে ঈশ্বরের সন্তান বলে প্রকৃতই উপলব্ধি করতে পেরেছে ... বাবাজী যেমন করেছেন, তেমনি সে তার অন্তর্নিহিত অসীম শক্তিবলে যে কোন উদ্দেশ্যসাধন করতে পারে। অত্যন্ত সাধারণ একটুকরো পাথরের ভিতর যেমন বিরাট আণবিকশক্তির রহস্য† লুক্কায়িত রয়েছে, ঠিক তেমনি মানুষের ভিতরেও দৈবশক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার লুকান আছে!'

"অতঃপর মুনিবর নিকটস্থ একটা টেবিলের উপর থেকে একটি পরম রমণীয় পুষ্পাধার তুলে নিলেন, যার হাতলটি উজ্জ্বল হীরকখচিত। তারপর সেটি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমাদের মহাগুরু কোটি কোটি মুক্ত ব্যোমরশ্মি ঘনীভূত করে এই প্রাসাদটি সৃষ্টি করেছেন। এই ফুলদানি

---

* "অলৌকিক ঘটনা কি? — সে যে নিন্দা তিরস্কার, মানবজাতিকে তীব্র উপহাস।" — এডওয়ার্ড ইয়ং প্রণীত 'নাইট থট্স'।

† জড়ের আণবিকগঠনের তত্ত্ব 'বৈশেষিক' আর 'ন্যায়দর্শনে' আলোচিত হয়েছে। "প্রতি অনুকণার ভিতরকার শূন্যস্থানে বিরাট বিশ্ব সব লুক্কায়িত রয়েছে — সূর্যকিরণের ভিতর যেমন কোটি কোটি ধূলিকণা ভেসে বেড়ায়" — যোগবশিষ্ঠ।

আর তার হীরকগুলি স্পর্শ করে দেখ — তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির সব পরীক্ষাগুলোতেই তা উৎরে যাবে।'

"ফুলদানিটি নিয়ে পরীক্ষা করলাম — এর মণিরত্নগুলি রাজারাজড়াদের সংগ্রহ করার উপযুক্ত। তারপর উজ্জ্বল চাকচিক্যবিশিষ্ট স্থূল কনকনির্মিত সেই ঘরের মসৃণ দেওয়ালের উপর হাত বুলিয়ে দেখলাম। মনে একটা গভীর সন্তোষ সঞ্চারিত হল। আমার বহু অতীত জীবনের অবচেতনার মধ্যে লুক্কায়িত একটা অবরুদ্ধ কামনা — সঙ্গে সঙ্গে মনে হল তা পরিতৃপ্ত হয়ে একেবারে নির্মূল হয়ে গেল!

"আমার রাজকীয় সহচর নানাকারুকার্যখচিত খিলান ও দীর্ঘ দালানের ভিতর দিয়ে আমায় সঙ্গে নিয়ে সম্রাটের প্রাসাদের মত বহুমূল্য উপকরণে সুসজ্জিত কতকগুলি কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এক বিশাল হলঘরে আমরা প্রবেশ করলাম। মধ্যস্থলে একটি স্বর্ণসিংহাসন স্থাপিত — নানা মণিমাণিক্যখচিত। তা থেকে নির্গত নানাবর্ণের উজ্জ্বল দ্যুতি চতুর্দিককে আলোকিত করে রেখেছে। সেখানে পদ্মাসনে উপবিষ্ট আমাদের গুরুদেব বাবাজী মহারাজ। আমি সেই চক্‌চকে মেঝের উপর তাঁর পদতলে নতজানু হয়ে বসলাম।

"'লাহিড়ী, এখনও কি তুমি তোমার সোনার রাজপ্রাসাদের স্বপ্নকামনায় বিভোর হয়ে রয়েছ?' গুরুদেবের চক্ষু দু'টি তাঁর তৈরী নীলার মতই জ্যোতি বিকিরণ করছিল। গুরুদেব বললেন, 'জাগো, বৎস জাগো, তোমার সব পার্থিব আকাঙক্ষা এখন চিরতরে মিটে যেতে চলেছে!' তারপর তিনি কতকগুলি দুর্বোধ্য মন্ত্রে আশীর্বচন উচ্চারণ করে বললেন, 'বৎস, ওঠ। "ক্রিয়াযোগে"র সাহায্যে ভগবৎ রাজ্যের সান্নিধ্যলাভের দীক্ষা নাও।'

"বাবাজী তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করলেন; চারিদিকে ফল ও পুষ্প বেষ্টিত এক হোমকুণ্ডে হোমাগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। সেই জ্বলন্ত অগ্নিবেদীর সম্মুখে আমি কৈবল্যদায়িনী যোগপ্রণালীর শিক্ষালাভ করলাম।

"অতি প্রত্যুষেই সমগ্র অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হল। সেই ভাবাবেশ অবস্থায় আমার ঘুমের আর কোন প্রয়োজনই বোধ হল না; আমি প্রাসাদের চতুর্দিকে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করতে লাগলাম। চারিদিকই অমূল্য ধনরত্ন

আর অপূর্ব কারুশিল্পের দ্রব্যসম্ভারে সুসজ্জিত। তারপর আমি উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করলাম। লক্ষ্য করলাম যে, গতকাল যা দেখেছিলাম, অতি নিকটেই সেইসব একই গুহা আর তরুলতাগুল্মবিহীন পর্বতের পাড়গুলি সব রয়েছে; কিন্তু গতকাল তাদের সংলগ্ন প্রাসাদ বা পুষ্পবীথির কোন চিহ্নই ছিল না।

"তুষারশীতল হিমালয়পর্বতের সূর্যকিরণে সেই প্রাসাদে পুনঃপ্রবেশ করে গুরুদেবের অন্বেষণ করলাম। তখনও তিনি সিংহাসনে সমাসীন — চতুর্দিকে বহু শিষ্যমণ্ডলী তাঁকে বেষ্টন করে নীরবে উপবিষ্ট।

"বাবাজী বললেন, 'লাহিড়ী, তোমার এখন ক্ষিধে পেয়েছে, বুঝতে পাচ্ছি। আচ্ছা, চোখ বোজো ......'

"চোখ খোলবার পর দেখি যে, সেই মায়াপ্রাসাদ আর তার উদ্যান — সবই অদৃশ্য হয়েছে। আমার নিজদেহ, বাবাজী এবং তাঁর শিষ্যগণের মূর্তিসব এখন ঠিক যে স্থানে প্রাসাদটি অবস্থিত ছিল — সেখানকার উন্মুক্ত ভূমিতে উপবিষ্ট রয়েছে। জায়গাটা সেই পর্বতগুহার সূর্যালোকিত প্রবেশপথ থেকে বেশি দূরে নয়। মনে পড়ে গেল, আমার পথপ্রদর্শক তো আগেই বলেছিলেন যে প্রাসাদটি কাজ শেষ হয়ে গেলেই আবার অদৃশ্য হয়ে যাবে, আর এর সংহত অণুপরমাণুগুলি যেখান থেকে তাদের উৎপত্তি হয়েছিল, সেই সব ভাবরূপেই বিলীন হয়ে যাবে। হতভম্ব হয়ে পড়লেও, আমি পূর্ণবিশ্বাসের সঙ্গেই গুরুর দিকে তাকালাম। কি জানি, আজকের এই ভোজবাজির দিনে আবার যে কি ঘটতে পারে তা তো বলতে পারি না।

"বাবাজী বললেন, 'যে উদ্দেশ্যে প্রাসাদটি তৈরী হয়েছিল তা এখন শেষ হয়েছে।' তিনি ভুঁই হতে একটা মাটির হাঁড়ি তুলে নিয়ে আমায় বললেন, 'এর ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেখ, যা তোমার খেতে ইচ্ছে হবে, তাই-ই পাবে। নাও, শুরু কর।'

"শূন্য মাটির হাঁড়িটা ছুঁতেই গরম গরম গাওয়াঘিয়ে ভাজা লুচি, নানারকম মুখরোচক তরকারী আর বহুবিধ মিষ্টান্ন তার ভিতরে এসে গেল। খেতে লাগলাম ...... দেখি যে হাঁড়িটা আর ফুরোয় না। খাওয়া শেষ

হলে জলের জন্যে চারিদিকে তাকালাম। গুরুদেব সামনের সেই হাঁড়িটাই দেখিয়ে দিলেন। আশ্চর্য! খাবারগুলো তখন সব অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর তার জায়গায় রয়েছে নির্মল শীতল জল।

"বাবাজী বললেন, 'অতি অল্পলোকেই জানে যে ভগবানের রাজ্যের ভিতর আমাদের এইসব পার্থিব প্রয়োজনের রাজ্যও আছে। ঈশ্বরের রাজ্য আমাদের এ জগৎসংসারেও বিস্তৃত; কিন্তু এ জগৎসংসার সবই মায়াময় বলে, এতে সত্যের কোন সার নেই, বুঝলে?'

"বললাম, 'পূজনীয় গুরুদেব, স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে যে সৌন্দর্যের সংযোগ রয়েছে, তা কাল রাত্রে আপনি আমায় দর্শন করালেন।' তারপরে সেই অদৃশ্য প্রাসাদের কথা স্মরণ করে মনে মনে এই ভেবে হাসলাম যে, এরূপ প্রত্যক্ষ বিলাসিতার মধ্যে আত্মার সুমহান আর গূঢ়তত্ত্ব বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন সাধারণ যোগী এমনভাবে দীক্ষা পান নি। বর্তমান দৃশ্যের বাস্তবতার দিকে তেমনি শান্তভাবেই তাকাতে লাগলাম। তৃণশষ্পবিহীন ভূমি, উন্মুক্ত আকাশ, মানুষের আদিম আশ্রয় পর্বতগুহা — সবই আমার চতুষ্পার্শ্বের দেবদূতেদের মত সাধুসন্তদিগের স্বাভাবিক পরিবেশ বলেই বোধ হল।

'সেই দিন বিকালে আমি আমার কম্বলাসনে বসে আছি — অতীত জীবনের ঈশ্বরোপলব্ধিপূত। আমার গুরুদেবতা কাছে এসে মাথার উপর হাত বুলিয়ে দিলেন। তাঁর পুণ্যহস্তস্পর্শে আমি 'নির্বিকল্প সমাধির' অবস্থায় প্রবেশ করলাম। এই অবস্থায় আমি একাদিক্রমে সাতদিন ছিলাম। আত্মজ্ঞানের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আমি মৃত্যুহীন পরমসত্যের রাজ্যে প্রবেশলাভ করলাম। মায়ার সব সীমাবদ্ধতা দূর হয়ে গেল। আমার আত্মা পরমাত্মবেদিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

"অষ্টম দিবসে আমি গুরুদেবের শ্রীচরণে প্রণিপাত করে কাতর আবেদন করলাম, যেন তিনি আমাকে এই পবিত্র বনভূমিতে সর্বদাই নিজের সঙ্গে রাখেন।"

"বাবাজী আমায় আলিঙ্গন করে বললেন, 'বৎস, এ জনমে তোমাকে বাইরের দর্শকমণ্ডলীর সামনেই অভিনয় করে যেতে হবে। তোমার

বহুজনমের নির্জন সাধনার আশীর্বাদপূত হলেও এ জীবনে তোমায় এ সংসারের মানুষদের মধ্যেই থাকতে হবে।'

"'বিয়ে হয়ে গিয়ে তোমার ছোটখাট একটি সংসারের আর সেইসঙ্গে তার দায়িত্বের ভার না পাওয়া পর্যন্ত এবারে আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হয় নি, তার মধ্যে একটা গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। হিমালয়ে আমাদের এই গোপন ছোট্ট দলটিতে যোগদান করবার ইচ্ছা এখন পরিত্যাগ কর; একজন আদর্শ গৃহীযোগীর উদাহরণস্বরূপ তোমার জীবন জনবহুল সংসারের ভিতরেই কাটাতে হবে।'

"তিনি বলে যেতে লাগলেন ঃ 'সংসারের বহু বিভ্রান্ত নরনারীর হতাশ ক্রন্দন বৃথাই মহাজনদিগের কর্ণে প্রবেশ করে নি। বহু আগ্রহশীল আর অনুসন্ধিৎসু লোকেদের "ক্রিয়াযোগে"র দ্বারা আধ্যাত্মিক শান্তি এনে দেবার জন্যেই তুমি নির্বাচিত হয়েছ। লক্ষ লক্ষ লোক, যারা পারিবারিক বন্ধনে আর সংসারের গুরুভারে বিব্রত — তোমারই মত যারা গৃহী, তারা তোমাকে দেখে মনে আবার নতুন আশা পাবে। যোগমার্গের সর্বোচ্চ অবস্থা যে গৃহস্থের পক্ষে অপ্রাপ্য নয়, তার পথ তোমাকেই প্রদর্শন করতে হবে। এই সংসারের ভিতরেই, কোন যোগী যদি তার নিজের ব্যক্তিগত কামনাবাসনা বা আসক্তি পরিত্যাগ করে আপন কর্তব্যসমূহ বিশ্বস্তভাবে পালন করে, তাহলে সে জ্ঞানদীপ্তির সুনিশ্চিত পন্থাই অবলম্বন করে।'

"'সংসার ত্যাগ করতে বাধ্য হবার তোমার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ অন্তরে তোমার কর্মবন্ধন সব ছিন্ন হয়ে গেছে। তুমি এ জগতের লোক না হলেও, তবু তোমায় এর ভিতরেই থাকতে হবে। এখনও তোমাকে অনেকদিন পারিবারিক, কর্মজীবন, নাগরিক অথবা আধ্যাত্মিক কর্তব্যসকল বিশ্বস্তভাবে পালন করতে হবে। সংসারী লোকেদের শুষ্ক হৃদয়ে একটা নূতন স্বর্গীয় আশার সঞ্চার হবে। তোমার সুসমঞ্জস জীবন দেখে তারা বুঝতে পারবে — মুক্তি আসে অন্তরের বৈরাগ্যে, বাইরের ত্যাগে নয়।'

"হিমালয়ের সেই নির্জনতার মধ্যে গুরুর কথাগুলি শুনতে শুনতে মনে হল — যেন আমার সংসার, আমার অফিস, এ পৃথিবী কত দূরে সরে

গেছে। তবুও তাঁর কথার মধ্যে বজ্রকঠোর সত্যের ভাব পরিস্ফুট। নিতান্ত অনুগতভাবেই সেই স্বর্গীয় শান্তির আনন্দনিলয় ত্যাগ করতে সম্মত হলাম। শিষ্যকে যোগসাধনে দীক্ষাদান করবার সব প্রাচীন আর কঠিন নিয়মগুলি বাবাজী আমায় শিখিয়ে দিলেন।

"তিনি বললেন, 'যারা উপযুক্ত, একমাত্র সেইসব শিষ্যকেই কেবল "ক্রিয়া" দেবে। ঈশ্বরলাভের জন্যে যারা সবকিছু পরিত্যাগ করবার দৃঢ় পণ করেছে, তারাই কেবল ধ্যানযোগের মধ্য দিয়ে জীবনের চরমরহস্য ভেদ করবার উপযুক্ত।'

"আমি কাতরনয়নে সানুনয়ে বললাম, 'গুরুমহারাজ, দেবতা আমার, এই লুপ্ত "ক্রিয়াযোগ" পুনরুজ্জীবিত করে আপনি মানবজাতির যে কি অশেষ কল্যাণসাধন করলেন তা আর বলা যায় না; কিন্তু শিষ্যত্ব গ্রহণের কঠোর বিধিনিষেধগুলি একটু শিথিল করে দিয়ে সে সুযোগ কি আপনি আরও প্রসারিত করবেন না? তাই আমার প্রার্থনা — সবাই যারা "ক্রিয়া" নিতে আন্তরিকভাবে ইচ্ছুক — এমন কি তারা প্রথমে অন্তরে পরিপূর্ণ বৈরাগ্য আনবার প্রতিজ্ঞা না করতে পারলেও, তাদের "ক্রিয়া" দেবার জন্যে আমায় যেন অনুমতি দেন। ত্রিতাপতাপে তাপিত,* দুঃখযন্ত্রণাক্লিষ্ট এই সংসারের নরনারী; তাদেরই বিশেষ উৎসাহ প্রদান প্রয়োজন। আর "ক্রিয়াযোগ" যদি তাদের কাছ থেকে দূরেই সরিয়ে রাখা হয়, তাহলে তো তারা মুক্তির পথে এগোবার কোন চেষ্টাই করতে পারবে না!'

"'তবে তাই হোক্! দেখছি, ভগবানের ইচ্ছা তোমার মুখ দিয়েই প্রকাশ পেল। যে কেউই ভক্তিভরে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে "ক্রিয়া" নিতে আসবে, অবাধে তাদের সবাইকে "ক্রিয়া" দিয়ে দিও।'†

---

* আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক তাপ যা যথাক্রমে ব্যাধি, মানসিক বিকলন বা 'জটিলতা' এবং আত্মিক অবিদ্যা রূপে প্রকাশিত।

† মহাবতার বাবাজী মহারাজ প্রথমে কেবলমাত্র লাহিড়ী মহাশয়কেই অন্যদের 'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষিত করার অধিকার প্রদান করেন। পরে যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয় বাবাজী মহারাজের অনুমতি প্রার্থনা করেন যাতে তিনি নিজের কতিপয় শিষ্যকে অন্যদের ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করার অধিকার দিতে পারেন। বাবাজী মহারাজ তাতে সম্মত হন এবং নির্দ্দেশ দেন — ভবিষ্যতে

"খানিকক্ষণ নীরব থেকে বাবাজী আবার বললেন, 'তোমার প্রত্যেক শিষ্যের কাছে ভগবদ্‌গীতার এই অমর শ্লোকটি উদ্ধৃত করে শোনাবে, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"* — [অর্থাৎ এ ধর্মের অতি অল্পমাত্র অনুশীলনেও তোমার বিপুল ভয় থেকে পরিত্রাণ পাবে]।'

"তার পরদিন সকালবেলা বিদায় আশীর্বাদ নেবার সময়, গুরুদেবের চরণপ্রান্তে নতজানু হয়ে প্রণাম করতে, তাঁকে ছেড়ে যেতে যে আমার একান্ত অনিচ্ছা তা বুঝতে পেরে সস্নেহে তিনি আমার কাঁধের উপর স্নেহভরে একখানি হাত রেখে বললেন, 'প্রিয় বৎস, আমাদের মধ্যে

কেবলমাত্র তাঁরাই ক্রিয়াযোগে দীক্ষা দিতে পারবেন যাঁরা নিজেরা ক্রিয়াযোগের পথে অনেকটা অগ্রসর হতে পেরেছেন এবং যারা দীক্ষাদানের অধিকার পেয়েছেন স্বয়ং লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে অথবা যোগাবতারের দ্বারা অধিকারপ্রাপ্ত শিষ্যগণ কর্তৃক স্থাপিত পারম্পরিক ক্রমে। বাবাজী মহারাজ করুণা পরবশ হয়ে সেই সকল অনুগত ও বিশ্বস্ত ক্রিয়াযোগীর জন্ম-জন্মান্তরের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির ভার গ্রহণ করেছেন যাঁরা অধিকার প্রাপ্ত উপদেষ্টাদের নিকট হতে দীক্ষালাভ করেছেন।

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপের ক্রিয়া দীক্ষার্থী ব্যক্তিগণকে এই মর্মে স্বীকৃতি প্রদান করে স্বাক্ষর দিতে হয় যে, তাঁরা এই 'ক্রিয়া' পদ্ধতি অন্যদের নিকট কখনো ব্যক্ত করবেন না। সরল এবং প্রকৃত ক্রিয়া পদ্ধতিকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেই সুরক্ষিত করা হয়েছে যাতে করে তা অনধিকারী উপদেষ্টাদের দ্বারা বিকৃত না হয়ে আদিতে যেমন ছিল, তেমনি অকৃত্রিম অবস্থায় থাকতে পারে।

জনসাধারণকে 'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষালাভের সুযোগ প্রদানের জন্য যদিও বাবাজী মহারাজ প্রাচীন যুগের সন্ন্যাস ও ত্যাগের দীক্ষা গ্রহণের নিষেধগুলি পরিত্যাগ করেন, তথাপি তিনি এই নির্দ্দেশ দেন যেন লাহিড়ী মহাশয় এবং তাঁর আধ্যাত্মিক পথের অনুগামীগণ (ওয়াই. এস. এস./ এস. আর. এফ. গুরুগণ) দীক্ষাপ্রার্থীদিগকে ক্রিয়াযোগ প্রাপ্তির প্রস্তুতির জন্য আবশ্যিকভাবে কিছুকাল প্রাথমিক আধ্যাত্মিক অনুশাসন মেনে চলতে বলবেন। ক্রিয়াযোগের ন্যায় একটি উচ্চ যোগ মার্গের আশ্রয় নিতে হলে, নিয়মশৃঙ্খলাহীন জীবনযাপন করা কোনমতেই চলতে পারে না। 'ক্রিয়াযোগ' হচ্ছে সাধারণ ধ্যানাভ্যাসের থেকেও একটি উচ্চস্তরের সাধনা। প্রকৃতপক্ষে এই যোগ হচ্ছে একটি অতি উন্নত ধরণের জীবনযাপন পদ্ধতি, এবং সেই কারণে এই যোগে দীক্ষিত হতে হলে কতকগুলি নিয়মানুবর্তিতা ও অনুশাসন মেনে নেওয়া একান্তভাবে প্রয়োজন। যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া এবং সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ নিষ্ঠাসহকারে বাবাজী মহারাজ, লাহিড়ী মহাশয়, স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী এবং পরমহংস যোগানন্দজীর মাধ্যমে প্রাপ্ত উপরোক্ত নির্দ্দেশসকল বিশ্বস্তভাবে পালন করে চলেছে। "হং-সৌ" এবং "ওঁ" সাধন পদ্ধতি, যা ক্রিয়াযোগের প্রাথমিক সাধনা হিসাবে ওয়াই. এস. এস./এস. আর. এফ. পাঠমালার মাধ্যমে, এবং ওয়াই. এস. এস./এস. আর. এফের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিনিধিগণের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে থাকে, তা হচ্ছে ক্রিয়াযোগ মার্গেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সাধন পদ্ধতিগুলি হচ্ছে চেতনাকে আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়ে, এবং আত্মার বন্ধনমুক্তি ঘটানোর পক্ষে, বিশেষভাবে কার্যকরী।

* শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ২য় অধ্যায়, ৪০ শ্লোক।

কখনও কোন বিচ্ছেদ নাই জেনো। যেখানেই তুমি থাক না কেন, আর যখনই তুমি আমায় ডাক না কেন, আমি তৎক্ষণাৎ তোমার কাছে গিয়ে উপস্থিত হব।'

"তাঁর এই অদ্ভুত প্রতিজ্ঞায় আশ্বস্ত হয়ে, আর নবলব্ধ ভগবৎজ্ঞানের স্বর্ণখনির সন্ধানলাভে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে, ধীরে ধীরে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। অফিসে যেতেই সহকর্মীরা সব হৈ হৈ করে উঠল — দশ দিন ধরে দেখা নেই, কোথায় গেল, কি হ'ল হিমালয়ের জঙ্গলে নিশ্চয়ই পথ হারিয়েছি — এই সব তো তারা ভেবেই অস্থির। যাইহোক, আমাকে ফিরতে দেখে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারপর শীগগিরই হেড অফিস থেকে একটি চিঠি এল। চিঠিতে লেখা ছিল, 'লাহিড়ী দানাপুরের অফিসে ফিরে আসবে। তার রাণীক্ষেতে বদলী ভুলক্রমে হয়ে গিয়েছিল। আর একজন লোককে রাণীক্ষেতের কাজের ভার নিতে পাঠান উচিত ছিল।'

"যাক্, সব দেখেশুনে তো মনে মনে খানিকটা হাসলাম এই ভেবে যে, কি ধরণের ঘটনার উল্টাস্রোত আমাকে ভারতবর্ষের এই সুদূরতম প্রদেশে টেনে এনে ফেলেছে।

"দানাপুরে* ফেরবার আগে মোরাদাবাদে আমি এক বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে দিনকতক ছিলাম। জনছয়েক বন্ধু মিলে একদিন যখন গল্পগুজব চলছে, আমি কথাবার্তা আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। আমাদের গৃহস্বামীটি বিরসবদনে বলল, 'ভারতে আজকাল আর তেমনগোছের কোন সাধুসন্ন্যাসী নেই!'

"আমি সঙ্গে সঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ করে বললাম, 'বাবু মশায়, আপনি বলেন কি? এখনও ভারতভূমিতে খুব বড় বড় যোগীঋষিরা আছেন বই কি!'" উৎসাহের আতিশয্যে আমার হিমালয়ের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনী তাঁদের সামনে বিবৃত করলাম। সেই ক্ষুদ্রদলটির অবিশ্বাস তখনও যায়নি।

---

* বেনারসের কাছাকাছি এক শহর।

"একটি লোক একটু সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'লাহিড়ী, হিমালয়ের উঁচু পাহাড়ের হাল্কা বাতাসে তোমার মাথা একেবারে গুলিয়ে গেছে! যা বর্ণনা করলে, তা সব দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।'

সত্যভাষণের উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে আমি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বলে ফেললাম, 'দেখুন, আমি যদি এখন ডাকি, তাহলে আমার গুরু এই বাড়ীতে এখনই এসে উপস্থিত হবেন।'

"শুনে তো সকলের চক্ষু উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। আর এরকম অলৌকিক উপায়ে কোন যোগীকে আবির্ভূত হতে দেখবার জন্যে যে সকলেরই আগ্রহ হবে, সেটা এমন বিশেষ কিছু আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। যাইহোক, কিছুটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি একটি নির্জন ঘর আর খানদুই নূতন কম্বলের আসন চাইলাম।

"'যোগিবর শূন্য হতেই আবির্ভূত হবেন। তিনি এলেই আমি আপনাদের ডাকব। এখন আপনারা দরজার বাইরে একটু অপেক্ষা করুন।' বলে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

"তারপর ধ্যানে বসলাম, — সকাতরে গুরুদেবকে ডাকতে লাগলাম। অন্ধকার ঘর শীগগিরই একটা স্নিগ্ধ মৃদু চন্দ্রালোকের ছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তার ভেতর থেকে বাবাজীর জ্যোতির্ময় মূর্তি প্রকটিত হলো।

"'লাহিড়ী! তুমি একটা অতি তুচ্ছ কারণে আমায় ডাকলে।' বাবাজীর দৃষ্টি কঠিন। 'এ সত্য কেবল তাদেরই জন্যে, মনেপ্রাণে যাদের ঐকান্তিক আগ্রহ আছে — কারোর অলস কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্যে নয়। চোখে দেখলে অবিশ্যি বিশ্বাস করা সহজ হয় — তখন আর অস্বীকার করার কিছুই থাকে না। যারা তাদের স্বাভাবিক জড়বাদী সন্দেহভাব থেকে মুক্ত হতে পেরেছে, তারাই কেবল অতীন্দ্রিয় সত্য আবিষ্কার করতে পারে, এবং তারা তা পাবার উপযুক্ত।' তারপর অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমায় যেতে দাও!'

"আমি তাঁর চরণতলে পড়ে মিনতি করে বললাম, 'পূজ্যপাদ গুরুদেব, আমার গুরুতর ভুল এখন আমি বুঝতে পারছি; আপনার

চরণতলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অন্ধ এই সব লোকেদের মনে বিশ্বাসসৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়েই আমি আপনাকে ডাকতে সাহসী হয়েছিলাম। যখন আপনি আমার প্রার্থনা স্বীকার করে দয়া করে এসে উপস্থিতই হয়েছেন, তখন আর আমার বন্ধুদের আশীর্বাদ না করে চলে যাবেন না। অবিশ্বাসী হলেও তারা শুধু আমার অদ্ভুত উক্তির সত্যতার বিষয়ে অনুসন্ধান করতেই ইচ্ছুক হয়েছিল!'

"'আচ্ছা বেশ, থাকব কিছুক্ষণ; অবিশ্যি আমিও ইচ্ছে করিনা যে তোমার বন্ধুদের সামনে তোমার কথা খেলো হয়ে যায়!' বাবাজীর মুখমণ্ডল শান্ত কোমল হয়ে এল। তারপর তিনি স্নিগ্ধমধুর স্বরে বললেন, 'বাবা, এখন থেকে কেবল তোমার সত্যি সত্যিই দরকার পড়লে ডাকলে তবেই আমি আসব — সব সময়ে ডাকলে আর আসব না।'*

"দরজা যখন খুললাম, একটা প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা সেই ক্ষুদ্র দলটির ভিতর বিরাজ করছিল। বন্ধুবর্গ যেন তাদের চোখ-কানকে অবিশ্বাস করে সেই কম্বলাসনের উপর উপবিষ্ট জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইল।

"একটা লোক হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'এ হচ্ছে সকলকে একসঙ্গে সম্মোহিত করা — এছাড়া আর কিছু নয়! আর তাছাড়া আমাদের অজান্তে কোন লোকের পক্ষে এ ঘরে ঢোকাই বা সম্ভব হবে কি করে?'

"বাবাজী একটু মৃদু হেসে এগিয়ে গিয়ে প্রত্যেককেই তাঁর শরীরের উষ্ণ, দৃঢ়মাংস স্পর্শ করতে ইঙ্গিত করলেন। একে একে সকলের সন্দেহভঞ্জন হবার পর সকলেই ভীত ও অনুতপ্তচিত্তে বাবাজীর সম্মুখে মেঝের উপর ভূমিষ্ঠ হয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল।

"বাবাজী তখন বললেন, 'খানিকটা হালুয়া তৈরী করে আন দেখি; এস, সবাই মিলে খাওয়া যাক, কি বল?' আমি বুঝতে পারলাম যে তাঁর

---

* আত্মোপলব্ধির পথে, এমন কি ঈশ্বরোপলব্ধ লাহিড়ী মহাশয়ের মত গুরুরাও উৎসাহের আতিশয্য প্রদর্শন করেন, এবং তা সংযত করারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ভগবদ্গীতায় ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জুনকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এজন্য তিরস্কার করেছিলেন, যা গীতায় বহু পঙ্ক্তির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

সশরীরে আবির্ভাবের সত্যতার আরও প্রমাণ প্রদর্শনের জন্যই তিনি এই অনুরোধ করলেন। হালুয়া তৈরী হতে লাগল, এধারে সেই গুরুদেবতাও অতি মধুরভাবে তাঁদের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ করতে লাগলেন। সন্দিগ্ধ টমাসদের ভক্তশ্রেষ্ঠ সেণ্ট পলে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হল। খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাবার পর বাবাজী একে একে প্রত্যেককেই আশীর্বাদ করলেন — তারপর হঠাৎ একটা বিদ্যুৎঝলকের মত জ্যোতিঃর স্ফুরণ! আমরা দেখলাম, বাবাজীর পঞ্চভৌতিক দেহের মূল উপাদানের অণুপরমাণুগুলি তৎক্ষণাৎ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যবিসারী আলোকবাষ্পে পরিণত হল। গুরুদেবের ঈশ্বরানুপ্রাণিত প্রবল ইচ্ছাশক্তি এখন তাঁর শরীররূপে ধৃত অণুপরমাণুগুলির সংহতি শ্লথ করে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কোটি-কোটি প্রাণকণিকাস্ফুলিঙ্গ সেই অনন্ত আধারে মিলিয়ে গেল।

"সেই দলের ভিতরকার মৈত্র মহাশয়* নামে এক ভদ্রলোক গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আমায় একবার বলেছিলেন, 'আমি নিজের চোখে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মহাগুরুকে দেখেছি। শিশুরা সাবানের ফেনা নিয়ে যেমন খেলা করে, আমাদের মহাগুরুও তেমনি দেশ ও কাল নিয়ে খেলা করেন। আমি এমন এক মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি যাঁর হাতে একসঙ্গে স্বর্গ ও মর্ত্যের চাবিকাঠি রয়েছে!' বলতে বলতে নবলব্ধ জ্ঞানের আনন্দালোকে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"শীগগিরই দানাপুরে ফিরে এলাম। পরমাত্মায় মন দৃঢ় সংলগ্ন করে আবার নানারকম কাজ আর সাংসারিক কর্তব্যভার সব হাতে তুলে নিলাম।"

বাবাজী কথা দিয়েছিলেন, "তোমার যখনই আমায় দরকার হবে, তখনই আবার আমি আসব" — যে অবস্থায় পড়ে বাবাজীর সঙ্গে লাহিড়ী

---

* মৈত্র মহাশয় বলে যে লোকটির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, পরে তাঁর খুব উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা লাভ হয়েছিল। স্কুল থেকে পাশ করে বেরোবার অল্প কিছুকাল পরেই মৈত্র মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়; কাশীর মহামণ্ডল আশ্রমে আমি যখন ছিলাম, তখন তিনি আশ্রম দর্শনের জন্য সেখানে যান। সে সময় তিনি আমায় মোরাদাবাদের সেই দলটির সামনে বাবাজীর সশরীরে আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, "এই অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শনের পর হতেই আমি লাহিড়ী মহাশয়ের আজীবন শিষ্য হয়েছিলাম।"

মহাশয়ের আর একবার সাক্ষাৎকার হয়েছিল, তার বিবরণ তিনি স্বামী কেবলানন্দ আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে বলেছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় তাঁর শিষ্যদের কাছে নিম্নলিখিতভাবে ঘটনাটি বিবৃত করেন, "দৃশ্যটা হচ্ছে প্রয়াগে 'কুম্ভমেলা'। অফিসের কাজ থেকে অল্প কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে সেখানে গেছি। কুম্ভমেলায় যোগদানের জন্য বহু দূর-দূরান্তর হতে আগত সহস্র সহস্র সাধুসন্ন্যাসীদের সমাগম হয়েছে, সেখানে তাঁদের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি, — ভিক্ষাপাত্র হাতে একটি ভস্মমাখা সন্ন্যাসীর প্রতি নজর পড়ল। মনে হল যেন লোকটা ভণ্ড, বাইরে ত্যাগের বড়াই — মনে কিন্তু তার বৈরাগ্যের ছিটেফোঁটাও নেই।

"যাক্, সাধুটিকে অতিক্রম করে যেই এগিয়েছি, অমনি বাবাজীর উপর বিস্মৃত দৃষ্টি পড়ল। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, তিনি একটি জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন — অদ্ভুত কাণ্ড!

"তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'গুরুজী, একি! আপনি এখানে কি করছেন?'

"বাবাজী আমার দিকে চেয়ে সরল শিশুর মত হেসে বললেন, 'আমি এই সন্ন্যাসীটির পা ধুইয়ে দিচ্ছি, তারপর এঁর উচ্ছিষ্ট বাসন মেজে দেব!' তখন আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি আমায় এই শিক্ষা দিতে চাইছেন যে, আমি যেন কারোর কোন সমালোচনা না করি; আর উচ্চনীচ সকলকার দেহমন্দিরেই যে ভগবান সমভাবে অধিষ্ঠান করছেন, সেইটাই যেন আমি মনে রাখি।

"মহাগুরু তারপর বললেন, 'জ্ঞানী-অজ্ঞানী এই দু'রকম সাধুদেরই সেবা করে আমি সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভগবানের কাছে যা সর্বাপেক্ষা প্রিয়, তাই শিক্ষা করছি — নম্রতা আর বিনয়।'"*

---

* "তিনি অবনত হয়ে দৃষ্টিপাত করেন আকাশ ও পৃথিবীতে সকল ব্যাপারের উপর।" গীতসংহিতা (সাম্‌স্) ১১৩ ঃ ৬। "যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা হবে, আর যে কেহ আপনাকে নত করে তাহাকে উচ্চ করা হবে।" ম্যাথিউ — ২৩ ঃ ১২ (বাইবেল)।

মিথ্যাস্বরূপ বা অহঙ্কারের নাশেই মানবের অনন্ত সত্তায় জাগরণ।

৩৫ পরিচ্ছেদ

লাহিড়ী মহাশয়ের পুণ্যময় জীবন

"এইরূপে আমাদের সকল সদাচারই পালন করা উচিত।"* জন দি ব্যাপ্টিষ্টকে এই কথাগুলি বলে, আর জনকে তাঁকে দীক্ষিত করতে বলে, যীশু তাঁর গুরুর দৈব অধিকার স্বীকার করেছিলেন।

প্রাচ্যের দৃষ্টিতে† বাইবেল শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করে, আর অন্তরের অনুভূতিতে আমার এই বিশ্বাস হয়েছে যে, অতীতজীবনে জন দি ব্যাপ্টিষ্ট যীশুখ্রিস্টের মহান গুরু ছিলেন। বাইবেলে এমন অনেক পঙ্‌ক্তি আছে যাতে করে বোঝা যায় যে, জন আর যীশুখ্রিস্ট তাঁদের গতজন্মে যথাক্রমে এলিজা আর তাঁর শিষ্য এলিশা নামে পরিচিত ছিলেন। (এইগুলি ওল্ড টেষ্টামেণ্টের বানান। গ্রীক অনুবাদকেরা নামের বানান করেছিলেন এলিয়াস আর এলিসিয়ুস; নিউ টেষ্টামেণ্টে তাঁরা এইরূপ পরিবর্তিত আকারেই পুনরায় স্থান পেয়েছেন।)

ওল্ড টেষ্টামেণ্টের শেষাংসে এলিজা আর এলিশার পুনর্জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী আছে। "দেখো, আমি প্রভুর সেই ভয়ঙ্কর দিন আসবার পূর্বেই ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ এলিজাকে তোমার কাছে পাঠাব।"‡ তাই জন (এলিজা) "সেই দিন ...... আসবার পূর্বেই" প্রেরিত হয়ে খ্রিস্টের অগ্রদূত হিসেবে কিছু আগেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা জ্যাকেরিয়াসের কাছে একটি দেবদূত আবির্ভূত হয়ে প্রমাণ দিয়ে গেলেন যে, তাঁর ভাবীপুত্র 'জন', এলিজা (এলিয়াস) ছাড়া আর কেউ নন।

---

* ম্যাথিউ — ৩ ঃ ১৫ (বাইবেল)।

† বাইবেলের বহু পঙ্‌ক্তিতে দেখা যায় যে, পুরাতন আর নূতন টেষ্টামেণ্ট যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁরা পুনর্জন্মবাদ অবগত ছিলেন আর তা স্বীকারও করেছেন।

‡ মালাচি — ৪ ঃ ৫ (বাইবেল)।

"কিন্তু সেই দেবদূত তাঁকে বললেন, — ভয় পেয়ো না জ্যাকেরিয়াস, কারণ তোমার প্রার্থনা শ্রুত হয়েছে; তোমার স্ত্রী এলিজাবেথের একটি পুত্রসন্তান হবে, আর তুমি তার নাম রাখবে 'জন'। ... আর ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে অনেককে সে তাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। আর সে 'এলিয়াসের আত্মা ও শক্তির বলে' তার আগে* যাবে, পিতাদের হৃদয় সন্তানদের দিকে, এবং অবাধ্যদের ধর্মশীলের ন্যায়নিষ্ঠার দিকে ফিরাতে, আর প্রভুর জন্যে দেশের লোকেদের তৈরী করতে।"†

যীশুখ্রিস্ট দুইবার স্পষ্টবাক্যে এলিজা (এলিয়াস)কে 'জন' বলে নির্দেশ করে গেছেন। "এলিয়াসের ইতিমধ্যে আগমন ঘটেছে — কেউ তাঁকে জানে না ... তারপর শিষ্যেরা বুঝতে পারলেন যে জন দি ব্যাপ্টিষ্টের কথাই তিনি তাদের বলেছিলেন।"‡

পুনরায় যীশুখ্রিস্ট বলছেন, "কারণ 'জন' পর্যন্ত সমস্ত ভবিষ্যদ্বক্তা আর বিধিনিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছে। আর তোমরা যদি গ্রহণ করতে সম্মত হও, তাহলে জেনো যে যাঁর আগমন হবে তিনিই এই ব্যক্তি — এলিয়াস।"§

জন যখন অস্বীকার করলেন যে তিনি এলিয়াস (এলিজা)¶ নন, তখন তিনি এই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, জনের দীনবেশে তিনি আর মহাগুরু এলিজার বাহ্যমহিমা নিয়ে আসেন নি। পূর্বজন্মে তিনি তাঁর মহিমা আর আধ্যাত্মিক সম্পদের "প্রাবরণ" তাঁর শিষ্য এলিশাকে দিয়েছিলেন। "আর এলিশা বললেন, আমি আপনার কাছে এই প্রার্থনা করি যে, আপনার আত্মার দুইটি অংশ আমাতে আসুক; তারপর তিনি বললেন, তুমি বড় কঠিন জিনিস চেয়েছ; যাইহোক, তোমার কাছ থেকে আমায় নিয়ে যাবার সময় যদি তুমি আমায় দেখ, তাহলে তোমার এই রকমই হবে ... তারপর এলিজা পরিত্যক্ত "প্রাবরণ" তিনি তুলে নিলেন।"**

---

* তার আগে অর্থাৎ প্রভুর আগে।

† ল্যুক — ১ : ১৩-১৭ (বাইবেল)।

‡ ম্যাথিউ — ১৭ : ১২-১৩ (বাইবেল)।

§ ম্যাথিউ — ১১ : ১৩-১৪ (বাইবেল)।

¶ জন — ১ : ২১ (বাইবেল)।

** রাজাবলী (কিংস) — ২ : ৯-১৪ (বাইবেল)।

এইবার তাঁদের ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে গেল, কারণ এলিশা-যীশুর এখন পূর্ণজ্ঞান লাভ হওয়াতে আর এলিজা-জনের তাঁর প্রকাশ্য গুরু হবার কোন প্রয়োজন রইল না।

পর্বতের উপর খ্রিস্টের রূপান্তরসাধনের* সময় মুসার সঙ্গে তাঁর গুরু এলিয়াসকে তিনি দেখেছিলেন। আবার ক্রুশের উপর তাঁর অন্তিমসময়ে যীশু ঈশ্বরের নাম ধরে এই বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন, "এলী, এলী, লামা শবক্তানী অর্থাৎ ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ? ... যারা কাছে দাঁড়িয়েছিল তাদের মধ্যে জনকতক তা শুনে বলল, এই ব্যক্তি এলিয়াসকে ডাকছে, ... দেখা যাক, এলিয়াস ওকে বাঁচাতে আসেন কিনা।"†

জন আর যীশুখ্রিস্টের মধ্যে গুরুশিষ্যের যে চিরন্তন সম্বন্ধ ছিল, তা বাবাজী আর লাহিড়ী মহাশয়ের মধ্যেও ছিল। তাঁর শিষ্যের দুইটি অতীত জীবনের মধ্যকার বিস্মৃতিসাগরের অতলস্পর্শ জলরাশি অতিক্রম করে, স্নেহব্যাকুল হৃদয়ে তিনি প্রথমে শিশু ও পরে পূর্ণবয়স্ক লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের গতি ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন। শিষ্যের তেত্রিশ বছর বয়সে না পৌঁছন পর্যন্ত, বাবাজী সেই অচ্ছেদ্যবন্ধনের প্রকাশ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে বিবেচনা করেন নি।

তারপর রাণীক্ষেতে তাঁদের সেই স্বল্পকালের সাক্ষাতের পর সেই নিঃস্বার্থ মহাগুরু তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শিষ্যকে নিজের কাছে না রেখে বাইরের সংসারের কাজে পাঠিয়ে দিলেন এই বলে যে, "বাবা, যখনই তোমার দরকার হবে আমি তোমার কাছে এসে হাজির হব।" কোন্ প্রেমিকমানব এমন প্রতিজ্ঞার অসীম অঙ্গীকার পূর্ণ করতে সক্ষম?

লোকসমাজে সাধারণভাবে অজ্ঞাত থাকলেও ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে কাশীর এক অখ্যাত সুদূর পল্লীকোণ হতে এক বিরাট আধ্যাত্মিক জাগরণ

---

* ম্যাথিউ — ১৭ ঃ ৩ (বাইবেল)।

† ম্যাথিউ — ২৭ ঃ ৪৬-৪৯ (বাইবেল)।

শুরু হয়েছিল। ফুলের সৌরভ যেমন লুকিয়ে রাখা যায় না, তেমনি অত্যন্ত সঙ্গোপনে একটি আদর্শগৃহী হিসেবে বাস করেও লাহিড়ী মহাশয় তাঁর অন্তরগৌরব লুকিয়ে রাখতে পারেন নি। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ভক্তমধুকরবৃন্দ সেই জীবন্মুক্ত মহানগুরুর উপদেশমকরন্দ পানের লোভে তাঁর চারপাশে এসে সমবেত হতে লাগলেন।

অফিসের সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টই অন্যতম প্রথম ব্যক্তি যিনি লক্ষ্য করেন যে তাঁর এই কর্মচারীটির মধ্যে একটা অতীন্দ্রিয় পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; তাই তাঁকে আদর করে "ব্রহ্মানন্দ বাবু" বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন।

একদিন সকালে এসে লাহিড়ী মহাশয় তাঁর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্যার, আপনাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। ব্যাপার কি বলুন তো?"

সাহেব তখন বললেন, "বিলেতে আমার স্ত্রী সাঙ্ঘাতিক পীড়িতা — মরণাপন্ন অবস্থা। দারুণ উদ্বেগ আর আশঙ্কায় আমি পাগল হয়ে গেছি।"

"আচ্ছা, তাঁর সম্বন্ধে আমি এখুনিই কিছু খবর এনে দিচ্ছি!" বলে লাহিড়ী মহাশয় ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটি নির্জন স্থানে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর উঠে এসে আশ্বাসসূচক হাসিতে বললেন, "ভয় নেই, আপনার স্ত্রী সেরে উঠছেন। তিনি আপনাকে এখন একটি চিঠি লিখছেন।" বলে সর্বদর্শী যোগিবর সেই পত্রের কিয়দাংশ উদ্ধৃত করে শোনালেন।

"ব্রহ্মানন্দ বাবু, আমি জানি যে আপনি কোন সাধারণ মানুষ ন'ন। কিন্তু তবুও আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, আপনি ইচ্ছামাত্র দেশ আর কালের বাধা এমন করে অতিক্রম করতে পারেন!"

তাঁর স্ত্রীর লেখা সেই কথিত চিঠিখানি শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হল। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় দেখলেন যে, পত্রে যে শুধু তাঁর স্ত্রীর আরোগ্যলাভের সুসংবাদ আছে তাই নয়, লাহিড়ী মহাশয় সপ্তাহকয়েক আগে যেসব কথাগুলি চিঠি থেকে উদ্ধৃত করে শুনিয়েছিলেন, সেসব কথাগুলোও অবিকল তাতে লেখা আছে।

মাসকতক পরে তাঁর স্ত্রী ভারতবর্ষে এলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হবার পর ভদ্রমহিলা তাঁর দিকে শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে তাকিয়ে বললেন, "মহাশয়, লণ্ডনে আমার রোগশয্যার পাশে স্বর্গীয় আলোর ছটায় ঘেরা আপনারই এই মূর্তি আমি মাসকতক আগে দেখেছিলাম। সেই মুহূর্তেই আমার রোগ একেবারে সম্পূর্ণভাবে আরাম হয়ে গেল। তারপরেই আমি অতি শীঘ্র ভারতবর্ষের পথে এই সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় বেরিয়ে পড়তে সমর্থ হলাম।"

দিনের পর দিন একটি দু'টি করে ভক্তেরা সব সেই মহান গুরুর কাছে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা লাভ করতে লাগল। তাঁর এইসব আধ্যাত্মিক, সাংসারিক আর কর্মস্থলের কর্তব্যসম্পাদন ছাড়াও তিনি শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তিনি বহু পাঠচক্র তৈরী করেছিলেন, এবং কাশীর বাঙ্গালীটোলা অঞ্চলে একটি বৃহৎ উচ্চবিদ্যালয় স্থাপনেও তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। "গীতসম্মিলনী" নামে অভিহিত সাপ্তাহিক ধর্মসভায় তিনি বহু ধর্মপিপাসু ব্যক্তির নিকট শাস্ত্রব্যাখ্যা করতেন।

সংসারীলোকে যে বলে, "রোজগার আর সংসারের কাজকর্ম করবার পর ধর্মটর্ম করবার আর সময় থাকে কোথায়?" — লাহিড়ী মহাশয় এই সব বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা তার উত্তর জনসাধারণের সম্মুখে হাজির করেছিলেন। এই মহান গৃহীগুরুর সুসমঞ্জস জীবন সহস্র সহস্র নরনারীর ভিতর নীরব অনুপ্রেরণা এনে দিত। অল্পবেতন উপার্জন করে, মিতব্যয়ী, অনাড়ম্বর আর সকলের পক্ষে সহজলভ্য হয়ে, গুরুদেব অত্যন্ত সহজ আর স্বাভাবিকভাবে এবং সুখেতেই সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন।

পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়েও লাহিড়ী মহাশয় জ্ঞানীমূর্খ-নির্বিশেষে সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতেন। ভক্তেরা তাঁকে প্রণাম করলে তাদেরও তিনি প্রতিনমস্কার করতেন। শিশুসুলভ সরলতার সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই অপরের পাদস্পর্শও করতেন; কিন্তু এরূপভাবে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন পুরাতন প্রাচ্য

প্রথা হলেও, কদাচিৎ তিনি অপরকে ঐরূপভাবে তাঁকে প্রণাম করতে দিতেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো — সকল ধর্মাবলম্বীদেরই ক্রিয়াযোগে দীক্ষাদান। কেবলমাত্র যে হিন্দুকে দীক্ষিত করতেন তাই নয়, মুসলমান বা খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরাও অনেকেই তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন। দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদী বা সকল ধর্মমতের অথবা সুপ্রতিষ্ঠিত কোন বিশেষ ধর্মমতের নয় — এমন বহু লোকেদেরও বিশ্বগুরু নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করে শিক্ষাদান করতেন। তাঁর খুব উচ্চকোটির শিষ্যদের মধ্যে আবদুল গফুর খাঁ নামে একজন মুসলমান চেলাও ছিলেন। তাঁর মত একজন বর্ণশ্রেষ্ঠ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হয়ে তাঁর সময়ে জাতিভেদের কঠিন গোঁড়ামি ভেঙ্গে দেবার যে চেষ্টা তিনি করেছিলেন, তাতে করে লাহিড়ী মহাশয়ের দুঃসাহসের পরিচয় পাওয়া যায় বই কি! মহাগুরুর বিশ্বব্যাপী পক্ষপুটের অন্তরালে বিভিন্নস্তরের মানুষ আশ্রয় পেয়েছিল। ঈশ্বর ভাবময় অন্যসব ধর্মগুরুদের মত তিনি সমাজের পতিত, নিপীড়িতদের প্রাণে নবীন আশার সঞ্চার করেছিলেন।

তিনি শিষ্যদের বলতেন, "সর্বদা মনে রেখো — তুমি কারোর নও আর কেউই তোমার নয়। ভেবে দেখো যে, একদিন এ সংসারের সব কিছুই ফেলে রেখে তোমাকে হঠাৎই চলে যেতে হবে — কাজেই এখন থেকে ভগবানের একটুআধটু খোঁজখবর নেওয়া শুরু কর; আর রোজই একটু একটু করে ঈশ্বরানুভূতির বেলুনে চড়ে মরণের শূন্যপথে মহাযাত্রার জন্যে এখন থেকে তৈরী হও। মায়ামোহে মুগ্ধ হয়ে তোমার হাড়মাংসের খাঁচাটাকেই স্ব-রূপ বলে ভাবছ। এ আর কি, বড়জোর একটা জ্বালাযন্ত্রণা দুঃখকষ্টের বাসা বই তো আর কিছু নয়!* অবিরাম ধ্যান করে যাও — যাতে করে অতি শীঘ্রই তুমি এই সকল দুঃখক্লেশমুক্ত, অনাদি অনন্ত পরমাত্মার স্বরূপ দেখতে পারো। ক্রিয়াযোগের গুপ্তচাবিকাঠি দিয়ে

* "আমাদের শরীরে কত রকমের মৃত্যুই না আছে! মৃত্যু ছাড়া সেখানে আর কিছুই নাই।" — মার্টিন লুথার।

তোমার দেহকারাগারের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হবার শিক্ষালাভ কর।"

মহান গুরু তাঁর বিভিন্ন শিষ্যদের তাঁদের আপন আপন ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত আচার পালনে উৎসাহিত করতেন। ক্রিয়াযোগের সর্বগ্রাহী প্রকৃতি যে মুক্তিলাভের কার্যকরী উপায়, তার উপর জোর দিয়ে লাহিড়ী মহাশয় তাঁর শিষ্যদের পরিবেশ আর শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাদের নিজ নিজ জীবন ফুটিয়ে তুলতে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় বলতেন, "মুসলমান দিনে পাঁচবার নমাজ* পড়বে, আর হিন্দুও দিনে কয়েকবার জপতপে বসবে। খ্রিস্টানও রোজ কয়েকবার হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, তারপর বাইবেল পড়বে।"

গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের, তাদের প্রত্যেকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী 'জ্ঞান', 'ভক্তি', 'কর্ম' বা 'রাজযোগে'র পথে তাদেরকে অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালিত করতেন। ভক্তেরা সন্ন্যাস জীবনযাপনের ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি তাদের সহজে অনুমতি দিতেন না — বরঞ্চ সাবধান করে দিয়ে বলতেন, তারা যেন সন্ন্যাস জীবনের কঠিন কৃচ্ছসাধনার বিষয়ে পূর্বেই চিন্তা করেন।

আদর্শগুরু হিসেবে তিনি শিষ্যদের শুধু শাস্ত্রের শুষ্কতর্ক নিয়ে পড়ে থাকা এড়িয়ে চলতেই পরামর্শ দিতেন। তিনি বলতেন, "প্রাচীন শাস্ত্রের সার সত্য শুধু পঠনপাঠনে নয়, অন্তরের মধ্যে প্রকৃত উপলব্ধি করবার জন্য যে সাধন করে, সেই বুদ্ধিমান। তোমার যা কিছু সমস্যা তা ধ্যানধারণার ভিতর দিয়ে সমাধানের চেষ্টা কর।† ধর্মের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে কোন অনিশ্চিত ধারণার বশবর্তী না হয়ে বরং প্রত্যক্ষ ঈশ্বরসঙ্গলাভের চেষ্টা কর।

---

* নমাজ — মুসলমানদের মূল প্রার্থনা।

† ধ্যানেতেই সত্যের সন্ধান কর — জীর্ণ পুঁথিতে নয়। চাঁদের জন্য আকাশে দৃষ্টিপাত কর — পুষ্করিণীতে নয়।" *(পারস্যদেশীয় প্রবাদ)*

"মনের ভিতর থেকে ধর্মের গোঁড়ামির সব জঞ্জাল দূর করে ফেল — সাক্ষাৎ অনুভূতির নির্মল, পূত শান্তিবারিতে মন প্লাবিত কর। অন্তরের যা প্রত্যক্ষ নির্দেশ তাই পালন করতে মনকে তৈরী কর; আর হৃদয়ের ঐশ্বরিক বাণীতেই তুমি জীবনের সকল জটিল সমস্যার উত্তর খুঁজে পাবে। মানুষের যেমন দুঃখকষ্টে পড়বার জন্যে উদ্ভাবনী ক্ষমতার কোন অন্ত নাই, তেমনি সকল উপায়ের উপায়, সেই পরমদয়ালের করুণারও শেষ নেই!"

একদিন ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণকালে তাঁর শিষ্যগণ তাঁদের গুরুদেবের সর্বব্যাপিত্বের এক পরিচয় পান। লাহিড়ী মহাশয় যখন কূটস্থ-চৈতন্য অর্থাৎ সকল স্পন্দনশীল সৃষ্টির মূলে যে ব্রহ্মজ্ঞান তার অর্থ ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি দম আটকে যাওয়ার মত চিৎকার করে বলে উঠলেন, "জাপানের সমুদ্রতীরে আমি বহুলোকের শরীরে থেকে ডুবে যাচ্ছি।"

তার পরদিন সকালবেলা শিষ্যেরা সংবাদপত্র খুলে পাঠ করে জানলেন যে, আগের দিন জাপানের কাছে এক জাহাজডুবি হয়ে বহুলোক মারা গিয়েছে।

লাহিড়ী মহাশয়ের দূরের শিষ্যরা তাঁদের নিকট তাঁর সর্বব্যাপী অদৃশ্য উপস্থিতি প্রায়ই অবগত হতেন। যাঁরা তাঁর কাছে উপস্থিত থাকতে পারতেন না তাঁদের আশ্বস্ত করে তিনি বলতেন, "যারা 'ক্রিয়া' অভ্যাস করে তাদের কাছে আমি সর্বদাই উপস্থিত থাকি। তোমার কোন ভাবনা নেই; তোমার ক্রমবর্ধমান উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমি পথ দেখিয়ে দেখিয়ে তোমার সেই চির-আশ্রয়স্থলে নিয়ে যাব।"

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল মহাশয়* — সেই মহান গুরুর এক শিষ্য বলেন যে, কৈশোরে ১৮৯২ সালে তিনি কাশী গমনে অসমর্থ হয়ে গুরুর কাছে আধ্যাত্মিক উপদেশের জন্য প্রার্থনা করেন। লাহিড়ী মহাশয় ভূপেন্দ্র বাবুর সামনে স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে দীক্ষা প্রদান করেন।

---

* ১৯৬২ সালে শ্রীসান্যাল দেহরক্ষা করেন। *(প্রকাশকের মন্তব্য)*

পরে তিনি কাশীতে গিয়ে গুরুর কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করলে, লাহিড়ী মহাশয় বলেন, "আমি তো তোমায় ইতিমধ্যে স্বপ্নে দীক্ষা দিয়ে দিয়েছি।"

সাংসারিক কোন কর্তব্যে অবহেলা করলে পর লাহিড়ী মহাশয় তাঁর শিষ্যকে সস্নেহে তার ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করে তাকে কর্তব্যপালনে অবহিত করে তুলতেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একদিন আমায় বলেছিলেন, "লাহিড়ী মহাশয় তাঁর কোন চেলার দোষের বিষয় সর্বসমক্ষে বলতে বাধ্য হলেও তিনি স্নেহপূর্ণস্বরে মিষ্টভাবে তাকে বুঝিয়ে সংশোধন করে দিতেন।" তারপর তিনি সখেদে বললেন, "আমাদের গুরুদেবের খোঁচা খেয়ে এ পর্যন্ত কোন শিষ্যই তাঁর কাছ থেকে পালায় নি।" শুনে হাসি চাপতে পারলাম না; যাইহোক, আমি কিন্তু সেই কথা শুনে সত্যসত্যই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে বললাম — কর্কশই হোক আর মিষ্টই হোক, তাঁর প্রত্যেক কথাই আমার কানে সঙ্গীতের মতই সুমধুর হয়ে বাজে।

লাহিড়ী মহাশয় "ক্রিয়াযোগের" ক্রমোন্নত দীক্ষার চারটি ধাপ সযত্নে বেছে দিয়েছিলেন।* শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ পেলে পর তবে তিনি বাকী তিনটি উচ্চতর প্রণালী তাকে শিক্ষা দিতেন। একদিন জনৈক শিষ্য তার মূল্য যথাযথভাবে স্বীকৃত হচ্ছে না ভেবে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, "গুরুদেব, এখন আমি দ্বিতীয় ক্রিয়া পাবার নিশ্চয়ই উপযুক্ত হয়েছি?"

সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল, ঘরে প্রবেশ করল তাঁর এক অতি দীন ভক্তশিষ্য — নাম বৃন্দা ভকত। সে ছিল কাশীর একজন ডাকহরকরা।

সস্নেহে তার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে গুরুদেব বললেন, "এস, এস, বৃন্দা, আমার কাছে এসে বস। আচ্ছা বল তো বৃন্দা, এবার কি তুমি দ্বিতীয় ক্রিয়া নিতে চাও?"

---

* "ক্রিয়াযোগের বহু শাখাপ্রশাখা আছে বলে লাহিড়ী মহাশয় তার মধ্য থেকে "ক্রিয়াযোগে"র সারস্বরূপ চারটি প্রণালী বিশেষভাবে নির্বাচিত করেছিলেন, যার ব্যবহারিক মূল্য সবথেকে বেশি।

অতি নম্র বিনয়ের সঙ্গে সেই সামান্য ডাকপিওন করজোড়ে গুরুদেবকে সবিনয়ে নিবেদন করলেন, "গুরুদেব, আর আমার ক্রিয়ার দরকার নেই! আরও উঁচু ক্রিয়া নিয়ে আমি কি করে সাধন করব? আমি আজ এখানে এসেছি আপনার আশীর্বাদ নিতে, কারণ প্রথম ক্রিয়াতেই আমার মন এমন আনন্দে উন্মত্ত আর আত্মহারা হয়েছে যে, আমি চিঠিবিলিই করতে পারি না।"

লাহিড়ী মহাশয় বললেন, "বৃন্দা এখন ব্রহ্মানন্দসাগরে ভাসছে।" অপর শিষ্যটি কথাগুলি শুনে মাথা হেঁট করলেন।

তারপর সেই শিষ্যটি বললেন, "গুরুজী, এখন বুঝেছি যে আমি একেবারেই আনাড়ী — কেবল 'যন্ত্রে'র দোষই খুঁজে বেড়াচ্ছি!"

সেই অশিক্ষিত, দীন, নম্র ডাকপিওন ক্রিয়াযোগের সাহায্যে এতদূর আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ করল যে বহু পণ্ডিত তার কাছ থেকেই শাস্ত্রের গূঢ় অর্থের ব্যাখ্যা সময়ে সময়ে শুনতে চাইতেন। লিখনপঠনে অপারগ আর অপাপবিদ্ধ সেই বৃন্দা ভকত, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতমহলে বহু সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

কাশীর বহু শিষ্য ছাড়াও ভারতবর্ষের বহু দূরদূরান্তর থেকে শত শত মানুষ তাঁর কাছে আসত। তাঁর দুই ছেলের শ্বশুরবাড়ী যাওয়া উপলক্ষ্যে তিনি স্বয়ং বাংলাদেশে কয়েকবার ভ্রমণ করে গিয়েছিলেন। তাঁর উপস্থিতির সুযোগে বাংলার ভিতরে বহু স্থানে ক্রিয়াবান্‌দের ছোট ছোট দল সব গড়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর আর বিষ্ণুপুর, এই দুই জেলার বহু নীরব ক্রিয়াবান্ আজও তাঁর সাধনার ধারা অব্যাহত রেখেছেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে যে সব সাধুসন্তরা "ক্রিয়া" পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কাশীর প্রখ্যাত স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী আর দেওঘরের খুব উচ্চাবস্থার সাধু বালানন্দ ব্রহ্মচারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাশীনরেশ মহারাজা ঈশ্বরীনারায়ণ সিংহ্ বাহাদুরের পুত্রের তিনি কিছুকাল গৃহশিক্ষকতাও করেছিলেন। গুরুদেবের আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের পরিচয় পেয়ে মহারাজা আর তাঁর পুত্র, উভয়েই তাঁর কাছ থেকে

ক্রিয়াযোগে দীক্ষাগ্রহণ করেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরও তাঁর নিকট ক্রিয়াযোগে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন।

লাহিড়ী মহাশয়ের কয়েকজন প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী শিষ্য প্রচারকার্যের দ্বারা তাঁর ক্রিয়াযোগের প্রসার ও তার পরিধি বিস্তার করতে উদ্যত হয়েছিলেন। গুরুজী তাতে অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। তাঁর আর একটি শিষ্য, কাশীনরেশের রাজচিকিৎসক, গুরুদেবের নাম “কাশীবাবা”[*] রূপে প্রচারের জন্য সংগঠিত প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন — এবারেও তা তিনি নিষেধ করলেন।

তিনি বলতেন, ‘ক্রিয়া’ পুষ্পের সৌরভ, বিনা প্রচারে স্বাভাবিকভাবে আপনিই বিস্তৃত হবে। অধ্যাত্মভাবের উর্বর হৃদয়ভূমিতে এর বীজ আপনিই অঙ্কুরিত হবে।”

যদিও গুরুমহারাজ আধুনিক সংগঠন অথবা ছাপাখানার মাধ্যমে কোন প্রচারপ্রণালী অবলম্বন করেন নি, তথাপি তিনি জানতেন যে তাঁর মহাবাণী, বন্যার দুর্নিবার স্রোতের মত উত্থিত হয়ে নিজের শক্তিতে মানবহৃদয়ের দুকূল পরিপ্লাবিত করে ছুটে চলবে। ভক্তদের পরিবর্তিত আর পবিত্র জীবনই হচ্ছে ক্রিয়াযোগের চিরন্তন অস্তিত্বের একমাত্র প্রত্যাভূতি।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে, রাণীক্ষেতে দীক্ষালাভের পঁচিশ বছর পরে, লাহিড়ী মহাশয় পেন্সন নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন।[†] এখন তাঁকে দিনের বেলাতেও সহজে পাওয়া যায় দেখে ভক্তের দল ক্রমশঃই বাড়তে লাগল। মহাগুরু তখন তাঁর অধিকাংশ সময় নীরবে পদ্মাসনে বসেই কাটিয়ে দিতেন। এমন কি একটু বেড়াবার জন্যে অথবা বাড়ীর অন্যান্য অংশে যাবার জন্যেও, তিনি কদাচিৎ বৈঠকখানা ত্যাগ করে আসতেন। গুরুদেবের দর্শনলাভের জন্যে শিষ্যদের নীরবে অবিরাম যাতায়াত সারাদিন ধরেই চলত।

---

[*] তাঁর শিষ্যরা তাঁকে যোগিবর, যোগিরাজ, মুনিবর প্রভৃতি নামেও ভূষিত করেন। “যোগাবতার” নামটি মৎকর্তৃক সংযোজিত।

[†] গভর্ণমেণ্ট অফিসে এক বিভাগে তাঁর কার্যকাল ছিল সবশুদ্ধ ৩৫ বৎসর।

দর্শনপ্রার্থীরা সভয়ে দেখত যে লাহিড়ী মহাশয়ের শরীরের স্বাভাবিক অবস্থায় — শ্বাসহীনতা, বিনিদ্রতা, ধমনী আর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ালোপ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শান্ত নয়ন দু'টিতে স্থির নিষ্পলকদৃষ্টি, আর তার সঙ্গে গভীর শান্তির একটা স্নিগ্ধছটার দ্বারা তিনি বেষ্টিত — এইসব দেহাতীত লক্ষণ সকল প্রকাশ পেত। উপস্থিত সকলেই তখন উপলব্ধি করতো যে প্রকৃতই একজন ব্রহ্মজ্ঞ গুরুশ্রেষ্ঠের নীরব পূত আশীর্বাদে তাদের মানবজীবন ধন্য হয়ে গেছে।

গুরুদেব এবারে তাঁর শিষ্য পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়কে কলকাতায় "আর্য মিশন ইনষ্টিটিউসন" নামে এক যোগকেন্দ্র স্থাপনে অনুমতি দিলেন। এই কেন্দ্র হতে কতকগুলি ভেষজ ঔষধ বিতরণ,* আর বাংলাদেশে ভগবদ্গীতার প্রথম সুলভ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। হিন্দী ও বাংলায় 'আর্য মিশন গীতা' সহস্র সহস্র গৃহে পঠিত হয়ে থাকে।

প্রাচীন প্রথানুযায়ী লাহিড়ী মহাশয় বহুবিধ রোগ দূরীকরণের জন্য একটি নিমের† তেল তৈরী করে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করতেন। গুরুদেব তাঁর কোন শিষ্যকে তেলটি চোলাই করতে বললে সে তা অতি সহজেই সম্পাদন করতে পারত; কিন্তু অপর কেউ যদি তা করতে চেষ্টা করত, তাহলে নানা অদ্ভুত সব বাধা এসে উপস্থিত হত — হয়তো দেখা যেত যে পরিশ্রুত করবার সময় সেই ওষুধের তেলটির প্রায় সবটাই একেবারে উবে গেছে। এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে,

---

* হিন্দু ভেষজ শাস্ত্রকে 'আয়ুর্বেদ' বলা হয়। বৈদিক যুগের চিকিৎসকগণ শল্য চিকিৎসার উপযোগী সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানতেন এবং তাঁরা প্লাস্টিক সার্জারীও করতেন। তাছাড়া তাঁরা বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবের পরিবর্ত কি জানতেন, এবং সিজারিয়ান ও মস্তিষ্কেও শল্য চিকিৎসা করতে পারতেন। এছাড়া ওষুধের দ্রব্যগুণ বৃদ্ধি করাতেও তাঁরা দক্ষ ছিলেন। খ্রিঃ পূর্ব ৪র্থ শতকের বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটস্ তাঁর 'মেটিরিয়া মেডিকা'র বহু উপকরণ হিন্দু সূত্র থেকে সংগ্রহ করেন।

† নিমের ভৈষজ্যগুণাবলী এখন প্রতীচ্যেও স্বীকৃত হয়েছে। এর তিক্তছাল টনিকরূপে ব্যবহৃত হয়, আর ফল ও বীজ হতে নিষ্কাশিত তৈল কুষ্ঠ রোগ এবং অন্যান্য রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

গুরুদেবের আশীর্বাদও ওষুধটার একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ ছিল!
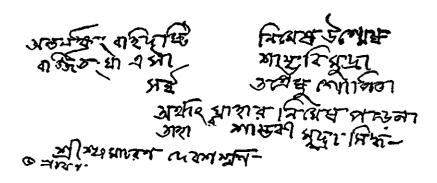
বাংলা অক্ষরে লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তাক্ষর আর তাঁর স্বাক্ষর উপরে প্রদর্শিত হল। তাঁর শিষ্যকে লিখিত একটি পত্র হতে লাইনগুলি উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে। এতে গুরুদেব একটি সংস্কৃত শ্লোকের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, "যাহার নিমেষ পড়ে না তাহার শাম্ভবী মুদ্রা * সিদ্ধ।

৫ শ্রাবণ (স্বাঃ) শ্রী শ্যামাচরণ দেবশর্ম্মণ।"

অন্যান্য বহু মহাপুরুষদের মত লাহিড়ী মহাশয় নিজে কোন পুস্তক লেখেন নি বটে, কিন্তু তিনি তাঁর বহু শিষ্যকে গভীর শাস্ত্রব্যাখ্যায় উপদিষ্ট করেছিলেন। আমার বিশেষ বন্ধু, লাহিড়ী মহাশয়ের স্বর্গীয় পৌত্র শ্রীআনন্দমোহন লাহিড়ী লিখেছেন ঃ

---

* 'শাম্ভবী মুদ্রা'র অর্থ হ'ল ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। মানসিক শান্তিলাভের একটি নির্দ্দিষ্ট পর্যায়ে উপনীত হলে পর যোগীর অক্ষিপল্লবের আর কম্পন হয় না। তিনি তখন ব্রহ্মানন্দে মগ্ন।

'মুদ্রা' হচ্ছে সাধারণতঃ কোন ক্রিয়াকাণ্ড বা অনুষ্ঠানে কর বা অঙ্গুলিবিন্যাস। অনেক মুদ্রা কতকগুলি স্নায়ুর উপর এমন ক্রিয়া প্রকাশ করে যে তাতে একটা গভীর মানসিক শান্তির উদয় হয়। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে শরীরস্থ নাড়ীমণ্ডলীর (দেহের ৭২,০০০ তন্ত্রিকা তন্ত্রীর) সঙ্গে মনের সম্বন্ধের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ আছে। কাজেই পূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান আর যোগাদি প্রক্রিয়াসাধনে মুদ্রার ব্যবহারের একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। মুদ্রার ভাষার বিস্তৃত পরিচয় ভারতবর্ষের মূর্তিশিল্প আর পূজাপার্বণ প্রভৃতিতে ও নৃত্যগীতাদি অনুষ্ঠানে পাওয়া যায়।

"শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা এবং 'মহাভারতের' অন্যান্য অংশে কতকগুলি ব্যাসকূট আছে। এই সব ব্যাসকূটের প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখলেই দেখা যাবে যে তা একটা অদ্ভুত আর সহজেই ভুল বোঝা যেতে পারে, এমন গোছের পৌরাণিক গল্পসমষ্টিমাত্র। আর ঐসব ব্যাসকূটের যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদত্ত না হলে আমরা দেখতে পাব যে, আমরা এমন এক বিজ্ঞান হারিয়েছি যা প্রাচ্য হাজার হাজার বছর ধরে নানাবিধ পরীক্ষার তত্ত্বানুসন্ধান করে সে'সব অমানুষিক ধৈর্যের সঙ্গে রক্ষা করে এসেছে।*

লাহিড়ী মহাশয়ের ব্যাখ্যা, শাস্ত্রবাক্য আর রূপকের ভিতর সুচতুরভাবে লুক্কায়িত ধর্মবিজ্ঞানকে তার রূপকের আবরণ মুক্ত করে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত করেছে। আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বৈদিক যাগযজ্ঞ, পূজার্চনার মন্ত্রতন্ত্র এখন আর কতকগুলি দুর্বোধ্য বাক্যের সমষ্টি বা কসরৎ নয়; লাহিড়ী মহাশয় প্রমাণ করেছেন যে তাদের মধ্যে বহুবিধ বৈজ্ঞানিক অর্থ নিহিত আছে।

"আমরা জানি যে, মানুষ সাধারণতঃ কুপ্রবৃত্তির অদম্যপ্রভাবে অসহায় হয়ে পড়ে; কিন্তু যখন তার চেতনায় ক্রিয়াযোগের দ্বারা এক উচ্চতর ও স্থায়ী পরমানন্দের আবির্ভাব হয়, তখন সেই প্রবৃত্তিগুলি শক্তিহীন হয়ে পড়ে, আর মানুষও তাদের প্রশ্রয় দেবার কোন উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না। এখানে নিবৃত্তিতে, নিম্নস্তরের কামনাবাসনা পরিহারের সঙ্গে, যুগপৎ পরমানন্দলাভের অনুভব ঘটে। এ পথ ছাড়া, নীতিবাক্য সকল যা কেবল এ কোরো না, ও কোরো না, এই সব বলেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে এসেছে, তা আমাদের কাছে একেবারে নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়।

---

* "সিন্ধুনদের উপত্যকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে সম্প্রতি কতকগুলি সীলমোহর ভূগর্ভ হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলি খ্রিঃ পূঃ তিন হাজার বৎসরের পুরাতন। তাতে দেখা যায় যে কতকগুলি মূর্তি অঙ্কিত, আর সে সব আমাদের বর্তমান যোগসাধনপ্রণালীতে ব্যবহৃত ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে সময়েও যোগের মূলতত্ত্বের কিছু কিছু বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল। আর হয়ত আমাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নিতান্তই অযৌক্তিক হবে না যে, প্রক্রিয়ার অনুশীলন দ্বারা নিয়মিত অন্তর্দর্শনের চর্চা ভারতবর্ষে পাঁচ হাজার বছর ধরে চলে এসেছে।" — ওয়াশিংটন, ডি. সি.-র 'আমেরিকান কাউন্সিল অফ লার্নেড সোসাইটি'র বুলেটিনে প্রকাশিত প্রফেসর ডব্লু. নর্ম্যান ব্রাউনের প্রবন্ধ।

যাইহোক, হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশ, ব্যাখ্যা প্রভৃতিতে প্রমাণিত হয় যে, স্মরণাতীত কাল থেকে যোগবিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় ছিল।

"বহির্জগতের পার্থিব সকল লীলায় যা কিছু প্রকাশ, তার পিছনে রয়েছে সেই অসীম মহাশক্তির সমুদ্র। জাগতিক ব্যাপারে আমাদের আসক্তি আমাদের মনে আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধা নষ্ট করে ফেলে। যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় কি করে আমরা প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার করতে পারি — সেইহেতু আমরা সকল নাম আর রূপের পিছনে যে 'বিরাট প্রাণ' — তার ধারণা করতেই অসমর্থ হই। প্রকৃতির সঙ্গে অতিমাত্র ঘনিষ্ঠতা, তার চরম রহস্য সম্বন্ধে একটা তাচ্ছিল্য এনে দিয়েছে। তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হচ্ছে ব্যবহারিক। আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের জন্য, যাতে সে বাধ্য হয় তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য — বলতে গেলে, আমরা তাকে যেন উত্ত্যক্তই করি। তার শক্তিসমূহের ব্যবহার করি বটে, কিন্তু তার উৎস আজ পর্যন্ত অজানাই থেকে গেছে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হচ্ছে অনেকটা উদ্ধত প্রভু ও তার ভৃত্যের মত, অথবা দার্শনিকভাবে বলতে গেলে — প্রকৃতি যেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় বন্দী। আমরা তাকে জেরা করি, চ্যালেঞ্জ করি, মানুষের তুলাদণ্ডে তার সাক্ষ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিচার করি, অথচ যা তার লুকানো ঐশ্বর্যের কখনও পরিমাপ করতে পারে না।

"অপরদিকে আত্মা যখন উচ্চতর শক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে, প্রকৃতি তখন বিনা প্ররোচনায় বা পীড়নে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষের ইচ্ছা পূরণ করে। অবোধ জড়বাদীরা প্রকৃতির উপর এই অনায়াস আধিপত্যকেই "অলৌকিক" বলে অভিহিত করেন।

"যোগ যে একটা গুপ্তপ্রক্রিয়ামাত্র — এই ভ্রমাত্মক ধারণার একটা আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে লাহিড়ী মহাশয়ের আদর্শজীবনের উদাহরণ। ভৌতবিজ্ঞানের বাস্তবতা* সত্ত্বেও প্রত্যেক মানুষই এখন ক্রিয়াযোগের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে তার সঠিক সম্বন্ধ কি, তা জানবার পথ খুঁজে নিতে পারে, আর সকল জাগতিক ঘটনার জন্য একটা আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধাও অনুভব করতে পারে — তা সে রহস্যময় কোন ঘটনাই হোক, আর

---

* "যে মানুষের বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না, (এবং শ্রদ্ধা করার) সে অসংখ্য রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি হলেও এবং সমস্ত পরীক্ষাগার এবং মানমন্দিরের সারসংগ্রহ তার একটিমাত্র মস্তিষ্কে স্থান পেলেও, সে এক জোড়া চশমারই মত — যার পিছনে কোন চক্ষু নাই।" "সাতোর রেজার্টাস" — কার্লাইল।

দৈনন্দিন কোন ব্যাপারই হোক। আমাদের মনে সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার যে, হাজার বছর আগে যা রহস্যময় ছিল এখন আর তা নেই, — আর আজ যা রহস্যজনক, একশ' বছর পরে তা ঠিক বিধিসঙ্গতভাবে সহজবোধ্য হবে।

"ক্রিয়াযোগের বিদ্যা সনাতন। এ গণিতশাস্ত্রের মত একেবারে অভ্রান্ত; যোগবিয়োগের সহজপ্রণালীর মত ক্রিয়াযোগের বিধিও কখনও নষ্ট হতে পারে না। গণিতশাস্ত্রের সমস্ত পুঁথি অগ্নিতে আহুতি দিলেও যুক্তিবাদী মন যেমন সব সত্য ঠিক পুনরায় আবিষ্কার করে ফেলবে, তেমনি যোগশাস্ত্রের সমস্ত বই নষ্ট করে ফেললেও যদি একজন প্রকৃত যোগী আবির্ভূত হন — যাঁর মধ্যে শ্রদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞানের সমন্বয় ঘটেছে, — তাহলে তিনি এর মূলবিধি সবই পুনরায় আবিষ্কার করে ফেলতে পারবেন।"

বাবাজী যেমন অবতারশ্রেষ্ঠ "মহাবতার", শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী যেমন সার্থকভাবে অভিহিত "জ্ঞানাবতার", তেমনি লাহিড়ী মহাশয়ও "যোগাবতার"।*

সামাজিক মঙ্গলসাধনে, গুণ ও পরিমাণ এই দুই-এর বিচারে তিনি সমাজকে আধ্যাত্মিকতার আরও উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে দিয়েছেন। তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তশিষ্যদের উচ্চতর অবস্থাতে উন্নীত করবার শক্তিতে, আর সাধারণ্যে সত্যের বহুল প্রচারে, লাহিড়ী মহাশয় মানবজাতির মুক্তিদাতাদের মধ্যে অন্যতম বলে গণ্য।

মহাপুরুষরূপে তাঁর অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর ক্রিয়াযোগরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত প্রণালীর উপর ব্যবহারিক গুরুত্ব দান — যাতে করে তিনি সর্বপ্রথম যোগের রুদ্ধদ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করে তার পথ সুগম করে দিয়েছেন। তাঁর নিজ জীবনের সব অলৌকিক ঘটনার কথা ছেড়ে দিলেও বলা যায় যে, যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয় অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার সর্বোচ্চচূড়ায় আরোহণ করেছিলেন যখন তিনি যোগশাস্ত্রের সব কিছু প্রাচীন জটিলতা দূর করে সাধারণের পক্ষে তাকে প্রত্যক্ষফলপ্রদ সহজসাধ্য সরল যোগসাধনে পরিণত করেছিলেন।

---

* শ্রীযুক্তেশ্বরজী তাঁর শিষ্য শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দকে দিব্য প্রেমের এক অবতারপুরুষ বলে অভিহিত করেছেন। পরমহংসজীর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর প্রধান শিষ্য রাজর্ষি জনকানন্দ (মিঃ জেমস্ জে. লীন) যোগানন্দজীকে "প্রেমাবতার" নামে অভিহিত করেন। *(প্রকাশকের মন্তব্য)*

অলৌকিক ঘটনার উল্লেখে লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই বলতেন, "অতি সূক্ষ্ম বিধিনিয়ম বলে যা সব ঘটে — সাধারণের কাছে যা অজ্ঞাত — তা প্রকাশ্যে আলোচিত বা বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে প্রকাশিত হওয়া উচিত নয়।" এই গ্রন্থটিতে যদি আমি কোথাও তাঁর সাবধানবাণী লঙ্ঘন করেছি বলে বোধ হয়, তা হলেও সেটা তাঁর কাছ থেকে অন্তরে পুনরাশ্বাস পাওয়াতেই আমার পক্ষে সম্ভবপর হয়েছে। আর তাছাড়া বাবাজী, লাহিড়ী মহাশয়, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী প্রভৃতি গুরুমহারাজগণের জীবনালেখ্য রচনার সময় আমি বহু সত্য অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ বর্জন করাই যুক্তিসঙ্গত বলে বোধ করেছি। অত্যন্ত দুর্বোধ্য জটিল দর্শনশাস্ত্রের এক বিরাট ব্যাখ্যাপুস্তক না লিখে তা আর প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়।

গৃহীযোগী হিসাবে লাহিড়ী মহাশয় আধুনিক ভারতের উপযোগী কার্যকরী পন্থার বাণী বহন করে এনেছেন। প্রাচীন ভারতের সমুন্নত ধর্ম ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসকল এখন আর বিদ্যমান নেই। কাজেই ভিক্ষাপাত্রহস্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল যোগীর প্রাচীন আদর্শ এই মহান গুরু আর অনুমোদন করেন নি। বরং তিনি স্বোপার্জনরত, অর্থসঙ্কটগ্রস্ত সমাজের উপর নির্ভরতাবিহীন, আর নিজ আবাসে একান্তে সাধনরত আধুনিক যোগীর সুযোগসুবিধার প্রতিই অধিকতর আগ্রহই প্রদর্শন করেছেন। উপরোক্ত নীতির সঙ্গে তিনি প্রাণমনে শক্তিসঞ্চারী নিজের অপূর্ব আদর্শের সংযোগসাধন করেছেন। তিনি হচ্ছেন আধুনিক ধরণের, ইংরেজীতে যাকে বলে "স্ট্রীমলাইনড" — অবাধ স্বচ্ছন্দগতি যোগীর আদর্শ। বাবাজী কর্তৃক পরিকল্পিত তাঁর জীবনাদর্শ শুধু যে কেবল প্রাচ্যের পক্ষেই তা নয়, প্রতীচ্যের যোগসাধনেচ্ছুদের পক্ষেও পথপ্রদর্শকরূপে গঠিত।

নূতন মানবজাতির পক্ষে নবীন আশার আনন্দ! যোগাবতার ঘোষণা করে গেছেন, "ভগবৎসঙ্গলাভ নিজ চেষ্টাতেই সম্ভব — আর তা' কোন ধর্মতত্ত্বে বিশ্বাস, বা কোন জগৎনিয়ন্তার খেয়ালখুশীর উপর নির্ভর করে না।"

আর এই ক্রিয়াযোগের চাবিকাঠি দিয়েই, যে সব মানুষ কোন মানবের দেবত্বে বিশ্বাস করে না, তাঁরাই আবার শেষপর্যন্ত নিজেদের মধ্যে পূর্ণদেবত্বের প্রকাশকে দেখতে পাবে।

৩৬ পরিচ্ছেদ

বাবাজীর প্রতীচ্যের প্রতি আগ্রহ

শান্তমধুর নিদাঘ নিশীথ। মাথার উপর বড় বড় উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলো আকাশের বুকে আলো বিকিরণ করে চারিদিকে একটা স্বপ্নের মায়াজাল রচনা করেছে। শ্রীরামপুর আশ্রমের দোতলার বারান্দায় শ্রীযুক্তেশ্বরজীর পাশে আমি বসে আছি। জিজ্ঞাসা করলাম, "গুরুদেব, আপনি কখনও বাবাজীর দর্শন পেয়েছেন?" শুনে তাঁর চোখদু'টি ভক্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আমার এই সোজাসুজি প্রশ্নে একটু হেসে তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, পেয়েছি বই কি! আমার বহু পুণ্যবলে আমি তিন তিনবার এই অমর মহাগুরুর সাক্ষাৎ পেয়েছি। প্রথমবার আমাদের সাক্ষাৎ হয় এলাহাবাদের 'কুম্ভমেলায়'।"

ভারতবর্ষে কুম্ভমেলার মত ধর্মীয় মহামেলা স্মরণাতীত যুগ হতে চলে আসছে। এইসব ধর্মীয় মহামেলা অগণিত লোকের চোখের সামনে একটা আধ্যাত্মিক লক্ষ্য সর্বদা ধরে রেখে আসছে। হাজার হাজার সাধুসন্ন্যাসী যোগীঋষিদের দর্শনলাভের জন্যে লক্ষ লক্ষ ভক্ত প্রতি বার বৎসর অন্তর একবার করে মেলায় সমবেত হন। এমনসব সাধুসন্ন্যাসীরাও আছেন, যাঁরা কেবলমাত্র একবার মেলায় এসে সংসারী নরনারীদের পুণ্য আশীর্বাদবর্ষণ করা ছাড়া আর কখনও তাঁদের নির্জন স্থান হতে প্রকাশ্যে আসেন না।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, "বাবাজীর সঙ্গে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় তখনও আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিনি। তবে লাহিড়ী মহাশয়ের কাছ থেকে তখন আমার "ক্রিয়াযোগে" দীক্ষা নেওয়া হয়ে গেছে। ১৮৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে এলাহাবাদে যে কুম্ভমেলা হয়, তাঁরই উৎসাহে আমি সে মেলাতে যোগদান করি। সেই আমার প্রথম কুম্ভমেলা দর্শন। দারুণ ভিড় আর হট্টগোলের মাঝে আমি একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি।

চতুর্দিকে আমার আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টির সম্মুখে কোন প্রকৃত সদ্‌গুরুর পুণ্যমূর্তির আবির্ভাব ঘটল না। গঙ্গার তীরে একটা পোলের কাছ দিয়ে যাচ্ছি, চোখে পড়ল একটি পরিচিত মূর্তি — কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন ভিক্ষাপাত্রটি বাড়িয়ে দিয়ে।

"হতাশ হয়ে ভাবলাম, 'এ মেলাটা একটা ভিখিরীর দলের চেঁচামেচি আর হট্টগোল ছাড়া অন্য কিছুই নয়। আমার মনে হয় যে পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকেরা, যাঁরা মানবজাতির প্রত্যক্ষ মঙ্গলসাধনের জন্যে জ্ঞানের পরিধি ধৈর্যের সঙ্গে বাড়িয়ে চলেছেন, তাঁরা কি এইসব, যারা ধর্মের ভণ্ডামি করে অথচ ভিক্ষাই যাদের একমাত্র উপজীবিকা, তাদের চেয়ে ভগবানের কাছে বেশি প্রিয় নন?'

"সমাজসংস্কারের এই সব ছোটখাট চিন্তাগুলি হঠাৎ বাধা পেল; দেখি, সামনে এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আমায় বলছেন,

"'মশায়, এক সাধুজী আপনাকে ডাকছেন।'

"'কে তিনি?'

"'আসুন, এলে নিজেই দেখতে পাবেন।'

"ইতস্ততঃ করে এই সংক্ষিপ্ত উপদেশটি পালন করতে গিয়ে এলাম একটি গাছতলায় — তার শাখাপ্রশাখার নিচে একজন গুরু তাঁর বেশ দর্শনযোগ্য দলবল নিয়ে বসে আছেন। গুরুজীর জ্যোতির্ময় মূর্তি অপূর্বদর্শন, ঘনকৃষ্ণ চক্ষুদু'টি অত্যুজ্জ্বল। আমার আগমনে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি আমায় আলিঙ্গন করে সস্নেহে বললেন, 'স্বাগত, স্বামীজী'।"

"আমি জোরালো প্রতিবাদ করে বললাম, 'না মশায়, আমায় স্বামীটামী কিছু বলবেন না; আমি ওসব কিছু নই।'

"দৈবাদেশে যাদের আমি "স্বামী" উপাধি দিই, তারা আর তা পরিত্যাগ করতে পারে না।' সাধুটি নিতান্ত সাধারণভাবে কথাগুলি বললেও কথাগুলির মধ্যে সত্যের গভীর দৃঢ়তা ছিল; সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যেন দেবতার আশিসধারায় প্লাবিত হয়ে গেছি। আমার এরূপ হঠাৎ স্বামী

পদবীতে* পদোন্নতি লাভ হওয়াতে একটু হেসে, যিনি আমায় এরূপভাবে সম্মানিত করলেন, সেই নরদেহে দেবতারূপী মহাগুরুর চরণে আমি প্রণাম নিবেদন করলাম।

"বাবাজী — কারণ তিনি ছাড়া আর কেউ নন — সেই গাছতলায় তাঁর নিকটে একটি আসনে আমায় বসতে বললেন। শরীর তাঁর বেশ দৃঢ় আর বলিষ্ঠ — দেখতে ঠিক লাহিড়ী মহাশয়ের মত। যদিও আমি এই দুই মহাগুরুর অদ্ভুত সাদৃশ্যের কথা বহুবার শুনেছিলাম, তবুও কিন্তু তখন তা আমার চোখে ঠিক ধরা পড়েনি। বাবাজীর এমন একটা শক্তি ছিল যে, কারোর মনে কোন বিশেষ চিন্তার উদয় হলে তা তিনি নিবারণ করতে পারতেন। বোধহয় সেই মহানগুরুর এই ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর সামনে আমি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই অবস্থান করি — তাঁর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে বেশি অভিভূত হয়ে না পড়ি।

"'কুম্ভমেলা দেখে কি মনে হয়?'

"'বড়ই হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, মশায়। পরে তাড়াতাড়ি বলে ফেললাম, 'অবশ্য আপনার দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত। কেন জানি না — আমার মনে হয় শান্তশিষ্ট সাধুসন্ন্যাসীদের সঙ্গে এই সব হট্টগোল একেবারেই খাপ খায় না।'

"গুরু মহারাজ বললেন, 'বৎস, (যদিও দেখলে তাঁর দু'গুণ আমার বয়স বলে বোধ হবে) বহুর দোষের জন্যে সবাইকেই একসঙ্গে বিচার করে বোসো না। পৃথিবীতে সব জিনিসই ভালমন্দে মিশানো — বালির সঙ্গে চিনির মিশ্রণ যেমন। চতুর পিপীলিকার মত হও; বালি ফেলে রেখে চিনির দানা খুঁটে নাও। যদিও অনেক সাধুসন্ন্যাসী এখানে এখনও মায়া আর ভ্রান্তিবশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তবুও মেলাতে এমন কিছু লোকও আছেন যাঁদের প্রকৃতই ঈশ্বরলাভ হয়েছে।'

"মেলায় এই মহানগুরুর সাথে আমার নিজ দর্শনলাভের কথা স্মরণ করে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁর কথায় সায় দিলাম।

---

* শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী পরে বিহারে বুদ্ধগয়ার মোহান্ত মহারাজের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

"আমি বললাম, 'মশায়, আমি পশ্চিমের বৈজ্ঞানিকদের কথাই ভাবছিলাম। বুদ্ধিতে তাঁরা আমাদের এখানকার সমবেত বেশিরভাগ মানুষের চেয়েও কত বড়। কোন্ সুদূরদেশে ইউরোপ বা আমেরিকায় তাঁরা বাস করেন — তাঁদের ধর্মমতও সব বিভিন্ন, আর এই বর্তমান মেলার মত সব মেলার প্রকৃত মূল্য কি, সে বিষয়েও তাঁরা অজ্ঞ। তাঁরা ভারতবর্ষের ধর্মগুরুদের সাক্ষাৎ পেলে খুবই উপকৃত হতে পারেন। বুদ্ধিবৃত্তিতে তাঁরা খুব উন্নত হলেও বহু প্রতীচীবাসী একেবারে দারুণ জড়বাদী। অন্যেরা বিজ্ঞান বা দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেও সকল ধর্ম যে মূলতঃ এক, সে কথাটা তাঁরা মানেন না। তাঁদের বিশ্বাসটাই হচ্ছে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, যা আমাদের কাছ থেকে তাঁদেরকে চিরতরেই পৃথক করে রেখেছে।'

"কথাটা মনোমত হওয়ায় বাবাজীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, 'দেখছি যে তোমার প্রাচ্য আর প্রতীচ্য এই দুই দেশের জন্যেই বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। সর্বমানবের জন্যেই তোমার উদারহৃদয় যে কেঁদে উঠেছে তা আমি টের পেয়েছি, আর সেইজন্যেই তোমাকে এই জায়গায় ডেকে এনেছি।

"তিনি বলতে লাগলেন, 'পূর্ব আর পশ্চিম এই দুই প্রান্তের মধ্যে কর্ম আর ধর্মসাধনার সুবর্ণময় মধ্যপথ রচনা করা উচিত। পশ্চিমের কাছ থেকে পার্থিব উন্নতির জন্যে ভারতবর্ষের যেমন অনেক কিছু শেখবার আছে, তেমনি তার প্রতিদানে ভারতবর্ষও পশ্চিমকে এমন এক সার্বজনীন প্রণালী শিক্ষা দিতে পারে যাতে করে সে যোগবিজ্ঞানের সুদৃঢ়ভিত্তির উপর তার ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে।

"স্বামীজী, পূর্ব-পশ্চিমের সুসঙ্গত ভবিষ্যৎ আদানপ্রদানের কাজে তোমায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। বছরকয়েক বাদে আমি তোমার কাছে একটি শিষ্যকে পাঠাব যাকে পশ্চিমে যোগ প্রচারের কাজে তোমাকে তৈরী করে নিতে হবে। সেখানে বহু ধর্মপিপাসু আত্মার আকুল আহ্বান বন্যার মত আমার কাছে এসে পৌঁচচ্ছে। আমি অনুভব করছি যে, আমেরিকা আর ইউরোপে বহু সম্ভাব্য সাধুসন্তরা জাগরিত হবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

গল্পের এই স্থানে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাঁর পূর্ণদৃষ্টি আমার মুখের উপর স্থাপিত করলেন।

শুভ্র চন্দ্রালোকে চারিদিক তখন হাসছে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী একটু হেসে শুরু করলেন, "বৎস, তুমিই হচ্ছ সেই শিষ্য, যাকে বাবাজী মহারাজ বহু বছর আগে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।"

শুনে অবশ্য খুবই খুশি হলাম যে বাবাজীই আমাকে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু এও আমি তখন কিছুতেই ভেবে উঠতে পাচ্ছিলাম না যে আমার ভক্তিভাজন গুরুদেব আর তাঁর এই শান্ত আশ্রমভূমি ত্যাগ করে আমি পশ্চিমে গিয়ে থাকব কি করে, আর কি নিয়ে।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তারপর বলতে শুরু করলেন, "বাবাজী তখন ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। আমায় তাঁর কতকগুলো প্রশংসার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের আমি যে কিছু ব্যাখ্যা লিখেছি, সে খবরও তিনি জানেন।

"তারপর সেই মহানগুরু বললেন, 'স্বামীজী, আমার অনুরোধে আর একটি কাজের ভার তোমায় নিতে হবে। তুমি খ্রিস্টীয় আর হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের মূলগত ঐক্য প্রদর্শন করে একটি ছোট্ট বই লেখ না কেন? এই দুই শাস্ত্র থেকে সমভাবের উক্তিসকল পাশাপাশি উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দাও যে, ঈশ্বরের প্রিয়ভক্তেরা সবাই একই সত্য বলে গেছেন — এখন যা মানুষের সাম্প্রদায়িকতার অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন।'

কতকটা সংশয়ের সঙ্গে বললাম, "মহারাজ, এ আপনার কি অদ্ভুত আদেশ! এ কি আমি পালন করতে পারব?"

"বাবাজী মৃদু হেসে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'বাবা, সন্দেহ করছ কেন? আরে এ কার কাজ, আর সবকাজ কেই বা করায় বল? ভগবান আমায় দিয়ে যা কিছুই বলাচ্ছেন, তা সব সত্য হয়ে ফলে যেতে বাধ্য।'

"সাধুমহারাজের আশীর্বাদে মনে নববলের সঞ্চার হল, বই লিখতে সম্মত হলাম। বিদায় নেবার সময় উপস্থিত দেখে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পর্ণাসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালাম।

"গুরুমহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'লাহিড়ীকে জান? একজন মহাপুরুষ, নয় কি, কি বল? আমাদের যে দেখা হয়েছে তা তাকে বোলো।' বলে লাহিড়ী মহাশয়কে জানাবার জন্য আমায় একটা সংবাদ দিলেন।

"বিদায়গ্রহণকালে ভক্তিভরে প্রণাম করে উঠতেই তিনি মধুর হেসে বললেন, 'তোমার বই লেখা শেষ হলেই আমি তোমায় দর্শন দেব — উপস্থিত এখন বিদায়!'

"তার পরদিনই এলাহাবাদ পরিত্যাগ করে কাশীর ট্রেন ধরলাম। গুরুদেবের বাড়ী পৌঁছেই আমি কুম্ভমেলার সেই অপূর্ব সাধুটির সমস্ত বিবরণ তাঁর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলাম।

"শুনে লাহিড়ী মহাশয়ের চোখ দু'টি আনন্দে নেচে উঠল, বলে উঠলেন, 'আরে তাঁকে চিনতে পারলে না — ওঃ, দেখছি যে তা তো তুমি পারবে না কারণ তিনি ইচ্ছে করেই ধরা দেন নি। তিনিই হচ্ছেন আমার অদ্বিতীয় গুরুদেব — পরম ভাগবত বাবাজী মহারাজ!'

"স্তম্ভিত হয়ে বললাম — 'বাবাজী! বলেন কি গুরুদেব, যোগিশ্রেষ্ঠ বাবাজী, এ্যাঁ, আমাদের পতিতপাবন বাবাজী মহারাজ! — যিনি কখনও দৃশ্য কখনও অদৃশ্য! হায় হায়, একবার যদি সে দিন আজ ফিরে আসে আর তাঁর দর্শন পাই, তাহলে তাঁর চরণকমলে ভক্তিনিবেদন করে যে একেবারে ধন্য হয়ে যাই!'

"লাহিড়ী মহাশয় সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'যাক, কিচ্ছু ভেবো না — তিনি তো তোমায় দেখা দেবেন প্রতিজ্ঞা করেছেন, তবে আর ভাবনা কি?'

"তারপর বললাম, 'গুরুদেব, বাবাজী মহারাজ আপনাকে একটি খবর দিতে বলেছেন। তিনি বললেন, "লাহিড়ীকে বোলো যে এ জীবনের সঞ্চিত শক্তি সব ফুরিয়ে আসছে — প্রায় শেষ হয়ে এল বলে!"

"এই রহস্যময় কথাগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই লাহিড়ী মহাশয়ের দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগল — যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ স্পর্শ করেছে। মুহূর্ত মধ্যে তাঁর চারদিকে সবকিছু একেবারে নীরব হয়ে গেল, তাঁর সদাহাস্যময় আনন অবিশ্বাস্যভাবে কঠিন হয়ে উঠল। আসনের উপর কাঠের মূর্তির মত গম্ভীর আর নিশ্চল তাঁর দেহ একেবারে বর্ণহীন হয়ে

পড়ল। দেখেশুনে ভয় পেয়ে গিয়ে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেল। এমন সদানন্দময় পুরুষের এমন ভীতিপ্রদ গাম্ভীর্য আমি জীবনে আর কখনও দেখি নি। উপস্থিত অন্যান্য শিষ্যেরাও ভয়ে ভয়ে তাকাতে লাগল।

"গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে তিন ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর লাহিড়ী মহাশয় পুনরায় তাঁর স্বাভাবিক প্রফুল্লভাব ধারণ করলেন, প্রত্যেক চেলার সঙ্গেই সস্নেহে কথাবার্তা কইতে লাগলেন। সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

"গুরুদেবের এই প্রতিক্রিয়াতে আমি বুঝতে পারলাম যে, বাবাজী মহারাজের সংবাদে এমন একটা নিশ্চিত ইঙ্গিত ছিল যাতে করে লাহিড়ী মহাশয় টের পেয়েছিলেন যে তাঁকে শীঘ্রই দেহরক্ষা করতে হবে। তাঁর ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্যে প্রমাণিত হল যে আমাদের গুরুদেব তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংযম করে এখানকার পার্থিব আকর্ষণের শেষ বন্ধনটুকু ছিন্ন করে সেই পরমপুরুষের অনন্তসত্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি যেমন বলে থাকেন, বাবাজীর উক্তিতে সেটাই ছিল, 'আমি তোমার সঙ্গে সর্বদাই থাকব।'

"যদিও বাবাজী আর লাহিড়ী মহাশয় উভয়েই সর্বজ্ঞ, আর আমার বা অন্য কোনও মধ্যস্থের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সংযোগরক্ষা করবার তাঁদের কোন আবশ্যকতাও ছিল না, তবুও এই সব বড় বড় মহাগুরুগণ প্রায়ই এই সংসারের নাট্যাভিনয়ে সাধারণ মানবচরিত্রের অংশই গ্রহণ করে থাকেন। মাঝে মাঝে তাঁরা কোন লোক মারফৎ অত্যন্ত সাধারণভাবে তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী প্রেরণ করেন, যাতে করে ভবিষ্যতে তাঁদের কথাগুলি ফলে গেলে পর, ঘটনাগুলো যারা শুনবে তাদের দেবে আরও প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মায়।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলে যেতে লাগলেন, "কাশী ছেড়ে শীগগিরই শ্রীরামপুরে ফিরলাম, বাবাজীর অনুরোধে শাস্ত্রসম্বন্ধে লেখা শুরু করবার জন্যে। লেখা শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অমরগুরুর নামে এক কবিতা লিখতে অনুপ্রাণিত হলাম। কলমের মুখ দিয়ে বিনাপ্রয়াসেই শ্রুতিমধুর পদগুলি বেরিয়ে এসে একটি সুন্দর কবিতা রচিত হয়ে গেল — আশ্চর্যের

বিষয় এই যে এর পূর্বে আমি সংস্কৃত ভাষায় কবিতা রচনা করবার জন্যে কখন চেষ্টা পর্যন্তও করি নি।

"নীরব নিশীথে, বাইবেল আর সনাতন ধর্মশাস্ত্রের* তুলনামূলক বিচার আরম্ভ করলাম। প্রভু যীশুখ্রিস্টের বাণী উদ্ধৃত করে দেখালাম যে, বেদের অন্তর্নিহিত সত্যের সঙ্গে তাঁর শিক্ষা মূলতঃ এক। আমার পরমগুরুর† কৃপাতেই আমার বই "দি হোলি সায়েন্স"‡-এর রচনা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়।

গুরুদেব বলতে থাকেন, "লেখা শেষ হবার পরদিন সকালে এখানকার রায়ঘাটে গেলাম গঙ্গাস্নান করতে। ঘাটে তখন কেউ ছিল না; খানিকক্ষণ চুপচাপ রোদে দাঁড়িয়ে একটু আরাম উপভোগ করলাম। তারপর জলে গোটাকতক ডুব দিয়ে বাড়ীমুখো হলাম। পথঘাট জনহীন, কোনও সাড়াশব্দ নেই। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে একমাত্র শব্দ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে আমার গঙ্গানাওয়া ভিজেকাপড়ের শপশপ শব্দ। গঙ্গার তীরে একটা খুব বড় বটগাছ ছিল; সে জায়গাটা পেরিয়ে আসতেই মনে কেমন যেন একটা প্রবল ইচ্ছার উদয় হল — পিছন ফিরে একবার তাকাই। ফিরে দেখি — সেই প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়ায় বসে বাবাজী মহারাজ, আর তাঁকে ঘিরে বসে তাঁর গুটিকতক শিষ্য!

"'স্বাগত, স্বামীজী!' মহাগুরুর মধুর কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করতে নিশ্চিন্ত হলাম যে সত্যিসত্যি আমি কোন স্বপ্ন দেখছি না। বাবাজী বলতে লাগলেন, 'দেখছি যে ভালভাবেই বইখানি লেখা শেষ হয়েছে — যাক, কথা দিয়েছিলাম যে আসব, তাই আজ এসেছি তোমায় ধন্যবাদ দিতে।'

---

* বৈদিকধর্মের শিক্ষাসমষ্টিকেই সনাতন ধর্ম বলা হয়। সনাতন ধর্মকে পরবর্তীকালে 'হিন্দুধর্ম' বলা হয়, যেহেতু মহাবীর আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে গ্রীকরা যখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে অভিযান করে, তখন তারা সিন্ধুনদ তীরবর্তী মানুষদের 'ইন্দুস্' বা 'হিন্দুস্' নামে অভিহিত করে।

† গুরুর গুরুকে পরমগুরু বলে। শ্রীশ্রী লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু বাবাজী মহারাজ ছিলেন স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পরমগুরু। যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া/ সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপের যে সকল সভ্য নিষ্ঠার সঙ্গে ক্রিয়াযোগ অভ্যাস করেন, তাঁদের সকলের আধ্যাত্মিক উন্নতির দায়িত্ব নিয়েছেন পরমতম গুরু মহাবতার বাবাজী মহারাজ।

‡ দি হোলি সায়েন্স, যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত।

"দ্রুতস্পন্দিতহৃদয়ে, তাঁর চরণতলে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে করজোড়ে নিবেদন করলাম, 'পরমগুরুজী, এই কাছেই আমার বাড়ী; আপনি আর আপনার চেলারা দয়া করে সেখানে একটু পায়ের ধূলো দিয়ে কি আমায় কৃতার্থ করবেন না?'

"মহানগুরু মৃদুহাস্যে তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'না বাছা! আমাদের এই গাছতলাটুকুই ভাল; কেন, এ জায়গা তো বেশ আরামের — কোনই কষ্ট নেই।' কি আর করি, অগত্যা আর কোন উপায় না দেখে কাতরনয়নে তাঁকে নিবেদন করলাম, 'পরমগুরু মহারাজ, দয়া করে এখানে একটু অপেক্ষা করুন, কিছু ভাল মিষ্টি নিয়ে আমি এখুনিই ফিরে আসছি!'* মিনিটকতক বাদেই আমি কিছু মিষ্টি নিয়ে ফিরে এলাম। এসে দেখি, কি আশ্চর্য! সেই বিরাট গাছতলায় বাবাজী বা তাঁর দলবলের চিহ্নমাত্রও নাই! ঘাটের চারদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজলাম — নাঃ, কোথাও আর তাঁদের দেখতে পেলাম না, মনে মনে বুঝলাম যে তাঁরা শূন্যে অদৃশ্য হয়েছেন!

"অন্তরে গভীর আঘাত পেলাম। মনে মনে বললাম, 'যাক, আবার আমাদের দেখা হলে তাঁর সঙ্গে কথাই বলব না! নিতান্তই নিষ্ঠুর তিনি, এমনভাবে হঠাৎ চলে যাওয়ার মানে কি?' অবিশ্যি এটা অভিমানের রাগ, তার বেশি আর কিছু নয়।

"মাসকতক বাদে কাশীতে লাহিড়ী মহাশয়কে দর্শন করতে গেলাম। ছোট্ট বৈঠকখানাটিতে ঢুকতেই গুরুদেব একটু হেসে আমায় বললেন, —

"'এস, এস, যুক্তেশ্বর! আচ্ছা আসবার সময় কি তুমি ঘরের দোরগোড়ায় বাবাজী মহারাজকে দেখতে পেলে?'

"আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কই, না তো!'

"'আচ্ছা, তাহলে কাছে এস,' বলে লাহিড়ী মহাশয় আমার কপালের মাঝখানে হাত দিয়ে মৃদুস্পর্শ করলেন; সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলাম দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাবাজীর জীবন্তমূর্তি — একটি পরিপূর্ণ শতদলের মতই প্রস্ফুটিত।

---

* ভারতবর্ষে গুরুদর্শনে মিষ্টান্ন নিবেদন না করাটা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন বলেই বিবেচিত হয়।

"আমার সেই পুরানো আঘাতের কথা মনে পড়ল। প্রণাম করলাম না। লাহিড়ী মহাশয় অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

"বাবাজী মহারাজ তাঁর অতল স্নেহকোমল চোখদু'টি আমার ওপর স্থাপন করে বললেন, 'তুমি আমার উপর বড়ই বিরক্ত হয়েছ, তাই না?'

"আমি বললাম, 'কেনই বা হব না বলুন! আপনার ভোজবাজির দলবল নিয়ে আপনি শূন্য থেকে উড়ে এলেন আবার সেই শূন্যেতেই মিলিয়ে গেলেন!'

"বাবাজী অতি স্নিগ্ধমধুর হেসে বললেন, 'আমি শুধু বলেছিলাম যে আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব — কিন্তু কতক্ষণ ধরে থাকব, তা' তো আমি কিছুই বলিনি। তুমি তখন খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলে। তবে আমি একথা বলব যে তোমার চঞ্চলতার দাপটে আমি প্রায় শূন্যেই মিলিয়ে গিয়েছিলাম আর কি!'

"এই সরল উত্তরে আমার মনের সকল ক্ষোভ তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে গেল। তাঁর চরণতলে নতজানু হয়ে বসলাম; বাবাজী মহারাজ সস্নেহে আমার কাঁধ চাপড়ে দিলেন।

"তারপর বাবাজী আমায় বললেন, 'বাবা, আরও ধ্যান কর, আরও ধ্যান কর — তোমার দৃষ্টি এখনও বেশ নির্দোষ হয় নি; সূর্যের আলোর পিছনে যে আমি লুকিয়ে আছি, তা' তো তুমি আমায় দেখে বার করতে পারলে না।' স্বর্গীয় মধুর বংশীধ্বনির মত এই কথাগুলো বলেই বাবাজী মহারাজ অনন্ত জ্যোতিঃর মধ্যে বিলীন হয়ে গেলেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বললেন, "গুরুদর্শনের জন্যে কাশী যাওয়া সেই বোধহয় আমার শেষ বা তারপর এক আধবার হয়ত গিয়েছিলাম। কুম্ভমেলায় বাবাজী ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহী জীবন শীঘ্রই শেষ হয়ে আসছে! ১৮৯৫ সালের গ্রীষ্মকালে তাঁর বলিষ্ঠ দেহের পৃষ্ঠদেশে একটি ক্ষুদ্র স্ফোটকের উৎপত্তি হয়। তিনি শস্ত্রপ্রয়োগ করতে বারণ করলেন, কারণ তিনি নিজদেহে তাঁর কিছু শিষ্যের কর্মফল ক্ষয় করে নিচ্ছিলেন। শেষে তাঁর কতকগুলো শিষ্য খুব জোরজবরদস্তি করাতে গুরুদেব রহস্যময়ভাবে উত্তর দিলেন, 'শরীর লয় হওয়ার একটা

কারণ তো থাকা চাই; আচ্ছা তোমাদের যা ইচ্ছে হয় কর, তাতেই আমি রাজী — কোন আপত্তিই আমি আর করব না।'

"অল্প কিছুকাল পরেই সেই অদ্বিতীয় গুরুশ্রেষ্ঠ লাহিড়ী মহাশয় কাশীতে দেহরক্ষা করেন। তাঁর সেই ছোট্ট বৈঠকখানাটিতে আর আমায় তাঁর দর্শনলাভের জন্য যেতে হয় না। এখন আমার জীবনের প্রতিটি দিনই তাঁর সর্বব্যাপী নির্দ্দেশনার আশীর্বাদপূত!"

অনেক বছর বাদে, তাঁর একজন খুব উন্নতশিষ্য স্বামী কেশবানন্দ মহারাজের* মুখ থেকে লাহিড়ী মহাশয়ের তিরোধানের বহু আশ্চর্যজনক ঘটনার বিবরণ শুনেছিলাম।

কেশবানন্দজী বলেছিলেন, "আমার গুরুদেব তাঁর দেহরক্ষা করবার কয়েকদিন আগেই হরিদ্বারে আমার আশ্রমে সশরীরে আবির্ভূত হয়ে আমাকে দর্শনদান করেন! 'কাশীতে এক্ষুনি চলে এস' — বলেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যান।

"কালবিলম্ব না করে তখনই গিয়ে কাশীর গাড়ী ধরলাম। গুরুদেবের বাড়ীতে পৌঁছেই দেখলাম যে বহু শিষ্য সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। সেইদিন† ঘণ্টাকতক ধরে গুরুদেব গীতা ব্যাখ্যা করলেন; তারপর তিনি আমাদের শুধু বললেন, 'এবার আমি বাড়ী যাচ্ছি।' শুনে সমবেত শিষ্যমণ্ডলী আসন্নবিচ্ছেদের আশঙ্কায় অদম্য ক্রন্দনের বেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

"'তোমরা শান্ত হও, কোন ভয় নেই; আবার আমি তোমাদের দেখা দেব।' এই কথাগুলো বলে তিনি তাঁর দেহটিকে তিনবার চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করিয়ে উত্তরমুখ হয়ে পদ্মাসনে বসলেন, তারপর পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক গরিমার মধ্যে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হলেন।‡

---

* আমার কেশবানন্দজীর আশ্রমদর্শন ৪২ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

† ১৮৯৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে লাহিড়ী মহাশয় দেহত্যাগ করেন। আর দিনকতক বাদেই তাঁর সাতষট্টি বছরের জন্মদিন এসে যেত।

‡ শরীরকে তিনবার চক্রাকারে ঘুরিয়ে উত্তরমুখো হয়ে উপবেশন হচ্ছে বৈদিকক্রিয়া-কাণ্ডের একটি অংশ আর তা অনুসৃত হত বড় বড় মহাগুরুদের দ্বারা, যাঁরা পূর্ব হতেই জানতে পারতেন যে তাঁদের অন্তিমসময় নিকটবর্তী হয়ে এসেছে। শেষধ্যানে বসে গুরু যখন পরমসত্তায় বিলীন হন তখন তাকে বলা হয় 'মহাসমাধি'।

"ভক্তদের প্রাণপ্রিয় লাহিড়ী মহাশয়ের মর্ত্যদেহ পবিত্র গঙ্গাতীরে মণিকর্ণিকা ঘাটে দাহ করা হয়। শেষকৃত্যের সময় গৃহস্থের সমস্ত অনুষ্ঠান যথোচিত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়েছিল।" কেশবানন্দজী বলতে লাগলেন, "তার পরদিন — তখনও আমি কাশীতে রয়েছি — সকালবেলা প্রায় দশটা নাগাদ আমার ঘরটি হঠাৎ এক অপূর্ব জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আশ্চর্য! চেয়ে দেখি যে রক্তমাংসের শরীরে লাহিড়ী মহাশয় আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে! তাঁর মূর্তি ঠিক আগেকারই মত, তফাৎ এইটুকুমাত্র যে তা যেন আরও বেশি তরুণ আরও জ্যোতিঃসমুজ্জ্বল হয়েছে।

"আমার গুরুদেবতা তখন আমার সঙ্গে কথা কইলেন। তিনি বললেন, 'কেশবানন্দ, এ আমি। আমার দাহকরা শরীরের শূন্যে বিলীন অণুপরমাণু হতে পুনর্গঠিত হয়ে আবার আমার মূর্তির পুনরুত্থান হয়েছে। পৃথিবীতে আমার গৃহস্থের কর্তব্য শেষ হয়েছে। কিন্তু আমি এ পৃথিবী ছেড়ে একেবারে যাচ্ছি না। এরপর আমি বাবাজী মহারাজের সঙ্গে কিছুকাল হিমালয়ে এবং তারপরে তাঁর সঙ্গে অন্তরীক্ষে বাস করব।'

"কয়েকটি আশীর্বাণী উচ্চারণ করে সেই অদ্বিতীয় মহাগুরু তখন অদৃশ্য হয়ে গেলেন; আশ্চর্য একটা উদ্দীপনা এসে আমার অন্তর পরিপূর্ণ করে দিলে। যীশুখ্রিস্ট আর কবীরের* জড়দেহের মৃত্যুর পর আবার

---

* সন্ত কবীর হচ্ছেন ষোড়শ শতাব্দীর একজন মহানগুরু; তাঁর বহু হিন্দু ও মুসলমান শিষ্য ছিলেন। দেহরক্ষার পর তাঁর শেষকৃত্যের ব্যবস্থা নিয়ে এই উভয়বিধ শিষ্যদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। মহানগুরু অত্যন্ত বিব্রত হয়ে তাঁর মহানিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে উপদেশ দিলেন — তাঁর দেহাবশেষের অর্ধাংশ মুসলমান ধর্মানুযায়ী প্রোথিত করা হবে, আর অপরাংশ হিন্দু সংস্কারানুযায়ী দাহ করা হবে।" তারপরেই তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। শিষ্যের দল শবাচ্ছাদন [illegible] উত্তোলিত করতেই দেখা গেল, শবের পরিবর্তে সেখায় গুচ্ছগুচ্ছ পুষ্প সজ্জিত রয়েছে। এর অর্ধাংশ মুসলমানেরা মঘর নামক স্থানে তাঁর অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রোথিত করেন। উক্তস্থান অদ্যাবধি তীর্থরূপে পূজা পেয়ে আসছে। অপরাংশ হিন্দুমতে কাশীতে দাহ করা হয়। সেখানে 'কবীর চৌরা' নামে এক মন্দির গড়ে ওঠে; অগণিত তীর্থযাত্রী তা দেখতে যান।

যৌবনে কবীরের নিকট দুইটি শিষ্য এসে উপস্থিত হয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য সূক্ষ্মজ্ঞানমার্গের প্রবেশপথের নির্দেশ অনুসন্ধান করাতে কবীর শুধু বললেন, —

"পথের সন্ধান করলেই দূরত্বের কথা এসে পড়ে; তিনি যদি তোমার নিকটেই থাকেন, তবে আর পথের খোঁজের দরকার কি? তাই যখন ভাবি যে গভীরজলে মীন পিয়াসী, তখন আমার বড় হাসি পায়।"

তাঁদের জীবন্তদেহ দর্শন করে তাঁদের শিষ্যদের মনে যেমন অপূর্বভাবের সঞ্চার হয়েছিল, আমার মনেও তেমনি একটা উন্নতভাবের উদয় হল।

"কেশবানন্দজী বলতে লাগলেন, 'হরিদ্বারে নির্জন আশ্রমে ফিরে যাবার সময় আমি আমার গুরুদেবের পবিত্র চিতাভস্ম সযত্নে সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি জানি, দেশকালে সীমাবদ্ধ এই দেহপিঞ্জর থেকে তিনি পালিয়ে গেছেন; তাঁর সর্বব্যাপী প্রাণপাখী আজ মুক্ত! তবুও তাঁর পুণ্য দেহাবশেষ সমাধিস্থ করে হৃদয় কতকটা শান্ত হল!'"

লাহিড়ী মহাশয়ের একজন শিষ্য যিনি মৃত্যুর পর পুনরাবির্ভূত গুরুর মূর্তি দর্শন করে কৃতার্থ হয়েছিলেন, তিনি হচ্ছেন সাধুপ্রকৃতির পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়।* পঞ্চানন বাবুর কলকাতার বাড়ীতে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম; গুরুর সঙ্গে তাঁর বহু বৎসর অবস্থিতির কাহিনী শুনে বিশেষ আনন্দলাভ করলাম। পঞ্চাননবাবু তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক যে ঘটনা বলে শেষ করেন, তা হচ্ছে এই —

"লাহিড়ী মহাশয়ের শেষকৃত্যের পরের দিন বেলা ঠিক দশটার সময় এই কলকাতার বাড়ীতে এসে তিনি আমায় জীবন্ত শরীরে দেখা দিয়ে যান।"

স্বামী প্রণবানন্দজীও — সেই "দুই দেহধারী সাধু" — তাঁর অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলেছিলেন।

রাঁচি বিদ্যালয়ে যখন প্রণবানন্দজী বেড়াতে আসেন তখন একদিন তিনি আমায় বলেন যে, "লাহিড়ী মহাশয় দেহরক্ষা করবার অল্প কিছুদিন আগে আমি তাঁর কাছ থেকে একখানি পত্র পাই; তাতে আমাকে অবিলম্বে কাশীতে রওনা হবার কথা লেখা ছিল। আমার কিছু দেরী হয়ে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারি নি। যাবার উদ্যোগ আয়োজন করছি — বেলা তখন দশটা, হঠাৎ দেখি গুরুদেবের প্রাজ্জ্বল মূর্তি আমার সামনে দাঁড়িয়ে — বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

"লাহিড়ী মহাশয় তখন একটু হেসে বললেন, 'এখন আর তাড়াতাড়ি কাশী গিয়ে কি হবে? আর তো তুমি সেখানে আমায় দেখতে পাবে না!'

* পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয় বিহার প্রদেশে দেওঘরে ১৭ একর এক উদ্যানবাটিকায় একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে লাহিড়ী মহাশয়ের একটি তৈলচিত্র রক্ষিত আছে।

"কথাগুলোর অর্থ যখন পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম তখন শোকে, দুঃখে, হতাশায় বুক যেন ভেঙে গেল; ক্রন্দনাবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম — মনে হতে লাগল যে সামনে যা দেখছি এ তাঁর প্রকৃত মূর্তি নয়, কেবলমাত্র যেন স্বপ্নেই তাঁকে দেখছি।

"গুরুদেব সান্ত্বনা দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'এই দেখ — আমার শরীর ছুঁয়ে দেখ; বরাবরই যেমন, আজও তেমনি আমি বেঁচে আছি, কই মরিনি তো। ছিঃ, আমার জন্যে শোক কোরো না; তোমার সঙ্গে তো আমি চিরদিনই আছি, তবে আর দুঃখ কিসের?'"

এই তিনটি মহান শিষ্যদের মুখ হতে যে আশ্চর্য ঘটনাটি নিঃসৃত হয়েছিল তা থেকে এই সত্যটি পাওয়া যায় যে, লাহিড়ী মহাশয়ের দেহরক্ষার পর তাঁর পুণ্যদেহ চিতাগ্নিতে ভস্মসাৎ হবার পরদিন সকালে বেলা দশটা নাগাদ, তিনটি বিভিন্ন শহরে তাঁর তিনটি প্রধান শিষ্যের সম্মুখে প্রকৃতই রক্তমাংসের শরীরে রূপান্তরিত লাহিড়ী মহাশয় প্রত্যক্ষভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

"সুতরাং যখন এই নশ্বরদেহ অক্ষয়ত্ব লাভ করবে আর এই মরজীবন অমরত্ব লাভ করবে, তখন যে উক্তি লিখিত আছে তাই ঘটবে। মৃত্যু বিজিত। মরণ, কোথায় তোমার দংশন? সমাধি, তোমারই বা জয় কোথায়?"*

* ১ করিন্থিয়ানস্ — ১৫ : ৫৪-৫৫ (বাইবেল)। "ঈশ্বর যে মৃতদের পুনরুত্থান করেন, এ চিন্তা তোমার কাছে অবাস্তব মনে হবে কেন?" — অ্যাক্টস্ ২৬ : ৮ (বাইবেল)।

৩৭ পরিচ্ছেদ

আমার আমেরিকা গমন

রাঁচি বিদ্যালয়ের ভাঁড়ারঘরে* কতকগুলো ধুলোমাখা বাক্সর পিছনে বসে আছি; জায়গাটা এমন আড়ালকরা যে ছেলেরা কেউ চট করে তা খুঁজে পাবে না। বসে বসে খুব গভীরভাবে চিন্তা করছি হঠাৎ আমার মানসপটে পশ্চিমবাসী লোকেদের কতকগুলো মুখের দৃশ্যপট যেন ভেসে উঠল। দেখেই মনে হল, "আরে এ তো আমেরিকা, আর এ লোকগুলো তো আমেরিকান দেখছি!"

স্বপ্ন তখনও ভাঙেনি। এক বিরাট জনতা† আমার মুখের দিকে আগ্রহের সঙ্গে তাকাতে তাকাতে আমার জ্ঞানমঞ্চে অভিনেতাদের মত একে একে চলে যেতে লাগল।

ভাঁড়ারঘরের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। যা ভয় করেছিলাম, তাই। একটা ছেলে আমার লুকোবার জায়গাটা ঠিক খুঁজে বার করে ফেলেছে।

যাইহোক, মনটা ছিল তখন বেশ প্রসন্ন; একটু খুশি খুশি হয়ে বললাম, "এস, এস বিমল, একটা সুখবর আছে। ভগবান আমায় আমেরিকায় ডাক দিয়েছেন যে!"

"আমেরিকায়? এ্যাঁ বলেন কি — আমেরিকায়?" বিমল আমার কথাগুলোর এমনভাবে প্রতিধ্বনিত করল যেন আমি আমেরিকা না বলে "চন্দ্রলোকে" যাবার কথাই তাকে বলেছি।

---

* পরমহংসজী যেখানে দিব্যদর্শন লাভ করেন, রাঁচীর পূর্বেকার সেই ভাণ্ডারগৃহের স্থলে ১৯৯৫ সালে শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দের আমেরিকা গমনের ৭৫ বার্ষিকী উপলক্ষে, একটি সুন্দর স্মৃতিমন্দির উৎসর্গ করা হয়।

† তাদের মধ্যে অনেকেরই মুখ আমি পশ্চিমে গিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম, আর দেখামাত্রই চিনতে পেরেছিলাম।

বললাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমেরিকা! কলম্বাসের মত আমেরিকা আবিষ্কার করতেই যাচ্ছি। তিনি তো ভেবেছিলেন যে তিনি ভারতবর্ষই আবিষ্কার করে ফেলেছেন! যাক, দেখা যাচ্ছে যে এই দু'টি দেশের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা কর্মসূত্রের যোগ আছে।"

বিমল তো শুনে আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে গেল। শীগগিরই এই দু'পেয়ে খবরের কাগজের দৌলতে খবরটি সারা স্কুলময় ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্যালয়ের হতভম্ব কর্তৃপক্ষকে বিদ্যালয়ের ভার অর্পণ করবার সময় বললাম, "আমার বিশ্বাস অবশ্যই আছে যে, শিক্ষাদান বিষয়ে আপনারা লাহিড়ী মহাশয়ের যোগের আদর্শ সর্বদা সম্মুখে রেখেই অগ্রসর হবেন। প্রায়ই আমি আপনাদের চিঠিপত্র লিখব, কিছু ভাববেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে একদিন আবার ফিরে আসব।"

রাঁচির সেই রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুবিস্তীর্ণ ভূমি আর আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্রদের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই চক্ষুদু'টি অশ্রুপূর্ণ হয়ে এল। বুঝলাম, আমার জীবনের একটা নির্দিষ্ট অধ্যায় এখানেই শেষ হল। এরপর থেকে বহু দূরদেশে আমায় বাস করতে হবে। আমার স্বপ্নদর্শনের ঘণ্টাকয়েকের মধ্যে রাঁচি পরিত্যাগ করে কলকাতার গাড়ীতে চেপে বসলাম। কলকাতায় গিয়ে তারপরদিনই আমি আমেরিকার উদার ধর্মমতাবলম্বীদের আন্তর্জাতিক কংগ্রেস (ইণ্টারন্যাশন্যাল কংগ্রেস অফ্ রিলিজিয়াস লিবারেলস্ ইন আমেরিকা) হতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য একটি নিমন্ত্রণপত্র পাই। আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অধীনে সে বছর এর অধিবেশন বোস্টন শহরে হবার কথা ছিল।

মাথা কেমন ঘুরছে, বুদ্ধি গুলিয়ে যাবার যোগাড়। কি করি, ছুটলাম শ্রীরামপুরে — গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বরজীর কাছে পরামর্শ নিতে।

বললাম, "গুরুজী, এইমাত্র আমি আমেরিকা হতে একটা নিমন্ত্রণপত্র পেলাম, সেখানে এক ধর্মমহাসম্মেলনে আমায় বক্তৃতা দেবার জন্যে ডেকেছে; আমি কি যাব?"

গুরুদেব শুধুমাত্র বললেন, "সকল দুয়ারই তো তোমার জন্যে খোলা জানবে; এখন না হলে আর কখনও তোমার যাওয়া হবে না।"

সভয়ে বললাম, "কিন্তু গুরুদেব, সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়ার তো আমার কোন অভ্যেস নেই, আর তার কিই বা আমি জানি বলুন। কচিৎ কদাচিৎ দিয়ে থাকলেও ইংরেজীতে তো কখনই নয়।"

"আরে ইংরেজী হোক আর নাই হোক, যোগের বিষয়ে তোমার কথা পশ্চিমের সবাই শুনবে, দেখে নিও।"

আমি হেসে ফেললাম; শেষে বললাম, "গুরুজী, আমার বক্তৃতা শুনতে আমেরিকানরা কি বাংলা শিখবে ভেবেছেন নাকি? যাইহোক, ইংরেজী ভাষাতে বক্তৃতা দেবার দারুণ পরীক্ষা যাতে উত্তীর্ণ হতে পারি তার জন্যে আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন।"

বাড়ীতে ফিরে এলাম। পিতার কাছে মতলবটি খুলে বলতে তিনি তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। আমেরিকা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য রকমের দূরদেশ; তাঁর ভয় হল, আমায় আর তিনি দেখতে পাবেন না।

তিনি রুক্ষভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি যাবে কি করে? আর তোমায় টাকাই বা কে দেবে শুনি?"

যেহেতু তিনি আমার শিক্ষা আর সারাজীবনের ভার সাদরে বহন করে এসেছেন, সেহেতু তিনি নিঃসংশয়ে আশা করেছিলেন যে আমার মতলব এই একটিমাত্র প্রশ্নের আঘাতেই কাৎ হয়ে যাবে। বললাম, —

"ভগবানই নিশ্চয় আমায় টাকা জুগিয়ে দেবেন।" এই উত্তর দেবার সময় মনে পড়ল যে ঠিক এইরকমই উত্তর বহুপূর্বে আমি আগ্রায় আমার দাদা অনন্তকে দিয়েছিলাম। কোনরকম চাতুরী না করে সোজাসুজিভাবেই বলে ফেললাম, "বাবা, আমায় সাহায্য করতে ভগবানই হয়তো আপনার মন ঠিক করে দেবেন।"

"না, কখনই নয়।" বলে তিনি আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

কিন্তু তার পরদিন যখন বাবা এক মোটা টাকার চেক আমার হাতে তুলে দিলেন, তখন আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম।

চেকটি দিয়ে তিনি আমায় বললেন, "দেখ, তোমায় যে আমি এই টাকাটা দিচ্ছি, তা তোমার আমি বাবা বলে নয় — লাহিড়ী মহাশয়ের

একজন ভক্তশিষ্য বলে। এখন পাশ্চাত্যে গিয়ে সেখানে জাতিধর্মনির্বিশেষে ক্রিয়াযোগের বাণী প্রচার কর।"

যে নিঃস্বার্থভাব প্রণোদিত হয়ে পিতা তাঁর ব্যক্তিগত অভিলাষ, স্বার্থচিন্তা সবকিছু দমন করে ফেললেন, তা দেখে আমার অন্তর গম্ভীরভাবে মুগ্ধ হয়ে গেল। বিদেশভ্রমণের খুব সাধারণ একটা ইচ্ছা যে আমার সমুদ্রযাত্রার মতলব নয়, এ সত্য আগের দিন রাত্রিতেই পিতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পিতার বয়স তখন সাতষট্টি — তাই অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে বললেন, "তুমি তো চলে যাচ্ছ, বোধহয় এ জীবনে আর আমাদের কখনও দেখা হবে না।"

মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে দিল — বললাম, "ভগবান নিশ্চয়ই অন্ততঃ আর একবার আমাদের দু'জনের দেখা করিয়ে দেবেন! কিচ্ছু ভাববেন না বাবা!"

আমার জন্মভূমি, আমার গুরুদেব, সব ত্যাগ করে আমেরিকার কোন্ অজানা দেশে পাড়ি জমাবার জন্যে যখন তৈরী হতে লাগলাম — মন যে ভয়ে একটুও কাঁপেনি তা নয়। প্রচণ্ড জড়বাদী প্রতীচ্যের সম্বন্ধে নানা গল্প আমি অনেক শুনেছিলাম — সে সব, ভারতের সাধুসন্ন্যাসীদের শতশত বৎসরের গভীরসাধনালব্ধ আধ্যাত্মিক পটভূমি হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভাবলাম, "প্রাচ্যের কোন লোকগুরু, যিনি প্রতীচ্যের জীবনধারার মধ্যে প্রবেশ করবার সাহস করবেন, তাঁকে হিমালয়ের দারুণ শৈত্যের মধ্যে কঠিন তপস্যার চেয়েও কঠোরতর সাধনার সম্মুখীন হতে হবে।"

অতিপ্রত্যূষে উঠে একদিন প্রার্থনা শুরু করলাম, মনে এই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে যে ঈশ্বরের বাণী শুনতে না পাওয়া পর্যন্ত প্রার্থনা করেই যাব — মরেও যদি যাই, তাহলেও উত্তর না শোনা অবধি তা বন্ধ হবে না। আমার প্রার্থনা ছিল, মনে আশ্বাস, দৃঢ়বল, সাহস আর সর্বোপরি তাঁর আশীর্বাদ, যাতে করে আমি আধুনিক উপযোগবাদের কুজ্ঝটিকার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে না ফেলি। আমেরিকায় যাবার জন্যে মন পূর্ব হতেই স্থির করে ফেলেছিলাম বটে, কিন্তু প্রথমে ঈশ্বরের অনুমতি আর তাঁর আশ্বাসবাণী শোনবার জন্যে মনের সঙ্কল্প আরও দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল।

প্রার্থনা চলতে লাগল — বিরাম নেই। বুকের কান্না বুকে চেপে রেখে অনড় হয়ে বসে সমস্ত অন্তর উজাড় করে ঈশ্বরচরণে আমার কাতর প্রার্থনা করুণভাবে নিবেদন করতে লাগলাম। তথাপি কোন উত্তর পেলাম না! আমার নীরব-প্রার্থনা ক্রমশঃ গভীর হতে গভীরতর হতে লাগল, মনে দারুণ যন্ত্রণা। দুপুরবেলা নাগাদ মনে হল যেন চরমে পৌঁচেছি — যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারছি না। মনের আকুলআবেগে আরও গভীরভাবে ক্রন্দন করতে গেলে, মনে হচ্ছিল যেন মাথা বুঝি এখুনিই ফেটে যাবে!

সেই মুহূর্তে আমাদের বসত বাড়ীর সদর দরজায় একটা কড়ানাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। দরজা খুলে দেখি, কৌপীনধারী এক নবীন সন্ন্যাসী। তিনি বাড়ীতে প্রবেশ করলেন।

হতভম্ব হয়ে গিয়ে ভাবলাম যে, "ইনি নিশ্চয়ই বাবাজী হবেন!" — কারণ আমার সম্মুখে যিনি উপস্থিত, তাঁর আকৃতিতে লাহিড়ী মহাশয়ের যুবাবয়সের সাদৃশ্য আছে।

আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন তিনি জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আমিই বাবাজী।" তারপর অতি মধুর হিন্দীতে বললেন, "আমাদের পরমপিতা পরমেশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন; তিনি তোমায় বলতে আমাকে আদেশ করেছেন যে, তুমি গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে আমেরিকায় যাও। ভয় কোরো না। ঈশ্বরই সর্বদা তোমায় রক্ষা করবেন।"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর বাবাজী পুনরায় বলতে শুরু করলেন, "তোমাকেই আমি পশ্চিমে ক্রিয়াযোগের বাণী প্রচার করবার জন্যে মনোনীত করেছি। বহুদিন পূর্বে কুম্ভমেলায় তোমার গুরুদেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তখনই আমি তাঁকে বলেছিলাম যে তোমাকেই আমি তাঁর কাছে শিক্ষার জন্যে পাঠাব।"

তাঁর আগমনে, আর তিনিই যে আমায় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর কাছে পাঠিয়েছিলেন — তাঁর স্বমুখনিঃসৃত এ কথাগুলো শুনে, ভয়ে-ভক্তিতে আমি নির্বাক নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আমি সেই অমর মহাগুরুর পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম। ভূমি হতে সযত্নে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে আমার জীবনের নানাকথা তিনি আমাকে শোনালেন।

তারপর তিনি আমায় কতকগুলো ব্যক্তিগত উপদেশ দিয়ে কয়েকটি গুপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী করলেন।

পরিশেষে তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, "ঈশ্বরানুভূতির যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অর্থাৎ ক্রিয়াযোগ, তা সবদেশেই একদিন বিস্তারলাভ করবে — আর অনন্তকরুণাময় পরমপিতার ব্যক্তিগত অতীন্দ্রিয় অনুভবের মধ্য দিয়েই মানবজাতিসমূহের মিলন সাধিত হবে।"

তারপর, তাঁর মহিমময় দিব্যদৃষ্টিবলে, সেই মহানগুরু তাঁর ব্রহ্মজ্ঞানের স্ফুরণে আমাকে যেন বিদ্যুতাঞ্চিত করে তুললেন।

"দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ।।

হঠাৎ যদি কখন আকাশে সহস্র সহস্র সূর্যের প্রভা (দীপ্তি) একাকালে সমুত্থিত হয়, তবে সেই প্রভার সহিত ঐ মহান বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য হতে পারে।"*

তারপরেই দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে তিনি বললেন, "আমায় অনুসরণের চেষ্টা কোরো না — তা তুমি পারবে না।" আমি তখন তাঁকে বারম্বার বলতে লাগলাম, "বাবাজী মহারাজ, দয়া করে যাবেন না, যাবেন না — আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে যান।"

তিনি শুধু বললেন, "এখন নয়, আর এক সময়।"

ভাবে অভিভূত হয়ে আমি তাঁর বারণ অগ্রাহ্য করে এগোতে গিয়েই দেখলাম যে আমার দু'টি পা-ই মেঝেতে একেবারে শক্ত হয়ে এঁটে বসে গেছে। দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে বাবাজী একবার আমার প্রতি শেষ সস্নেহ দৃষ্টিপাত করলেন, তারপর আশীর্বাদচ্ছলে একবার হাত তুলেই তিনি প্রস্থান করলেন — আমার দৃষ্টি তখনও তাঁর উপর স্থিরভাবে সংলগ্ন।

মিনিট কতকবাদেই আমার পা খুলে গেল। আসনে বসে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলাম; ভগবানের প্রতি আমার অজস্র ধন্যবাদ জানালাম শুধু যে

---

* ভগবদ্‌গীতা — ১১ অধ্যায়, ১২ শ্লোক।

তিনি আমার প্রার্থনা পূরণ করেছেন তাই নয় — বাবাজী দর্শনদানে আমাকে আশীর্বাদপূত করেছেন — এই বলেও। আমার সর্বশরীর সেই প্রাচীন অথচ চিরনবীন মহানগুরুর পুণ্যস্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছে। তাঁকে দেখবার জন্যে একটা প্রবল আগ্রহ বহুদিন থেকেই মনের মধ্যে ছিল, আজ তা মিটল।

বাবাজীর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা এ' পর্যন্ত আমি কারুর কাছেই বলিনি। আমার মানবজীবনের এক পবিত্রতম অভিজ্ঞতা হিসেবে মনে করে আমি সেকথা অন্তরে লুক্কায়িতই রেখেছিলাম। কিন্তু এই চিন্তা আমার মনে উদিত হল যে, এই আত্মজীবনীর পাঠকবর্গ সেই নিঃসঙ্গ বাবাজী আর জগতের উন্নতিতে তাঁর আগ্রহের বিষয়ে সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন, যদি আমি বলি যে আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছি। আমি একজন চিত্রশিল্পীকে আধুনিক ভারতের মহাযোগি বাবাজী মহারাজের প্রকৃত আলেখ্য চিত্রিত করতে সাহায্য করেছি; সেই চিত্র এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আমেরিকা যাবার প্রাক্কালে আমি শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পুণ্যপদতলে প্রণাম নিবেদন করে বিদায় গ্রহণ করতে গেলাম।

গুরুদেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ শান্তস্বরে আমায় জ্ঞানোপদেশ দিয়ে বললেন, "ভুলে যাও যে তুমি একজন হিন্দু হয়ে জন্মেছ, আর মার্কিনদের জীবনধারার সব কিছুও গ্রহণ করে বোসো না। উভয়ের যা কিছু ভাল, তাই গ্রহণ কোরো। অমৃতের পুত্র তুমি — তোমার যা স্বরূপ, তাইতেই প্রকাশিত হোয়ো। আর পৃথিবীর চারদিকে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তোমার যে সব ভাইয়েরা, তাদের মধ্যে যা কিছু সব সদ্‌গুণ তা নিয়ে নিজেকে গড়ে তুলো।"

তারপর তিনি আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "ঈশ্বরের সন্ধানে যারাই তোমার কাছে বিশ্বাস নিয়ে আসবে, সকলেই তারা উপকৃত হবে। তাদের প্রতি তোমার দৃষ্টিপাতে, তোমার চক্ষু দু'টি হতে নির্গত অধ্যাত্মশক্তি প্রবাহ তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাদের পার্থিব অভ্যাসের পরিবর্তন সাধিত করবে ও তাদের আরও বেশি ঈশ্বরমুখী করে তুলবে।"

তারপর মৃদু হেসে তিনি বললেন, "প্রকৃত ধর্মপিপাসু লোকেদের আকর্ষণ করবার ভাগ্যও তোমার খুব ভাল। যেখানেই তুমি যাওনা কেন — এমন কি বনেজঙ্গলে গেলেও তুমি বন্ধু খুঁজে পাবে।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর এই উভয় আশীর্বাদই বহুলাংশে পূর্ণ হয়েছিল। আমেরিকায় এলাম একলা — যেখানে একটিও বন্ধু নেই, কিন্তু এসে দেখলাম যে হাজার হাজার মানুষ শাশ্বত সনাতন আধ্যাত্মিকশিক্ষা গ্রহণ করবার জন্য উৎসুক আগ্রহে সেখানে অপেক্ষা করছে।

১৯২০ সালে অগ্যাস্ট মাসে "সিটি অফ্ স্পার্টা" নামক জাহাজে আমি ভারতবর্ষ ত্যাগ করলাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সেইটাই হচ্ছে আমেরিকাগামী প্রথম যাত্রীবাহী জাহাজ। পাসপোর্ট পাবার সরকারী আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির বহু হাঙ্গামাহুজ্জত, বলতে গেলে প্রায় অলৌকিক উপায়ে এড়িয়ে, তবে জাহাজে স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।

এই দু'মাস ধরে সমুদ্রযাত্রার মাঝখানে একজন সহযাত্রী আবিষ্কার করে ফেললেন যে বোস্টন কংগ্রেসে আমি এক ভারতীয় প্রতিনিধি।

তিনি বললেন, "সোয়ামী ইয়োগানান্দ" — মার্কিনেরা পরে আমার নাম যে সব অদ্ভুত উচ্চারণে উচ্চারিত করেছিল তাঁর মধ্যে এইটেই অবিশ্যি সর্বপ্রথম — "এই বৃহস্পতিবার রাত্রে আপনি অনুগ্রহ করে সহযাত্রীদের সামনে একটি বক্তৃতা দেন না কেন? আমার মনে হয় বক্তৃতার বিষয় 'জীবনযুদ্ধ ও তা জয়ের উপায়' হলে সবাইকার শুনতে ভাল লাগবে, কি বলেন?"

হা ভগবান, বুধবার রাত্রেই আমি আবিষ্কার করলাম যে আমার নিজেরই জীবনযুদ্ধের লড়াই-এ এখন আমায় নামতে হবে! ইংরেজীতে বক্তৃতা দেবার জন্যে ভাবটাবগুলো একটু আধটু গুছিয়ে নেবার জন্যে খানিকক্ষণ ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করবার পর শেষে একেবারে হাল ছেড়ে দিলাম। চিন্তাগুলো, বুনো ঘোড়া যেমন জিনের দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়, সেভাবে ইংরেজী ব্যাকরণের নিয়মকানুনের সঙ্গে অসহযোগিতা করে চললো। অবশেষে গুরুদেবের পূর্বেকার আশ্বাসদানের কথা স্মরণে রেখে স্টিমারের সেলুনে বক্তৃতা দেবার জন্যে শ্রোতৃবৃন্দের সম্মুখে তো

উপস্থিত হলাম। বাগ্মিতা প্রদর্শন করা তো দূরে থাক, সেই জনমণ্ডলীর সামনে বাক্‌শক্তিহীন হয়ে দাঁড়িয়েই রইলাম খানিকক্ষণ। এক মিনিট ... দু' মিনিট ..... তিন মিনিট .... দশ মিনিট কেটে গেল, কথা আর বেরোয় না। শ্রোতারা আমার দুর্দশার কথা অনুধাবন করে হাসাহাসি শুরু করে দিল।

ব্যাপারটা অবশ্য আমার কাছে তখন আদৌ প্রীতিকর ছিল না — রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে, নীরবে গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম। তৎক্ষণাৎ অন্তরের মধ্যে তাঁর বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠল, "তুমি পারবে! তুমি পারবে! বল, কথা বল!"

সঙ্গে সঙ্গে ভাবগুলি বেশ গুছিয়ে এসে ইংরেজী ভাষার সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে মনের মধ্যে ভিড় করে দাঁড়াল। পৌনে একঘণ্টা শোনবার পরও শ্রোতৃবৃন্দ আরও শুনতে সমান উৎসুক। সেই বক্তৃতার পর আমেরিকার নানাদল থেকে আমার কাছে বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ আসতে লাগল।

বক্তৃতা শেষ হবার পর, কি যে সব বলেছিলাম তার একটা বর্ণও আর স্মরণে ছিল না। অত্যন্ত গোপন অনুসন্ধানের পর কয়েকজন যাত্রী আমাকে বললেন ঃ "আপনি নির্ভুল ইংরেজীতে উদ্দীপনাময় আর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এক বক্তৃতা দিয়েছেন।" এই আনন্দসংবাদে আমি ভক্তিনতচিত্তে যথাসময়ে সাহায্য পাঠাবার জন্য আমার গুরুদেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। আবার নতুন করে উপলব্ধি করলাম যে তিনি আমার সঙ্গে সর্বদাই রয়েছেন, দেশকালের ব্যবধান তাঁর কাছে তুচ্ছ।

সমুদ্রযাত্রার পরের দিকটায় কিন্তু একবারমাত্র আগামী বোস্টন কংগ্রেসে বক্তৃতার ব্যাপারে একটু ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

তাতে আমি ভগবানের কাছে এই বলে প্রার্থনা করলাম, "দয়াময়, তুমিই আমার বক্তৃতার একমাত্র প্রেরণা, ভাবের উৎস হও!"

"সিটি অফ্ স্পার্টা" সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ বোস্টনের কাছে বন্দরে গিয়ে ভিড়ল। ১৯২০-র ৬ই অক্টোবর তারিখে আমি ঐ কংগ্রেসে আমেরিকায় আমার প্রথম বক্তৃতা দিলাম। সকলেই খুশি হয়েছিলেন। যাক্,

মুক্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম। কংগ্রেসের প্রকাশিত কার্যবিবরণীতে* আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের উদার-হৃদয় সেক্রেটারী মহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন, —

"ভারতবর্ষের রাঁচি ব্রহ্মচর্য আশ্রম থেকে স্বামী যোগানন্দ, কংগ্রেসে তাঁর সমিতির অভিনন্দন নিয়ে এসেছেন। বিশুদ্ধ আর পরিষ্কার ইংরেজীতে ও উদ্দীপনাময় ভাষায় তিনি "ধর্মবিজ্ঞান" সম্বন্ধে দার্শনিকতত্ত্বপূর্ণ এক বক্তৃতা দেন। বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে বক্তৃতাটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন — ধর্ম হচ্ছে সার্বজনীন, আর অভিন্ন। আমরা অবিশ্যি কোন বিশিষ্ট প্রথা বা বিশ্বাসকে সার্বজনীন রূপ দিতে পারি না; কিন্তু ধর্মের মূলতত্ত্বকে সার্বজনীন করে তোলা যেতে পারে — আর তা আমরা সকলকে অনুসরণ করতে আর পালন করতেও বলতে পারি।"

পিতার উদার দানের ফলে, অধিবেশন শেষ হয়ে গেলেও আমি আমেরিকায় কিছুকাল থেকে যেতে পেরেছিলাম। বোস্টনে অতি সুখে, সরল আর অনাড়ম্বরভাবে তিনটি বৎসর কেটে গেল। বক্তৃতাপ্রদান, যোগসম্বন্ধীয় ক্লাসে শিক্ষাদান ছাড়াও একটি কবিতার বই লিখেছিলাম — বইটির নাম "সংস অফ দি সোল";† এর মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন, ডাঃ ফ্রেডারিক বি. রবিনসন, সিটি অফ্ নিউ ইয়র্ক কলেজের প্রেসিডেন্ট।

১৯২৪ সালে সমগ্র মহাদেশ পরিক্রমণ করে প্রধান প্রধান শহরে হাজার হাজার লোকের সামনে আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। পরমরমণীয় আলাস্কায় অবকাশযাপন করবার জন্য সীয়াটলে জাহাজে চড়ে বসলাম।

উদার-হৃদয় ছাত্রদের বদান্যতায় ১৯২৫ সালের শেষের দিকে আমি লস্-অ্যাঞ্জেলেস্ শহরের মাউণ্ট ওয়াশিংটন এস্টেট্সে, আমেরিকায়

---

* নিউ পিলগ্রিমেজেস অফ্ দি স্পিরিট (বোস্টনের বীকন প্রেস হতে ইং ১৯২১ সালে প্রকাশিত)।

† সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ কর্তৃক প্রকাশিত। ডাঃ ও শ্রীমতি রবিনসন ১৯৩৯ সালে ভারত পরিভ্রমণ করেন, এবং যোগদা সৎসঙ্গের একটি সভায় সম্মানিত অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানকেন্দ্র স্থাপন করেছিলাম। বহুবৎসর পূর্বে কাশ্মীর ভ্রমণের সময় আমি স্বপ্নে এই বাড়ীটির দর্শন পাই। সুদূর আমেরিকায় আমার কার্যকলাপের চিত্রাবলী আমি অবিলম্বে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর নিকট পাঠাই। তাতে তিনি আমায় বাংলায় একটি পোস্টকার্ড লেখেন, —

১১ই অগ্যাস্ট, ১৯২৬

আমার মানসপুত্র যোগানন্দ,

তোমার স্কুল আর ছাত্রদের ফটো দেখে আমার মনে যে কি আনন্দ হচ্ছে তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। নানাশহরে তোমার যোগ শিক্ষার্থীদের দেখে মন আনন্দে বিগলিত হয়েছে।

স্তোত্রপাঠ, রোগনিবারণে শক্তিসঞ্চার, আর দৈব উপায়ে রোগনিরাময়ের প্রার্থনা প্রভৃতির তোমার প্রণালীর কথা শুনে আমার আন্তরিক আশীর্বাদ তোমায় না দিয়ে থাকতে পাচ্ছি না।

মাউণ্ট ওয়াশিংটন এস্টেট্‌সের গেট, তার ক্রমোন্নত আঁকাবাঁকা পার্বত্যপথ, আর তার নীচের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী নিজের চোখে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।

এখানকার সব মঙ্গল। ভগবৎকৃপায় তুমি চিরসুখী হও।

শ্রী যুক্তেশ্বর গিরি

বছরের পর বছর কেটে গেল। এই নূতন মহাদেশের প্রতিটি অংশেই আমি বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালাম। শত শত ক্লাব, কলেজ, চার্চ আর নানা দলের সামনে আমায় অনেক কিছুই বলতে হল। ১৯২০-১৯৩০ দশকে সহস্র সহস্র আমেরিকাবাসী আমার যোগের ক্লাসে যোগদান করে। তাদের সকলের নামে "হুইস্পার্স ফ্রম ইটারনিটি"* — "দিব্য বাণী" নামে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে একটি নূতন প্রার্থনা ও কবিতার পুস্তক উৎসর্গ করলাম। বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন শ্রীমতী অ্যামেলিটা গ্যালি-কুর্চি।

কখনও কখনও — (সাধারণতঃ মাসের পয়লা তারিখে মাউণ্ট ওয়াশিংটন এস্টেটের এবং সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপের অন্যান্য

* প্রকাশক — যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া।

কেন্দ্রসকলের ব্যয়নির্বাহের জন্যে যখন বিল সব এসে হাজির হত) — তখন ভারতবর্ষের সরল অনাড়ম্বর শান্তিময় জীবনের জন্যে প্রাণের ব্যাকুলতা জেগে উঠত। কিন্তু প্রাচী আর প্রতীচীর ভাবের আদানপ্রদানের দৈনন্দিন প্রসার দেখে মন আনন্দে উল্লসিতও হয়ে উঠত।

"তাঁর জাতির পিতা" জর্জ ওয়াশিংটন, যিনি বহু উপলক্ষ্যেই অনুভব করেছিলেন যে, তিনি দৈবনির্দেশে পরিচালিত হতেন, আমেরিকার আধ্যাত্মিক অনুপ্রাণনার জন্য (তাঁর বিদায়বাণীতে) নিম্নলিখিত কথাগুলো বলেছিলেন, —

"স্বাধীন, শিক্ষিত আর অচিরেই একটা বিরাট জাতিতে পরিণত — এদের পক্ষে সর্বদা উচ্চ ন্যায়বিচার আর লোকহিতৈষণার দ্বারা চালিত জাতির একটা অতি মহত্ত্বপূর্ণ আর বিরাট উদাহরণ মানবজাতিকে দেওয়ার সে উপযুক্ত হবেই। নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, সময় আর ঘটনার পথে এরূপ একটা বিরাট পরিকল্পনার ফল, এ শুধু ধৈর্য ধরে অনুসরণ করবার সাময়িক ক্ষতি বহুগুণেই পূরণ করবে। এটা কি কখন হতে পারে নাকি যে, ভগবান একটা জাতির গুণের সঙ্গে তার চিরস্থায়ী সুখ আর সৌভাগ্য সংযুক্ত করে রাখে নি?"

হুইটম্যানের "আমেরিকা প্রশস্তি"

(ওয়াল্ট হুইটম্যানের "দাউ মাদার উইথ দাই ইকোয়াল ব্রুড" হতে উদ্ধৃত।)

তোমার ভবিষ্যকালে তুমি,
বুদ্ধিদীপ্ত, বৃহত্তর তব নরনারীদলে তোমা' মাঝে —
তোমার সে শক্তিধর, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক;
উত্তর, দক্ষিণ আর প্রাচী ও প্রতীচী।
তব নৈতিকসম্পদে আর সভ্যতায়
(ততদিন জড়সভ্যতায় বৃথাই তব গর্ব রহিবে কেবল)
সর্বার্থসাধক, তব শ্রদ্ধা সর্বব্যাপী — অথবা যে
কেবল একটিমাত্র বাইবেল, ত্রাণকর্তামাঝে,

আবদ্ধ তুমি তো নও,
মুক্তিদাতারূপে গণ্য তোমা' মাঝে যাঁরা
— সংখ্যা নাই তার,
নিদ্রিত রয়েছে তারা বুকের মাঝারে তব,
যেকোন লোকের সাথে তুলনায় আর দৈবীভাবে,
সমতুল এ সবাই! এরাই তোমার মাঝে
(নিশ্চয় আসবে দেখো)
ভবিষ্যদ্বাণী আমি করে যাই আজ।

৩৮ পরিচ্ছেদ

লুথার বারব্যাঙ্ক — গোলাপবাগের সাধু

লুথার বারব্যাঙ্ক হচ্ছেন একজন যুগান্তকারী মার্কিন উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌ — উদ্ভিদ্‌রাজ্যের যাদুকর। অসীম ধৈর্য আর অপূর্ব মনীষাবলে ইনি উদ্ভিদরাজ্যে নানা নূতন নূতন ফলফুলের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর পরীক্ষাক্ষেত্র ছিল ক্যালিফোর্নিয়ার শান্তা রোজা উদ্যান। একদিন যখন তাঁর সঙ্গে সেখানে বেড়াচ্ছি, লুথার বারব্যাঙ্ক তখন এই জ্ঞানগর্ভ সত্যটি প্রকাশ করে বললেন, "উন্নত ধরণের উদ্ভিদপ্রজননের গুপ্তরহস্য হচ্ছে অবিশ্যি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ছাড়া — প্রেম!" আমরা আহারযোগ্য একপ্রকার কাঁটাশূন্য মনসাগাছের ঝাড়ের কাছে এসে তখন দাঁড়ালাম।

তিনি বলতে লাগলেন, "যখন আমি মনসাগাছকে কাঁটাশূন্য করবার পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম, তখন আমি প্রায়ই তাদের আদর করে ভালবাসার কথা সব বলতাম। আমি তাদের বলতাম, 'তোমাদের কিচ্ছু ভয় নেই। আত্মরক্ষার জন্যে তোমাদের কাঁটার কি দরকার, আমিই তোমাদের সব রক্ষা করব!' এইরকম করে নানাকথা বলে আমি যেন তাদের সব ভয় ভাঙাতাম। অবশেষে দেখা গেল যে মরুভূমির সেই দারুণ কাঁটাওয়ালা ফণীমনসার গাছ হতে একেবারে কাঁটাশূন্য অতিপ্রয়োজনীয় এক বিশেষ-শ্রেণীর গাছের উদ্ভব হয়েছে।"

এই অলৌকিক ব্যাপারের কথা শুনে তো আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বললাম, "প্রিয় লুথারসাহেব, আমাকে কতকগুলো ক্যাকটাসের পাতা দেবেন তো, মাউন্ট ওয়াশিংটনে আমার বাগানে পুঁতব।"

কাছেই একটা মালী দাঁড়িয়েছিল; তাড়াতাড়ি কতকগুলো পাতা ছাঁটতে শুরু করে দিল। বারব্যাঙ্ক তাকে বারণ করে বললেন, "থাক, থাক, আমি নিজেই স্বামীজীর জন্যে পাতা তুলে দিচ্ছি", বলে আমায় তিনটি পাতা তুলে দিলেন। বাগানে সেগুলি লাগাতে খুব বড় হয়ে উঠল দেখে ভারি আনন্দ হল।

সেই বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ আমায় বলেছিলেন যে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য হচ্ছে সুবৃহৎ আলু — তাঁর নিজনামে এখন যা পরিচিত। বিরাট প্রতিভা ও অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি প্রকৃতিতে নানা বর্ণসঙ্করজাতির সৃষ্টি করে পৃথিবীকে বহু নূতন আর উন্নতধরণের ফলফুল উপহার দিয়েছেন। যেমন তাঁর নামে পরিচিত নূতন ধরণের টমাটো, ভুট্টা, স্কোয়াশ, চেরী, কুল, নেক্‌টারিন, বেরী, পপি, লিলি, গোলাপ ইত্যাদি।

লুথারসাহেব যখন আমায় তাঁর সেই বিখ্যাত বাদামগাছের কাছে নিয়ে গেলেন তখন আমি আমার ক্যামেরার মুখ সেদিকে ফেরালাম। এই বাদামগাছ থেকে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে প্রাকৃতিক বিবর্তন দ্রুততমগতিতে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

তিনি বললেন, "মাত্র ষোলবছরে এই বাদামগাছে এমন প্রচুর ফলন ফলেছিল যে, কোন সাহায্য না পেয়ে প্রকৃতিকে তেমনভাবে ফল ফলাতে গেলে অন্ততঃ তার দ্বিগুণ সময় তো লাগতই!"

বারব্যাঙ্কের ছোট্ট পালিতাকন্যাটি তার একটি পোষা কুকুর নিয়ে লাফাতে লাফাতে বাগানে এসে ঢুকল।

লুথার সাহেব সস্নেহে তাকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "ও হচ্ছে আমার মানবতরু। সমগ্র মানবজাতিকে আমি একটি বিরাট বনস্পতির মতই মনে করি; তাদের পূর্ণবিকাশ আর চরমপরিণতির জন্যে দরকার প্রেম, প্রকৃতির মুক্ত আলোবাতাস, আর সুচতুর নির্বাচন ও মিলন-সংঘটন। আমার নিজেরই জীবনকালে বৃক্ষলতার বিবর্তনে এমনসব আশ্চর্য উন্নতি আমি দেখেছি যে, তাতে করে আমার খুবই আশা হয় — যদি এর সন্তানসন্ততিদের সরল আর সুসঙ্গতভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহলে জগৎ আরো সুন্দর আর স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠবে। প্রকৃতি এবং প্রকৃতির স্রষ্টা সেই ঈশ্বরেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

"লুথারসাহেব, আপনি আমার রাঁচি বিদ্যালয়ের মুক্ত আকাশতলে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা আর সেখানে শান্তির আবহাওয়ায় সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন দেখলে নিশ্চয়ই খুশি হবেন।"

আমার কথাগুলি বারব্যাঙ্কের হৃদয়তন্ত্রীর এক কোমল পর্দায় গিয়ে আঘাত করলে — সেটি শিশুশিক্ষা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে তিনি আমাকে অস্থির করে তুললেন। তাঁর শান্তগম্ভীর চোখদু'টি আগ্রহে উদ্দীপ্ত!

অবশেষে তিনি বললেন, "স্বামীজী, আপনার বিদ্যালয়ের মত বিদ্যালয়ই আগামী সহস্রাব্দের একমাত্র আশা। আমি বর্তমানযুগের শিক্ষাব্যবস্থার ওপর একেবারে বীতশ্রদ্ধ — এরূপ শিক্ষা প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, সমস্ত ব্যক্তিত্বের শ্বাসরোধ করে! আপনার শিক্ষার যে কার্যকরী আদর্শ, তার সঙ্গে আমি মনেপ্রাণে এক!"

এই সৌম্যমূর্তি ঋষিটির কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি একটি ছোট বইয়ে স্বাক্ষর* করে সেটি আমায় উপহার দিয়ে বললেন, "এই আমার বই, 'দি ট্রেনিং অফ্ দি হিউম্যান প্ল্যান্ট'।† এখন চাই নূতন ধরণের শিক্ষা আর চাই নির্ভীক পরীক্ষা! সময়ে সময়ে খুব দুঃসাহসী পরীক্ষার ফলে সর্বোৎকৃষ্ট ফলফুলের উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। শিশুশিক্ষায় নূতনপ্রণালী প্রবর্তনেও তেমনি দুঃসাহসী, তেমনি বহুল পরীক্ষা প্রয়োজন।"

গভীর আগ্রহে তাঁর সেই বইটি আমি রাত্রিতেই পড়ে শেষ করে ফেললাম। জাতির গৌরবময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তিনি লিখেছেন ঃ

"এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি অনমনীয় সজীব বস্তু — যাকে পরিবর্তন করা অত্যন্ত কঠিন, সে হচ্ছে একটি গাছ, যার কতকগুলি অভ্যাস একেবারে বদ্ধমূল হয়ে গেছে ... স্মরণ রাখবেন যে, এই গাছটি

---

* লুথার বারব্যাঙ্ক তাঁর স্বাক্ষরিত একটি নিজের ফটোগ্রাফও আমায় দিয়েছিলেন। জনৈক হিন্দুবণিক লিনকনের একটি প্রতিকৃতি একদা যেমন অমূল্য বলে বিবেচনা করতেন, বারব্যাঙ্কের প্রতিকৃতিও আমি সেই রকমই বিবেচনা করি। সেদেশে গৃহযুদ্ধের সময় উক্ত হিন্দুবণিকটি আমেরিকায় ছিলেন। তিনি লিনকনের প্রতি এতদূর অপরিসীম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন যে, সেই "বিরাট মুক্তিদাতার" একখানি ছবি সংগ্রহ না করা পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে আর কিছুতেই ফিরতে চাইলেন না। একদিন লিনকন সাহেবের বাড়ীর দরজা গোড়ায় এসে ভদ্রলোক একেবারে অনড় হয়ে বসেই রইলেন, যতক্ষণ না তিনি বিব্রত প্রেসিডেন্ট সাহেবের কাছ থেকে তাঁর চিত্র অঙ্কিত করবার জন্যে নিউইয়র্কের বিখ্যাত চিত্রকর ড্যানিয়েল হান্টিংটনকে নিযুক্ত করবার অনুমতি পেলেন। প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ হতেই হিন্দু ভদ্রলোকটি বিজয়গর্বে সেটি বহন করে কলকাতায় ফিরলেন।

† নিউইয়র্ক হতে সেঞ্চুরী কোং কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯২২।

যুগ-যুগান্তর ধরে তার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে এসেছে; হয়ত এই গাছটির উৎপত্তি অনুসরণ করে কালপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ফিরে গেলে তাকে আদি প্রস্তরের স্তরের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যাবে। এই এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আপনার কি মনে হয় না যে, এই যুগ-যুগান্তরের জন্ম-মৃত্যুর পর গাছটির অপূর্ব দৃঢ়তাসম্পন্ন কোন ইচ্ছা — তাকে ইচ্ছা যদি বলতে চান, বলুন, — তার অধিগত হয় নি? বাস্তবিক এমন কতকগুলি গাছ আছে, যেমন কতকগুলি পামজাতীয় গাছ — তারা এত সংরক্ষণশীল যে কোন মানবশক্তি এপর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে নি। একটা গাছের ইচ্ছার তুলনায় মানুষের ইচ্ছা খুবই নগণ্য। কিন্তু দেখুন — এই সম্পূর্ণ গাছটার জীবনব্যাপী দৃঢ়তা শুধুমাত্র বর্ণসঙ্করতা ঘটিয়ে, নূতন জীবন সংযোগ করে, তার জীবনে একটা সম্পূর্ণ আর শক্তিশালী পরিবর্তন এনে কি করে তাকে ভঙ্গ করে ফেলা যায়। তারপর সেই ব্যাঘাত এলে তাকে বৎসরের পর বৎসর ধরে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সুনির্বাচন আর পর্যবেক্ষণ করে তার অভ্যাস সুদৃঢ় করে তুলুন — দেখবেন, নতুন গাছটি নবজীবনধারায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সে আর তার পুরাতন অবস্থায় কখনও ফিরে যাবে না। তার অনমনীয় ইচ্ছা পরিশেষে একেবারে লুপ্ত আর পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

"এইরকম ব্যাপার যখন শিশুপ্রকৃতির মত একটা ভাবপ্রবণ আর নমনীয় বিষয়ে ঘটে, তখন সমস্যাটা অত্যন্ত সহজ আর সরল হয়ে আসে।"

এই বিশিষ্ট আমেরিকান বৈজ্ঞানিকের মনীষায় চৌম্বকাকৃষ্ট হয়ে আমি বারম্বার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই। একদিন সকালে গিয়ে পড়েছি, দেখি ডাকপিয়নও এসে হাজির হয়েছে। বারব্যাঙ্কের পড়বার ঘরে একটা থলে করে তাঁর নামে চিঠি দিয়ে গেল — হাজারখানেক চিঠি। পৃথিবীর নানা প্রান্তের উদ্যানতত্ত্ববিদেরা তাঁকে লিখেছেন।

লুথারসাহেব খুশি হয়ে বললেন, "স্বামীজী এসে পড়েছেন, ভালই হয়েছে — আপনার দোহাই দিয়ে চলুন বাগানে বেরিয়ে পড়ি।" তারপর একটা প্রকাণ্ড ডেস্ক-ড্রয়ার খুলে তার ভিতর থেকে অনেকগুলো

দেশভ্রমণের ছবির অ্যালবাম বার করে নিয়ে বললেন, "এই দেখুন, আমি কেমন করে দেশভ্রমণ করে বেড়াই। গাছের সেবা আর চিঠিপত্র লেখালিখিতে আটকে পড়ে বিদেশ-ভ্রমণের সুখ আমায় মাঝেমাঝে এই সব ছবিগুলো দেখেই মেটাতে হয় আর কি।"

আমার গাড়ী দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। লুথার সাহেব আর আমি সেই ছোট্ট শহরটির রাস্তায় রাস্তায় একটু ঘুরে বেড়ালাম। শহরটির চারদিকের বাগানগুলি তাঁরই আবিষ্কৃত শাস্তা রোজা, পীচব্লো, বারব্যাঙ্ক গোলাপে আলো হয়ে রয়েছে।

এইরকমই একবার তাঁর কাছে আমার যাতায়াতের সময়ে লুথার বারব্যাঙ্ক 'ক্রিয়াযোগে' দীক্ষিত হয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, "আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই প্রক্রিয়াটি অভ্যাস করি।" তারপর যোগের বিভিন্ন অঙ্গ সম্বন্ধে আমাকে বহু সুচিন্তিত প্রশ্ন করবার পর অবশেষে ধীরে ধীরে বললেন, "সত্যিই প্রাচ্যের এত বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আছে, যার বিষয় প্রতীচ্য সবেমাত্র অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেছে।"*

প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সংযোগের ফলে প্রকৃতি যে তার নিজস্ব সযত্নরক্ষিত বহু গুপ্তরহস্য তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল — তাতে করে লুথার বারব্যাঙ্ক লাভ করেছিলেন অপরিসীম আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধা।

তিনি সসঙ্কোচে একদিন আমায় বললেন, "মাঝে মাঝে আমি সেই অনন্তশক্তির স্পর্শ খুব নিকটেই পাই। তাতে করে আমি আশেপাশের রুগ্ন লোকেদের আর অসুস্থ গাছেদেরও সুস্থ করে তুলতে পেরেছি।" স্মৃতির আলোকে তাঁর সুবেদী আর সুন্দর আকৃতির মুখটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

---

* সুবিখ্যাত ইংরেজ জীববিদ্ ও ইউনেস্কোর পরিচালক ডাঃ জুলিয়ান হাক্সলি সম্প্রতি বলেছেন যে, জড় সমাধিতে প্রবেশ এবং শ্বাসক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের "প্রাচ্য প্রণালী" সব শিক্ষা করা উচিত। "কি হয়? এ কেমন করে সম্ভব?" প্রভৃতি তিনি প্রশ্ন করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২১শে আগস্ট তারিখে লণ্ডন হতে প্রেরিত এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদে বর্ণিত হয়েছে, "ডাঃ হাক্সলি 'নিউ ওয়ার্লড ফেডারেশন ফর মেণ্টাল হেল্থ'কে বলেছিলেন যে, প্রাচ্যের অতীন্দ্রিয় বিদ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে ভাল হবে। যদি এই বিদ্যার বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান হয়,' তিনি মানস বিশেষজ্ঞদিগকে উপদেশ দিয়েছিলেন, "তাহলে আমার মনে হয় যে, আপনাদের কর্মক্ষেত্রে বহুদূর অগ্রসর হতে পারা যাবে।"

তাঁর মা ছিলেন একজন খাঁটি খ্রিস্টান। তাঁর কথা উল্লেখ করে বারব্যাঙ্ক বললেন, "মায়ের মৃত্যুর পর বহুবার তিনি আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন।"

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা তাঁর বাড়ী ফিরলাম — যেখানে হাজারখানেক চিঠি তখনও খোলবার অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে।

বাড়ী ফিরে লুথারসাহেবের কাছে একটা কথা পাড়লাম। বললাম, "লুথারসাহেব, শীঘ্রই আমি একটি পত্রিকা বার করছি, পূর্ব আর পশ্চিমের যা কিছু সত্যের দান, তা এর ভিতর দিয়েই লোকের হাতে পৌঁছে দেব। পত্রিকাটির জন্যে একটি বেশ ভাল নাম নির্বাচিত করবার কাজে আমায় সাহায্য করবেন?"

কিছুক্ষণ এ বিষয়ে আলোচনার পর অবশেষে "ইস্ট-ওয়েস্ট"* এই নামটাই সাব্যস্ত হল। তারপর পুনরায় তাঁর পড়বার ঘরে প্রবেশ করবার পর বারব্যাঙ্ক সাহেব "বিজ্ঞান ও সভ্যতা" এই নামে তাঁর একটি লেখা আমায় পড়তে দিলেন।

লেখাটি পেয়ে আমি সকৃতজ্ঞভাবে বললাম, "ইস্ট-ওয়েস্টে'র প্রথম সংখ্যাতেই এই লেখাটি বেরোবে।"

আমাদের অন্তরঙ্গতা গভীর থেকে গভীরতর হতে আমি বারব্যাঙ্ক সাহেবকে "আমেরিকার সাধু" বলে অভিহিত করতে লাগলাম। প্রায়ই আমি বলতাম, "দেখ, ইনি এমন এক ব্যক্তি যাঁর মধ্যে কোন খলকপটতা নেই।"† তাঁর হৃদয় ছিল অতলগভীর — সুদীর্ঘ-অভ্যস্ত নম্রতা, ধৈর্য আর ত্যাগে ভরপুর। গোলাপবাগানের মধ্যে তাঁর ছোটবাড়িটি ছিল নিতান্তই সরল আর অনাড়ম্বর। বিলাসিতা আর তুচ্ছ কতকগুলি সম্পদের অসারতার বিষয় তিনি বুঝতেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার খ্যাতি যে নম্রতার সঙ্গে তিনি বহন করতেন, তাতে বারম্বার এই কথাই আমার মনে হত যে, গাছ ফলভারাবনত হলে আপনিই নত হয়ে পড়ে; আর ফলহীন বৃক্ষেরাই নিষ্ফলগর্বে মস্তকোত্তলন করে দাঁড়িয়ে থাকে।

---

* ১৯৪৮ সালে "সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন" এই নামকরণ করা হয়।

† জন ১ : ৪৭ (বাইবেল)।

১৯২৬ সালে আমি যখন নিউইয়র্কে, তখন আমার প্রিয় বন্ধুবর ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সজলনয়নে আমি ভাবলাম, "আহা, তাঁর সঙ্গে দেখা হল না। তাঁর একটিবার মাত্র দেখা পাবার জন্যে আমি এখান থেকে শান্তা রোজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারি!" আমার সব সেক্রেটারী আর অতিথি অভ্যাগতদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে রেখে, তারপর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাধরে আমি নির্জনতার মধ্যে অতিবাহিত করি।

তার পরের দিন লুথার সাহেবের একটি মস্তবড় ছবির সামনে তাঁর আত্মার মঙ্গলকামনায় পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য আমি একটি বৈদিক অনুষ্ঠান পালন করি। হিন্দু অনুষ্ঠানের উপযোগী সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে আমার কতকগুলি আমেরিকান শিষ্য, দেহের পাঞ্চভৌতিক উপাদানের প্রতীক — অগ্নি, জল আর পুষ্প প্রদান করে তাদের পঞ্চভূতে বিলীন হওয়া উপলক্ষ্যে স্তোত্র পাঠ করল।

যদিও লুথার বারব্যাঙ্কের দেহ আজ তাঁর শান্তা রোজার বাগানে বহুদিন আগে রোপিত এক লেবানন সিডার বৃক্ষতলে শায়িত, আমার কাছে কিন্তু তাঁর আত্মার প্রকাশ চলার পথে রাস্তার ধারে আলোহাসিতে উজ্জ্বল, প্রস্ফুটিত প্রতি ফুলেফুলে। প্রকৃতির বিরাট আত্মার সঙ্গে সাময়িকভাবে মিশে গিয়ে লুথার বারব্যাঙ্কই কি উষার সঙ্গে একত্রে চরণ ফেলছেন না, বাতাসের কানে কানে কথা কইছেন না?

তাঁর নাম আজ সাধারণ ভাষার অঙ্গীভূত একটা শব্দরূপে প্রচলিত হয়েছে। ওয়েবস্টারের নিউ ইণ্টারন্যাশানাল ডিক্সনারীতে "বারব্যাঙ্ক", সকর্মক ক্রিয়ারূপে শব্দের তালিকাভুক্ত হয়েছে, যার অর্থ দেওয়া হয়েছে, "জোড়বাঁধা বা কলমকরা। সুতরাং রূপক অর্থে তা বোঝায় মন্দলক্ষণগুলি পরিত্যাগপূর্বক উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলি (পদ্ধতিগত বা প্রতিষ্ঠানগত) সংযোজিত করে কোন কিছুর উন্নতিসাধন করা।"

বারব্যাঙ্ক কথাটির অভিধানে প্রদত্ত সংজ্ঞা পাঠ করে আমি বলে উঠলাম, "প্রিয়তম বারব্যাঙ্ক, আপনার নামটাই হচ্ছে উৎকর্ষ আর সাধুতার এক প্রতিশব্দ।"

লুথার বারব্যাঙ্ক

শান্তা রোজা, ক্যালিফোর্ণিয়া ২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৪

ইউ. এস. এ.

আমি স্বামী যোগানন্দের যোগদাপ্রণালী পরীক্ষা করে দেখেছি; আর আমার মতে মানুষের দৈহিক, মানসিক আর আধ্যাত্মিক প্রকৃতির শিক্ষা আর সামঞ্জস্যবিধানে এ আদর্শস্থানীয়। স্বামীজীর উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীব্যাপী আদর্শ জীবনযাপনপ্রণালীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে শিক্ষা কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনেই আবদ্ধ থাকবে, তা নয় — শরীর, ইচ্ছা, অনুভূতি এদেরও প্রস্তুতির ব্যবস্থা থাকবে।

মনঃসংযোগ আর ধ্যানের সরল ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যোগদাপ্রণালীর মাধ্যমে শরীর, মন আর আত্মার উৎকর্ষসাধনে জীবনের অনেক কিছু জটিলসমস্যার সমাধান হতে পারবে, আর পৃথিবীতে শান্তি আর সদিচ্ছা নেমে আসবে। স্বামীজীর মতে প্রকৃত শিক্ষা হবে সকল প্রকার দুর্জ্ঞেয়তা আর অকার্যকারিতা হতে মুক্ত সহজ সাধারণজ্ঞান; তা না হলে এ আমার অনুমোদন পেত না।

প্রকৃত জীবনযাপনপ্রণালীর উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক বিদ্যালয়ের জন্য স্বামীজীর আবেদনে অন্তরের সঙ্গে যোগদানের এই সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত, যা প্রতিষ্ঠিত হলে স্বর্গরাজ্যসূচনার কাছাকাছি হবে; এর বেশি আর কিছু যে আছে, তা আর আমার জানা নেই।

Luther Burbank

লুথার বারব্যাঙ্ক

৩৯ পরিচ্ছেদ

থেরেসা নোয়ম্যান — খ্রিস্ট ক্ষতাঙ্ক-ধারিণী ক্যাথলিক

মাউণ্ট ওয়াশিংটনের প্রধান কার্যালয়ে একদিন ধ্যানে বসে আছি, হঠাৎ আমার অন্তরের অন্তস্তলে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল ঃ "ভারতবর্ষে ফিরে এসো; তোমার জন্যে আমি পনের বছর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে বসে আছি। শীঘ্রই আমি দেহত্যাগ করে অনন্তের দিকে পাড়ি জমাব। যোগানন্দ, চলে এস!"

চক্ষের পলকে দশহাজার মাইল অতিক্রম করে তাঁর আহ্বান আমার অন্তরে এসে পৌঁছল — বিদ্যুৎচমকের মত।

পনের বছর। হ্যাঁ, পনের বছরই তো বটে! দেখলাম, এটা ১৯৩৫ সাল; এসেছিলাম ১৯২০ সালে। পনের বছর ধরে আমি গুরুর শিক্ষা আমেরিকায় প্রচার করে এসেছি। এখন গুরু আমায় ডাক দিয়েছেন।

এর কিছুদিন পরেই আমার প্রিয় বন্ধু মিঃ জেমস জে. লীনকে আমার এই অনুভূতির কথা বলেছিলাম। ক্রিয়াযোগ সাধন করে তার আধ্যাত্মিক উন্নতি এতদূর সাধিত হয়েছিল যে, আমি তাকে প্রায়ই সেণ্ট লীন বলে অভিহিত করতাম। বাবাজীর ভবিষ্যদ্বাণী — পাশ্চাত্যেও এমন সব নরনারী তৈরী হতে পারে যাদের প্রাচীন যোগের পথে সত্যকার ঈশ্বরোপলব্ধি হয়েছে। ঐ ভবিষ্যবাণী বহু পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে সার্থকতা লাভ করেছে দেখে আমি আনন্দিতই হতাম।

মিঃ লীন আমার যাত্রার ব্যবস্থার জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ প্রদান করতে চাইলেন। আর্থিক সমস্যা দূরীভূত হতে আমি ইউরোপ হয়ে ভারতবর্ষে যাবার ব্যবস্থা করতে লাগলাম। ১৯৩৫ সালের মার্চ মাসে আমি সেল্ফ্ রিয়লাইজেশন ফেলোশিপকে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের আইন অনুসারে

চিরস্থায়ী স্বত্বে ধর্মনিরপেক্ষ লভ্যহীন প্রতিষ্ঠানরূপে রেজেষ্ট্রী করলাম। সেই সঙ্গে আমার যাবতীয় লেখার সত্ত্বাধিকার সমেত সকল সম্পত্তি সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপকে দান করে দিলাম। সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ, অন্যান্য অধিকাংশ শিক্ষা ও ধর্ম-প্রতিষ্ঠানসমূহের মত সদস্যদের এবং জনসাধারণের অর্থানুকুল্যে পরিচালিত হয়।

শিক্ষার্থীদের বললাম, "আমি আবার ফিরে আসব। আমেরিকাকে আমি কখনও ভুলব না।"

স্নেহানুগত বন্ধুবর্গ লস্-অ্যাঞ্জেলেসে আমাকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে এক ভোজ দিলেন। তাঁদের মুখের দিকে বহুক্ষণ চেয়ে আমি সকৃতজ্ঞমনে ভাবলাম, "ভগবান, তোমাকেই যে একমাত্র সকল দানের দাতা বলে ভাবতে পারে, মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের মাধুর্য খুঁজে পাবার তার কখনও অভাব হয় না।"

১৯৩৫ সালের ৯ই জুন আমি "ইউরোপা" নামক জাহাজে নিউইয়র্ক ত্যাগ করলাম। দু'টি শিষ্য আমার সঙ্গে এল — আমার সেক্রেটারী মিস্টার সি. রিচার্ড রাইট, আর অন্যজন সিনসিনাটির এক বর্ষিয়সী মহিলা — মিস এটি ব্লেচ। সমুদ্রযাত্রার শান্তিময় দিনগুলি বড়ই আনন্দে কাটল; আগেকার কর্মব্যস্ত দিনগুলির সঙ্গে তাদের পার্থক্য কত তৃপ্তিদায়ক! আমাদের অবসরবিনোদন কিন্তু বেশিদিন চললো না। আধুনিক জলযানের গতির ভিতরেও কিঞ্চিৎ ক্ষোভের বিষয় আছে বই কি!

আর সব উৎসুক ভ্রমণকারীদের মত আমরাও সেই বিশাল আর প্রাচীন মহানগরী লণ্ডন বেড়িয়ে বেড়ালাম। আমাদের পৌঁছিবার পরদিন ক্যাক্সটন হলে এক বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমি আমন্ত্রিত হলাম। সেখানে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড লণ্ডনের শ্রোতাদের নিকট আমায় পরিচিত করে দিলেন।

তারপরে আমাদের দলের নিমন্ত্রণ এল স্যার হ্যারি লডারের স্কটল্যাণ্ডে তাঁর জমিদারীতে এক অবসরদিবস যাপন করবার জন্যে। এর কিছুদিন পরে আমরা ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইউরোপ মহাদেশে পাড়ি

দিলাম, কেন না আমার উদ্দেশ্য ছিল — জার্মানীর ব্যাভেরিয়া প্রদেশে একটি বিশেষ তীর্থস্থান দর্শন করা। কারণ আমি ভাবলাম যে কোনার্সরুয়েথের ক্যাথলিক মরমী থেরেসা নোয়ম্যানকে দর্শন করার এই হবে আমার একমাত্র সুযোগ।

বহুবৎসর আগে আমি থেরেসা নোয়ম্যান প্রসঙ্গে একটি অত্যাশ্চর্য বিবরণ পাঠ করেছিলাম। তাতে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি বিবৃত করা হয়েছিল ঃ—

(১) ১৮৯৮ সালে গুডফ্রাইডে'র দিন থেরেসার জন্ম; কুড়ি বছর বয়সে তিনি একটি দুর্ঘটনায় আহত হয়ে অন্ধ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন।

(২) ১৯২৩ সালে লিসিস্কের "দি লিটল্ ফ্লাওয়ার", সেণ্ট থেরেসার নিকট প্রার্থনার ফলে তিনি অলৌকিকভাবে তাঁর দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে পান। পরে থেরেসা নোয়ম্যানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অতি দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

(৩) ১৯২৩ সাল থেকে থেরেসা দৈনিক একটি ক্ষুদ্র পবিত্র রুটি আহার করা ব্যতীত খাদ্যপানীয় গ্রহণে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন।

(৪) ষ্টিগম্যাটা অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রিস্টের পবিত্র ক্ষতচিহ্নসকল ১৯২৬ সালে থেরেসার মস্তকে, বক্ষে, হস্ত ও পদদ্বয়ে প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে প্রতি সপ্তাহে শুক্রবারে* তিনি তাঁর নিজশরীরে যীশুখ্রিস্টের মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা ও ক্লেশ ভোগ করে আসছেন।

(৫) থেরেসার কেবলমাত্র তাঁর নিজগ্রামের সরল জার্মান ভাষাই জানা ছিল, অথচ প্রতি শুক্রবারে তাঁর "ভর" হবার সময় তিনি এমন সব কথা উচ্চারণ করতেন, যাকে পণ্ডিতেরা প্রাচীন অ্যারামেয়িক বলে নির্ধারিত করেছেন। তাঁর "ভরে"র সময় তিনি হিব্রু বা গ্রীক ভাষাতেও কথা বলতেন।

(৬) গির্জার কর্তৃপক্ষের অনুমতি অনুসারে থেরেসাকে বারকতক কঠিন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাধীনে রাখা হয়। এক প্রোটেস্ট্যাণ্ট জার্মান

---

* যুদ্ধের বৎসরগুলির পর থেরেসা আর প্রতি শুক্রবারে "প্যাশন" অর্থাৎ উপরোক্ত ঐতিহাসিক মৃত্যুক্লেশ অনুভব করেন নি। কেবল বৎসরের কয়েকটি পুণ্য দিবসে তা সংঘটিত হয়।
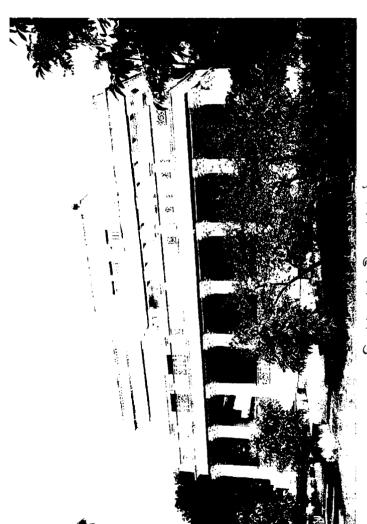
দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার তীরে যোগদা মঠ

১৯৩৯ সালে পরমহংস যোগানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ার রেজিস্টার্ড অফিস

রাঁচীতে অবস্থিত যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ার
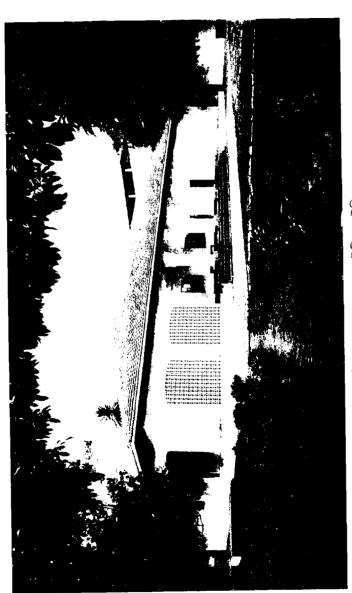
সেল্ফ্-রিয়লাইজ়েশন ফেলোশিপের আন্তর্জাতিক সদর দপ্তরের প্রশাসনিক ভবন। ১৯২৫ সালে ক্যালিফোর্ণিয়ার লস্ অ্যাঞ্জেলসে মাউন্ট ওয়াশিংটনের শিখরদেশে শ্রীশ্রী যোগানন্দজী কেন্দ্রটি স্থাপন করেন।

সেল্ফ-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ আশ্রম, এন্সিনিটাস্, ক্যালিফোর্ণিয়া
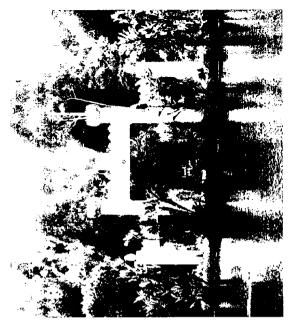
সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ লেক শ্রাইন ও গান্ধী বিশ্বশান্তি স্মৃতি-সৌধ, প্যাসিফিক প্যালিসেডস্, লস্ অ্যাঞ্জেলস্, ক্যালিফোর্ণিয়া

পরমহংস যোগানন্দ

১৯৫০ সালের ২০শে আগস্ট — সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ লেক স্রাইনে
প্যাসিফিক প্যালিসেডস ক্যালিফোর্নিয়ায় উৎসর্জন সমারোহে তোলা আলোকচিত্র

পরমহংস যোগানন্দের উত্তরাধিকারীগণ

(বাঁদিক থেকে ডানদিকে) শ্রীশ্রী রাজর্ষি জনকানন্দ, যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া/সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপের সভাপতি ও আধ্যাত্মিক প্রাচার্য্য, ১৯৫২-৫৫। শ্রীশ্রী দয়ামাতা ১৯৫৫ সালে রাজর্ষি জনকানন্দের পদাধিষ্ট হন ও ৫৫ বছরের ও অধিক ২০১০ সালে, তাঁর দেহাবসান পর্যন্ত, সেবা করেন। শ্রীশ্রী মৃণালিনী মাতা, যিনি মহান গুরুর আরেকজন ঘনিষ্ঠ শিষ্যা এবং তাঁর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর দ্বারা প্রশিক্ষিত হন, তিনি ওয়াই.এস. এস./এস. আর. এফ.-এর বর্তমান সভানেত্রী ও আধ্যাত্মিক প্রাচার্য্য।

সমাধিতে এক পাশ্চাত্য ব্যক্তি

রাজর্ষি জনকানন্দ (জেমস জে. লীন)

এন্সিনিটাস্, ক্যালিফোর্ণিয়ার এক নিজস্ব সৈকতে নিত্য ক্রিয়াযোগ অভ্যাসের পাঁ বছর পরে, জানুয়ারী ১৯৩৭ সালে মিঃ লীন সমাধিতে, অনন্ত ঈশ্বরের আভ্যন্তরীণ গরিমা বিরাজমান এক সুন্দর দর্শন লাভ করেন।

যোগানন্দজী বলেন, "শ্রী লীনের সুষম জীবন সকল মানুষের জন্যে এক অনুপ্রের জোগাতে পারে।" বিবেকবান হয়ে জাগতিক জীবনের কার্য নির্বাহ করেও শ্রী লীন গভ ধ্যানাভ্যাসের নিত্য সময় পেতেন। সফল ব্যবসায়ী এক প্রজ্ঞাবান ক্রিয়াযোগী হয়ে উঠে।

পরমহংসজী প্রায়ই স্নেহভরে তাঁকে "সেণ্ট লীন" বলে উল্লেখ করতেন ও ১৯৫১ সালে তাঁকে (ভারতের পুরাকালের আধ্যাত্মিক রাজা জনকানন্দের নামে) রাজ জনকানন্দ—এই সন্ন্যাস নাম প্রদান করেন। 'রাজর্ষি' শব্দের অর্থ ঋষি প্রতিম রাজা।

শ্রীশ্রী রাজর্ষি জনকানন্দ

(জেমস্ জে. লীন, ১৮৯২-১৯৫৫)

ওয়াই. এস. এস./এস. আর. এফ.-এর দ্বিতীয় সভাপতি

শ্রীশ্রী দয়ামাতা
ওয়াই. এস. এস./এস. আর. এফ.-এর তৃতীয় সভানেত্রী

দিব্য আলাপনে শ্রীশ্রী দয়ামাতা

শ্রীশ্রী দয়ামাতা, যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া/সেল্ফ-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপের প্রাক্তন সভাপতি, ১৯৬৮ সালে ভারত ভ্রমণকালে ধ্যানে ডুবে আছেন। তিনি লিখেছেন, "পরমহংস যোগানন্দজী, শুধুমাত্র তাঁর বাণী ও নিজের জীবনের উদাহরণ দিয়েই নয়, তদুপরি সেই ওয়াই. এস. এস./এস. আর. এফ. বিজ্ঞানসম্মত ধ্যান প্রবিধি প্রদান করে তিনি আমাদের রাস্তা দেখিয়েছেন। আত্মোপলব্ধির তৃষ্ণা শুধুমাত্র সত্য সম্বন্ধে পাঠ করেই মেটানো যায় না; ঈশ্বরস্বরূপ সত্যের ফোয়ারা থেকেই তা পান করতে হবে। আত্মোপলব্ধির অর্থ হলো এই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অনুভূতি।"

তিনি ছিলেন প্রকৃত এক সমবেদনার মাতৃমূর্তি — যা তাঁর দয়ামাতা নাম থেকে বোঝায়। তাঁর জীবনের মূল বিষয় ছিল ঈশ্বরকে ভালবাসা এবং সে ভালবাসা সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া।

১৯১৫ সালে ৮ই এপ্রিল, হলিউড ক্যালিফোর্ণিয়ায় সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপের ইণ্ডিয়া সেন্টার উদ্বোধন সভায় স্থানাধিষ্ট রাজ্যপাল শ্রী গুডউইন জে. নাইট (মাঝে), যোগানন্দজী ও মিঃ এ. বি. রোসের সঙ্গে।

পরমহংস যোগানন্দজী কর্তৃক ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের অভ্যর্থনা

মহাযোগীর মহাসমাধিলাভের তিনদিন আগে, ৪ঠা মার্চ, ১৯৫২ সালে, লস্ অ... সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপের আন্তর্জাতিক সদর দপ্তরে শ্রীশ্রী যোগানন্দজীর সঙ্গে মার্কিন ... নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী বিনয় রঞ্জন সেন।

১১ই মার্চের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রদূত সেন বলেনঃ " ... সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে পরমহংস যোগানন্দের মত একজন মানুষ থাকতেন, তাহলে এই পৃথিবী ... সুন্দরতর স্থান হয়ে উঠতে পারতো। আমার জানা এমন একটিও মানুষ নেই যিনি ভারত ও আমেরিকা ...

এস. আর. এফ./ওয়াই. এস. এস. সদর দপ্তরে শ্রী শঙ্করাচার্য

১৯৫৮ সালে লস্ অ্যাঞ্জেলসে সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ
আন্তর্জাতিক সদর দপ্তরে পুরীধামের শ্রী জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য ভারতী কৃষ্ণ তীর্থ।
আমেরিকায় শ্রী শঙ্করাচার্যের তিনমাসব্যাপী ভ্রমণের আয়োজন করেছিল
সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ

শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ — "শেষ হাসি"

১৯৫২ সালের ৭ই মার্চ, ক্যালিফোর্ণিয়ার লস্ অ্যাঞ্জেলসে, ভারতীয় রাষ্ট্রদূ
শ্রী বিনয় রঞ্জন সেনের সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় তাঁর মহাসমাধিলাভের ক
এক ঘণ্টা পূর্বে গৃহীত আলোকচিত্র।

আলোকচিত্রী এখানে পরমহংস যোগানন্দজীর প্রেমপূর্ণ স্মিত হাসির ছবি
তুলেছেন — মনে হচ্ছে, শ্রীশ্রী যোগানন্দজী যেন তাঁর অগণিত বন্ধু, ছাত্র ও শিষ্যদে
প্রত্যেককে বিদায় আশীর্বাদ জানাচ্ছেন। অনন্তে নিবদ্ধ তাঁর দৃষ্টি তখনও মানবিক প্রে
ও ভাবে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের এই অলোকসামান্য ভক্তের ওপর মৃত্যুর কোন করা
রূপের প্রকাশ ঘটেনি; তাঁর দেহ বিকার রহিত অবসস্থায় থাকে, যা বাস্তবিকই এ
অনন্যসাধারণ ঘটনা। *(পৃষ্ঠা ৬৬১ দ্রঃ)*

সংবাদপত্রের সম্পাদক, ডাক্তার ফ্রিৎস গের্লিক কোনার্সরয়েথে গিয়েছিলেন ক্যাথলিক বুজরুকি ফাঁসিয়ে দিতে — কিন্তু ফিরে এসে লিখলেন নোয়ম্যানের এক শ্রদ্ধাপূর্ণ জীবনকাহিনী।*

কি পূর্ব কি পশ্চিম, সাধুদর্শনের জন্যে আমি সর্বদাই আগ্রহী। ১৬ই জুলাই তারিখে আমাদের ছোট্টদলটি কোনার্সরয়েথের সেই অদ্ভুত গ্রামটিতে প্রবেশ করতেই আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলাম। ব্যাভেরিয়ার চাষীরা আমাদের ফোর্ড গাড়ী (আমেরিকা থেকে আমাদের সঙ্গে আনা) আর তাতে আমাদের এই বিচিত্র দলটি — এক মার্কিন যুবাপুরুষ, এক বয়স্কা মহিলা, আর একটি শ্যামবর্ণের প্রাচ্যদেশবাসী, যার স্কন্ধবিলম্বিত কেশগুচ্ছ কোটের কলারের ভিতর লুক্কায়িত — দেখে খুবই কৌতুহলী হয়ে উঠল।

থেরেসার ছোট্ট কুটিরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পুরানো ধরণের একটি কুয়ার ধারে জিরেনিয়াম ফুল ফুটে রয়েছে — কিন্তু হায়, গাড়ি থেকে নেমে দেখি যে তা বন্ধ, একেবারে নিস্তব্ধ। প্রতিবেশিরা, এমন কি সেইখান দিয়ে তখন যে ডাকপিওন যাচ্ছিল সেও, তাঁর বিষয়ে কিছুই খবর দিতে পারল না। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। সঙ্গীরা সব বলল — ফেরা যাক।

আমি কিন্তু দৃঢ়ভাবে বললাম, "যতক্ষণ না আমি থেরেসার কোন সন্ধান পাচ্ছি ততক্ষণ আমি এখানেই থাকব।"

ঘণ্টা দুই কেটে গেল — তখনও আমরা বৃষ্টির মধ্যে সেই গাড়ীর ভিতর বসে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভগবানের কাছে নালিশ জানালাম, — "প্রভু, থেরেসা যদি অন্তর্ধানই করলেন, তবে তুমি তাঁর কাছে আমায় নিয়ে এলে কেন?"

কাছে এসে একটি লোক দাঁড়াল — লোকটা ইংরেজী জানত। বিনীত হয়ে জিজ্ঞাসা করল যে, সে কিছু সাহায্য করতে পারে কি না।

---

* থেরেসার জীবন সম্বন্ধে অন্যান্য বই হচ্ছে ঃ *Therese Neumann: A Stigmatist of Our Day,* and *Further Chronicles of Therese Neumann,* both by Friedrich Ritter von Lama; and *The Story of Therese Neumann,* by A. P. Schimberg (1947), all published by Bruce Pub. Co., Milwaukee, Wisconsin; and *Therese Neumann,* by Johannes Steiner, published by Alba House, Staten Island, N. Y.

সে বলল, "থেরেসা কোথায় তা অবশ্য আমি সঠিক জানি না। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে প্রফেসর ফ্রানজ্ ওয়াৎসের বাড়ি যান — তিনি হচ্ছেন আইখ্‌স্ট্যাট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশী ভাষার শিক্ষক — জায়গাটা এখান থেকে আশি মাইল দূরে।"

তারপরদিন সকাল বেলা আবার আমাদের দলটি আইখ্‌স্ট্যাটের শান্ত গ্রামটিতে গিয়ে উপস্থিত হল। ডাক্তার ওয়াৎস তাঁর বাড়িতে আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে বললেন, "হ্যাঁ, থেরেসা এখন এখানেই আছেন।" বলে তিনি এই সব দর্শনপ্রার্থীদের কথা তাঁকে বলে পাঠালেন। তাঁর উত্তর নিয়ে একটি লোক শীঘ্রই নীচে নেমে এল। তাতে লেখা ছিল, "যদিও বিশপ তাঁর অনুমতি বিনা আমায় কারোর সঙ্গে দেখা করতে নিষেধ করেছেন, তবুও আমি ভারতবর্ষের এই সাধুটির সঙ্গে দেখা করব।"

তাঁর কথাগুলিতে মন গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠল। ডাক্তার ওয়াৎসের সঙ্গে উপরতলায় বসবার ঘরে গেলাম। থেরেসাও সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর পুণ্যদেহ হতে একটা যেন শান্তি আর আনন্দের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। পরিধানে ছিল একটা কাল গাউন আর অতি শুভ্র শ্বেতবর্ণের মস্তকাবরণ। এই সময়ে তাঁর সাঁইত্রিশ বছর বয়স হলেও দেখতে তিনি যেন আরও নবীন — শিশুর সৌকুমার্য আর লাবণ্যে ভরা : সুগঠিত আকৃতি স্বাস্থ্যপূর্ণ — কপোলদেশে রক্তিম আভা, প্রফুল্লবদন এই সেই সাধ্বী যিনি অনাহারে থাকেন।

থেরেসা আমার সঙ্গে অতিমৃদু করমর্দনে আমায় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। নীরবে উভয়েই উভয়কে ঈশ্বরপ্রেমিক জেনে আমাদের উভয়েরই মুখে মৃদুহাসি ফুটে উঠল।

ডাক্তার ওয়াৎস দয়া করে বললেন যে তিনি আমাদের দোভাষীর কাজ করবেন। সকলে উপবেশন করতে দেখা গেল যে থেরেসা অবিমিশ্র কৌতূহলের সঙ্গে আমার দিকে তাকাচ্ছেন — স্পষ্টতঃই বোঝা গেল যে, ব্যাভেরিয়া অঞ্চলে ভারতীয় হিন্দু নিতান্তই দুর্লভদর্শন।

তাঁর নিজের মুখ থেকে উত্তরটা শোনবার আশায় আমি প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি কিছুই খান না?"

"না, কেবলমাত্র একটি হোস্ট* ছাড়া — তাও সকাল ছটার সময় একবারমাত্র খাই।"

"রুটিটি কত বড়?"

"কাগজের মত পাতলা আর একটি ছোট টাকার মত। আমি এটা গ্রহণ করি — পবিত্র অনুষ্ঠানপালনেরই জন্য। যদি এ প্রসাদী না হয়, তাহলে আমি তা আর গিলতে পারি না।"

"তাতে করে তো আপনি আর এই এতদিন বারবছর ধরে বেঁচে থাকতে পারেন না।"

তাঁর উত্তর এল অত্যন্ত সরল আর আইনস্টাইনীয় ভঙ্গীতে — "আমি ঈশ্বরের জ্যোতিঃতেই বেঁচে আছি।"

"তাহলে দেখছি যে আপনি ঈথর, আলো আর বায়ু থেকেই আপনার শরীরের জন্য শক্তি ও পুষ্টি সঞ্চয় করেন।"

তাঁর মুখের উপর একটা মৃদুহাসির ঝিলিক খেলে গেল। বললেন, "কেমন করে বেঁচে আছি তা যে আপনি বুঝতে পেরেছেন, জেনে আমি ভারী খুশি হলাম।"

"যীশুখ্রিস্ট যে মহাসত্য উচ্চারণ করে গেছেন যে, 'মানুষ কেবলমাত্র শুধু অন্নতেই জীবনধারণ করবে না, ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত তাঁর প্রত্যেক বাণীর দ্বারাই সে তার জীবনধারণ করবে'† — এ কথার সত্যতার দৈনন্দিন জীবন্ত উদাহরণ হচ্ছে আপনার পুণ্যময় জীবন।"

---

* ইউক্যারিষ্টিক (যীশুর নৈশ ভোজন পর্ব) ময়দার পাতলা প্রসাদী রুটি।

† ম্যাথিউ — ৪ : ৪ (বাইবেল)। মানুষের দেহরূপ ব্যাটারি যে কেবলমাত্র জড় অন্নেতেই পরিপুষ্টি লাভ করে তা নয়। তা করে স্পন্দনশীল বিশ্বশক্তি বলে (শব্দব্রহ্ম বা প্রণব ঝঙ্কার)। সুষুম্নাশীর্ষক (সহস্রদল পদ্ম) দ্বারের ভিতর দিয়ে এই অদৃশ্য মহাশক্তি মানবশরীরে সঞ্চারিত হয়। ঘাড়ের পিছনে মেরুদণ্ডস্থিত পাঁচটি চক্রের উপর এই ষষ্ঠচক্রটি অবস্থিত।

এই সুষুম্নাই হচ্ছে শরীরের মধ্যে বিশ্বপ্রাণশক্তি (প্রণব) সঞ্চারের প্রধান প্রবেশদ্বার এবং তা দুই ভ্রূমধ্যস্থ তৃতীয়নেত্রস্থিত খ্রিস্টচৈতন্য কেন্দ্রের (কূটস্থ চৈতন্য), যা মানবের ইচ্ছাশক্তির আধার, তার সঙ্গে মেরুপ্রবণতা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সংলগ্ন। অতএব এই মহাব্যোমশক্তি সপ্তম চক্র মস্তিষ্কের মধ্যে অসীম সম্ভাবনার আধারস্বরূপে সঞ্চিত থাকে — (বেদে ব্রহ্মজ্যোতিঃর সহস্রদলকমল রূপে উল্লিখিত)। বাইবেলের লেখকগণ যখন "ওম্" অথবা "পবিত্রাত্মা" বলে উল্লেখ করেন, তখন তা ওঙ্কার অথবা শব্দব্রহ্মকে অদৃশ্য প্রাণশক্তি অর্থেই ব্যবহার করেন, যে

আমার ব্যাখ্যায় তিনি পুনরায় আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, "বাস্তবিকই তাই। এ জগতে আমার বেঁচে থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে যে, শুধু অন্নদ্বারা নয়, ঈশ্বরের অদৃশ্য আলোকেই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে — তা প্রমাণ করা।"

"আচ্ছা, কি করে মানুষ না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তা আপনি তাদের শিখিয়ে দিতে পারেন না কি?"

মনে হল একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন — বললেন, "আমি তো তা পারি না, ঈশ্বরের তা ইচ্ছা নয়।"

তাঁর বলিষ্ঠ অথচ কমনীয় দু'টি হস্তের উপর আমার দৃষ্টি পড়তেই থেরেসা তাঁর উভয় করপৃষ্ঠে সদ্য আরোগ্যপ্রাপ্ত একটি করে ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ক্ষতচিহ্ন প্রদর্শন করলেন। প্রত্যেক করতলে তিনি দেখালেন যে আরও এক ক্ষুদ্র অর্ধচন্দ্রাকৃতি ক্ষতচিহ্ন — সবেমাত্র শুকিয়েছে। প্রত্যেক ক্ষতচিহ্ন হাতের চেটোর মধ্য দিয়ে ফুঁড়ে গিয়েছে। এই দৃশ্য দেখে আমার স্পষ্ট মনে পড়ল যে বড় বড় চৌকো লোহার পেরেকের তলাগুলো চাঁদের ফালির মত, এখনও তা পূর্বাঞ্চলে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমি সে সব পশ্চিমে ব্যবহৃত হতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

তারপর থেরেসা নোয়ম্যান তাঁর সাপ্তাহিক "ভরে"র কথা কিছু বলে বললেন, "অসহায় দর্শকের মত আমি যীশুখ্রিস্টের মরণদৃশ্যের সবটাই প্রত্যক্ষ করি।" প্রতি বৃহস্পতিবার মধ্যরাত্র থেকে শুক্রবার বেলা ১টা পর্যন্ত তাঁর ক্ষতস্থানগুলির মুখ খুলে গিয়ে রক্তক্ষরণ হতে থাকে। সাধারণভাবে তাঁর দেহের ওজন ১২১ পাউণ্ড, তা থেকে দশ পাউণ্ড তখন কমে যায়। তাঁর এই গভীর ঈশ্বরপ্রেমে নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করেও থেরেসা তাঁর প্রভু যীশুখ্রিস্টের সাপ্তাহিক দর্শনলাভের আশায় সানন্দে অপেক্ষা করেন।

ঐশী বলে এ নিখিল সৃষ্টি বিধৃত হয়ে আছে। "কি? তুমি কি জান না যে তোমার দেহ হচ্ছে তোমার মধ্যে অবস্থিত 'পবিত্রাত্মার' মন্দির, যা তুমি ঈশ্বরের কাছ হতে লাভ করেছ, আর তুমি তোমার নিজের কিছু নও?" — ১ করিন্থিয়ান ৬ঃ ১৯ (বাইবেল)।

আমি তখনই বুঝলাম যে, তাঁর এই অদ্ভুত জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল খ্রিস্টানদের কাছে নূতন টেস্টামেণ্টে বর্ণিত যীশুখ্রিস্টের জীবন ও ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা, আর সেই গ্যালিলীয় গুরু ও তাঁর ভক্তশিষ্যদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্ধন নাটকীয়ভাবে প্রদর্শন করাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

তারপর প্রফেসর ওয়াৎস সেই সাধ্বীমহিলার বিষয়ে কতকগুলি ঘটনা বর্ণনা করলেন।

তিনি বললেন, "আমাদের মধ্যে জনকতক — তার মধ্যে থেরেসাও থাকেন, সারা জার্মানীর ভিতর দিয়ে দিনের পর দিন ধরে নানাস্থান দেখবার জন্যে প্রায়ই বেড়াতে বার হই। তখন এক অস্বস্তিকর ব্যাপার ঘটে! আমরা যখন দিনে তিনবার করে বেশ পরিপাটিরূপে ভোজনক্রিয়াটি সম্পন্ন করি — থেরেসা তখন বিন্দুমাত্র জলও স্পর্শ করেন না। থেরেসার কিন্তু বিন্দুমাত্রও ক্লান্তি নাই, তখনও তিনি সদ্যফোটা একটি গোলাপফুলেরই মত তাজা। ক্ষিধেয় পেট জ্বলতে শুরু করলে আমরা যখন রাস্তার ধারে সরাইখানা ঢুঁড়ে মরি, থেরেসা মহা আনন্দে কেবল হাসেন।"

প্রফেসর সাহেব তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে আরও কতকগুলি কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার বললেন। তিনি বললেন, থেরেসা কোনও প্রকার আহার্য গ্রহণ না করাতে, তাঁর পাকস্থলী কুঞ্চিত হয়ে গেছে। তাঁর মলমূত্র ত্যাগ হয় না — কিন্তু তাঁর ঘর্মগ্রন্থির ক্রিয়া সব ঠিকই আছে। চর্ম তাঁর সর্বদাই কোমল অথচ দৃঢ়।

বিদায়গ্রহণকালে আমি থেরেসাকে তাঁর "ভর" হবার সময় উপস্থিত থাকবার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম।

তিনি সৌজন্য প্রকাশ করে বললেন, "তা বেশ, কোনার্সরয়েথে আসুন না কেন — আসছে শুক্রবারে। বিশপের কাছ থেকে অনুমতিপত্র পাবেন। আমায় আইখ্স্ট্যাটে খুঁজতে গিয়েছিলেন শুনে আমি ভারি খুশি হয়েছি।"

বহুবার মৃদুভাবে করমর্দন করে থেরেসা আমাদের দলটিকে এগিয়ে দিতে গেটের কাছ পর্যন্ত এলেন। রাইটসাহেব মোটরগাড়ির রেডিওটি খুলে দিতেই থেরেসা সহাস্যকৌতূহলে যন্ত্রটি পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেই সময় উপস্থিত ছোকরাদের দল এতবেশি সংখ্যায় ভারি হয়ে উঠল যে, থেরেসাকে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়তে হল। আমরা গাড়ি ছেড়ে দিলাম — দেখি যে থেরেসা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে উঁকি মারছেন আর ছোট মেয়ের মত আমাদের দিকে হাত নাড়ছেন।

থেরেসার দুই ভাই — ভারি অমায়িক আর তাদের ব্যবহারও অতি মধুর, — তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে পারলাম যে থেরেসা মাত্র এক বা দু'ঘণ্টা রাত্রিতে ঘুমান। তাঁর শরীরে বহু ক্ষতচিহ্ন থাকা সত্ত্বেও তিনি বেশ কার্যক্ষম আর উৎফুল্ল। পাখি খুব ভালবাসেন, মাছের অ্যাকুইরিয়াম আছে — তার দেখাশোনা করেন, আর বাগানে উদ্যানচর্যাতেই তাঁর বহুসময় কাটে; চিঠিপত্র লেখালিখিও তাঁকে খুব করতে হয়। ক্যাথলিক ভক্তেরা তাঁকে প্রার্থনা আর রোগনিরাময়ের জন্য লেখেন। বহু ভক্ত তাঁর দ্বারা গুরুতর ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করেছেন।

তাঁর এক ভাই ফার্ডিনাণ্ড — বয়স তেত্রিশবছর — তার সঙ্গে আলাপ হল। আমায় বললেন — প্রার্থনার বলে অপরের রোগের ভোগ নিজশরীরে ক্ষয় করে নেবার শক্তি থেরেসার আছে। থেরেসা আহার ত্যাগ করতে শুরু করলেন তখন, যখন তাঁদের গির্জার একটি যুবক পাদ্রী হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল; সেই সময়ে তিনি প্রার্থনা করেন যে সেই যুবকের গলার ব্যাধি যেন তাঁর নিজের গলায় প্রবিষ্ট হয়।

বৃহস্পতিবার বৈকালে আমাদের দলটি বিশপের বাড়ি গিয়ে পৌঁছল; বিশপ মহাশয় তো আমার লম্বা চুল দেখে বেশ বিস্মিত হলেন। যাইহোক, তিনি শীঘ্রই অনুমতিপত্রটি লিখে আমাদের হাতে দিলেন। অবশ্য তার জন্যে আমায় কোনরকম ফি দিতে হয় নি। চার্চ এই নিয়মটি করেছিল অলস কৌতূহলী পর্যটকদের হাত থেকে থেরেসাকে বাঁচাবার জন্যে। পূর্ববর্তী বছরগুলিতে তারা প্রতি শুক্রবারে হাজারে হাজারে এসে উপস্থিত হতো।

শুক্রবার কোনার্সরয়েথে এসে পৌঁছলাম বেলা সাড়ে নটায়। দেখা গেল থেরেসার ক্ষুদ্র কুটিরটির একটা বিশেষ অংশে কাঁচের ছাদ দেওয়া আছে — যাতে প্রচুর আলো আসতে পারে। দেখে আনন্দ হল, এবার আর দরজাগুলো সব বন্ধ নয় — সানন্দে স্বাগত সম্ভাষণের জন্য সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত। প্রায় জনকুড়ি দর্শক সেখানে উপস্থিত, সবাইকার হাতে একটি করে পারমিট বা অনুমতিপত্র; আমরাও সেই দলে মিশে গেলাম। অনেকেই সেই অদ্ভুত "ভর" দেখবার জন্যে বহু দূরদেশ থেকে এসেছেন।

থেরেসা আমার প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সেই প্রফেসরের বাড়িতে। আমি যে তাঁকে আধ্যাত্মিক কারণে দেখতে এসেছি — কেবলমাত্র অলস কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে নয় — তা তিনি অন্তরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

আমার দ্বিতীয় পরীক্ষা হয়েছিল এই রকম। উপরতলায় তাঁর ঘরে যাবার আগে আমি যোগনিদ্রায় মগ্ন হলাম, উদ্দেশ্য ছিল দূরদর্শন আর দূরশ্রবণবিষয়ে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া। তাঁর কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলাম — দেখি তা দর্শকে পরিপূর্ণ; শয্যার উপর একটি শ্বেতবসনে আবৃত হয়ে থেরেসা শয়ন করে আছেন। রাইট সাহেবও পিছনে পিছনে আসছিল। আমি চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভিতরে ঢুকেই একটা অদ্ভুত আর অতি ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

থেরেসার নীচের চোখের পাতা থেকে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া একটি রক্তস্রোত পাতলাভাবে অনবরত বইছে। তাঁর ঊর্ধ্বদৃষ্টি ভ্রূমধ্যস্থ তৃতীয়নেত্রের দিকে নিবদ্ধ। তাঁর মাথায় যে কাপড় জড়ান ছিল, তা কাঁটার মুকুটের ক্ষতস্থান হতে নিঃসৃত রক্তে প্লাবিত হয়ে গেছে। তাঁর বুকের উপরকার শ্বেতবস্ত্র তাঁর পাঁজরার ক্ষতস্থান হতে ঝরা রক্তে একেবারে লাল হয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয়, ঠিক যে জায়গায় যীশুখ্রিস্ট বহুকালপূর্বে সৈনিকের বর্শাফলকের দ্বারা আঘাত পেয়েছিলেন, ঠিক সেই জায়গা থেকেই রক্ত ঝরে পড়ছে!

থেরেসার হস্তদু'টি জননীর স্নেহকরুণায় প্রসারিত ... অনুনয়ে বিন্যস্ত। আননে যুগপৎ যন্ত্রণা ও ক্লেশের ছায়া আবার স্বর্গীয় আভা। দেখে

বোধ হল শরীরটি পূর্বাপেক্ষা একটু যেন কৃশ হয়ে গেছে, আর অন্তর ও বাহির — বহু দিক দিয়েই তাঁর সূক্ষ্ম পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আপনমনে বিড়বিড় করে কি একটা বিদেশীভাষায় কথা কইতে কইতে তাঁর ঠোঁট দু'টি কাঁপছে — বোধ হয় তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সামনে যে সব ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদেরই সঙ্গে কথা বলছিলেন।

তাঁর মনের সঙ্গে তখন আমার যোগসূত্র স্থাপন করা হয়ে গেছে। আমিও তাঁর স্বপ্নের সব দৃশ্যই দেখতে পেলাম। যীশুখ্রিস্ট যখন বিদ্রূপকারী জনতার মধ্য দিয়ে ক্রুশের কাঠ বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনকার সব দৃশ্য থেরেসা দেখছিলেন।* হঠাৎ তিনি ধড়মড় করে মাথা উঁচু করে তুলে ধরলেন ... কাঠের ভারে যীশুখ্রিস্টের পতন ঘটল। দৃশ্যটিও অন্তর্হিত হল। উদগ্র অনুভূতিতে ক্লান্ত হয়ে থেরেসা বালিশের উপর মাথা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ঠিক এইসময়ে আমি আমার পিছনেই যেন মানুষ পড়ে যাবার মত দড়াম করে একটা ভারি কিছু পতনের শব্দ শুনতে পেলাম। মুহূর্তের মধ্যে মাথা ফিরিয়ে দেখি যে দু'টি লোক একটি শায়িত দেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। সেই সময় আমার গভীর যোগনিদ্রার ঘোর কাটেনি বলে লোকটি যে কে, তা তখুনিই ঠিক চিনতে পারি নি। আবার থেরেসার মুখের উপর আমার দৃষ্টি স্থাপিত করলাম ... রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে বলে সে মুখ মৃত্যুপাণ্ডুর, বিবর্ণ, কিন্তু তা থেকে একটা শুদ্ধ ও পবিত্র আভা বেরোচ্ছে। তারপরে আমি পিছন ফিরে দেখি যে রাইটসাহেব গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে — গাল দিয়ে রক্ত ঝরছে।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ডিক, তুমিই কি পড়ে গিয়েছিলে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি এ ভীষণদৃশ্য সহ্য করতে না পেরে মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম।"

---

* আমার সেখানে উপস্থিত হবার পূর্বেই যীশুখ্রিস্টের শেষজীবনের কতকগুলি ঘটনার স্বপ্নদর্শন থেরেসার ইতিমধ্যেই ঘটে গিয়েছিল। সাধারণতঃ তাঁর "ভর" আরম্ভ হয় যীশুখ্রিস্টের "শেষ সান্ধ্যভোজে"র পরবর্তী কতকগুলি ঘটনার দৃশ্য হতে, আর তাঁর স্বপ্নদর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটে যীশুর ক্রুশের উপর মৃত্যু অথবা কখনও কখনও তাঁর সমাধির সঙ্গে সঙ্গে।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, “যাক, তোমার সাহস আছে দেখছি — ফিরে এসে আবার এ দৃশ্য দেখতে এসেছ!”

বহু দর্শক তখনও নীচে নীরবে অপেক্ষা করছে স্মরণ করে মিস্টার রাইট আর আমি থেরেসার কাছ থেকে নীরবে বিদায়গ্রহণান্তে তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য ত্যাগ করে বেরিয়ে এলাম।”*

তার পরদিন আমাদের ক্ষুদ্র দলটি মোটরে করে দক্ষিণদিকে অগ্রসর হল। একটা সুবিধা ছিল এই যে, আমাদের ট্রেনের উপর নির্ভর করতে হয় নি — গ্রামের ধারে যেখানে যখন ইচ্ছা আমাদের ফোর্ডগাড়ি থামিয়ে সব দেখতে শুনতে পেরেছি। জার্মানী, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ডের আল্পস্ পাহাড় প্রভৃতি ভ্রমণের সময় প্রতিটি মুহূর্ত আমরা উপভোগ করেছি; ইটালির মধ্যে অ্যাসিসিতে বিনয়ের অবতার সেণ্ট ফ্রান্সিসকে দর্শন করবার জন্যে আমরা যাই। ইউরোপভ্রমণ আমাদের শেষ হল গ্রীসে এসে। এখানে আমরা এথিনিয়ান মন্দির আর যে কারাগারে সক্রেটিস† বিষপান

---

* ১৯৪৮ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে জার্মানী থেকে যুদ্ধোত্তর আই. এন. এস. প্রেরিত সংবাদে প্রকাশিত, “এবারে গুডফ্রাইডে'র দিন একটি জার্মান কৃষকরমণীকে দেখা গেল যে, সে তার শয্যায় শায়িতা; তার মাথা, হাত আর কাঁধ দু'টিতে রক্তচিহ্ন, যীশুখ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হবার আর কণ্টকমুকুট ধারণ করবার পর কাঁটার আর পেরেকের যে যে স্থানে ক্ষতচিহ্ন থেকে রক্ত ঝরেছিল, ঠিক সেই সেই স্থান হতে রক্ত ঝরছে। ভীতিবিমূঢ় সহস্র সহস্র জার্মান ও আমেরিকান থেরেসা নোয়ম্যানের কুটিরশয্যার পাশ দিয়ে তাঁকে দর্শন করে একে একে অগ্রসর হচ্ছিল।” *(এই বিখ্যাত ক্ষতাঙ্কধারিণী ১৯৬২ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর কোনার্সরিউথ-এ পরলোক গমন করেন)।*

† ইউসেবিয়াসের এক পঙ্‌ক্তিতে সক্রেটিস এবং এক হিন্দুঋষির মধ্যে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তর্কযুদ্ধের বিষয় বর্ণিত আছে। পঙ্‌ক্তিটিতে লিখিত আছে, “সঙ্গীতবিশারদ এরিস্টোজেনাস ভারতীয়দের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি বলেন ঃ এঁদের মধ্যে একজন এথেন্স নগরীতে সক্রেটিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন তাঁর দর্শনের বিষয় কি। সক্রেটিস উত্তর দিলেন, 'মানবজীবনের ব্যাপারে অনুসন্ধান!' এই উত্তরে ভারতবাসীটি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করে বললেন, 'মানবজীবনের ব্যাপারে অনুসন্ধান করে মানুষ কি করবে, যখন সে দৈবব্যাপারের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ।”

গ্রীক আদর্শ, যা পাশ্চাত্যদর্শনে প্রতিবিম্বিত, তা হচ্ছে “মানব, নিজেকে জান।” একজন হিন্দু বলবে, “মানব, তোমার স্ব-রূপকে অবগত হও।” ভারতবাসীর চক্ষে ডেকার্টের বিখ্যাত নীতিসূত্র “আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি,” দার্শনিকভাবে গ্রাহ্য নয়। বিচারশক্তি মানবের চরম অস্তিত্বের উপর আলোকপাত করতে পারে না। মানবমন, বাইরের বিশ্বপ্রকৃতির মত — যার সঙ্গে এ পরিচিত — চিরপরিবর্তনশীল; তা কোন চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তির চরিতার্থতাই চরম লক্ষ্য নয়। ঈশ্বরানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই হচ্ছেন নিত্যসত্যে (বিদ্যা)র প্রকৃত উপাসক; আর সকলই 'অবিদ্যা' — আপেক্ষিক জ্ঞান।

করেছিলেন, সেই কারাগার দর্শন করলাম। গ্রীকরা যেভাবে দেশের সর্বত্র তাদের কল্পনাকে এ্যালাব্যাস্টারে রূপায়িত করে তুলেছে, তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হতে হয়।

তারপর রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল ভূমধ্যসাগরে এসে জাহাজ ধরলাম, নামলাম প্যালেস্টাইনে। দিনের পর দিন সেই পুণ্যভূমিতে বিচরণ করে মনে মনে বুঝলাম — তীর্থভ্রমণের মূল্য কি! প্যালেস্টাইনে যীশুখ্রিস্টের মহিমা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। শ্রদ্ধান্তকরণে আমি বেথেলহেম, গেথসিমেন, ক্যালভেরি, পবিত্র মাউণ্ট অফ অলিভস্, জর্ডন নদী, গ্যালিলীর সমুদ্র, সবই তাঁর পাশে পাশে দেখতে দেখতে ঘুরে বেড়িয়েছি।

আমাদের ছোট্টদলটি নিয়ে তাঁর জন্মস্থান "অশ্বশালা", জোসেফের কাঠের কারখানা, ল্যাজারাসের কবর, মার্থা ও মেরীদের বাড়ি, শেষভোজের হলঘরটি — সব দেখে বেড়ালাম। প্রাচীনকালের অন্ধ কারা হতে উদ্‌ঘাটিত দৃশ্যের পর দৃশ্যে দেখলাম যীশুখ্রিস্ট যুগযুগান্তরের জন্য কি সব স্বর্গীয় নাটক অভিনয় করে গেছেন।

তারপর মিশরে এলাম; দেখলাম এর আধুনিক শহর কাইরো আর সে'দেশের প্রাচীন পিরামিডকে। তারপরে লোহিত সাগর পার হয়ে আমাদের জাহাজ আরব সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। অবশেষে ঐ দূরে ভারতবর্ষ!

৪০ পরিচ্ছেদ

আমার ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন

আমার ভারতবর্ষ! সকৃতজ্ঞভাবে ভারতের পুণ্যবায়ুতে আবার আমি নিঃশ্বাস নিলাম — বুক যেন ভরে গেল।

১৯৩৫ সালের ২২শে অগ্যাস্ট আমাদের 'রাজপুতানা' নামে বড় জাহাজখানা বোম্বাই শহরের প্রকাণ্ড বন্দরে এসে ভিড়ল। জাহাজ থেকে নেমে প্রথমদিনেই টের পেলাম যে সামনের একটি বছর আমায় কি রকম অবিরাম কর্মস্রোতের মধ্য দিয়ে কাটাতে হবে। বন্ধুরা সব ফুলের মালা নিয়ে বন্দরে অভ্যর্থনার জন্যে এসেছেন। তাজমহল হোটেলে গিয়ে উঠলাম — শীগগিরই রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফারদের ভিড় লেগে গেল।

বোম্বাই শহরটা আমার কাছে নতুন; দেখলাম, আধুনিক পশ্চিমের অনেক উপকরণ দিয়ে শহরটি চমৎকার সাজানো। প্রশস্ত রাজপথের দু'ধারে পামগাছের সারি; বিরাট সৌধশ্রেণী প্রাচীন মন্দিরগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। যাইহোক, শহর দেখার সময় খুব অল্পই পাওয়া গেল; আমার পূজনীয় গুরুদেব আর প্রিয়জনদের সঙ্গে সাক্ষাতের অধীর আগ্রহে মন তখন ব্যাকুল। ফোর্ড গাড়িটাকে মালগাড়িতে চালান করে দিয়ে আমরা কলকাতার গাড়িতে চেপে বসলাম।*

হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখি যে আমাদের অভ্যর্থনা করতে আসা মানুষের এমনই ভিড় সৃষ্টি হয়েছে যে, খানিকক্ষণ আমরা ট্রেন থেকে নামতেই পারলাম না। অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ থেকে কাশিমবাজারের তরুণ মহারাজা আর আমার ভাই বিষ্ণু এগিয়ে এল। অভ্যর্থনার বিরাটত্ব আর আন্তরিকতায় আমরা অভিভূত হয়ে পড়লাম।

---

* ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীকে দর্শনের জন্য আমরা মধ্যপথে সেন্ট্রাল প্রভিন্সে যাত্রাভঙ্গ করি। সেখানকার কথা সব ৪৪ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

আপাদমস্তক পুষ্পমাল্যে ভূষিত হয়ে মিস ব্লেচ, মিস্টার রাইট আর আমি ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম। আমাদের গাড়ির সামনে একটি শোভাযাত্রাও ছিল, তাতে ছিল মোটরগাড়ি আর মোটর সাইকেলের সারি; ঢাক আর শঙ্খধ্বনির সঙ্গে আনন্দকোলাহল করতে করতে শোভাযাত্রাটি ঠিক আমাদের গাড়ির পুরোভাগে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল।

বৃদ্ধ পিতা আনন্দোদ্বেলিত হৃদয়ে আমায় আলিঙ্গন করলেন, যেন পুনর্জন্ম লাভ করে ফিরে এসেছি। আনন্দে আমরা উভয়েই নির্বাক — পরস্পরের দিকে অপলক দৃষ্টিতে শুধু চেয়েই রইলাম; ভাই, বোন, খুড়ো, খুড়ী, খুড়তুতো ভাইয়েরা, ছাত্র, বহুদিনের বন্ধুরা — সকলেই এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালেন, আমাদের ভিতর কারোরই চক্ষু তখন শুষ্ক ছিল না। স্মৃতির মণিকোঠায় লুকিয়ে থাকলেও পুনর্মিলনের সে সব স্নেহের দৃশ্য এখনও মনে প্রত্যক্ষভাবে জাগ্রত, তা জীবনে কখনও ভুলে যাবার নয়। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে সাক্ষাতের দৃশ্য বর্ণনা করতে গেলে আমি ভাষা খুঁজে পাই না; আমার সেক্রেটারীর লেখা নীচের এই বর্ণনাটি দিলেই যথেষ্ট হবে।

মিস্টার রাইট তাঁর ভ্রমণের দিনলিপিতে লিখেছেন, "কি অসীম আগ্রহ আর আশা নিয়ে আজ আমি যোগানন্দজীকে কলকাতা থেকে শ্রীরামপুরে গাড়িতে করে নিয়ে গেলাম! রাস্তার দু'ধারে বিচিত্রবর্ণের দোকানের সারি — তাদের মধ্যে একটি ছিল যোগানন্দজীর কলেজ জীবনের প্রিয় ভোজনালয় — তা পেরিয়ে গিয়ে ঢুকলাম একটি সরু গলিতে, তার দু'ধারে দেওয়াল। হঠাৎ বাঁ দিকে ঘুরতেই গুরুদেবের দোতলা আশ্রমবাড়িটি চোখে পড়ে গেল — এর লোহার গ্রিলদেওয়া বারান্দা উপরের দোতলা থেকে রাস্তার দিকে বেরিয়ে এসেছে। চারপাশ ঘিরে একটা শান্তির বাতাবরণ।

"গভীর ভক্তিনতহৃদয়ে আমি যোগানন্দজীর পিছন পিছন গিয়ে আশ্রমের উঠানেতে প্রবেশ করলাম। হৃৎপিণ্ড দ্রুত আলোড়িত হচ্ছে; আমরা উভয়ে পুরান সিমেণ্টের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলাম — এই

সেই সিঁড়ি যেখান দিয়ে কত সত্যান্বেষী যাতায়াত করেছেন। উপরে উঠতে উঠতে মনের চাঞ্চল্য ক্রমশঃই বাড়তে লাগল। আমাদের সামনে সিঁড়ির মাথায় নীরবে এসে দাঁড়ালেন মহাত্মা স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বরজী — প্রাচীন ঋষির দৃপ্ত মহিমায়!

তাঁর মহান সান্নিধ্যে উপস্থিত হবার অপরিসীম সৌভাগ্যলাভে আমার অন্তঃকরণ ভাবের প্রাবল্যে আলোড়িত ও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আমার আগ্রহব্যাকুল দৃষ্টি অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে এল — দেখলাম, যোগানন্দজী নতজানু হয়ে অবনতমস্তকে গুরুর চরণকমল স্পর্শ করে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও তাদের বন্দনা করলেন; তারপর পদযুগলে হস্ত স্পর্শ করে, হাতটি নিজের কপালে ঠেকালেন। উঠে দাঁড়াতেই শ্রীযুক্তেশ্বরজী তাঁকে বক্ষে স্নেহভরে ধারণ করে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করলেন।

"প্রথমে মুখ থেকে কোন কথাই বেরোল না, কিন্তু মনের গভীর ভাব অন্তরের নীরব বাণীতেই পরস্পরের কাছে প্রকাশিত হল। পুনর্মিলনের আনন্দের উষ্ণতায় তাঁদের উভয়েরই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নীরব বারান্দায় এক স্নিগ্ধ মধুরভাব স্পন্দিত হচ্ছিল — সূর্যও তখন হঠাৎ মেঘ থেকে বেরিয়ে এসে আলোর প্লাবনে ভাসিয়ে দিল!

"নতজানু হয়ে তাঁর চরণযুগল স্পর্শ করে আমিও পরমগুরুদেবকে আমার অন্তরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা নীরব ভাষায় নিবেদন করলাম। তিনিও আমায় আশীর্বাদ করলেন। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম, তাঁর গভীর দু'টি সুন্দর কালো চোখ অন্তর্দৃষ্টির জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত, আনন্দে উজ্জ্বল।

তারপর তাঁর বৈঠকখানায় গিয়ে আমরা বসলাম; তার একটা অংশ বারান্দার দিকে মুখ করা, যেটা রাস্তা থেকে দেখা যায়। পরমগুরুদেব একটা পুরান সোফায় ঠেসান দিয়ে সিমেণ্টের মেঝের উপর একটা গদির আসনে বসলেন। যোগানন্দজী আর আমি পরমগুরুদেবের চরণপ্রান্তে গিয়ে উপবেশন করলাম! মাদুরের উপর ঠেসান দিয়ে আরামে বসবার জন্যে গেরুয়ারঙের গোটাকতক বালিশও ছিল।

"দুই স্বামীজীর মধ্যে কথাবার্তা চলছিল বাংলায়, তা অনুধাবনের জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলাম (কারণ পরে দেখলাম যে যখন তাঁরা একসঙ্গে থাকেন তখন মোটেই ইংরেজী ব্যবহার করেন না, যদিও স্বামীজীমহারাজ — লোকে তাঁকে এই বলেই ডাকে — ইংরেজীতে বেশ কথাবার্তা বলতে পারেন, আর প্রায়ই তা বলেন)। আমি কিন্তু সেই মহাপুরুষের বিরাট মহিমা উপলব্ধি করলাম — তাঁর মন কেড়েনেওয়া হাসিতে আর আনন্দোজ্জ্বল চোখদুটিতে। তাঁর গভীর অথবা প্রফুল্ল সদালাপে একটা গুণ অতি সহজেই দেখা যেত যে, তাঁর উক্তিতে একটা দৃঢ় নিশ্চয়তা থাকত — জ্ঞানীব্যক্তির লক্ষ্মণ, যিনি জানেন যে তিনি সত্যকে জানেন, কারণ ভগবানকে তিনি জানতে পেরেছেন। তাঁর গভীর জ্ঞান, উদ্দেশ্যের স্থিরতা আর মতের দৃঢ়তা সব রকমেই প্রকাশ পেত।

"স্বামীজী মহারাজের পরিধেয় ছিল নিরাড়ম্বর — শুধু ধুতি আর শার্ট। সে'গুলি একসময়ে গেরুয়া রঙের ছিল, এখন তা হাল্কা কমলালেবু রঙে এসে দাঁড়িয়েছে। মাঝে মাঝে তাঁকে সশ্রদ্ধভাবে বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছিলাম যে, তাঁর খেলোয়াড়চিত দীর্ঘ বপু, সন্ন্যাসধর্মের পরীক্ষা আর ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। তাঁর দেহভঙ্গীমাটি রাজকীয়। ঋজু, গাম্ভীর্যপূর্ণ তাঁর চলনভঙ্গিমা। স্ফূর্তিতে, হাঁসির উচ্ছ্বাসে তাঁর সারা শরীরটি কম্পিত হয়। এই হাঁসি সত্যিই আনন্দোদ্বেলিত ও আন্তরিক — অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসরিত।

তাঁর মুখ ও শরীরের গঠন দিব্য শক্তিমত্তার পরিচায়ক। মাথার মাঝখানে চেরা সিঁথি; চুল কপালের কাছে সাদা হতে হতে স্বর্ণাভ হয়ে শেষে ধুসরে পরিণত হয়েছে। গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ তাঁর কাঁধের উপর এসে লুটিয়ে পড়েছে। শ্মশ্রুগুম্ফ বিরল বা ক্ষীণ হয়ে এসেছে, এবং তাতে যেন তাঁর মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমোচ্চ কপাল যেন স্বর্গমুখী। কৃষ্ণবর্ণের চোখ দু'টিকে ঘিরে রয়েছে এক নীল স্বর্গীয় বলয়। নাসিকাটি ঈষৎ দীর্ঘ ও স্থূল — অবসর মুহূর্তে সে'টিকে নিয়ে আমোদ করতেন। ছোট ছেলেদের মত নেড়েচেড়ে হাসিতামাসা করতেন। বিশ্রামরত

অবস্থায় তাঁর মুখমণ্ডল সুদৃঢ় দেখালেও তার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম কোমলতা মেশানো ছিল।

"ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখে বুঝলাম যে এই ভগ্নপ্রায় হতশ্রী ঘরের মালিকের সাংসারিক সুখের প্রতি কোন আসক্তিই নেই। সেই লম্বা ঘরটির সাদা দেওয়ালগুলি জলবায়ুতে বিবর্ণ হয়ে গিয়ে তাতে মাঝে মাঝে ফিকে নীল প্লাস্টারের দাগ দেখা দিয়েছে। ঘরের একদিকে মাল্যভূষিত লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতিকৃতি — অনাড়ম্বর সরল ভক্তির পরিচয়। এছাড়া ঘরে যোগানন্দজীরও একখানি ছবি ছিল — ছবিতে তিনি বোস্টন শহরে প্রথম এসে যখন ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান করেন তখন অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

"দেখলাম, সেখানে আধুনিক আর প্রাচীন ভাবের এক অদ্ভুত সমাবেশ। একটা প্রকাণ্ড বেলোয়ারি কাঁচের ঝাড়বাতি, মাকড়সার জালে ঢাকা পড়ে গেছে; আবার দেওয়ালে একটা রঙচঙে নতুন ক্যালেণ্ডারও শোভা পাচ্ছে। সারা ঘরটির মধ্যে একটা সুখ ও শান্তির স্নিগ্ধ মধুর সৌরভ ছড়িয়ে রয়েছে। বারান্দার ওধারে দেখলাম — বড় বড় নারকেল গাছ, আশ্রমের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নীরবে পাহারা দিচ্ছে।

"পরমগুরুদেব কাউকে ডাকতে হলে কেবল একটু মৃদু করতালি দিতেন আর তা শেষ হতে না হতেই, একজন না একজন বালকশিষ্য এসে হাজির হত তাঁর আজ্ঞাপালন করতে। তাদের মধ্যে একজনের নাম প্রফুল্ল,* ক্ষীণকায়, কাঁধ অবধি লম্বা একরাশ চুল, একজোড়া উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চোখ আর মুখে স্বর্গীয় হাঁসি লেগেই রয়েছে; হাসলে চোখদুটি মিটমিট করে, আর মুখের কোণদুটি একটু উপর দিকে ওঠে — যেন গোধূলিতে এক ফালি চাঁদের হঠাৎ আবির্ভাব।

"তাঁর 'সৃষ্টি' তাঁর কাছে ফিরে আসাতে শ্রীযুক্তেশ্বরজীর আনন্দ আজ উথলে উঠেছে (আর তাঁর 'সৃষ্টির সৃষ্টি', আমার সম্বন্ধেও তাঁর কিঞ্চিৎ কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়েছে, তাও দেখা গেল)। সে যাইহোক, দেখলাম যে

* প্রফুল্ল হচ্ছে সেই ছেলেটি যে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সামনে একটা কেউটে সাপ বেরোবার সময় সেখানে উপস্থিত ছিল।

এই মহাপুরুষের প্রকৃতিতে জ্ঞানভাবের প্রাবল্য তাঁর ভাবোচ্ছ্বাসের বাহিঃপ্রকাশকে বাধা দেয়।

"গুরুদর্শনে গেলে শিষ্যকে কিছু ভক্তিঅর্ঘ্য নিয়ে যেতে হয়। যোগানন্দজীও তাঁকে কতকগুলি জিনিষ উপহার দিলেন। তারপর আমরা খেতে বসলাম; রান্না সাদাসিধে হলেও খেতে বেশ চমৎকারই হয়েছিল। পদের মধ্যে ছিল নিরামিষ তরকারী আর ভাত। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমায় কতকগুলি ভারতীয় প্রথার ব্যবহার, অর্থাৎ হাত দিয়ে খেতে দেখে খুশিই হলেন।

"ঘণ্টাকতক ধরে মাঝে মাঝে বাংলায় নানারকম আলাপ-আলোচনা, স্নিগ্ধহাসি আর উৎফুল্ল দৃষ্টিবিনিময়ের পর তাঁর চরণে প্রণাম করে আমরা বিদায় গ্রহণ করলাম। এবার কলকাতায় ফেরা। এই পুণ্যদর্শনের পবিত্রস্মৃতি আমার মনে চিরজাগরুক থাকবে। যদিও আমি তাঁর ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশের সম্বন্ধে আমার ধারণা প্রধানতঃ লিখছি বটে, কিন্তু তাঁর সাধুজীবনের মুলভিত্তি যে আধ্যাত্মিক গৌরব, সে বিষয়ে আমি সর্বদাই সচেতন ছিলাম। তাঁর অপূর্ব শক্তি আমি অনুভব করে এসেছি; সেটাকেই আমি দেবতার আশীর্বাদের মত চিরতরে বহন করব।"

আমেরিকা, ইউরোপ, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি নানাদেশ থেকে আমি শ্রীযুক্তেশ্বরজীর জন্যে নানা উপহার এনেছিলাম। সেগুলি তিনি সহাস্যবদনে গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না। আমার নিজের ব্যবহারের জন্য আমি জার্মানী থেকে একটা লাঠির ভিতরে ছাতা এনেছিলাম; ভারতে এসে সেটি গুরুজীকে উপহার দিতে মনস্থ করলাম।

সেটি পেয়ে বললেন, "এ জিনিষটি ভারি পছন্দসই বটে!" বলে আমার দিকে চেয়ে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করলেন। যতগুলি জিনিস দিয়েছিলাম, তার মধ্যে সেই লাঠিটি নিয়েই সকলকে দেখাতেন।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর বাঘছাল একটা ছেঁড়া র‍্যাগের উপর পাতা দেখে বললাম, "গুরুদেব, বৈঠকখানা ঘরের জন্যে একটা নতুন কার্পেট আনাবার আমায় অনুমতি দিন।"

কোন প্রকার উৎসাহপ্রদর্শন না করেই তিনি বললেন, “এনে খুশি হও যদি তো আন গে। কেন, আমার বাঘছালটি তো বেশ পরিষ্কার আর সুন্দর আছে — আমার এ ছোট্ট রাজ্যটুকুতে আমিই তো রাজা গো। বাইরে বিশালজগৎ পড়ে রয়েছে, সেখানে বাইরের জিনিসের উপরেই লোকেদের টান থাকে বেশি!”

তাঁর এই কথাগুলি বলবার সময় মনে হল আবার আমি আগেকার দিনে ফিরে গেছি, — আবার আমি যেন তাঁর সেই বালক শিষ্যটি, দৈনিক শাসনের ফলে অগ্নিশুদ্ধ হচ্ছি।

শ্রীরামপুর আর কলকাতা হতে কোন রকমে নিজেকে একটু একলা করতে পেরেই মিস্টার রাইটকে সঙ্গে করে রাঁচী যাত্রা করলাম। কি প্রচণ্ড অভ্যর্থনা — একটা মর্মস্পর্শী বিজয়োল্লাস! চোখদুটি আমার জলে ভরে এল যখন দেখলাম যে যাঁদের রেখে আমি আমেরিকা যাত্রা করেছিলাম, সেই সব শিক্ষকেরা আমার পনের বছরের অনুপস্থিতির মধ্যেও বিদ্যালয়ের পতাকা সগৌরবে উড্ডীয়মান রেখেছেন; তাঁদের সব আলিঙ্গন করলাম। সেখানকার আবাসিক আর দৈনিক ছাত্রদের মুখের হাসি আর হাসিখুশি মুখ, তাদের বিদ্যালয়ে সযত্ন শিক্ষা আর যোগশিক্ষা উপযোগিতার এক একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

তবুও হায়, রাঁচী বিদ্যালয়ে তখন দারুণ অর্থাভাব চলছে। বৃদ্ধ মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী তখন পরলোকে। তাঁর কাশিমবাজার প্রাসাদ বিদ্যালয়গৃহে পরিণত করা হয়েছিল — আর তিনি দানও করেছিলেন প্রচুর। জনসাধারণের যথোপযুক্ত সাহায্যের অভাবে বিদ্যালয়ের অনেক বিনামূল্যে জনহিতকর সেবাকর্ম এখন গুরুতরভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

আমেরিকায় থাকতে অবশ্য তাদের কাজ চালাবার উপযোগী কার্যকরী অভিজ্ঞতা, আর বাধাবন্ধের সম্মুখে তাদের অদম্যসাহস সঞ্চয় শিক্ষা না করে আমি বৃথাই এতগুলি বছর সেখানে কাটিয়ে আসিনি। সপ্তাহখানেক ধরে আমি রাঁচীতে ছিলাম — নানাজটিল প্রশ্ন, নানা ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা সামলাতে হলো। তারপরে কলকাতায় ফিরে এসে বড় বড় নেতা,

আর শিক্ষাব্রতীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, কাশিমবাজারের নূতন মহারাজার সঙ্গে দীর্ঘ আলাপআলোচনা, পিতার নিকট পুনরায় অর্থসাহায্যের আবেদন, তারপরেই ভগবৎকৃপায় বিদ্যালয়ের পতনোন্মুখ অর্থাবস্থা আবার ঠিকঠাক হয়ে উঠল। আমার আমেরিকান শিষ্যদের কাছ থেকেও প্রচুর দান ঠিক সময়মত এসে পৌঁছল।

ভারতবর্ষে আসবার মাসকতকের মধ্যেই রাঁচী বিদ্যালয় আইনতঃ রেজিষ্ট্রী হয়ে গেল দেখে ভারি আনন্দিত হলাম। চিরস্থায়ী বৃত্তির বন্দোবস্তে যোগশিক্ষার কেন্দ্রস্থাপনার আমার জীবনব্যাপী স্বপ্ন আজ সার্থক হল। এই উচ্চাশাই ১৯১৭ সালের গোড়ার দিকে মাত্র সাতটি ছেলে নিয়ে বিদ্যালয় স্থাপনে আমায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

রাঁচীর যোগদা সৎসঙ্গ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নিম্নশ্রেণীর আর উচ্চশ্রেণীর সকল বিষয়ই পড়ান হয়। সেখানকার আবাসিক আর অনাবাসিক ছাত্ররা কোন না কোন প্রকারের বৃত্তিগত শিক্ষালাভ করে থাকে।

ছেলেরা স্ব-শাসিত কমিটি দ্বারা তাদের অধিকাংশ কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। আমার শিক্ষাব্রতী জীবনের গোড়ার দিকে আমি দেখেছিলাম — যেসব ছেলেরা দুষ্টুমি করে শিক্ষকদের ফাঁকি দিয়ে মজা পায়, তারাই আবার তাদের সহপাঠিদের তৈরী নিয়ম সানন্দে মেনে চলে। অবশ্য আমিও যে খুব একটা আদর্শ ছাত্র ছিলাম তা নয়, তবুও ছাত্রদের ছেলেমানুষি ফস্টিনস্টিতে আর নানা মুশ্‌কিলের ব্যাপারে তারা আমার সহানুভূতিও পেত।

খেলাধূলায় খুব উৎসাহ দেওয়া হয়; মাঠে হকি, ফুটবল প্রভৃতির চর্চা চলে। প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছেলেরা প্রায়ই জিতে আসে। ইচ্ছাশক্তিবলে পেশীতে শক্তিসঞ্চালন আর মানসিকশক্তিবলে শরীরের যে কোনও অংশে প্রাণশক্তি সঞ্চারিত করবার যোগদা প্রণালী ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়। ছেলেদের যোগাসন, তরবারি, লাঠিখেলা, প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসায় শিক্ষিত রাঁচীর ছাত্ররা বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সঙ্কটকালে আর্তত্রাণকার্যে প্রশংসাজনকভাবে জনসাধারণের সেবা করেছে। উদ্যানচর্যায় তারা নিজেদের আহারের জন্য শাকসব্জি প্রভৃতি উৎপাদন করে।

বিহারের আদিম জাতি সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতিদের হিন্দীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষনীয় বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বালিকাদের ক্লাস নিকটস্থ গ্রামগুলিতে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

রাঁচী বিদ্যালয়ের একটা অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা দান। বালকেরা প্রত্যহই অধ্যাত্মতত্ত্বের চর্চা, গীতাপাঠ ইত্যাদি করে, আর সরলতা, স্বার্থত্যাগ, আত্মসম্মানজ্ঞান, সত্যানুশীলন প্রভৃতির বিষয় সব উদাহরণপ্রদানে আর উপদেশপালনে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। তাদের বোঝান হয় — যাতে দুঃখকষ্ট আসে সেইটা মন্দ, আর যা প্রকৃত সুখ এনে দেয় সেটাই সৎকাজ। অসৎকার্যকে বিষমেশান মধুর সঙ্গে তুলনা করে তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, সে সব লোভনীয় বটে কিন্তু শেষে তারাই মৃত্যু ডেকে আনে।

গাঢ় মনঃসংযোগের প্রক্রিয়ায় দেহ ও মনের চাঞ্চল্যদমনে ছেলেদের মধ্যে খুব আশ্চর্যজনক ভাল ফল পাওয়া গেছে। ছোট্ট একটি ন' দশ বছরের ছেলে, ভ্রূমধ্যে তার দৃষ্টি স্থিরসংলগ্ন রেখে একঘণ্টা কি তারও বেশি সময় একটানা যোগাসনে বসে আছে — এ দৃশ্য বিদ্যালয়ে বিরল বা নতুন কিছু নয়।

ফলের বাগানে একটি শিবমন্দির আছে — সেখানে যোগিরাজ লাহিড়ী মহাশয়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বাগানের আম্রকুঞ্জে দৈনিকপ্রার্থনা আর শাস্ত্রালোচনার ক্লাস বসে।

রাঁচীর যোগদা সৎসঙ্গ সেবাশ্রমে সহস্র সহস্র দরিদ্র ভারতীয়কে বিনা মূল্যে অস্ত্রোপচার এবং ঔষধ বিতরণ করে চিকিৎসায় সাহায্য করা হয়।

রাঁচী সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত, জলবায়ুও নাতিশীতোষ্ণ। কুড়ি একর বাগান, তার মধ্যে বড় একটা স্নানের পুষ্করিণী। ভারতের মধ্যে এটি একটি উত্তম ফলের বাগান — আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু, খেজুর প্রভৃতি নিয়ে প্রায় পাঁচশ' ফলের গাছ আছে।

রাঁচী লাইব্রেরীতে বহু সাময়িকপত্রিকা আসে — পূর্ব ও পশ্চিমের লোকেদের উপহার — তাছাড়া প্রায় হাজারখানেক ইংরেজী ও বাংলা বইও আছে। পৃথিবীর নানাধর্মশাস্ত্রের সংগ্রহও এখানে আছে। একটি

সুসজ্জিত যাদুঘরে ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের বিবিধ উপকরণ ও দ্রব্যাদি সাজানো আছে। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ এই বিশালজগতে আমার ভ্রমণের বহু নিদর্শন ও সংগৃহীত দ্রব্যাদিও এখানে বহুল পরিমাণে রক্ষিত আছে।*

রাঁচীর মত আবাসিক ও যোগ বিদ্যালয় আরও খোলা হয়েছে, এবং তারা যথেষ্ট উন্নতিও করছে। ছেলেদের জন্যে পুরুলিয়া জেলার লক্ষ্মণপুরে যোগদা সৎসঙ্গ বিদ্যাপীঠ, আর মেদিনীপুরের এজমালিচকে যোগদা বিদ্যালয় আর আশ্রম স্থাপিত হয়েছে।†

১৯৩৯ সালে দক্ষিণেশ্বরে ঠিক গঙ্গার উপর যোগদা মঠ নামে একটি প্রকাণ্ড মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতার মাইলকয়েক উত্তরে এই আশ্রমটি শহরবাসীদের পক্ষে একটি পরম রমণীয় শান্তিময় স্থান।

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি, তার বিদ্যালয় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে তার কেন্দ্র ও আশ্রম সকলের প্রধান কার্যালয় হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর মঠ। যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি, আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়ায় লস্-অ্যাঞ্জেলেস্স্থিত সেল্ফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ নামে আন্তর্জাতিক হেড কোয়ার্টারের সহিত আইনতঃ সংযুক্ত। যোগদা সৎসঙ্গ‡ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে আছে ওয়াই. এস. এস.-এর উপদেশ ও লেশ্যনস্ যা প্রতিমাসে ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে শিক্ষার্থীদিগের নিকট পাঠান হয়। এই উপদেশগুলিতে শক্তিবিধায়ক শরীর চর্চা (Energization Exercises), মনঃসংযোগ এবং ধ্যান বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ থাকে। উচ্চতর

---

* শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজী যে সকল দর্শনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করেছিলেন, সেইসব সামগ্রী দিয়ে ক্যালিফোর্ণিয়ার প্যাসিফিক প্যালিসেডস্-এর লেক স্রাইনে একটি সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়েছে। *(প্রকাশকের মন্তব্য)*

† পরবর্তীকালে বালক ও বালিকাদের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু যোগদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়ে দ্রুত উন্নতিলাভ করছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে কিন্ডারগার্টেন স্কুল থেকে আরম্ভ করে কলেজ পর্যন্ত।

‡ যোগদা শব্দটি 'যোগ' অর্থাৎ মিলন, সংহতি, ভারসাম্য এবং 'দা' — যাহা প্রদান করে — উভয়ের মিলিত রূপ। সৎসঙ্গ — সৎ (সত্য) + সঙ্গ (বন্ধুত্ব)।

১৯১৬ সালে পরমহংস যোগানন্দজী যখন বিশ্বশক্তির উৎস হতে মানবশরীরে শক্তি সঞ্চারিত করবার প্রণালী আবিষ্কার করলেন, তখন "যোগদা" কথাটির সৃষ্টি। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাঁর আশ্রম সংস্থাকে "সৎসঙ্গ" নামে অভিহিত করতেন। কাজেই শিষ্য পরমহংসজীর পক্ষে সেই নামটি রাখবার ইচ্ছা স্বাভাবিক।

'ক্রিয়াযোগের' উপদেশ পাবার আগে ভিত্তি রচনার জন্য এই সাধনাগুলি নিষ্ঠাসহকারে পালন করা একান্তভাবে প্রয়োজন। উপযুক্ত ছাত্রগণ উচ্চতর উপদেশ পরবর্তী পাঠমালায় পেয়ে থাকেন।

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটির এই সব শিক্ষাবিষয়ক, ধর্মীয়, আর জনহিতকর কাজের জন্য বহু শিক্ষক আর কর্মীদের নিঃস্বার্থ সেবা আর নিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে। সংখ্যায় তারা বহু বলে এখানে তাদের আর নামের উল্লেখ করলাম না; কিন্তু তাদের প্রত্যেকের জন্যই আমার অন্তরের মণিকোঠায় একটি করে স্নেহের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে।

মিস্টার রাইটের রাঁচীর ছেলেদের সঙ্গে খুব প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সাদাসিধে একটা ধুতি পরে তিনি কিছুকাল তাদের সঙ্গে বাসও করেছিলেন। রাঁচী, কোলকাতা, শ্রীরামপুর, বম্বে যেখানেই সে যাক না কেন, ভ্রমণ ডায়েরি বার করে তার ভ্রমণের দিনলিপি সে লিখে রাখত, আর সে'সব বর্ণনা করতেও সে বেশ পারদর্শী ছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি তাকে একটি প্রশ্ন করে বসলাম, —

"ডিক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা?"

একটু চিন্তা করে সে বলল, "শান্তি, জাতির জীবন শান্তির দ্যুতিতে উজ্জ্বল।"

"যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া" — একটি লভ্যহীন প্রতিষ্ঠান, চিরস্থায়ীরূপে গঠিত। উক্তনামে যোগানন্দজী তাঁর সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ও প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতবর্ষে সমিতিবদ্ধ করেছেন। এখন বোর্ড অফ্ ডাইরেক্টরের দ্বারা যোগদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর পঃ বঙ্গ হইতে সুদক্ষভাবে পরিচালিত। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ওয়াই. এস. এস. ধ্যান কেন্দ্র স্থাপিত হয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

পশ্চিমে, যোগানন্দজী ইংরাজীতে তাঁর আন্তর্জাতিক সংস্থা "সেল্‌ফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ" নামে সমিতিবদ্ধ করেছেন। ১৯৫৫ সাল থেকে শ্রীশ্রী দয়ামাতা, যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া ও সেল্‌ফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ এই উভয়বিধ সংস্থার সভানেত্রী। *(প্রকাশকের মন্তব্য)*

৪১ পরিচ্ছেদ

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

"তুমিই হচ্ছ প্রথম সাহেব, ডিক, যে এ পর্যন্ত এই তীর্থস্থানে ঢুকতে পেরেছে। আর সকলে বৃথাই চেষ্টা করে মরেছে!"

কথাগুলো শুনে মিস্টার রাইট একটু চমকে উঠল, তারপর খুশিও হল। দক্ষিণ ভারতের মহীশূর রাজ্যে পাহাড়ের উপর পরমরমণীয় চামুণ্ডী দেবীর মন্দির থেকে তখন আমরা সবেমাত্র বেরিয়ে এসে মহীশূর রাজপরিবারের কুলদেবী চামুণ্ডী দেবীর মন্দির দর্শন করতে গিয়েছি। স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত সিংহাসনের উপর দেবী আসীন; আমরা সকলে প্রণাম করলাম।

কতকগুলি প্রসাদীনির্মাল্য সযত্নে গুছিয়ে রেখে রাইটসাহেব বলল, "আমার এই অভূতপূর্ব সম্মানলাভের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ পুরোহিতের দেওয়া গোলাপজল মিশ্রিত এই গোলাপ পাপড়িকটি আমি চিরকাল সযত্নে রেখে দেব।"

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসটা আমি ও আমার সঙ্গী* মহীশূর রাজের অতিথি হয়ে ছিলাম। মহারাজার উত্তরাধিকারী, মহামান্য যুবরাজ স্যার শ্রী কান্তিরাভ নরসিংহরাজ ওয়াদিয়ার, তাঁর রাজ্যে শিক্ষা ও উন্নতিবিস্তার পরিদর্শনের জন্য আমার সেক্রেটারী ও আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন।

গত পক্ষকালমধ্যে আমাকে টাউন হল, মহারাজার কলেজ, ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল স্কুল প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য শহরবাসী আর ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিতে হয়। ব্যাঙ্গালোরে ন্যাশনাল হাই স্কুল, ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ, আর চেট্টি টাউন হলে তিনটে বিরাট সভায়

---

* মিস ব্লেচ কোলকাতায় আমার আত্মীয়বর্গের সঙ্গেই ছিলেন।

বক্তৃতা দিতে হয়েছিল! চেট্টি টাউন হলে তিন হাজারের উপর লোকসমাগম হয়।

আমেরিকার যে উজ্জ্বল চিত্র আমি অঙ্কিত করেছিলাম, তাতে আগ্রহশীল শ্রোতৃবর্গের কোন উৎসাহ ছিল কিনা তা আমার জানা নেই; কিন্তু যখনই উল্লেখ করেছি যে পূর্ব পশ্চিমের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু শ্রেয় ও প্রেয়, তার পারস্পরিক আদান-প্রদানে উভয়েই উপকৃত হবে — তখনই করতালিধ্বনি প্রবল হয়ে উঠত।

রাইটসাহেব আর আমি, দু'জনে মিলে সেখানে শান্তি আর আরামে দিন কাটাচ্ছি। রাইটসাহেবের ভ্রমণের দিনলিপি থেকে তার মহীশূর সম্বন্ধে যা ধারণা, তা এখানে উদ্ধৃত হল, —

"আকাশের সদাপরিবর্তনশীল বিস্তৃত চিত্রপটের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় অন্যমনস্কভাবে দৃষ্টি সংলগ্ন করে বহু আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে, কেননা ভগবানের তুলির স্পর্শে যে রঙের আবির্ভাব হয়, তাতে থাকে নবীন প্রাণের স্পন্দন। মানুষ যখন কেবলমাত্র পিগমেণ্টের রং দিয়ে তার অনুকরণ করতে যায়, তখন সেই রঙের লালিত্য, তার গরিমা সবই হারিয়ে যায়; কারণ ভগবান কাজে লাগান অত্যন্ত সাদাসিধে আর ফলপ্রসু মাধ্যম — তেলও নয়, রংও নয় — তা হচ্ছে আলোর কিরণ। মেঘের কোণে একটু আলোর ছোপ লাগিয়ে দিলেন — দাঁড়িয়ে গেল সেটা সিঁদুরের মত, আবার একটু তুলি বুলিয়ে দিলেন — বদলে হয়ে গেল সেটা কমলালেবু থেকে সোনালী। ঘনমসীকৃষ্ণবর্ণ মেঘের বুকে অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখা বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে — যেন মেঘের বুক থেকে এক ঝলক রক্ত তীব্রবেগে বেরিয়ে আসছে। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর এই লীলা চলছে — চিরনূতন, চিরপরিবর্তনশীল, চিরসজীব; এর মধ্যে কোন প্রতিলিপি নেই — নেই কোন দৃশ্যপট বা রঙের পৌনঃপুনিকতা! ভারতের আকাশে দিন যখন রাত্রির কোলে ঢলে পড়ে, অথবা রাত্রিশেষে উষাকালে যখন অরুণোদয় হয়, সেরকম অপরূপ দৃশ্য অন্যত্র আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। আকাশকে দেখায় যেন ভগবানের হাতে রঙের পাত্র — তাতে স্বর্গের বিচিত্রবর্ণের হোলিখেলা চলছে।

"এবার আমি কৃষ্ণরাজসাগর বাঁধের* কথা বলব। বাঁধটি প্রকাণ্ড — গোধূলিতে তার দৃশ্য নয়নাভিরাম। যোগানন্দজী আর আমি একটি ছোট ছেলেকে "সরকারী গাইড" হিসেবে সঙ্গে নিয়ে একটা ছোট বাসে চড়ে বাঁধ দেখতে বেরোলাম। মহীশূর থেকে বার মাইল দূরে বাঁধটি অবস্থিত। মাটির রাস্তা, বেশ সমতল — অস্তগামী সূর্য তখন তার গাঢ় রক্তিমরাগরঞ্জিত শেষ রশ্মিলেখা ছড়িয়ে পশ্চিম দিকচক্রবালের দিকে ঢলে পড়েছে।

"আমাদের যাত্রা শুরু হল চারিদিকের চৌকো ধানক্ষেতের পাশেপাশে পত্রবহুল ছায়াসুশীতল বটগাছের সারির ভিতর দিয়ে। মাঝে মাঝে দু'পাশে উন্নতশীর্ষ নারকেল গাছ; ঘনজঙ্গলের মত বৃক্ষলতার প্রাচুর্যে সবুজের সমারোহ — তারপরে একটি পাহাড়ের মাথায় উঠেই একেবারে এসে পড়লাম সেই বিরাট কৃত্রিম হ্রদের মুখোমুখি — নক্ষত্র ও তাল গাছ আর অন্যান্য সব গাছের ছায়া জলে প্রতিফলিত; চারধারে ধাপে ধাপে বাগান উঠে গিয়ে হ্রদটি ঘিরে রেখেছে — বাঁধের ধারে ধারে বিজলীবাতির সারি।

নীচে বাঁধের ধারে এক নয়নাভিরাম দৃশ্য নজরে পড়লো! উচ্ছ্বসিত জলস্রোতে আলো পড়ে ইন্দ্রধনুর বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। তলায় দেখলাম ফোয়ারার উপর রঙিন আলোর খেলা — লাল, হলদে, সবুজ, নীল রঙের আলোর ঝরণা, — যেন আকাশের কোল থেকে ঝরে পড়ছে। প্রস্তর নির্মিত বিশালকায় হস্তীরা তাদের উত্তোলিত শুণ্ড দিয়ে জল উদ্‌গীরণ করছে। বাঁধটি (যার আলোর ফোয়ারাগুলি আমায় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের শিকাগো শহরের বিশ্বমেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল), এই ধানক্ষেতভরা প্রাচীন দেশ আর তার সরল লোকদের কাছে এজিনিস একেবারে অত্যাধুনিক। ভারতবাসীরা আমাদের এরূপ বিরাট আর সাদর অভ্যর্থনা করছে যে, আমার ভয় হয় যোগানন্দজীকে আবার আমেরিকায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব কিনা — তা বোধহয় আমার শক্তি বা ক্ষমতায় আর কুলোবে কিনা।

---

* মহীশূর শহরের নিকটবর্তী এলাকায় জলসেচের জন্য ১৯৩০ সালে এই বাঁধটি নির্মিত হয়। মহীশূর তার রেশম, সাবান আর চন্দন তেলের জন্য বিখ্যাত।

"আর একটা অতি দুর্লভ সুযোগ পাওয়া গেল — সেটা আমার জীবনে প্রথম — হাতিতে চড়া। গতকাল যুবরাজ তাঁর একটি হাতিতে চড়বার জন্যে তাঁর গ্রীষ্ম প্রাসাদে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন; হাতিটা ছিল বিশালকায়। হাওদায় চড়বার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। হাওদাটি বাক্‌সর মত, সিল্কের গদি দেওয়া। তারপর হেলতে দুলতে, সামনে পিছনে টাল খেতে খেতে চললাম — একবার যেন নীচে নেমে তলিয়ে যাচ্ছি আর একবার যেন ঠেলে উপরে উঠছি — সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা, জীবনে কখনও তো হাতিতে চড়িনি! সে কি রোমাঞ্চকর অনুভূতি আর অপূর্ব উল্লাস! মনে স্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গে আবার একটু ভয় ভয়ও করছে! পৈতৃক প্রাণটা না হারাই সেই ভয়ে প্রাণের দায়ে হাওদাটা আঁকড়ে ধরে বসে রইলাম।"

দাক্ষিণাত্যে বহু ঐতিহাসিক আর প্রত্নতাত্ত্বিক ঐশ্বর্য সব চারদিকে ছড়িয়ে আছে। দক্ষিণ ভারতের সৌন্দর্য ও মনোহারিত্ব বর্ণনা করা যায় না। মহীশূরের উত্তরে হায়দ্রাবাদ। বিরাট গোদাবরী নদী তার ছবির মত সুন্দর মালভূমিকে বিভক্ত করে প্রবাহিত। সুন্দর নীলগিরি পর্বত, আর অন্যান্য বহুস্থানে চূণাপাথর বা গ্র্যানিটের উষর পাহাড়। হায়দ্রাবাদের ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনি বৈচিত্র্যময়; তিনহাজার বছর আগে অন্ধ্ররাজগণের সময় থেকে তার সূত্রপাত। ১২৯৪ সাল পর্যন্ত তা হিন্দুরাজগণের অধীনে ছিল; পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকগণের অধীনে চলে যায়।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর চিত্রশিল্পে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক অপূর্ব নিদর্শনের একত্র সমাবেশ একমাত্র প্রাচীন পর্বতখোদিত ইলোরা আর অজন্তা গুহাতেই দেখতে পাওয়া যায়।* ইলোরার কৈলাসগুহা একখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরে খোদিত মন্দির — তাতে নানা দেবদেবী, নরনারী, পশুপক্ষীর বিশাল সব মূর্তি — মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর মূর্তির মত। অজন্তায় পাঁচটি অলিন্দশোভিত মন্দির আর পঁচিশটি নির্জন মঠ আছে। সবই পাথরে খোদিত; প্রাচীর চিত্রের কাজকরা বিশাল বিশাল

---

* ১৯৫০ সালে নতুন করে সীমানা নির্ধারণ করার পর গুহা দু'টি এখন মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। *(প্রকাশকের মন্তব্য)*

থামের উপর দাঁড়িয়ে — যেগুলিকে শিল্পী ও ভাস্কর তাদের প্রতিভায় চির স্মরণীয় করে তুলেছেন।

হায়দ্রাবাদ শহরে আছে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং মক্কা মসজিদের বিরাট হর্ম্যাবলী; মসজিদে দশহাজার মুসলমান একত্র বসে নামাজে যোগদান করতে পারে।

মহীশূর রাজ্য সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে তিন হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত, চারিদিকে ক্রান্তীয় ঘন জঙ্গল — বন্যহস্তী, বাইসন, ভাল্লুক, প্যান্থার, বাঘ প্রভৃতির আবাসভূমি। এর দু'টি প্রধান শহর মহীশূর আর ব্যাঙ্গালোর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও নয়নাভিরাম; এখানে আছে বহু সুন্দর সুন্দর বাগান আর সাধারণের ভ্রমণের জন্য উদ্যান।

একাদশ শতাব্দী হতে পঞ্চাশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় মহীশূরে হিন্দু স্থাপত্যশিল্প ও ভাস্কর্যের চরমতম উন্নতি সাধিত হয়। একাদশ শতাব্দীর ভাস্কর্যশিল্পের অন্যতম নিদর্শন বেলুড়ের মন্দির — রাজা বিষ্ণুবর্ধনের সময় তার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। সুক্ষ্মকারুকার্য আর সমৃদ্ধ কল্পনায় জগতে যা অতুলনীয়।

মহীশূরের উত্তরাংশে যে সব শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে তা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের। সেগুলি সম্রাট অশোকের* স্মৃতিকে জাগ্রত করে — যার বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ভারত, আফগানিস্থান ও বালুচিস্থান। বিভিন্ন ভাষায় উৎকীর্ণ অশোকের 'শিলা অনুশাসনে' তৎকালীন ব্যাপক শিক্ষাপ্রসারের পরিচয়ই বহন করে। ত্রয়োদশ শিলালিপিতে যুদ্ধের নিন্দা করা হয়েছে। "ধর্মের জয় ছাড়া অন্য কিছুতেই সত্যকার জয় নাই।" দশম শিলালিপিতে লিখিত আছে, "রাজার প্রকৃত গৌরব নির্ভর করে তার প্রজাগণের নৈতিক উন্নতিলাভের পথে সাহায্য করার উপর।" একাদশ

---

* সম্রাট অশোক ভারতের নানাস্থানে ৮৪,০০০ ধর্মীয় স্তূপ নির্মাণ করেন। চোদ্দটি শিলালিপি ও দশটি শিলাস্তম্ভ অদ্যাবধি বিদ্যমান। প্রত্যেকটি স্তম্ভ কারিগরী, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের এক একটা উজ্জ্বল নিদর্শন।

সম্রাট অশোক জলাশয়, বাঁধ, জলসেচের স্লুইস গেট রাজপথ এবং পথিকদের জন্য মধ্যে মধ্যে বিশ্রামগৃহসম্বলিত ছায়াতরুসমাচ্ছন্ন বহু পথ, ভেষজ সংগ্রহের জন্য বোটানিক্যাল গার্ডেন আর মানব ও পশুদিগের নিমিত্ত বহু হাসপাতাল নির্মাণ করেছিলেন।

শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, "সত্যকারের দান" হবে কোন বস্তু নয়, — তা হবে 'শিবম্' অর্থাৎ মঙ্গল — সত্যের প্রচার। ষষ্ঠ শিলালিপিতে সর্বজনপ্রিয় সম্রাট অশোক তাঁর প্রজাবর্গকে সরকারী কার্যের জন্য "দিনরাত্রির মধ্যে যে কোন সময়ে" তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাতে আরও লেখা আছে যে তাঁর রাজকর্তব্য সকল বিশ্বস্তভাবে পালন করে তিনি এইরূপে "তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে তাঁর ঋণ থেকে মুক্তি লাভ করছেন।"

অশোক ছিলেন সেই দুর্ধর্ষ মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র যিনি মহাবীর আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ভারতে রক্ষিত সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করেন এবং ৩০৫ খ্রিঃ পূর্বাব্দে সেল্যুকাস পরিচালিত ম্যাসিডোনিয়ান সৈন্যদের পরাজিত করেন। তারপরে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসকে পাটলিপুত্রের* রাজসভায় সংবর্ধিত করেন। এই মেগাস্থিনিসই তাঁর সময়ের সমৃদ্ধ ও উন্নতিশীল ভারতবর্ষের বিবরণ সুনিপুণভাবে লিখে রেখে গিয়েছেন।

২৯৮ খ্রিঃ পূর্বাব্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার তাঁর পুত্রের হাতে সমর্পণ করেন। দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হয়ে তিনি বর্তমান মহীশূরের একটি তীর্থস্থান — শ্রবণবেলগোলায় কপর্দকহীন সন্ন্যাসীর মত একটি পর্বতগুহায় আত্মানুসন্ধানে রত থেকে জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করেন। এখানেই আছে একটি মাত্র প্রস্তর থেকে খোদিত পৃথিবীর বৃহত্তম মূর্তি, যে'টি ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে মুনি গোমতেশ্বরের সম্মানে জৈনগণ নির্মাণ করেন।

ভারতবর্ষ অভিযানের সময় আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে বা পরে, যে সব গ্রীক ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য ব্যাক্ত এদেশে এসেছিলেন, তাঁরা অতিশয়

---

* পাটলিপুত্র শহরের (বর্তমান পাটনা) একটি চিত্তাকর্ষক ইতিহাস আছে। প্রভু বুদ্ধ খ্রিঃ পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে স্থানটি পরিদর্শন করেন। তখন সেটি ছিল কেবলমাত্র একটি নগণ্য দুর্গ। তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করে যান, "যতদূর পর্যন্ত আর্যগণের আশ্রয় (অবস্থান), বণিকগণ যতদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করে, সকলপ্রকার পণ্য দ্রব্যের বিনিময়ের জন্য পাটলিপুত্রই তাদের জন্য প্রধান শহর হয়ে থাকবে।" (মহাপরিনির্বাণ সূত্র)। দুই শতাব্দী পরে পাটলিপুত্রই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে পরিণত হয়। তাঁর পৌত্র অশোক, শহরটিকে অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সমৃদ্ধিশালী করে তোলেন।

কৌতূহলোদ্দীপক নানা ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অ্যারিয়ান, ডিয়োডোরস, প্লুটার্ক আর ভৌগলিক ষ্ট্র্যাবোর লেখা বিবরণ ডাঃ জে. ডব্লিউ. ম্যাকক্রিণ্ডল* সাহেব অনুবাদ করেছেন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ওপর যা গভীর আলোকপাত করে। আলেকজাণ্ডারের নিষ্ফল আক্রমণের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে তাঁর হিন্দু দর্শনশাস্ত্র, যোগী ও সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ প্রদর্শন — যাঁদের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে তিনি সাক্ষাৎ করতেন এবং যাঁদের সঙ্গ তিনি সাগ্রহে কামনা করতেন। উত্তর ভারতে তক্ষশীলা আক্রমণের অব্যবহিত পরেই তিনি ওয়ানসিক্রিটস নামে 'ডায়োজেনিসের হেলেনিক মতাবলম্বী' এক শিষ্যকে দূতস্বরূপে তক্ষশীলার সন্ন্যাসীপ্রবর দণ্ডামিসকে আনবার জন্য প্রেরণ করেন।

ওয়ানসিক্রিটস, দণ্ডামিসকে তাঁর আরণ্যআশ্রমে খুঁজে বার করে বললেন, "নমস্তে হে ব্রাহ্মণগুরু! সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জিউসের পুত্র আলেকজাণ্ডার — যিনি পৃথিবীর সকলদেশের একচ্ছত্র অধিপতি, তিনি আপনাকে তাঁর কাছে যাবার আদেশ করেছেন। আপনি যদি তা পালন করেন তবে তিনি আপনাকে বহু মহার্ঘ্য উপঢৌকনে পুরস্কৃত করবেন, কিন্তু অমান্য করলে তিনি আপনার শিরশ্ছেদন করবেন।"

যোগিবর এক প্রকার বাধ্যতামূলক এই নিমন্ত্রণ শান্তভাবেই শ্রবণ করলেন বটে, কিন্তু "পর্ণশয্যা থেকে মাথাও তুললেন না।"

প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, "আলেকজাণ্ডার যদি জিউসের পুত্র হন, তাহলে আমিও তাই। আলেকজাণ্ডারের যা কিছু আছে তার কিছুই আমি চাই না, কারণ আমার যা আছে তাতেই আমি সন্তুষ্ট, আমি কিন্তু দেখছি যে তিনি লোকজন নিয়ে জলেস্থলে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন — তাতে তাঁর কোনই লাভ হচ্ছে না; আর তাঁর ঘোরারও কোন শেষ হচ্ছে না।"

"যাও, আলেকজাণ্ডারকে বল গিয়ে যে রাজাধিরাজ পরমপিতা পরমেশ্বর কখনও স্পর্ধাজনিত অসৎকার্যের কর্তা নন, পরন্তু তিনি সংসারে

---

* 'Ancient India', ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ (চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা। ১৮৭৯, পুনঃ প্রকাশিত ১৯২৭)।

আলোক, শান্তি, জীবন, জল, মনুষ্যদেহ ও আত্মার স্রষ্টা; মৃত্যু যখন মানবগণকে মুক্তি দেয় তখন তিনি তাদের সকলকেই গ্রহণ করেন, কোনরূপেই তাদের আর কালব্যাধির অধীন হতে হয় না। একমাত্র তিনিই আমার প্রণম্য ঈশ্বর, হত্যাকাণ্ড যাঁর কাছে ঘৃণার বস্তু, যুদ্ধে যিনি কখনও প্ররোচনা দেন না।"

তারপর সেই মহাপ্রাণ ঋষিবর শান্ত উপেক্ষার সঙ্গে বলতে লাগলেন, "আলেকজাণ্ডার তো ঈশ্বর নন — কারণ তাঁকেও মৃত্যুর কবলে নিশ্চয়ই পড়তে হবে। তিনি যখন অন্তররাজ্যের সিংহাসনে এখনও অধিষ্ঠিত হন নি, তখন তাঁর মত ব্যক্তি কি করে জগতের প্রভু হতে পারেন? তিনি তো এখনও সশরীরে যমলোকেও প্রবেশ করেন নি, বা এই পৃথিবীর বিরাট অংশের উপর দিয়ে সূর্যের যে গতিপথ তাও তাঁর জানা নেই। অধিকাংশ জাতিই তাঁর নাম পর্যন্তও শোনে নি।"

"সসাগরা ধরিত্রীর অধিপতি"র কর্ণে বোধহয় এরূপ কটু তিরস্কারবাক্য আর কখনও প্রবেশ করে নি। যাইহোক, সেই সঙ্গে বিদ্রূপের সুরে মুনিবর বললেন, "আলেকজাণ্ডারের বর্তমান রাজত্বসমূহ যদি তাঁর মন ভরবার মত প্রশস্ত না হয়, তাহলে তাঁকে গঙ্গাপার হতে বল গিয়ে; সেখানে তিনি এমন একটা রাজ্য পাবেন যেখানে তাঁর সব লোকের স্থানসঙ্কুলান হয়ে যাবে।*

"তাছাড়া, এটা ঠিক জেনে রেখো — আলেকজাণ্ডার যা দানের প্রস্তাব করেছেন বা যে সব উপহার দিতে চাইছেন, তা আমার কাছে একেবারেই নিরর্থক; যে সব জিনিষ আমি সত্যিই চাই আর যা সব আমার পক্ষে বাস্তবিকই গ্রহণযোগ্য তা হচ্ছে এই বৃক্ষতল — যা আমার আশ্রয়; এই সব ফলন্ত গাছ, যা আমায় দৈনিক আহার জোগায়; আর জল, যা আমার তৃষ্ণা নিবারণ করে। এছাড়া আর যে সমস্ত জিনিষ অতি কষ্টে আর দুশ্চিন্তায় সংগ্রহ করতে হয়, — তা যারা করে তাদের পক্ষে তা ধ্বংসেরই

---

* আলেকজাণ্ডার ও তাঁর কোন সৈনাধ্যক্ষই কখনও গঙ্গানদী অতিক্রম করেন নি। উত্তরপশ্চিমে দৃঢ় বাধা পেয়ে ম্যাসিডোনিয়ান সৈন্যগণ আরও অধিক অগ্রসর হতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ করে; আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি পারস্যজয়ে মনোনিবেশ করেন।

কারণ হয় — আর সে'সব অজ্ঞানীলোকেদের ক্লেশ ও বিপাকের কারণ হয়, — তাদের দুঃখ আর অশান্তিই ডেকে আনে।

"আমি এই পত্রশয্যায় শয়ন করি, আর পাহারা দেবার জন্যে কোন কিছু না থাকাতে পরমশান্তিতে ঘুমোতে পারি। পক্ষান্তরে নজর রাখবার মত মূল্যবান যদি কিছু আমার থাকত, তাহলে ঘুম তো আমার তখনই চলে যেত! মা যেমন শিশুকে দুগ্ধদান করে, তেমনি আমার এই ধরিত্রীমাতা আমায় সব কিছুই দিয়ে থাকেন। বিষয়চিন্তা না থাকাতে যেখানে খুশি আমি যেতে পারি।

"আলেকজাণ্ডার আমার মস্তক ছেদন করলেও আমার আত্মার তো বিনাশ সাধন করতে পারবে না। আমার মাথাটি তখন নীরব হয়েই পড়ে থাকবে — একটা ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডের মতই আমার শরীরটাও এই পৃথিবীতে পড়ে থাকবে — যেখান থেকে এর উপাদান সব সংগৃহীত হয়ে এর সৃষ্টি হয়েছিল। তারপর আমি আত্মারূপে আমার ভগবানের কাছে গিয়ে পৌঁছব, যিনি আমাদের সকলকে রক্তমাংসের দেহে বন্দী করে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এই প্রমাণ করতে যে, আমরা এখানে নেমে এসে তাঁর শাসন মেনে চলতে পারি কি না; আর যখন আমরা এখান থেকে তাঁর সামনে গিয়ে হাজির হব, তখন তাঁকে আমাদের জীবনের সকল কাজেরই কৈফিয়ৎ দিতে হবে, কেননা তিনিই হচ্ছেন সকল প্রকার অন্যায়কাজের একমাত্র বিচারক; তাঁর এমনি বিচার যে অত্যাচারিতের মর্মন্তুদ যন্ত্রণাই শেষে অত্যাচারীর শাস্তি হয়ে দাঁড়ায়।

"অতএব আলেকজাণ্ডার কেবল তাদেরকেই এই সব বলে ভয় দেখান যাদের ঐশ্বর্যের বাসনা আছে, যারা মৃত্যুকে ভয় করে — ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তার অস্ত্রশস্ত্রের কোন শক্তিই নেই। আমরা কাঞ্চনের মায়া করি না, আর আমাদের মৃত্যুভয়ও নেই! অতএব আলেকজাণ্ডারকে এই কথা বল গিয়ে যে, — আপনার কোন কিছুতেই দণ্ডামিসের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই; কাজেই তিনি আপনার কাছে যাবেন না। আর আপনার যদি দণ্ডামিসের কাছে থেকে কিছু চাইবার থাকে, তাহলে আপনিই তাঁর কাছে যান।"

ওয়ানসিক্রিটস যথাকালে এই বার্তা আলেকজাণ্ডারের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। আলেকজাণ্ডার গভীর মনোযোগের সঙ্গে সব শুনলেন,

এবং "তাঁর দণ্ডামিসকে দেখবার ইচ্ছা আরও প্রবলতর হয়ে উঠল — যিনি বৃদ্ধ আর দিগম্বর হলেও একমাত্র প্রতিযোগী, যাঁর মধ্যে বহুদেশবিজেতা সেই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা দেখতে পেয়েছিলেন এমন একজনকে যিনি তাঁর চেয়েও ঢের বেশি শক্তি ধরেন।"

আলেকজাণ্ডার বেশ কয়েকজন ব্রাহ্মণ তপস্বীকে তক্ষশিলায় নিমন্ত্রণ করেন। তাঁরা দার্শনিক প্রশ্নের জ্ঞানগর্ভ সমাধানে পারদর্শী ছিলেন। প্লুটার্ক একটি তর্কযুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন; আলেকজাণ্ডার নিজেই তার সমস্ত প্রশ্ন রচনা করে দিয়েছিলেন।

"জীবিত আর মৃতদের মধ্যে সংখ্যায় কে বেশি?"

"জীবিত, কারণ মৃতেরা তো আর নেই।"

"প্রাণীরা কোথায় বেশি জন্মায়, সমুদ্রে না ভূমিতে?"

"ভূমিতে, কারণ সমুদ্র ভূমিরই একটা অংশ!"

"পশুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা চতুর কোন্‌টি?"

"যার সঙ্গে মানুষের এখনও পরিচয় ঘটে নি।"

(মানুষ অজানাকেই বেশি ভয় পায়)।

"আগে কোন্‌টা ছিল — দিন, না কি রাত?"

"একদিন আগে বলেই দিন আগে ছিল।" এই উত্তরে আলেকজাণ্ডার বিস্ময় প্রকাশ করেন; তাতে ব্রাহ্মণটি বলেন, "অসম্ভব প্রশ্নের অসম্ভব জবাব দিতে হয়।"

"সর্বোৎকৃষ্ট কি উপায়ে একজন মানুষ নিজেকে সকলের প্রিয়পাত্র করে তুলতে পারে?"

"মানুষ সকলের প্রিয়পাত্র হয়, যদি সে বিরাট শক্তিধর হয়েও কারোরই ভয়ের কারণ না হয়।"

"মানুষ কি করে দেবতা হতে পারে?"*

* এই প্রশ্ন হতে আমরা অনুমান করতে পারি যে "জিউসের পুত্রে"র যে ইতিমধ্যেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়েছে এ বিষয়ে তাঁর মাঝে মাঝে সন্দেহ উপস্থিত হত।

"মানুষের পক্ষে যা করা অসম্ভব, তাই করে।"

"জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে কে বেশি শক্তিশালী?"

"জীবন — কারণ এ কত দুঃখকষ্ট, কত অমঙ্গল সহ্য করতে পারে।"

আলেকজাণ্ডার তাঁর গুরুরূপে একজন প্রকৃত যোগীকে ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে যেতে সমর্থ হন। এই ব্যক্তি কল্যাণ (স্বামী স্ফাইনস) নামে পরিচিত, গ্রীকরা যাঁকে "কালানস" বলে সম্বোধন করতো। মুনিবর আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে পারস্যদেশে গমন করেন। একটি নির্দিষ্ট দিনে, পারস্যদেশের সুসা নামক স্থানে তিনি সমগ্র মাসিডোনিয়ান সৈন্যদলের সমক্ষে তাঁর জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে জ্বলন্তচিতায় প্রবেশ করে নিজেকে অগ্নিতে আহুতি দেন। ঐতিহাসিকেরা বর্ণনা করে গেছেন যে উক্ত যোগিবরের কোনরূপ যন্ত্রণা বা মৃত্যুর ভয় না দেখে সমস্ত সৈন্যেরা বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায়; তিনি চিতাগ্নিতে দগ্ধ হবার সময় একবারও স্থানচ্যুত হন নি। চিতায় প্রবেশ করবার পূর্বে কালানস তাঁর বহু অন্তরঙ্গ সঙ্গীসাথীদের আলিঙ্গন করেন, কিন্তু আলেকজাণ্ডারের কাছ থেকে বিদায়গ্রহণে বিরত থাকেন; তাঁকে সেই হিন্দুঋষি কেবলমাত্র একটি কথাই বলেন, —

"শীঘ্রই তোমার সঙ্গে ব্যাবিলনে সাক্ষাৎ হবে!"

আলেকজাণ্ডার পারস্যদেশ পরিত্যাগ করার এক বৎসর পরে ব্যাবিলনে মারা যান। তাঁর ভারতীয় গুরুর কথাবলার মধ্যেই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে তিনি আলেকজাণ্ডারের জীবনেমরণে সর্বদা উপস্থিত থাকবেন।

গ্রীক ঐতিহাসিকেরা ভারতীয় সমাজের বিষয়ে বহু প্রত্যক্ষ আর আগ্রহোদ্দীপক বিবরণ দিয়ে গেছেন। অ্যারিয়ান বলেন, হিন্দু আইন জনগণকে রক্ষা করে, আর "আদেশ দেয় যে তাদের মধ্যে কেউ কোন অবস্থাতেই ক্রীতদাস হবে না; আর নিজেরা যে স্বাধীনতা উপভোগ করে, তাতে যে সকলেরই অধিকার আছে, সে কথা মানবে।*

* সকল গ্রীক পর্যবেক্ষকগণ ভারতবর্ষে ক্রীতদাসপ্রথার অনুপস্থিতির বিষয়ে বর্ণনা করে গেছেন: এ ব্যাপারটা গ্রীক সমাজব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

আর একটি পুস্তকে লেখা আছে, "ভারতবাসীরা টাকা সুদে খাটাতে অথবা ঋণ করতে জানে না। কোন ভারতবাসীর কোন অন্যায় করা বা তা সহ্য করা প্রচলিত প্রথার বিরোধী ছিল; কাজে কাজেই তাদের কোন একরারনামা বা জামিন প্রয়োজন হয় না।" কথিত আছে যে রোগনিরাময় সরল আর স্বাভাবিক উপায়েই হত। "ঔষধপ্রদান অপেক্ষা পথ্যনিয়ন্ত্রণেই রোগমুক্তির ব্যবস্থা ছিল। ঔষধহিসাবে মলম আর পুলটিশেরই আদর ছিল বেশি। অন্য সবকিছুই অপকারক বলে বিবেচিত হতো।" যুদ্ধব্যবসা ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। "শত্রুরাও ভূমিতে কর্ষণরত কোন কৃষকের উপর আপতিত হয়ে তার কোনও ক্ষতিসাধন করবে না — কারণ এই শ্রেণীর লোকেরা জনসাধারণের মঙ্গলকারী বলে বিবেচিত হয়ে সকল প্রকার আঘাত হতে রক্ষিত হতো। ভূমিও এই রকমে অত্যাচারের হাত এড়িয়ে গিয়ে প্রচুর শস্য উৎপাদন করে — জীবনকে উপভোগ্য করবার সবরকম উপকরণ অধিবাসীবৃন্দকে যোগায়।"

মহীশূরের প্রায় সর্বত্র ছড়ানো তীর্থস্থানগুলি থেকে দক্ষিণ ভারতের বহু প্রখ্যাত সাধুসন্তদের পরিচয় জানা যায়। এই সব সাধু-সন্তদের মধ্যে থায়ুমানবর নামে একজন এই অপূর্ব উদ্দীপনাময়ী কবিতাটি লিখেছেন ঃ—

"দমন করিতে পার প্রমত্ত বারণ,
আর ঋক্ষ-শার্দূলের বদন ব্যাদন;
পশুরাজ সিংহোপরি করি আরোহণ,
কালসর্পসাথে ক্রীড়া — তুচ্ছ করি প্রাণ।
রসায়নবলে তব জীবিকা অর্জন,
ছদ্মবেশে ভ্রমিবারে পার পৃথ্বীময়;

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার কৃত "ক্রিয়েটিভ ইণ্ডিয়া"তে ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক নানা সাফল্য এবং অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও সমাজবিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য নীতিসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। (মতিলাল বেনারসীদাস, প্রকাশক ঃ ১৯৩৭)

আর একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক হচ্ছে, "ইণ্ডিয়ান কালচার থ্রু দি এজেস"; এস. ভি. বেঙ্কটেশ্বর প্রণীত। (নিউইয়র্ক; লংম্যান, গ্রীন এণ্ড কোং)

দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধি সর্ব দেবগণ;
সুচিরযৌবন করি দেহে উপচয়;
জলের উপর ভ্রমি', অগ্নিমধ্যে বাস;
চিত্তদমন তথাপি কঠিন প্রয়াস।"

ভারতবর্ষের সুদূর দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য; স্থানটি উর্বর ও অতিশয় মনোরম। এখানে অধিকাংশস্থানে নদী, খাল, বিল প্রভৃতি জলপথেই লোকেরা যাতায়াত করে। কবে কোন সুদূর অতীতে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যকে যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা সংযোজিত করা হয়েছিল বলে তার দরুণ সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্তপালনের বাধ্যবাধকতা আজও মহারাজা বংশপরম্পরানুক্রমে প্রতি বৎসরই স্বীকার করে আসেন। বৎসরের মধ্যে ছাপ্পান্নদিন মহারাজা বেদ ও স্তোত্রপাঠ শোনবার জন্য দৈনিক তিনবার করে মন্দিরে যান। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় "লক্ষদীপম্"এ অর্থাৎ মন্দিরটিকে একলক্ষ দীপে আলোকিত করে।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সমুদ্রবলয়িত সমতল, প্রশস্ত মাদ্রাজ শহর আর কাঞ্চীপুরম (কাঞ্চনপুরী বা স্বর্ণনগরী)। শেষোক্ত শহরটি পহ্লব রাজবংশের রাজধানী ছিল, আর তাঁদের রাজ্যকাল ছিল খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীতে। বর্তমানে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসনীতি খুবই প্রসার লাভ করেছে। শ্বেতবর্ণের 'গান্ধীটুপি' প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণভারতে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যদের জন্য বহু মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত আর জাতিভেদেরও বহু সংস্কারসাধন করেছেন।

বর্ণভেদের আদি উৎপত্তি, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক মনু কর্তৃক যা প্রবর্তিত, তা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। তিনি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন যে, মনুষ্যজাতি স্বাভাবিক বিবর্তনে চারটি প্রধানশ্রেণীতে বিভক্ত; দৈহিক শ্রমের দ্বারা সমাজকে সেবা করতে সমর্থ (শূদ্র); যারা মননশক্তি, কার্যদক্ষতা, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়বাণিজ্য বা সাধারণ বণিকবৃত্তির দ্বারা সমাজকে সেবা করে (বৈশ্য); যাদের প্রতিভা শাসন, পালন অথবা

রক্ষাকার্যে স্ফুরিত (ক্ষত্রিয়); যাদের প্রকৃতি ভগবচ্চিন্তা, পূজার্চনা, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদিতে নিযুক্ত (ব্রাহ্মণ)। মহাভারতে লিখিত আছে যে, "জন্ম বা দশবিধ সংস্কারপালন, বিদ্যার্জন বা বংশগৌরব মানবকে দ্বিজাতিত্বে (ব্রাহ্মণত্বে) উন্নীত করতে পারে না। কেবল চরিত্র ও শীলতাই পারে।"* মনু সমাজকে তার লোকেদের জ্ঞান, প্রাচীনত্ব, আত্মীয়তা এবং সর্বশেষ ঐশ্বর্য অনুসারে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে বলে গেছেন। যে ধন সঞ্চিত হয় বা দাতব্যকার্যের জন্য অপ্রাপ্য হয় বৈদিকভারতে সেরূপ ধনকে ঘৃণাই করা হয়। প্রভূত অর্থশালী কৃপণ অথবা অনুদার ব্যক্তিকে সমাজের নিম্নস্তরে স্থান দেওয়া হত।

---

* ১৯৩৫ সালের "ইষ্ট-ওয়েষ্ট" জানুয়ারি সংখ্যায় তারা মাতা লিখেছেন — "এই চারিটি বর্ণের অঙ্গীভূত হওয়াটা আদিতে মানুষের জন্মের উপর নির্ভর করত না, তা করত তার স্বাভাবিক শক্তি বা সামর্থের উপর, যা তার জীবনের পরমপুরুষার্থ বা চরমলক্ষ্য নির্বাচনে প্রদর্শিত হত। এই লক্ষ্য হতে পারত (১) কাম — অর্থাৎ কামনা, ইন্দ্রিয়ভোগসম্পন্ন জীবনের ক্রিয়াশীলতা (শূদ্রাবস্থা), (২) অর্থ — মানে লাভ, অর্থাৎ বাসনাপূরণ তবে সংযতভাবে (বৈশ্যাবস্থা), (৩) ধর্ম — আত্মসংযমশিক্ষা, সৎকার্য ও দায়িত্বপূর্ণ জীবন (ক্ষত্রিয়াবস্থা), (৪) মোক্ষ বা নির্বাণ — আধ্যাত্মিক ও ধর্মশিক্ষার জীবন (ব্রাহ্মণাবস্থা)। এই চারিবর্ণ মনুষ্যজাতির সেবা করে (১) দেহ (২) মন (৩) ইচ্ছাশক্তি আর (৪) ঈশ্বরাধনার দ্বারা।

"এই চারিটি অবস্থা প্রকৃতির এইসব নিত্য গুণের সঙ্গে সমগুণান্বিত, — তমঃ, রজঃ, সত্ত্ব, — ব্যাঘাত. ক্রিয়া ও বিস্তার; অথবা ভর, শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি। চারিটি বর্ণ এই চারিটি গুণে গুণান্বিত, যথা, (১) তমঃ (অবিদ্যা) (২) তমঃ-রজঃ, (অবিদ্যা ও ক্রিয়াশীলতার সংমিশ্রণ), রজঃ-সত্ত্ব (সৎকার্য ও জ্ঞানের সংমিশ্রণ), আর সত্ত্ব (জ্ঞান)। এইরূপে প্রকৃতিদেবী প্রত্যেক মানবকে এক বা একাধিক গুণের সংমিশ্রণে তার জাতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অবশ্য প্রত্যেক মানুষেরই অল্পাধিক পরিমাণে এই তিনটি গুণই বর্তমান থাকে। গুরুই প্রকৃতপক্ষে মানুষের বর্ণ বা বিবর্তনের পর্যায় সঠিকভাবে নির্ধারণ বা নিরূপিত করতে পারেন।

সকল দেশের আর সকল জাতির লোকেরা, মতবাদের কারণে না হলেও কার্যতঃ কিছুটা জাতিভেদকে মেনে চলে! যেখানে অবাধ অধিকার অথবা তথাকথিত স্বাধীনতা আছে, বিশেষতঃ স্বাভাবিক জাতদের ভিতর দুই বিপরীত বর্ণের মধ্যে পারস্পারিক বিবাহে, সেখানে জাতিটির লোকসংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে এসে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। 'পুরাণসংহিতা'তে এরূপ মিলনে সৃষ্ট সন্তানকে অশ্বতরের মত বর্ণসঙ্করের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এরা নিজেদের জাতের বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। কৃত্রিম জাতিসকল পরিণামে লুপ্ত হয়ে যায়। অসংখ্য বড় বড় জাতির যাদের জীবিত বংশধরদের আর কোন চিহ্নই মেলে না, তাদের বহু উদাহরণ আজকাল ইতিহাসে মেলে। ভারতবর্ষের বহু চিন্তাশীল মনীষীরা বলেন যে, ভারতের বর্ণাশ্রমধর্ম নির্বিচার স্ত্রীগ্রহণের প্রতিবন্ধক হয়ে জাতির বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করে, তাকে যুগযুগান্তের নানা উত্থানপতনের হাত হতে বাঁচিয়ে আজকে এক নিরাপদ স্থানে এনে দাঁড় করিয়েছে — আর সেই জায়গায় অন্যান্য বহু প্রাচীন জাতি বিস্মৃতির অতলগহ্বরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।"

গুরুতর অমঙ্গল দেখা দিল তখন, যখন জাতিভেদ প্রথা শতাব্দীর পর শতাব্দী বংশক্রমে পালিত হয়ে সুদৃঢ় আকার ধারণ করলো। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালাভ করে ভারত জাতিভেদের প্রাচীন অর্থ — যা জন্মের উপর নয়, একমাত্র স্বাভাবিক গুণকর্ম বিভাগের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য ধীর অথচ নিশ্চিতভাবে চেষ্টা করে চলেছে। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই সুনির্দিষ্ট দুঃখজনক কর্মফল আছে, আর তাদের তা সযত্নে দূর করবার ব্যবস্থাও করতে হয়। ভারতবর্ষও তার অদম্য উৎসাহ আর বহুমুখী প্রচেষ্টার দ্বারা জাতিভেদ দূরীকরণ কার্যে নিজের যোগ্যতা প্রদর্শন করতে সমর্থ হবে।

দক্ষিণ ভারত এতই চিত্তাকর্ষক স্থান যে রাইট সাহেব আর আমি, আমাদের ভ্রমণ আরও দীর্ঘতর করবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলাম। কিন্তু সময়ের অল্পতাবশতঃ আমাদের আতিথ্যগ্রহণ আর বেশিদিন বিলম্বিত করতে পারা গেল না। শীঘ্রই আমাকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের শেষ অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে যেতে হবে। মহীশূর ভ্রমণের শেষে ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সের সভাপতি স্যার সি. ভি. রমনের সঙ্গে আমার আলাপের সুযোগ হয়েছিল। এই জগদ্বিখ্যাত হিন্দু পদার্থবিদ্‌কে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয় ১৯৩০ সালে। আলোক বিচ্ছুরণ সংক্রান্ত তাঁর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার যা 'রমন এফেক্ট' নামে পরিচিত — তারই জন্যে তাঁকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হয়।

আমাদের মাদ্রাজী বন্ধু ও ছাত্রদের কাছ থেকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় গ্রহণ করে আমরা আবার পরিভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। মধ্যপথে আমরা সদাশিব-ব্রাহ্মণের* স্মৃতিপূত একটি ক্ষুদ্রতীর্থে নামলাম, দর্শনের জন্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এঁর জীবনকথা নানা অলৌকিক ঘটনায় পূর্ণ। নেরুর নামক স্থানে আর একটি বৃহত্তর সদাশিব তীর্থ আছে। পুড়ুকোট্টাই-

---

* তাঁর পূর্ণ উপাধি ছিল স্বামী শ্রীসদাশিবেন্দ্র সরস্বতী। এই নামেই তিনি তাঁর বইগুলি রচনা করেছেন ('ব্রহ্মসূত্র' এবং পতঞ্জলির 'যোগসূত্রে'র ভাষ্য)। মহীশূরের শৃঙ্গেরি মঠের পরলোকগত শঙ্করাচার্য মহামান্য সচ্চিদানন্দ শিবাভিনভ নরসিংহ ভারতী, সদাশিব সম্বন্ধে এক উদ্দীপনাময়ী প্রশস্তিগাথা রচনা করেছেন।

এর রাজা এটি নির্মাণ করে দেন — এখানে দৈবশক্তিবলে রোগমুক্তির জন্য বহু তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয়। বংশপরম্পরাক্রমে পুডুকোট্টাই-রাজগণ, শাসনকার্যে রত রাজার জন্যে রাজ্যপরিচালনা বিষয়ে ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে সদাশিব কর্তৃক লিখিত কতকগুলি ধর্মোপদেশ, আজও পরম পবিত্র বলে সযত্নে পালন করে থাকেন।

দক্ষিণ ভারতে গ্রামবাসীদের মধ্যে পূর্ণজ্ঞানী পরমপ্রিয় সদাশিব সম্বন্ধে বহু অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প এখনও প্রচলিত আছে। কাবেরী নদীর তীরে একদিন তাঁকে সমাধিমগ্ন অবস্থায় হঠাৎ বন্যার জলে ভেসে যেতে দেখা যায়। সপ্তাহকতক বাদে দেখা গেল যে তিনি কোয়েম্বাটুর জেলার কোড়ুমুডি নামক স্থানে মাটির ঢিপির তলায় গভীরভাবে চাপা পড়ে রয়েছেন। গ্রামবাসীরা খুঁড়ে বার করবার সময় কোদালের আঘাত তাঁর গায়ে লাগাতে তাঁর সমাধিভঙ্গ হয়, তখনই তিনি উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি সেস্থান পরিত্যাগ করে চলে যান।

জনৈক বয়োঃজ্যেষ্ঠ বৈদান্তিক পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করাতে সদাশিবের গুরু সদাশিবকে এই বলে তিরস্কার করেন, "তুমি একটি বালকমাত্র, তোমার এত বাক্যব্যয় কেন, কবে তোমার রসনা সংযত হবে?" তাতে সদাশিব উত্তর দেন, "আপনার আশীর্বাদে, এই মুহূর্ত থেকেই।" তদবধি সদাশিব মৌনব্রতাবলম্বন করেন এবং তারপর মুনি বলে খ্যাত হন।

সদাশিবের গুরু ছিলেন স্বামী শ্রীপরমশিবেন্দ্র সরস্বতী; ইনি 'দহরবিদ্যাপ্রকাশিকার' রচয়িতা এবং 'উত্তরগীতা'র একটি অপূর্ব পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকাও রচনা করে গেছেন। কতকগুলি সাংসারিক ব্যক্তি, ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত সদাশিবকে রাস্তার উপর যাকে বলে "লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে" উন্মাদের মত নৃত্য করতে দেখে মর্মাহত হয়ে তাঁর গুরুদেবের কাছে গিয়ে নালিশ করে বলেন, "মশায়, আপনাদের সদাশিব একটি বদ্ধ পাগল।"

কিন্তু পরমশিবেন্দ্র তা শুনে হাস্যোৎফুল্ল বদনে বললেন, "আহা, এমনি পাগল যদি সবাই হতে পারত!"

সদাশিবের জীবনে ভগবানের বহু অদ্ভুত আর অপূর্ব লীলাসকল প্রকটিত হয়েছে। এ জগতে আপাতদৃষ্টিতে অনেক রকম অবিচারই দেখা যায়; কিন্তু ঈশ্বরভক্তের নিকট তাঁর অমোঘ ন্যায়ের সদ্য প্রতিবিধানের বহু উদাহরণও পাওয়া যায়। একদিন রাত্রে সমাধিমগ্ন অবস্থায় সদাশিব এক সম্পন্ন গৃহস্থের শস্যের গোলার কাছে উপস্থিত হলে পর, প্রহরারত তিনটি ভৃত্য সাধুবরকে প্রহারের জন্য মস্তকোপরি লাঠি উত্তোলন করাতে দেখা গেল যে তাদের হাতগুলো সব একেবারে অবশ হয়ে গেছে। প্রত্যুষে সদাশিবের সে স্থান ত্যাগ করে চলে যাবার সময় পর্যন্ত উক্ত তিনটি ভৃত্যবরকে ঐরকম অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাত তুলে পাথরের মূর্তির মতই সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

অন্য এক উপলক্ষ্যে সদাশিবকে জোর করে এক সর্দার তার কুলির দলে জ্বালানি বইবার কাজে লাগিয়ে দেয়। মৌনী সদাশিব নীরবে বোঝাটি মাথায় করে নির্দিষ্টস্থানে উপস্থিত হয়ে একটা প্রকাণ্ড স্তূপের উপর সেটিকে রাখতেই জ্বালানির সেই বিরাট স্তূপটিতে সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যায়।

ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মত সদাশিবও উলঙ্গ অবস্থায় থাকতেন। একদিন সকালবেলা সেই নগ্ন যোগী অন্যমনস্কভাবে একটি মুসলমান সর্দারের তাঁবুতে প্রবেশ করেন। দু'টি মহিলা ভয়ে চিৎকার শুরু করে দেন; সৈনিকপ্রবর তো তরবারির প্রবল আঘাতে তাঁর একটি হস্ত দেহ হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। যোগিবর নির্লিপ্তভাবে সে স্থান হতে প্রস্থান করলেন। ভয় আর অনুতাপে দগ্ধ হয়ে সেই মুসলমান সর্দার ছিন্নহস্তটি মেঝে থেকে তুলে নিয়ে তাঁর পিছনে পিছনে ছুটলেন। সদাশিব নীরবে ছিন্নহস্তটি তার কাছ থেকে নিয়ে রক্তস্রাবী ক্ষতস্থানে সংযুক্ত করে দিলেন। আঘাতের আর কোন চিহ্নই রইল না। মুসলমান যোদ্ধাটি যখন সশ্রদ্ধচিত্তে ও ভক্তিনত হৃদয়ে তাঁর কাছ থেকে কিছু আধ্যাত্মিক উপদেশ চাইলেন, সদাশিব তখন বালুকার উপর অঙ্গুলি দ্বারা নিম্নলিখিত কয়টি কথা লিখে দেন, —

"তুমি যা করতে চাও তা কোরো না, তা হলে তোমার যা ইচ্ছে হয় তাই করতে পারবে!"

এই উপদেশ লাভ করে মুসলমান সর্দারের মনে এক অপূর্ব পবিত্রভাবের উদয় হলো। সে সাধুটির অদ্ভুতভাবের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে বুঝল যে অহংভাবের দমনেই আত্মার মুক্তি। সামান্য কথাকয়টিতে এতদূর আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত ছিল যে, তার বলেই সেই সর্দারটি ক্রমে তাঁর একজন উপযুক্ত শিষ্যে পরিণত হয়েছিল; পূর্বজীবনের সঙ্গে তার আর কোন সম্পর্কই রইল না।

গ্রামের ছেলেরা একদিন সদাশিবের কাছে গিয়ে জানায় যে তাদের বড়ই ইচ্ছে, মাদুরায় তখন যে ধর্মোৎসব আর মেলা চলছে সেটা তারা দেখে আসে; মাদুরা সেখান থেকে ১৫০ মাইল দূরে। যোগিবর সদাশিব তখন সেইসব ছোট ছোট ছেলেদের ইঙ্গিত করলেন তারা যেন তাঁর গা স্পর্শ করে থাকে। আশ্চর্য! মুহূর্তমধ্যে গোটা দলটি মাদুরায় গিয়ে উপস্থিত। ছেলেগুলো ভারি স্ফূর্তিতে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে খুব আমোদেই খানিকক্ষণ বেড়িয়ে বেড়ালো। তারপরে ঘণ্টাকতক বাদে তিনি আবার ঐভাবে অতি সহজেই তাদের বাড়ি ফিরিয়ে আনলেন। বিস্ময়ে স্তম্ভিত সেই সব ছেলেদের পিতামাতারা সেখানকার প্রতিমার শোভাযাত্রা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ বর্ণনা তাদের কাছে থেকে শুনল, আর তারা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল যে অনেক ছেলের হাতে তখনও মাদুরার নানারকম মিষ্টি রয়েছে।

এক অবিশ্বাসী ছোকরার কিন্তু সাধুটি আর তাঁর এই অদ্ভুত ঘটনাটির কথা কিছুতেই বিশ্বাস হল না। উল্টে সে ঠাট্টামস্করা আরম্ভ করল। এর পরের বারের শ্রীরঙ্গমে অনুষ্ঠিত উৎসবে সে সদাশিবের কাছে হাজির হয়ে বেশ একটু টিটকিরি দিয়ে বলল, "প্রভু, সেবারে যেমন ছেলেদের মাদুরায় নিয়ে গিয়েছিলেন, আমায়ও আজ তেমনি করে শ্রীরঙ্গমের মেলায় নিয়ে চলুন না?"

সদাশিব কি আর করেন, তেমনি করে সেই ছোকরাটিকে শ্রীরঙ্গম নিয়ে গিয়ে ফেললেন। ছোকরাটি সেই মুহূর্তে দেখল যে, সে শ্রীরঙ্গমে শহরের লোকজনদের মধ্যে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ফেরবার যখন তার সময় হল তখন সে আর সদাশিবকে খুঁজেই পেল না — এখন উপায়?

এখন বাড়ি ফেরে কি করে? সারা রাস্তাটি হেঁটে আধমরা হয়ে তবে বাছাধনকে বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করার আগে শ্রীরমন মহর্ষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে রাইট সাহেব এবং আমি, তিরুভান্নামালাইয়ের কাছে অরুণাচলের পুণ্যময় পর্বতে তীর্থযাত্রা করি। সেই মহান তপস্বী তাঁর আশ্রমে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং নিকটে রক্ষিত 'ইষ্ট-ওয়েষ্ট' পত্রিকার স্তূপের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে যে কয়েকঘণ্টা আমরা কাটিয়েছিলাম তার অধিকাংশ সময় তিনি নীরবেই ছিলেন — কিন্তু তাঁর বদনমণ্ডল ছিল দিব্য প্রেম ও প্রজ্ঞায় সমুদ্ভাষিত।

নিপীড়িত মানবাত্মা যাতে করে তার বিস্মৃত পূর্বতন বিশুদ্ধতা ফিরে পায়, তারজন্য শ্রীরমন মহর্ষি প্রত্যেককে 'আমি কে?' — এই আত্মজিজ্ঞাসা করতে উপদেশ দিতেন। অন্য সকল চিন্তাকে কঠিন হাতে নিবৃত্ত করার ফলে ভক্ত শীঘ্র উপলব্ধি করতে পারেন যে, প্রকৃত আত্মা বিষয়ে গভীর থেকে গভীরতর চেতনায় তিনি নিমজ্জিত হচ্ছেন। তখন চিত্তচাঞ্চল্যকারী অন্য সমস্ত চিন্তার উদয় রহিত হয়। দাক্ষিণাত্যের এই ভগবৎ জ্ঞানী ঋষি লিখেছেন ঃ— 'দ্বৈতবাদ ও ত্রিত্ববাদ পরের উপর স্থিতিশীল; সাহায্য ব্যতিরেকে তাদের দর্শন মেলে না। যারা সেই সাহায্যের সন্ধানী, তারাই বিচ্যুত হয়ে পতিত হয়। ইহাই সত্য। যারা এই সত্য দর্শন করেছেন, তারা কদাপি বিচলিত হন না।'

৪২ পরিচ্ছেদ

গুরুর সঙ্গে শেষ কয়দিন

শ্রীরামপুর আশ্রমে এলাম সঙ্গে কিছু গোলাপফুল আর ফলমূল নিয়ে। প্রণাম করে বললাম, "গুরুজী, আজ আমার ভাগ্য ভাল, সকালে আপনাকে একলা পেয়েছি!" শ্রীযুক্তেশ্বরজী অত্যন্ত নিরীহভাবে আমার দিকে তাকালেন।

"তোমার মতলব কি বল তো?" বলে ঘরের চারদিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলেন যে, দেখে বোধ হল যেন পালাবার পথ খুঁজছেন!

"গুরুজী, আপনার সঙ্গে আমার যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন আমি স্কুলে পড়ি; আর এখন আমি বড় হয়েছি, এমন কি মাথায় দু'একটা চুলও হয়ত এখন পেকেছে। যদিও প্রথম সাক্ষাতের মুহূর্ত থেকেই আপনি আমায় নীরবে স্নেহ করে আসছেন, কিন্তু আপনার মনে আছে কি যে আমাদের প্রথম সাক্ষাতের দিনটি থেকে কেবল একবারমাত্র আপনি আমায় বলেছিলেন — আমি তোমায় ভালবাসি?" বলে তাঁর দিকে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলাম।

গুরুদেব দৃষ্টি অবনত করে বললেন, "যোগানন্দ, আমার ভাষাহীন অন্তরের মধ্যে যে প্রগাঢ় স্নেহ লুকিয়ে রয়েছে, তাকে কি ভাষার দৃঢ়তাতেই প্রকাশ করতে হবে?"

"গুরুজী, আমি জানি যে আপনি আমায় ভালবাসেন, কিন্তু তবু একটু তা শুনতে বড্ড ইচ্ছে হয়।"

"আচ্ছা বেশ, তবে শোন। আমার বিবাহিতজীবনে আমি একটি পুত্রসন্তান চেয়েছিলাম; তাকে যোগের পথে শিক্ষা দেব বলে মনে বড় আশা ছিল — কিন্তু তা হল না। তারপর তুমি এলে আমার জীবনে, আমি সুখীই হলাম; কারণ তোমাকে পেয়েই আমার পুত্রের সাধ মিটল।" দু'টি

বড় বড় অশ্রুর ধারা শ্রীযুক্তেশ্বরজীর চক্ষু হতে গড়িয়ে পড়ল, শুধু বললেন, "যোগানন্দ, আমি তো তোমায় সর্বদাই ভালবাসি।"

তাঁর স্নেহমাখা কথাগুলিতে আমার হৃদয় বিগলিত হল, বুক থেকে একখানা পাথর যেন সরে গেল, বললাম, "আপনার উত্তর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম যে স্বর্গের দুয়ার আমার জন্যে খোলাই রইল।" তিনি যে ভাবোচ্ছ্বাসহীন আর আত্মস্থ — এ আমি জানতাম; কিন্তু তবুও তাঁর নীরবতায় আমি প্রায়ই আশ্চর্য হয়ে ভাবতাম যে তাঁর মনে কি আছে? মাঝে মাঝে মনে ভয় হত যে, বুঝিবা আমি গুরুর উপযুক্ত সেবা করে তাঁর পূর্ণ সন্তোষ উৎপাদন করতে পারি নি। তাঁর প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত, তার পুরোপুরি পরিচয় কেউ পেত না। সে প্রকৃতি ছিল স্থির, গভীর, বাইরের জগতের কাছে তা দুরধিগম্য — যার সব আকর্ষণ, সব আসক্তি বহুপূর্বে তিনি অতিক্রম করেছেন।

দিনকতক পরে কোলকাতার এলবার্ট হলে আমায় যখন এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিতে হয় তখন শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী, সন্তোষের মহারাজা আর কোলকাতার মেয়রের সঙ্গে বক্তৃতা মঞ্চে বসতে সম্মত হন। যদিও গুরুদেব আমায় তখন কোন কথাই বলেন নি, তবুও বক্তৃতা দেবার সময় মাঝে মাঝে তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম; মনে হল যেন তাঁর চোখ দু'টি আনন্দে হাসছে।

তারপর আমাদের শ্রীরামপুর কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের সামনে বক্তৃতা দিতে হল। আমার পুরানো সহপাঠীদের দিকে যখন চাইলাম আর তারাও যখন তাদের "পাগলা সন্ন্যাসী"র দিকে তাকাল, লজ্জা সঙ্কোচ দূরে ফেলে চোখের কোণে আনন্দাশ্রু জমে উঠলো। আমাদের দর্শনের অধ্যাপক ডাঃ ঘোষাল আমায় অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন — কালের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে আমাদের সকল পুরানো মতান্তরই তখন তিরোহিত হয়েছে।

শ্রীরামপুর আশ্রমে ডিসেম্বর মাসের শেষে দক্ষিণায়ণ সংক্রান্তির উৎসব হত। নিকট, দূর, বহুস্থান হতেই শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শিষ্যেরা সব এসে তাতে যোগদান করতেন। মধুর নামসঙ্কীর্তন, কেষ্টদার অমিয়মধুর গলার গান, আশ্রমের ছেলেদের তৈরী প্রসাদগ্রহণ, তারপর আশ্রমের উঠানে

মুক্ত আকাশতলে গুরুদেবের জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা! আহা, সে সব কি সুখের স্মৃতি, কি আনন্দের দিনই গিয়েছে — বহুদিন আগেকার সব আনন্দোৎসব। আজ রাতে হয়তবা তাতে নূতন কিছু একটু যোগ হতে পারে।

গুরুদেব বললেন, "যোগানন্দ, আজকের সভায় বক্তৃতা দাও — ইংরেজীতেই বলবে।" এইরকম অস্বাভাবিক অনুরোধ করে গুরুদেবের চোখে কৌতুকের হাসি দেখা গেল; জাহাজে আমার প্রথম ইংরেজীতে বক্তৃতা দেবার অব্যবহিত পূর্বেকার দূরবস্থার কথা তিনি কি তখন ভাবছিলেন? আমি সে গল্প আমার গুরুভাইদের শুনিয়ে গুরুদেবের আশীর্বাদের জোরে আমার কি পরিমাণ কৃতকার্যতা লাভ হয়েছিল, তার কথাও আন্তরিক ভক্তির সঙ্গে নিবেদন করে শেষ করলাম।

আমি বললাম, "গুরুদেবের অমেয় সাহায্য শুধু যে কেবল সেই সমুদ্রের মাঝে জাহাজেই আমার কাছে এসে পৌঁছেছিল তাই নয়, আমেরিকার মত বিরাট মহাদেশে আজ এই পনের বছর ধরে প্রত্যহই তা আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে।"

নিমন্ত্রিতেরা বিদায় নিলে পর শ্রীযুক্তেশ্বরজী আমাকে সেই ঘরে ডাকলেন, যেখানে (ঐরকম একটা উৎসবের পর কেবল একটিবার মাত্র) আমি তাঁর কাঠের তক্তপোষে শোবার অনুমতি পেয়েছিলাম! আজকে দেখি গুরুদেব সেখানে নীরবে বসে আছেন, শিষ্যরা সব তাঁকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করে তাঁর চরণতলে উপবিষ্ট। ঘরে প্রবেশ করতেই একটু হেসে তিনি বললেন, "যোগানন্দ, তুমি কি এখন কোলকাতায় ফিরছ নাকি? আচ্ছা, কাল একবার এখানে এসো; তোমায় আমার গোটাকতক কথা বলবার আছে।"

তার পরদিন বৈকালে, কতকগুলি আশীর্বাণী উচ্চারণ করে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমায় পরমহংস* উপাধি প্রদান করলেন।

---

* পরমহংস — শাস্ত্রকাহিনীতে শ্বেত রাজহংস সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বাহন বলে উল্লিখিত আছে; শ্বেত রাজহংস জলমিশ্রিত দুগ্ধ হতে দুগ্ধকে পৃথক করতে সমর্থ বলে সদসৎ বিচারের প্রতীকস্বরূপ বিবেচিত হয়। হং-স শব্দটির মন্ত্রোচ্চারণ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগের শব্দের অনুরূপ। অহম্-সঃ — অর্থাৎ হংসঃ মানে "আমিই তিনি।" এই দু'টি শক্তিশালী মন্ত্রের সঙ্গে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সংযোগ আছে। কাজেই প্রতি শ্বাসগ্রহণে মানুষ তার নিজের অজ্ঞাতসারে তার অস্তিত্বের সত্য, "আমিই তিনি" তা প্রমাণিত করে।

আমি নতজানু হয়ে তাঁর সামনে বসতেই তিনি বললেন, "এখন তোমার পূর্বেকার 'স্বামী' উপাধির জায়গায় 'পরমহংস' উপাধি হল।" এই 'পরমহংসজী'* কথাটা উচ্চারণ করতে আমার পশ্চিমী শিষ্যরা যে কিরূপ গলদ্‌ঘর্ম হবে, তা ভেবে তখন মনে মনে একটু হাসলাম।

গুরুদেবের চক্ষু দু'টি স্থির, স্নিগ্ধ। শান্তভাবে বললেন, "পৃথিবীতে আমার কাজ এখন ফুরিয়েছে; তোমাকেই এখন থেকে সব চালাতে হবে।" শুনে তো ভয়ে বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, "পুরীতে আমাদের আশ্রমের ভার নেবার জন্যে কাকেও পাঠিয়ে দাও। তোমার হাতে আমি সবই দিয়ে যাচ্ছি। তুমি তোমার জীবন আর এই প্রতিষ্ঠানের তরী, ঠিকই সাফল্যের সঙ্গে স্বর্গের বেলাভূমিতে ভিড়োতে পারবে!"

অশ্রুপ্লাবিত নয়নে আমি তাঁর পা দু'টি জড়িয়ে ধরলাম; তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সস্নেহে আশীর্বাদ করলেন।

তার পরদিন রাঁচী থেকে স্বামী সেবানন্দ নামে একটি শিষ্যকে ডাকিয়ে এনে তাকে আশ্রমের ভার দিয়ে পুরী পাঠিয়ে দিলাম। তারপরে গুরুদেব তাঁর বিষয়সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি আইনের খুঁটিনাটি ব্যাপারস্যাপার নিয়ে আলোচনা করলেন — কারণ তাঁর ভয় ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুইটি আশ্রম আর অন্যান্য সম্পত্তি সব দখলের জন্য তাঁর আত্মীয়স্বজনদের মামলামোকদ্দমা জুড়ে দেবার সম্ভাবনা আছে, সেটা নিবারণ করা প্রয়োজন — কাজেই তাঁর ইচ্ছা হল যে তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সব একমাত্র জনহিতকর কাজের উদ্দেশ্যে দান করে যান।

একদিন বৈকালে অমূল্যবাবু নামে এক গুরুভাই আমায় বললেন, "গুরুদেবের সম্প্রতি খিদিরপুরে যাবার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু তিনি যেতে পারেন নি।" শুনে কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার শীতল শিহরণ সর্বাঙ্গ দিয়ে বয়ে গেল। বার বার পীড়াপীড়ি করাতে শ্রীযুক্তেশ্বরজী কেবল এইটুকুমাত্র বললেন, "খিদিরপুরে আর আমার যাওয়া হবে না!" মুহূর্তের জন্য গুরুদেব যেন সন্ত্রস্ত শিশুর মত কেঁপে উঠলেন!

* আমায় 'স্যার' বলে সম্বোধন করে তারা 'পরমহংসজী' শব্দ উচ্চারণের দুরূহতা এড়িয়ে গেছল।

(পতঞ্জলি লিখেছেন,* "দেহের প্রতি স্বভাবজ আসক্তি, খুব বড় বড় সাধুদের মধ্যেও ঈষৎ পরিমাণে বর্তমান।" মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমার গুরুদেব মাঝে মাঝে বলতেন, "বহুদিন খাঁচায় বন্ধ পাখি যেমন দরজা খুলে দিলেও উড়ে যেতে ইতস্ততঃ করে।")

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে আমি মিনতি করে বললাম, "গুরুজী, ও কথা বলবেন না। আমার সামনে ওসব কথা আর কখনও উচ্চারণ করবেন না।"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মুখ প্রশান্ত হাসিতে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। একাশি বছরে পড়বেন, তবুও তাঁকে দেখতে বেশ স্বাস্থ্যবান আর বলিষ্ঠ!

দিনের পর দিন গুরুদেবের নীরব অথচ অনুভাব্য স্নেহধারায় অভিষিক্ত হয়ে তাঁর ভাবী তিরোভাবের নানা ইঙ্গিত সব একে একে মন থেকে মুছে ফেললাম।

পাঁজিতে তারিখ দেখিয়ে বললাম, "গুরুদেব, এবারে 'কুম্ভমেলা' এই মাসে প্রয়াগে হচ্ছে।"†

"তুমি কি সত্যিই কুম্ভমেলায় যেতে চাও নাকি?"

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর যে আমায় ছাড়তে ইচ্ছে নয়, তা ঠিকমত বুঝতে না পেরে আমি বলে চললাম, "প্রয়াগে একবার কুম্ভমেলায় বাবাজীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎলাভের যে সৌভাগ্য হয়েছিল — বোধহয় এবারে আমারও সেইরকম সৌভাগ্য হয়ে যেতে পারে।"

---

* স্বরসবাহী বিদুষোহপি তথারূঢ়োহভিনিবেশঃ।। (পাতঞ্জলদর্শনম্, সাধনপাদঃ — ৯ শ্লোক)

† প্রাচীন 'মহাভারতে' ধর্মমেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াগে যে বিরাট কুম্ভমেলা হয়, তার একটি বিবরণ লিখে রেখে গেছেন। কুম্ভমেলা প্রতি তিন বৎসর অন্তর ক্রমান্বয়ে হরিদ্বার, এলাহাবাদ, নাসিক ও উজ্জয়িনীতে অনুষ্ঠিত হয়ে দ্বাদশ বৎসরের মাথায় চক্রাকারে ঘুরে এসে আবার হরিদ্বারে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শহরগুলিতে প্রতি ছয় বৎসরে একবার অর্ধকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মোটের ওপর শহরগুলিতে প্রতি তিন বৎসরে কুম্ভ ও অর্ধকুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

হিউয়েন সাং লিখেছেন ঃ উত্তর ভারতের অধিপতি মহারাজ হর্ষবর্ধন কুম্ভমেলায় সন্ন্যাসী পরিব্রাজক প্রভৃতিদের মধ্যে তাঁর রাজকোষ উন্মুক্ত করে তাঁর সম্পূর্ণ ধন (পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত) নিঃশেষে দান করতেন। হিউয়েন সাং চীন দেশে প্রত্যাবর্তন করবার সময় হর্ষবর্ধনের বিদায় উপহার স্বর্ণ ও রত্নরাজি গ্রহণে অস্বীকার করে ৬৫৭ খানি হস্তলিখিত ধর্ম গ্রন্থের পুঁথি অধিকতর মূল্যবান বিবেচনা করে স্বদেশে নিয়ে যান।

"আমার তো মনে হয় না যে, এবার তুমি সেখানে তাঁর দেখা পাবে।" বলে তিনি নীরব হয়েই রইলেন — আমার মতলবে বাধা দেওয়ার তাঁর কোন ইচ্ছা ছিল না।

তার পরদিন সকালে যখন ছোট একটি দল নিয়ে আমি যাত্রার উদ্যোগ করছি — গুরুদেব আমায় তখন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে আশীর্বাদ করলেন। গুরুদেবের আচরণের অর্থ কি, তা ঠিক স্পষ্টতঃ আমি তখন অনুমান করে উঠতে পারি নি। তার কারণ বোধহয় এই যে, আমার গুরুর মহাপ্রস্থান আমায় নিতান্ত নিরুপায় আর অসহায়ভাবে দেখতে হবে, এটা হয়ত ভগবানের অভিপ্রেত ছিল না। তার হাত থেকে রেহাই দেওয়াই বোধহয় ভগবানের ইচ্ছা ছিল। আর আমার জীবনে এটা সর্বদাই ঘটেছে যে, আমার অতি প্রিয়জনের মৃত্যুর সময় ভগবান দয়া করে আমায় সে সব করুণদৃশ্য থেকে বরাবরই দূরে সরিয়ে রেখেছেন।*

১৯৩৬ সালের ২৩শে জানুয়ারী আমাদের দলটি কুম্ভমেলায় উপস্থিত হয়। প্রায় বিশলক্ষ লোকের জনতা — সে এক বিরাট ও অভাবনীয় দৃশ্য। ভারতবাসীদের, এমন কি দীনতম কৃষকদের মধ্যেও, ঠাকুরদেবতা আর সব সাধুসন্ন্যাসী, যাঁরা ঈশ্বরলাভের জন্যে সংসারের সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন করে সব কিছু ত্যাগ করে এসেছেন — তাঁদের উপর একটা স্বাভাবিক ভক্তি আছে। অবশ্য ভণ্ড আর বুজরুকও সেখানে যথেষ্টই ছিল; তথাপি মুষ্টিমেয় কিছু প্রকৃত মুনিঋষি, যাঁদের আবির্ভাবে সারাদেশ দেবতার আশীর্বাদপূত হয়ে ধন্য হয়ে গেছে, কেবল তাঁদেরই জন্য নির্বিচারে সকলকেই ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকে। প্রতীচ্যবাসীরা যাঁরা এ বিরাট দৃশ্য দেখছিলেন, তাঁরা দেশের নাড়ীর স্পন্দন আর কালের গতির সম্মুখে ভারত তার আধ্যাত্মিক উৎসাহবলে যে অদম্য প্রাণশক্তি পেয়েছে, তা দেখবার একটা অপূর্ব সুযোগ পেলেন।

---

* আমার মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনন্তদা, জ্যেষ্ঠাভগিনী রমাদিদি, গুরুদেব, পিতৃদেব এবং আমার জনকয়েক অন্তরঙ্গ প্রিয়জনদের কারোরই মৃত্যুসময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম না। (পিতা ১৯৪২ সালে কোলকাতায় উননব্বই বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।)

প্রথম দিন আমাদের শুধু চারদিক ঘুরেফিরে সব দেখেশুনে বেড়িয়ে বেড়াতেই কেটে গেল। হাজার হাজার লোক পাপক্ষালনের জন্য জাহ্নবীর পুণ্যসলিলে অবগাহন করছে, কোথাওবা ব্রাহ্মণেরা পূজা হোম বা যাগযজ্ঞ করছেন। মৌনী সাধুসন্ন্যাসীদের চরণে লোকজন নানা উপকরণ নিয়ে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করছে। সারি সারি হাতীর দল, নানা আভরণে ভূষিত অশ্বদল, মন্থরগতি রাজস্থানের উটের দল — সব ধীর কদমে চলেছে। তাদের সঙ্গে চলেছে সিল্ক বা ভেলভেটের নিশান বা ঝাণ্ডা, আর স্বর্ণ বা রৌপ্যের দণ্ড নিয়ে নাগাসন্ন্যাসীদের এক বিচিত্র শোভাযাত্রা।

কৌপীনধারী সন্ন্যাসীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে নীরবে বসে রয়েছেন; তাঁদের শরীর শীতাতপ নিবারণের জন্য ভস্মানুলিপ্ত, কপালে একটিমাত্র চন্দনের ফোঁটা — তৃতীয় নেত্রের প্রতীক। গৈরিকবসন, মুণ্ডিতমস্তক, দণ্ডকমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীর দল হাজারে হাজারে সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কি শিষ্যদের সঙ্গে ধর্মালোচনায়, কি ভ্রমণকালে, তাঁদের মুখে ত্যাগের শান্তমহিমার একটা অনির্বাণ জ্যোতিঃ।

এখানে ওখানে গাছতলায় বড় বড় ধুনি জ্বালিয়ে সাধুরা* সব বসে রয়েছেন, মাথার উপর জটা বিঁড়ে করে পাকানো। কয়েকজনের আবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাড়ি, কয়েক ফুট লম্বা, তার আবার ডগায় একটা করে গেঁট বাঁধা। তাঁরা নীরবে ধ্যানে বসে আছেন অথবা চলমান জনতাকে হস্তোত্তোলনে আশীর্বাদ বিতরণ করছেন — ভিক্ষুক, হস্তীপৃষ্ঠে রাজামহারাজা, বিচিত্রবর্ণের শাড়ীপরিহিতা নারীর দল — হাতে তাদের কারুকার্যশোভিত কঙ্কণ, পায়ে মল, ঝঙ্কার তুলছে রিণিঝিনিঝিনি; কোথাও বা ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী [illegible] কৃশ হস্তোত্তোলন করে বসে রয়েছেন, ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে রয়েছে আশা; উপবিষ্ট সাধুদের অসাধারণত্ব বাইরে থেকে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না — তাদের গাম্ভীর্য তাদের অন্তরের পরমানন্দকে লুকিয়ে রেখেছে। হট্টগোল ছাপিয়ে উঠছে মন্দিরের অবিরত ঘণ্টাধ্বনি।

---

* লক্ষ লক্ষ ভারতীয় সাধুগণ ভারতের সাতটি প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ সাতজন মণ্ডলেশ্বর কর্তৃক গঠিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক পরিচালিত হন। বর্তমান মহামণ্ডলেশ্বর অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হলেন শ্রীশ্রীজয়েন্দ্র পুরী। এই মহাপ্রাণ সাধু অত্যন্ত স্বল্পবাক্ — তিনটি মাত্র বাক্যে তাঁর আলাপ সমাপ্ত — সত্য, প্রেম ও কর্ম। এই-ই হচ্ছে তাঁর প্রচুর আলাপ-আলোচনা।

মেলার দ্বিতীয় দিনে সঙ্গীদের নিয়ে আমি নানা আশ্রম আর কুটির বা ঝোপড়াতে সাধুসন্ন্যাসীদের দর্শন আর প্রণাম করে ঘুরে ঘুরে বেড়ালাম। গিরিসম্প্রদায়ের মণ্ডলেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে তাঁর আশীর্বাদ লাভ করলাম; ক্ষীণদেহ, চক্ষু দু'টিতে স্নিগ্ধ তপঃজ্যোতি। তারপরে আমরা একটি আশ্রমে গেলাম, সেখানকার গুরুমহারাজ নয় বৎসর ধরে মৌনব্রত পালন করছেন — শুধুমাত্র ফলই আহার করে থাকেন। আশ্রম হলের মাঝের বেদীতে প্রজ্ঞাচক্ষু* নামে একটি অন্ধ সাধু বসে আছেন — গভীর শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর; সর্বসম্প্রদায় কর্তৃক বহুল সম্মানিত।

হিন্দীতে বেদান্ত সম্বন্ধে অল্পকিছু বলবার পর আমি সঙ্গীদের নিয়ে সেই শান্তিময় আশ্রমকুঞ্জ পরিত্যাগ করে নিকটবর্তী আর একটি সাধুর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সাধুটির নাম কৃষ্ণানন্দ, সুন্দর আকৃতি, রক্তিম গণ্ড, সুদৃঢ় স্কন্ধ। তাঁর পাশেই লম্বমান হয়ে শুয়ে রয়েছে একটি পোষা সিংহী। সাধুটির আধ্যাত্মিক প্রভাবে — অবিশ্যি তার বলিষ্ঠ দৈহিক শক্তির জন্যে নয়, এটা আমি ঠিক জানি — জঙ্গলের এই হিংস্র মাংসাশী পশুটি সব রকম মাংসাহার পরিত্যাগ করে শুধু ভাত আর দুধ খেয়েই প্রাণধারণ করে। স্বামীজী সেই পিঙ্গলদেহ সিংহীকে 'ওম্' উচ্চারণ করতে শিখিয়েছেন — আর তা বেরোয় বেশ একটা শ্রুতিসুখকর গম্ভীর গর্জনে — বিড়ালের জাত তো, বিড়াল তপস্বী আর কি।

তারপর দর্শন হল এক শিক্ষিত তরুণ সাধুর সঙ্গে। রাইট সাহেবের চমকপ্রদ মনোরম দিনলিপি হতে তার কিছুটা বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত হল, —

"আমরা ফোর্ড গাড়িতে গঙ্গা পার হলাম। গঙ্গা এখানে নিতান্ত অগভীর। পন্টুন ব্রীজ পার হতে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ করে। তারপরে সরু আঁকাবাঁকা রাস্তার ভিতর দিয়ে সর্পিলগতিতে এগিয়ে চললাম। পথে যেতে যেতে যোগানন্দজী, নদীতীরে যেখানে বাবাজীর সঙ্গে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই জায়গাটি আমায় দেখালেন। অল্পক্ষণ পরেই আমরা গাড়ি থেকে নেমে কিছুদূর হেঁটে চললাম। রাস্তায় বালিতে

---

* এই নামেই সাধুটি অভিহিত — অর্থাৎ যিনি (জড়চক্ষুর অভাবে) জ্ঞানচক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন।

পা বসে যায়, তার উপর ধুনির আগুনের গাঢ়ধোঁয়া। অবশেষে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম খড়মাটি দেওয়া ছোট ছোট কতকগুলি কুঁড়েঘরের সামনে। এদেরই মধ্যে একটার সামনে এসে দাঁড়ালাম; একটি অস্থায়ী কুটির, প্রবেশপথ অতি ক্ষুদ্র, কোন দরজা নেই — এই-ই হচ্ছে করপাত্রীজীর ডেরা। করপাত্রীজী নবীন পরিব্রাজক সাধু। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রসিদ্ধ। সেখানে তিনি একগাদা খড়ের উপর পদ্মাসনে বসে আছেন; তাঁর একমাত্র আচ্ছাদন — আর বোধ হয় তাঁর ঐ একমাত্রই সম্পত্তি — একটি গৈরিকবর্ণের বস্ত্রখণ্ড, স্কন্ধের উপর আলম্বিত।

"কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে সেই ঝোপড়ার ভিতর ঢুকে প্রণাম সারতেই দেখলাম, মুখে তাঁর কি অপরূপ হাসি — বাস্তবিকই স্বর্গীয় সুষমায় ভরা, পরমশান্তি বিকিরণ করছে; দুয়ারের কাছে কেরোসিন লণ্ঠনের আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলে দেওয়ালের উপর নানারকম অদ্ভুতমূর্তির ছায়া রচনা করছে। তাঁর মুখটি, বিশেষতঃ তাঁর চক্ষুদুটি আর সুন্দর দন্তপঙ্‌ক্তি হাসিতে উজ্জ্বল। তাঁর হিন্দীভাষণ ঠিক বুঝে উঠতে না পারলেও তাঁর মুখের ভাব সহজেই বোধগম্য হচ্ছিল; প্রেম, আধ্যাত্মিক ও উদ্দীপনায় পূর্ণ মহিমা। তাঁর মহত্ব সম্বন্ধে কারোরই মনে কোন সংশয় থাকার কথা নয়।

"কল্পনা করুন — সাংসারিক আসক্তিবিহীন, পরমনিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ ও সুখী জীবন; অশনবসনের কোন ভাবনা নেই, আহারের বৈচিত্র্যের জন্য কোনও লালসা নেই। একদিন অন্তর পক্কান্ন গ্রহণ করেন — হস্তে ভিক্ষাপাত্র নেই; সর্বপ্রকার অর্থচিন্তার জটিলতা হতে মুক্ত, টাকাকড়ি স্পর্শও করেন না, কোন সঞ্চয় নেই, ভগবানে তাঁর সদা গভীর বিশ্বাস; যাতায়াতের কোন হাঙ্গামা পোহাতে হয় না, গাড়িতে কখনও চড়েন না; কিন্তু স্থানান্তরে যেতে হলে সর্বদা নদীর ধার দিয়েই যাতায়াত করেন; কোথাও একসপ্তাহর বেশি থাকেন না, পাছে সেখানে মন বসে যায়!

"আর কি বিনয়নম্র ভাব! বেদে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ও শাস্ত্রী উপাধিধারী। তাঁর চরণতলে উপবেশন করতে একটা মহান উদারভাব আমার মনে উদয় হল; বুঝলাম

যে. আমি যে সত্যকারের প্রাচীন ভারতের সন্ধানে বেরিয়েছি এখানে তার উত্তর পেলাম — কারণ আমার বোধ হল — এইসব বিরাট বিরাট সাধুসন্ন্যাসী, মুনিঋষি, যোগীতপস্বীদের দেশের ইনিই হচ্ছেন প্রকৃত প্রতিনিধি।"

করপাত্রীজীকে তাঁর পরিব্রাজক জীবনের কথা জানতে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "শীতের জন্যে বেশি কাপড়চোপড় রাখেন না?"

"না, এই-ই যথেষ্ট।"

"বই সঙ্গে রাখেন না?"

"না; যাঁরা আমার কাছ থেকে শুনতে চান, তাঁদের আমি স্মৃতির সাহায্যে শিক্ষা দিই।"

"আর কি করেন?"

"গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াই!"

কি চমৎকার সরল ও সুন্দর জীবন! তাঁর জীবনের মধুর সারল্য, নিরুদ্বেগ শান্তি আর নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা আমার মনকে সবলে আকর্ষণ করল। আমেরিকায় আমার স্কন্ধে ন্যাস্ত নানাকাজের দায়িত্বভারের কথা মনে পড়ল। ক্ষুণ্ণ মনে মুহূর্তেক ভাবলাম, "না যোগানন্দ, এ জীবনে গঙ্গারধারে ঘুরে বেড়ান তোমার চলবে না — অনেক কাজ তোমার এখনও বাকি।"

সাধুটি তাঁর গুটিকতক আধ্যাত্মিক অনুভূতি আমার কাছে বিবৃত করবার পর আমি হঠাৎ তাঁকে প্রশ্ন করে বসলাম, "আপনি কি এ সব বর্ণনা শাস্ত্রকথা থেকে বলছেন, না অন্তরের উপলব্ধি থেকে?"

সরল হেসে তিনি উত্তর দিলেন, "অর্ধেক বই থেকে, আর বাকি অর্ধেকটা অনুভব।"

আমরা খানিকক্ষণ সেখানে বসে রইলাম নীরব ধ্যানের শান্তিতে. উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তাঁর পবিত্রসান্নিধ্য ত্যাগ করে বাইরে এসে রাইট সাহেবকে বললাম, "রাইট, রাজাকে দেখলে, — সোনার খড়ের সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট?"

রাত্রে সেই মেলাক্ষেত্রে, ভূমিতে বসেই মুক্ত আকাশের নীচে নক্ষত্রালোকে আহারপর্ব শেষ করলাম। কাঠি দিয়ে গাঁথা শালপাতায় খাওয়া, বাসনকোসন মাজার কোন হাঙ্গামা নেই।

কুম্ভমেলায় আরও দু'দিন কাটিয়ে তারপরে যমুনার তীর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে আগ্রা নগরীতে গিয়ে পৌঁছলাম। তাজমহলের দিকে চাইতে স্মৃতিতে উদয় হল — মর্মরস্বপ্নের অপূর্ব সৌন্দর্যে অভিভূত জিতেন্দ্র যেন আমার পাশেই দাঁড়িয়ে!

তারপর চললাম বৃন্দাবনে স্বামী কেশবানন্দজীর আশ্রমে।

কেশবানন্দজীকে খুঁজে বার করবার উদ্দেশ্য ছিল এই পুস্তক-সংক্রান্ত ব্যাপারে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর অনুরোধ ছিল আমি যেন লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনী লিখি; সেকথা আমি কখনও ভুলিনি। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে যোগাবতার লাহিড়ী মহাশয়ের আত্মীয়স্বজন আর তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যবর্গের সঙ্গে সংযোগস্থাপনের প্রত্যেকটি সুযোগ আমি গ্রহণ করেছিলাম। তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে আমি প্রত্যেকটি ঘটনা সন তারিখসহ মিলিয়ে নিয়েছি; তাছাড়া ফটোগ্রাফ, পুরানো চিঠি ও অন্যান্য দলিলপত্রাদিও সংগ্রহ করেছি। লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনী সংক্রান্ত কাগজপত্রাদির সংগ্রহ দিন দিন বেশ বেড়ে উঠছিল। তারপর একটু ভয়ও হল যে, এবার আমার সামনে গুরুতর শ্রমসাধ্য পুস্তকপ্রণয়নের যে বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে — তা সম্পন্ন করি কি করে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালাম যেন এই মহাগুরুর জীবনীলেখক হিসাবে আমার কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারি। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কারও কারও মনে আশঙ্কা হল যে, তাঁদের গুরুর বিষয়ে লিখিত বিবরণে হয়ত তাঁদের গুরুকে ক্ষুদ্র করে ফেলা হবে অথবা তাঁর ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।

তাঁর এক প্রধান শিষ্য শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয় একবার আমায় বলেছিলেন, "কোন দিব্য মহাপুরুষের জীবনী শুধু দুটো নীরস কথায় সাজিয়ে লিখলে তাঁর প্রতি অবিচারই করা হবে।"

অন্যান্য শিষ্যরাও তেমনি চেয়েছিলেন যে, তাঁদের অমরগুরু তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্তলেই লুকিয়ে থাকুন — তাঁর কথা আর বাইরে প্রকাশ করে কাজ নেই। যাইহোক, তাঁর জীবনী সম্বন্ধে লাহিড়ী মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করে আমি তাঁর বাহ্যজীবনের ঘটনাসমূহ সংগ্রহ আর তাদের সত্যতা প্রমাণের জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি।

বৃন্দাবনে কেশবানন্দজী আমাদের দলটিকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন তাঁর কাত্যায়নী পীঠ আশ্রমে। বিশাল ইঁটের তৈরী বাড়ী বড় বড় কালো থাম দেওয়া — চারদিকে সুন্দর বাগান। তিনি তখুনিই আমাদের একটি বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন — লাহিড়ী মহাশয়ের একটি বড় প্রতিকৃতি ঘরের মধ্যে শোভা পাচ্ছে। কেশবানন্দজীর বয়স নব্বই-এর কাছাকাছি, তবু তাঁর পেশীবহুল দেহ হতে শক্তি আর স্বাস্থ্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। দীর্ঘকেশ, তুষারশুভ্র শ্মশ্রু, চক্ষুদুটি আনন্দে উজ্জ্বল — প্রাচীন ঋষিদের মতই সৌম্যদর্শন। আমি তাঁকে বললাম যে ভারতের গুরুদের সম্বন্ধে আমার পুস্তকে তাঁর বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই।

বড় বড় যোগীরা সাধারণতঃ নিজেদের বিষয়ে কিছু প্রকাশ করতে চান না। তবুও আমি একটু বিনীত অনুনয়ের হাসি হেসে বললাম, "দয়া করে আপনার পূর্বজীবনের কথা যদি কিছু বলেন?"

কেশবানন্দজীর ভাবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পেল। বললেন, "আমার জীবনে বলবার আর বিশেষ কি আছে? বলতে গেলে আমার সারা জীবনটাই হিমালয়ের নির্জন পাহাড়ে, এক নীরব গুহা থেকে আর এক গুহায় পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে বেড়াতেই কেটে গেছে। কিছুদিনের জন্যে আমি হরিদ্বারের বাইরে একটা আশ্রম করেছিলাম — চারদিকে বড় বড় বৃক্ষকুঞ্জে ঘেরা। জায়গাটি খুব শান্তিপূর্ণ, যাত্রীরা বড় কেউ সেখানে আসতো না — কারণ জায়গাটাতে অনেক কেউটে সাপের বাসা ছিল।" বলে কেশবানন্দজী একটু হেসে আবার শুরু করলেন, "তারপর একদিন গঙ্গায় বান এসে আশ্রমটির সঙ্গে সঙ্গে কেউটে সাপগুলোকেও কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল তা কে জানে। তারপর আমার শিষ্যদের সাহায্যে বৃন্দাবনে এই আশ্রমটি তৈরী হয়েছে।"

আমাদের দলের মধ্যে একজন স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করলো ঃ তিনি হিমালয়ের বাঘের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতেন কি করে?

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "হিমালয়ের মত অত উঁচু একটা আধ্যাত্মিক ভূমিতে বন্যপশুরা কদাচিৎ যোগীঋষিদের উপর অত্যাচার করতে আসে। একবার আমি জঙ্গলের ভিতর বাঘের মুখে পড়েছিলাম। আমার হঠাৎ চিৎকারে বাঘটা যেন জমে পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।" স্বামীজী স্মৃতির রোমন্থনে আবার একটু হাসলেন।*

"মাঝে মাঝে এই নির্জনবাস ছেড়ে আমি গুরুদর্শনের জন্য কাশী যেতাম। হিমালয়ের জঙ্গলে অনবরত ঘুরে বেড়ানোর জন্যে তিনি আমায় খুব ঠাট্টা করতেন।

"একবার তিনি আমায় বলেছিলেন, 'তোমার ভবঘুরের বৃত্তি আর ঘুচল না দেখছি। অনবরতই তো এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও। যাক, রক্ষে এই যে হিমালয় পাহাড়ের মত বিরাট জায়গা পেয়েছ, খুব ঘুরে বেড়াতে পারবে।'"

কেশবানন্দজী বলতে লাগলেন, "লাহিড়ী মহাশয়ের তিরোধানের পূর্বে আর পরে বহুবার তিনি আমার সামনে সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। হিমালয়ের উচ্চতাও তাঁর মত লোকের কাছে তো অনধিগম্য নয়।"

ঘণ্টাদুই পরে তিনি আমাদের একটি খাবার দালানে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। আমি সভয়ে একটি নীরব দীর্ঘশ্বাস ফেললাম — হায়রে, এখানেও দেখি যে সেই ষোড়শোপচারে আহারের ব্যবস্থা! ভারতে এসেছি — এখনও বছর পূর্ণ হয় নি, এরই মধ্যে ওজনে পঞ্চাশ পাউণ্ড

---

* ব্যাঘ্রকে ভীতিপ্রদর্শনের নানা উপায় আছে বলে বোধ হয়। ফ্রান্সিস বার্টলস নামে জনৈক অস্ট্রেলিয়ান অভিযাত্রী বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ভারতের জঙ্গল "বিচিত্র, সুন্দর ও নিরাপদ" বলেই মনে করেন। তাঁর আপদুদ্ধার কবচ ছিল — মাছি আটকাবার কাগজ; তিনি এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "প্রত্যেক রাত্রে আমি বহুল পরিমাণে মাছিধরা কাগজ আমার তাঁবুর চারধারে ছড়িয়ে রাখতাম; তারফলে কোন উপদ্রব হত না। তার কারণটা হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক। ব্যাঘ্র হচ্ছে এমন একটি প্রাণী যার বেশ টনটনে মর্যাদাবোধ আছে। অতি সন্তর্পণে সে ঘুরে বেড়ায় মানুষকে আক্রমণের জন্য, তারপর যেই সে মাছিধরা কাগজের কাছে এসে পৌঁছয়, অমনি সে চুপিসাড়ে সরে পড়ে! কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যাঘ্রপ্রবর একবার চটচটে মাছিধরা কাগজের উপর বসবার মজা টের পেয়ে আর কখনও মানুষের সামনে আসতে সাহস করে না।"

বেড়ে গেছি। তা হলেও আমার সম্মানে প্রদত্ত অন্তহীন ভোজে সযত্নে প্রস্তুত এইসব নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্যসামগ্রী গ্রহণ করতে অস্বীকার করাটাও অভদ্রতার চূড়ান্তই হবে বলে মনে হল। ভারতবর্ষে (হায়রে, আর কোথাও নয়!) বেশ হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি সাধু একটি মনোরম দৃশ্যই বটে।

ভোজনের পর কেশবানন্দজী একটি নির্জন জায়গায় আমায় টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, "আপনার আসা আমার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়, আপনার জন্যে একটা খবর আছে।"

আমি বিস্ময়ে চমকে উঠলাম। কেশবানন্দজীকে দর্শন করার মতলব আর তো কেউ জানত না, তবে ইনি জানতে পারলেন কি করে?

তিনি বলতে লাগলেন, "গত বৎসর হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলে বদরীনারায়ণের কাছে বেড়াতে বেড়াতে আমি পথ হারিয়ে ফেলি। ঘুরতে ঘুরতে দেখি যে বেশ প্রশস্ত একটি গুহা, একেবারে খালি, সেখানে আশ্রয় নিলাম; ভিতরে দেখি যে পাথরের মেঝেতে একটা গর্তে ধুনির আগুন জ্বলছে। এই নির্জনস্থানে কে বাস করেন? কার এ ধুনি? মনে মনে এই সব তোলপাড় করতে করতে ধুনির পাশে গিয়ে বসে পড়লাম, দৃষ্টি স্থির রাখলাম গুহার সূর্যালোকিত প্রবেশ পথের দিকে।

"পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, 'কেশবানন্দ, তুমি যে এখানে এসে পড়েছ তাতে আমি খুশি হয়েছি।' চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে তো বিস্ময়ে স্তম্ভিত! বাবাজী মহারাজ — সেই পর্বতকন্দরে মহাগুরু তখন সশরীরে আবির্ভূত হয়েছেন। বহুবৎসর বাদে পুনরায় তাঁর দর্শনলাভ করে আনন্দে অভিভূত হয়ে তাঁর পবিত্র চরণতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম।

"বাবাজী বলতে লাগলেন, 'আমিই তোমায় এখানে এনেছি। সেই জন্যেই তুমি পথ হারিয়ে আমার এই সাময়িক গুহাবাসে এসে হাজির হয়েছ। আমাদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল বহুদিন আগে; যাক, আবার তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি খুব খুশি হয়েছি।'

"তারপর সেই মহামহিমময় অমর মহাগুরু কতকগুলি আধ্যাত্মিক উপদেশের কথা বলে আমায় আশীর্বাদান্তে বললেন, 'যোগানন্দকে বলার জন্যে তোমায় একটা কথা বলছি। ভারতে ফিরে এসে সে তোমার সঙ্গে

দেখা করবে। তার গুরু, আর লাহিড়ীর জীবিত শিষ্যদের সম্বন্ধীয় বহুব্যাপারে সে নানাকাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকবে। তাকে বোলো যে, খুবই আগ্রহের সঙ্গে আশা করলেও এবার আর তার সঙ্গে আমি দেখা করতে পারব না; আর এক সময় তাকে দেখা দেব।'"

বাবাজীর মধুর আশ্বাস কেশবানন্দজীর মুখ থেকে শুনে আমার অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠল। মনের গোপন কোণে একটু ক্ষোভের যে সঞ্চার হয়েছিল — তাও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আগেই যা ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন, শেষপর্যন্ত তাই হয়ে দাঁড়াল — কুম্ভমেলাতে বাবাজীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না, তার জন্যে আর দুঃখও রইল না।

আশ্রমে একরাত্রি আতিথ্যলাভ করে তার পরদিন বৈকালে কোলকাতার দিকে আমাদের দল রওনা হল। যমুনার ব্রীজের উপর দিয়ে গাড়ি চলল, বৃন্দাবনের দিক্‌চক্রবালরেখার অপূর্ব মহিমময় সৌন্দর্য চোখের সামনে ভেসে উঠল — সূর্যদেব তখন সারা আকাশে আগুনের হোলি খেলে পাটে বসেছেন; যমুনার স্থিরজলে সেই রঙের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয়ে নদীর জল রক্তরাঙা করে তুলেছে।

শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাল্যলীলার পুণ্যস্মৃতিতে যমুনাতীর পবিত্র। গোপিনীদের সঙ্গে এখানে তিনি বাল্যকালে সরল মধুর লীলা প্রদর্শন করেন — ঈশ্বরের অবতার আর তাঁর ভক্তজনের মধ্যে যে চিরন্তন ভগবৎপ্রেম বর্তমান, তাঁর লীলায় তাই-ই প্রকটিত। বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি — অনেকেই ভুল বুঝেছেন। শাস্ত্রের মর্মকে শুধু আক্ষরিক অর্থগ্রাহী। লোকেদের মনের ধারণার অতীত। জনৈক অনুবাদকের একটি হাস্যকর ভুল এখানে উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। গল্পটি মধ্যযুগের এক উচ্চকোটির সাধক চর্মকার রবিদাস সম্বন্ধে। মানবজাতির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক মহিমা লুকিয়ে আছে, তা তিনি নিজ বৃত্তির ভাষায় সরল প্রাণে গেয়েছিলেন, —

"বিশাল নীল গগন মাঝে,
চর্মে ঢাকা দেবতা রাজে।"

একজন পাশ্চাত্য লেখকের রবিদাসের কবিতার একটা নেহাৎই কল্পনাবিহীন ও গ্রাম্য এই ব্যাখ্যা শুনে কেউ আর হাস্য সম্বরণ করতে পারবেন না। ব্যাখ্যাটি হচ্ছে এই, —

"তিনি তারপর একটি কুটির নির্মাণ করে তাতে একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। মূর্তিটি চর্মে নির্মিত। তারপর সেটি পূজো করা শুরু করলেন।"

রবিদাস ছিলেন ভক্তশ্রেষ্ঠ কবীরের গুরুভ্রাতা। রবিদাসের বিশিষ্ট শিষ্যবর্গের মধ্যে একজন হলেন চিতোরের রাণী। তিনি গুরুর সম্মানে একবার এক বিরাট ভোজে বহু ব্রাহ্মণকে চিতোরে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু নিমন্ত্রিতের দল নীচজাতীয় মুচির সঙ্গে একত্র আহার করতে সম্মত হলেন না। তাঁরা বসলেন এক স্বতন্ত্র ঠাঁইয়ে — নিজেদের মর্যাদা ও শুচিতা সযত্নে রক্ষা করে, জাত বাঁচিয়ে। তখন হল এক ভারি মজা। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণবটুরা দেখলেন যে, তাঁদের প্রত্যেকের পাশে একজন করে রবিদাস বসে। কারোরই পাশ খালি নেই। ব্যাপার দেখে তো সকলেই অবাক। যাক, তার ফল হল এই যে, এই ব্যাপারের পর গোঁড়ামি আর ততটা বজায় রইল না। চিতোরে একটা বিরাট আধ্যাত্মিক জাগরণ সাধিত হল।

আমাদের ছোট দলটি অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কোলকাতায় গিয়ে পৌঁছল। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ নিয়ে এসে শুনে হতাশ হলাম যে তিনি শ্রীরামপুর আশ্রম থেকে পুরী চলে গেছেন। পুরী কোলকাতার প্রায় তিনশত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

৮ই মার্চ তারিখে এক গুরুভ্রাতা, শ্রীঅতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী নামে গুরুদেবের একজন কোলকাতার শিষ্যকে এক টেলিগ্রাম পাঠালেন, "পুরী আশ্রমে এখুনিই চলে আসুন।" টেলিগ্রামের সংবাদ কানে পৌঁছতেই এর অর্থ কি বুঝতে আর দেরী হল না — পা দুটো ভেঙ্গে পড়ল — নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে আকুল প্রার্থনা জানাতে লাগলাম, গুরুদেবের জীবন যেন এ যাত্রা তিনি রক্ষা করে দেন। ট্রেন ধরবার জন্যে বাড়ি থেকে বেরোতেই অন্তরের মধ্যে এক দৈববাণী শুনতে পেলাম, —

"পুরীতে আজ রাত্রে যেও না। তোমার প্রার্থনা সফল হবার নয়।"

দুঃখে যন্ত্রণায় অভিভূত হয়ে বললাম, "প্রভু, পুরীতে গেলে যে তোমার আমার মধ্যে জীবনমৃত্যুর টানাটানি চলবে, সে তো তোমার ইচ্ছা নয় দেখছি; সেখানে গেলে তো গুরুদেবের জীবন রক্ষার জন্যে আমার অবিরত প্রার্থনা তোমায় সবই বিফল করে দিতে হবে। তবে কি আরও উচ্চতর কর্তব্যের আহ্বানে তাঁকে তোমার কাছে ফিরে যেতেই হবে?"

আমার অন্তরের বাণী শিরোধার্য করে সে রাত্রে তো আমি পুরী যাত্রা স্থগিত রাখলাম। তার পরদিন সন্ধ্যাবেলা ট্রেন ধরার জন্য যাত্রা করলাম। তখন প্রায় সাতটা বাজে। একটা ঘন কৃষ্ণবর্ণ সূক্ষ্ম মেঘ হঠাৎ কোথা থেকে এসে আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলল।* তারপরে দেখলাম আমাদের ট্রেন যখন পুরীর দিকে ছুটে চলেছে, শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর মূর্তি তখন হঠাৎ আমার সম্মুখে আবির্ভূত হল। তাঁকে দেখলাম আসনে উপবিষ্ট, অত্যন্ত গম্ভীর মূর্তি, তাঁর দুইধারে দুইটি আলো।

করজোড়ে অনুনয় করে বললাম, — "সব কি শেষ হয়ে গেছে?"

তিনি একটু মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তার পরদিন সকালে পুরী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তখনও ক্ষীণতম আশা; এমন সময় একজন অপরিচিত লোক আমার কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, "শুনেছেন কি, আপনার গুরুদেব দেহরক্ষা করেছেন?" বলেই আর একটিমাত্র কথা না বলেই লোকটা চলে গেল; লোকটা যে কে আর আমাকে এখানেই বা কি করে খুঁজে পাবে তা সে জানল কি করে, তা কখনো জানতে পারিনি।

চলৎশক্তি লোপ পেয়েছে, পা টলছে, হতভম্ব হয়ে প্ল্যাটফর্মের দেওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে পড়লাম — বুঝলাম যে নানা উপায়ে আমার গুরুদেব আমায় এই হৃদয়বিদারক ঘটনা জানাতে চাইছেন। মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভের ঝড়, অন্তর অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত। পুরী আশ্রমে পৌঁছবার সময় আমার তো একেবারে অজ্ঞান হবার মত অবস্থা। অন্তরের বাণী তখন স্নিগ্ধস্বরে ধ্বনিত হচ্ছে, —

"ধৈর্য ধর, শান্ত হও, স্থির হও।"

---

* এই সময় শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী দেহত্যাগ করেন — সন্ধ্যা ৭টা, ৯ই মার্চ, ১৯৩৬ সাল।

আশ্রমের ঘরে প্রবেশ করলাম; গুরুদেবের দেহ কল্পনাতীতভাবে জীবন্তের মত, পদ্মাসনে উপবিষ্ট — তখনও স্বাস্থ্য আর কমনীয়তায় অঙ্গ সমুজ্জ্বল, মহাসমাধিতে মগ্ন হয়েছেন। তাঁর তিরোধানের অল্প কিছুদিন আগে তাঁর সামান্য জ্বর হয়েছিল; তারপর তাঁর স্বর্গারোহণের পূর্বদিবসে তাঁর দেহ সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল। যতবারই তাঁর প্রিয়মূর্তির দিকে আমি তাকাচ্ছি, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, প্রাণ তাঁর দেহ ত্যাগ করে চলে গেছে। তখনও তাঁর গাত্রচর্ম মসৃণ আর কোমল; মুখে তাঁর একটা স্বর্গীয় পরমানন্দময় শান্তির ভাব প্রকটিত। রহস্যময় অন্তিম আহ্বানের শেষমুহূর্তে তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেছেন।

অভিভূতের মত চিৎকার করে বলে উঠলাম, "বাংলার সিংহ আজ চলে গেলেন।"

১০ই মার্চ তারিখে আমি তাঁর পারলৌকিক কৃত্যাদি সম্পন্ন করলাম। পুরী আশ্রমের বাগানের মধ্যে সাধুসন্ন্যাসীদের প্রাচীন শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পুণ্যদেহের সমাধি* দেওয়া হল। পরে এক মহাবিষুব সংক্রান্তিতে তাঁর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষ্যে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য দূরদূরান্তর হতে তাঁর বহুশিষ্য সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। কোলকাতার প্রসিদ্ধ 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' তাঁর চিত্রসম্বলিত নিম্নলিখিত এই বিবরণটি প্রকাশিত হয়, —

"২১ মার্চ তারিখে শ্রীমৎ স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি মহারাজের তিরোভাব উপলক্ষ্যে ভাণ্ডারা অনুষ্ঠিত হয়, যিনি ৮১ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন। সেই উপলক্ষ্যে তাঁর বহু শিষ্য পুরীধামে উপস্থিত হয়েছিলেন।

"স্বামী মহারাজ কাশীধামের যোগিরাজ শ্রীশ্রী শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার একজন শ্রেষ্ঠ টীকাকার ও ব্যাখ্যাতা। স্বামী মহারাজ ভারতবর্ষে যোগদা সৎসঙ্গের (সেল্‌ফ-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপ) অনেকগুলি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা —

---

* হিন্দুমতে শেষকৃত্যাদিতে গৃহীদের পক্ষে দাহের ব্যবস্থা আছে। সাধুসন্ন্যাসী প্রভৃতিদের দাহ না করে সমাধি দেওয়া হয় (অবশ্য মাঝে মাঝে তার ব্যতিক্রমও হয়)। সাধু প্রভৃতিদের দেহ সন্ন্যাসগ্রহণের সময় জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে বলে বিবেচিত হয়।

আর যোগপ্রচারের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। এই যোগপ্রচারকার্য তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী যোগানন্দ পশ্চিমে বহন করে নিয়ে যান। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি আর তাঁর গভীর উপলব্ধি স্বামী যোগানন্দকে সমুদ্রযাত্রা করে আমেরিকায় গিয়ে ভারতের ধর্মগুরুদের বাণী প্রচারে উদ্বুদ্ধ করে।

"তাঁর গীতা ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাখ্যা শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় বহন করে, যা প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের ঐক্যসাধনে সকলের কাছে পথপ্রদর্শকস্বরূপ হয়ে আছে। শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী সকল ধর্মবিশ্বাসের মূলগত ঐক্যে বিশ্বাস করতেন বলে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সাহায্যে ধর্মের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবসঞ্চারের জন্য 'সাধুসভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। তাঁর মৃত্যুকালে তিনি 'সাধুসভা'র সভাপতি হিসাবে স্বামী যোগানন্দ গিরিজীকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

"ভারত আজ এরূপ একজন মহৎ ব্যক্তিকে হারিয়ে বাস্তবিকই বড়ই দীন হয়ে পড়ল। প্রকৃত ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনা যা তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছিল, তা যেন তাঁর সান্নিধ্য ধন্য সকলের মধ্যে প্রসারিত হয়।"

কোলকাতায় ফিরলাম। তাঁর সহস্র পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত শ্রীরামপুর আশ্রমে ফিরবার মত মন আমার এখনও ঠিক হয় নি দেখে তাঁর সেই প্রফুল্ল নামে ছোট শিষ্যটিকে শ্রীরামপুর আশ্রম থেকে ডেকে আনিয়ে রাঁচী বিদ্যালয়ে ভর্তি করবার সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দিলাম।

প্রফুল্ল আমাকে বলেছিল, "যেদিন সকালে আপনি এলাহাবাদে কুম্ভমেলায় যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়লেন, গুরুজী সোফার উপর ধপ করে বসে পড়ে বলতে লাগলেন, 'যোগানন্দ চলে গেল, এ্যাঁ, যোগানন্দ চলে গেল! তাহলে তাকে তো দেখছি অন্য কোন উপায়ে জানাতে হবে।' তারপর ঘণ্টাকতক ধরে নীরবে বসে রইলেন।"

তারপর আমার দিনগুলো কাটতে লাগল বক্তৃতা দেওয়া, ক্লাস নেওয়া, দেখাসাক্ষাৎ করা আর পুরানো বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে। শুকনো হাসির তলায় চাপা আর অবিরল কর্মব্যস্ত জীবনের

মধ্য দিয়ে একটা ঘন অন্ধতমিস্র বিষাদের স্রোত যা বয়ে চলেছিল, তা আমার সকল অনুভূতির বালুতটের মধ্য দিয়ে দুকূল পরিপ্লাবিত করে যে আনন্দের নদী এতদিন ধরে অবিরামগতিতে বয়ে চলেছিল, তাকে একেবারে পঙ্কিল করে তুলল।

শোকদগ্ধ বিষাদখিন্ন অন্তর থেকে একটা নীরব ক্রন্দন অবিরাম ধ্বনিত হয়ে উঠতে লাগল, "দেবতা আমার, গুরুজী আমার, কোথায় গেলেন?"

কোন উত্তর পেলাম না!

মন শুধু এই আশ্বাস দিল, মাত্র এইটুকু সান্ত্বনা পেলাম যে, "ভালই হয়েছে — গুরুদেবের সেই পরমানন্দময়ের সাথে পরিপূর্ণ মিলন হয়েছে। তিনি সেই অনন্তস্বর্গে, সেই অমরলোকে আজ চিরবিরাজমান।"

মন ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, "আর তো তুমি কখনও তাঁকে শ্রীরামপুরের বাড়িতে দেখতে পাবে না। আর তো তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবদের ডেকে এনে তাঁকে দেখিয়ে সগর্বে বলতে পারবে না, 'তোমরা দেখ গো সব দেখ, ঐ ভারতের জ্ঞানাবতার বসে রয়েছেন।'"

জুন মাসের গোড়ার দিকে রাইট সাহেব বোম্বাই থেকে জাহাজে আমাদের সবাইকার ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে ফেলল। মে মাসের পক্ষকাল বিদায় ভোজে আর বক্তৃতা দিয়ে কোলকাতায় কাটাবার পর, মিস ব্লেচ, মিস্টার রাইট আর আমি ফোর্ডগাড়িতে করে বোম্বাই-এর পথে বেরিয়ে পড়লাম। সেখানে পৌঁছবার পর জাহাজ কর্তৃপক্ষ আমাদের যাত্রা স্থগিত রাখবার জন্যে বলল, কারণ ফোর্ডগাড়িটির সে জাহাজে স্থান হবার কোন উপায় ছিল না, অথচ ইউরোপে আবার সেটিকে নিতান্তই দরকার।

মুখ অন্ধকার করে রাইট সাহেবকে আমি বললাম, "কুছ পরোয়া নেই, আমি আবার পুরীতেই ফিরে যাব।" মনে মনে বললাম, "গুরুজীর সমাধি আবার আমার দু'টি নয়নের জলে সিক্ত হয়ে উঠুক।"

৪৩ পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর পুনরুত্থান

বোম্বাই-এর রিজেন্ট হোটেলে আমার ঘরে বসে আছি। রাস্তার ওধারে একটা প্রকাণ্ড উঁচু বাড়ি। তিনতলার ঘরের খোলা বড় জানালার ভিতর দিয়ে তার ছাদের দিকে চেয়ে আছি — হঠাৎ চোখের সামনে একটা অদ্ভুত দৃশ্য ভেসে উঠল। বিরাট অত্যুজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবয়ব পুণ্যমূর্তির আবির্ভাব ঘটল। কি অপরূপ সে রূপের মাধুরী!

পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ আমার দিকে হাত নাড়লেন, এবং মৃদুহাসিতে ও মাথা নেড়ে শুভেচ্ছা জানালেন। তাঁর ইঙ্গিতের মর্ম সম্যক অবগত না হওয়াতে তিনি আশীর্বাদ করে প্রস্থান করলেন; জীবন ধন্য হল, মন অনাবিল গভীর আনন্দরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল — বুঝলাম আগামী কোন আধ্যাত্মিক ঘটনার এ একটা পূর্বাভাস।

আমার পশ্চিমগমন তখন সাময়িকভাবে স্থগিত রয়েছে। কোলকাতা ও পুরীতে ফিরে যাবার পূর্বে বোম্বাইয়ে আমার গোটাকতক বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল।

১৯৩৬ সালের ১৯শে জুন তারিখে বেলা ৩টা নাগাদ বোম্বাইয়ের হোটেলে আমার বিছানার উপর বসে আছি — সেটা আমার শ্রীকৃষ্ণের দিব্য দর্শনের ঠিক এক সপ্তাহ পরের কথা — হঠাৎ একটা অপরূপ সুন্দর স্বর্গীয় জ্যোতিঃস্ফুরণে আমার ধ্যান টুটে গেল। আমার খোলা আর বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নের সম্মুখে এক অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল — সারা ঘরটা যেন একটা অত্যাশ্চর্য জগতে রূপান্তরিত হল। সূর্যালোক পরিবর্তিত হয়ে স্বর্গীয় আলোর দীপ্তিতে পরিণত হলো!

চোখের সামনে দেখলাম, রক্তমাংসের শরীরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। একটা প্রচণ্ড আনন্দের প্রবাহ আমার সর্বশরীর দিয়ে বয়ে গেল।

গুরুদেবের মুখে অমিয়নিষ্যন্দী দেবদুর্লভ সুমধুর হাসি। স্নিগ্ধকোমল কণ্ঠে বললেন, 'বৎস যোগানন্দ!'

জীবনে সেই প্রথম গুরুর চরণতলে নতজানু হয়ে প্রণাম করতে ভুলে গেলাম; কিন্তু মুহূর্তমধ্যে তাঁকে বাহুযুগলে আঁকড়িয়ে ধরে আমার তৃষিত ক্ষুধার্ত হৃদয়ে আকর্ষণ করবার জন্যে মন উদ্দাম হয়ে উঠল। সে এক অপূর্ব মুহূর্ত! গত কয়েকমাসের বিরহযন্ত্রণাক্লিষ্ট মনের গুরুভার লঘু হয়ে আজকের এই আনন্দের পাগলাঝোরার মধ্যে কোথায় তলিয়ে গিয়ে হারিয়ে গেল, তা কে জানে?

"গুরুজী আমার, হে হৃদিবল্লভ, কেন আপনি আমায় ছেড়ে গেলেন — কেন, কেন?" আনন্দের উত্তেজনায় তখন কি যে বলতে লাগলাম কিছুই মনে নেই। "কেন আপনি আমায় কুম্ভমেলায় যেতে দিলেন? আপনাকে ছেড়ে চলে আসার ভুলের জন্য নিজেকে যে কত অভিশাপ দিয়েছি, তা আর কি বলব!"

"বাবাজীর সঙ্গে যেখানে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল, সেই তীর্থস্থান দর্শন করবার তোমার আনন্দের আশায় আমি বাধা দিতে ইচ্ছে করিনি। তোমাকে তো অল্প কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে এসেছি; আবার ত' তোমার কাছে ফিরেও এসেছি।"

"কিন্তু, কিন্তু গুরুদেব, একি সত্যিই আপনি, সেই ঈশ্বরের পশুরাজ, আমাদের জ্ঞানাবতার মহাগুরু? পুরীর নিষ্ঠুর মাটির তলায় যে দেহ সমাধি দিয়ে এসেছি, আপনি কি সেইরকম একটা দেহ ধারণ করে এসেছেন বলুন! বলুন!"

"হ্যাঁ, বৎস; আমিই সেই! এটা রক্তমাংসেরই শরীর জেনো। যদিও আমার দৃষ্টিতে এটা সূক্ষ্ম কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে এটা এক জড়দেহ মাত্র। তোমার স্বপ্নজগতের পুরীধামে স্বপ্নবালুকার নীচে বিশ্বস্বপ্নে গড়া যে জড়দেহ তুমি সমাধি দিয়ে এসেছ, ঠিক তারই মত একটি সম্পূর্ণ নূতন দেহ আমি মহাব্যোমপরমাণু থেকে সৃষ্টি করে নিয়েছি। সত্যি কথা বলতে গেলে মৃতাবস্থা থেকে আমি পুনরুত্থিত হয়েছি — এ পৃথিবীতে নয় — সূক্ষ্ম জগতে! পৃথিবীর লোকেদের চেয়ে সেখানকার অধিবাসীরা আমার

উচ্চাবস্থার সম্মুখীন হতে বেশি সমর্থ। সেখানে তুমি আর তোমার অতি আদরের প্রিয়তম আত্মীয়বান্ধবেরা এককালে সকলেই আমার কাছে আসবে।”

“মরণজয়ী গুরুদেব, বলুন বলুন, আরও কিছু আমায় বলুন।”

গুরুজী একটু দ্রুত উচ্চহাস্য করে বললেন, “আরে বাপু, ছাড়, ছাড়, তোমার আলিঙ্গন একটু ঢিলে কর!”

অক্টোপাসের মত আমার দৃঢ়বন্ধন সামান্য আলগা করে বললাম ঃ “আচ্ছা, কেবল একটুখানি!” পূর্বে তাঁর পার্থিব শরীরের যেটা বৈশিষ্ট্য ছিল ঠিক সেই একইরকম মৃদু সুরভির স্বাভাবিক গন্ধই টের পেলাম। যখন সেই আনন্দোজ্জ্বল গৌরবময় পরম মুহূর্তগুলির কথা মনে পড়ে, তখন তাঁর সেই দিব্যশরীরের প্রাণোন্মাদনাকারী স্পর্শ আজও আমার দুইবাহু ও করতলের মধ্যে অনুভব করি।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, “জড়জগতে মানুষের কর্ম্মক্ষয়ে সাহায্য করতে যেমন মহাপুরুষেরা প্রেরিত হন — আমিও তেমনি এক সূক্ষ্মজগতে মুক্তিদাতারূপে কাজ করবার জন্যে ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছি। আমি যেখানে এসেছি সে জায়গাটার নাম হচ্ছে ‘হিরণ্যলোক’। সেখানে উচ্চস্তরের জীবদের তাঁদের সূক্ষ্মজগতের কর্মফল থেকে মুক্ত হয়ে সূক্ষ্মজগতে পুনর্জন্ম করা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি সাহায্য করছি। হিরণ্যলোকবাসীরা আধ্যাত্মিকতায় খুব উচ্চাবস্থা লাভ করেছেন; তাঁদের সকলেই শেষ পার্থিবজন্মে মৃত্যুকালে সমাধিমগ্ন হয়ে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করবার ক্ষমতা ধ্যানবলে লাভ করেছেন। আর পৃথিবীতে যাঁরা ‘সবিকল্প সমাধির’ অবস্থা অতিক্রম করে ‘নির্বিকল্প সমাধির’ উচ্চাবস্থায় না পৌঁচেছেন, তাঁদের কেউই হিরণ্যলোকে প্রবেশ করতে পারেন না।*

---

* ‘সবিকল্প সমাধিতে’ সাধক ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ করেন বটে, কিন্তু কালে নিশ্চল তন্দ্রাবস্থা ভিন্ন তিনি ব্রহ্মচৈতন্যে স্থিত হতে পারেন না। সুদীর্ঘ ও গভীর ধ্যানাভ্যাসের মাধ্যমে তিনি আরও উচ্চতর অবস্থা, ‘নির্বিকল্প সমাধিতে’ আরোহণ করতে পারেন, যেখান থেকে তিনি ঈশ্বরোপলব্ধিচ্যুত না হয়েও সংসারে ইচ্ছামত বিচরণ করে থাকেন।

নির্বিকল্প সমাধিতে যোগি তাঁর পার্থিব কর্মের শেষ নিদর্শনটুকুও ক্ষয় করে ফেলেন। তথাপি তাঁকে কতকগুলি সূক্ষ্ম ও কারণজগতের কর্ম ক্ষয় করতে হয়; কাজেই তাঁকে আরও উচ্চতর স্তরের সূক্ষ্ম ও কারণদেহ পুনরায় ধারণ করতে হয়।

"হিরণ্যলোকের অধিবাসীরা সূক্ষ্মলোকের সাধারণ স্তরগুলি অতিক্রম করে এসেছেন, যেখানে মৃত্যুর পর পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষকে অবশ্যই যেতে হবে; সেই সব সূক্ষ্মলোকে তাঁরা তাঁদের সূক্ষ্মজগতের বহু প্রাক্তনকর্মের বীজের বিনাশ সাধন করে এসেছেন। খুব অগ্রসর আর উচ্চস্তরের জীব ছাড়া সূক্ষ্মজগতে এ রকম মুক্তিদায়ক কাজ আর কেউ কৃতিত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে করতে পারে না।* তারপর তাদের সূক্ষ্মজগতের সকল প্রকার কর্মবন্ধনের লেশমাত্র পরিণাম থেকে পরিপূর্ণ মুক্তিলাভের জন্যে বিশ্ববিধান অনুযায়ী এইসব উচ্চস্তরের জীব হিরণ্যলোকে নূতন দেহধারণ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। হিরণ্যলোক হচ্ছে সূক্ষ্মলোকের সূর্য বা স্বর্গ, যেখানে তাদের সাহায্য করবার কাজে আমি উপস্থিত হয়েছি। অবশ্য প্রায় পূর্ণ জীবেরাও হিরণ্যলোকে বাস করেন — তাঁরা উচ্চ কারণজগৎ হতে এসেছেন।"

গুরুদেবের মনের সঙ্গে আমার মনের তখন এমন পরিপূর্ণ ঐক্য সংসাধিত হয়েছিল যে, তিনি আংশিক বাক্যে আর আংশিক চিন্তাপরিচালনার দ্বারা আমার মনে একটি সম্পূর্ণ শব্দচিত্র অঙ্কিত করে দিচ্ছিলেন। তাই তাঁর মূর্ত ভাবসকল আমি অতি শীঘ্রই গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

গুরুদেব বলতে লাগলেন, "তুমি তো শাস্ত্রে পড়েছ যে ঈশ্বর মানবাত্মাকে পর্যায়ক্রমে তিনটি শরীরে আবদ্ধ করে রেখেছেন — ভাব অথবা কারণশরীর, সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহ — মানবের মানসিক আর ভাবপ্রকৃতির স্থান; আর এই পঞ্চভৌতিক জড়দেহ। মানুষ পৃথিবীতে এসে তার জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলি লাভ করে। কিন্তু একজন সূক্ষ্মলোকবাসী তার চেতনজ্ঞান, অনুভূতি আর প্রাণকণিকা† সংগঠিত দেহ নিয়ে কাজ করে।

---

* কারণ বহুলোকেই সূক্ষ্মজগতের আনন্দ ও সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার কৃচ্ছ্রসাধনের কোন প্রয়োজনই অনুভব করে না।

† শ্রীযুক্তেশ্বরজী "প্রাণ" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন; আমি তাকে "লাইফট্রন" বলে উল্লেখ করেছি। হিন্দুশাস্ত্রে শুধু যে কেবল "অণু" এবং "পরমাণু" অথবা সূক্ষ্মতর পরমাণবিক শক্তির উল্লেখ আছে তাই নয়; "প্রাণ" অর্থাৎ "সৃজনক্ষম লাইফট্রনের"ও উল্লেখ আছে। অণুপরমাণু বা বিদ্যুতিনসকল অন্ধশক্তি; "প্রাণ" স্বতঃই চৈতন্যময়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, শুক্রকীট এবং ডিম্বাণুতে "জীবনীশক্তিবিশিষ্ট প্রাণকণিকা" সকল কর্মবন্ধানুসারে ভ্রূণবৃদ্ধির গতি নিয়ন্ত্রণ করে।

কারণশরীরধারী জীব আনন্দময় ভাবরাজ্যে বিচরণ করে। আমার কাজ হচ্ছে সেইসব সূক্ষ্মলোকবাসীদের সঙ্গে, যাঁরা কারণজগতে প্রবেশ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।”

“পূজ্যপাদ গুরুদেব, পরজগৎ সম্বন্ধে আমায় আরও কিছু বলুন।” তখনও কিন্তু শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীকে আমি তেমনি আঁকড়ে ধরে রয়েছি। যদিও তাঁর অনুরোধে একটু আল্‌গা করে আমি তাঁকে ধরেছিলাম বটে কিন্তু একেবারে ছাড়িনি। আর ছাড়বই বা কি করে, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন, — আমার গুরুদেব আজ মৃত্যুকে দলিত, মথিত, পর্যুদস্ত করে আমার কাছে এসে যখন পৌঁচেছেন, তখন তাঁকে কি আজ আর ছাড়তে পারি?

গুরুদেব বলতে লাগলেন, “এমন সব সূক্ষ্মজগৎ আছে যেখানে বহু বহু আত্মিকের বাস। সেই সব আত্মিকেরা সূক্ষ্মবাহন অথবা আলোকপিণ্ডের সাহায্যে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণ করেন — বিদ্যুৎ আর তেজস্ক্রিয় শক্তিসকলের চাইতেও দ্রুতবেগে।

“আত্মিক বা পারলৌকিক জগৎ আলোক আর বর্ণের বিভিন্ন সূক্ষ্মস্পন্দনে গঠিত, আর তা হচ্ছে এই জড়বিশ্ব হতে শত শত গুণ বড়! এই সমগ্র ভৌতজগত, একটা ছোট্ট কঠিন ঝুড়ির মত সূক্ষ্মলোকের প্রকাণ্ড আলোর বেলুনের তলায় ঝুলছে। মহাশূন্যে যেমন আমাদের জড়জগতের বহু সূর্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্ররা সব পরিভ্রমণ করে, তেমনি সূক্ষ্মজগতেও অনেক নক্ষত্রপুঞ্জ আছে যা ভৌত চন্দ্র-সূর্যের চেয়েও সুন্দর। সূক্ষ্মজগতের জ্যোতিষ্কমণ্ডল দেখতে আমাদের পৃথিবীর অরোরা বোরিয়ালিসের মত। সূক্ষ্মজগতের সূর্যমেরুচ্ছটা, স্নিগ্ধকিরণ চন্দ্রমেরুচ্ছটার চেয়ে অধিক উজ্জ্বল। সূক্ষ্মজগতের দিনরাত পৃথিবীর দিনরাতের চেয়েও দীর্ঘতর।”

“সূক্ষ্মজগৎ এখানকার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, পবিত্র আর সুশৃঙ্খল। সেখানে কোন নির্জীব গ্রহ বা পতিত ভূমি নাই। আমাদের এই পৃথিবীর অভিশাপগুলো — আগাছা, জীবাণু, পোকামাকড়, সাপ ইত্যাদি — সেখানে একেবারেই নেই; পৃথিবীর মত সেখানে পরিবর্তনশীল জলবায়ু বা ঋতুও নেই; সূক্ষ্মগ্রহে আছে চিরবসন্তের

নাতিশীতোষ্ণ তাপ, আর মাঝে মাঝে আলোকজ্জ্বল শুভ্র তুষার ও বিচিত্রবর্ণের আলোকবৃষ্টি। সূক্ষ্মগ্রহে আছে দুগ্ধশুভ্র হ্রদ, উজ্জ্বল সমুদ্র, আর রামধনুরঙের নদী।

"সাধারণ সূক্ষ্মলোক — যা হিরণ্যলোকের মত সূক্ষ্মতর পরলোকের স্বর্গ নয় — সে স্থান পৃথিবী হতে সদ্য বা স্বল্প পূর্বে আগত কোটি কোটি আত্মিকের দ্বারা পূর্ণ; আর আছে সেখানে অসংখ্য পরী, মৎস্যকন্যা, মৎস্যকুল, জীবজন্তু, অপদেবতা, বামন, উপদেবতা আর প্রেতাত্মাসকল — এরা বিভিন্ন সূক্ষ্মলোকে তাদের নিজ নিজ কর্মের গুণাগুণ অনুযায়ী স্থান পেয়েছে। নানাবিধ স্তরের আবাস অথবা স্পন্দনভূমি, শুভ বা দুষ্ট আত্মিকদের জন্য আলাদা করা আছে। শুভ আত্মারা সর্বত্র অবাধে বিচরণ করতে পারেন, কিন্তু দুষ্ট আত্মাদের গতিবিধি নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। পৃথিবীতে যেমন মানুষ ধরাপৃষ্ঠে বাস করে, মাটিতে কীটপতঙ্গ, জলেতে মৎস্যকুল, আকাশে পক্ষী, তেমনি বিভিন্ন স্তরের সূক্ষ্মজীবের বসবাসের জন্য উপযুক্ত স্পন্দনবিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট করা আছে।

"যে সব পতিত দেবদূতেরা অন্য জগৎ হতে বিতাড়িত হয়ে এসে পড়েন, তাদের মধ্যে "প্রাণ" পরমাণবিক বোমা অথবা মানসিক মন্ত্রশক্তির* সাহায্যে সংঘর্ষ বা যুদ্ধ বাধে। তারা প্রেতলোকের অন্ধকারাচ্ছন্ন নিম্নস্তরে বাস করে তাদের দুষ্ট কর্মক্ষয় করে।"

"প্রেতলোকের অন্ধকার কারাগারের উপরে যে সকল বিরাটভূমি রয়েছে, সেখানে যা কিছু আছে সবই উজ্জ্বল, সবই সুন্দর। পরজগৎ স্বভাবতঃই ঈশ্বরের অভিপ্রায় আর পূর্ণতালাভের পরিকল্পনায় পৃথিবী অপেক্ষা অধিকতর উপযোগী। সূক্ষ্মজগতের প্রত্যেক বস্তুই প্রথমতঃ ঈশ্বরের ইচ্ছায় আর আংশিকভাবে আত্মিকগণের ইচ্ছার আহ্বানে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরসৃষ্ট যে কোন বস্তুর আকৃতি বা কমনীয়তার পরিবর্তন

---

* এইসব মন্ত্র হচ্ছে উচ্চারিত শব্দবীজ, যা মনে মনে গভীর ধ্যানসংযোগে কামানের মত নিক্ষিপ্ত হয়। পুরাণে দেবাসুরের মধ্যে এইরূপ মন্ত্রযুদ্ধের বিষয় বর্ণনা করা আছে। একবার এক অসুর কোন দেবতাকে শক্তিশালী মন্ত্রপ্রয়োগে হত্যা করবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভুল উচ্চারণবশতঃ মন্ত্র ব্যুমেরাং হয়ে সেই অসুরকেই বিনষ্ট করে।

বা পরিবর্ধন করবার ক্ষমতা এইসব আত্মিকগণের আছে। ঈশ্বর তাঁর সূক্ষ্মলোকের সন্তানদের পরজগতে সূক্ষ্মবস্তুর ইচ্ছামাত্র পরিবর্তন বা পুনঃসংযোজনের স্বাধীনতা আর অধিকার দান করেছেন। পৃথিবীতে, কোন কঠিন বস্তুকে তরল বা অন্য কোন আকারে পরিবর্তিত করতে হলে স্বাভাবিক কিম্বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবশ্যক; কিন্তু সূক্ষ্মজগতের কোন কঠিনবস্তু তৎক্ষণাৎ সেখানকার তরল, বায়বীয় অথবা আণবিক শক্তিতে পরিণত হয়, সেখানকার অধিবাসীদের একমাত্র ইচ্ছাশক্তি বলেই।"

গুরুদেব বলতে লাগলেন, "পৃথিবী আজ জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সর্বত্র যুদ্ধবিগ্রহ আর হত্যাকাণ্ডে কলঙ্কিত; কিন্তু সূক্ষ্মলোকে একটা সুখময় সাম্য আর সুসঙ্গতির শান্তি চিরবিরাজমান। সূক্ষ্মশরীরিগণ ইচ্ছামাত্র রূপ পরিগ্রহ করতে পারেন বা অদৃশ্য হতে পারেন। সেখানকার ফুল, মাছ বা জীবজন্তু, সাময়িকভাবে নিজেদেরকে পরলোকবাসীদের মূর্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। সকল সূক্ষ্মদেহীদেরই যে কোন আকৃতি ধারণ করবার স্বাধীনতা আছে, এবং তারা অতি সহজে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনও করতে পারে। কোনরকম স্থির, নির্দিষ্ট, প্রাকৃতিক নিয়ম তাদের বেঁধে রাখেনি — উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, সূক্ষ্মলোকের একটা গাছ থেকে সেখানকার আম, কিম্বা অন্য কোন ফল, ফুল বা যে কোন ঈপ্সিত বস্তু সফলতার সঙ্গে উৎপন্ন করা যেতে পারে। অবশ্য কর্মজনিত কতকগুলো পার্থক্য রয়েছে বই কি, কিন্তু পরলোকে বিভিন্ন আকৃতির উপযোগিতার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। সেখানকার সবই ভগবানের সৃষ্টির আলোকে দেদীপ্যমান!

"জননীগর্ভে সেখানে কারোর জন্ম হয় না; সন্তান আবির্ভূত হয় পরলোকের মূর্তপ্রকাশে বিশিষ্ট রূপধারণ করে, সেখানকার অধিবাসীদের ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে। সদ্য জড়দেহমুক্ত জীব পরলোকের পরিবারের মধ্যে এসে পড়ে তাদের আহ্বানে — একইরকম মানসিক আর আধ্যাত্মিক বৃত্তির আকর্ষণে।

"সূক্ষ্মদেহ শীতোষ্ণ বা অন্য কোনপ্রকার প্রাকৃতিক অবস্থার বশীভূত নয়। সূক্ষ্ম শরীরসংস্থানে আছে সূক্ষ্মমস্তিষ্ক, যাতে সর্বদর্শী সহস্রদল কমল

আংশিকভাবে সক্রিয়, আর সুষুম্না নাড়ীতে ছয়টি প্রস্ফুটিত পদ্ম বা সূক্ষ্মমস্তিষ্ক-কশেরুকাচক্র। হৃৎপিণ্ড, সূক্ষ্মমস্তিষ্ক থেকে মহাজাগতিক শক্তি আর আলোক গ্রহণ করে তাকে সূক্ষ্মতন্ত্রিকা আর শরীরকোষের ভিতরে চালিত করে। পরলোকবাসীরা "প্রাণকণিকা" শক্তি অথবা পূত মন্ত্রশক্তিবলে তাদের আকৃতির পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

"মূলতঃ সূক্ষ্মশরীর হচ্ছে শেষ জড়দেহের অবিকল প্রতিলিপি। আত্মিকদের মুখ আর দেহ তাদের পূর্বজন্মের যৌবনকালীন পার্থিবদেহের সাদৃশ্য বহন করে; কখনও কখনও তারা ইচ্ছা করলে, এই আমার মত, তাদের বৃদ্ধবয়সের মূর্তিও ধারণ করতে পারে।" বলেই গুরুদেব যৌবনসুলভ উল্লাসের সঙ্গে হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

তারপর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, "সূক্ষ্মজগৎ ত্রৈমাত্রিক আয়তন বিশিষ্ট পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগতের মত নয়; সেখানকার বিভিন্নস্তর, আর একটি ইন্দ্রিয়, সর্বগ্রাহী ষষ্ঠেন্দ্রিয় — যাকে স্বজ্ঞা বলে, তার দ্বারা সব কিছু দেখা যায়। কেবলমাত্র স্বজ্ঞাত অনুভূতি দ্বারা সকল সূক্ষ্মশরীরীরা দেখা, শোনা, গন্ধ, স্পর্শ, স্বাদ গ্রহণ করা, সব কাজই চালাতে পারে। তাদের তিনটি নয়ন, যার দু'টি সাধারণতঃ অর্ধনিমীলিত থাকে। আর তৃতীয়টি — যেটি প্রধান, সে'টি কপালের মাঝখানে লম্বালম্বিভাবে থাকে, সে'টি উন্মুক্ত। আত্মিকদের সকল প্রকার বহিরিন্দ্রিয়ই আছে — চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, — কিন্তু তারা শরীরের যে কোন অংশ দিয়েই স্বজ্ঞাত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সবরকম সংবেদনেরই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে; কর্ণ, নাসিকা, এমন কি চর্মের সাহায্যেও তারা সব কিছু দেখতে পারে। জিহ্বা বা চক্ষুর সাহায্যে তারা শ্রবণ করতে পারে, কিম্বা কর্ণ বা ত্বকের সাহায্যে তারা আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে — এমনি সব আর কি।*

"মানুষের জড়দেহ অসংখ্য বিপদের সম্মুখীন, আর তা সহজেই আঘাতপ্রাপ্ত বা অঙ্গহীন হতে পারে; কিন্তু অতিসূক্ষ্ম আত্মিকদেহ কখনও

---

* এমন কি এই পৃথিবীতেও হেলেন কেলার এবং কিছু বিরলজনের মধ্যে এরূপ শক্তির উদাহরণের অভাব নেই।

কখনও হয় তো বা কেটে যেতে বা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু ইচ্ছামাত্র তা আবার সুস্থও হয়ে উঠতে পারে।”

“গুরুদেব, পরলোকবাসীরা কি সবাই দেখতে সুন্দর?”

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী তাতে বললেন, “সূক্ষ্মজগতে সৌন্দর্য একটা আধ্যাত্মিকগুণ বলেই বিবেচিত, সেটা কোন বাহ্যিক সৌষ্ঠব নয়। কাজে কাজেই পরলোকবাসীরা মুখের সৌন্দর্য বাড়ানর দিকে বেশি নজর দেয় না। কিন্তু তাদের আর একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে — তারা ইচ্ছামাত্র বর্ণোজ্জ্বল নব আত্মিকদেহ গঠন করে নিতে পারে। উৎসব উপলক্ষ্যে পৃথিবীর মানুষেরা যেমন নূতন বসনভূষণে সজ্জিত হয়, আত্মিকেরাও তেমনি সেইরকম কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন রূপ ধারণ করে নিজেদের সুসজ্জিত করবার সুযোগলাভ করে।

“হিরণ্যলোকের মত পরলোকের উচ্চতর সূক্ষ্মলোকে পারলৌকিক আনন্দোৎসব শুরু হয়, যখন কোন জীব আধ্যাত্মিক উন্নতিবলে আত্মিক জগৎ হতে মুক্তিলাভ করে কারণজগতের স্বর্গে প্রবেশ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়। ঐ উপলক্ষ্যে আমাদের নয়নের অগোচর পরমপিতা পরমেশ্বর, আর যে সব সাধুসন্তরা তাঁর কোলে আশ্রয় পেয়েছেন — তাঁরা তাঁদের ইচ্ছামত রূপধারণ করে পারলৌকিক উৎসবে যোগদান করেন। তাঁর প্রিয় সন্তানকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে ভগবান তার যে কোন ঈপ্সিত রূপ ধারণ করেন। শুদ্ধাভক্তি নিয়ে সাধন করলে পর ভক্ত তাঁকে জগজ্জননীমূর্তিতে দর্শন পায়। যীশুখ্রিস্টের কাছে ভগবানের পিতৃভাবই অন্যান্য ভাবের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ছিল। সৃষ্টিকর্তা তাঁর সৃষ্টজীবদের প্রত্যেককে যে স্বাতন্ত্র্যতা, যে স্বাধীনতা দিয়েছেন, তাতে করে ভগবানের অনন্তরূপের মধ্যে, যতরকম সম্ভাব্য আর অসম্ভাব্য রূপদর্শনের তারা প্রার্থনা করে; কাজেই ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে তাঁকেও সেইপ্রকার রূপ ধারণ করে তাদের তৃপ্ত করতে হয়।” গুরুদেব আর আমি দু’জনেই একসঙ্গে হেসে উঠলাম।

বাঁশীর মত মনোহর সুমধুরস্বরে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আবার বলতে শুরু করলেন ঃ “পরলোকে পূর্ব পূর্ব জন্মের বন্ধুরা পরস্পর পরস্পরকে

অতি সহজেই চিনতে পারে। দুঃখ আর মোহময় পার্থিবজীবনের অবসানকালে প্রেমের অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, আবার তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আর অক্ষয় বন্ধুত্বের আনন্দ উপভোগ করে, সেই প্রেমের অমরত্ব সহজেই উপলব্ধি করতে পারে।

"সূক্ষ্মশরীরীদের স্বজ্ঞা, অন্ধকার যবনিকা ভেদ করে পৃথিবীর মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই দেখতে পায়; মানুষ কিন্তু পরলোকের কিছুই দেখতে পায় না — যতক্ষণ না তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় অন্ততঃ কিছুটাও উন্নতিলাভ করছে। অবশ্য এটাও সত্যি যে হাজার হাজার পৃথিবীবাসী অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যেও পরলোক বা সেখানকার অধিবাসীদের দেখা পেয়েছে।*

"হিরণ্যলোকের উন্নত আত্মিকেরা পরলোকের দীর্ঘ রাত্রি বা দিবস, নির্বিকল্প সমাধির পরমানন্দময় জাগ্রত অবস্থায় যাপন করে, আর তাদের কাজ হচ্ছে — বিশ্বপরিচালন ব্যাপারে জটিল সমস্যার সমাধান, ও পৃথ্বীবদ্ধ আত্মা, সংসারবদ্ধ জীবের মুক্তিসাধনে সাহায্য করা। হিরণ্যলোকের অধিবাসীরা যখন নিদ্রা যায়, তখন মাঝে মাঝে তাদের স্বপ্নের মত আত্মিকদর্শনলাভ হয়।

"কিন্তু তা হলে কি হয়, পরলোকের সকল স্তরের অধিবাসীরা তবুও মানসিক দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণাভোগের অধীন থাকে। হিরণ্যলোকের মত গ্রহের উচ্চতর জীবেদের সংবেদনশীল মনে কোন সদাচরণ অথবা সত্যোপলব্ধি বিষয়ে কোন ভুলভ্রান্তি উপস্থিত হলে তারা দারুণ যন্ত্রণাই ভোগ করে। এইসব উচ্চাবস্থার জীবেরা, তাদের প্রত্যেক কার্য বা চিন্তা আধ্যাত্মিকবিধি অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে।

"পরলোকবাসীদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগরক্ষা সম্পূর্ণভাবে পারলৌকিক দূরদর্শন বা দূরশ্রবণ ব্যবস্থার সাহায্যেই সম্পাদিত হয়; লেখা

---

* পৃথিবীতে নির্মলমন শিশুরা কখনও কখনও পরী প্রভৃতির সূক্ষ্মদেহের দর্শনলাভে সমর্থ হয়েছে।

ঔষধ অথবা মাদক পানীয়ের সাহায্যে — যাদের ব্যবহার সকল শাস্ত্রেই নিষিদ্ধ — কোন মানুষের মনে এমন বিকৃতিসাধন হতে পারে যে, তাতে করে সে পরলোকের নরকের বীভৎস আকৃতি বা দৃশ্য দর্শন করতে পারে।

আর কথ্য ভাষার মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি পার্থিব মানুষের মধ্যে হতে বাধ্য, সেরকম কোন গোলমাল বা ভুলভ্রান্তি সেখানে কখনও হয় না। চলচ্চিত্রের পর্দায় কতকগুলি আলোর ছবির সাহায্যে লোকেরা চলাফেরা করছে, কাজকর্ম করছে বা হাত পা নাড়ছে দেখা যায়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কোন শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে না। তেমনি পরলোকবাসীরাও সুপরিচালিত আর সুবিন্যস্ত আলোর ছবিদের মতই চলাফেরা করে, কাজকর্ম করে, তার জন্যে তাদের অক্‌সিজেন থেকে শক্তিসংগ্রহের কোন প্রয়োজন হয় না। মানুষকে জীবনধারণের জন্য নির্ভর করতে হয় কঠিন, তরল, বায়বীয় পদার্থসমূহ আর শক্তির উপর; কিন্তু পরলোকবাসীরা প্রাণধারণ করে থাকে প্রধানতঃ মহাকাশের আলোক বা বিশ্বজ্যোতির উপর।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "গুরুদেব, পরলোকবাসীরা কিছু খায় কি?" গুরুদেবের পরলোকতত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যা আর সেখানকার বিশদ বিবরণ আমি আমার সকল গ্রহণক্ষম মনোবৃত্তি — অর্থাৎ আমার সমস্ত মন, হৃদয় আর আত্মা দিয়ে যেন পান করছিলাম। সত্যের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি শাশ্বত, ধ্রুব এবং অপরিবর্তনীয়। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়ানুভূতি আর মনের মধ্যে তার যে প্রভাব, তা সাময়িক বা আপেক্ষিকভাবে সত্য বলে বোধ হওয়া ছাড়া আর বেশি কিছু নয়। আর স্মৃতির মধ্যে তাদের স্পষ্টতা অতি শীঘ্রই ম্লান হয়ে যায়। গুরুদেবের কথাগুলি আমার মানসপটে এমন গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছে যে, আমার মনকে যে কোন সময়ে অতিমানস চৈতন্যে উপনীত করে আমি সেই দিব্য অভিজ্ঞতা পুনরুজ্জীবিত করতে পারি।

তিনি তা শুনে বললেন, "আত্মিক ভূমিতে উজ্জ্বল আলোক রশ্মির মত প্রচুর তরিতরকারি জন্মায়। পরলোকবাসীরা এইসব তরিতরকারি আহার করে, আর পরলোকের নদী, স্রোতস্বিনী আর উজ্জ্বল আলোকের উৎস হতে প্রবাহিত অমৃতোপম সুমধুর ধারা পান করে। পৃথিবীতে যেমন অদৃশ্য লোকেদের মূর্তিসকল ইথর তরঙ্গের মধ্য থেকে টেলিভিশন (দূরদর্শন) যন্ত্রসাহায্যে ধরে দৃষ্টিগোচর করা যায়, আবার পরে তাকে মহাশূন্যে মিলিয়ে দিতে পারা যায়, সেইরকম ঈশ্বরসৃষ্ট, ইথারে ভাসমান শাকসব্জি,

বৃক্ষলতাদির অদৃশ্য পারলৌকিক রেখাচিত্রাঙ্কন সেখানকার গ্রহের অধিবাসীদের আদেশমাত্রই উৎপন্ন করা যায়। ঐরকম একই উপায়ে এইসব আত্মিকদের উদ্দাম কল্পনানুযায়ী বিরাট উদ্যানসকলকে রূপায়িত করে পরে আবার ইথারের অদৃশ্যতার মধ্যে বিলীন করে দেওয়াও যায়। যদিও হিরণ্যলোকের মত স্বর্গলোকবাসীদের পান-ভোজনের কোন কিছুরই দরকার হয় না, তেমনি কারণজগতের প্রায় পূর্ণমুক্ত বন্ধনহীন আত্মাদের আরও উচ্চস্তরের জীবন, পরমানন্দের অমিয়ধারা পান ছাড়া আর কিছুরই দরকার করে না।

"পৃথিবী হতে মুক্ত আত্মা এখানে এসে পৃথিবীতে তার নানা জন্মের* পরিচিত পিতামাতা, ভাইভগ্নী, স্বামীস্ত্রী, পুত্রপরিবার প্রভৃতি অসংখ্য আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধবাদি প্রিয়জনসমূহের সাক্ষাৎ পায়; সময় সময় পরলোক রাজ্যে নানা অংশে এসে তারা দেখা দেয়। তাতে করে সে বেচারা বড় মুশকিলেই পড়ে যায় — কারণ কাকে সে যে বেশি করে ভালবাসবে তা ঠিক করে উঠতে পারে না; কাজেকাজেই তাকে এইভাবে সবাইকে ঈশ্বরের সন্তান আর তাঁর ব্যক্তিগত মূর্ত প্রকাশ বলে মনে করে সকলের প্রতি সমানভাবে দিব্যপ্রেম বিতরণ করতে শিক্ষা করতে হয়।

যদিবা কোন প্রিয়জনের বাহ্যিক আকৃতির পরিবর্তন ঘটে (অল্পবিস্তর তাদের পূর্বজন্মের কোন নূতন গুণের উন্নতির ফলে) তবুও পরলোকবাসী তার সহজ ও নির্ভুল স্বজ্ঞার সাহায্যে অন্য গ্রহে বা স্তরে, এককালে যারা তার অতিশয় প্রিয় ছিল, তাদের তৎক্ষণাৎ চিনতে পেরে নতুন পরলোকের গৃহে তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসে। সৃষ্টির প্রতিটি অণুপরমাণুর মধ্যে অষ্টবিধা প্রকৃতির† ভাবগত বৈশিষ্ট্য চিরবর্তমান থাকাতে, [illegible] আত্মিকবন্ধুকে অতি সহজেই চেনা যায়, তা সে যে রকমই রূপধারণ করুক না কেন। কি রকম জান, অভিনেতার সাজসজ্জা বা ছদ্মবেশ যতই

---

* ভগবান বুদ্ধদেবকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল — সব মানুষকেই সমানভাবে ভালবাসতে হবে কেন? তাতে সেই মহান ধর্মপ্রবর্তক উত্তর দিয়েছিলেন, "কারণ প্রত্যেক মানবের অগণিত আর বিচিত্র জীবনধারার মধ্যে অপর প্রত্যেকেই (কোন না কোনকালে) তার প্রিয় ছিল।"

† অণুপরমাণু হতে মানুষ পর্যন্ত সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে অষ্টবিধা প্রকৃতির গুণ বর্তমান — ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। *(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা — ৭ম অধ্যায়, ৪ শ্লোক।)*

ভাল হোক না কেন, তার আসলরূপ একটু খুঁটিয়ে দেখলেই ধরা পড়ে যায় — তেমনি আর কি।

"পরলোকে প্রবিষ্ট জীবের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল পৃথিবী অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ। কতকগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবের সূক্ষ্মদেহ ধারণের গড়পড়তা সময় হচ্ছে পাঁচ শত থেকে এক হাজার বৎসর (পৃথিবীর সময়ের পরিমাপে)। যেমন আমেরিকার সিকোয়া (রেডউড) গাছ অন্যান্য গাছেদের চেয়ে শতশত বৎসর বেশি বাঁচে, অথবা যেমন অধিকাংশ লোকের ষাট বছরের আগে মৃত্যু ঘটলেও অনেক যোগী কয়েক শত বৎসর ধরে বাঁচেন, তেমনি বিশিষ্ট জীবেরা পরলোকে সাধারণ অবস্থান সময় থেকে অধিককাল বসবাস করেন। সূক্ষ্মলোকে আগত আত্মিকরা তাদের পার্থিব জীবনের কর্মফল অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। তারপর আবার তারা সময় অন্তে মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন।

"পরলোকবাসীদের আর একটা সুবিধা হচ্ছে এই যে তাদের জ্যোতির্ময় দেহ ত্যাগ করবার সময় মরণের সঙ্গে আর ক্লেশকর যুদ্ধ করতে হয় না। কিন্তু তাহলে কি হয়, তবুও তাঁদের মধ্যে অনেকেই পারলৌকিক দেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্মতর কারণশরীর ধারণ করবার চিন্তায় একটু ভীত হয়ে পড়ে বই কি। পরলোক কিন্তু অনভীপ্সিত মৃত্যু, জরা বা ব্যাধি থেকে মুক্ত। এই তিনটি ভয়ই হচ্ছে পৃথিবীর অভিশাপ, যেখানে মানুষের আত্মজ্ঞান তার নশ্বর জড়দেহের সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই জড়িয়ে গিয়ে দেহটাকেই তার একমাত্র অস্তিত্ব বলে কল্পনা করে, আর তার সেই ক্ষণভঙ্গুর দেহটার অস্তিত্ব আদৌ বজায় রাখতে গিয়ে তাকে সর্বদাই বায়ু, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে হয়।

"জড়দেহের মৃত্যু হলে শ্বাসলোপ পেয়ে শরীরকোষগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। আর সূক্ষ্মদেহের মৃত্যু ঘটলে তার "প্রাণকণিকা"গুলির বিক্ষেপণ ঘটে। প্রাণশক্তির প্রকাশ এই "কণিকা"সমূহের এককগুলি হতেই সূক্ষ্মদেহীদের প্রাণ সংগঠিত। জড়দেহের মৃত্যুতে জীব তার অস্থিমাংসের দেহজ্ঞান হারিয়ে পরলোকের সূক্ষ্মদেহের বিষয় অবগত হয়। যথাকালে পরজগতে সূক্ষ্মদেহের মৃত্যুর আস্বাদন লাভ করে জীব

এই প্রকারে পরলোকের জন্ম ও মৃত্যুর অভিজ্ঞতা থেকে ফিরে গিয়ে আবার জড়জন্ম ও মৃত্যুর জ্ঞান লাভ করে। এইরকম পরলোক আর পার্থিব জন্মমৃত্যুর আবর্তনচক্রসকল অজ্ঞানী লোকেদের অপরিহার্য বিধিলিপি। স্বর্গ আর নরকের বিষয়ে শাস্ত্রের বর্ণনাতে কখনও কখনও মানুষের পরলোকের সুখময় আর পার্থিব জগতের হতাশাপূর্ণ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসমূহ তার মগ্নচৈতন্যের চেয়ে গভীরতর স্মৃতিকে আলোড়িত করে তোলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "পূজ্যপাদ গুরুদেব, আপনি পৃথিবীতে, আর সূক্ষ্ম এবং কারণজগতে পুনর্জন্মের বিবরণ একটু বিশদভাবে বলবেন কি?"

আমার পরমারাধ্য গুরুদেব তখন বুঝিয়ে বললেন, "মানুষ জীবাত্মারূপে মূলতঃ হচ্ছে কারণশরীরবিশিষ্ট। সেই শরীর হচ্ছে ঈশ্বরের পঁয়ত্রিশটি কল্পনা বা ভাবের আকর বা আশ্রয়, আর এই ভাবসমষ্টি হচ্ছে মূল অথবা কারণ চিন্তাশক্তিসমূহ, — যা থেকে তিনি পরে বিভাগ করে উনবিংশতি তত্ত্ববিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহ এবং ষোড়শ তত্ত্ববিশিষ্ট স্থূল জড়দেহ নির্মাণ করেন।

"আতিবাহিকদের উনবিংশতিতত্ত্বসকল হচ্ছে মনোময়, ভাবময়, আর প্রাণময়। এই উনিশটি উপাদান হচ্ছে — বুদ্ধি; অহঙ্কার; সংবেদন; মন (ইন্দ্রিয়জ্ঞান); চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা আর ত্বক, এদের জ্ঞানের সূক্ষ্ম প্রতিকল্প হচ্ছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; প্রজনন, নিঃসারণ, বাক্যালাপ, ভ্রমণ এবং হস্তসম্পাদ্য ক্রিয়াসাধনের মানস প্রতিরূপ হচ্ছে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়। আর হচ্ছে পঞ্চপ্রাণবায়ু — প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, — এরা শরীরের মধ্যে কেলাসগঠন, দেহসাৎকরণ, নিঃসারণ, পুষ্টিগ্রহণ এবং সঞ্চালন ক্রিয়াসকলের শক্তিবিশিষ্ট। ষোলটি স্থূল রাসায়নিক মূল উপাদানে গঠিত জড়দেহের মৃত্যুর পরও উনবিংশতিতত্ত্বের এই সূক্ষ্ম অবয়ব বর্তমান থাকে।

"ঈশ্বর তাঁর বিভিন্ন পরিকল্পনা স্বয়ং চিন্তাদ্বারা সৃজন করে স্বপ্নে তা প্রক্ষেপিত করেছেন। বিশ্বস্বপ্নের মায়াসুন্দরী এইভাবে আপেক্ষিকতাবাদের সংখ্যাতীত অলঙ্কারে ভুষিতা হয়ে নির্গতা হলেন।

"কারণশরীরের পঁয়ত্রিশটি ভাবপর্যায়ের মধ্যে ভগবান মানুষের উনিশটি সূক্ষ্ম আর ষোলটি জড় প্রতিরূপের সকল বৈষম্যের উৎকর্ষ সাধন করেছেন। স্পন্দনশক্তিকে ঘনীভূত করে, প্রথমে সূক্ষ্ম ও পরে জড়রূপে তিনি মানুষের সূক্ষ্মশরীর, এবং তার জড়দেহ তৈরী করলেন। অপেক্ষবাদের নিয়মানুসারে — যাতে করে আদি কৈবল্যভাব বহু জটিল বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হয়েছে, — যেমন কারণজগৎ আর কারণশরীর, সূক্ষ্মজগৎ আর সূক্ষ্মদেহ থেকে স্বতন্ত্র — তেমনি এই জড়জগৎ আর স্থূলদেহ সৃষ্টির নানারূপ থেকে স্বভাবতঃই স্বতন্ত্র।

"জড়দেহ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার স্বপ্নের নির্দিষ্ট বস্তুরূপ। পৃথিবীতে দ্বৈতভাব চিরবিদ্যমান; স্বাস্থ্য আর ব্যাধি, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি। মানুষ দেখে যে ত্রিমাসিক জড়রূপই তার সীমা আর প্রতিবন্ধক। ব্যাধি বা অন্য কোন কারণে মানুষের বাঁচার অভিপ্রায় যখন গুরুতরভাবে বিপর্যস্ত হয়, তখনই তার মৃত্যু আসে; আর আত্মার অস্থিমাংসের স্থূল আবরণ তখন সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয়। তখনও আত্মা কিন্তু সূক্ষ্ম ও কারণশরীরে আবদ্ধ থাকে।* আর যে সংহতিশক্তিবলে এই তিনটি অবয়ব একত্র সংলগ্ন থাকে সেটা হচ্ছে বাসনা বা কামনা। এই অতৃপ্ত কামনা বা বাসনার সক্রিয় চালিকা শক্তিই হচ্ছে মানুষের সর্ববিধ বন্ধন আর দাসত্বের মূল।

"অহঙ্কার আর ইন্দ্রিয়সুখই হচ্ছে পার্থিব বাসনা বা কামনার মূল। ইন্দ্রিয়ানুভূতির তাড়না বা প্রলোভন সূক্ষ্মশরীরের আসক্তি বা কারণ অবস্থার অনুভূতিসংশ্লিষ্ট বাসনাশক্তির চেয়েও প্রবলতর।

"সূক্ষ্মজগতের কামনা-বাসনাসকল স্পন্দনভাবের উপভোগেই কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে। সূক্ষ্মজগতের জীবেরা মহাব্যোমের বিশ্বসঙ্গীত (প্রণবধ্বনি) শ্রবণ করে, আর সকল সৃষ্টিই যে পরিবর্তনশীল আলোর অফুরন্ত প্রকাশ, সে দৃশ্য দেখে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। সূক্ষ্মদেহীরা আবার আলোর গন্ধ, স্বাদ আর স্পর্শও পায়। এইরূপে সূক্ষ্মজগতের কামনা-বাসনাসকল সূক্ষ্মশরীরীর সকল বস্তু আর জ্ঞানকে আলোর রূপে, অথবা প্রগাঢ় চিন্তা বা স্বপ্নে পরিণত করার শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

---

* দেহ মানেই কোষবদ্ধ আত্মা, তা সে জড়ই হোক আর সূক্ষ্মই হোক। এই তিনটি শরীর হচ্ছে "নন্দন পক্ষী"র পিঞ্জর।

"কারণজগতের যাবতীয় কামনাবাসনা, কেবল অনুভূতি বা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের দ্বারাই পূর্ণ হয়। প্রায়মুক্ত জীবেরা, যারা কেবল কারণদেহে আবদ্ধ থাকে, তারা এই সারা বিশ্বটাকে ভগবানের স্বপ্নভাবের মূর্ত প্রকাশ বলেই দেখতে পায়; কেবলমাত্র চিন্তার দ্বারাই তারা যে কোন জিনিসের রূপদান করতে পারে। আর সেইজন্যেই কারণশরীরীরা পার্থিব অনুভূতি কিম্বা সূক্ষ্মজগতের আনন্দকেও তাদের আত্মার সূক্ষ্মতর বোধশক্তির পক্ষে নিতান্ত স্থূল আর শ্বাসরোধী বলে মনে করে। কারণশরীরীরা বাসনার তৎক্ষণাৎ রূপ দান মারফৎ তাদের ক্ষয় করে।* যারা কেবলমাত্র কারণজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবয়বে আবদ্ধ, তাঁরা, এমন কি সৃষ্টিকর্তারই মত বিশ্বরচনা করতে পারেন। সকল সৃষ্টিই যখন বিশ্বস্বপ্নজালে তৈরী, তখন অতিসূক্ষ্ম কারণশরীরে আবদ্ধ আত্মারও শক্তির বিরাটভাবের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়।

"আত্মা স্বভাবতঃ একেবারে অদৃশ্য বলে কেবল এর শরীর বা অবয়বগুলির দ্বারাই একে চিনতে পারা যায়। শুধুমাত্র কোন শরীর দেখলেই বোঝা যায় যে এর অস্তিত্ব অতৃপ্ত বাসনার ফলেই সৃষ্ট হয়েছে।†

"যতদিন পর্যন্ত মানুষের আত্মা, অবিদ্যা ও বাসনার ছিপি দ্বারা একটি, দু'টি বা তিনটি দেহাধারের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে, ততদিন পর্যন্ত সে সচ্চিদানন্দ সাগরে মিশে যেতে পারে না। মৃত্যুর কঠিন আঘাতে যখন তার স্থূল জড়দেহ বা আধার চূর্ণ হয়, অপর দুটো আবরণ — সূক্ষ্ম আর কারণ — তখনও সর্বব্যাপী প্রাণসাগরে আত্মার সজ্ঞান প্রবেশ করার পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। জ্ঞানের সাহায্যে যখন বাসনাশূন্য হতে পারা যায়, তখন তার সেই জ্ঞানশক্তি বাকি দুটো আধারকে একেবারে চূর্ণ করে

* এমন কি বাবাজী মহারাজও লাহিড়ী মহাশয়কে তাঁর কোন অতীত জীবনের অবচেতন মনে এক রাজপ্রাসাদের বাসনা থেকে মুক্ত হবার জন্যে সাহায্য করেছিলেন, সে ঘটনা ৩৪ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

† "এবং তিনি তাদের বললেন, শব যেখানেই থাকুক না কেন, সেখানেই শকুনপক্ষীরা সমবেত হবে।" — লুক ১৭ ঃ ৩৭ (বাইবেল)।

যেখানেই কোন আত্মা, স্থূল, সূক্ষ্ম অথবা কারণশরীরে আবদ্ধ হোক না কেন, সেখানেই বাসনা-কামনার শকুনপক্ষীসকল — যারা মানুষের ইন্দ্রিয়দৌর্বল্যকে অথবা কোন সূক্ষ্ম বা কারণজগতের আসক্তির উপর আক্রমণ করে — আত্মাকে বন্দী করে রাখবার জন্য সমবেত হয়।

ফেলে। অবশেষে সেই ক্ষুদ্র মানবাত্মা মুক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ে অনাদি অনন্ত বিস্তৃতি নিয়ে পরমাত্মার সঙ্গে লীন হয়ে যায়।"

গুরুদেবকে তখন আমি উচ্চ আর রহস্যময় কারণজগৎ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করবার জন্যে অনুরোধ করাতে তিনি বললেন, —

"কারণজগৎ এত সূক্ষ্ম যে তা বর্ণনা করা যায় না; তা বুঝতে গেলে, জীবের এমন বিরাট একাগ্র শক্তি থাকা দরকার যে, সে চোখ বন্ধ করেই সূক্ষ্মজগৎ আর এই বিরাট জড়বিশ্ব — যেন একটা আলোর বেলুনের সঙ্গে একটা কঠিন ঝুড়ি — তা' কেবল ভাবরূপেই আছে বলে দেখতে পায়। যদি কেউ এই অতিমানবিক গভীর একাগ্রতাবলে তাদের সব কিছু বৈচিত্র্যসমেত এই দু'টি বিশ্বকে কেবলমাত্র ভাবরূপে পরিণত বা পর্যবসিত করতে কৃতকার্য হয়, তাহলে সে কারণজগতে পৌঁছে মনোজগৎ আর জড়জগতের সীমারেখায় উপস্থিত হতে পারে। সেখানে গিয়ে তার এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয় যে — সকল সৃষ্টবস্তু, কঠিন, তরল, বায়বীয়পদার্থ, বিদ্যুৎ, শক্তি, সকলপ্রাণী, দেবতা, মানুষ, জীবজন্তু, বৃক্ষলতাদি, বীজাণু — জ্ঞানেরই সব এক একটা রূপ, যেমন মানুষ চক্ষু বুঁজেও অনুভব করে যে সে আছে, সে বর্তমান — তার অস্তিত্ব সে বেশ অনুভব করছে, যদিও তার জড়দৃষ্টির সামনে তার দেহ অদৃশ্যই হয়ে থাকে, সেটা কেবল ভাবরূপেই বর্তমান।

"মানুষ যা কল্পনায় করে, কারণশরীরী বাস্তবভাবে তা সম্পন্ন করতে পারে। অতিবিরাট আর প্রচণ্ড কল্পনাপ্রবণ মানববুদ্ধি কেবল মনের ভিতরেই এক চিন্তার শেষ সীমা থেকে অপর এক চিন্তার শেষ সীমায় উপনীত হতে পারে, মনে মনেই সে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণ করতে পারে, অনন্তর অতল গভীর গহ্বরের সীমাহীন তলদেশে যেতে পারে অথবা রকেটের মত তারকাখচিত নীল নভোদেশে অতিবেগে উর্ধ্বে পাড়ি দিতে পারে, কিম্বা ছায়াপথে অথবা নক্ষত্রপুঞ্জশোভিত মহাব্যোমে সে সন্ধানীআলোর মত দীপ্তির চমক প্রকাশ করে চলতে পারে। কিন্তু কারণজগতের জীবেদের এর চেয়েও বেশি স্বাধীনতা আছে — তারা বিনা

আয়াসে নিজেদের চিন্তাকে তৎক্ষণাৎ বস্তুর রূপদান করতে পারে — তাতে কোনরূপ জড় বা সূক্ষ্ম প্রতিবন্ধক বা কর্মের সীমাবদ্ধতা কোনপ্রকার বাধা দিতে পারে না।

"কারণশরীরীরা উপলব্ধি করতে পারে যে জড়বিশ্ব মূলতঃ ইলেক্‌ট্রন দ্বারা সৃষ্ট নয়, অথবা সূক্ষ্মজগৎ "লাইফট্রনে"র মৌলিক ভিত্তির উপরও প্রতিষ্ঠিত নয় — এ দুটোই বস্তুতঃ ঈশ্বরের অতি সূক্ষ্ম চিন্তাকণিকার দ্বারাই সৃষ্ট — যা মায়া বা অপেক্ষবাদের দ্বারা খণ্ডিত আর বিভক্ত, যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে বিভাজন রচনা করে।

"কারণজগতে আত্মারা পরস্পর পরস্পরকে সেই আনন্দময় পরমাত্মার ব্যষ্টিগত প্রকাশ বলেই জানে; তাদের চিন্তাবিষয়সকলই কেবল সেই বস্তু যা তাদের চারধার ঘিরে থাকে। কারণশরীরীরা তাদের দেহ আর চিন্তার মধ্যে যে পার্থক্য, তা কেবল ভাবরূপেই দেখতে পায়। যেমন মানুষ চোখ বুঁজে অতি উজ্জ্বল সাদা আলো কিম্বা ক্ষীণ নীল আলোর আভাস দেখতে পায়, কারণশরীরীরাও তেমনি কেবলমাত্র চিন্তার দ্বারাই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ সবই অনুভব করতে পারে, বিশ্বমানসশক্তির দ্বারা তারা যে কোন জিনিসের সৃষ্টি বা বিলোপসাধন করতে পারে।

"কারণজগতে মৃত্যু আর পুনর্জন্ম এ দুটো কেবলমাত্র চিন্তাতেই আছে; কারণশরীরীরা একমাত্র চিরনূতন জ্ঞানানন্দের সুধাই পান করে। তারা শান্তির নির্ঝরিণী থেকে পান করে, দৈব অনুভূতির চরণচিহ্নহীন ভূমির উপর ভ্রমণ করে, আর পরমানন্দের অসীম সাগরে সন্তরণ করে বেড়ায়। আহা ঐ দেখ! তাদের উজ্জ্বল চিন্তাশরীর সব, ঈশ্বরসৃষ্ট কোটি কোটি গ্রহ-উপগ্রহ, নবজাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডসকল, অসীম নীলাকাশের বুকে ভাসমান সুবর্ণ নীহারিকার অপার্থিব আলোকস্বপ্ন — এ'সবের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে অতিক্রম করে চলেছে।

"কারণজগতে বহু জীব হাজার হাজার বছর ধরে অবস্থান করে। গভীরতর তুরীয়ানন্দ লাভ করে মুক্তাত্মাগণ ক্ষুদ্র কারণশরীর থেকে নিজেকে প্রত্যাহৃত করে নিয়ে কারণবিশ্বের বিরাটরূপ ধারণ করে। সকলপ্রকার ভাবধারার বিভিন্ন আবর্তসমূহ, শক্তি, প্রেম, ইচ্ছা, আনন্দ,

শান্তি, স্বজ্ঞা, স্থৈর্য, আত্মসংযম আর ধারণার নানা তরঙ্গরূপ সব, পরমানন্দসাগরেই গিয়ে লয়প্রাপ্ত হয়। তখন আত্মা তার আনন্দকে জ্ঞানের একটা বিশিষ্ট ভাবতরঙ্গরূপ বলে মনে করে না — তার অনন্ত হাসি, উত্তেজনা, পুলক, কম্পন, একের মধ্যে বহুবাঞ্ছিত বৈচিত্র্যের তরঙ্গসব নিয়ে সেই অখণ্ড মহাব্যোমে বিলীন হয়ে যায়।

"যখন কোন আত্মা প্রজাপতির মত এই তিনটি অবয়বের গুটি ভেদ করে বেরিয়ে আসে তখন সে চিরতরে অপেক্ষবাদ থেকে মুক্ত হয়ে অনির্বচনীয় শাশ্বত স্থিতি লাভ করে।* সেই সর্বব্যাপিত্বের প্রজাপতিকে লক্ষ্য কর, দেখ তার পক্ষদ্বয়ে চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা ঝলমল করছে। আত্মা পরমাত্মায় বিস্তারলাভ করে আলোকহীন আলো, তমিস্রাহীন অন্ধকার, চিন্তাহীন চিন্তার রাজ্যে ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির স্বপ্নের পরমানন্দে মত্ত হয়ে একলাই থাকে।"

সভয় বিস্ময়ে বলে উঠলাম, "মুক্ত আত্মা!"

গুরুদেব বলতে লাগলেন, "যখন কোন আত্মা এই তিনটি শরীরকোষের মায়া থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে, — তখন সে পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায় কিন্তু তবুও তার স্বতন্ত্রতার কোন লোপ বা হ্রাস হয় না। খ্রিস্টের এমন কি যীশুরূপে জন্মগ্রহণ করবার পূর্বেই, এরূপে চূড়ান্ত মুক্তিলাভ ঘটেছিল। তাঁর অতীত জীবনের তিনটি অবস্থায় — যা তাঁর পার্থিবজীবনে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের তিনদিনের অভিজ্ঞতায় মূর্ত হয়ে রয়েছে, তাতে তিনি ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করবার পূর্ণশক্তি অর্জন করেছিলেন।

"এই তিনটি শরীর থেকে মুক্তিলাভ করতে গেলে অপরিণত মানবকে তার অসংখ্য পার্থিব, সূক্ষ্ম আর কারণশরীরের মধ্য দিয়ে জন্ম নিতে হবে। যখন তিনি এইরূপ চরম মুক্তিলাভ করেন, তখন তিনি ইচ্ছা

* "যে জয় করে, তাকে আমি আমার ঈশ্বরের মন্দিরে স্তম্ভস্বরূপ করি আর সে কখনও সেখান হতে বাইরে যাবে না (অর্থাৎ তার আর কখনও পুনর্জন্ম হবে না) ... আমি যেমন জয় করেছি আর আমার পিতার সঙ্গে সিংহাসনে বসেছি, তেমনি যে জয় করে, তাকে আমি আমার সঙ্গে আমার সিংহাসনে বসতে দেই।" — রিভিলেশন ৩ঃ ১২, ২১ (বাইবেল)।

করলে ধর্মোপদেষ্টারূপে অন্যান্য মানবদের ঈশ্বরসান্নিধ্যে ফিরিয়ে আনবার জন্যে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারেন অথবা আমার মত তিনি সূক্ষ্মজগতেও বাস করতে পারেন! সেখানে কোন পরিত্রাতা সেখানকার অধিবাসীদের কিছু কর্মফল গ্রহণ করে,* এইরূপে সূক্ষ্মজগতে তাদের বারম্বার যাতায়াতের অবসান ঘটিয়ে কারণজগতে চিরতরে বাস করার জন্য তাদের সাহায্য করেন। অথবা কোন মুক্তাত্মা কারণজগতে প্রবেশ করে সেখানকার অধিবাসীদের কারণশরীরে অবস্থানকাল সংক্ষেপিত করে তাদের কৈবল্যপ্রাপ্তিতে সাহায্য করেন।"

"অমরদেবতা, যে কর্মফলের প্রভাবে আত্মারা এই তিনটি জগতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়, তার বিষয়ে আরও কিছু বলুন, শুনতে বড়ই ইচ্ছে করছে!" মনে হল, আমার সর্বদর্শী গুরুদেবের কথা চিরকাল ধরেই আমি শুনে যেতে পারি। তাঁর পার্থিবজীবনে আমি তাঁর কাছ থেকে একদিনে এত সব জ্ঞানের বিষয় কখনও আত্মভূত করতে পারি নি। আজ এই প্রথম, জীবনমৃত্যুর গভীর রহস্যময় অন্তঃপ্রদেশে সুস্পষ্ট আর প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করছি।

গুরুদেব পুলকোচ্ছ্বলস্বরে ব্যাখ্যা শুরু করে বললেন, "সূক্ষ্মজগতে নিরন্তর বসবাস করতে হলে মানুষকে অতি অবশ্য পার্থিব সব কর্মফল বা বাসনা সম্পূর্ণভাবে ক্ষয় করে ফেলতে হবে। সূক্ষ্মজগতে দু'রকমের জীব বাস করে; চিরস্থায়ী বাসিন্দা আর স্বল্পকালীন বাসিন্দা, যাদের পার্থিব কর্মক্ষয় করা তখনও বাকী; আর সেইজন্যে তাদের কর্মের ঋণ পরিশোধ করবার জন্যে জড় পার্থিবদেহে পুনরায় তাদেরকে বাস করতেই হবে; তাই জড়দেহের অবসানে তারা সূক্ষ্ম জগতে এলে তাদের চিরস্থায়ী বাসিন্দা অপেক্ষা দু'দিনেরই অতিথিই বলা যায়।

"যাদের পার্থিব কর্মক্ষয় হয় নি সেইসব জীবেদের সূক্ষ্মজগতে মৃত্যু ঘটলেও বিশ্বপরিকল্পনার উচ্চতর কারণস্তরে তারা প্রবেশ লাভ করতে

---

* শ্রীযুক্তেশ্বরজী বলতে চেয়েছেন যে, তাঁর পার্থিব জীবনে তিনি যেমন মাঝে মাঝে তাঁর শিষ্যদের কর্মক্ষয়ের উদ্দেশ্যে তাদের রোগভার নিজশরীরে গ্রহণ করতেন, তেমনি সূক্ষ্মজগতেও মুক্তিসাধকরূপে তাঁর জীবনের কর্তব্য হচ্ছে হিরণ্যলোকবাসীদের কোন কোন সূক্ষ্ম কর্মফল গ্রহণ করে তাদের উচ্চতর কারণজগতে দ্রুত উন্নীত হতে সাহায্য করা।

পারে না; তারা কেবল জড় আর সূক্ষ্মজগতে যাতায়াত করে পর্যায়ক্রমে ষোড়শ জড়তত্ত্ববিশিষ্ট স্থূলদেহ আর উনবিংশতি সূক্ষ্মতত্ত্ববিশিষ্ট আতিবাহিক দেহ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। উপরন্তু প্রত্যেক জড়দেহ নাশের পর পৃথিবীর অপরিণত জীব অধিকাংশকালই মরণনিদ্রার ঘোর অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, আর মনোরম সূক্ষ্মজগতের বিষয়ে তার কদাচিৎ জ্ঞানলাভ ঘটে। সূক্ষ্মজগতে কিছুকাল বিশ্রামের পর এরূপ মানবাত্মা আবার জড়জগতে ফিরে আসে আরও শিক্ষা, আরও সাধনার জন্যে। আর বার বার যাতায়াতের ফলে ক্রমশঃ সে সূক্ষ্মস্তরের জগতে থাকতে নিজেকে অভ্যস্ত করে তোলে।

"উপরন্তু সূক্ষ্মজগতের সাধারণ অথবা বহুদিনের বাসিন্দারা, যারা সকলরকম জড়বাসনা হতে চিরতরে মুক্ত হয়ে গেছে, তাদের আর কখনও পার্থিব জড়ভূমিতে ফিরে আসবার প্রয়োজন হয় না। এইসব জীবদের কেবলমাত্র সূক্ষ্ম আর কারণজগতের কর্ম সকল ক্ষয় করতে হয়। সূক্ষ্মজগতে তাদের মৃত্যু ঘটলে তারা অপরিসীম সুন্দরতর আর সূক্ষ্মতর কারণজগতে প্রবেশ করে! বিশ্ববিধানে নির্দিষ্ট সময় অন্তে, কারণশরীরের ভাবরূপ পরিত্যাগ করে এইসব উচ্চতর অবস্থাপ্রাপ্ত জীবেরা হিরণ্যলোক অথবা সেইরকম কোন উচ্চ সূক্ষ্মজগতে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম নবকলেবরে পুনর্জাত হয়ে তাদের সূক্ষ্মজগতের বাকী কর্ম সব ক্ষয় করে।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতে লাগলেন, "বৎস, এখন তুমি আরও বেশি করে বুঝতে পারবে যে আমি বিধির বিধানেই মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করেছি কেন জান? পৃথিবী থেকে যে সব আত্মা সূক্ষ্মজগতে এসে প্রবেশ করছে, তাদের চেয়ে বিশেষভাবে কারণজগৎ থেকে যেসব আত্মা সূক্ষ্ম জগতে নেমে এসে পুনরায় জন্মগ্রহণ করছে, তাদের মুক্তিসাধনের সহায়তার জন্যে। পৃথিবী থেকে যারা আসছে তাদের যদি বিন্দুমাত্র জড়জগতের কর্ম বাকী থাকে, তা হলে তারা আর হিরণ্যলোকের মত অতি উচ্চলোকে কখনও আরোহণ করতে পারে না।

"পৃথিবীতে যেমন অধিকাংশ লোকই ধ্যানলব্ধ আত্মিকদর্শনের সাহায্যে সূক্ষ্মজগতের উচ্চতর সুখকর অবস্থা আর তার পরমানন্দ উপলব্ধি করতে শেখেনি, আর সে'কারণে মৃত্যুর পরে পৃথিবীর সসীম আর অপূর্ণ আনন্দেই আবার ফিরে যেতে চায়, তেমনি বহু সূক্ষ্মশরীরীরা তাদের সূক্ষ্মদেহের স্বাভাবিক বিঘটনের সময় সূক্ষ্মজগতের অধিকতর স্থূল আর উচ্ছ্বল আনন্দের চিন্তা মনের মধ্যে লালন করে আবার সূক্ষ্মজগতের স্বর্গেই পুনরায় ফিরে আসতে চায়। কারণজগতের সমুচ্চ অধ্যাত্ম আনন্দের চিন্তা তারা করতে পারে না। সূক্ষ্মজগতের গুরু কর্মফল এই সকল জীবেদের সূক্ষ্মজগতে মৃত্যু ঘটবার আগেই তা সব ক্ষয় করে নিতে হয়; তা না হলে তারা কারণ ভাবজগতে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হতে পারে না — এই কারণে যে, ভাবজগৎ আর স্রষ্টার মধ্যে বিভেদ খুব অল্পই।

"যখন কেবল জীবের আর নয়নাভিরাম সূক্ষ্মজগতের অভিজ্ঞতালাভের ইচ্ছা থাকে না, আর কোন প্রলোভনই তাকে সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, তখনই কেবল সে কারণজগতে থাকতে পারে। সেখানে থেকে কারণজগতের সমস্ত কর্ম অথবা অতীত জীবনের সমস্ত বাসনার বীজ নাশ করবার সাধনা শেষ করে, বদ্ধজীব তিনটি অজ্ঞান আবরণের শেষ কারণ অবয়ব ভেদ করে বেরিয়ে পড়ে এবং সেই অনন্তপুরুষের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে মিলিত হয়।"

গুরুদেব অতি স্নিগ্ধমধুর হেসে বললেন, "এখন সব বুঝতে পারছ তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার কৃপায় পারছি বটে। কৃতজ্ঞতা আর আনন্দের আমি কোন ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।"

কোনো গান, কোনো আখ্যায়িকায় আমি কখনো এমন উদ্দীপনাময় আর উচ্চভাবের জ্ঞানের কথা কখনও শুনি নি। শাস্ত্রে যদিও এইসব কারণ এবং সূক্ষ্মজগৎ আর মানুষের এই তিনটি অবয়বের উল্লেখ আছে, তথাপি আমার এই পুনরুত্থিত গুরুদেবের এ রকম অপূর্ব মৌলিকতার সঙ্গে তুলনায় তাদের ব্যাখ্যা কতই না অনধিগম্য, অসংলগ্ন বা অর্থহীন বলে মনে হয়। তাঁর কাছে বাস্তবিকই এমন কোন —

"অচিন দেশের কথা জানা নাই তার,
কভু নাহি ফিরে পান্থ, সীমা হতে যার!"*

গুরুদেব বলতে লাগলেন, "মানুষের এই তিনটি শরীরের অন্তর্ব্যাপ্তি তার ত্রিবিধা প্রকৃতির মধ্য দিয়ে নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ জাগ্রত অবস্থায় তার এই তিনটি অবয়বের বিষয় অল্পবিস্তর সচেতন। যখন তার মন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট, তখন সে প্রধানতঃ তার জড়শরীর দিয়ে কাজ করে। দর্শনক্রিয়া বা ইচ্ছাপ্রকাশের সময়, সে প্রধানতঃ তার সূক্ষ্মশরীরের ভিতর দিয়ে কাজ করে। আর মানুষ যখন কোন চিন্তা বা গভীর অন্তর্দর্শন অথবা ধ্যানের মধ্যে গভীরভাবে ডুবে যায়, তখন তার কারণশরীর প্রকটিত হয়; আর যে মানবের নিয়মিতভাবে কারণশরীরের সংস্পর্শ ঘটে, প্রজ্ঞাবানের সূক্ষ্মচিন্তাসকল তার কাছে উদয় হয়। এই অর্থে কোন ব্যক্তিকে 'জড়ভাবাপন্ন', 'প্রাণবন্ত' অথবা 'বুদ্ধিজীবী' — এই তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়।

"মানুষ দৈনিক প্রায় ষোল ঘণ্টা ধরে তার জড় অবয়বটিকে নিয়েই পড়ে থাকে — তারপর সে নিদ্রা যায়। যখন সে স্বপ্ন দেখে তখন সে সূক্ষ্মশরীরে অবস্থান করে, আর সে' সময় বিনা আয়াসে সূক্ষ্মশরীরীদের মতই যে কোন জিনিস সৃষ্টি করতে পারে। আর মানুষের সুষুপ্তি যদি গভীর আর স্বপ্নবিহীন হয়, তা হলে ঘণ্টাকতক ধরে সে তার চেতনা অথবা আমিত্ব-জ্ঞানকে তার কারণশরীরে পরিচালিত করতে পারে; এরূপ নিদ্রা পুনরুজ্জীবক। যে স্বপ্নদ্রষ্টা, সে কারণশরীরে নয়, সূক্ষ্মশরীরের সংস্পর্শে আসে, কিন্তু তার নিদ্রা পরিপূর্ণভাবে শ্রান্তি অপনোদনকারী হয় না।"

গুরুদেবের এই অপূর্ব ব্যাখ্যা প্রদানকালে আমি তাঁকে ভক্তিবিনত চিত্তে দেখতে দেখতে বললাম, "গুরুদেবতা, আপনার শরীর কিন্তু পুরী আশ্রমে আপনার দেহরক্ষার সময় যেমনটি দেখেছিলাম, ঠিক অবিকল তেমনটিই দেখতে পাচ্ছি।"

---

* হ্যামলেট (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)।

"হ্যাঁ, তা বটে; আমার এ নতুন শরীর সেই পুরান শরীরটার অবিকল প্রতিরূপ। পৃথিবীতে থাকতে আমি যত না করতাম, তার চেয়েও ঢের বেশিবার আমি ইচ্ছামত যেকোন সময় আমার এই মূর্তি ধারণ করি বা অদৃশ্য করে ফেলি। মুহূর্তমধ্যে শরীর অদৃশ্য করে ফেলে এখন আমি আলোর গতিতে চোখের পলকে গ্রহ হতে গ্রহান্তরে যাই, অথবা বস্তুতঃই সূক্ষ্ম থেকে কারণ কিম্বা জড়জগতে ফিরে চলি।" তারপর গুরুদেব একটু হেসে বললেন, "যদিও তোমরা আজকাল এত তাড়াতাড়ি যাতায়াত করতে পার, তথাপি আমার কিন্তু তোমাকে বোম্বাইয়ে খুঁজে পেতে বিন্দুমাত্রও দেরি হয়নি!"

"গুরুদেব, আপনার মৃত্যুতে আমার যে কি গভীর দুঃখ হচ্ছিল!"

"আহাহা, আমি মরলামই বা কোথায়? তোমার কথার মধ্যে কিছু গরমিল আছে না কি?" বলে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী সস্নেহ কৌতূকের হাসি হাসলেন।

তারপর তিনি বলতে লাগলেন, "যোগানন্দ, তুমি কেবলমাত্র এই পৃথিবীতে স্বপ্ন দেখছিলে; আর সেই স্বপ্নপৃথিবীর উপর তুমি আমার স্বপ্নদেহই দেখেছিলে। পরে সেই স্বপ্নেগড়া মূর্তিকেই তোমরা সমাধি দিয়েছিলে। এখনকার আমার এই আরও সূক্ষ্মতর মর্ত্যদেহ — যা তুমি এখন দেখছ আর শুধু দেখছই বা বলি কেন, এমন শক্ত করে এখন জড়িয়ে ধরে আছ — তা ঈশ্বরের আর একটা সূক্ষ্মতর স্বপ্নজগতে পুনর্জন্ম লাভ করেছে। কোন দিন হয়ত বা সেই সূক্ষ্মতর স্বপ্নদেহ আর সূক্ষ্মতর স্বপ্নজগৎ সবই মিলিয়ে যাবে; সে'সবও কিছু চিরকালের জন্যেও নয়। পরমজাগরণের চরমস্পর্শে এইসব স্বপ্নবুদ্বুদ অবশেষে সবই ফাটবে। যোগানন্দ, পুত্র আমার — স্বপ্ন আর সত্যের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখ, বুঝে নাও কোনটা স্বপ্ন আর কোনটা সত্য।"

বৈদান্তিক* পুনরুত্থানের এই ভাবনা আমায় বিস্ময়াবিভূত করল। পুরীতে গুরুদেবের প্রাণহীন দেহ দেখে যে শোকাকুল হয়ে পড়েছিলাম

---

* জীবন আর মৃত্যু হচ্ছে চিন্তার আপেক্ষিকভাব মাত্র। 'বেদান্ত' ঘোষণা করে যে ঈশ্বরই হচ্ছেন একমাত্র সৎবস্তু — যাবতীয় সৃষ্টি বা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হলো, অবিদ্যা বা মায়া। এই অদ্বৈতবাদ, শঙ্করাচার্যের 'উপনিষদ' ভাষ্যে পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে।

তা মনে পড়াতে বড়ই লজ্জাবোধ হল। অবশেষে আমি এই উপলব্ধি করলাম — পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব এবং তাঁর আজকের এই পুনরুত্থান, এসব বিশ্বস্বপ্নে দৈব কল্পনার একটা আপেক্ষিকসম্বন্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়, এই ভেবে আমার গুরুদেব সর্বদাই ঈশ্বরভাবে নিমগ্ন থাকতেন।

"যোগানন্দ, তোমায় আজ আমি আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার পুনরুত্থানের সব কথাই বললাম। আমার জন্যে আর শোক কোরো না, বরং ঈশ্বরের স্বপ্নেগড়া মানুষের পৃথিবী থেকে আরেকটি ঈশ্বরস্বপ্নরচিত সূক্ষ্মশরীরীদের জগতে আমার পুনর্জন্মের কথা তুমি সর্বত্র প্রচার কর। দুঃখে উদ্‌ভ্রান্ত, মরণভয়ে ভীত, পৃথিবীর স্বপ্নদর্শীদের অন্তরে তাতে নতুন আশার সঞ্চার হবে।"

বললাম — "আজ্ঞে হ্যাঁ গুরুদেব, তা বলব বই কি।" ভাবলাম, তাঁর পুনরুত্থানে সবাইকার সঙ্গে আমারও কি আনন্দই না লাভ হবে!

তিনি স্নিগ্ধকোমলস্বরে বলতে লাগলেন, "পৃথিবীতে আমার প্রকৃতি অত্যন্ত অস্বস্তিকর উচ্চভাবাপন্ন ছিল বলে অনেকের পক্ষে তা বরদাস্ত করা কঠিন ছিল। তোমায় হয়ত আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক বেশি ভর্ৎসনা করেছি। কিন্তু তুমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ; আমার সকল তিরস্কার, সকল কঠিন শাসনের মেঘের মধ্য দিয়ে তোমার ভক্তির উজ্জ্বল রশ্মির ছটা প্রকাশ পেয়েছে।" তারপর কোমল স্বরে বলতে লাগলেন, "আজ আমি তোমায় বলতে এসেছি যে আর তুমি সে কঠিন তিরস্কারের রুদ্রদৃষ্টি আমার কাছে দেখতে পাবে না; আর তোমায় আমি কখনও তিরস্কার করব না।"

হায়রে — আমার পরমদয়াল গুরুদেবের সেই সস্নেহ তিরস্কারকে হারিয়ে আজ আমার মন কি দারুণ বিষাদে আচ্ছন্ন! তারা যে সব চলার পথের অন্ধকারে এক একটি দেবদূতের মত আমায় রক্ষা করে আমায় সাবধানে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলত!

"পরমারাধ্য গুরুদেব, আমায় হাজারবার বকুন, — এখনই আপনি আমায় ভর্ৎসনা করে আবার আগেকার মত আমায় শাসন করুন।"

"না যোগানন্দ, আর তোমায় আমি কখনও বকব না।" তাঁর স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর এখন গম্ভীর, অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত তাতে হাসির গুপ্তধারা প্রবাহিত। "ঈশ্বরের মায়াস্বপ্নে আমাদের এই দুটো মূর্তি যতদিন আলাদা হয়ে থাকবে, ততদিন আমরা দু'জনেই একসঙ্গে আনন্দের হাসি হাসব। শেষে আমরা দু'জনে এক হয়ে গিয়ে সেই পরমাত্মায় মিশে যাব — আমাদের হাসি হবে তাঁরই হাসি, আমাদের দু'জনের মিলিত আনন্দসঙ্গীত ঈশ্বরীয়ভাবে ভাবিত আত্মাদের কাছে ধ্বনিত হবে অনন্তকাল ধরে!"

তারপর শ্রীযুক্তেশ্বরজী কতকগুলি বিষয়ে আমায় কিছু উপদেশ দিলেন, যা আমি এখানে প্রকাশ করে বলতে পারছি না। সেই বোম্বাইয়ের হোটেলঘরে যে দু'ঘণ্টা তিনি আমার সঙ্গে অতিবাহিত করেছিলেন, সেইসময় তিনি আমার প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালের জুন মাসে তিনি যেসব পার্থিব ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন — তা সবই ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে।

"প্রিয় বৎস আমার, এবার আমি তা হলে চলি!" শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলাম যে আমার দৃঢ়সংবদ্ধ আলিঙ্গনের মধ্য থেকে তাঁর দিব্যদেহ যেন বিগলিত হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমার আত্মাকাশে তাঁর সেই অপূর্ব কণ্ঠধ্বনি ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল, "বৎস, যখনই তুমি নির্বিকল্প সমাধিতে প্রবেশ করে আমায় ডাক দেবে, তখনই আমি তোমার কাছে এই রকম রক্তমাংসের শরীরে এসে হাজির হব, — আজ যেমন এসেছি।"

তাঁর এই দিব্যপ্রতিশ্রুতিদানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী আমার দৃষ্টির গোচর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। মধুর সঙ্গীতের মূর্ছনায় তাঁর কণ্ঠস্বর মেঘমন্দ্রধ্বনিতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল, "সকলকে বোলো যোগানন্দ! বোলো যে যিনিই নির্বিকল্প সমাধি লাভ করে জানতে পেরেছেন যে এই পৃথিবী ঈশ্বরের একটা স্বপ্ন বই আর কিছু নয়, তিনি স্বপ্নসৃষ্ট সূক্ষ্মতর হিরণ্যলোকে আসতে পারবেন — আর সেখানে আমাকে ঠিক পার্থিব শরীরের মতই সূক্ষ্মশরীরে পুনরুত্থিত দেখতে পাবেন; যোগানন্দ, বোলো সকলকে এ কথা!"

আজ আমার বিচ্ছেদের যাবতীয় বেদনা দূর হল। তাঁর মৃত্যুর জন্য বেদনা আর শোক — যা এতদিন ধরে আমার সকল শান্তি হরণ করে আসছিল, তা আজ যেন লজ্জায় কোথায় মুখ লুকাল। আত্মার নবোন্মুক্ত অনন্ত রন্ধ্রপথে পরমানন্দের অমৃতধারা এক বিরাট উৎস হতে সহস্রধারে উৎসারিত হয়ে প্রবেশ করতে লাগল। বহুদিনের অব্যবহৃত রন্ধ্রমুখ আজ পুণ্য আনন্দের এক প্রবল বন্যাতাড়নে উদার, উন্মুক্ত হল। অন্তর পবিত্রতায় ভরে গিয়ে পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠল। আমার অতীত জন্মগুলি চলচ্চিত্রের মত একে একে আমার অন্তশ্চক্ষুর সামনে ভেসে উঠল। আমার গুরুদেবের দিব্য আবির্ভাবের ফলে আমায় ঘেরা স্বর্গীয় আলোকের মধ্যে আমার অতীত জীবনের সদসৎ সবকর্মই যেন মিলিয়ে গেল।

আমার আত্মজীবনীর এই অধ্যায়ে আমি গুরুআজ্ঞা শিরোধার্য করে সেই আনন্দসংবাদ প্রচার করেছি, যদিও তা বুঝতে অনুসন্ধিৎসু লোকেদের বুদ্ধি একটু বিপর্যস্ত হবেই। ক্ষুদ্রতা, নীচতা মানুষের ভালরকমই জানা আছে; হতাশাও তার নিতান্ত অপরিচিত নয় — তবু এরা সব মনোবৈকল্যের ভাব, মানুষের আসল স্বরূপের কোন অংশই নয়। যে দিন সে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করবে, সেইদিন থেকেই সে মুক্তির পথে পা বাড়াবে। "ধূলোর তুমি ধূলোয় মিশবে," — দুঃখবাদীদের এই চিন্তাবসাদক উপদেশই বহুদিন ধরে সে মেনে এসেছে, শাশ্বত আত্মার চিরন্তন বাণীতে কখনও সে কর্ণপাত করে নি।

পুনরুত্থিত মদীয় গুরুদেবকে কেবল যে আমারই দেখবার বিশেষ সৌভাগ্য হয়েছিল তা নয়; আর একজনেরও সে সৌভাগ্য ঘটেছিল।

শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর শিষ্যাদের মধ্যে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ছিলেন, সকলে আদর করে তাঁকে "মা" বলে ডাকত। পুরী আশ্রমের কাছেই তাঁর বাড়ি। প্রাতর্ভ্রমণের সময় গুরুদেব প্রায়ই সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। ১৯৩৬ সালের ষোলই মার্চ তারিখে, "মা" আশ্রমে এসে তাঁর গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন।

পুরী আশ্রমের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত স্বামী সেবানন্দ তখন সেখানে, — বিষাদকরুণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে বলল, "সেকি, গুরুদেব যে এক সপ্তাহ হল দেহরক্ষা করেছেন!"

প্রতিবাদের ভঙ্গীতে তিনি মৃদু হেসে বললেন, "তা কি হয় গো বাবা! সে যে একেবারেই অসম্ভব।"

বিব্রত সেবানন্দ তখন তাঁর সমাধির সব বিবরণ দিয়ে "মা"কে ডেকে বলল, "আচ্ছা আসুন, এই সামনের বাগানে তাঁর সমাধিস্থল দেখিয়ে দিচ্ছি।"

"ওসব কথা আমি কিছুই শুনতে চাইনে বাবা।" "মা" প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললেন, "আরে না, না। তাঁর কোন সমাধিটমাধি হতেই পারে না। এই আজ সকালে, যেমন তিনি বেড়াতে বেরোন, ঠিক তেমনি বেড়িয়ে বেলা দশটা নাগাদ আমার দুয়োরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, — দেখলাম। দিনের বেলায় সদরে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হল খানিকক্ষণ ধরে। কি সব বলছেন আপনি! তিনি, এমন কি আমায় বললেন পর্যন্ত যে, 'আজ সন্ধ্যেবেলা আমার আশ্রমে একবার এসো।'"

"তাই আমি এখন এখানে এসেছি বাবা! আমার এই বুড়োর মাথায় তাঁর যে কত আশীর্বাদ! ভগবানের আশীর্বাদে গুরুদেব আমার চিরজীবী হোন! গুরুদেব আমার অমর, তাঁর কি কখনও মৃত্যু হতে পারে? তাই আমার অমর গুরু আমায় জানিয়ে গেলেন যে কি দিব্যদেহে তিনি আজ সকালে আমায় দর্শন দিলেন!"

বিস্ময়ে হতবাক সেবানন্দ তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বলল, "মা, আমার মন থেকে যে কি গুরু শোকের পাষাণভার আজ আপনি তুলে নিলেন, তা আর কি বলব! ঠিকই 'ত, তাঁর তিরোভাব তো কখনও ঘটেনি, তাই তিনি পুনরুত্থিত হয়ে আবার দেখা দিয়ে গেলেন!"

৪৪ পরিচ্ছেদ

ওয়ার্ধায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে

আগস্ট মাসের ভোরবেলা। ট্রেনের ধূলো আর গরমের হাত থেকে রেহাই পেয়ে মিস ব্লেচ, মিঃ রাইট আর আমি ওয়ার্ধা স্টেশনে নেমে পড়লাম। মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই আমাদের সম্বর্ধনার জন্য সেখানে উপস্থিত।

"ওয়ার্ধায় স্বাগত!" বলে খদ্দরের মালা দিয়ে শ্রীযুক্ত দেশাই আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করলেন। সঙ্গের মালপত্র একটা গরুর গাড়িতে চালান করে দিয়ে আমরা একটা খোলা মোটর গাড়িতে উঠে বসলাম। সঙ্গে চললেন মহাদেব দেশাই আর তাঁর সঙ্গীগণ, বাবাসাহেব দেশমুখ ও ডাক্তার পিঙ্গেল। মাটির গ্রাম্যপথের উপর দিয়ে গাড়ি চলল। অল্পক্ষণ পরেই "মগনবাদী" পৌঁছলাম — ভারতের রাজনৈতিক সন্ন্যাসীর আশ্রমে।

শ্রীযুক্ত দেশাই আমাদের সরাসরি মহাত্মাজীর লেখবার ঘরে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। মহাত্মা গান্ধী সেখানে মেঝের উপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসে রয়েছেন, একহাতে কলম আর অন্যহাতে কাগজ, — প্রশান্তবদনে উদার মধুর প্রাণখোলা হাসি!

সেদিন ছিল সোমবার, মহাত্মাজীর মৌনব্রত পালনের দিন। কথা বলবার উপায় নেই! কাজেই তিনি লিখে জানালেন — অবশ্য হিন্দিতে, "স্বাগত!"

যদিও আমাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ, তবুও মনে হল যেন আমাদের কতকালের পরিচয়। দুইজনেই হাসলাম। ১৯২৫ সালে গান্ধীজী রাঁচী বিদ্যালয় পরিদর্শন করে তাকে সম্মানিত করেন, আর সেখানকার পরিদর্শকদের খাতায় বিদ্যালয় সম্বন্ধে উচ্চ মন্তব্যই লিখে দিয়ে আসেন।

মাত্র একশত পাউণ্ডের এই ক্ষুদ্রকায় মহামানবটির মধ্যে থেকে যেন দৈহিক, মানসিক আর আধ্যাত্মিক একটা স্বাস্থ্যের জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। স্নিগ্ধ ধূসর চক্ষুদুটি আন্তরিকতা, জ্ঞান আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল — রাষ্ট্রনেতা গান্ধীজী হাজার রকমের আইনসংক্রান্ত, সামাজিক আর রাজনৈতিক যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এসেছেন। গান্ধীজী ভারতের কোটি কোটি মূক জনসাধারণের হৃদয়ে যে সুনির্দিষ্ট স্থানটি দখল করেছেন, পৃথিবীতে আর কোন নেতা তেমনটি পারেন নি! তাদের হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধা তাঁর বিশ্ববিশ্রুত "মহাত্মা" নামেই প্রকাশ পেয়েছে। ভারতের উপেক্ষিত, পদদলিত জনসাধারণ — যাদের এর চেয়ে আর বেশি কিছু জোটে না — কেবল তাদেরই সঙ্গে এক হয়ে গান্ধীজী প্রভূতভাবে ব্যঙ্গচিত্রিত কটিবাসের অতিরিক্ত আর কিছুই পরিধান করেন না।

শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই গান্ধীজীর লেখবার ঘর থেকে আমাদের অতিথিশালায় নিয়ে যাবার সময় মহাত্মাজী তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্যের সঙ্গে এই ক'টি কথা তাড়াতাড়ি লিখে আমার হাতে দিলেন ঃ "আশ্রমবাসীরা সকলেই আপনাদের সেবার জন্য প্রস্তুত; কোন কিছুর প্রয়োজন হলেই দয়া করে তাদের জানাবেন।"

শ্রীযুক্ত দেশাই আশ্রমের ফলফুলের বাগানের ভিতর দিয়ে আমাদের নিয়ে গিয়ে তুললেন একটা টালি দিয়ে ছাওয়া বাড়িতে — জানালাগুলো সব জাফরি দেওয়া। সামনের উঠানে একটা কূয়া, প্রায় পঁচিশফুট চওড়া। শ্রীযুক্ত দেশাই জানালেন — গবাদি পশুর জলপানের জন্য ব্যবহৃত হয়; ধানভানার জন্যে কাছেই একটা ঘোরাবার সিমেণ্টের চাকা রয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের ছোট ছোট শোবার ঘরে — একেবারে যা না হলে আর চলে না — সেইরকম একটি করে হাতে তৈরী দড়ির খাটিয়া। চুনকামকরা রান্নাঘরের এক কোণে একটি জলের কল আর আরেক কোণে রাঁধবার জন্যে উনুন। সরল গ্রাম্যপরিবেশের মধ্যে যে সব শব্দ কানে আসতে লাগল — তা হচ্ছে কাক-চড়াইয়ের ডাক, গরুবাছুরের হাম্বারব, আর পাথরকাটার দরুন বাটালির শব্দ!

রাইট সাহেবের ভ্রমণ ডায়েরী দেখে শ্রীযুক্ত দেশাই একটি পাতা খুলে সত্যাগ্রহীদের সত্যাগ্রহের* প্রতিজ্ঞাগুলি সব একে একে লিখে দিলেন, যথা ঃ— "অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, কৌমার্য, অপরিগ্রহ, কায়িক পরিশ্রম, রসনাসংযম, নির্ভীকতা, সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার আর অস্পৃশ্যতা পরিহার। এই এগারটি, নিতান্ত অনুগতভাবে ব্রতস্বরূপ পালন করতে হবে।"

(মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এই পাতাটি তার পরেরদিন স্বাক্ষর করেছিলেন, তারিখ দিয়েছিলেন — ২৭শে আগস্ট, ১৯৩৫।)

আমাদের পৌঁছবার ঘণ্টাদুই পরে আমাদের সঙ্গীদের নিয়ে খেতে যাবার ডাক পড়ল। তাঁর পড়াশোনার ঘর থেকে একটু তফাতে উঠানের ওপারে আশ্রমের ছাওয়া বারান্দা, তার তলায় মহাত্মাজী ইতিমধ্যে বসে গেছেন; প্রায় পঁচিশটি নগ্নপদ সত্যাগ্রহীও তাঁর সঙ্গে বসেছেন, সামনে পিতলের থালাবাটি। আহারের পূর্বে সমবেত প্রার্থনা। তারপর একটা প্রকাণ্ড পিতলের পাত্র হতে ঘি মাখানো চাপাটি দেওয়া হল। তার সঙ্গে তালসরি (টুকরো টুকরো শাকসব্জি সিদ্ধ) আর একটু লেবুর আচার।

মহাত্মাজী খেলেন চাপাটি, বীটসিদ্ধ, কিছু কাঁচা শাকসব্জি আর কমললেবু। তাঁর থালার একধারে বড় একতাল নিমপাতা বাটা — রক্ত পরিশোধক গুণের জন্য প্রসিদ্ধ। তাই থেকে খানিকটা চামচে দিয়ে ভেঙে নিয়ে আমার পাতে দিলেন। আমি আর কি করি, খানিকটা জল দিয়ে সেটা ঢোক করে গিলে ফেললাম। মনে পড়ল ছেলেবেলাকার কথা, — মা যখন আমায় এই অত্যন্ত অপ্রীতিকর বস্তুটি গলাধঃকরণে বাধ্য করতেন। গান্ধীজী কিন্তু কোনরকম বিকৃতি ছাড়াই লেশ টুকটুক করে সেই নিমবাটাটি খেয়ে ফেললেন।

ঘটনাটা অবশ্য নিতান্তই তুচ্ছ আর সাধারণ, কিন্তু তাতেই আমি লক্ষ্য করলাম যে ইন্দ্রিয়বোধ থেকে ইচ্ছামাত্র মনকে বিযুক্ত করবার ক্ষমতা গান্ধীজীর আছে। মনে পড়ল — বছরকতক আগে তাঁর উপাঙ্গে

---

* সত্যাগ্রহ — মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক প্রবর্তিত তাঁর বিশ্ববিখ্যাত অহিংস সংগ্রাম। সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত শব্দটির অর্থ ঃ 'সত্যকে অবলম্বন।'

অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল, সে সময় অ্যানাস্‌থেটিক্স প্রয়োগ উপেক্ষা করে গান্ধীজী সারা অস্ত্রোপচারের সময় তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে বেশ প্রফুল্লচিত্তেই গল্প করেছিলেন। তাঁর শান্ত হাসিতে টেরই পাওয়া গেল না যে তিনি কোনরকম কষ্টবোধ করছেন।

সেই সময় গান্ধীজীর এক বিখ্যাত শিষ্যা, এক ইংরেজ নৌসেনাপতির কন্যা, মিস ম্যাডেলিন স্লেড, — বর্তমানে মীরাবেন* নামে পরিচিতা, সেখানে বাস করছিলেন; বৈকালে তাঁর সঙ্গে আলাপের খানিক সুযোগ পাওয়া গেল। কথাবার্তা কইলেন নির্ভুল হিন্দীতে; তাঁর দৈনন্দিন কার্যের বিবরণ দিতে দিতে তাঁর দৃঢ় ও শান্ত বদন উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"গ্রাম পুনঃসংগঠনের কাজ খুবই ফলপ্রসূ! রোজ ভোর পাঁচটার সময় আমাদের একটি দল কাছাকাছি গ্রামের লোকেদের সেবা করতে যায় এবং তাদের সরল স্বাস্থ্যবিধিগুলি শিখিয়ে দেয়। কাজের মধ্যে আমাদের একটা নিয়ম থাকে — তাদের আঁস্তাকুড়, পায়খানা প্রভৃতি আর মাটির কুঁড়েঘরগুলি পরিষ্কার করে দেওয়া। গাঁয়ের লোকেরা নিরক্ষর, কাজেই উদাহরণ না দেখালে তো তারা আর শিখতে পারবে না!" বলে হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন!

প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম এই উচ্চকুলসম্ভূতা সদ্বংশজাতা ইংরেজ রমণীটির দিকে, যাঁর প্রকৃত খ্রিস্টানুগত্য তাঁকে — কেবলমাত্র "অস্পৃশ্য"দের দ্বারাই যে কাজ হয় — সেই ময়লা পরিষ্কারের কাজ করবার সামর্থ দিয়েছে!

---

* মহাত্মা কর্তৃক তাঁকে লেখা কতকগুলি পত্র তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেছেন, যাতে তাঁর গুরু কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষাপ্রণালী প্রদর্শিত হয়েছে। (গান্ধীস লেটার্স টু এ ডিসাইপল, হার্পার এণ্ড ব্রাদার্স, নিউ ইয়র্ক; ১৯৫০)।

পরবর্তীকালে অন্য একটি বইতে (দি স্পিরিটস্ পিলগ্রিমেজ, কাওয়ার্ড-ম্যাক্ ক্যান, নিউ ইয়র্ক ১৯৬০), ওয়ার্ধা আশ্রমে মহাত্মাজীর সাক্ষাতপ্রার্থী বহু ব্যক্তির কথা উল্লেখ করে মীরাবেন লিখেছেন ঃ আজ এতদিন পরে আমার সকলকার কথা পরিষ্কারভাবে মনে পড়ছে না। কিন্তু দু'জনের কথা এখনও বেশ মনে আছে — তুরস্কের খ্যাতনামা মহিলা লেখিকা হ্যালিডে এডিব হানুম, এবং আমেরিকার সেলফ্-রিয়্যালাইজেশন ফেলোশিপের প্রতিষ্ঠাতা — স্বামী যোগানন্দ।" *(প্রকাশকের মন্তব্য)*

তিনি আমাকে বললেন, "১৯২৫ সালে আমি ভারতে আসি; এদেশে এসে দেখলাম যে আমি আমার 'নিজের ঘরে ফিরে এসেছি!' এখন আর আমি আমার পুরান জীবন বা পুরান কাজে কখনই ফিরে যাব না।"

আমেরিকা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। তিনি বললেন, "ভারতে বেড়াতে এসে বহু আমেরিকান যে আধ্যাত্মিক বিষয়ে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন, তা দেখে আমি বাস্তবিকই খুব খুশি আর আশ্চর্যও হই!"*

মীরাবেন সঙ্গে সঙ্গে চরকাঘোরান শুরু করলেন। মহাত্মাজীর প্রভাবে ভারতের গ্রামে গ্রামে আজ সর্বত্রই চরকা বিস্তৃতি লাভ করেছে।

কুটিরশিল্প পুনর্জাগরণের জন্য গান্ধীজীর অবশ্য সুদৃঢ় অর্থনৈতিক আর সংস্কৃতিগত কারণ আছে, কিন্তু তা বলে তিনি গোঁড়ামি করে বর্তমান যুগের প্রগতিমূলক সবকিছু পরিহার করে চলতে বলেন না। যন্ত্রপাতি, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, টেলিগ্রাফ — সবই তো তাঁর বিরাট কর্মজীবনে খুব বড় বড় অংশই গ্রহণ করেছে। পঞ্চাশ বছরের জনসাধারণের সেবায়, কি কারাগারে, কি বাইরে থেকে, রাজনৈতিক জগতের কঠিন বাস্তবতা আর নানা খুঁটিনাটি সক্রিয় ব্যাপারে দৈনন্দিন সংঘর্ষে এসে, তাঁর মানসিক স্থৈর্য, ঋজুতা, স্থিরবুদ্ধি আর এই অপরূপ মানবপ্রদর্শনী, তাঁর সরস গুণবিবেচনাকেই যেন বর্ধিত করে তুলেছে।

বাবাসাহেব দেশমুখ আমাদের তিনজনকে সান্ধ্যভোজনে নিমন্ত্রণ করলেন, সন্ধ্যা ৬টার সময়। সন্ধ্যা ৭টায় মগনবাদী আশ্রমে ফিরে এলাম; আশ্রমের ছাদে প্রার্থনাসভায় গান্ধীজীকে অর্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করে রয়েছেন প্রায় জনত্রিশেক সত্যাগ্রহী। একটা মাদুরের উপর তিনি বসে। একটি পুরান ট্যাকঘড়ি তাঁর ঝুলান রয়েছে। অস্তাচলগামী সূর্যের শেষকিরণলেখা অশ্বত্থ, তাল প্রভৃতি গাছের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ধ্যায় উচ্চিংড়ের একঘেয়ে সুর ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। আকাশে

---

* মিস স্লেড আমাকে আর এক বিশিষ্টা পাশ্চাত্য মহিলার কথা স্মরণ করিয়ে দেন — তিনি হচ্ছেন মিস মার্গারেট উডরো উইলসন; আমেরিকার স্বনামধন্য প্রেসিডেন্ট উডরো উইলসনের জ্যেষ্ঠা কন্যা। নিউ ইয়র্ক শহরে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর গভীর আগ্রহ। পরে তিনি পণ্ডিচেরীতে গমন করে তাঁর জীবনের শেষ পাঁচ বৎসর ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু শ্রীঅরবিন্দের পদতলে বসে সাধনায় অতিবাহিত করেন।

বাতাসে একটা গভীর প্রশান্তি বিরাজ করছে। মন বড়ই আনন্দে ভরে উঠল।

শ্রীযুক্ত দেশাই একটি স্তোত্র গম্ভীরভাবে আবৃত্তি শুরু করলেন, দলের অন্যান্য সকলে তাঁর সঙ্গে যোগদান করলেন; তারপরে গীতাপাঠ। মহাত্মাজী আমায় শেষ প্রার্থনাটি করতে ইঙ্গিত করলেন। ভাব আর আশার কি দৈবসম্মিলন। সন্ধ্যাতারার বিরাট চন্দ্রাতপতলে ওয়ার্ধার আশ্রমের ছাদে ভগবৎ আরাধনা — এ আমার চিরদিনের স্মৃতি হয়ে রইল।

ঠিক রাত আটটার সময় গান্ধীজী তাঁর মৌন ভঙ্গ করলেন। তাঁর জীবনের যে বিরাট কাজ, তাতে তাঁর সময় খুব হিসেব করেই ভাগ করে নিয়ে তাঁকে চলতে হয়।

“স্বাগত, স্বামীজী!” এবার আর তাঁর বাণী কাগজের মারফতে আমার কাছে এসে পৌঁছল না। এখন আমরা ছাদ থেকে নেমে এসে তাঁর লেখবার ঘরে প্রবেশ করলাম, — আসবাব খুব সামান্য; মেঝেতে মাদুরপাতা (চেয়ার নেই), একটা নীচু ডেস্ক তাতে বই, কাগজ আর গোটাকতক সাধারণ কলম (ফাউন্টেন পেন নয়); একটি নগণ্য ঘড়ি ঘরের এককোণে অবস্থিতি করে তার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে। সর্বব্যাপী একটা গভীর প্রশান্তি আর নিষ্ঠারভাব বিদ্যমান। গান্ধীজীর প্রায় দন্তবিহীন মুখগহ্বরবিগলিত প্রাণখোলা হাসি পরম উপভোগ্য!

গান্ধীজী বললেন, “বছরকতক আগে আমি সপ্তাহে একদিন মৌনী থাকা আরম্ভ করলাম — আমার চিঠিপত্র দেখাশোনা করবার জন্যে। কিন্তু এখন সে চব্বিশঘণ্টা আমার একটা দারুণ আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে গেছে। সাময়িক মৌনব্রতপালন, শাস্তি নয় — আশীর্বাদ!”

সর্বান্তঃকরণে আমি তাতে সায় দিলাম।* আমেরিকা, ইউরোপ সম্বন্ধে গান্ধীজী আমায় অনেক প্রশ্ন করলেন; তারপর আমরা ভারতবর্ষ আর পৃথিবীর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলাম।

---

* আমার সেক্রেটারী ও অতিথিঅভ্যাগতদিগের নানা অসুবিধাসত্ত্বেও আমেরিকায় আমি বহু বৎসর ধরেই মৌনব্রত পালন করে আসছি।

মহাদেব দেশাই ঘরে ঢুকতেই গান্ধীজী বললেন, "মহাদেব, কালরাত্রে টাউন হলে স্বামীজীর যোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা কর।"

তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নেবার সময় গান্ধীজী অত্যন্ত বিবেচনাসহকারে আমায় এক শিশি লেবুর তেল দিয়ে এক গাল হেসে বললেন, "ওয়ার্ধার মশারা কিন্তু আপনার ওসব অহিংসাটহিংসা* কিছুই মানে না, বুঝলেন স্বামীজী — একটু সাবধান হয়ে শোবেন।"

তার পরদিন সকালে সবাই দুধ আর গুড়ের সঙ্গে সুস্বাদু গমের ছাতুর মণ্ড দিয়ে প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করলাম। বেলা প্রায় সাড়ে দশটার সময় আমাদের সকলের খাবার ডাক পড়ল। গান্ধীজী এবং অন্যান্য সত্যাগ্রহীরাও সব বসেছেন। আজকের খাবারের তালিকায় রয়েছে রাঙা চালের ভাত, নতুন ধরণের নিরামিষ তরকারী আর এলাচ দানা।

দুপুরে আশ্রমের জমিতে কিছুক্ষণ বেড়ালাম। মাঝে মাঝে কয়েকটি শান্ত নিরীহ গাভীর গোচারণের মাঠ। গোরক্ষায় গান্ধীজীর একটা বিশেষ ঝোঁক ছিল।

মহাত্মাজী বলেছেন, "আমার কাছে গোজাতি মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ মানবেতর পৃথিবী, যার উপর মানুষের নিজের জাতি ছাড়াও তার সহানুভূতি বিস্তৃত। এই গোজাতির মধ্য দিয়েই মানুষ সকল প্রাণীর সঙ্গে তার ঐক্য অনুভব করতে পারে। প্রাচীন ঋষিরা কেন যে দেবত্বারোপে গোজাতিকে পূজার জন্যে নির্বাচিত করেছিলেন তা আমার কাছে বেশ পরিষ্কার। ভারতবর্ষের গোজাতিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ; প্রাচুর্যের দাত্রী সে। কেবলমাত্র সে যে দুগ্ধপ্রদানই করে তা নয়, কৃষিকার্যও সে সম্ভবপর করে তুলেছে। শান্ত প্রাণীদের কাছেই অনুকম্পা দেখতে পাওয়া যায়। গাভী হচ্ছে অনুকম্পার কাব্যরূপ। কোটি কোটি লোকেদের কাছে সে আর একটি মা! গো-সংরক্ষণ মানে ভগবানের রাজ্যে সমগ্র মূক

---

* অহিংসা — গান্ধীমতবাদের মূলভিত্তি। তিনি জৈনভাবের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। জৈনেরা অহিংসাকেই ধর্মের মূল বলে মানে। হিন্দুধর্মের এক শাখা জৈনধর্মের বিপুল প্রচার হয় বুদ্ধদেবের সমসাময়িক মহাবীর কর্তৃক খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে। মহাবীর — অর্থাৎ শ্রেষ্ঠবীর; আজ তিনি এই শতাব্দীসমূহের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে তাঁর এই বীরপুত্র গান্ধীর প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করুন।

প্রাণীজাতির সংরক্ষণ। সৃষ্টির নিম্নস্তরের জীবেদের আবেদন সব চেয়ে বেশি শক্তিশালী, কারণ তারা হচ্ছে মূক আর অসহায় জীব।"*

নিষ্ঠাবান হিন্দুর অবশ্যপালনীয় তিনটি আহ্নিকক্রিয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে 'ভূতযজ্ঞ' — পশুপক্ষীদের মধ্যে আহার বিতরণ। এই আচার পালন হচ্ছে সৃষ্টির নিম্নস্তরের প্রাণীদের প্রতি মানুষের কর্তব্য উপলব্ধির প্রতীক; এরা সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে দেহবোধে আবদ্ধ, (যা মানবজীবনকেও ক্ষয় করে) কিন্তু মানবজাতির যে বৈশিষ্ট্য — মুক্তিপ্রদায়িনী বিচার ও যুক্তি — তা এদের মধ্যে নেই।

'ভূতযজ্ঞ' এইরূপে দুর্বল প্রাণীদের পুষ্টিদানের জন্য মানুষের তৎপরতাকে দৃঢ় করে তোলে। সেও আবার আর একদিক দিয়ে উচ্চতর অদৃশ্যজীবদের অগণিত মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির দ্বারা সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করে। ভূমি, সমুদ্র, আর আকাশে প্রকৃতির যে অফুরন্ত সঞ্জীবন দান ছড়ান রয়েছে, তার কাছেও মানুষ ঋণী। বিবর্তনজনিত কারণে মূকপ্রকৃতি, প্রাণী, মানুষ আর পরলোকের দূতেদের পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদানের যে বাধা রয়েছে, তা এইরকম নীরব ভালবাসার দৈনিক যজ্ঞের দ্বারাই অতিক্রম করা যায়।

আর দু'টি দৈনিক যজ্ঞ হচ্ছে 'পিতৃ' আর 'নৃ'। পিতৃযজ্ঞ হচ্ছে পিতৃপুরুষদের তর্পণ — তাঁদের কাছে ঋণের কৃতজ্ঞতাস্বীকারের চিহ্ন, যাঁদের জ্ঞানের উৎকর্ষে আজ মানবজাতি আলোকিত। আর 'নৃযজ্ঞ' হচ্ছে অপরিচিত অথবা দরিদ্রদের মধ্যে আহার্য বিতরণ; এর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বর্তমান কর্তব্য — সমসাময়িকদের প্রতি তার দায়িত্ব পালন।

বিকালবেলা গান্ধী আশ্রমে ছোট ছোট মেয়েদের দেখতে গিয়ে আমি স্থানীয় পল্লীর মধ্যে নৃযজ্ঞ পালন করলাম। রাইট সাহেবও সঙ্গে গিয়েছিল, যেতে মিনিট দশেক লাগল। রঙবেরঙের শাড়ীর উপর মেয়েদের ছোট

* গান্ধীজী নানা বিষয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। প্রার্থনা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ "ঈশ্বরের সহায়তা ছাড়া আমরা যে কত অসহায়, সেটাই আমরা নিজেদের স্মরণ করিয়ে দেই। প্রার্থনা ব্যাতিরেকে কোন কাজই সমাপ্ত হয় না। আমাদের নির্দিষ্টভাবে বুঝতে হবে — মানুষের সর্বোত্তম প্রচেষ্টাও ফলবতী হবে না যদিনা তার আড়ালে ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকে। প্রার্থনা হলো নম্রতাকে আহ্বান। প্রার্থনা অন্তশুদ্ধি, অন্তরে অনুসন্ধান করার ডাক দেয়।"

ছোট মুখগুলি যেন ফুলের মত ফুটে রয়েছে। ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিন্দীতেই কথাবার্তা চলছিল — হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল; কি আর করি, হেসে রাইট সাহেব আর আমি তাড়াতাড়ি গাড়ি চেপে মগনবাদীতে ফিরে এলাম। সারা পথে সেকি দারুণ বর্ষণ!

অতিথিশালায় প্রবেশ করে সর্বত্র অনাড়ম্বর সরলতা আর আত্মত্যাগের নিদর্শন দেখে যেন আবার নতুন করে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। অপরিগ্রহ গান্ধীব্রত তাঁর বিবাহিত জীবনের গোড়ার দিকেই শুরু হয়। মহাত্মাজী তাঁর বিরাট আইনের প্র্যাকটিস, যাতে করে তাঁর বাৎসরিক প্রায় ২০,০০০ ডলার আয় ছিল, তা পরিত্যাগ করে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দেন।

ত্যাগের সাধারণ ও প্রচলিত ধারণাসম্বন্ধে শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী উপহাস করে বলতেন, —

"ভিখারী তো তার ঐশ্বর্য ত্যাগ করতে পারে না! কেউ যদি আক্ষেপ করে বলে ... 'আমার ব্যবসা দেউলে হয়েছে, আমার স্ত্রী আমায় ত্যাগ করেছে, আমি সব ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেব' — তাতে করে পৃথিবীতে তার ত্যাগের মহিমা আর থাকে কোথায়? সে তো আর ধনসম্পত্তি, স্নেহ, ভালবাসা এ'সব ত্যাগ করেনি — তারাই সব তাকে ত্যাগ করেছে।"

গান্ধীজীর মত মহাপুরুষেরা শুধু যে প্রত্যক্ষ কোন বিশেষ ত্যাগ করেই মহীয়ান তা নয়, তাঁদের ত্যাগ আরও কঠিন, আরও উচ্চ; তাঁরা তাঁদের সকলপ্রকার স্বার্থচিন্তা বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সবকিছু ত্যাগ করে তাঁদের অন্তরতম আত্মাকে অখণ্ড মানবজীবনস্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

যখন গান্ধীজী, তাঁর স্ত্রী আর সন্তানসন্ততিদের জন্যে নিজ সম্পত্তির কোনও অংশ স্বতন্ত্র করে রাখতে অসমর্থ হলেন, তখনও গান্ধীজীর স্বনামধন্যা স্ত্রী কস্তুরাবাঈ কোন আপত্তি করেন নি। যৌবনের প্রারম্ভেই গান্ধীজীর বিবাহ হয়; চারটি পুত্র জন্মাবার পর* গান্ধীজী ও তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মচর্য

---

* "দি স্টোরী অফ্ মাই এক্সপেরিমেন্টস উইথ ট্রুথ" (আমেদাবাদ, নবজীবন প্রেস) নামক পুস্তকে গান্ধীজী তাঁর জীবনের সকল কথাই অকপটে স্বীকার করেছেন। সি. এফ. এন্ড্রুজ সম্পাদিত ও জন হেইন্স হোমসের ভূমিকা সম্বলিত 'Mahatma Gandhi, His Own

পালনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। এই গভীর নাটকে, যাতে তাঁদের উভয়ের জীবন অভিনীত, তাতে কস্তুরাবাঈ হচ্ছেন একজন ধীর স্থির নায়িকা, যিনি কোন বিপদেই বিচলিত হন নি — অকম্পিতপদে স্বামীর সঙ্গে কারাবাসে গেছেন, তাঁর তিন সপ্তাহব্যাপী অনশনে অংশগ্রহণ করেছেন, এবং গান্ধীজীর অগণিত দায়িত্বসমূহে তাঁর অংশ তিনি পরিপূর্ণভাবেই বহন করেছেন। তিনি গান্ধীজীকে শ্রদ্ধাসহকারে বলেছেন ঃ—

"তোমার জীবনসঙ্গিনী আর সহকর্মিনী হবার সৌভাগ্যদান করার জন্য আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেই। আর ধন্যবাদ দিই পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা আদর্শ বিবাহের জন্যে যা ব্রহ্মচর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত — যৌনলিপ্সার উপর নয়। ধন্যবাদ দিই ভারতের জন্য তোমার জীবনের কাজে তোমার সমান ভেবে আমায় গ্রহণ করেছ বলে। আর তুমি যে সেইসব স্বামীদের মত নও, যারা জুয়া, ঘোড়দৌড়, সুরা, নারী আর গানবাজনাতেই সময় কাটিয়ে দেয়, আর ছোট ছোট ছেলেদের যেমন শীঘ্রই তাদের খেলার উপর বিতৃষ্ণা এসে পড়ে তেমনি তাদের স্ত্রীপুত্রের উপরও বিরাগ দেখা দেয় — সে'জন্যও আমি তোমায় ধন্যবাদ দিই। আর, পরের শ্রম অপহরণ করে বড়লোক হবার জন্যে যারা সময় ব্যয় করে, তুমি যে তাদের মত স্বামী নও তারজন্যেও আমি কত কৃতজ্ঞ!

"তোমার ঈশ্বরে পরিপূর্ণ, অখণ্ড বিশ্বাস, সাহসী আত্মপ্রত্যয় এবং ঈশ্বর ও স্বদেশকে অর্থলিপ্সার ঊর্ধ্বে স্থান দেবার জন্যে আমি কতই না কৃতজ্ঞ! আমি ধন্য যেহেতু আমি এমন একজনকে স্বামীরূপে পেয়েছি — যিনি ঈশ্বর ও দেশকে আমার কাছে আদর্শ করে তুলতে পেরেছেন। আর আমি কৃতজ্ঞ

Story' নামক গ্রন্থে এই আত্মজীবনীর সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়েছে। (নিউ ইয়র্ক; ম্যাকমিলন কোং, ১৯৩০)

বিখ্যাত ব্যক্তিদিগের নাম আর নানা বিচিত্র ঘটনার বিবরণপূর্ণ বহু আত্মজীবনীই কিন্তু লেখকের আত্মবিশ্লেষণ অথবা আত্মবিকাশের কোন ধারার সম্বন্ধে প্রায় একেবারেই নীরব থাকে। এইগুলি পড়ে পাঠককে কতকটা অতৃপ্তির সঙ্গেই বইটি নামিয়ে রেখে যেন বলতে হয়, — "জীবনী যাঁর পড়লাম, তিনি তো অনেক বড় বড় লোকেদেরই পরিচয় পেয়েছিলেন, কিন্তু এতে দেখছি যে তিনি নিজের পরিচয় কখনও পান নি"; গান্ধীজীর আত্মজীবনী পড়ে এরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া অসম্ভব; তিনি তাঁর নিজের দোষত্রুটি, ছলকপটতা, সত্যের প্রতি নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বাসের সঙ্গে প্রকাশ করেছেন, যা যে কোন যুগের লেখায় একান্তই দুর্লভ।

তোমার কাছে তোমার অপরিসীম সহ্যগুণের জন্যে, আমার যৌবনের দোষ, ত্রুটি সব মার্জনা করে নেওয়াতে; তখন, অত প্রাচুর্যের মধ্য থেকে অত অস্বচ্ছলতার মধ্যে পড়ে আমাদের জীবনযাপনের ধারা পরিবর্তন করতে হওয়ায় কত না আক্ষেপ, কত না অশান্তি তোমার বিরুদ্ধে করেছি!

"শৈশবে তোমাদের বাড়িতেই আমি মানুষ হই; তোমার মা ছিলেন উচ্চমনা আর মহীয়সী নারী। তিনিই আমায় গড়ে তোলেন। তিনি আমায় শিক্ষা দেন কি করে সাহসী, দৃঢ়চেতা আর উপযুক্তা স্ত্রী হতে পারা যায়, কি করে তাঁর পুত্র — আমার ভবিষ্যৎ স্বামীর — ভালবাসা আর সম্মান অর্জন করতে পারি। বছরের পর বছর কাটতে লাগল — তুমি ভারতে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা হলে, তখনও কিন্তু এ ভয় ছিল না যে স্বামী উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করলে স্ত্রী যেমন দূরে পড়ে থাকে, আমার ভাগ্যেও তাই ঘটবে — যা সচরাচর অন্যান্য দেশে ঘটে থাকে। আমি জানি যে মরণেও আমরা সেই স্বামী-স্ত্রী দু'জনে এক হয়েই থাকব।"

সর্বজনপ্রিয় গান্ধীজী যে কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করেন, সেই ধন-ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব কস্তুরাবাঈ বহুদিন ধরে সুচারুরূপে পালন করেছিলেন। এ সম্বন্ধে অনেক মজার মজার গল্প আছে: গয়নাটয়না পরে স্ত্রীরা যদি গান্ধীজীর কোন ভাষণ শুনতে যায় তাহলে স্বামী বেচারাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয় — কারণ সভায় পদদলিত জনসাধারণের জন্যে গান্ধীজীর চিত্তদ্রবকারী আবেদনে ধনী স্ত্রীরা গলা থেকে হীরার নেকলেস আর হাত থেকে সোনার ব্রেসলেট খুলে সোজাসুজি ভিক্ষার ঝুলিতে দিয়ে না বসে!

একদিন জনতা ধনভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষা কস্তুরাবাঈ মাত্র চারিটি টাকার খরচের হিসেব মেলাতে পারছিলেন না। গান্ধীজী হিসেব-নিকেশের বিবরণ যথাযথ প্রকাশ করলেন — দেখা গেল তাতে তাঁর স্ত্রীর হিসেবের গরমিল বেশ সুস্পষ্টভাবেই দেখান হয়েছে।

আমার আমেরিকান শিষ্যদের সঙ্গে ক্লাসে আমি প্রায়ই এই গল্পটি করতাম। একদিন সন্ধ্যেবেলা জনৈকা মহিলা রাগে চিৎকার করে বলে উঠল, —

"মশায়, তিনি মহাত্মাই হোন আর যাই-ই হোন না কেন, তিনি যদি আমার স্বামী হতেন, তাহলে আমায় সাধারণের সামনে এরকম অযথা অপমানের জন্যে ঠেঙিয়ে তাঁর চোখে কালশিরে পড়িয়ে দিতাম।"

যাইহোক, মার্কিন আর হিন্দু স্ত্রী সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কতকগুলি সরস বাদানুবাদের পর আমি তখন আর একটু বিস্তারিতভাবে বললাম, —

"শ্রীমতী গান্ধী, মহাত্মাজীকে শুধু তাঁর স্বামী বলেই বিবেচনা করেননি, তাঁর গুরু বলেই মনে করতেন, তাঁর সামান্যতম ভুলেরও যাঁর সংশোধন করে দেবার অধিকার ছিল। কস্তুরাবাঈয়ের সাধারণের সম্মুখে ভর্ৎসিত হবার পর রাজনৈতিক অপরাধে গান্ধীজী জেলে যান। তিনি যখন শান্তভাবে স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায়গ্রহণ করছিলেন, তখন কস্তুরাবাঈ তাঁর পদতলে পতিত হয়ে অতি দীনভাবে বললেন, 'প্রভু, আমি যদি কখনও আপনার চরণে অপরাধ করে থাকি, তাহলে দয়া করে আমায় মার্জনা করবেন।'"

ওয়ার্ধায় সেদিন বিকালে বেলা তিনটের সময়, পূর্ববন্দোবস্ত অনুযায়ী আমি মহাত্মাজীর লেখবার ঘরে গিয়ে হাজির হলাম। গান্ধীজী — যিনি নিজের স্ত্রীকে একজন একনিষ্ঠা শিষ্যা তৈরী করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন, যা একটা পরমাশ্চর্য ব্যাপার — তিনি মুখ তুলে চাইলেন — মুখে সেই হাসি, যা কখনও ভোলবার নয়।

খোলা মাদুরের উপর তাঁর পাশে বসে পড়ে আমি বললাম, "মহাত্মাজী, আপনার 'অহিংসা'র মানে কি?"

"চিন্তায় বা কাজে কোন প্রাণীর ক্ষতি করার ভাব পরিহার করা।"

চমৎকার আদর্শ! কিন্তু সকলেই তো বলবে যে, একটা শিশুকে অথবা নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে, কেউ কি একটা কেউটে সাপও মারতে পারবে না?"

"কেউটে সাপ মারতে গেলে আমার দুটো প্রতিজ্ঞা, — নির্ভীকতা আর অহিংসা — এ দুটো ভাঙতে হয়। তারচেয়ে তাকে বরং মনে মনে আমি ভালবাসার অনুভূতি দ্বারা জয় করবার চেষ্টা করব। অবস্থার প্রয়োজনে আমার আদর্শকে আমি নীচু করতে পারি না।" তারপর তাঁর

অপূর্ব সারল্যের সঙ্গে তিনি বললেন, "অবশ্য এ কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে কেউটে সাপের সামনে পড়লে আমি যে এরকম ভাবে কথাবার্তা কইতে পারতাম না, সে কথাও ঠিক।"

ডেস্কের উপরে খাদ্যসম্বন্ধে লেখা অতি আধুনিক কতকগুলি বিলাতী বই পড়েছিল — তাদের সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করাতে তিনি একটু হেসে বললেন, "সব জায়গায় যেমনি, সত্যাগ্রহ আন্দোলনেও তেমনি খাদ্য বিচারও একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। সত্যাগ্রহীদের জন্যে পরিপূর্ণ সংযম প্রচার করি বলে ব্রহ্মচারীদের জন্যে আমি সবচেয়ে উপযুক্ত আহার নির্বাচন করবার সর্বদা চেষ্টা করছি। ইন্দ্রিয়সংযমের আগে রসনা সংযম প্রয়োজন। অর্ধাহার বা অসম খাদ্যগ্রহণ এর উত্তর নয়। আগে অন্তরে খাদ্যের লোভ সংবরণ করে তারপর সত্যাগ্রহী প্রয়োজনীয় সব খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন), খনিজপদার্থ, ক্যালোরি ইত্যাদি সমেত উপযুক্ত নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা সব অনুসরণ করে চলবে। খাদ্যসম্বন্ধে অন্তঃ ও বহির্জ্ঞানের দ্বারা সত্যাগ্রহীর শুক্র তার সর্বশরীরে প্রাণশক্তিরূপে সহজেই পরিণত হয়।"

মহাত্মাজী ও আমি, দু'জনায় মিলে, মাংসের পরিবর্তে কি ভাল প্রতিকল্প ব্যবহার করা যায় তাই নিয়ে আলোচনা করলাম। আমি বললাম, "এভোকেডো হচ্ছে খুবই ভাল, আমার ক্যালিফোর্ণিয়া আশ্রমের কাছে অসংখ্য এভোকেডো কুঞ্জ আছে।"

গান্ধীজীর মুখ আগ্রহ ও উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "আমি ভাবছি, সে সব কি ওয়ার্ধায় ফলবে? তা হলে সত্যাগ্রহীরা একটা নতুন খাদ্য পেয়ে খুশিই হবে।"

আমি বললাম, "লস অ্যাঞ্জেলিসে ফিরে গিয়ে ওয়ার্ধায় আমি নিশ্চয়ই এভোকেডো গাছ পাঠাব। ডিম হচ্ছে প্রোটিনসমৃদ্ধ একটি আহার, কিন্তু তা কি সত্যাগ্রহীদের পক্ষে গ্রহণ করা বারণ?"

গান্ধীজী অতীতের কথা স্মরণ করে একটু হেসে বললেন, "বাওয়া ডিম অবিশ্যি নয়। কিন্তু তা হলেও বহুবছর ধরেই আমি তাদের তা ব্যবহার করতে দিই নি — এমন কি এখনও পর্যন্ত আমি নিজে তা খাই না। আমার

একটি পুত্রবধূ একবার পুষ্টিহীনতার জন্যে মরমর অবস্থায়পৌঁচেছিল — ডাক্তার তাকে ডিম খাওয়াবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল; আমি রাজী না হয়ে তাকে ডিমের বদলে অন্য কিছু ব্যবস্থা করবার উপদেশ দিলাম।

"ডাক্তার বললেন, 'গান্ধীজী, বাওয়া ডিমে কোন প্রাণের বীজ নেই; এতে প্রাণীহত্যার আশঙ্কা নেই, আপনি অনায়াসে ডিম খেতে পারেন।'

"তখন আমি খুশি হয়ে পুত্রবধূটিকে ডিম খেতে অনুমতি দিলাম; শীঘ্রই সে স্বাস্থ্য ফিরে পেল।"

আগের দিন রাত্রে, গান্ধীজী লাহিড়ী মহাশয়ের ক্রিয়াযোগ দীক্ষা গ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মহাত্মাজীর খোলা মন আর অনুসন্ধিৎসা দেখে আমি অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর ঈশ্বরানুসন্ধান ছিল শিশুদেরই মত সরল — যে সারল্য শিশুদের হৃদয়কে পবিত্র আধারস্বরূপে প্রকাশিত করে দেখে যীশুখ্রিস্ট প্রশংসা করে বলেছেন, "এদের ভিতরেই স্বর্গরাজ্য।"

আমার প্রতিশ্রুত উপদেশ দেবার নির্ধারিত সময় এল। জনকয়েক সত্যাগ্রহী তখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন, — শ্রীযুক্ত দেশাই, ডাক্তার পিঙ্গেল, এবং আরও কয়েকজন, যাঁরা "ক্রিয়া" নিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

প্রথমে আমি সেই ছোট্ট ক্লাসটিতে যোগদার শারীরিক ব্যায়াম কৌশলগুলি শিখিয়ে দিলাম। শরীরকে বিশটি অংশে বিভক্ত বলে দেখতে হয়। মন একে একে তাদের প্রত্যেক অংশে শক্তি প্রেরণ করে। ব্যায়াম অভ্যাসের ফলে শীঘ্রই প্রত্যেকে আমার সামনে একটি করে মানবমোটররূপে স্পান্দত হতে লাগলেন। গান্ধীজীর বিশটি দেহাংশে ঢেউ খেলানোর মত যোগাভ্যাসের ক্রিয়ার ফল সহজেই প্রত্যক্ষ হল ... সব সময়েই তা সম্পূর্ণভাবে দৃষ্টিগোচর! খুব রোগা শরীর হলেও তাঁকে দেখতে একেবারে বেমানান নয়, শরীরের ত্বক তাঁর মসৃণ আর বলিহীন।*

---

* গান্ধীজী বহু স্বল্প ও দীর্ঘকালীন অনশন করেছেন। অসাধারণ ভাল তাঁর স্বাস্থ্য। তাঁর লেখা বই — ডায়েট এণ্ড ডায়েট রিফর্ম, নেচার কিওর, আর কী টু হেলথ্ আহমেদাবাদে নবজীবন পাবলিশিং হাউসে প্রাপ্তব্য।

তারপরে তাঁদের আমি সব "ক্রিয়াযোগে"র মুক্তিদায়িনী প্রক্রিয়াতে দীক্ষিত করলাম।

মহাত্মাজী পৃথিবীর সকল ধর্মের বিষয়ই শ্রদ্ধাসহকারে পড়াশোনা করেছেন। গান্ধীজীর অহিংসা-ধর্মের মূলে আছে জৈনশাস্ত্র, বাইবেলের নূতন টেস্টামেণ্ট আর টলস্টয়ের* সমাজতত্ত্ব বিষয়ক লেখা — এই তিনটি প্রধান উপাদান। নিজের মতবাদ সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেছেন ঃ—

"বেদের মতই আমি বাইবেল, কোরাণ আর জেন্দাবেস্তাকে† দৈবানুপ্রাণিত বাণী বলেই মনে করি। আমি গুরুবাদে বিশ্বাস করি, কিন্তু এ যুগে সাধারণ লোকদের কোনরকম গুরু গুরু ছাড়াই চলতে হবে, কারণ পূর্ণজ্ঞান আর পরিপূর্ণ পবিত্রতার সমাবেশ একত্র দেখতে পাওয়া নিতান্তই দুর্লভ। কিন্তু নিজ ধর্মের সত্য কখনও জানতে পারবেনা বলে কারোর হতাশ হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ সকল প্রধান ধর্মমতেরই মত হিন্দুধর্মের মূলসত্যও অপরিবর্তনীয় আর সহজ বোধগম্য।

"প্রত্যেক হিন্দুর মত আমিও ঈশ্বর এবং একেশ্বরবাদ, পুনর্জন্ম ও মুক্তিতে বিশ্বাস করি ... হিন্দুধর্মসম্বন্ধে আমার মনোভাব আমার নিজ স্ত্রীর প্রতি যা, তার চেয়ে বেশি বর্ণনা করতে পারি না। তিনি আমার মনে যেরকম সাড়া ফেলেন — পৃথিবীতে অন্য কোন স্ত্রীলোক তেমন পারে না। তাঁর মধ্যে যে কোন দোষ নেই তা নয়; আমি জোর করেই বলতে পারি যে তাঁর এমন অনেক কিছু দোষ আছে যা আমি নিজে দেখতে পাই না। কিন্তু তবুও সেখানে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনের ভাব বিদ্যমান। সেইরকম আমি হিন্দুধর্মকে তার সব দোষ আর সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শ্রদ্ধা করি। গীতার শ্লোক আর তুলসীদাসের রামায়ণের চেয়ে আর কিছু আমায় বেশি আনন্দ দেয় না। যখন মনে হবে আমার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে আসছে, গীতাই তখন আমার একমাত্র শান্তির স্থল হয়ে দাঁড়াবে।

---

* প্রতীচ্যের আরও তিনটি লেখক — থোরো, রাস্কিন ও ম্যাজিনির সমাজনীতিসম্বন্ধীয় মতবাদও গান্ধীজী সযত্নে অধ্যয়ন করেছিলেন।

† ১০০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে জরথুস্ত্র কর্তৃক রচিত পারস্যদেশের ধর্মশাস্ত্র।

"হিন্দুধর্ম কোন বিশিষ্ট ধর্ম নয়। এ ধর্মের মধ্যে পৃথিবীর সকল মহাপুরুষদের শ্রদ্ধার ও পূজার স্থান আছে।* সাধারণ ভাষায় যাকে বলে প্রচারকদের ধর্ম, এ তা নয়। এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য যে হিন্দুধর্ম বহুজাতিকে আপন অঙ্কে স্থান দিয়েছে, কিন্তু এই গ্রহণ বিবর্তনপ্রসূত, আর তা অজানিতভাবেই ঘটেছে। হিন্দুধর্ম প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ বিশ্বাস বা ধর্ম† অনুসারে ঈশ্বরকে ভজনা করতে বলে — আর তাই অন্য কোন ধর্মের সঙ্গে এর কোনই বিরোধ নেই।"

যীশুখ্রিস্ট সম্বন্ধে গান্ধীজী লিখেছেন, "আমার স্থির বিশ্বাস, যদি তিনি এ সময়ে এখনকার লোকেদের মধ্যে বাস করতেন, তা হলে তিনি অনেকের জীবনকেই আশীর্বাদপূত করতেন, যারা তাঁর নাম পর্যন্তও কখন শোনে নি ... যেমন তাঁর বাণীতে আছে, 'যারা আমায় শুধু হে প্রভু, হে প্রভু বলেই ডেকেছে, কেবল তারাই নয় ... যে আমার পিতার ইচ্ছা পালন করেছে।'‡ যীশু তাঁর নিজের জীবনের আদর্শে মানবজাতিকে যে বিরাট উদ্দেশ্য আর একমাত্র লক্ষ্য প্রদর্শন করেছিলেন, তাঁর অনুসরণেই আমাদের সকলের প্রয়াস করা উচিত। আমি বিশ্বাস করি যে কেবলমাত্র খ্রিস্টানদেরই যে তিনি তা নয় — তিনি সকল দেশ, সকল জাতি, সমগ্র পৃথিবীর।"

ওয়ার্ধা অবস্থানের শেষের দিন সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত দেশাই কর্তৃক টাউন হলে আহুত একটি সভায় আমায় বক্তৃতা দিতে হল। যোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনবার জন্যে প্রায় চারশো লোকের সমাগমে ঘরটির জানালার পাড়

---

* পৃথিবীর ধর্মসকলের মধ্যে হিন্দুধর্মের একটা অপূর্ব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, কোন একজনমাত্র বিশিষ্ট ধর্মপ্রবর্তকের দ্বারা এ প্রতিষ্ঠিত নয় — এর উৎপত্তি হচ্ছে অপৌরুষেয় বৈদিক শাস্ত্র হতে। তাই হিন্দুধর্মের ক্রোড়ে সকল যুগ আর সকল দেশের ধর্মোপদেষ্টাদের পূজা ও শ্রদ্ধার স্থান পাবার সুযোগ আছে। বৈদিকশাস্ত্রসকল, মানবের প্রত্যেক কার্য দৈববিধি অনুযায়ী পরিচালিত করবার প্রচেষ্টায় শুধু যে পূজার্চনা তাই নয়, তার অতি প্রয়োজনীয় সামাজিকবিধি ও প্রথাসকলও নিয়ন্ত্রিত করে।

† ধর্ম — সংস্কৃত শব্দ বিধির ব্যাপক অর্থ। ন্যায়বিধি বা স্বাভাবিক ধর্মভাবের অনুসরণ। অবস্থা বিশেষে নির্দিষ্ট মানুষের তৎকালীন কর্তব্যপালন। শাস্ত্রসমূহে ধর্মের সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া আছে ঃ "বিশ্ববিধান, যার পালনে মানুষ নিজেকে অধোগতি আর দুঃখভোগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।"

‡ ম্যাথিউ ৭ ঃ ২১। (বাইবেল)

পর্যন্ত ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে হিন্দীতে পরে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেই। আমাদের ছোট্ট দলটি ঠিক সময়মত আশ্রমে ফিরতে পেরেছিল। শুভরাত্রি জ্ঞাপন করতে এসে দেখলাম গান্ধীজী পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে চিঠিপত্র লেখায় ব্যস্ত।

ভোর পাঁচটায় উঠলাম — তখনও রাত রয়েছে। গ্রামে জীবনের স্পন্দন ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। প্রথমে আশ্রমদ্বারের সামনে দিয়ে একটি গরুর গাড়ি গেল, তারপর একজন কৃষক একটা প্রকাণ্ড মোট বিপজ্জনকভাবে মাথার উপর বসিয়ে চলেছে দেখা গেল। প্রাতঃরাশের পর আমরা তিনজন বিদায় নেবার জন্যে গান্ধীজীর সন্ধানে গেলাম। গান্ধীজী ঊষাকালীন প্রার্থনার জন্যে আরও ভোরে ওঠেন — ভোর ৪টায়।

নতজানু হয়ে পাদস্পর্শ করে বললাম, "মহাত্মাজী প্রণাম, এবার বিদায় দিন। আপনার পরিচালনায় ভারত আজ নিরাপদ।"

ওয়ার্ধা ভ্রমণের পর বহু বৎসর অতীত হয়েছে। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ আজ বিশ্বযুদ্ধে ঘন তমসাচ্ছন্ন। পৃথিবীর বড় বড় নেতাদের মধ্যে একমাত্র গান্ধীজীই কেবল সশস্ত্র শক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত সক্রিয় অহিংস প্রতিরোধের উপায় বার করেছেন। সকল অত্যাচার, অবিচারের প্রতিকারে মহাত্মাজী অহিংসপন্থাকেই অবলম্বন করেছেন, যা বারম্বার তার ফলপ্রসূতাই প্রমাণ করেছে। তাঁর মতবাদ তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটি কথায় ব্যক্ত করেছেন ঃ—

"ধ্বংসের মধ্যেও জীবনের প্রবহমানতা আমি দেখেছি। সুতরাং ধ্বংসের চেয়ে আরও উচ্চতর বিশ্ববিধান নিশ্চয়ই আছে। কেবলমাত্র ঐ নিয়মের অধীনেই সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত সমাজ সহজগ্রাহ্য হবে আর জীবনও উপভোগ্য হবে।

"জীবনের যদি এই-ই নিয়ম হয়, তাহলে আমরা প্রাত্যহিক জীবনেও অবশ্যই তা পালন করে যাব। যেখানেই যুদ্ধ দেখা দেবে, যেখানেই আমরা কোন বিরোধীপক্ষের সম্মুখীন হবো, সেখানেই আমরা ভালবাসা দিয়েই তাকে জয় করব। আমি দেখেছি — ভালবাসার কতকগুলি ধারা আমার জীবনে বহু প্রশ্নের সমাধান করেছে, যা ধ্বংসবিধি কখনও করতে পারেনি।

"ভারতে সম্ভবপর সবচেয়ে ব্যাপক ক্ষেত্রে এই বিধির কার্যকারিতার চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আমি অবশ্য একথা বলিনা যে ভারতের ছত্রিশকোটি লোকের ভিতরেই অহিংসামন্ত্র প্রবেশ করেছে, তবে এ কথা আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, অন্য যেকোন মতের চেয়ে এই মত অবিশ্বাস্য দ্রুত সময়ের মধ্যে লোকের অন্তরে খুব গভীরতর ভাবেই প্রবেশ করেছে।

"মনে অহিংসভাব আনবার চেষ্টা রীতিমত পরিশ্রম আর শিক্ষাসাপেক্ষ ব্যাপার। সৈনিকের মতই নিয়মনিষ্ঠ জীবনযাপন করা চাই। পরিপূর্ণ অবস্থা তখনই লাভ হয় যখন বাক্য, দেহ, মন এসবের উপযুক্ত সমন্বয় সাধিত হয়। সত্য আর অহিংসাকেই যদি আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র করি, তাহলে প্রত্যেক সমস্যারই সমাধান পাওয়া যাবে।"

পৃথিবীর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বীভৎসতা নির্মমভাবে এই সত্যই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অভাবে ধ্বংসই হবে মানুষের পরিণতি। ধর্ম না হলেও বিজ্ঞানই মানবজাতির মনে নিরাপত্তার অভাববোধের ক্ষীণ আভাস, এমনকি সমস্ত পার্থিব বস্তুর একটা অনিত্যতাবোধকে জাগিয়ে তুলেছে। সত্যই, মানুষ এখন তার আদিকারণ ও তার অন্তরস্থিত সেই পরমাত্মার কাছে ছাড়া আর কোথায়ই বা যেতে পারে?

ইতিহাস পর্যালোচনা করে যে কেউ যুক্তিসঙ্গতভাবেই বলতে পারে যে মানবজাতির সমস্যা পশুশক্তির দ্বারা কখনও সমাধান হয় নি। প্রথম মহাযুদ্ধের পৃথিবীব্যাপী ক্রমবর্ধমান অমঙ্গলজনক কর্মফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উৎপত্তি হয়। একমাত্র বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রেমমন্দাকিনীধারাই এই যুদ্ধের রক্তপাতজনিত কর্মফলের হিমালয়প্রমাণ বিরাট তুষারস্তূপ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ধুয়েমুছে দিতে পারে; আর তা না হলে তা থেকে আবার তৃতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হতে পারে। বিংশ শতাব্দীর অমঙ্গলত্রয়ী! বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাবার জন্যে মানবীয় যুক্তির বদলে পাশবিক যুক্তি প্রয়োগ করলে পৃথিবী জঙ্গলেই পরিণত হবে। জীবিত অবস্থায় ভাই হতে না পারলেও, ভয়াবহ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তারা ভাই হয়ে উঠবে। এইরূপ ভাবের ঘৃণ্য হীনতার জন্যে ভগবান নিশ্চয়ই মানুষকে স্নেহবশে আণবিকশক্তির রহস্য উন্মোচনে অনুমতি দেননি।

যুদ্ধ আর অপরাধ শেষ পর্যন্ত কখনও সুফল আনে না। কোটি কোটি টাকা, যা বিস্ফোরকের ধোঁয়াতে শূন্যে মিলিয়ে গেল, তা দিয়ে আর একটা নতুন পৃথিবী গড়া যেতে পারত — যে পৃথিবী হতো প্রায় আধিব্যাধিশূন্য, আর দারিদ্র্যের কবল হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত! ভয়, বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রভৃতির মত প্রলয়নাচনের এ পৃথিবী নয় — এ পৃথিবী হচ্ছে শান্তি, সুখ, সৌভাগ্য আর জ্ঞান প্রসারের এক প্রশস্ত ক্ষেত্র!

গান্ধীজীর অহিংস বাণী মানুষের সর্বোচ্চ বিবেককে জাগিয়ে তোলে। আজ পৃথিবীর সকল জাতিই সঙ্ঘবদ্ধ হোক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নয় —জীবনের ভিতর দিয়ে; ধ্বংসের মধ্যে নয় — গঠনের ভিতর দিয়ে; ঘৃণা দিয়ে নয়, প্রেমের অলৌকিক সৃজনকারিতার মধ্য দিয়ে।

মহাভারতে আছে যে, "মানুষের ক্ষতি যত বড়ই হোক না কেন, তার জন্যে তার ক্ষমা করা উচিত। বলা হয় — মানুষ ক্ষমাশীল হওয়ার কারণেই জীবনধারা অব্যাহত রয়েছে। ক্ষমাই পুণ্য; ক্ষমার দ্বারাই জগৎ ধৃত। ক্ষমাই হচ্ছে শক্তিমানের শক্তি। ক্ষমা হচ্ছে ত্যাগ, ক্ষমাতেই মনের শান্তি। আত্মসংযমী যারা, তাদের গুণই হচ্ছে ক্ষমা আর সৌজন্য। এরা অনন্তগুণেরই পরিচয় দেয়।"

অহিংসা হচ্ছে ক্ষমা আর প্রেমের বিধানের স্বাভাবিক পরিণতি। গান্ধীজী বলেন, "ধর্মযুদ্ধে যদি প্রাণসংহার করা নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তাহলে লোকে যীশুখ্রিস্টের মত, যেন তার নিজেরই রক্তপাত ঘটায় অন্যের নয়। তাহলেই পৃথিবীতে রক্তপাত একেবারে কমে আসবে।"

ভারতের সত্যাগ্রহীদের বিষয়ে হয়ত কোন একদিন কোন মহাকাব্য লিখিত হবে — যারা ঘৃণাকে ভালবাসা দিয়ে, হিংসাকে অহিংসা দিয়ে জয় করেছে, যারা অস্ত্রধারণের পরিবর্তে নিজেদেরকে নির্দয়ভাবে হত্যা করতে দিয়েছে। ফল হয়েছে এই যে, কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনায় সশস্ত্র বিপক্ষদল তাদের হাতের বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দারুণ লজ্জায় পালিয়েছে; যারা নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে পরের জন্যে আত্মদান করতে প্রস্তুত, সে সব লোকেদের দেখে তাদের অন্তর গভীরভাবে আলোড়িত হয়ে উঠেছে।

গান্ধীজী বলেন, "যদি দরকার হয় তো আমি যুগযুগান্ত ধরেও অপেক্ষা করতে প্রস্তুত আছি — কিন্তু রক্তপাতের পন্থায় আমি কখনও দেশের স্বাধীনতা চাইব না।" বাইবেলও আমাদের এই বলে সাবধান করে দেয় যে, "যারা তরবারি ধারণ করে, তাদের তরবারিতেই মৃত্যু হয়।"* গান্ধীজী লিখেছেন, —

> "আমি নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলি — কিন্তু আমার জাতীয়তাবাদ বিশ্বের মত উদার। এর কোলে পৃথিবীর সকল জাতির ঠাঁই।† আমার জাতীয়তাবাদ সারা পৃথিবীর মঙ্গল কামনা করে। আমি চাইনা যে, আমার ভারত অন্যান্য জাতির ভস্মাবশেষের উপর গড়ে উঠুক। আমি চাই না ভারত একটিমাত্র লোককেও শোষণ করে। আমি চাই যে ভারত শক্তিশালী হয়ে উঠুক, যাতে করে সে অপর জাতিদের মধ্যেও তার শক্তি সঞ্চারিত করতে পারে। আজকে ইউরোপে একটা জাতিরও মধ্যে তা নেই; তারা আর অপরাপর জাতিদের কোন শক্তিই দান করতে পারে না।
>
> "প্রেসিডেণ্ট উইলসন তাঁর চমৎকার চোদ্দটি ধারা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বলেছেন, 'পরিশেষে শান্তিলাভের জন্য যদি আমাদের এই প্রচেষ্টা বিফল হয়, তাহলে আমাদের অস্ত্রের উপরই নির্ভর করতে হবে।' আমি সে ব্যবস্থাটা বদলে দিয়ে বলতে চাই, 'আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ইতিমধ্যেই বিফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখন নতুন একটা কিছু খুঁজে বার করতে হবে; এখন আমাদের প্রেমের শক্তি আর ঈশ্বর যিনি পরম সত্য, এই দু'টি জিনিষের দ্বারা চেষ্টা করা যাক! আমরা যখন সেটাকে পাব তখন আর আমাদের চাইবার কিছু থাকবে না।"

---

* ম্যাথিউ, ২৬ ঃ ৫২ (বাইবেল)। বাইবেলে এইরকম অসংখ্য পঙ্‌ক্তি আছে যা মানুষের জন্মান্তর সুস্পষ্ট অর্থ সূচিত করে। (১৬ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কর্ম্মফলের ন্যায়ের বিধি জানা থাকলে জীবনের বহু জটিল ব্যাপারের অর্থ সহজবোধ্য আর সরল হয়ে আসে।

† "মানুষ যেন না গৌরব করে, বিতরিয়া প্রেম দেশে,
সে যেন বরং গর্বিত হয়, স্বজাতিকে ভালবেসে।"
— পারসিক প্রবাদ।

মহাত্মা গান্ধীর হস্তলিপি (হিন্দীতে)

মহাত্মা গান্ধী যোগদা সৎসঙ্গ ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শকদের মন্তব্যপুস্তকে তিনি অনুগ্রহপূর্বক উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলি লিখে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"এই বিদ্যালয় আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। আমি মনে এই উচ্চ আশা পোষণ করি যে এই বিদ্যালয় চরকার অধিকতর ব্যবহারে উৎসাহদান করবে।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৫ (স্বাঃ) মোহনদাস গান্ধী

মহাত্মাজীর দ্বারা শিক্ষিত হাজার হাজার খাঁটি সত্যাগ্রহীরা (যাঁরা এই রিচ্ছেদের প্রথমাংশে বর্ণিত এগারটি কঠিন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন), ারা আবার নিজেরা সত্যাগ্রহের বাণী প্রচার করেন; অহিংসার আধ্যাত্মিক বং পরিশেষে পার্থিব উপকার উপলব্ধি করবার জন্যে ভারতের নসাধারণকে ধৈর্যের সঙ্গে শিক্ষা দেন। অবিচারের সঙ্গে অসহযোগ, স্ত্রগ্রহণ অপেক্ষা অপমান, কারাবাস, এমন কি মৃত্যুবরণ করবার ইচ্ছা — ই সব অহিংস অস্ত্রে তাঁর বাহিনী সজ্জিত করে সত্যাগ্রহীদের মধ্যে ারজনোচিত অগণিত আত্মোৎসর্গের উদাহরণের মধ্য দিয়ে জগতের লাকেদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, গান্ধীজী যুদ্ধ ব্যতিরেকে বিবাদ সম্বাদ নিষ্পত্তি করবার জন্যে অহিংসার বাস্তবতা ও মহান শক্তি টকীয়ভাবে চিত্রিত করেছেন।

বন্দুকের গুলিচালনার সাহায্যে কোন দেশের কোন নেতা তাঁর দেশের জন্য এ পর্যন্ত যতটা করতে পেরেছেন, গান্ধীজী অহিংস উপায়ে তার চেয়ে ঢের ঢের বেশি রাজনৈতিক সুবিধা ইতিমধ্যে আদায় করে নিতে পেরেছেন। সকল অন্যায়, অমঙ্গল, সকল দুঃখ, অহিংস উপায়ে উন্মিলিত করবার প্রণালী শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই যে আদর্শভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তা নয়, ভারতের সমাজসংস্কারের সূক্ষ্ম আর জটিল ক্ষেত্রেও একে প্রয়োগ করা হয়েছে। হিন্দু-মুসলমানের বহুদিনের বহু বিবাদবিসম্বাদ গান্ধীজী আর তাঁর অনুগামীরা দূর করতে পেরেছেন; লক্ষ লক্ষ মুসলমান গান্ধীজীকেই তাঁদের নেতা বলে মনে করেন। অস্পৃশ্যরা গান্ধীজীকে তাদের নির্ভীক আর অজেয় নেতা বলে মনে করে। গান্ধীজী লিখেছেন, "আমার কপালে যদি পুনর্জন্ম লেখা থাকে, তাহলে আমি পতিতদের মধ্যে একজন পতিত হয়েই জন্মাতে চাই — কারণ তা হলে তাদের জন্যে আরও বেশি কাজ করতে পারব।"

মহাত্মা বাস্তবিকই এক মহান আত্মা; ভারতের কোটি কোটি অশিক্ষিত জনসাধারণের অন্তর হতে স্বতঃ উৎসারিত হয়ে এ উপাধিটি তাঁর প্রতি প্রযুক্ত হয়েছে। এই শান্ত মহাপুরুষটি তাঁর স্বদেশের জনসাধারণের অন্তরে এক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আর সম্মানের আসন অধিকার করে রয়েছেন। গান্ধীজীর উচ্চ আশা নিম্নতম কৃষকদের মধ্যেও ফলবতী হয়ে উঠেছে। মানুষের অন্তরে যে একটা সহজাত ঔদার্য আর মহত্ত্ব আছে, গান্ধীজী তা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন। অবশ্যম্ভাবী বিফলতাও গান্ধীজীকে কখনও নিরুৎসাহিত করতে পারে নি। তিনি লিখছেন, কোন প্রতিকূলাচারী যদি কোন সত্যাগ্রহীর সঙ্গে বিশবার মিথ্যাচরণ বা প্রবঞ্চনা করে, তাহলে সেই সত্যাগ্রহী একুশবারের বারও তাকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত, কারণ মানবপ্রকৃতিতে অবিচলিত ও অখণ্ড বিশ্বাসসংস্থাপনই হচ্ছে তার অনুসৃত মতের সার পদার্থ।"*

---

* "তখন পীটার তাঁর কাছে এসে বললেন, 'প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার কাছে কতবার অপরাধ করলে তাকে আমি ক্ষমা করব? সাতবার পর্যন্ত?' যীশু তাকে বললেন, তোমাকে বলছিনা যে

একজন সমালোচক একবার এই মন্তব্যটি করেছিল — "মহাত্মাজী, আপনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আপনি নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন না যে আপনি যেমনটি করবেন, বিশ্বসংসারও ঠিক তেমনটি করে চলবে।"

গান্ধীজী উত্তর দিলেন, "শরীরের অবশ্য উন্নতিসাধন করা যেতে পারে বটে কিন্তু আত্মার সুপ্তশক্তি জাগ্রত করা অসম্ভব — এই কল্পনা করে আমরা নিজেদের কি অদ্ভুত ভাবেই না ঠকাই। আমি দেখাতে চেষ্টা করি যে, আমার মধ্যে যদি তেমন কোন শক্তি থাকে, তাহলেও আমি আর পাঁচজনেরই মত নশ্বর দেহধারী; আর আমার নিজের মধ্যে কোন অসাধারণত্ব কখনও ছিল না, আর এখনও নেই। আমি একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি, অন্যান্য যে কোন লোকের মত আমারও ভুলভ্রান্তি হতে পারে; তবে আমি একথা বলতে পারি যে আমার নিজের ভুলভ্রান্তি স্বীকার করে তা শুধরে নেবার মত যথেষ্ট নম্রতা আমার আছে। আমি একথা জোর করেই বলব যে ঈশ্বর আর তাঁর মঙ্গলময় ভাবের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস, আর সত্যে এবং প্রেমের প্রতি গভীর অনুরাগ আমার আছে। কিন্তু ঐ জিনিসটা কি সকলের অন্তরেই সুপ্ত নেই?" তারপর তিনি বললেন, "যদি আমরা জড়জগতে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারি, তা হলে আধ্যাত্মিক জগতে গেলে আমাদের কি একেবারে দেউলে হয়ে যেতে হবে? ব্যতিক্রমের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়ে তাদের নিয়মে পরিণত করাটা কি এতই অসম্ভব? মানুষ কি কেবল সর্বদাই আগে পশু এবং তারপরে মানুষ হবে — যদি আদৌ হয়?"*

কেবল সাতবার পর্যন্ত, কিন্তু সাতের সত্তরগুণ পর্যন্ত।" ম্যাথিউ — ১৮; ২১-২২ (বাইবেল)। এরূপ একটা অসম্ভব উপদেশ বোঝবার জন্যে আমি গভীরভাবে প্রার্থনা করেছিলাম। প্রতিবাদস্বরূপ বলেছিলাম, "প্রভু, এ কি সম্ভব?" তখন তাতে একটা জ্যোতিঃপ্লাবন সারা হৃদয়কে শান্ত করে দৈববাণীতে ঝঙ্কৃত হল, "হে মানব, তোমাদের প্রত্যেককে আমি দিনের মধ্যে কতবার ক্ষমা করি বলতো?"

* সুবিখ্যাত ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার, চার্লস সি. স্টাইনমেৎজকে, রজার ডব্লিউ ব্যাবসন একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে কোন গবেষণায় সর্বোচ্চ উন্নতি ঘটবে?" স্টাইনমেৎজ উত্তরে বলেন, "আমার মনে হয় আধ্যাত্মিক পথেই সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার

পেনসিলভ্যানিয়ায় উইলিয়াম পেনের সপ্তদশ শতাব্দীতে উপনিবেশ স্থাপনের সফল অহিংস পরীক্ষার কথা আমেরিকাবাসীর আজও হয়তো মনে আছে। সেখানে "কোন দুর্গ, কোন সৈন্য, কোন যোদ্ধৃদল, এমন কি কোন অস্ত্রশস্ত্র" পর্যন্তও ছিল না। রেড ইণ্ডিয়ান আর নূতন বসতকারীদের মধ্যে যে হিংস্র সীমান্তযুদ্ধ আর নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলছিল, একমাত্র পেনসিলভেনিয়ার কোয়েকারেরাই সে সব অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত ছিল। "অপর লোকেদের মধ্যে কতক বা হত, কতক বা দলবদ্ধ বিরাট হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছিল; কিন্তু একটি মাত্রও কোয়েকার রমণী অত্যাচারিত হয় নি, একটিমাত্র কোয়েকার শিশু হত বা একটিমাত্রও কোয়েকার পুরুষ উৎপীড়িত হয় নি।" শেষপর্যন্ত যখন কোয়েকারদের প্রদেশের শাসনভার ছেড়ে দিতে বাধ্য হতে হল, তখন "যুদ্ধ বেধে গেল আর বহুসংখ্যক পেনসিলভ্যানিয়ানরাও নিহত হল। কিন্তু কোয়েকারেরা নিহত হল মাত্র তিনজন, আর কেবল সেই তিনজন — যারা আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্রবহন না করার বিশ্বাস হতে চ্যুত হয়েছিল।"

ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট বলেছেন, "প্রথম মহাযুদ্ধে বলপ্রয়োগ শান্তি আনতে পারে নি। যুদ্ধে জয়পরাজয় সমানই অফলপ্রসূ। এ শিক্ষা পৃথিবীর গ্রহণ করা উচিত ছিল।"

লাওৎ সু শিক্ষা দিয়েছেন, — "যত বেশি হিংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সব বেরবে, মানবজাতির দুঃখ ততই বাড়বে। অত্যাচারের বিজয়গর্বের পরিণতি ঘটে শোকের উৎসবেই!"

ঘটবে। ইতিহাস সুস্পষ্টরূপে এ' কথাই বলে যে এখানে এমন একটি শক্তি আছে যা মানবজাতির অভ্যুদয়ের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি। তবুও আমরা যেন এর সঙ্গে ছেলেখেলাই করে চলেছি, কারণ জড়শক্তি সম্বন্ধে আমরা যতটা ভেবেছি তেমন গুরুতরভাবে আমরা এর বিষয়ে আলোচনা বা চর্চা কখনও করি নি। একদিন না একদিন মানুষ বুঝতে পারবে যে পার্থিব কোন বস্তু সুখ আনে না, আর তা নরনারীকে সৃজনক্ষম আর শক্তিশালী করে তুলতে সামান্যই কাজে আসে। তখন পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী তাঁদের পরীক্ষাগারে ঈশ্বর, প্রার্থনা আর আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধে গবেষণা কার্য শুরু করে দেবেন, যার সামান্য সূচনাও এখন পর্যন্ত হয়নি বললেই চলে। সেদিন যখন আসবে, পৃথিবী এক যুগের মধ্যে ততটাই উন্নতি ঘটতে দেখবে, গত চার যুগের মধ্যে যা দেখা যায় নি।"

গান্ধীজী বলেছেন, "বিশ্বব্যাপী শান্তি ছাড়া আর কিছুর জন্যে আমার লড়াই নয়। অহিংস সত্যাগ্রহের ভিত্তিতে যদি ভারতীয় আন্দোলন চালিয়ে সাফল্যলাভ করা যায়, তাহলে এ দেশপ্রেমিকতার, এবং সবিনয়ে নিবেদন করবো, জীবনেও একটা নতুন মানে এনে দেবে।"

প্রতীচ্য — গান্ধীজীর কর্মপন্থা স্বপ্নবিলাসীর স্বপ্ন বলে পরিত্যাগ করবার পূর্বে একবার তারা গ্যালিলীর প্রভু যীশুখ্রিস্টের সত্যাগ্রহের সংজ্ঞা সম্বন্ধে আগে বিবেচনা করুক ঃ—

"তোমরা শুনেছ যে বলা হয়েছে — চোখের বদলে চোখ, আর দাঁতের বদলে দাঁত চাই; আমি কিন্তু তোমাদের বলবো যে তোমরা অনিষ্ট দিয়ে অনিষ্টের প্রতিরোধ কোরো না। বরং যদি কেউ তোমাদের দক্ষিণ গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তাহলে তার দিকে তোমরা অপর গণ্ডটাও এগিয়ে দিও।"

বিশ্বনিয়ন্তার মহাকালের অপূর্ব বিধানে গান্ধীজীর যুগ এমন এক শতাব্দীতে এসে পৌঁচেছে, যা দুটো বড় বড় বিশ্বযুদ্ধে ইতিমধ্যেই একেবারে নিঃসঙ্গ আর বিধ্বস্ত হয়েছে। প্রস্তরতুল্য তাঁর দেহপ্রাচীরে এক দিব্য হস্তলিপি প্রকাশিত হয়েছে, তা হলো — ভায়ে-ভায়ের মধ্যে রক্তপাতের বিরুদ্ধে সতর্কতা বাণী।

মহাত্মা গান্ধী স্মরণে

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধী নূতন দিল্লীতে আততায়ীর হাতে নিহত হবার কিছুক্ষণ বাদে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেন ঃ "তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে জাতির পিতা, আর এক উন্মত্ত মানব তাঁকে হত্যা করেছে। কোটি কোটি নরনারী আজ তাঁর জন্য গভীর শোক করছে কারণ দীপ আজ নির্বাপিত ... যে আলোক এই দেশেতে দীপ্যমান ছিল, তা কোন সাধারণ আলো নয়। সহস্র বৎসর ধরে সেই আলো এই দেশে দেখতে পাওয়া যাবে, আর সমগ্র জগৎও তাকে দেখবে।"

মাত্র পাঁচমাস আগে ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ উপায়ে দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করেছে। ৭৮ বৎসর বয়স্ক গান্ধীজীর জীবনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর আয়ু ফুরিয়ে এসেছে। দুর্ঘটনার দিন প্রাতঃকালে তিনি তাঁর নাতনীকে ডেকে বললেন, "আভা, জরুরী কাগজপত্র সব এখুনি নিয়ে এস; আমাকে আজকেই তার উত্তর দিতে হবে। কালকের দিন হয় তো আর নাও আসতে পারে।" তাঁর বহু লেখার মধ্যেও গান্ধীজী তাঁর বিধিলিপি সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন।

উপবাসক্লিষ্ট দুর্বলদেহে উপর্যুপরি তিনবার গুলিবিদ্ধ হয়ে মরণোন্মুখ মহাত্মা যখন ধীরে ধীরে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন, তখন অন্তিমশয়নে শায়িত হয়ে প্রচলিত হিন্দু প্রথানুযায়ী নীরবে হাত তুলে তিনি আততায়ীকে ক্ষমাই করে গেলেন। সারা জীবনে যিনি ছিলেন এক নিষ্পাপ শিল্পী, মরণেও তিনি তার চরম উৎকর্ষতা প্রকাশ করে গিয়েছেন।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন লিখেছেন, "ভবিষ্যতে বহুযুগ ধরে লোকেরা হয়ত কদাচিৎ একথা বিশ্বাস করবে যে, রক্তমাংসধারী এমন একজন মানুষ এই পৃথিবীর মাটির উপরই বিচরণ করত।" রোমের ভ্যাটিক্যান প্রাসাদ হতে প্রেরিত সংবাদে উল্লিখিত হয়, "এই হত্যাকাণ্ড এখানে গভীর শোকের সৃষ্টি করেছে; খ্রিস্টিয় গুণাবলীর মূর্ত প্রকাশ, দেবস্বরূপ গান্ধীর জন্য লোকে শোক প্রকাশ করছে।"

কোন বিশেষ সদুদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে সকল মহৎ ব্যক্তি এই পৃথিবীতে আগমন করেন, তাঁদের সকলেরই জীবন অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ও নানা সম্ভাবনায় পূর্ণ। ভারতে ঐক্যসাধনে গান্ধীজীর নাটকীয় মৃত্যু দ্বন্দ্ববিরোধ, বিবাদবিসম্বাদক্লিষ্ট পৃথিবীর সকল দেশের সামনে তাঁর বাণীকে উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করেছে। ভাববাদীর মত ভাষায় তিনি এই কথাগুলি বলে গেছেন ঃ

"জনসাধারণের মধ্যে অহিংসনীতি বিস্তার লাভ করেছে, আর এ স্থায়িত্ব লাভ করবে। পৃথিবীতে শান্তি আনবার এ হচ্ছে অগ্রদূত।"

৪৫ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গলার "আনন্দময়ী মা"

আমার ভাইঝি অমিয়া বসু একদিন আমায় বলল, "নির্মলাদেবীকে না দেখে আপনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবেন না। তাঁর ভগবদ্ভক্তি অতীব গভীর, আর 'আনন্দময়ী মা' বলেই তিনি সকলের কাছে পরিচিতা।" বলতে বলতে তার চোখে মুখে ফুটে উঠল এক গভীর আকুতি।

বললাম, "নিশ্চয়ই, সেই সন্ন্যাসিনীকে দেখে যাব বই কি। তাঁর ঈশ্বরভাবের উচ্চাবস্থার কথা আমি সবই পড়েছি। বছরকতক আগে 'ঈষ্ট-ওয়েষ্ট' পত্রিকায় তাঁর বিষয়ে একটি ছোট প্রবন্ধও বেরিয়েছিল।"

অমিয়া বলতে লাগল, "আমি তাঁকে দর্শন করেছি। আমরা যেখানে থাকি, সেই জামসেদপুর শহরে সম্প্রতি তিনি এসেছিলেন। জনৈক শিষ্যের অনুরোধে আনন্দময়ী মা একটি মরণাপন্ন লোকের বাড়িতে যান। তার মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে লোকটির কপালে হাত বুলিয়ে দিতেই তার মৃত্যুযন্ত্রণা সব থেমে যায়। রোগও সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়; আনন্দে, বিস্ময়ে লোকটি দেখল যে সে একেবারে নিরাময় হয়ে গেছে।"

দিনকতক বাদে শুনতে পেলাম, আনন্দময়ী মা কোলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে তাঁর এক শিষ্যের বাড়িতে অবস্থান করছেন। রাইট সাহেব আর আমি, দু'জনে মিলে আমাদের কোলকাতার বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে পড়লাম। ভবানীপুরের সেই বাড়িটির কাছে আমাদের ফোর্ডগাড়ি পৌঁছতে রাইট সাহেব আর আমি রাস্তার উপর একটা অদ্ভুত দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম।

দেখলাম আনন্দময়ী মা একটা হুডখোলা মোটর গাড়িতে দাঁড়িয়ে, প্রায় শতখানেক শিষ্য তাঁকে ঘিরে রয়েছে — দেখে বোধ হল কোথাও যাবার জন্যে বেরচ্ছেন। রাইট সাহেব ফোর্ড গাড়িটাকে কিছু দূরে রেখে আমার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে সেই নীরব জনতার দিকে এগিয়ে চলল।

আনন্দময়ী মা আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করামাত্রই গাড়ি থেকে নেমে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

"বাবা, আপনি এসেছেন!" আবেগভরে এই কথাটি বলে এক হাত দিয়ে আমার গলা বেষ্টন করে তিনি আমার কাঁধের ওপর তাঁর মাথাটি রাখলেন। রাইট সাহেবকে একটু আগেই বলেছি — আমি এই সাধ্বীটিকে বিশেষ চিনি না — কাজেই এই রকম অসাধারণ অভ্যর্থনার দৃশ্য দেখে সে বেচারা অবাক হয়েই তাকিয়ে রইল। আর সেই শতখানেক চেলা — তারাও অবাক বিস্ময়ে এই স্নেহভরা দৃশ্যাবলী স্থির হয়ে দেখতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি টের পেলাম যে সাধ্বীটি তখন সমাধির খুব উচ্চাবস্থায় রয়েছেন। বাইরে নারীর ছদ্মবেশ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে তিনি নিজেকে জানতে পেরেছিলেন যে তিনি শাশ্বত আত্মা; সেই উচ্চাবস্থা থেকে তিনি আর একজন ঈশ্বরভক্তকে সানন্দে অভ্যর্থনাজ্ঞাপন করছেন। হাত ধরে তিনি তাঁর গাড়ির কাছে আমায় নিয়ে গেলেন।

আমি একটু প্রতিবাদের সুরে বললাম, "আনন্দময়ী মা, আমি আপনার বেরোন তো দেরী করিয়ে দিচ্ছি!"

তিনি বললেন, "বাবা, এ জীবনে* আজ আমি আপনাকে এই প্রথম দেখছি — কত যুগযুগান্তর পরে। এখুনি আর চলে যাবেন না।"

গাড়ির পিছন দিকের আসনে আমরা দু'জনে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দময়ী মা সমাধিতে মগ্ন হয়ে পড়লেন, — শরীর স্থির, নিশ্চল, স্থাণুবৎ। সুন্দর দু'টি চক্ষু তাঁর আকাশের দিকে অর্ধোন্মীলিত, দৃষ্টি স্থির হয়ে এসে নিবদ্ধ হল নিকট-সুদূর অন্তরের স্বর্গরাজ্যে। শিষ্যবর্গ শান্ত ও মৃদুস্বরে বলে উঠল — "আনন্দময়ী মাঈ কি জয়!"

ভারতবর্ষে আমি বহু ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি, কিন্তু এরূপ উচ্চাবস্থার সাধিকার দর্শনলাভ আমার আগে কখনও ঘটে নি। তাঁর শান্ত, স্নিগ্ধ মুখশ্রী আনন্দে উজ্জ্বল, তাতে করেই তাঁর নাম হয়েছে "আনন্দময়ী মা।" সুদীর্ঘ ঘন কৃষ্ণকেশপাশ অবগুণ্ঠনহীন মস্তকের পিছনে

---

* পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার খেওরা গ্রামে ১৮৯৬ সালে আনন্দময়ী মা জন্মগ্রহণ করেন।

লুটিয়ে পড়েছে, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা — তৃতীয় নেত্রের প্রতীক, আধ্যাত্মিক দৃষ্টি অন্তরে তাঁর সদা জাগ্রত। ছোট্ট মুখখানি, ছোট্ট দু'টি হাত আর ছোট্ট দু'টি পা — তাঁর আধ্যাত্মিক বিরাটত্বের সঙ্গে কি অদ্ভুত বৈসাদৃশ্য।

আনন্দময়ী মা সমাধিস্থ থাকাকালীন আমি নিকটস্থ একটি শিষ্যাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম।

শিষ্যাটি বললেন, "আনন্দময়ী মা ভারতের বহুস্থানেই ভ্রমণ করেন; নানা জায়গায় তাঁর শতশত শিষ্য-শিষ্যা আছে। তাঁর দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ফলে নানা প্রয়োজনীয় সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। নিজে ব্রাহ্মণ হলেও তিনি কোন প্রকার জাতিভেদ মানেন না। মায়ের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখবার জন্যে আমাদের একটি দল সর্বদাই ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে। মায়ের মত যত্ন নিয়ে ওঁকে আমাদের সর্বদা দেখাশোনা করতে হয়, কারণ উনি দেহের প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেন না। কেউ যদি না ওঁকে খেতে দেয় তো খানই না, বা তার কোন খোঁজও করেন না। খাবার সামনে ধরে দিলেও, তা পর্যন্ত উনি ছোঁন না। এইরকম না খেয়ে খেয়ে শেষপর্যন্ত উনি যদি দেহত্যাগই করে বসেন, সেই ভয়ে আমরা, ওঁর শিষ্যরা, ওনাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিই। দিনের পর দিন ধরে উনি সমাধি অবস্থায় থাকেন, নিঃশ্বাস পড়ে কি না সন্দেহ, দৃষ্টি তখন থাকে একেবারে নিষ্পলক, স্থির। ওঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ওঁর স্বামী, নাম ভোলানাথ। বহুবছর আগে ওঁদের বিবাহ হবার অল্পকাল পরেই তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেন।"

শিষ্যাটি একটি ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিলেন; বেশ চওড়া কাঁধ, আকৃতিও বেশ সুন্দর, লম্বা চুল আর শাদা দাড়ি। ভদ্রলোক নীরবে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন করজোড়ে — শিষ্যের ভক্তিনত ভাবে।

ব্রহ্মানন্দসাগরে অবগাহন করে আনন্দময়ী মা এখন যেন জড়জগতে ফিরে এলেন।

"বাবা, বলুন, এখন আপনি কোথায় থাকেন?" তাঁর স্বর অতি পরিষ্কার, যেন সঙ্গীতের মধুর ঝঙ্কার।

"বর্তমানে কোলকাতা কিম্বা রাঁচী থাকি, কিন্তু শীগগিরই আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছি।"

"আমেরিকা?"

"হ্যাঁ; সেখানকার ধর্মপিপাসু লোকেরা আপনার মত ভারতীয় সাধিকাকে দেখলে নিশ্চয়ই আন্তরিকভাবে খুশি হবে — যাবেন আপনি?"

"বাবা নিয়ে গেলেই যাব!"

উত্তর শুনে তো উপস্থিত শিষ্যের দল সব সভয়ে চমকে উঠলেন।

একজন তার মধ্যে থেকে এগিয়ে এসে আমাকে দৃঢ়স্বরে বললেন, "শুনুন মশায়, আমাদের মধ্যে এই জনকুড়ি কি তারও বেশি আমরা আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে সর্বদাই ভ্রমণ করি। ওঁকে ছেড়ে আমরা কোথাও থাকতে পারব না। উনি যেখানে যাবেন, আমরাও সেখানে যাব, বুঝলেন?"

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মতলবটি ছাড়তে হল, — দেখলাম যে এ একেবারে অসম্ভব, কারণ শুধু শুধু দল বেজায় ভারি হয়ে যায়।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বললাম, "আপনার শিষ্যদের নিয়ে অন্ততঃ রাঁচীতে তো আসুন। আপনি নিজে একজন ঈশ্বরের দিব্য শিশু, আমার রাঁচী বিদ্যালয়ের শিশুদের দেখেও ভারি আনন্দই পাবেন।"

"বাবা আমায় যখনই নিয়ে যাবেন, তখনই খুশি হয়ে যাব।"

অল্প কিছুদিন পরেই আনন্দময়ী মা'র রাঁচী বিদ্যালয়ে প্রতিশ্রুত আগমনের কথা শোনা গেল। যে কোন উৎসবই ছেলেদের আনন্দিত করে তোলে। পড়াশোনার হাঙ্গামা নেই, গানবাজনা, সর্বোপরি ভুরিভোজন, — স্ফূর্তির চূড়ান্ত।

যে দিন তিনি এসে পৌঁছলেন, গেটের কাছ থেকেই ছেলেরা চিৎকার করে অভ্যর্থনা জানাল, — "জয়! আনন্দময়ী মাই কি জয়!" করতাল, শঙ্খধ্বনি আর মৃদঙ্গবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গাঁদাফুলের বৃষ্টি! আনন্দময়ী মা রৌদ্রকরোজ্জ্বল বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে হাস্যমুখে চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে বেড়াতে লাগলেন — যেন স্বর্গের একটি সচল আনন্দ প্রতিমা।

প্রধানগৃহ যেটি সেখানে আমি তাঁকে নিয়ে যেতে আনন্দময়ী মা সানন্দে বলে উঠলেন, "এ জায়গাটি তো ভ্যার সুন্দর!" শিশুসুলভ সরল হাসি হেসে তিনি আমার পাশেই বসে পড়লেন। তাঁকে পেয়ে লোকের মনে হয় যেন তিনি আপনা হতেও আপন, অথচ একটা দূরত্বের আভাস যেন সর্বদা তাঁকে ঘিরে রয়েছে — সর্বব্যাপিত্বের একি রহস্যময় স্বাতন্ত্র্য!

বললাম, "আপনার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলুন।"

"বাবা তো সবই জানেন, তবে আবার বলা কেন?" হয়ত তিনি মনে করেছিলেন যে, একটা জন্মের ঘটনার ক্ষুদ্র ইতিহাস সে আর ধর্তব্যের মধ্যেই নয়, তা আবার বলবে কি!

একটু হেসে সবিনয়ে আমি আবার একবার অনুরোধ করলাম। কি আর করেন, সুন্দর সুঠাম হস্ত হতাশাসূচক ভঙ্গীতে প্রসারিত করে বললেন, "বাবা, বলবার আর কি আছে, কিছুই নেই। আমার চৈতন্য কখনও এই নশ্বর দেহটার সঙ্গে জড়িত হয় নি। এই পৃথিবীতে আসবার আগে, বাবা, 'আমি* সেই একই ছিলাম।' ছোট্ট একটি মেয়ে যখন ছিলাম তখনও 'আমি সেই', নারীত্বে পৌঁছে তখনও 'আমি সেই।' যে পরিবারের মধ্যে জন্মেছিলাম — তাঁরা যখন এই দেহটার বিবাহ দিতে চাইলে, তখনও 'আমি সেই।' আর বাবা, এখন আপনার সামনেও 'আমি সেই একই আছি। আর এই অনন্তের কোলে আমায় ঘিরে সৃষ্টির লীলা যতই চলুক, নিত্যকালের জন্যে 'আমি সেই একই থাকব।'"

তারপর আনন্দময়ী মা যেন গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন। দেহ তাঁর মর্মর প্রতিমার মত নিথর, নিষ্পন্দ। মন যেন কার ডাকে কোন সুদূরে উধাও হয়ে ছুটে চলেছে; গভীর কালো চোখদু'টি যেন কাঁচের মত প্রাণহীন, নিষ্প্রভ। সাধুসন্তরা যখন জড়দেহ হতে তাঁদের চৈতন্য অপসারিত করেন, তখন প্রায়ই তাঁদের এই রকম ভাব দেখা যায়। সে

---

* আনন্দময়ী মা নিজের বিষয়ে "আমি" বলে উল্লেখ করেন না। তিনি বিনয়সূচক পরোক্ষ উক্তি করেন, যেমন — "এই দেহটা", "এই ছোট মেয়েটি", "আপনার কন্যা" ইত্যাদি। কাকেও তাঁর "শিষ্য" বলেও উল্লেখ করেন না। নৈর্ব্যক্তিকভাবে তিনি সকল ব্যক্তিরই উপর জগজ্জননীর প্রেম বিতরণ করেন।

সময় বোধহয় দেহটা যেন একটা নিষ্প্রাণ মাটির পুতুলের মত। ঘণ্টাখানেক ধরে দু'জনেই আমরা তখন ধ্যানানন্দে মগ্ন হয়ে রইলাম। ছোট্ট একটি উচ্ছ্বসিত হাসিতে টের পেলাম —আনন্দময়ী মা'র সম্বিৎ ফিরে এসেছে।

বললাম, "আনন্দময়ী মা, দয়া করে আমার সঙ্গে বাগানে আসুন। রাইট সাহেব গোটাকতক ছবি নেবেন।"

"আচ্ছা বেশ বাবা, আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা।" অনেকগুলো ছবি তোলা হল — ভক্তির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত তাঁর নয়নযুগলে তখনও সেই দিব্যজ্যোতিঃ অপরিবর্তিত!

তারপর এল ভোজের পালা। আনন্দময়ী মা কম্বলাসনে বসলেন একজন শিষ্যা পাশে বসে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন। শিষ্যাটি আনন্দময়ী মা'র মুখে খাবার তুলে দিতে ঠিক ছোট্ট শিশুটিরই মত শান্তভাবে খেতে লাগলেন। খেতে খেতে দেখা গেল যে খেয়েই যাচ্ছেন — তরকারী আর মিষ্টিতে যে স্বাদের কোন পার্থক্য আছে, আনন্দময়ী মা'র কাছে তার কোন প্রকার বোধ কিছুমাত্র নেই!

সন্ধ্যা হয়ে এল — আনন্দময়ী মা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে আশ্রম থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন; যাবার সময় আর একদফা তাঁদের উপর সেই রকম গোলাপফুলের পাপড়িবৃষ্টি; তিনিও ছেলেদের হাত তুলে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। স্বতঃউৎসারিত ভক্তির উচ্ছ্বাসে ছেলেদের মুখ উজ্জ্বল। তাদের সে এক মহা আনন্দের দিন!

যীশুখ্রিস্ট ঘোষণা করেছেন, "তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকে ভালবাসবে তোমার সকল অন্তঃকরণ, সকল আত্মা, সকল মন আর সকল শক্তি দিয়ে; এই হচ্ছে আমার প্রথম আজ্ঞা।"*

সকলপ্রকার তুচ্ছ আকর্ষণ পরিহার করে আনন্দময়ী মা ভগবানে একান্তভাবে ও পরিপূর্ণরূপেই আত্মসমর্পণ করেছেন। পণ্ডিতদের চুলচেরা বিচারে নয়, কিন্তু বিশ্বাসের ধ্রুবন্যায়ে এই আপনভোলা শিশুর মত সরল

* মার্ক ১২ঃ৩০ (বাইবেল)।

সাধিকা, মানব জীবনের একমাত্র সমস্যার সমাধান করেছেন — সেটা হচ্ছে ভগবানের সাযুজ্য লাভ।

লক্ষকোটি সাংসারিক তুচ্ছ ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত মানুষ আজ এই একমাত্র সহজ সরল সত্যটাকে একেবারে ভুলে গেছে; এক ও অদ্বিতীয় ভগবানের প্রতি প্রেম অস্বীকার করে জাতিসকল বাহ্যিক মানবহিতৈষণার প্রতি উৎকট নিষ্ঠা প্রদর্শন করে তাদের নাস্তিকতা লুকোবার চেষ্টা করে। অবশ্য এইসব মানবকল্যাণকর প্রচেষ্টাগুলিও সৎ, — কারণ তারা মানুষের মনকে সাময়িকভাবে তাদের নিজেদের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়; কিন্তু যীশুখ্রিস্ট তাঁর "প্রথম আজ্ঞা"য় যা বলেছেন, জীবনের সেই একমাত্র দায়িত্ব থেকে তা কিন্তু মানুষকে মুক্ত করে না। ঈশ্বরকে ভালবাসার যে উন্নতিসাধক কর্তব্য, তা তার একমাত্র দাতার* মুক্তহস্তের দান — প্রথম শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে।

রাঁচীতে যাওয়ার পর আর একবার আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল; শিষ্যদলের সঙ্গে শ্রীরামপুর স্টেশনে গাড়ির জন্যে তখন তিনি অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি বললেন, "বাবা, আমি হিমালয়ে যাচ্ছি; সহৃদয় জনকয়েক লোক মিলে আমাদের জন্যে দেরাদুনে একটি আশ্রম তৈরী করে দিয়েছেন।"

গাড়িতে চড়লেন ... দেখে অবাক হয়ে গেলাম যে, কি ভিড়ের মধ্যে কি ট্রেনে, কি ভোজনে, কি নীরব ধ্যানে — কোন উপলক্ষ্যেই তাঁর দৃষ্টি ঈশ্বর থেকে কখনও লক্ষ্যচ্যুত হয়না। অন্তরের মধ্যে এখনও সেই অপরিসীম সুধামাখা বাণীর প্রতিধ্বনি শুনি, —

"দেখুন, এখন আর সর্বদাই, পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে 'আমি চিরকাল সেই একই আছি!"

---

* "অনেকেই একটি নূতন এবং উন্নততর জগৎ সৃষ্টি করার জন্য মনে মনে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। কিন্তু এরূপ চিন্তার জাল রচনা করার পরিবর্তে তোমরা তাঁরই ধ্যানে নিয়োজিত হয়ো যাঁর কাছ থেকে পরিপূর্ণ শান্তিলাভের প্রত্যাশা করা যায়। মানুষের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরের বা সত্যের সন্ধানে নিযুক্ত হওয়া।" — আনন্দময়ী মা।

৪৬ পরিচ্ছেদ

নিরাহারা যোগিনী

রাইট সাহেব ফোর্ড গাড়ি চালাচ্ছিল — জিজ্ঞাসা করল, "গুরুদেব, আজ সকালে কোথায় যাওয়া হবে?" বলে রাস্তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কারণ দিনের পর দিন তাকে যে রকমভাবে বেরিয়ে পড়তে হত, তাতে বেচারা জানতেই পারত না যে আগামীকাল তাকে বাংলাদেশের কোন অংশ আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করতে হবে।

সোৎসাহে উত্তর দিলাম, "ঈশ্বরের যদি কৃপা হয়, তাহলে আজ আমরা বেরোচ্ছি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য দেখতে — এক সাধ্বী মহিলা, যিনি মাত্র বায়ুসেবন করেই বেঁচে থাকেন।"

রাইট সাহেব সমান আগ্রহে হেসে বলল, "থেরেসা ন্যোয়ম্যানের পর এ যে আর এক আশ্চর্য ব্যাপার!" আর উৎসাহের চোটে গাড়ির গতিও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দিল। তার ভ্রমণ ডায়েরির মধ্যে এটাও হবে এক অত্যাশ্চর্য বিবরণ, যা কোন সাধারণ পর্যটকের পক্ষে সহজলভ্য নয়!

রাঁচী বিদ্যালয় সবে মাত্র আমরা পিছনে ছেড়ে এসেছি; সূর্যোদয়ের আগেই আমরা সব জেগে উঠেছি। দলের মধ্যে আমার সেক্রেটারী আর আমি ছাড়া আরও তিন বাঙ্গালী বন্ধু ছিলেন। ভোরের বাতাস শরীরে একটা অপূর্ব পুলকশিহরণ এনে দিচ্ছিল। আমাদের গাড়ির চালককে তখন অতি সন্তর্পণে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল। ভোরবেলায় কৃষকেরা সব বেরিয়েছে জোয়ালকাঁধে ধীরে চলা উচ্চককুদ্ বলদটানা দু'চাকার গাড়ি নিয়ে — তাদের রাজ্যে ভঁক্ ভঁক্ করে মোটর গাড়ির অনধিকার প্রবেশ তারা সহজে বরদাস্ত করবে কেন?

রাইট সাহেব বলল, "গুরুদেব, এঁর সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন, শুনতে বড্ড ইচ্ছে করছে।"

আমি শুরু করলাম, "এঁর নাম হচ্ছে গিরিবালা। বহুবছর আগে, স্থিতিলাল নন্দী নামে জনৈক পণ্ডিত ভদ্রলোকের কাছ থেকে এঁর বিষয় আমি প্রথম শুনি। তিনি আমার ভাই বিষ্ণুকে পড়াতে আমাদের গড়পারের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন।

"স্থিতিবাবু আমাকে বলেছিলেন, 'আমি গিরিবালাকে বেশ ভাল করেই জানি; তিনি এমন একটা বিশেষ যোগপ্রক্রিয়া অভ্যাস করেন, যাতে করে আহার বিনাই জীবনধারণ করতে পারেন। ইছাপুরের* কাছে নবাবগঞ্জে তাঁর বাড়ি; তিনি আমাদের নিকট প্রতিবেশিনী ছিলেন। তাঁর উপর খুব ভালভাবে লক্ষ্য রেখে অনেক দিন ধরে দেখলাম, কিন্তু তাঁর পানভোজনের প্রমাণ একটা দিনের জন্যেও বার করতে পারলাম না। আমার আগ্রহ তখন এতদূর বেড়ে উঠল যে শেষপর্যন্ত আমি বর্ধমানের মহারাজার† কাছে গিয়ে তাঁকে ব্যাপারটার একটা তদন্ত করবার জন্যে অনুরোধ করলাম। ব্যাপারটা শুনে তো অবাক হয়ে মহারাজা গিরিবালাকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রণ করলেন। গিরিবালা মহারাজার পরীক্ষায় সম্মত হয়ে তাঁর প্রাসাদের এক অংশে মাস দুই অতিবাহিত করেন — সেই অংশটা চাবি দেওয়াই থাকত। পরে তিনি একবার রাজপ্রাসাদে এসে দিনকুড়ি, আর তৃতীয়বার এসে দিনপনের থেকে যান। মহারাজা নিজে আমাকে বলেছেন যে, এই তিনটে খুব কঠিন পরীক্ষায় নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, বাস্তবিকই তিনি নিরম্বু উপবাস করে থাকেন — কিছুই খান না।'

"স্থিতিবাবুর এই গল্পটি পঁচিশ বছরেরও উপর আমার মনের মধ্যে রয়েছে। আমেরিকায় বসে কখনও কখনও ভাবতাম — এই অপূর্ব যোগিনীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হবার পূর্বে কালস্রোত তাঁকে গ্রাস করে ফেলবে না তো? এখন অবশ্য তিনি বেশ বৃদ্ধাই হবেন। তিনি এখনও বেঁচে আছেন কিনা, আর যদিই বা থাকেন, তাহলে কোথায় থাকেন — তাও আমি জানি না। যাইহোক, আর ঘণ্টাখানেক বাদেই পুরুলিয়ায় গিয়ে পৌঁছব; সেখানে তাঁর ভাইয়ের বাড়ি আছে।"

---

* উত্তর বঙ্গ।

† সম্প্রতি পরলোকগত হিজ হাইনেস সার বিজয় চাঁদ মহতাব। মহারাজের গিরিবালাকে তিনবার পরীক্ষা করার ফল নিঃসন্দেহে তাঁর রাজপরিবারের কাছে রক্ষিত আছে।

সাড়ে দশটার সময় আমাদের ছোট দলটি পুরুলিয়ায় শ্রীযুক্ত লম্বোদর দে মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত হলো — পুরুলিয়ার তিনি একজন উকিল। কথাবার্তা শুরু হল।

আমাদের প্রশ্নের উত্তরে লম্বোদরবাবু বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ভগ্নী এখনও বর্তমান। কখনও সখনও তিনি এখানে আমার কাছে এসে কিছুদিন থাকেন, — কিন্তু এখন তিনি বিউরে আমাদের দেশের বাড়িতেই আছেন।" তারপর লম্বোদরবাবু ফোর্ড গাড়িটার দিকে একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিনিক্ষেপ করে বললেন, "স্বামীজী, আমার তো মনে হয় না যে, কোন মোটরগাড়ি এ'পর্যন্ত বিউর অবধি গিয়ে ঢুকতে পেরেছে। তারচেয়ে বরং গরুর গাড়ির ঝাঁকানির হাতে নিজেদের সমর্পণ করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ!"

ডেট্রয়েটের গৌরব আমাদের ফোর্ড গাড়িটির প্রতি দলের সকলেই সমস্বরে আনুগত্য জানাল।

আমি উকিল মশায়কে বললাম, "ফোর্ড গাড়িটি আমেরিকা থেকে এসেছে — এ বেচারাকে যদি গ্রাম বাংলার সঙ্গে পরিচয় ঘটতে দেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, তা হলে সেটা তার প্রতি নিতান্তই অবিচার করা আর বড় লজ্জার বিষয় হবে!" কি আর করেন, অবশেষে লম্বোদরবাবু একটু হেসে বললেন, "সিদ্ধিদাতা গণেশ* আপনাদের সহায় হোন!" তারপর সৌজন্য সহকারে বললেন, "যদি একবার সেখানে পৌঁছতে পারেন, তা হলে গিরিবালা যে আপনাদের দেখে খুব খুশিই হবেন সে' কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। বয়স তাঁর প্রায় সত্তর হয়ে এল, কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁর এখনও খুব চমৎকারই আছে।"

মনের দর্পণ হচ্ছে মানুষের দু'টি চোখ; সোজাসুজি তাঁর সেই মনের গবাক্ষ, চোখদুটির উপর দৃষ্টি স্থাপন করে জিজ্ঞাসা করলাম, "মশায়, আচ্ছা দয়া করে আমায় বলুন তো, তিনি যে একদম কিছুই খান না, এটা কি খাঁটি সত্যি?"

---

* সকল বিঘ্নত্রাতা, সৌভাগ্যের দেবতা।

"খাঁটি সত্যি মশায়।" দৃষ্টি তাঁর সরল ও অকপট। তারপর তিনি বললেন, "পঞ্চাশ বছরেরও উপর আমি তো তাঁকে কখন একগ্রাসও খেতে দেখিনি। আজ যদি পৃথিবী হঠাৎ প্রলয়ে ধ্বংসও হয়ে যায়, তাহলে আমি যত না আশ্চর্য হব, তারচেয়ে বেশি আশ্চর্য হব আমার ভগ্নীকে আহার করতে দেখলে!"

এ দুটো মহাজাগতিক ঘটনা ঘটার অসম্ভাব্যতার বিষয় স্মরণ করে আমরা দু'জনেই হেসে উঠলাম।

লম্বোদরবাবু বলতে লাগলেন, "গিরিবালা তাঁর যোগসাধনে কখনও এমন নির্জনতা খোঁজেন নি যেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। সারা জীবনটাই তাঁর সংসার আর আত্মীয়পরিজনের সাহচর্যেই কেটেছে। তাঁর এইরকম অদ্ভুত অবস্থা এখন তাদের কাছে সব সয়ে গেছে। তাদের মধ্যে এমন একজন কেউ নেই যে, গিরিবালা দেবীকে খাদ্যগ্রহণ করতে দেখলে একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়ে যাবে! স্বভাবতঃই ভগিনী একটু গম্ভীর, চাপা স্বভাবের মহিলা — হিন্দু বিধবারা যেমন হয়; কিন্তু পুরুলিয়া আর বিউরে আমাদের ছোট পরিবারের সকলেই জানে যে, বলতে গেলে প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন 'অসাধারণ' স্ত্রীলোক।

ভগিনীর প্রতি ভ্রাতার অগাধ বিশ্বাস সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হল। আমরা সকলে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে বিউরের দিকে যাত্রা করলাম। রাস্তার ধারে এক খাবারের দোকানের কাছে দাঁড়ান গেল, কিছু খেয়ে নেবার জন্যে — লুচি আর তরকারী; সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় ভবঘুরে ছোঁড়াদের বেশ ভিড় লেগে গেল — তারা, রাইট সাহেব বিনা কাঁটাচামচেতে হিন্দুদের মত* হাতের আঙুল দিয়ে লুচি ছিঁড়ে খাচ্ছে দেখে তো তাজ্জব বনে গেল; যাক, আমাদের সবাইকার তখন ক্ষিধেও পেয়েছিল বেশ, বিকেলে জুটবে কি জুটবে না ভেবে সকাল সকাল সব সেরে নেওয়া গেল; কেন না এরপর আবার অনেক ঘোরাঘুরি আছে।

---

* শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী বলতেন, "ভগবান পৃথিবীতে আমাদের উপভোগের জন্য নানা ফলমূল দিয়েছেন। আমরা আমাদের ভোজ্য দেখতে চাই, তাদের গন্ধ বা স্বাদ নিতে চাই — হিন্দুরা আবার তা' স্পর্শও করতে চায়;" খাবার সময় কেউ হাজির না থাকলে, 'শোনা' ব্যাপারটাও মন্দ লাগে না!

গাড়ি দৌড়ল বর্ধমান জেলার ভিতর দিয়ে পূর্বদিকে — চারধারে রোদেপোড়া ধানের ক্ষেত, রাস্তার দু'ধারে ছায়াঘন গাছপালার সারি; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছাতার মত গাছের ডাল হতে সব ময়না, গলায় ডোরাকাটা বুলবুলের গান ভেসে আসছে। লোহার হালবাঁধান চাকার গ্রাম্য গরুরগাড়ির রিনি ঝিনি, রিনি মঞ্জু মঞ্জু শব্দের সঙ্গে মনে মনে তুলনা করতে লাগলাম শহরের অভিজাত পিচবাঁধান রাস্তায় মোটর টায়ারের সর্-র্-র্ শব্দ।

গাড়ি উদ্দামগতিতে ছুটে চলেছে। হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, "ডিক, থাম, থাম! দেখ দেখ, আমগাছটা যেন ফলে ভেঙে পড়েছে। এ সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করলে বৃক্ষরাজের প্রতি নিতান্ত অসম্মান প্রদর্শন করা হবে, কি বল?"

আমার হঠাৎ অনুরোধে ফোর্ড গাড়িটা একটা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল।

পাঁচজনে আমরা গাড়ি থেকে নেমে পড়ে ছোট্ট ছেলেদের মত ছুটলাম সেই আমতলায়; রাশি রাশি পাকা আম চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

আমি একটা সুপ্রসিদ্ধ কবিতার অনুকৃতি করে বললাম, —

"বহু সুরসাল রসাল ফলেছে চোখের অন্তরালে,
হারাতে তাদের মধুর স্বাদ পাথুরে জমির পরে ... ...

শৈলেশ মজুমদার নামে আমার একটি ছাত্র একগাল হেসে বলল, "আমেরিকায় আর এমনটি হতে হয় না, কি বলেন স্বামীজী?"

অত্যন্ত পরিতৃপ্তিসহকারে আম্ররস আস্বাদন ও তজ্জনিত সন্তোষলাভের আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়ে অকপটেই স্বীকার করতে হল যে, 'না, এমনটি হয় না বটে। আমেরিকায় থাকতে আম না পেয়ে কত দুঃখই যে হতো। আম ছাড়া হিন্দুর স্বর্গ — কল্পনাই করা যায় না!"

খুব উঁচু ডালে একটা বেশ বড় আর পাকা আম ঝুলছিল; একটা ইঁটের ঘায়ে সেটাকে পেড়ে ফেললাম। দেখা গেল রোদে সেটা গরম হয়ে রয়েছে। তারপর সেই অমৃতফল আস্বাদনের মাঝে জিজ্ঞাসা করলাম, "ডিক, আমাদের সব ক্যামেরাগুলোই কি গাড়িতে রেখে এসেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ গুরুদেব, ব্যাগেজ কম্পার্টমেণ্টে!"

"দেখ, যদি গিরিবালা সত্যিকারেরই একজন খুব উঁচুদরের সাধিকা হন, তা হলে আমেরিকায় গিয়ে তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছু লিখব। এমন অপূর্বশক্তির আধার এই হিন্দু যোগিনী যে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে ইহজগৎ পরিত্যাগ করে যাবেন সে হতে পারে না — এই আমগুলোর যা দশা হচ্ছিল তার মত আর কি! কি বল?"

আরও আধঘণ্টা কাটল, তখনও আমরা ছায়াসুনিবিড় স্নিগ্ধ শান্তির মধ্যে আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

রাইট সাহেব বলল, "গুরুদেব, গিরিবালা দেবীর বাড়ি আমাদের সূর্যাস্তের আগেই পৌঁছন দরকার, যাতে করে ফটো নেবার জন্যে যথেষ্ট আলো পাওয়া যেতে পারে।" তারপর একটু হেসে বলল, "মুশকিল হচ্ছে, আমেরিকানরা আবার একটু সন্দিগ্ধপ্রকৃতির কিনা, তাই এঁর সম্বন্ধে কিছু বিশ্বাস করাতে হলে ফটো না হলে তো চলবে না!"

তার কথা যথার্থ বটে, তর্ক করা চলে না; কাজেই লোভ সম্বরণ করে গাড়িতে পুনঃপ্রবেশ করা গেল।

যেতে যেতে সখেদে দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে বললাম, "ডিক, তোমার কথাই ঠিক! আমেরিকার বস্তুতন্ত্রতার বেদীতে আজ আমের স্বর্গকে আমি বলি দিলাম। যাক, ফটোগ্রাফ কিন্তু আমাদের নিতেই হবে!"

রাস্তা ক্রমশঃই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসতে লাগল। গরুর গাড়ির চাকার দাগ, শক্ত মাটির ঢেলা — যেন বার্ধক্যের জরাজীর্ণ অবস্থা! আমাদের চারজনের দল মাঝে মাঝে গাড়ি থেকে নেমে গাড়িটাকে পিছন দিক দিয়ে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে দিতে লাগল যাতে করে রাইট সাহেব ফোর্ড গাড়িটাকে আরও একটু সহজে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

শৈলেশকে স্বীকার করতে হল, "লম্বোদরবাবু ঠিকই বলেছিলেন; এখন দেখছি যে গাড়ি আমাদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে না, আমরাই গাড়িকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি!"

গাড়িতে আমাদের অনবরত ওঠা আর নামার একঘেয়েমি দূর হচ্ছিল মাঝে মাঝে যখন একটা গ্রাম এসে পড়ছিল — অপরূপ সুন্দর সরল গ্রাম্যদৃশ্য! মনটা তাতে একটু হাল্কা হয়।

এবার রাইট সাহেবের ডায়েরি থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি; তারিখ হচ্ছে ১৯৩৬ সালের ৫ই মে, — "সভ্যতার কৃত্রিমতার সংস্পর্শশূন্য প্রাচীন গ্রামগুলি বনের ছায়ার কোলে বাসা বেঁধেছে, তার ভিতরে তালবনের পাশ দিয়ে আমাদের গাড়ি এঁকেবেঁকে পথ করে নিয়ে চলল। মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা কুঁড়েঘরগুলো দেখতে ভারি চমৎকার। দরজায় এক একটা ঠাকুরের নাম লেখা। ছোট ছোট উলঙ্গ শিশুরদল নিঃশঙ্কচিত্তে খেলা করছে। গাড়ি যখন ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের গ্রামের ভেতর দিয়ে দৌড়চ্ছে, কেউবা তখন দাঁড়িয়ে হাঁ করে তা দেখছে আর কেউবা তা দেখেই প্রাণপণে ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে। এ কিরকম গাড়ি? প্রকাণ্ড কালোরঙের — তাতে বলদ জোড়া নেই, আপনিই দৌড়চ্ছে! গ্রাম্যনারীরা আড়াল থেকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে আর পুরুষেরা রাস্তার ধারে গাছের তলায় অলসভাবে ঠেসান দিয়ে বসে রয়েছে — অবজ্ঞার মধ্যেও যেন একটা কৌতূহলের ভাব। এক জায়গায় গ্রামবাসীরা একটা বড় পুকুরে নেমে খুব স্ফূর্তিতে স্নান করছে দেখা গেল (গায়ে শুকনো কাপড় জড়িয়ে ভিজে কাপড় তখন ছেড়ে ফেলছে)। মেয়েরা বড় বড় পিতলের ঘড়া করে জল নিয়ে যাচ্ছে।

"রাস্তায় অনেক চড়াই-উৎরাই। গাড়িতে ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে সামলাতে, লাফাতে লাফাতে, ছোট ছোট খানাখন্দ পার হয়ে, একটা অসমাপ্ত বাঁধ ঘুরে, শুকনো একটা বালিভরা নদীগর্ভ দিয়ে মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়ে অবশেষে বেলা ৫টা নাগাদ আমাদের গন্তব্যস্থল বিউরের নিকটস্থ হলাম। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে ছোট এই গ্রামটি, চারিদিকে ঘন গাছপালার আড়ালে লুকোন; বর্ষায় জলের স্রোত যখন উদ্দামবেগে প্রবাহিত হয় আর সর্পিল রাস্তা কাদায় ভরা থাকে, তখন পথিকদের গ্রামে পৌঁছবার আর কোন উপায় থাকে না।

“একটা নির্জন মাঠের মাঝে এক মন্দির থেকে পুজো সেরে একটা দল তখন ফিরছিল; তাদের মধ্যে একজনকে পথ দেখিয়ে দেবার কথা বলতেই ডজনখানেক প্রায় নেংটিপরা ছোট ছেলের দল তড়াক করে দু'ধারের ফুটবোর্ডে লাফিয়ে উঠে পড়ল — সবাই বলে যে, গিরিবালা দেবীর কাছে আমাদের নিয়ে যাবে।

“রাস্তাটা একটা খেজুরঝোপে ঘেরা কতকগুলো মাটির কুঁড়ের দিকে গিয়েছে; সেখানে পৌঁছবার আগেই হঠাৎ ফোর্ড গাড়িটা একটা বিপজ্জনক কোণে হেলে পড়ে বারকতক লাফিয়ে উঠল। সরু রাস্তাটা গেছে — গাছের সারি, পুকুরধার, উঁচুপাড়, গভীর গর্ত আর খাদের মাঝখান দিয়ে। গাড়িটা গিয়ে আটকাল একটা ঝোপের ধারে, তারপরে একটা উঁচু টিলার কাছে গিয়ে মাটিতে বসে গেল। কতকগুলো মাটির চাঙড়া না সরিয়ে আর উপায় রইল না। ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে আমরা এগিয়ে চললাম। হঠাৎ রাস্তাটা গিয়ে থামল গরুর গাড়ির চাকার দাগের মাঝখানে একটা নলখাগড়ার ঝোপের মত জায়গায়, ফলে আবার ঘুরতে হল খাড়া পাড় বেয়ে নেমে একটা মজাপুকুরের ভিতর দিয়ে। সেখান থেকে শাবলকোদাল বাইস দিয়ে রাস্তা খুঁড়ে কেটে বার করে তবে উদ্ধার। বারম্বারই দেখা গেল যে রাস্তায় আর চলা যায় না; কিন্তু কি করা যায়, তীর্থযাত্রা তো আর স্থগিত রাখা যায় না, এগোতেই হবে। অনুগত ছোকরারদল, কোদালটোদাল এনে রাস্তার মাঝখানের সব বাধাবন্ধ সাফ করে পথ বানিয়ে দিল (সিদ্ধিদাতা গণেশের সব চেলা আর কি!) আর শতশত গাঁয়ের লোক আর ছেলে-ছোকরারদল সব হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

“আমরা এগোতে লাগলাম পুরানো গরুর গাড়ির চাকার দাগ ধরে; একধারে মেয়েরা তাদের কুঁড়েঘরের দরজা থেকে বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে, আর একধারে পুরুষেরা পাশেপাশে আর পিছনপিছন আসতে লাগল, ছোঁড়াগুলো সব লাফাতে লাফাতে এসে শোভাযাত্রাটির কলেবর বৃদ্ধিসাধনে তৎপর হল — সে এক অপরূপ দৃশ্য! আমাদের গাড়িটিই বোধহয় এ রাস্তায় প্রথম মোটর যান! গরুর গাড়ির একাধিপত্য যেখানে,

সেখানে এ একটা অদ্ভুত ব্যাপার বই কি! কি যে চাঞ্চল্য তখন সৃষ্টি করেছিলাম আমরা — একজন আমেরিকান এক গর্জনশীল মোটর গাড়িতে কিছু লোক নিয়ে তাদের গ্রাম্যদুর্গের একেবারে দুয়ারের গোড়ায় এসে হাজির — এতদিনের পুরোন আবরু এইবার বুঝি গেল!

"গাড়ি গিয়ে থামল একটা সরু গলির মুখে, যেখান থেকে গিরিবালা দেবীর বাপের বাড়ি একশত ফুট হবে। রাস্তার সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই করে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে অবশেষে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে আমাদের মন তখন বিজয়গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। চারদিকে মাটির কুঁড়েঘরের মাঝে একটা বড় দোতলা পাকাবাড়ি — তখন মেরামত চলছে, কারণ তখনও বাড়িটার চারদিকে বাঁশের ভারা বাঁধা।

"অন্তরের চাপা উল্লাসে আর অধীর আগ্রহে খোলা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম তাঁর বাড়িতে — ভগবান যাঁকে ক্ষুধার ক্লেশ থেকে মুক্তি দিয়ে অপার করুণা প্রদর্শন করেছেন। গ্রামবাসীরা — ছোট বুড়ো ন্যাংটা, কাপড়পরা সবাই হাঁ করে তাকিয়ে। মেয়েরা একটু দূরে দূরে রয়েছে বটে কিন্তু তাদেরও কৌতূহলের সীমা নেই — ছেলেবুড়ো সবাই এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে অসঙ্কোচে আমাদের পিছু পিছু আসতে লাগল।

"তারপরেই দ্বারপথে দেখা গেল একটি ক্ষুদ্রমূর্তি — গিরিবালা দেবী স্বয়ং, তসরের কাপড়পরা। ঘোমটার তলা থেকে সলজ্জ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এগিয়ে এলেন। ঘোমটার ছায়াতলে চোখ দু'টি হতে এক অপূর্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হচ্ছে। স্নিগ্ধ, শান্ত, সৌম্যমূর্তি — পার্থিব আকর্ষণমুক্ত ঈশ্বরোপলব্ধিজাত এক মহিমময় প্রশান্তিতে মুখখানি উদ্ভাসিত।

"ধীর শান্তপদে তিনি এগিয়ে এলেন। তাঁর নীরব সম্মতি পেয়ে আমরা তাঁর 'স্থির' আর 'চলচ্চিত্র' তুলে নিলাম।* আমাদের ক্যামেরা ঠিক করে নেওয়া, আলোর ব্যবস্থা করা আর ঠিক হয়ে বসা প্রভৃতি ব্যাপারের

* শ্রীরামপুরে তাঁর শেষ জলবিষুবসংক্রান্তির উৎসবে রাইট সাহেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীরও চলচ্চিত্র তুলে নিয়েছিল।

হাঙ্গামা তিনি ধৈর্যসহকারে সহ্য করে সলজ্জভাবে অপেক্ষা করে বসে রইলেন। অবশেষে তাঁর অনেকগুলি ফটো গ্রহণ করা গেল — ভবিষ্যতে সাক্ষী রাখবার জন্যে যে তিনিই পৃথিবীতে একমাত্র নারী যিনি গত পঞ্চাশ বৎসরেরও উপর নিরম্বু উপবাস করে আছেন (থেরেসা ন্যোয়ম্যান অবশ্য ১৯২৩ সাল থেকে উপবাস করে আছেন)। গিরিবালা দেবী আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন — মুখে তাঁর অপূর্ব মাতৃভাব, দেহ সম্পূর্ণরূপে বস্ত্রাবৃত; ছোট্ট দু'টি পা, আর মুখটি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না; দৃষ্টি অবনত। মুখে অপূর্ব সারল্যের ভাব ও প্রশান্তির ছাপ, নাসিকাটি সুডৌল, শিশুদের মত ওষ্ঠাধার, উজ্জ্বল দু'টি চোখ আর মুখে অপরূপ হাসি!"

গিরিবালা দেবী সম্বন্ধে রাইট সাহেবের যা ধারণা, আমারও তাই। তাঁর স্নিগ্ধোজ্জ্বল অবগুণ্ঠনের মতই একটা আধ্যাত্মিক ভাব তাঁকে ঘিরে রয়েছে। প্রণাম করলেন আমাকে — গৃহস্থ যেমন সাধুসন্ন্যাসী দেখে করে। তাঁর সরল মধুরভাব আর নীরব স্নিগ্ধহাসি, মধুমাখা অভ্যর্থনাবাণীর চেয়েও বেশি আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাল। ধুলোমাখা পথের কষ্টকর ভ্রমণের সব ব্যথা এক নিমেষে দূর হয়ে গেল।

গিরিবালা দেবী বারান্দায় গিয়ে ভূমিতে পা মুড়ে উপবেশন করলেন; বার্ধক্যের চিহ্ন দেখা গেলেও তিনি ক্ষীণদেহ ছিলেন না। বর্ণ ছিল তাঁর গৌর, পরিষ্কার আর স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে উজ্জ্বল।

আমি তাঁকে বললাম, — "মা, পঁচিশবছরেরও ওপর আমি সাগ্রহে আপনার দর্শন কামনা করে আসছি। আপনার এ পুণ্যজীবনের কথা স্থিতিলাল নন্দীবাবুর কাছ থেকেই শুনেছিলাম।"

তিনি মাথা নেড়ে বলেন, "হ্যাঁ, তিনি নবাবগঞ্জে আমাদের বাড়ির পাশেই থাকতেন।"

"এই সময়ের মধ্যে আমি সমুদ্রযাত্রা করে বিদেশে গেছি, কিন্তু একদিন এসে আপনার দর্শনলাভ করতে হবে — পূর্বেকার এ আকাঙ্ক্ষার কথা আমি কখনও ভুলিনি। মানুষের অন্তরে ভগবানের অনন্ত করুণাধারার কথা সংসার বহুদিন ভুলে গেছে। আপনি নীরবে নিভৃতে ভগবানের যে মহিমা এখানে প্রদর্শন করছেন, তার কথা সারা পৃথিবীতে প্রচার হওয়া উচিত।"

মিনিটখানেক এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, মুখের হাসিতে গভীর আগ্রহ। তারপর বিনম্রস্বরে বললেন, “বাবাই সব জানেন।”

তিনি যে কোন অপরাধ নিলেন না — তাতে আমি খুব খুশিই হলাম। প্রচার হবার কথায় যোগী বা যোগিনীরা যে কে কি রকম ব্যবহার করবেন, তা কেউ বলতে পারে না। সাধারণতঃ তাঁরা এ সব পরিহার করে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনা নীরবেই করে যেতে পছন্দ করেন। জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের উপকারের জন্য তাঁদের জীবনলীলা প্রকাশ্য প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হলেই তাঁরা অন্তরের মধ্যে সাড়া পান।

আমি বলতে লাগলাম, “মা, তা হলে দয়া করে আমায় ক্ষমা করবেন যদি বেশি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে আপনাকে বিরক্ত করি। যেটা খুশি হয় সেটাই উত্তর দেবেন, না হলে দেবেন না — আপনি চুপ করে থাকলেও আমি তা সব বুঝে নিতে পারব।”

প্রসন্ন মধুর ভঙ্গীতে হস্তদু'টি প্রসারিত করে তিনি বললেন, “নিশ্চয়, খুশি হয়েই উত্তর দেব আমি, তবে বাবা আমার মত অকিঞ্চন ব্যক্তি যতটা ভাল করে উত্তর দিতে পারে সেই অবধি — তার বেশি আর কি পারব?”

অন্তরের সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললাম, “না, না মা, অকিঞ্চন কি বলছেন! আপনি কত উচ্চ, কত মহান।”

“কি যে বলেন বাবা, দীনাতিদীনা আমি, সকলের অনুগতা দাসী”, তারপর তিনি অপূর্ব সারল্যের সঙ্গে বললেন, “তবে লোককে রেঁধে খাওয়াতে আমি বড্ড ভালবাসি।”

ভাবলাম এ তো ভারি অদ্ভুত শখ বিশেষতঃ এই নিরাহারা সাধ্বীর পক্ষে!

“আচ্ছা মা, আপনি নিজমুখে বলুন তো — আপনি কি সত্যিই একেবারে অনাহারে থাকেন?”

“হ্যাঁ বাবা, সত্যি।” মিনিটখানেক চুপ করে বসে রইলেন; তাঁর পরের কথাতে বোঝা গেল যে মনে মনে তিনি হিসেব কষছিলেন। তারপর তিনি বললেন, “বার বছর চারমাস বয়স থেকে আজকে এই

আটষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত, ছাপ্পান্ন বছরের উপর আমি কি খাবার, কি জল — কিছুই খাইনি।"

"খেতে কখনও লোভ হয় না?"

"খাবার ইচ্ছে হলে আমায় খেতে হত বইকি বাবা।"

সরল হলেও এই মহিমাদীপ্ত উত্তরদানে তিনি এক স্বতঃসিদ্ধ সত্য প্রকাশ করলেন, যা দিনে অন্ততঃ তিনবার করে ভোজনক্রিয়ায় রত পৃথিবীবাসীর কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত।

"কিন্তু নিশ্চয়ই আপনি কিছু খান বই কি!" একটু প্রতিবাদের সুরেই বললাম।

চট করে বুঝে নিয়ে একটু হেসে তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই!"

"সূর্যের আলো আর বাতাসের সূক্ষ্মতর শক্তি* আর যে ব্যোমশক্তি সুষুম্নাশীর্ষকের মধ্য দিয়ে আপনার শরীরে শক্তি সঞ্চার করে, তা থেকেই আপনি পুষ্টিগ্রহণ করেন, তাই না?"

---

* ১৯৩৩ সালের ১৭ই মে তারিখে মেমফিস শহরে ক্লেভল্যাণ্ডের ডাঃ জর্জ ডব্লিউ ক্রাইল এক চিকিৎসক সম্মেলনে নিম্নলিখিত ভাষণটি দিয়েছিলেন,—

"আমরা যা আহার করি তা হচ্ছে বিকিরণ; আমাদের খাদ্য হচ্ছে কিছু পরিমাণ শক্তি। এই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিকিরণ, যা তন্ত্রিকাজাল বা শরীরস্থ বিদ্যুৎবর্তনীতে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করে, তা সূর্যকিরণই খাদ্যের মধ্যে সঞ্চিত করে।" ডাঃ ক্রাইল বলেন, "অণুপরমাণুরা সব যেন সৌরমণ্ডল। কুঞ্চিত স্প্রিং-এর মত সৌরদীপ্তিপূর্ণ অণুপরমাণুরাই শক্তির বাহক। এইসব অসংখ্য অণুপরমাণুপূর্ণ শক্তিই খাদ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। এইসব উত্তেজনা বাহক অতি ক্ষুদ্রাকার অণুপরমাণু একবার মানবশরীরের প্রোটপ্লাজমে প্রবেশ করেই শরীরের তাপবিকিরণকারী নূতন রাসায়ণিক শক্তি ও নূতন তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করে। ডাঃ ক্রাইল বলেছেন, 'তোমার শরীর এইরকম অণুপরমাণুতে সংগঠিত। তারাই চক্ষুকর্ণের মত তোমার পেশী, মাস্তিষ্ক, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম।

বিজ্ঞানীরা হয়ত একদিন আবিষ্কার করবেন — মানুষ সরাসরি সৌরশক্তির উপর নির্ভর করে কিরূপে বেঁচে থাকতে পারে। নিউ ইয়র্ক টাইমসে উইলিয়াম এল. লরেন্স লিখেছেন, "ক্লোরোফিল হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে জাত একমাত্র পদার্থ যা সূর্যকিরণ ধরা ফাঁদের মত কাজ করবার এক প্রকার শক্তি ধারণ করে। তারা সূর্যকিরণের শক্তি 'ধরে' উদ্ভিদ মধ্যে তা সঞ্চয় করে রাখে। এদের ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভবপর হ'ত না। আমাদের বাঁচবার জন্যে যে শক্তির দরকার, তা আমরা পাই সৌরশক্তি হতে — আর তা সঞ্চিত থাকে আমাদের উদ্ভিজ খাদ্যে অথবা উদ্ভিদভোজী প্রাণীদের মাংসের মধ্যে। কয়লা অথবা খনিজ তেলের মধ্যে আমরা যে শক্তি পাই তা হচ্ছে সেই সৌরশক্তি, লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে উদ্ভিদজীবনে ক্লোরোফিল যা ফাঁদ পেতে ধরে রেখেছিল। ক্লোরোফিল-এর মাধ্যমেই আমরা সূর্যদেবের কৃপায় বেঁচে আছি।"

"বাবাই তো সব জানেন।" বলে আবার তিনি নীরব হয়ে পড়লেন, তাঁর ভাব শান্তস্নিগ্ধ ও অপ্রগলভ।

"মা, আপনার ছেলেবেলাকার কথা সব বলুন। ভারতের সবাইকার কাছে এ একটা গভীর আগ্রহের বিষয় — এমন কি সমুদ্রপারে আমাদের যে সব ভাইবোনেরা আছে, তাদের কাছেও।"

গিরিবালা দেবী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গাম্ভীর্য পরিহার করে আলাপ আলোচনায় মগ্ন হয়ে মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বললেন ঃ "আচ্ছা তবে বলি। আমার জন্ম এই জঙ্গলের দেশেই। আমার ছেলেবেলাকার কাহিনীতে বিশেষত্ব কিছুই নেই, কেবল একটামাত্র কথা ছাড়া — তা হ'ল, আমার ক্ষিধে ছিল রাক্ষুসে। ন' বছর বয়সেই আমার বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়।

"মা আমাকে সাবধান করে বলতেন, 'বাছা, ক্ষিধে চাপতে চেষ্টা করো। শ্বশুরঘরে গিয়ে যখন অজানা লোকেদের মাঝখানে তোমায় বাস করতে হবে, তখন সারাদিন তোমার খাইখাই করা দেখে তারা সব কি ভাববে বল দেখি?'

"তিনি যে বিপদের সম্ভাবনা আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন অবশেষে তাই-ই ঘটল। নবাবগঞ্জে যখন শ্বশুরঘর করতে গেলাম, তখন আমার বয়স মাত্র বার বছর। আমার সর্বদা খাইখাই স্বভাব দেখে শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ দিনরাত অনবরত গঞ্জনা করতে লাগলেন। যাইহোক, তাঁর বকুনি হয়েছিল শাপে বর! তা আমার মধ্যে সুপ্ত আধ্যাত্মিক বৃত্তিকে ক্রমশঃ জাগিয়ে তুলল। একদিন তিনি যে উপহাস আর বকুনি দিলেন, তা ভয়ঙ্কর নির্মম, হৃদয়হীন।

"অন্তরের অন্তঃস্থলে দারুণ মর্মবেদনা পেয়ে আমি বলে ফেললাম, 'আমি আপনাদের কাছে শীগগিরই প্রমাণ করে দেব যে, যতদিন আমি বাঁচব, ততদিন আমি আর কোন খাবারই ছোঁব না।'

"শ্বাশুড়ীঠাকরুণ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'বটে? ওমা তাই নাকি গো? যখন তুমি একবার খাওয়ার ওপর আবার না খেয়ে থাকতে পার না, তখন একেবারে না খেয়ে থাকতে পারবে কি করে গো, এ্যাঁ?'

"এ মন্তব্যের আর কোন জবাব চলে না। কিন্তু তবুও মনে জেগে উঠল এক লৌহকাঠিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। একটু নিরালা জায়গায় গিয়ে ঈশ্বরের কাছে অনবরত প্রার্থনা করতে লাগলাম, 'ভগবান, দয়া করে আমায় এমন গুরু পাঠিয়ে দাও যিনি তোমারই আলোয় বেঁচে থাকতে আমায় শিখিয়ে দিতে পারবেন — খাওয়াতে নয়।'

"মনে একটা স্বর্গীয় আনন্দ আমাকে ছেয়ে দিল! কি একটা অপরূপ আনন্দের ঘোরে নবাবগঞ্জের গঙ্গার ঘাটের দিকে চললাম। রাস্তায় দেখা হল আমার শ্বশুরবাড়ির পুরুতঠাকুরের সঙ্গে।

"তাঁর উপর ভরসা করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঠাকুরমশাই, দয়া করে বলুন না, না খেয়ে কি করে বেঁচে থাকা যায়?'

"ঠাকুরমশাই তো প্রশ্ন শুনে অবাক। মুখে তাঁর কোন উত্তর যোগাল না, শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলেন। অবশেষে যেন একটু আশ্বাস দেবার জন্যে বললেন, 'বাছা, আজ সন্ধ্যার সময় মন্দিরে এস, তোমার জন্যে একটা বিশেষ বৈদিক প্রক্রিয়া করব।'

"এইরকম অস্পষ্টগোছের উত্তরে আমি তৃপ্তিলাভ করতে পারলাম না; আবার ঘাটের দিকে এগোতে লাগলাম। সকালবেলা সূর্যের আলো গঙ্গার জলে ছড়িয়ে পড়েছে। গঙ্গা স্নান সেরে নিয়ে পবিত্র হলাম, যেন আমার তখন পুণ্য দীক্ষা হবে। ঘাট ছেড়ে ভিজেকাপড়ে যখন উঠে আসছি, তখন সেই দিনের আলোর মাঝখানে আমার গুরুদেব আমার সামনে সশরীরে আবির্ভূত হলেন!

"স্নেহকোমল স্বরে তিনি বললেন, 'মা লক্ষ্মী, আমিই তোমার গুরু; ভগবান আমায় এখানে পাঠিয়েছেন তোমার ব্যাকুল প্রাথনা পূরণ করবার জন্যে। এরকম অদ্ভুত প্রার্থনায় তিনিও গভীরভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছেন। আজ হতে তুমি সূক্ষ্মশক্তির বলে জীবনধারণ করবে — তোমার শরীরের অণুপরমাণু সেই অনন্ত শক্তির সাহায্যেই পুষ্ট হবে।'"

গিরিবালা দেবী নীরব হলেন। রাইট সাহেবের কাছ থেকে আমি প্যাড আর পেনসিল নিয়ে কতকগুলো কথা তার বুঝবার জন্যে ইংরেজিতে লিখে দিলাম।

আবার তিনি বলতে শুরু করলেন — তাঁর শান্তস্বর এত মৃদু যে তা প্রায় শ্রুতিগোচর হয় না। "ঘাট তখন নির্জন, কিন্তু আমার গুরুদেব আমাদের চারধারে এমন একটা আলোর বলয় সৃষ্টি করলেন যাতে হঠাৎ কেউ স্নান করতে এসে পড়ে আমাদের বিরক্ত না করে। তিনি তখন আমায় এমন একটি ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত করলেন যাতে করে মনুষ্যজীবনে প্রয়োজনীয় কোন জড় খাদ্যের উপরই শরীরকে নির্ভর করতে না হয়। প্রণালীটির ভিতর প্রধানতঃ একটি মন্ত্রের* ব্যবহার আর শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম আছে, যা সাধারণ কোন লোকের পক্ষে প্রয়োগ করা অত্যন্ত কঠিন। এতে কোন ওষুধবিষুধও নেই, আর কোন ভোজবাজিও নেই — 'ক্রিয়া' ছাড়া এতে আর কিছুই নেই!"

আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের কেরামতি তারা আমাকে তাদের অজ্ঞাতসারেই শিখিয়েছিল; তা দিয়ে আমি গিরিবালা দেবীকে বহুবিষয়ে প্রশ্ন করলাম এই ভেবে যে, তাতে জগতের উপকার হবে। একটু একটু করে তিনি এইসব সংবাদ দিলেন, ...

"ছেলেপুলে আমার কখনও হয় নি; বহুবছর আগে বিধবা হই। ঘুমাই খুবই কম, কারণ জাগা আর ঘুমান — ও দুটোই আমার কাছে সমান। দিনে ঘরসংসারের কাজকর্ম সব করি, রাত্রে একটু জপতপ, ধ্যানধারণায় বসি। ঋতুপরিবর্তন অবশ্য সামান্যই বোধ করি। জীবনে কখনও অসুস্থ হইনি, বা রোগভোগও কোনদিন করিনি। হঠাৎ করে কোথাও আঘাত লেগে গেলে সেখানে কেবলমাত্র ঈষৎ বেদনাই অনুভব করি। মলমূত্রত্যাগের কোন প্রয়োজন হয় না। হৃৎপিণ্ডের গতি আর শ্বাসপ্রশ্বাস সংযত করতে পারি। স্বপ্নে প্রায়ই আমার গুরুদেব আর অন্যান্য মহাপুরুষদের দর্শনলাভ হয়।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা মা, অন্য কাউকে না খেয়ে বেঁচে থাকবার উপায়টা শিখিয়ে দিন না কেন?"

---

* শক্তিবহ কম্পমান পাঠ। সংস্কৃত 'মন্ত্র' শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ হচ্ছে 'মননের মাধ্যমে।' এর অর্থ ঃ "আদর্শ অশ্রুত ধ্বনি, যা সৃষ্টির একটি রূপের প্রতিভূ। যখন তা অক্ষরে উচ্চারিত হয়, তখন তা বিশ্বজনীন শব্দ হয়ে ওঠে। শব্দের অনন্ত শক্তির উদ্ভব হয় 'ওম্' থেকে, যা হলো 'বাক্য' বা মহাজাগতিক চালকযন্ত্রের (Cosmic Motor) সৃজনশীল গুঞ্জন।

হায়, হায়, পৃথিবীর কোটি কোটি ক্ষুধার্ত মানুষের মুক্তির উচ্চ আশা আমার তখন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল!

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, "না, তা হয় না; গুরুদেব এর রহস্য প্রকাশ করা বিশেষভাবেই নিষেধ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা নয় যে ভগবানের সৃষ্টিনাটকে কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়। বহু লোককে আমি যদি না খেয়ে বেঁচে থাকবার উপায় শিখিয়ে দিই, তাহলে চাষীরা তো আগে আমায় তেড়ে মারতে আসবে। এমন সুরসাল ফলমূল সব মাটিতে গড়াগড়ি খাবে। দুঃখ, অনাহার আর ব্যাধি — এসব তো কর্মেরই পরিণতি বলে বোধহয়; এরাই শেষপর্যন্ত জীবনের সত্যিকারের অর্থ খোঁজবার জন্যে আমাদের পরিচালিত করে।"

আমি ধীরে ধীরে বললাম, "আচ্ছা মা, আপনিই যে একলা না খেয়ে বেঁচে আছেন, এটার মানে কি?"

জ্ঞানালোকদীপ্ত আননে স্নিগ্ধ মধুর স্বরে তিনি বলতে লাগলেন, "মানুষ যে আত্মা তা প্রমাণ করবার জন্যে। আধ্যাত্মিক উন্নতির বলে মানুষ যে শুধু অন্নেই নয় — ঈশ্বরের জ্যোতিঃতে বেঁচে থাকতে ক্রমশঃ শিক্ষা করতে পারে, তা প্রদর্শন করবার জন্যে।"*

---

* গিরিবালার লব্ধ নিরাহার অবস্থা হচ্ছে একপ্রকার যোগশক্তি, যা পতঞ্জলির 'যোগসূত্রের' বিভূতিপাদে ৩১ নং শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি এমন একটি শ্বাসের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন যা মেরুদণ্ডস্থিত সূক্ষ্মশক্তির কেন্দ্র পঞ্চম চক্র বিশুদ্ধাকে প্রভাবিত করে। কণ্ঠের বিপরীত দিকে অবস্থিত এই বিশুদ্ধচক্র, পঞ্চভূত, আকাশ অথবা ইথারকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই ইথার আবার জড়কোষসমূহের অণুপরমাণুদের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান ব্যেপে রয়েছে। এই চক্রে মনঃসংযোগ করলে সাধক ইথারের শক্তিবলে প্রাণধারণ করতে সমর্থ হন।

থেরেসা ন্যোয়ম্যান কিন্তু জড়খাদ্য গ্রহণ করে জীবনধারণ অথবা অনাহারে থাকার জন্য কোন প্রকার যৌগিকপ্রক্রিয়া সাধন করেন না। এর ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত কর্মফলের জটিলতার মধ্যে লুক্কায়িত। থেরেসা ন্যোয়ম্যান অথবা গিরিবালাদের মত জীবনের অন্তরালে বহু ঈশ্বরার্পিত জীবন আছে, কিন্তু তাদের বহিঃপ্রকাশের পথই স্বতন্ত্র। খ্রিস্টিয় সাধুগণের মধ্যে যাঁরা অনাহারে জীবনধারণ করতেন (তাঁরা খ্রিস্টক্ষতাঙ্কধারীও ছিলেন) তাঁরা হলেন : শীডামের সেণ্ট লিডউইনা, রেণ্টের পুণ্যশীলা এলিজাবেথ, সিয়েনার সেণ্ট ক্যাথেরিন, ডোমিনিকা ল্যাজারি, ফলিগনো'র পুণ্যাত্মা এঞ্জেলা এবং উনবিংশ শতাব্দীর লুইসি লেটো। ফ্লিউয়ের সেণ্ট নিকোলাসও (ব্রুডার ক্লস — পঞ্চদশ শতাব্দীর সন্ন্যাসী, ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য যাঁর আকুল আহ্বান সুইস কনফেডারেশনকে রক্ষা করেছিল), বিশ বৎসর অনাহার করে বেঁচে ছিলেন।

তারপর গিরিবালা দেবী গভীর ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেলেন। দৃষ্টি অন্তর্মুখী। চোখের গভীর শান্তভাব ক্রমশঃ ভাবলেশবিহীন হয়ে গেল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল — শ্বাসবিহীন আনন্দময় সমাধির পূর্বাভাস। কিছুক্ষণের জন্য তিনি ভেসে চললেন সেই আনন্দস্রোতে, যা তাঁকে তাঁর অন্তরেই পরমানন্দের স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে দেয়।

রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। গাঁয়ের অনেক লোক অন্ধকারে চুপচাপ বসে। একটা ছোট কেরোসিনের আলো তাদের মাথার উপর ছড়িয়ে পড়েছে। রাত্রির কালো কোমল চন্দ্রাতপতলে দূরের কুটিরের লণ্ঠনের আলো আর জোনাকির চলমান ঝিকিমিকি একটা ভৌতিক নক্‌শা রচনা করেছে। বিদায়কাল ঘনিয়ে এল; মনটা বিচ্ছেদবেদনায় ভারী হয়ে উঠল, সামনে সুদীর্ঘপথ — একঘেয়ে, মন্থর, কষ্টকর যাত্রা!

গিরিবালা দেবী চক্ষু উন্মীলন করতেই আমি বললাম, "মা, আপনার একটা কিছু স্মৃতিচিহ্ন আমায় দিন — অন্ততঃ আপনার শাড়ির একটু ফালি!"

তিনি অবিলম্বে বেনারসী কাপড় হাতে করে নিয়ে এসে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমায় প্রণাম করলেন।

আমি ভক্তিভরে তখন বলে উঠলাম, "মা, আমাকে আবার প্রণাম করা কেন — বরং আমায় আপনার পুণ্য পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে দিন!"

৪৭ পরিচ্ছেদ

আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন

লণ্ডনে যোগ সম্বন্ধে ক্লাস হচ্ছিল, সেখানে বললাম, — "ভারতে আর আমেরিকায় আমি যোগ সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়েছি, কিন্তু একজন হিন্দু হিসেবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, ইংরেজ ছাত্রদের ক্লাস করতে পেরে আমি সত্যিই খুব খুশি।"

শুনে সেখানকার ক্লাসে যোগদানকারীরা বিশেষ আপ্যায়িত হয়ে হাসলেন; রাজনৈতিক কোন গণ্ডগোল আমাদের যোগালোচনায় কোনরকম শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে নি।

ভারতবর্ষ এখন এক পুণ্যস্মৃতি। ১৯৩৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস — আবার ইংলণ্ডে ফিরে এসেছি; ষোল মাস পূর্বে কথা দিয়ে গিয়েছিলাম যে আবার লণ্ডনে এসে বক্তৃতা দেব।

অনাদিকালের যোগের কথা শুনতে ইংলণ্ডও সমুৎসুক। গ্রোভনার হাউসে আমার কোয়ার্টারে রিপোর্টার, সংবাদপত্রের ক্যামেরাম্যান প্রভৃতির ভিড় লেগে রইল। ওয়ার্লড ফেলোশিপ অফ ফেথের ব্রিটিশ ন্যাশন্যাল কাউন্সিল, ২৯শে সেপ্টেম্বর এক সভার আয়োজন করলেন হোয়াইটফিল্ডের কংগ্রিগেশনাল চার্চে — সেখানে বক্তৃতা দিতে হল। বিষয়টি গুরুগম্ভীর ঃ "সৎসঙ্গে বিশ্বাস — সভ্যতা রক্ষার উপায়।" ক্যাক্সটন হলে রাত আটটার বক্তৃতায় এত লোকসমাগম হয়েছিল যে দু'রাত অতিরিক্ত জনতাকে উইণ্ডসর হাউস প্রেক্ষাগৃহে রাত সাড়ে ন'টায় আমার দ্বিতীয় বক্তৃতার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তার পরের সপ্তাহগুলিতে যোগের ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা এতই বেড়ে গেল যে, রাইট সাহেবকে অন্য আর একটা হলের বন্দোবস্ত করতে হল।

আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের বিষয়ে ইংরেজ সংসক্তির একটা প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমার প্রস্থানের পর লণ্ডনে যোগের ক্লাসের ছাত্ররা

নিজেদের মধ্যে একটা সেলফ্-রিঅ্যালাইজেশন ফেলোশিপ কেন্দ্র গঠন করে অমন সব ভীষণ যুদ্ধের বছরগুলিতেও নিয়মিত সাপ্তাহিক ধ্যানের অধিবেশনে জড়ো হতো।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালীন দিনগুলি অবিস্মরণীয়; লণ্ডনে শহর পরিদর্শন, তারপর সুন্দর গ্রামাঞ্চলে পরিভ্রমণ। সেখানকার বড় বড় কবি আর ব্রিটিশ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ বরেণ্য ব্যক্তিদের জন্মস্থান আর সমাধি ইত্যাদি রাইট সাহেব ও আমি, দু'জনে মিলে আমাদের বিশ্বস্ত ফোর্ডগাড়িতে করে ঘুরে ঘুরে সব বেড়িয়ে দেখলাম।

অক্টোবরের শেষ দিকে আমাদের ছোটদলটি সাদাম্পটন থেকে 'ব্রিমেন' জাহাজে চড়ে আমেরিকায় যাত্রা করল। নিউইয়র্ক বন্দরে স্ট্যাচু অফ্ লিবার্টি দেখে আনন্দের ভাবাবেগে আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল।

ফোর্ডগাড়িটা যদিও প্রাচ্যদেশে নানা দুর্গমপথ পরিভ্রমণ করে কিঞ্চিৎ বিবর্ণ ও ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তখনও সেটা বেশ মজবুত। যাইহোক, আমেরিকার মাটিতে নেমে সে নিউইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পাড়ি জমাল। ১৯৩৬ সালের শেষাশেষি একসময় মাউণ্ট ওয়াশিংটনে পৌঁছলাম!

বৎসরান্তের বড়দিনের উৎসব লস্-অ্যাঞ্জেলেস্ কেন্দ্রে পালিত হয় — প্রতিবৎসরই ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে। আট ঘণ্টা সমবেত ধ্যানে (আধ্যাত্মিক খ্রিস্টমাস)*, আর তার পরদিন খাওয়াদাওয়ার (সামাজিক

---

* ১৯৫০ সাল থেকে ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে সারাদিবসব্যাপি ধ্যানের ব্যবস্থা প্রচলন করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে অবস্থিত যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া/সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপের সভ্যগণও নিজ নিজ আবাসে অথবা এস. আর. এফ্./ওয়াই. এস. এস. মন্দিরে ও কেন্দ্রে, উপরোক্তভাবে খ্রিস্টমাস পর্ব উদযাপন করে থাকেন। এইভাবে তাঁরা খ্রিস্টমাসপর্ব চলাকালীন একদিন গভীর ধ্যান ও প্রার্থনায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁদের অনেকেই বলেছেন, পরমহংস যোগানন্দের সূচনাকৃত এই বাৎসরিক অনুষ্ঠান পালন করে তাঁরা প্রভূত অধ্যাত্ম সহায়তা ও আশীর্বাদলাভ করেছেন। মাউণ্ট ওয়াশিংটন কেন্দ্রে পরমহংসজী এক প্রার্থনাচক্র (Prayer Council) স্থাপন করেন, যেটি হলো ওয়াই. এস. এস./এস. আর. এফের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনাচক্রের নিউক্লিয়াস। যারা নিজস্ব সমস্যা সমাধান বা অবসানের নিমিত্ত সাহায্য চান, তাদের জন্যে এখানে রোজ প্রার্থনা করা হয়। — *(প্রকাশকের মন্তব্য)*

খ্রিস্টমাস) উৎসবে। এ বছরের উৎসব খুব জোরদার হলো, কারণ দূর শহর থেকে বহু ছাত্র, শিষ্য, প্রিয়বন্ধুরা সব এসেছেন এই ভূপর্যটকত্রয়কে গৃহপ্রত্যাবর্তনে স্বাগত সম্ভাষণ জানাতে।

খ্রিস্টমাসদিবস পর্ব উপলক্ষ্যে আনন্দভোজে যে সব উপাদেয় আহার্যের উপকরণাদি সংগ্রহ করা হয়েছিল, তা সব এসেছে পনের হাজার মাইল দূর থেকে; কাশ্মীর থেকে "গুচ্ছি" ব্যাঙের ছাতা, টিনের কৌটোয় রসগোল্লা, আমসত্ব, পাঁপড়, কেওড়ানির্যাস — আইসক্রীম সুগন্ধি করবার জন্যে। সন্ধ্যাবেলায় আমরা একটা প্রকাণ্ড খ্রিস্টমাস বৃক্ষের চতুর্দিকে ঘিরে বসলাম — নিকটের অগ্নিকুণ্ডে সুগন্ধি সাইপ্রেস গাছের কাঠ জ্বলছে।

এইবার সব উপহার বিতরণের পালা। পৃথিবীর চারদিক থেকে কত উপহারের জিনিষ সব আনা হয়েছে, — প্যালেস্টাইন, মিশর, ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বিদেশে কোন জংশনে পৌঁছলেই রাইট সাহেব কত যে যত্নে আর কত হুঁশিয়ারির সঙ্গে লাগেজগুলো সব গুণে তুলতো — পাছে আমাদের এই আমেরিকায় প্রিয়জনেদের জন্যে আনা মূল্যবান উপহারগুলি পথের মাঝেই চুরি হয়ে না যায়। পুণ্যভূমি (প্যালেস্টাইন) থেকে পবিত্র জলপাই গাছের প্রাচীরচিত্র, হল্যাণ্ড আর বেলজিয়ামের সূক্ষ্ম কারুকার্যকরা সব লেস্ আর চিকনের কাজ, পারস্যদেশের কার্পেট, সূক্ষ্ম কাজকরা কাশ্মীরী শাল, মহীশূরের সুগন্ধি চন্দনকাঠের থালা, মধ্যপ্রদেশের মূল্যবান পাথর, বহুকাল লুপ্ত রাজত্বকালের প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা, রত্নখচিত ফুলদানি ও কাপ, মিনিয়েচার, আর কাপড়ের পর্দা, ধূপ, অগুরু, চন্দন, সুগন্ধী প্রভৃতি পূজার সামগ্রী, স্বদেশী ছাপাকাপড়, ঢাকার কাজ, মহীশূরের গজদন্তের কারুকার্য, লম্বা শুঁড়ওয়ালা পারস্যদেশের চটিজুতো — সচিত্র প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, মখমল, কিংখাব; গান্ধীটুপি, মাটির জিনিষ, টালি, পিতলের বাসনপত্র, প্রার্থনা করবার র‍্যাগ্ (আসন) — তিনটে মহাদেশ লুট করে সব আনা হয়েছে!

গাছের তলায় বিরাট স্তূপ করে রাখা সুন্দর সুন্দর রঙীন কাগজে মোড়া পুলিন্দা একে একে বার করে নিয়ে সবাইকে বিতরণ করলাম।

"সিস্টার জ্ঞানমাতা" ... আমি তাঁর হাতে একটা লম্বা বাক্স তুলে দিলাম। মধুর শান্তমূর্তি উচ্চাবস্থার এই আমেরিকান মহিলা, আমার অনুপস্থিতকালে মাউণ্ট ওয়াশিংটনের দায়িত্ব বহন করেন। বাক্সের ঢাকা সরাতেই বেরিয়ে এল সোনালী বেনারসী শাড়ি। উপহারটি পেয়ে খুব খুশি — বললেন, "ধন্যবাদ গুরুদেব, শাড়ি পেয়ে মনে হল আমি ভারতবর্ষের দৃশ্য সব চোখের সামনে দেখছি!"

"মিস্টার ডিকিনসন" — এই উপহারটি কিনেছিলাম কোলকাতার দোকান থেকে। সে সময় ভেবেছিলাম "মিস্টার ডিকিনসন এটা পেয়ে খুব খুশিই হবেন।" মিস্টার ই. ই. ডিকিনসন আমার এক প্রিয়শিষ্য, ১৯২৫ সালে মাউণ্ট ওয়াশিংটনের প্রতিষ্ঠা থেকে প্রতি বৎসরই খ্রিস্টমাস উৎসবের সময় সে উপস্থিত থাকে।

আজ এই একাদশ বার্ষিক উৎসবের দিনে সে আমার সামনে দাঁড়িয়ে, তার লম্বা চৌকোনা উপহারের বাক্সটির ফিতে খুলেই অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল ... "রূপোর কাপ!"

মনে তখন তার যে কি ভাবের ঝড় উঠেছিল তা জানি না, তবে বোধহল বেচারা তার সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে — উপহারটির দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়েই রইল; উপহারটি বেশি কিছুই নয়, একটা লম্বা পানপাত্র, "রূপোর কাপ।" খানিকক্ষণ পরে একটু দূরে গিয়ে সে বসে রইল — যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। পুনরায় সাণ্টা ক্লসের ভূমিকা অভিনয় করবার পূর্বে আমি সস্নেহে তার দিকে চেয়ে একটু হাসলাম।

আনন্দকলরবে মুখারত সান্ধ্য উৎসবের পরিসমাপ্ত ঘটল — সকল দানের যিনি দাতা, তাঁর প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করে। তারপরে হ'ল দলবদ্ধ হয়ে খ্রিস্টমাস ক্যারলের গান।

কিছুদিন বাদে আমাদের দু'জনের কথাবার্তা হচ্ছিল। ডিকিনসন বলল, "গুরুদেব, রূপোর কাপের জন্যে এখন আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। খ্রিস্টমাস রাতে আমি তখন আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষাই খুঁজে পাই নি।"

"আমি তোমার জন্যেই বিশেষ করে এ উপহারটি বেছে এনেছি। পছন্দ হয়েছে তো?"

সলজ্জভাবে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে ডিকিনসন বলতে লাগল, "আজ তেতাল্লিশ বছরধরে আমি এই রূপোর কাপটির প্রত্যাশা করে আসছি। সে অনেক কথা; আজ পর্যন্ত আমি সে সব কথা কাউকে বলি নি। আরম্ভটা হয়েছিল নাটকীয়ভাবে। আমি জলে ডুবে যাচ্ছিলাম। আমরা তখন নেব্রাস্কার একটা ছোট শহরে থাকি। খেলা করতে করতে আমার বড় ভাই আমায় পনের ফুট গভীর একটা ডোবার ভিতর ঠেলে ফেলে দিল। আমার বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। দ্বিতীয়বার আবার যখন আমি জলে ডুবতে বসেছি, তখন হঠাৎ একটা রামধনু রঙের উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠে আমার চোখ যেন ঝলসে দিল। আলোয় চারিদিক ছেয়ে গেল, তার মাঝখানে দেখা গেল একটি মানুষের মূর্তি — প্রশান্ত দৃষ্টি, মুখে অভয় হাসি। তৃতীয়বারের বার যখন আমার দেহ আবার ডুবে যাবার উপক্রম হল, আমার ভাইয়েরই এক সঙ্গী একটা লম্বা আর সরু উইলো গাছের ডাল নুইয়ে জলের ধারে এমনভাবে ধরল যে আমি সেটার নাগাল পেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে সেটাকে ধরে ফেলে কোনক্রমে ভেসে রইলাম — তারপর পাড়ের উপর ছেলেগুলো আমায় তাড়াতাড়ি ধরে জল থেকে টেনে তুলে ফেলল, এবং প্রাথমিক চিকিৎসা করে তারা আমায় সুস্থ করে তুললো।

"বছর বার বাদে — তখন আমার বয়স সতের — মায়ের সঙ্গে শিকাগো শহরে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেটা ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস। ওয়ার্লড পার্লামেণ্ট অফ্ রিলিজিয়নের অধিবেশন তখন সেখানে চলছে। মা আর আমি একটা বড় রাস্তা দিয়ে চলেছি, এমন সময় দেখলাম সেই উজ্জ্বল জ্যোতিঃর স্ফূরণ। খানিকটা আগে আগে সেই একই ব্যক্তি ধীরে ধীরে চলেছেন — যাঁকে আমি বহুবছর আগে স্বপ্নে দর্শন করেছিলাম। একটা প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগারের কাছে এসে তিনি দরজার মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

"চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'মা, মা, ঐ সেই লোক, যিনি আমার ডুবে যাবার সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন।'

"মা আর আমি তাড়াতাড়ি চললাম সেই বাড়ির দিকে; লোকটি বক্তৃতা দেওয়ার মঞ্চের উপর বসেছিলেন। তখনিই জানতে পারলাম যে তিনি আর কেউ নন, স্বামী বিবেকানন্দ* — ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন। তাঁর একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শেষ হবার পর আমি তাঁর সাক্ষাতের জন্য এগিয়ে গেলাম। আমাকে দেখে তিনি মধুরভাবে হাসলেন, যেন আমরা দু'জন কতকালের বন্ধু। আমি তখন এতই ছোট যে মনের ভাব কি করে প্রকাশ করতে হয়, তা জানিনা, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে আমি এই আশা পোষণ করছিলাম যে তিনি আমার গুরু হতে সম্মত হবেন। তিনি আমার মনের কথা সব বুঝতে পারলেন।

"বিবেকানন্দজী তখন আমার দুই চক্ষুর উপর তাঁর দু'টি সুন্দর চক্ষুর গভীরদৃষ্টি স্থাপিত করে বললেন, 'না বাছা, আমি তোমার গুরু নই। তোমার যিনি গুরু তিনি পরে আসবেন, আর তিনি তোমায় একটি রূপোর কাপ দেবেন।' তারপর একটু থেমে তিনি হেসে বললেন, 'তুমি এখন যা বহন করতে সমর্থ, তার চেয়েও বেশি আশীর্বাদ তিনি তোমার উপর বর্ষণ করবেন।'"

মিস্টার ডিকিনসন বলতে লাগল, "দু'চারদিনের মধ্যেই আমি শিকাগো ছেড়ে চলে এলাম — কিন্তু সেই মহাপুরুষ বিবেকানন্দজীর আর দর্শন পেলাম না। কিন্তু তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি কথা আমার অন্তরের অন্তস্তলে চিরতরে খোদিত হয়ে রইল। বছরের পর বছর কাটতে লাগল, কিন্তু আমার কোন গুরু এলেন না। ১৯২৫ সালে একদিন রাত্রে আমি গভীরভাবে প্রার্থনা করলাম প্রভু, আমার কাছে আমার গুরু পাঠিয়ে দাও। ঘণ্টাখানেক বাদে অতি সুমধুর সঙ্গীতের ধ্বনি শুনে আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। দেখলাম, স্বর্গের কতকগুলি দেবদূত বাঁশী আর অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র নিয়ে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন। দিব্যসঙ্গীতে বায়ুমণ্ডল পরিপূর্ণ করে দেবদূতেরা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

---

* খ্রিস্টসম জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের প্রধান শিষ্য।

"তার পরদিন সন্ধ্যাবেলায় লস্-অ্যাঞ্জেলেসে আমি সর্বপ্রথম আপনার সভায় যোগদান করলাম এবং তখনই অনুভব করলাম যে আমার হৃদয়ের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে!"

নীরবে আমরা হাস্য বিনিময় করলাম।

মিস্টার ডিকিনসন বলতে লাগল, "আজ এগার বছরধরে আমি আপনার ক্রিয়াযোগের শিষ্য। কখনও কখনও আমি রূপোর কাপের কথা ভেবে আশ্চর্য হতাম; তখন আমার প্রায় এই বিশ্বাসই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে বিবেকানন্দর কথাগুলি রূপকমাত্র।

কিন্তু সেই রাত্রে, আপনি যখন খ্রিস্টমাসের গাছের কাছে সেই ছোট বাক্সটি আমার হাতে দিলেন, তখন জীবনে তৃতীয়বার আমি সেই উজ্জ্বল জ্যোতিঃর স্ফূরণ দেখতে পেলাম। তারপরেই আমার হাতে এল আমার গুরুর উপহার, যা বিবেকানন্দ তেতাল্লিশ বছর আগেই* দেখতে পেয়েছিলেন — একটি রূপোর কাপ!"

* মিস্টার ডিকিনসনের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হয় ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। আর ঐ একই বৎসরে ৫ই জানুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন পরমহংস যোগানন্দ। মনে হয়, স্বামী বিবেকানন্দ জানতে পেরেছিলেন যে যোগানন্দ আবার জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ভারতের চিরন্তন বাণী শিক্ষাদানের জন্য আমেরিকায় গমন করবেন।

১৯৬৫ সালে মিস্টার ডিকিনসনের ৮৯ বৎসর বয়স হওয়া সত্ত্বেও তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম ছিলেন। ঐ বৎসরে লস্-অ্যাঞ্জেলেসে, সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ প্রধান কেন্দ্রে, এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁকে যোগাচার্য উপাধি প্রদান করা হয়।

তিনি প্রায়ই পরমহংসজীর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধ্যান সাধনায় যোগ দিতেন এবং দৈনিক তিনবার করে ক্রিয়াযোগ সাধনা করা থেকে কখনো বিরত হতেন না।

যোগাচার্য ডিকিনসন ১৯৬৭ সালের ৩০শে জুন তারিখে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর দু'বছর পূর্বে তিনি সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপের সন্ন্যাসীদের কাছে একটি ভাষণ দেন। তিনি তাঁদের কাছে এমন একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করেন যা তিনি পরমহংসজীকে বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। যোগাচার্য ডিকিনসন সন্ন্যাসীদের বলেছিলেন ঃ 'আমি যখন শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে কথা বলার জন্য বক্তৃতা মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলাম, তখন তিনি আমার অভিবাদন জানানোর আগেই বলে উঠলেন ঃ

"যুবক, আমি তোমাকে জলাশয় থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছি!"

— *(প্রকাশকের মন্তব্য)*

৪৮ পরিচ্ছেদ

ক্যালিফোর্ণিয়ার এন্সিনিটাসে

"আপনাকে অবাক করে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে গুরুদেব। বিদেশে যখন আপনি বেড়াতে বেরিয়েছিলেন তখন আমরা এন্সিনিটাসে এই আশ্রমটি তৈরী করে ফেলেছি — আপনার 'স্বাগত প্রত্যাগমনে'র এটি একটি উপহার!" বলে মিস্টার লীন, সিস্টার জ্ঞানমাতা, দুর্গা মাতা ও কতিপয় আরো শিষ্য-শিষ্যা একটি গেটের ভিতর দিয়ে আমাকে নিয়ে ছায়াঢাকা পথ ধরে অগ্রসর হলেন।

দেখলাম, বাড়িটি নীল সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে — যেন প্রকাণ্ড একটি শ্বেতবর্ণের সমুদ্রগামী জাহাজ। প্রথমটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে তারপর ওঃ, আহা ইত্যাদি বিস্ময়সূচক শব্দ উচ্চারণে, তারপরে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতায় বাক্যহারা হয়ে, অবশেষে আশ্রমটি ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে লাগলাম। বাড়িটার মধ্যে ষোলটি খুব বড় বড় ঘর আছে — প্রত্যেকটাই সুন্দর করে সাজান।

বাড়িটার মাঝখানের হলঘরটির জানালাগুলি সব বিশাল বড়, প্রায় কড়িকাঠ স্পর্শ করেছে — তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় তৃণাচ্ছাদিত মাঠ, সমুদ্র, আর নীল আকাশ — ঠিক যেন পান্না, উপলমণি আর নীলার সিম্ফনি! হলের মাঝখানে প্রকাণ্ড ফায়ারপ্লেসের ম্যাণ্টেলের উপর যীশুখ্রিস্ট, বাবাজী, লাহিড়ী মহাশয় আর শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর ছবি। মনে হল, এই শান্ত স্নিগ্ধ পাশ্চাত্য আশ্রমের উপর তাঁরা আশীর্বাদ বর্ষণ করছেন।

হলের ঠিক নীচেই, সমুদ্রতীরের খাড়া জমিটার উপরেই দু'টি নির্জন গুহা তৈরী হয়েছে, ধ্যানসাধনার জন্যে — সামনেই দিগন্তবিস্তৃত অনন্ত মহাসমুদ্র, আর মাথার উপরে অসীম নীলাকাশ। বেলাভূমিতে সূর্যস্নানের নিরালা কোণ। নিভৃত কুঞ্জ অবধি বিস্তৃত পাথর বাঁধান রাস্তা, গোলাপ বাগান, ইউক্যালিপটাস কুঞ্জ, আর ফলের বাগান।

(আশ্রমের একটি দ্বারে সংলগ্ন "জেন্দাবেস্তা" থেকে এই "আবাসের জন্য প্রার্থনাটি" উদ্ধৃত করা হয়েছে), — 'শুদ্ধচেতা আর বীর্যবান পুণ্যাত্মাগণ যেন এখানে আসেন, এবং তাঁদের সঙ্গদানে আর শুভ আশীর্বাদ বিতরণে তাঁরা যেন আমাদের মঙ্গল সাধন করেন — যা হবে পৃথিবীর মত অবাধ, আকাশের ন্যায় উচ্চ।'

ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশস্থ এন্সিনিটাসের বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপকে মিঃ জেমস জে. লীন সাহেবের উপহার। লীন সাহেব ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে প্রথম "ক্রিয়াযোগে" দীক্ষিত হন এবং তদবধি ভক্তিভরে সাধনা করে আসছেন। মিঃ লীন একজন মার্কিন ব্যবসায়ী, অগণিত তাঁর দায়িত্ব ও কর্মভার (বিরাট তৈল প্রতিষ্ঠানসমূহ আর পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বিনিময়যোগ্য অগ্নিবীমা প্রভৃতির কর্ণধার); তবুও তিনি প্রত্যহ দীর্ঘ ও গভীর "ক্রিয়াযোগ" সাধন, ধ্যান প্রভৃতির জন্য সময় করে নেন। এইভাবে একটি সুসমঞ্জস জীবনযাপন করে তিনি 'সমাধি'তে অখণ্ড পরমানন্দ লাভ করেছেন।

ভারতবর্ষে আর ইউরোপে আমার অবস্থানের সময় (জুন ১৯৩৫ থেকে অক্টোবর ১৯৩৬) মিঃ লীন* ক্যালিফোর্ণিয়ায় আমার সংবাদদাতাগণের সঙ্গে সপ্রেম চক্রান্ত করেছিলেন যাতে করে এন্সিনিটাসের আশ্রম তৈরীর কথা বিন্দুবিসর্গও আমার কানে না পৌঁছয়। তাই বিস্ময় আর আনন্দ আমার আর ধরে না।

আমেরিকায় থাকার গোড়ার দিকে আমি ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূলে খোঁজ করে বেড়িয়েছিলাম একটি ছোট্ট জায়গা, যাতে সমুদ্রতীরে একটি আশ্রম স্থাপন করতে পারি। যখনই উপযুক্ত স্থান খুঁজে পাই তখনই একটা না একটা বাধা উপস্থিত হয়ে কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। আজ এন্সিনিটাসের রৌদ্র-কিরণোজ্জ্বল ভূমিতে ভক্তিঅবনত চিত্তে দাঁড়িয়ে

---

* মিঃ লীন (রাজর্ষি জনকানন্দ) পরমহংস যোগানন্দজীর মহাসমাধির পর সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ এবং যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটির সভাপতি হয়েছিলেন। তদীয় গুরু সম্বন্ধে মিঃ লীনের মন্তব্য, "প্রকৃত সাধু সঙ্গ কি অপূর্ব, কি স্বর্গীয়! আমার জীবনে যা কিছু পেয়েছি তার মধ্যে পরমহংসজীর আশীর্বাদই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ!"

মিস্টার লীন ১৯৫৫ সালে 'মহাসমাধি' লাভ করেন। — *(প্রকাশকের মন্তব্য)*

দেখলাম — শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর* বহুদিন পূর্বেকার ভবিষ্যদ্বাণী, “সমুদ্রতীরে আশ্রম”, আজ বিনা আয়াসেই পূর্ণ হয়েছে।

মাসকয়েক পরে, ১৯৩৭ সালে ঈস্টারে, আমি এন্সিনিটাসের তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে প্রথম ঈস্টারের ঊষাপ্রার্থনা শুরু করলাম। কয়েকশত শিক্ষার্থী সে প্রার্থনাসভায় যোগদান করেছিল। পূর্বগগনে নব অরুণোদয়, যা প্রতিদিনের এক অলৌকিক ঘটনা — পুরাকালের প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞানী ব্যক্তিদের (মেইজাই) মত সকলে ভক্তিপ্লুত চিত্তে তার দিকে তাকিয়ে দেখছিল; পশ্চিমে অনন্ত প্রশান্ত মহাসাগর তার উর্মিনৃত্যে যেন গভীর বন্দনাগান করছে। দূরে ছোট্ট একটি সাদা পালতোলা নৌকা; একটি শঙ্খচিল একাকীই নীল আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। “যীশুখ্রিস্ট, আজ তুমি পুনরুত্থিত!” কেবলমাত্র গ্রীষ্মের সূর্যের সঙ্গে নয় — আত্মার অনন্ত ঊষার মধ্যে!

মাস কতক বেশ সুখেই কাটল। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের নিরবচ্ছিন্ন শান্তির মধ্যে এন্সিনিটাসের আশ্রমে বসে আমি বহুদিনের মনের মধ্যে অভিলাষিত একটা কাজ শেষ করে ফেললাম — সেটা “কস্‌মিক্ চ্যান্টস” রচনা। অনেক ভারতীয় গানে ইংরেজী শব্দ ও পাশ্চাত্য সুরসংযোজন করেছি। এর মধ্যে আছে আচার্য শঙ্করের “ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা”, সংস্কৃত — “ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং”, রবিঠাকুরের — “মন্দিরে মম কে আসিল হে”; আর বাকী সব আমার নিজস্ব রচনা ঃ “আমি সদা তোমারই”, “স্বপন পারের দেশে”, “নীরব গগন হতে নেমে এস”, “শোন মোর অন্তরের ডাক”, “শান্তি মন্দিরে।”†

এই সঙ্গীতগ্রন্থের মুখবন্ধে প্রাচ্যের ভক্তিভাবের সুর পাশ্চাত্যের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তার সম্বন্ধে আমার প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলাম। উপলক্ষ্যটা ছিল একটা জনসভা, কাল ১৯২৬ সালের ১৮ই এপ্রিল, স্থান নিউইয়র্কের কার্নেগী হল।

---

* ১২ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

† যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত। পরমহংস যোগানন্দজীর ‘কসমিক চ্যান্ট’ হতে কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। রেকর্ডগুলি যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ায় প্রাপ্তব্য। — *(প্রকাশকের নিবেদন)*

১৭ই এপ্রিল তারিখে আমার একটি আমেরিকান ছাত্র মিস্টার আলভিন হানসিকারকে গোপনে বললাম, "আমি মনে করছি, শ্রোতৃবৃন্দকে একটি প্রাচীন হিন্দু ভজনগান গাইতে বলব, 'হে হরি সুন্দর, হে হরি সুন্দর!'"*

মিস্টার হানসিকার আপত্তি তুলে বলল যে আমেরিকানরা প্রাচ্য দেশীয় গানবাজনা বিশেষ বোঝেটোঝে না।

আমি তার উত্তরে বললাম, "সঙ্গীত হচ্ছে এক সর্বজনীন ভাষা — আমেরিকানরাও এ রকম প্রাণমাতান গানের উচ্চভাব গ্রহণ করতে কখনও অপারগ হবে না।"

তার পরদিন রাত্রে শ্রোতৃবৃন্দের তিনসহস্রকণ্ঠের সমবেতসঙ্গীতে একঘণ্টার উপর অবিরতভাবে সেই ভজন গান চলল "হে হরি সুন্দর, হে হরি সুন্দর।" আনন্দের আর বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই। নিউইয়র্কবাসিগণ! তোমাদের সকলের অন্তর ভগবানের মহিমাকীর্তনের আনন্দের প্রবল উচ্ছ্বাসে আজ কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছে। সেই সন্ধ্যায় ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে ভগবানের পুণ্যনামগানে ভক্তদের মধ্যে অনেকেরই দৈবশক্তিবলে রোগনিরাময় সাধিত হয়েছিল।

১৯৪১ সালে আমি বোস্টন শহরের সেল্ফ-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ কেন্দ্র পরিদর্শন করি। বোস্টন কেন্দ্রের পরিচালক ডাঃ এম. ডব্লিউ. লিউইস আমার জন্য একটি সুরুচিসম্মতভাবে সজ্জিত সুইটে বসবাসের বন্দোবস্ত করে দিলেন। ডাঃ লিউইস একটু হেসে বললেন, "গুরুদেব, একদিন আপনি আমেরিকা আসবার গোড়ার দিকে এই শহরে বাস করেছিলেন একটি মাত্র ঘরে, তাতে আবার কোন স্নানের ঘরও ছিল

---

* হে হরি সুন্দর, হে হরি সুন্দর, তোমার চরণে প্রণাম জানাই!
বনে অরণ্যে তুমি শ্যামলিমা, পাহাড়ে পর্বতে তুমি যে গরিমা,
নদীতে ঝর্ণায় তুমি যে চঞ্চল, সাগরে সাগরে গম্ভীর হে হরি!
সেবকজনের তুমি যে সেবা, প্রেমিকজনের তুমি যে প্রেম
দুঃখীজনের তুমিই সান্ত্বনা, যোগীজনের পরমানন্দ।।

— গুরু নানক

না। এখন দেখুন বোস্টন শহরে কেমন আরামদায়ক আর সাজান সব ঘর পাওয়া যায়!”

ক্যালিফোর্ণিয়ায় কর্মোদ্যমেপূর্ণ বছরগুলি বেশ সুখেই কাটল। এন্সিনিটাসের সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ কলোনি* ক্যালিফোর্ণিয়ায় ১৯৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলোনির কার্যাবলীর মধ্যে এস. আর. এফ.-এর আদর্শে শিষ্যদের বহুমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা অন্তর্গত; এছাড়া এন্সিনিটাস্ ও লস অ্যাঞ্জেলস কেন্দ্রের এস. আর. এফ. আবাসিকদের জন্য তাজা শাকসব্জি ও ফলমূলের চাষও এখানে হয়।

“তিনি সকল মানবজাতিকে এক শোণিতেই সৃষ্টি করেছেন।”† “বিশ্ব ভ্রাতৃসঙঘ” একটা খুবই গালভরা কথা, কিন্তু যে মানুষ নিজেকে বিশ্ববাসী বলে মনে করে, অবশ্যই তার মানুষের প্রতি সহানুভূতি বর্ধিত করা উচিত। যদি কেউ সত্যসত্যই বুঝতে পারে যে এ “আমারই আমেরিকা, আমারই ভারতবর্ষ, আমারই ফিলিপিন্স, আমারই ইউরোপ, আমারই আফ্রিকা” ইত্যাদি, তাহলে তার সার্থক আর সুখময় জীবনযাপনের সুযোগের অভাব হবে না।

যদিও শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজীর দেহ ভারতবর্ষ ছাড়া আর অন্য কোন মাটির উপর বিচরণ করে নি, তবুও তিনি বিশ্বভ্রাতৃত্বমন্ত্রের এই মহাসত্যটি জানতেন ঃ “সারা জগৎটাই আমার আপন ঘর।”

---

* এটি এখন একটি বিরাট আশ্রম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই কেন্দ্রের পরিধির মধ্যে রয়েছে আদি মুখ্য সাধন কুটীর, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের থাকার জন্য আশ্রম গৃহ, ভোজনালয় এবং সঙেঘর সভ্য ও সুহৃদ্‌বর্গের নির্জনে সাধনা করার উপযুক্ত সুন্দর বাসগৃহ। প্রধান সড়ক পথের দিকে মুখোমুখি সুপ্রশস্ত জমির উপর পাশাপাশি দণ্ডায়মান রয়েছে অনেকগুলি শ্বেতবর্ণের স্তম্ভ ও তার ওপর শোভা পাচ্ছে স্বর্ণবর্ণের ধাতু নির্মিত পদ্মফুল। ভারতীয় শিল্পকলায় পদ্মফুলকে বলা হয় আমাদের মস্তিষ্কের কেন্দ্রে (সহস্রার) অবস্থিত মহাজাগতিক চৈতন্যের কেন্দ্র — ‘সহস্রদলযুক্ত আলোকের পদ্মফুল।’

† একটস্, ১৭ ঃ ২৬ (বাইবেল)।

৪৯ পরিচ্ছেদ

সন ১৯৪০—১৯৫১

"ধ্যানের প্রকৃত মূল্য কি, তা আজ আমরা সত্যই বুঝতে পেরেছি। আর এও জানি, কোন কিছুই আমাদের অন্তরের শান্তিকে বিনষ্ট করতে পারবে না। গত কয়েক সপ্তাহের অধিবেশনের সময় আমরা বিমান আক্রমণের সতর্কধ্বনি শুনেছিলাম আর বিলম্বিত-ক্রিয়ার বোমার বিস্ফোরণের শব্দও আমাদের কানে এসেছিল; কিন্তু শিক্ষার্থীরা তবুও একত্রে সমবেত হয়ে আমাদের সৎসঙ্গে সাগ্রহে যোগদান করে পরিপূর্ণ আনন্দই লাভ করেছিল।"

আমেরিকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের অব্যবহিত পূর্বেই যুদ্ধবিধ্বস্ত ইংলণ্ড ও ইউরোপ থেকে অনেক চিঠি আমার কাছে আসে। সেই সকল চিঠিপত্রের মধ্যে উক্ত পরম নির্ভরতার সংবাদটি লণ্ডন সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিল। "দি উইসডম অফ্ দি ঈষ্ট" সিরিজের প্রখ্যাত সম্পাদক ডাক্তার ক্র্যানমার-বিঙ্ আমায় ১৯৪২ সালে লিখেছিলেন ঃ "যখন আমি 'ঈষ্ট-ওয়েষ্ট'* পড়লাম, মনে হল আমরা কত দূরদূরান্তে রয়েছি — যেন আমরা দুটো স্বতন্ত্র জগতে বাস করি। লস্-অ্যাঞ্জেলেস্ থেকে সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা, স্বস্তি ও শান্তি আমার কাছে আসে, ঠিক যেন কোন অবরুদ্ধ নগরীতে প্রেরিত 'হোলি গ্রেলে'র আশীর্বাদ আর স্বাচ্ছন্দ্য বোঝাই হয়ে বন্দরে জাহাজ প্রবেশ করার মত। আমি স্বপ্নে দেখতে পাই, আপনাদের ধ্যানকুঞ্জ আর এন্সিনিটাসের মন্দির, তার সামনে অনন্তবিস্তৃত মহাসাগর আর পার্বত্যদৃশ্য; আর সর্বোপরি আধ্যাত্মিক ভাবানুপ্রাণিত নরনারীবৃন্দ — যে গোষ্ঠী একতায় বদ্ধ, সৃষ্টি কার্যে নিবিষ্টচিত্ত, ধ্যানে পরিপুষ্ট ... সকল সৎসঙ্গীদের কাছে একজন সাধারণ সৈনিকের অভিনন্দন পাঠালাম — নজরদারী চৌকির উপর বসে লেখা, উষার প্রতীক্ষায় ..."

---

* বর্তমানে পত্রিকাটির নাম "সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন"।

ক্যালিফোর্ণিয়ার হলিউড শহরে একটি সর্বধর্মসমন্বয় মন্দির এস. আর. এফ.-এর কর্মীবৃন্দ দ্বারা নির্মিত হয়ে উৎসর্গীকৃত হয় ১৯৪২ সালে। এক বছর বাদেই আর একটি এস. আর. এফ. মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যান ডিয়েগো শহরে এবং অন্য একটি ক্যালিফোর্ণিয়ারই লং বীচ শহরে ১৯৪৭ সালে।

লস্-অ্যাঞ্জেলেস্ শহরের প্যাসিফিক প্যালিসেডস অঞ্চলে লতাপুষ্পের মোহনকুঞ্জ শোভিত, পৃথিবীর মধ্যে এক অপূর্ব সুন্দর ভূমিখণ্ড সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপকে প্রদান করা হয় ১৯৪৯ সালে। দশ একর পরিমিত ভূখণ্ডটির স্বাভাবিক আকৃতি ডিম্বাকার, হরিৎবর্ণের শৈলমালা বেষ্টিত। একটি সুবৃহৎ স্বাভাবিক হ্রদ, পার্বত্য মুকুট মাঝে যেন নীলকান্তমণি; তারই কারণে এই মনোরম ভূমিটির নাম হয়েছে 'লেক স্রাইন' (হ্রদতীর্থ)। জমির মাঝখানে একটি অপূর্ব ওলন্দাজ হাওয়া-যাঁতাকলের মত বাড়িতে একটি শান্ত শ্রীমণ্ডিত উপাসনালয় আছে। ঢালু উদ্যানের কাছে একটি বিরাট জলচক্র জলপ্রবাহের মন্থরগীতি গেয়ে চলেছে। চীনদেশের দু'টি মর্মর মূর্তি স্থানটির শোভাবর্ধন করেছে — একটি হচ্ছে প্রভু বুদ্ধদেবের, আর অন্যটি হচ্ছে কোয়ান্ ইন্ (জগজ্জননীর চীনা প্রতিরূপ)-এর। একটি জলপ্রপাতের উপরকার পাহাড়ে যীশুখ্রিস্টের পূর্ণাবয়ব মূর্তি দণ্ডায়মান। এর মুখমণ্ডল আর আলম্বিত বস্ত্রাবরণ রাত্রিতে উজ্জ্বলভাবে আলোকিত করা হয়।

মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্লড পীস মেমোরিয়াল (মহাত্মা গান্ধী বিশ্বশান্তি স্মৃতিমন্দির) হ্রদতীর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫০ সালে। একই বছরে আমেরিকায় সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপের ত্রিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসবও* পালিত হয়। ভারতবর্ষ হতে প্রেরিত মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র চিতাভস্মের কিয়দংশ, সহস্র বৎসরের প্রাচীন একটি প্রস্তর পেটিকায় সযত্নে সেখানে রক্ষিত আছে।

১৯৫১ সালে হলিউডে একটি এস. আর. এফ. "ইণ্ডিয়া সেণ্টার" স্থাপিত হয়। ক্যালিফোর্ণিয়ার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর মিঃ গুডউইন জে.

---

* এই উৎসব উপলক্ষ্যে লস্-অ্যাঞ্জেলেসে ১৯৫০ সালের ২৭শে আগস্ট তারিখে আমি এক পবিত্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করি, এবং পাঁচশত দীক্ষার্থিকে ক্রিয়াযোগে দীক্ষা দিই।

নাইট, এবং ভারতের কন্সাল জেনারেল শ্রী এম. আর. আহুজা উৎসর্গ অনুষ্ঠানে আমার সঙ্গে যোগদান করেন। ওখানে আছে একটি আড়াইশত আসন বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ — "ইণ্ডিয়া হল।"

বিভিন্ন এস. আর. এফ. কেন্দ্রে নবাগত অনেকেই যোগ সম্বন্ধে আরও জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কখনও কখনও আমি এই জাতীয় প্রশ্নও শুনতে পাই ঃ "কোন কোন প্রতিষ্ঠান বলে থাকে যে, ছাপা বই পড়ে যোগের সকল প্রকার অনুশীলন করা সম্ভবপর নয়; তা করতে গেলে একমাত্র আচার্যের প্রত্যক্ষ নির্দেশনা প্রয়োজন — এটা কি সত্যি।"*

এই আণবিক যুগে যোগদা সৎসঙ্গ লেশ্যনসের মত শিক্ষাবলীর ব্যবস্থা দ্বারাই যোগশিক্ষা করা কর্তব্য, অন্যথা এই মুক্তিদায়ক বিজ্ঞান আবার কয়েকটি মুষ্টিমেয় লোকেদেরই করায়ত্ত হয়ে পড়বে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী যদি তার কাছে কোন সিদ্ধ গুরুকে পান তাহলে তো সেটা তার পক্ষে একটা অমূল্য আশীর্বাদ হয়; কিন্তু জগতে তো "পাপীতাপী"দের সংখ্যাই বেশি, সাধুসন্তরা আর ক'জন? তাহলে জনসাধারণই বা কিভাবে যোগের সাহায্য পাবে, যদি না তারা বাড়িতে বসেই প্রকৃত যোগিদের লিখিত সাধন প্রণালীর অনুধ্যান করতে পারে?

এর একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে "সাধারণ লোককে" অবজ্ঞা করা ও তাদের যোগবিদ্যা না দেওয়া। কিন্তু নতুন যুগে ঈশ্বরের অভিপ্রায় তা নয়। বাবাজী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, সকল খাঁটি ক্রিয়াযোগিদের তিনি রক্ষা করবেন ও তাদের ঈশ্বরের পথে পরিচালিত করবেন।† মানুষ যে অমৃতের সন্তান সে অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা যখন সে করবে, তখন

---

* বাড়িতে পড়ার জন্য এই বোধগম্য শিক্ষামালা যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া, রাঁচী থেকে পাওয়া যায়। 'ক্রিয়াযোগ' ধ্যান সাধনা প্রচার ও অধ্যাত্ম জীবনযাপন প্রণালী শিক্ষাদানের জন্য পরমহংস যোগানন্দ এই সোসাইটি স্থাপন করেন।

† পরমহংস যোগানন্দজীও বহু উপলক্ষ্যে তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিষ্যদের বলেছেন যে ইহলোক পরিত্যাগ করে যাবার পরও তিনি সকল ক্রিয়াবানদের (ক্রিয়াযোগে দীক্ষিত সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ/যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার 'লেশন' ছাত্রগণ) আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে সতত দৃষ্টি রেখে চলবেন। তাঁর এই অপূর্ব সুন্দর প্রতিশ্রুতির সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর মহাসমাধির পর এস. আর. এফ./ওয়াই. এস. এস.-এর সদস্যদের লিখিত পত্র হতে — যাঁরা তাঁর সর্বব্যাপী নির্দেশনার বিষয় অবগত হতে পেরেছেন। *(প্রকাশকের মন্তব্য)*

তাদের জন্য যে শান্তি ও প্রাচুর্যের জগৎ অপেক্ষা করে আছে, তা প্রকাশ করার জন্য, মাত্র কয়েক ডজন নয়, শত সহস্র ক্রিয়াযোগীর প্রয়োজন হবে।

প্রতীচ্যে একটি সেল্ফ-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপ প্রতিষ্ঠান — একটি "আধ্যাত্মিক মধুর মধুচক্র" স্থাপনার ভার — আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীযুক্তেশ্বর গিরিজী ও আমার পরম পরমগুরুদেব বাবাজী মহারাজ আমার উপর অর্পণ করেন। এই পবিত্র কর্তব্যপালনে আমাকেও নানাবিধ বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

সান ডিয়েগো মন্দিরের অধ্যক্ষ ডাক্তার লয়েড কেনেল এক সন্ধ্যায় আমায় একটি প্রশ্ন করে বসলেন ঃ "আচ্ছা পরমহংসজী, ঠিক করে বলুন তো, সত্যিই কি এসব সার্থক হয়েছে?" তাঁর এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের ভাবে বুঝলাম যে তিনি জানতে চান, "আপনি কি আমেরিকায় এসে সুখী হয়েছেন? যোগ প্রচারে বাধা দিতে যারা সমুৎসুক, সেইসব ভ্রান্ত লোকেদের মিথ্যা প্রচারের বিষয়ে আপনার মত কি? এই যে হতাশা, অন্তর্দাহ, কেন্দ্রের অধ্যক্ষ — যাঁরা ঠিকমত পরিচালনা করতে পারেন না, ছাত্ররা — যাদের উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করতে পারা যায় না — তাদের কথা কি সব ভেবেছেন?"

বললাম, "ঈশ্বর যাকে পরীক্ষা করেন সেই তো ভাগ্যবান; আমার উপর পরীক্ষাভার চাপাতেই তো তিনি আমায় সর্বদা স্মরণ করছেন।" তখন মনে পড়লো সেইসব বিশ্বাসী মানুষজনের কথা, আর আমেরিকার অন্তরে যে ভালবাসা, ভক্তি, যাতে আমেরিকার হৃদয় উজ্জ্বল — তার সব কথা। ধীরে ধীরে দৃঢ়স্বরে আমি বলতে শুরু করলাম, কিন্তু আমার উত্তর এই — হ্যাঁ, হাজারবার আমি বলব, হ্যাঁ, এ সত্যিই সার্থক হয়েছে; পূর্ব আর পশ্চিমকে একমাত্র শাশ্বত আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে দেখা — এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।"

ভারতের ধর্ম মহাগুরুগণ, যাঁরা প্রতীচ্যের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তাঁরা আধুনিক অবস্থা খুব ভালভাবেই বোঝেন। তাঁরা জানেন যে যতদিন পর্যন্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রধান গুণগুলি সকল জাতির মধ্যে

উত্তমরূপে আয়ত্তীকৃত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আর পার্থিব অবস্থার কোন উন্নতির সম্ভাবনা নেই। দুই গোলার্ধের মধ্যে পরস্পরের সর্বোৎকৃষ্ট গুণগুলির অনুশীলন ও আদানপ্রদান একান্ত প্রয়োজন।

পৃথিবী পরিভ্রমণকালে আমি নানাস্থানে বহু দুঃখদুর্দশা সব দর্শন করে মর্মাহতই হয়েছি। প্রাচ্যের দুঃখক্লেশ মূলতঃ জড়বিষয়ে আবদ্ধ, আর প্রতীচ্য প্রধানতঃ আবদ্ধ মানসিক বা আধ্যাত্মিক ক্লেশে। পৃথিবীর সকল জাতি এখন ভারসাম্যহীন সভ্যতার ক্লেশকর পরিণাম উপলব্ধি করছে।* ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য প্রাচ্যদেশসমূহ আমেরিকার মত প্রতীচ্যজাতিগুলি পার্থিব ব্যাপারে ব্যবহারিক জ্ঞানার্জ্জন — ঐহিক কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টার অনুসরণ থেকে বহুলপরিমাণে উপকৃত হতে পারবে। আবার প্রতীচ্যবাসীদেরও জীবনের আধ্যাত্মিক বিষয়ে সুগভীর জ্ঞান থাকা দরকার, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ মানুষের সচেতন ঈশ্বরোপলব্ধিকল্পে প্রাচীনকালে যে সব বৈজ্ঞানিক প্রণালীর উদ্ভাবন করেছিল, সে বিষয়ে।

সর্বাঙ্গসুন্দর সভ্যতার চিন্তাভাবনা একেবারে অলীক কল্পনা নয়। সহস্র-সহস্র বৎসর ধরে ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও বিরাট পার্থিব ঐশ্বর্যের সমৃদ্ধভূমি ছিল। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাস, গত দুইশত বৎসরের দারিদ্র্য ও তার কর্মফলের একটি সাময়িক অবস্থা মাত্র। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে "ভারতের ঐশ্বর্য"† সম্বন্ধে একটা প্রবাদ পৃথিবীতে

---

* আমারে ঘেরিয়া গরজে সে বাণী ক্ষুব্ধ সিন্ধুসম ঃ

"তোমার ধরা কি এতই আশাহত,
চূর্ণ হয়েছে ধুলিকণামত?
হারিয়েছ আজ সবকিছু হায়, ছাড়ি' আশ্রয় মম।
যা কিছু তোমার নিয়েছিনু কেড়ে, শুধু এইটুকু তরে,
তোমা' ক্ষতি তরে নয়,
আবার সে সব খুঁজে নেবে তুমি, প্রসারিত মম করে।
যা' কিছু হারাবার ভয়,
সকলই তোমার শিশুর ভ্রান্তি; সবই আছে মোর ঘরে।
তোমা' তরে সব সঞ্চয় করি, রেখেছি ঘরের মাঝে,
ওঠ এবে তুমি, ধর মোর হাত, এস আজ মোর কাছে।"

— ফ্রান্সিস টম্পসনকৃত "দি হাউণ্ড অফ্ হেভেন।"

† ঐতিহাসিক বিবরণে প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী জাতি ছিল।

সুপ্রচলিত আছে। বিশ্ববিধান অথবা ঐহিক পুণ্য বা "ঋতে"র ভাবদ্যোতক হচ্ছে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক প্রাচুর্য। ঈশ্বরের প্রসাদ অথবা তাঁর লীলারূপিনী প্রাচুর্যসম্পন্না প্রকৃতিদেবীর নিকট কোন বিষয়ে কিছুরই কার্পণ্য নেই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক পশ্চিমী ঐতিহাসিক মতবাদ — আর্যজাতির আদিপুরুষেরা সব এশিয়ার অন্য কোন অঞ্চল অথবা ইউরোপ থেকে এসে ভারত "আক্রমণ" করেছিলেন — তা কি হিন্দুসাহিত্য, কি কিম্বদন্তী, কোন কিছুতেই সমর্থিত হয় না। পণ্ডিতগণ এই কাল্পনিক অভিযানের উৎস নির্ধারণে স্পষ্টতঃই ব্যর্থ। স্মরণাতীত কাল হতে ভারতবর্ষই যে হিন্দুদের আবাসভূমি তা বেদের মধ্যেকার বিষয়বস্তুতে প্রমাণিত হয়, আর তা ১৯২১ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত শ্রী অবিনাশ চন্দ্র দাস লিখিত 'Rig-Vedic India' নামক একটি অপূর্ব আর অতি সুখপাঠ্য মৌলিক গ্রন্থে অতি সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। অধ্যাপক দাস বলেন যে, ভারতবর্ষ হতে আগত অভিবাসীরা ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি করেছিলেন: তাতে আর্য কথাবার্তা এবং লোকগাথার বিস্তৃতি ঘটেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে — সংস্কৃতের সঙ্গে লিথুয়ানিয়ান ভাষার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। দার্শনিক কাণ্ট, যিনি সংস্কৃত ভাষার কিছুই জানতেন না, তিনিও লিথুয়ানিয়ান ভাষার বিজ্ঞানসম্মত গঠন দেখে চমৎকৃত হন। তিনি বলেছিলেন, "এর কাছে এমন একটি চাবি আছে যা, কেবলমাত্র শব্দতত্ত্ব নয়, ইতিহাসেরও বহু রহস্য উদ্‌ঘাটন করবে।"

বাইবেলে (২য় ক্রনিকেল ৯ ঃ ২১, ১০) উল্লেখ আছে যে, "টারশিশের জাহাজ সকল" রাজা সলোমনের জন্য ওফির (মুম্বাই উপকূলের সোপারা) হতে "স্বর্ণ ও রৌপ্য, গজদন্ত, বানর, এবং ময়ূর" আর "প্রচুর এলগাম (এলগাম — চন্দনকাঠ) বৃক্ষ এবং মহামূল্য রত্নসমূহ" এনেছিল। গ্রীকদূত মেগাস্থেনিস (খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) ভারতের বিরাট ঐশ্বর্যের বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্লিনি (১ম খ্রিস্টাব্দ) বলেন যে রোমানরা ভারতবর্ষ হতে বাৎসরিক পাঁচকোটি সেস্টার্সের (প্রায় ৫০ লক্ষ ডলার) পণ্যদ্রব্য আমদানী করত — আর সে সময়ে ভারতের একটা বিরাট নৌশক্তিও ছিল।

চৈনিক পরিব্রাজকেরা ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যগরিমামণ্ডিত সভ্যতা, এর ব্যাপক শিক্ষাদান ব্যবস্থা আর অপূর্ব রাজ্যশাসনপ্রণালী প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে গেছেন। চীনা পুরোহিত ফা-হিয়েন (পঞ্চম শতাব্দী) বলেন যে, ভারতের জনগণ সুখী, সৎ ও ঐশ্বর্যশালী ছিল। লণ্ডন হতে ট্রাবনার কর্তৃক প্রকাশিত স্যামুয়েল বীল লিখিত 'Buddhist Records of the Western World' (চীনাদের নিকট ভারতবর্ষই ছিল 'পাশ্চাত্য জগৎ'!), আর রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত টমাস ওয়াটার্সের On Yuan Chwang's Travels in India A. D. 629—45 দ্রষ্টব্য।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে কলম্বাস নূতন বিশ্ব আবিষ্কার করবার সময় প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে যাবার সংক্ষিপ্ত বাণিজ্যপথের অনুসন্ধানে বেরিয়েছিলেন। বহু শতাব্দী ধরেই ইউরোপ ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত পণ্যদ্রব্যগুলি সংগ্রহে চেষ্টিত ছিল, যথা — রেশম, সূক্ষ্মবস্ত্র (এত সূক্ষ্ম যে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে 'পবন বয়ন', 'অদৃশ্য কুহেলী' প্রভৃতি) ছাপা ছিট, কিংখাব, চিকণের কাজ, রাগ, ছুরি, কাঁচি, অস্ত্রশস্ত্র, হাতির দাঁত এবং হাতির দাঁতের কাজ, সুগন্ধি, ধূপ, চন্দনকাঠ, মৃৎপাত্র, ভেষজ, প্রলেপ, নীল, চাউল, মশলা, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, চুণী, পান্না ও হীরা প্রভৃতি।

পর্তুগীজ ও ইতালীয় বণিকেরা বিজয়নগর রাজ্যের (১৩৩৬-১৫৬৫ খ্রিঃ অঃ) সর্বত্র বিশাল ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির পরিচয় দেখে তাদের বিপুল বিস্ময় লিপিবদ্ধ করে গেছে। এর রাজধানীর গৌরব বর্ণনাকালে আরব দূত আবদুর রজ্জাক বলেন যে, "তা এমন বিরাট যে পৃথিবীতে তার সমকক্ষ কোন যে জায়গা আছে, তা চোখেও দেখা যায়নি আর কানেও শোনা যায় নি।"

হিন্দুশাস্ত্র এই শিক্ষা দেয় যে মানব এই পৃথিবীতে আকৃষ্ট হয়ে আসে তার পরম্পরাগত প্রতিটি জীবনে সকল পার্থিব অবস্থার মধ্যে যে ভগবানের অনন্তলীলার প্রকাশ, সে বিষয়ে পূর্ণশিক্ষা লাভ করতে। পূর্ব ও পশ্চিম উভয়েই এই মহাসত্য বিভিন্ন উপায়ে শিক্ষালাভ করছে, আর তাদের এইসব আবিষ্কার সানন্দেই পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে নেওয়া

ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, ষোড়শ শতাব্দীতে ভারত প্রথম সম্পূর্ণভাবে অহিন্দুরাজের অধীনে আসে; ১৫২৪ খ্রিঃ অব্দে তুর্কি সুলতান বাবর ভারত আক্রমণ করে মুসলমান রাজবংশের পত্তন করেন। এই প্রাচীন ভূমিকে বাসভূমি করেও কিন্তু নূতন সম্রাটেরা এর ঐশ্বর্যসম্ভার নিঃশেষিত করেন নি! অতঃপর আভ্যন্তরীণ বিবাদবিসম্বাদে দুর্বল, ঐশ্বর্যশালী ভারতবর্ষ সপ্তদশ শতাব্দীতে কয়েকটি ইউরোপীয় জাতির কুক্ষিগত হয়; ইংলণ্ডই সবশেষে শাসকশক্তিরূপে পরিণত হয়। পরিশেষে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা লাভ করে!

বহু ভারতবাসীর মত, আমারও একটি 'এতদিনধরে না বলা' কাহিনী আছে। কোন এক যুবকদল যাদের সঙ্গে কলেজে আমার পরিচয়, তারা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় একদিন আমার কাছে এসে একটি বিদ্রোহী আন্দোলন পরিচালনা করবার জন্যে খুবই পীড়াপীড়ি করে। আমি তাদের এই বলে অসম্মতি জানাই যে "ইংরেজ ভ্রাতাদের হত্যা করে ভারতের কোন মঙ্গল হবে না, তার মুক্তি আসবে গোলাগুলির দ্বারা নয়, আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে।" আমি তারপর তাদের এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, অস্ত্রশস্ত্রে বোঝাই জার্মান জাহাজ যার উপর তারা একান্ত নির্ভর করছিল, তা বাংলাদেশের ডায়মণ্ড হারবারের কাছে ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়ে যাবে। যুবকদল কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত না করে তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হতে গিয়ে শেষে দেখে যে আমার পূর্বকথিত আশঙ্কানুযায়ী তাদের সকল চেষ্টাই বিফল হল। আমার বন্ধুগণ কয়েকবছর বাদে কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে। হিংসার পথ পরিত্যাগ করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ তখন মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে। পরিশেষে অবশ্য তারা দেখতে পায় যে ভারতের "যুদ্ধ" জয় শান্তিপূর্ণ উপায়েই সম্ভবপর হয়েছে।

এই দেশকে ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত হওয়ার মর্মন্তুদ ঘটনা, আর দেশের কোন কোন অঞ্চলে সাময়িক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক — ধর্মোন্মাদনাপ্রসূত নয়, (একটা গৌণকারণ — যেটাকে প্রায়ই মুখ্যকারণ বলে প্রদর্শিত হয়)। অগণিত হিন্দু মুসলমান, অতীতে যেমন বর্তমানেও তেমনি, পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবের সঙ্গেই পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে। উভয়মতাবলম্বী বহুসংখ্যক লোকেরাই "মতহীন" সন্ত কবীরের (১৪৫০-১৫১৮ খ্রিঃ অঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল এবং আজ পর্যন্তও তাঁর অনুগামী লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা 'কবীরপন্থী' নামে পরিচিত। মুসলমান রাজত্বে আকবর বাদশাহের সময় ভারতের সর্বত্র লোকেদের নিজ নিজ ধর্মমতের অনুশীলনে যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। আজও ভারতের সরল নরনারীদের শতকরা ৯৫ জনের মধ্যে কোন গুরুতর ধর্মগত বিরোধ নেই। প্রকৃত ভারত, যে ভারত মহাত্মা গান্ধীর মত লোককে বোঝে, তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করে চলে তা, ভারতের কর্মচঞ্চল সুবৃহৎ নগরগুলিতে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তা পাওয়া যাবে "ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়" ভারতের সাতলক্ষ গ্রামগুলিতে, যেখানে স্মরণাতীত কাল থেকে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসনের সহজ ও যথার্থ বৈশিষ্ট্য চলে আসছে। নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের বর্তমান সমস্যাসমূহের নিশ্চিত সমাধান এক সময়ে সেইসব মহাপুরুষদের দ্বারা সাধিত হবে, ভারতের বুকে যাঁদের আবির্ভাবের অভাব কখনও ঘটে নি।

উচিত। তাঁর ইহজগতের সন্তানদের দারিদ্র্য, রোগ, অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত এক আদর্শ সভ্যতা পৃথিবীতে বিস্তারের জন্য যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে তা দেখে নিশ্চয়ই খুশি হবেন এ কথা বলাই বাহুল্য। মানুষের তার দৈব সম্পদের বিষয়ে বিস্মরণ (যা তার স্বাধীন ইচ্ছার* অপব্যবহারজনিত ফল) — তা হচ্ছে তার সকল রকম দুঃখদুর্দশার মূল কারণ।

"সমাজ" নামে মানবরূপী ভগবানের বিমূর্ত কল্পনাতে আরোপিত যে সব কুফল তা বস্তুতঃ প্রত্যেক মানুষের প্রতিই আরোপিত হতে পারে।† রামরাজ্যের কল্পনা নাগরিক গুণাবলীর মধ্যে পুষ্পিত হয়ে ওঠবার আগে তা ব্যক্তিবিশেষের অন্তরে উদয় হওয়া প্রয়োজন; অন্তরের শুদ্ধির দ্বারাই স্বাভাবিকভাবে বাইরের সংস্কারসাধন হয়। যে মানুষ নিজেকে সংশোধন করতে পেরেছে, সে হাজার হাজার লোকের সংশোধন করতে পারবে।

কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পৃথিবীর সকল ধর্মশাস্ত্রই মূলতঃ এক, যা মানবকে তার ঊর্ধ্বগতির পথে অগ্রসর হবার প্রেরণা যোগায়। আমার জীবনের একটি সুখময় সময় অতিবাহিত হয়েছে সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন

---

* কার্যতে স্বাধীন মোরা,
কারণ মোদের স্বাধীন প্রেম —
ভালবাসা বা না বাসা, শুধু ইচ্ছামাত্র হয়।
ইহাতেই আমাদের জয় পরাজয়।
কাহারও পতন ঘটে অবাধ্যতা তরে,
স্বর্গ হতে গভীর নরকে।
হায়রে, পতন ঘটে কি আনন্দের
উচ্চাসন হতে কি গভীর বিষাদে।"

— মিলটন, "প্যারাডাইস লস্ট"।

† ঈশ্বরের দিব্যলীলার পরিকল্পনা — যাতে করে প্রাতিভাসিক জগৎসমূহের আবির্ভাব, তা হচ্ছে স্রষ্টা আর সৃষ্ট জীবের মধ্যে অন্যোন্যাশ্রয়ী ভাব। মানুষ ভগবানকে একমাত্র যা দান করতে পারে, তা হচ্ছে প্রেম; এটাই তাঁর উচ্ছলিত করুণাধারা আকর্ষণ করবার পক্ষে যথেষ্ট। "তোমরা, এমন কি এই সমস্ত জাতি, আমাকে লুণ্ঠন করেছ। তোমাদের প্রাপ্য ফসলের দশমাংশ সমস্তই ভাণ্ডারে আনো যাতে করে আমার গৃহে খাদ্য থাকে; তারপর বাহিনীদের প্রভু বললেন, এখনই এই দিয়ে আমায় পরীক্ষা কর যে আমি তোমাদের কাছে স্বর্গের বাতায়ন উন্মুক্ত করি কি না, আর তোমাদের প্রতি অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষণ করি কি না, যা ধারণ করবার মত স্থান থাকবে না।" — মালাকি ৩ ঃ ৯-১০ (বাইবেল)।

ম্যাগাজিনের’ জন্য বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্টের কতকাংশের ব্যাখ্যার শ্রুতলিখন দেবার সময়। খ্রিস্টের নিকট আমি সকাতরে প্রার্থনা করেছিলাম এই বলে যে, তাঁর বাণীর প্রকৃত অর্থ উদঘাটন করতে তিনি যেন আমায় পথপ্রদর্শন করেন — যে সব বাক্যের অধিকাংশেরই অর্থ আজ এই দু’হাজার বৎসর ধরেই মারাত্মক রকমের ভ্রমপূর্ণ রয়েছে।

এন্সিনিটাস্ আশ্রমে একরাত্রে আমি নীরব ধ্যানে বসে আছি, হঠাৎ আমার বসবার ঘরটি এক অপূর্ব স্বচ্ছ নীল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। নয়নসম্মুখে প্রতিভাত হল প্রভু যীশুখ্রিস্টের জ্যোতির্ময় মূর্তি। যুবা আকৃতি, বয়স অনুমান পঁচিশ, স্বল্প শ্মশ্রুগুম্ফশোভিত মুখমণ্ডল; তাঁর সুদীর্ঘ কৃষ্ণকেশপাশ মধ্যস্থলে দ্বিধাবিভক্ত, উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণের ছটায় শোভিত।

অসীম রহস্যময় অতল গভীর তাঁর দু’টি চোখ, তার দিকে চেয়েই রইলাম — চোখের ভাব অনন্ত, ও নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাদের প্রত্যেক দিব্যভাবের পরিবর্তনের অভিব্যক্তির সঙ্গে যে জ্ঞান প্রকাশ পাচ্ছিল, স্বজ্ঞাবলে তা অনুভব করলাম। তাঁর মহিমাদীপ্ত নয়নযুগলে সেই শক্তি, যা লক্ষকোটি জগৎ ধারণ করে রয়েছে। তাঁর মুখে দেখা গেল সেই পবিত্র পানপাত্র (হোলি গ্রেল) — তা আমার ওষ্ঠপ্রান্ত স্পর্শ করে আবার খ্রিস্টের নিকট ফিরে গেল। কয়েকমুহূর্ত পরে তিনি আমায় মধুর স্বরে কতকগুলি কথা বললেন, কিন্তু সেগুলি এতই ব্যক্তিগত যে, সে’সব প্রকাশে বিরত হয়ে নিজ অন্তরেই তাকে নিবদ্ধ রাখলাম।

১৯৫০-৫১ সালে ক্যালিফোর্ণিয়ার মোজাভে মরুভূমির এক নিভৃতাবাসে অবস্থানকালে আমি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিশদ টীকাটিপ্পনীসহ অনুবাদ রচনা করি। এতে যোগের নানা পথের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

যোগপ্রণালী সম্বন্ধে দুইবার* বিশেষভাবে উল্লেখ করে, (গীতায় যার একবারমাত্র উল্লেখ আছে আর সেই একই প্রণালী, যাকে বাবাজী মহারাজ দু’টি সরল শব্দে নামকরণ করেছেন — ক্রিয়াযোগ) ভারতের সর্বপ্রধান ধর্মশাস্ত্র কার্যকরী এবং নৈতিক শিক্ষা প্রদান করেছে। আমাদের

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪র্থ অধ্যায় ২৯ শ্লোক এবং পঞ্চম অধ্যায় ২৭-২৮ শ্লোক।

স্বপ্নজগতের মহাসাগরে শ্বাসপ্রশ্বাসই হচ্ছে মায়ার বাত্যাবিশেষ, যা ব্যষ্টিগত চৈতন্য তরঙ্গের উৎপাদন করে। যথা — মানুষের আকৃতি ও অন্যান্য সব জড়পদার্থসমূহ। মানুষকে তার বিচ্ছিন্ন অবস্থানের বেদনাময় স্বপ্ন থেকে জাগ্রত করার পক্ষে মাত্র দার্শনিক আর নৈতিক জ্ঞানই যে যথেষ্ট নয়, সেকথা বুঝে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই পুণ্যজ্ঞানকেই নির্দ্দিষ্ট করেছেন যার দ্বারা যোগী তাঁর শরীরের উপর ক্ষমতা বিস্তার করে ইচ্ছামত তাকে বিশুদ্ধশক্তিতে পরিণত করতে পারেন। আণবিক যুগের পথিকৃৎ আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কাছে এই প্রকার যোগসাধন অন্ততঃ কোন বিষয়গত তাত্ত্বিক উপলব্ধির অতীত নয়। একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সমস্ত জড়বস্তুকেই শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

হিন্দুশাস্ত্রগুলিতে যে যোগবিদ্যার প্রশংসা করা হয়েছে, তার কারণ হলো এটি সর্বসাধারণের দ্বারা সাধনযোগ্য। অবশ্য একথা সত্য যে শ্বাস-প্রশ্বাস রহস্য কখনও কখনও আনুষ্ঠানিক যোগপ্রক্রিয়া ছাড়াই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে — যেমন কতকগুলি অহিন্দু মরমিয়াদের ক্ষেত্রে, যাঁরা ঈশ্বরের প্রতি অচলা ভক্তির বলে অলৌকিক শক্তিসমূহের অধিকারী ছিলেন। এরূপ খ্রিস্টান, মুসলমান এবং অন্যান্য সাধুসন্তদেরও প্রকৃত শ্বাসপ্রশ্বাসবিহীন এবং নিশ্চল অবস্থায় দেখা গিয়েছে (সবিকল্প সমাধি),* যার অভাবে কোন মানুষই ঈশ্বরানুভূতির প্রথম অবস্থায় পৌঁছতে পারে না। (কোন মহাত্মার 'নির্বিকল্প' অর্থাৎ সর্বোচ্চ সমাধি অবস্থায় পৌঁছবার পর তাঁর ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয় আর সে স্থান হতে কখনও তিনি চ্যুত হন না — তা তিনি বিগতশ্বাস বা শ্বাসপ্রশ্বাসসম্পন্ন অথবা সক্রিয় কিম্বা নিশ্চল — যাই-ই হোন না কেন।)

সপ্তদশ শতাব্দীর খ্রিস্টীয় ভাববাদী সাধু ব্রাদার লরেন্স বলেন যে, তাঁর ঈশ্বরানুভূতির প্রথম আভাস আসে একটি বৃক্ষদর্শন থেকে। প্রায় সকল মানুষই তো বৃক্ষ দর্শন করে থাকে; কিন্তু হায় অতি অল্পলোকেই সেই বৃক্ষদর্শন থেকে বৃক্ষের স্রষ্টার দর্শন লাভ করতে পারে। কি প্রাচ্য কি

---

* ২৬ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। খ্রিস্টিয়ান মরমিয়া সাধুদের মধ্যে যাঁদের সবিকল্প সমাধির অবস্থায় দেখা গেছে তাঁদের মধ্যে আভিলার সেন্ট থেরেসার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁর শরীর এত দৃঢ়ভাবে নিশ্চল হয়ে যেত যে, তাঁর কনভেন্টের বিস্ময়স্তম্ভিত সন্ন্যাসিনীগণ তাঁর অবস্থার পরিবর্তন বা তাঁর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে একেবারেই অসমর্থ হতেন।

প্রতীচী, সর্বত্র এমন কিছু 'একান্তী' সাধকের দেখা যায়, যারা সহজেই সেইসব ভক্তির অদম্য শক্তির অধিকারী ছিলেন, যাকে আহ্বান করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। তবুও সাধারণ লোক* সে' জন্য ভগবৎসঙ্গলাভের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হয় না। আত্মচিন্তার জন্য তার ক্রিয়াযোগের প্রণালীর নৈতিক উপদেশসমূহ দৈনিক পালন আর ভগবানকে প্রাণ খুলে ডাকা "প্রভু, তোমার অদর্শন আর সহ্য করতে পারছি না, দেখা দাও প্রভু, দেখা দাও!" এছাড়া কিছুই আর তার প্রয়োজন হয় না।

এইভাবে ভক্তির প্রাবল্য, যা সাধারণ মানুষের ভাবানুভূতির আয়ত্বের বাইরে, তা অপেক্ষা দৈনিক সাধনযোগ্য বৈজ্ঞানিকপ্রণালী অবলম্বনে ভগবৎ সান্নিধ্যলাভ করবার জন্য চেষ্টায় যোগের এক সার্বজনীন আবেদন আছে।

ভারতের বিভিন্ন জৈন ধর্মগুরুগণ, যাঁদের "তীর্থঙ্কর" বলে অভিহিত করা হয়, তাঁরা সেই পথের সন্ধান দিয়েছেন যে পথ অবলম্বন করে পথভ্রান্ত মানবজাতি ঘোর বাত্যাবিক্ষুব্ধ সংসারসমুদ্র (অর্থাৎ কর্মচক্র — জন্মমৃত্যুর পুনরাবর্তন) অতিক্রম করে তীরে পৌঁছতে পারে। সংসার (সম্যকরূপে চলে যে — মায়া প্রভাবে) মানুষকে সবচেয়ে কম প্রতিবন্ধকতার পথ অবলম্বন করতেই প্ররোচিত করে। "তা হলে যে কেউই জগতের বন্ধু হবে, সেই-ই হবে ভগবানের শত্রু।"† ভগবানের সখ্যলাভ করতে গেলে মানুষকে তার নিজ কর্মফল, যা তাকে পৃথিবীর মায়ামোহের হস্তে নিরুপায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে, তার কুফলতাকে অবশ্যই জয় করতে হবে। কর্মফলের কঠিনবিধির বিষয়ে জ্ঞান প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে তাদের বন্ধন হতে চরম মুক্তিলাভের উপায় বার করতে উৎসাহিত করে। মানুষ যে কর্মফলের দাসত্ব করে, তার মূল হচ্ছে অবিদ্যাজাত মনের কামনাবাসনা; তাই যোগী মনঃসংযমের

---

* "সাধারণ মানুষকে কোন একসময় কোন এক জায়গা থেকে আধ্যাত্মিক পথে যাত্রা শুরু করতে হবে। লাও-ৎসু বলেছেন, 'হাজার মাইলের ভ্রমণ শুরু হয় একটি মাত্র পদবিক্ষেপে।'" বুদ্ধদেবও বলেছেন, "পরম মঙ্গলের বিষয় কেউ যেন তুচ্ছভাবে মনে মনে এই বলে চিন্তা না করে যে, 'এ তার আমার কাছে আসবে না।' বিন্দু বিন্দু বারিপাতে জলপাত্র পূর্ণ হয়; অতি অল্প অল্প করে সঞ্চয় করলেও জ্ঞানী ব্যক্তি পরিশেষে পূর্ণ মঙ্গল লাভ করেন।"

† জেমস, ৪ : ৪ (বাইবেল)।

সাধনা করে থাকেন।* কর্মজ অবিদ্যার নানা আবরণ যখন অপসারিত হয়, তখন মানুষ নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে।

জীবনমৃত্যু রহস্যের সমাধান জানার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের এই পৃথিবীতে আগমন, এবং তা শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। শ্বাসহীনতা মানেই মৃত্যুহীনতা। এই সত্য উপলব্ধি করে প্রাচীন ভারতের যোগীঋষিগণ একমাত্র শ্বাসপ্রশ্বাসের সূত্র অবলম্বনে বিগতশ্বাস হবার এক সঠিক এবং যুক্তিসিদ্ধ বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেন।

জগতে ভারতের যদি আর কোন দানই না থাকত, তা হলে এই "ক্রিয়াযোগ"ই তার রাজোচিত দান বলে বিবেচিত হত।

বাইবেলে এমন কতকগুলি পঙ্‌ক্তি আছে যাতে বোঝা যায়, ঈশ্বর যে শ্বাসপ্রশ্বাসকেই দেহ ও আত্মার মধ্যে সূক্ষ্মসংযোগসূত্র বলে তৈরী করেছেন — সে সম্বন্ধে ইহুদী ধর্মোপদেষ্টাগণ অবহিত ছিলেন। বাইবেলের জেনেসিসে আছে, "প্রভু পরমেশ্বর মানুষকে ভূমির মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করলেন, আর তার নাসারন্ধ্রে প্রাণবায়ু প্রদান করলেন, আর মানুষ একটি

---

* নির্বাত স্থানের দীপ টলে না যেমন,
সংযমী যোগীর চিত্তে স্থিরতা তেমন।
অভ্যাসে যখন চিত্তে স্থিরতা উদয়,
আত্ম-দরশনে মন তুষ্ট অতিশয়,
জ্ঞানগম্য চিদানন্দ উদয় যখন,
বাক্যাতীত অতীন্দ্রিয় সুখে মগ্ন মন,
আত্ম-দরশনে চিত্ত অবিচল থাকে,
অপূর্ব অবস্থা সেই যোগ বলে তাকে।
মধুময় যে অবস্থা লাভে ধনঞ্জয়,
জগতের সব লাভ তুচ্ছ বোধ হয়,
মহাদুঃখে দুঃখ বোধ নাহি থাকে আর,
অপূর্ব অবস্থা সেই যোগ নাম তার।
কষ্টসাধ্য বলি' যেন অযত্ন না হয়,
কাতরতাশূন্য চিত্ত করি' ধনঞ্জয়,
যোগের ব্যাঘাতকারী কামনা ছাড়িয়া,
ইন্দ্রিয় সংযত করি' মনোবল দিয়া,
গুরু-উপদেশে বুদ্ধি করিয়া নিশ্চয়,
করিবে সে যোগাভ্যাস পাণ্ডুর তনয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৬ঃ ১৯-২৩ *(সুধাকরকৃত অনুবাদ)*

জীবন্ত প্রাণীতে পরিণত হল।"* মানবশরীর রাসায়ণিক আর ধাতব উপাদানে গঠিত, যা "ভূমিতলের মৃত্তিকা"তেও পাওয়া যায়। মানবদেহের এই জড়মাংস, কোন ক্রিয়াশীলতা অথবা শক্তি ও গতি প্রকাশ করতে পারতো না, যদি না আত্মা কর্তৃক দেহের মধ্যে — অজ্ঞানী লোকেদের কাছে শ্বাসপ্রশ্বাসের (বায়ব্যশক্তির) মাধ্যমে — প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হচ্ছে বলে বোধ হত। মানবশরীরের ক্রিয়াশীল পঞ্চপ্রাণ, বা সূক্ষ্ম প্রাণশক্তি হচ্ছে সর্বব্যাপী পরমাত্মার প্রণবঝঙ্কারের বহিঃপ্রকাশ।

আত্মকারণ হতে উদ্ভূত প্রাণের যে আলোক বা তার প্রতিফলন প্রতি কোষকে আলোকিত করছে, তার আপাত সত্যতাই মানবের দেহাসক্তির একমাত্র কারণ। অবশ্য একথাও ঠিক যে সে এই একটা মৃত্তিকাপিণ্ডরূপ মানবদেহের প্রতি কখনও প্রবল শ্রদ্ধা পোষণ করবে না। মানুষ জড়দেহের সঙ্গে তার একাত্মবোধ অকারণে অনুভব করে, কারণ আত্মা হতে প্রাণস্রোত অস্থিমাংসের দেহে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে এত প্রবলবেগে প্রবাহিত হয় যে, মানুষ কার্যটাকেই কারণ বলে ভুল করে — দেহের নিজেরই প্রাণ আছে কল্পনা করে দেহটাকেই পূজো করে।

মানুষের চৈতন্যাবস্থা হচ্ছে তার দেহ আর শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাপারে সচেতনতা। নিদ্রাবস্থায় ক্রিয়াশীল মগ্নচৈতন্য, তার মানসিক এবং শরীর ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সাময়িক বিচ্ছেদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। তার তূরীয়াবস্থা হচ্ছে — শরীর আর শ্বাসপ্রশ্বাসের উপর যে মানুষের "অস্তিত্ব" নির্ভর করে — সেই ভ্রান্তি থেকে মুক্তি![†] ঈশ্বর তো শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাতিরেকেই

---

* জেনেসিস [illegible] (বাইবেল)।

† "এ পৃথিবী তোমার সম্যক উপভোগ করা কখনই ঘটবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার শিরা-উপশিরার মধ্যে সাগরের বিশালতা প্রবাহিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি দিব্যভূষণে সজ্জিত হয়ে শিরে নক্ষত্রের মুকুট ধারণ করে উপলব্ধি কর যে, এই নিখিল জগতের তুমিই হচ্ছ একমাত্র উত্তরাধিকারী বা তার চেয়েও বেশি, কারণ এখানে এমন লোকেরা সব আছে যারা প্রত্যেকেই তোমারই মত একমাত্র উত্তরাধিকারী; যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি রাজার রাজদণ্ড ধারণ অথবা কৃপণের ধনসঞ্চয়ের আনন্দের মত ভগবানের গুণগানে আনন্দ লাভ কর, ... যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তোমার অভ্যস্ত চলাফেরা, আহার বিহারের মত, ভগবানের সকল যুগের লীলার সঙ্গে পরিচিত হও; যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি সেই রহস্যময় শূন্যতা, যা থেকে এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল তার গভীর পরিচিতি লাভ কর।" টমাস ট্র্যাহার্ণ — "সেঞ্চুরীস্ অফ্ মেডিটেশন্স।"

রয়েছেন; তাঁর প্রতিরূপে নির্মিত জীবাত্মা একমাত্র বিগতশ্বাস হলে পর তবেই নিজস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে।

বিবর্তনপ্রসূত কর্মের দ্বারা আত্মা ও দেহের মধ্যেকার শ্বাসগ্রন্থি যখন ছিন্ন হয়, তখন "মৃত্যু" নামে অভিহিত হঠাৎ অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে; জড়কোষগুলি তাদের স্বাভাবিক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফিরে যায়। ক্রিয়াযোগীর পক্ষে কিন্তু শ্বাসগ্রন্থিচ্ছেদ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা ইচ্ছাবলেই সংসাধিত হয়, সেখানে কর্মফলের জোরকরে অনধিকার প্রবেশের কোন প্রয়োজন থাকে না। প্রত্যক্ষ অনুভূতিবলে যোগী তাঁর অশরীরী মূল অবস্থার কথা ইতিমধ্যে জ্ঞাত হন, আর মৃত্যুর কতকটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত যে মানুষের জড়শরীরের উপর নির্ভর করা নিরতিশয় ভ্রম — সে বিষয়ে তার আর কোন বোধের প্রয়োজন হয় না!

জন্মজন্মধরে প্রত্যেক মানুষই (তার নিজ গতিবলে, তা সে যতই অস্থির হোক না কেন) নিজেকে দেবত্বে উন্নীত করবার পথে অগ্রসর হচ্ছে। মৃত্যু এই অগ্রগতির পথে বাধাস্বরূপ না হয়ে কেবলমাত্র সূক্ষ্মজগতে অধিকতর উপযুক্ত অবস্থাপ্রাপ্তির সুযোগদান করে, যেখানে থেকে সে তার যাবতীয় মালিন্যমুক্ত হয়ে শুচিশুভ্র হয়। "তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয় ... আমার পিতার বাটীতে বহু বাসস্থান আছে।"* ভগবান এই বিশ্বরচনাতে তাঁর সবকিছু উদ্ভাবনী দক্ষতা শেষ করে ফেলেছেন, অথবা পরলোকে এক বীণাবাদন ছাড়া আর বেশি কিছু আগ্রহোদ্দীপক আমাদের জন্যে রাখেন নি — এ বাস্তবিকই অসম্ভব।

মৃত্যু অস্তিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপ অথবা জীবন থেকে চরম মুক্তি নয়; কিন্তু মৃত্যু অমরত্বের প্রবেশপথও নয়। যে পার্থিব সুখের মধ্যে থেকে আত্মাকে পরিত্যাগ করে তাকে ভুলে যায়, সে পরলোকের সূক্ষ্মসৌন্দর্যের মধ্যেও তাকে আর পুনরাবিষ্কার করতে পারবে না। সেখানে সে কেবলমাত্র সূক্ষ্মতর অনুভব আর 'শিবম্ সুন্দরম্' যা মূলতঃ এক, তার সূক্ষ্মতর প্রতিবেদনমাত্র সঞ্চয় করে। পৃথিবীর এই স্থূলভূমির নেহাইয়ের উপরেই সংগ্রামী মানবকে তার আধ্যাত্মিক স্বরূপের অক্ষয় স্বর্ণকে আঘাতের পর

* জন — ১৪ ঃ ১-২ (বাইবেল)।

আঘাত দিয়ে তৈরী করে নিতে হবে। সর্বগ্রাসী মৃত্যুর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য, কষ্টার্জিত সেই স্বর্ণপিণ্ড তার হাতে দান করে মানব পরিণামে জড়দেহের পুনর্জন্ম গ্রহণের হাত থেকে চরম মুক্তিলাভ করে।

কয়েক বছরধরে আমি এন্সিনিটাসে ও লস্‌-অ্যাঞ্জেলেসে পতঞ্জলির 'যোগসূত্র' এবং অন্যান্য গভীর তত্ত্বমূলক হিন্দু দর্শনের ক্লাস পরিচালনা করেছিলাম।

একদিন সন্ধ্যাকালে ক্লাসের একটি ছাত্র প্রশ্ন করলো, "ঈশ্বর, দেহ ও আত্মার সংযোগসাধন করলেন কেন? সৃষ্টির এই বিবর্তনশীল বিশ্বনাট্যে প্রাথমিক গতিসংযোগ করার মধ্যেই বা তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল?" এরূপ ধরণের প্রশ্ন অসংখ্য লোকেই করেছে; দার্শনিকেরা কিন্তু বৃথাই তাদের পূর্ণ উত্তরদানের চেষ্টা করেছেন।

শ্রীযুক্তেশ্বরজী হেসে বলতেন, "ওরকম গোটাকতক রহস্যের সমাধান 'মহাকালের' জন্যেই থাক। মানুষের সসীম যুক্তিবল কি সেই 'অবাঙ্‌মনসগোচর' অজ, স্বয়ম্ভু, পরম সত্তার দুরধিগম্য অভিপ্রায় বুঝতে পারে?* মানুষের যুক্তি যা এই জড়জগতে কার্যকারণবিধির কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ, তা অনাদি, কারণাতীত ঈশ্বরের রহস্যের কাছে একেবারেই নিষ্ফল হয়ে যায়। তথাপি, যদিও মানবমনের যুক্তি সৃষ্টিরহস্য ভেদ

* প্রভু বলেছেন, — "কারণ আমার চিন্তাসকল তোমাদের চিন্তা নয়, তোমাদের পথও আমার পথ নয়। স্বর্গ যেমন পৃথিবীর চেয়েও উঁচু, তেমনই আমার পথ তোমাদের পথের চেয়ে, আমার চিন্তা তোমাদের চিন্তার চেয়েও উঁচু।" — ঈশাইয়া ৫৫ ঃ ৮-৯ (বাইবেল)।

দান্তে "দি ডিভাইন কমিডি"তে বর্ণনা করেছেন —

"তাঁহারি আলোকে সুদীপ্ত সেই স্বর্গভূমির মাঝে
গিয়েছিনু, আর দেখেছিনু আমি যে সব ব্যাপার সেথা,
সেথা হতে যেবা ফিরে আসে, তার কোন কৌশলজ্ঞান
নাহিক কিছুই কহিতে সে বারতা;
কারণ তাহার লক্ষ্যভূমিতে হলে ক্রমে আগুয়ান
বুদ্ধি মোদের অভিভূত হয় এতই গভীরভাবে, —
ফিরিতে পারে না সে আর — একদা যে পথ ধরে
চলেছিল, পুনরায় সেই পথে।
মনের গহনে সঞ্চিত আছে মোর যাহা স্মৃতিবলে,
সেই হবে মোর বিষয়বস্তু, পুণ্যদেশের কথা;
কণ্ঠেতে মোর ধ্বনিবে সদাই, এ গান না শেষ হলে।"

করতে অক্ষম, তবুও ভক্তের কাছে ভগবান স্বয়ং সকল রহস্যেরই একদিন সমাধান করে দেন।"

যাঁর জ্ঞানলাভের জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা আছে, তিনি জীবনের "আইনস্টাইন থিয়োরী"র নির্ভুল গাণিতিক রেখাচিত্র আগে হতেই দাবী না করে, সেই দিব্য আদর্শের কতকগুলি সরল নীতির অ, আ, ক, খ শিক্ষা করে তাঁর ঈশ্বরানুসন্ধানে উদ্যোগী হন।

"কোন মানুষ কোন সময়েই ঈশ্বরের দর্শন পায় নি (মায়ার আপেক্ষিকতা,* 'কালে'র অধীন কোন মানবই অসীমকে উপলব্ধি করতে পারে না); 'একমাত্র তাঁর জাত পুত্র যিনি পিতার বক্ষে আশ্রয় পেয়েছেন' (প্রতিফলিত কূটস্থচৈতন্য অথবা বহিঃপ্রক্ষেপিত শুদ্ধজ্ঞান, যা প্রণবঝঙ্কারের মধ্য দিয়ে সকল সৃষ্টির ব্যাপারকে পরিচালিত করে, তা 'বক্ষঃ' অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ পরমাত্মার গভীর অন্তঃস্থল থেকে একের মধ্যে বহুর বৈচিত্র্যপ্রকাশের জন্য উৎপন্ন হয়েছে), তিনি তাকে ঘোষণা (রূপায়িত অথবা প্রকাশিত) করেছেন।"†

যীশু ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "সত্য সত্যই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পুত্র নিজ হতে কোন কিছুই করিতে পারেন না, কেবল পিতাকে যা করিতে দেখেন, তাই-ই করেন; কারণ যা কিছু তিনি করেন, সে সকলই পুত্রও তদ্রূপভাবে করেন।"‡

ঈশ্বরের ত্রিবিধা প্রকৃতি, যার মাধ্যমে তিনি নিজেকে বাহ্যজগতে প্রকাশিত করেন, তা হিন্দুশাস্ত্রে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের প্রতীক ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে বর্ণিত হয়েছে। সারা সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্য দিয়ে তাঁদের এই ত্রিবিধা প্রকৃতির কার্যস্রোত নিরন্তর প্রবাহিত। নির্গুণ পরব্রহ্ম যেহেতু

---

* পৃথিবীর আহ্নিকগতিতে আলো থেকে অন্ধকার আর অন্ধকার থেকে আলো হচ্ছে মানুষের কাছে সৃষ্টির মায়াধীনতা বা বিপরীতাবস্থার নিত্যস্মারক। (তাই প্রদোষ ও সন্ধ্যা — দিবসের এই পরিবর্তন অথবা সমগুণী কালসমূহ, ধ্যানের পক্ষে অতি প্রশস্ত বলেই বিবেচিত হয়।) মায়ার দ্বৈতগুণের অবগুণ্ঠন ভেদ করে যোগী অতীন্দ্রিয় ঐক্যের উপলব্ধি করতে পারে।

† জন ১ ঃ ১৮ (বাইবেল)।

‡ জন ৫ ঃ ১৯ (বাইবেল)।

মানুষের ধারণাশক্তির অতীত, সেহেতু ভক্ত হিন্দু তাঁকে এই মহান ত্রিমূর্তিরূপেই পূজা করে থাকে।*

যাইহোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ভাবরূপ, তা ঈশ্বরের চরম, এমন কি তাঁর মূল প্রকৃতিও নয় (কারণ বিশ্বসৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র)।† এমন কি তাঁর ত্রিমূর্তির সকল রহস্য ভেদ করেও তার অন্তর্গূঢ় ভাব আবিষ্কার করা যাবে না, কারণ তাঁর বহিঃপ্রকৃতি, যা বিধিবদ্ধ আণবিক প্রবাহে প্রকাশিত, তা তাঁকে প্রকাশিত না করে কেবল তাঁর আভাসমাত্র প্রদান করে। ঈশ্বরের চরম প্রকৃতি কেবল তখনই জ্ঞাত হওয়া যায়, যখন "পুত্র পিতার নিকট গমন করেন।"‡ মুক্তমানব তখন সৃষ্টিরাজ্য অতিক্রম করে নিষ্কম্প আদিসত্তায় ফিরে যায়।

পরমরহস্যের সমাধানের প্রশ্নে সকল ধর্মোপদেষ্টাগণই নির্বাক রয়ে গেছেন। পিলেত যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্য কি?"§ যীশুখ্রিস্ট তার কোনই উত্তর দিলেন না। পিলেতের মত বুদ্ধিজীবিদের আড়ম্বরপূর্ণ বড় বড় প্রশ্ন কদাচিৎ জ্বলন্ত অনুসন্ধিৎসার ভাব থেকে উদয় হয়। এরূপ ব্যক্তিরা বৃথা দম্ভভরেই কথা বলেন, যাতে করে "খোলা মনের" পরিচয় যে তার আধ্যাত্মিক মূল্য,¶ তার বিশ্বাসের অভাবই সূচিত হয়।

---

* সৎ, তৎ, ওঁ অথবা পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা — এই ত্রয়ীবাদের সত্য হতে এ স্বতন্ত্র ধারণা। তৎ অর্থাৎ পুত্র, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অন্তর্নিহিত যে কূটস্থচৈতন্য, তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রয়ী ভাবেরই প্রকাশক। এই ত্রিমূর্তির যে সব 'শক্তি', বা 'স্ত্রী' তা সেই 'ওম্' বা পবিত্রাত্মার প্রতীক, যা কারণশক্তি হয়ে অনুকম্পনের সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করে আছে।

† "হে প্রভু ... তুমিই সব কিছু সৃষ্টি করেছ। তোমাকেই আনন্দ দিতে তাদের অস্তিত্ব আর তারা সৃষ্ট হয়েছিল।" — রিভিলেশ্যন ৪ ঃ ১১ (বাইবেল)।

‡ জন ১৪ ঃ ১২ (বাইবেল)।

§ জন ১৮ ঃ ৩৮ (বাইবেল)।

¶ "প্রেম ধর্ম; মুক্ত একা বাধাবন্ধনহীন, —
কেবল সেই-ই পারে শিখাইতে তোমা',
কিরূপে করিতে হয় আরোহণ সেথা,
আকাশ মণ্ডল হতে উচ্চতর স্থানে;
অথবা, সে ধর্ম যদি কভু হয় ক্ষীণ,
মর্ত্যে নেমে আসে স্বর্গ প্রেমধর্ম কাছে।"

— মিল্টন, কোমাস্।

"এই উদ্দেশ্যেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, আর এই কারণেই আমি পৃথিবীতে এসেছি, যাতে করে আমি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান করতে পারি। যে কেহ সত্যের পক্ষে, সেই আমার বাণী শুনতে পায়।"* এই সামান্য কয়টি কথায় যীশুখ্রিস্ট অনেক কথাই বলেছেন। ঈশ্বরের সন্তান যিনি, তিনি জীবনাদর্শে তার "সাক্ষ্য বহন" করেন। মূর্তিমান সত্য তিনি; তিনি যদি তার ব্যাখ্যা করতে যান, সেটা হবে তার উদার পুনরাবৃত্তিমাত্র।

সত্য কোন তত্ত্ব অনুমান, কোন ঔপপত্তিক বিষয় বা কাল্পনিক নীতি নয়, অথবা দর্শনশাস্ত্রের কোন অনুমানের প্রণালীও নয় বা কোন বুদ্ধিজাত অন্তর্দৃষ্টিও নয়। সত্য হচ্ছে বাস্তবসত্তা বা সদ্‌বস্তুর অবিকল প্রতিরূপ। মানুষের পক্ষে সত্য হচ্ছে তার আসল প্রকৃতি — আত্মারূপে তার স্বরূপের সুদৃঢ় জ্ঞান। যীশুখ্রিস্ট তাঁর প্রতিটি কার্য এবং বাক্যের দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে, ঈশ্বর থেকে যে তাঁর উৎপত্তি — তাঁর জীবনের সেই সত্যের বিষয় তিনি অবগত। সর্বব্যাপী খ্রিস্টচৈতন্য বা কূটস্থ চৈতন্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে তিনি চূড়ান্তভাবে শুধু একথাই বলতে পেরেছেন; "যারা সত্যের পক্ষে, তারা সকলেই আমার বাণী শ্রবণ করে।"

বুদ্ধদেবও পরমতত্ত্বের উপর আলোকপাত করতে অস্বীকারই করেছিলেন; নীরসভাবে শুধু এই কথাগুলি বলেছেন — পৃথিবীতে মানুষের দু'দিনের বাস, যেটা ভালভাবে ব্যয় করা যায় তার নৈতিক জীবনের উন্নতিসাধনেই। চৈনিক মরমিয়া সাধক লাও-ৎসু ঠিকই বলেছেন যে, "যে জানে, সে বলে না; আর যে বলে, সে জানে না।" ঈশ্বরতত্ত্বের চরম রহস্য "আলোচনার বিষয়ীভূত" নয়। তাঁর গুপ্তরহস্য ভেদ করা হচ্ছে এমন একটা বিদ্যাকৌশল যা মানুষ মানুষকে দিতে পারে না; এখানে ভগবানই হচ্ছেন একমাত্র শিক্ষাদাতা গুরু।

"স্থির হও আর উপলব্ধি কর যে আমিই ঈশ্বর।"† ঈশ্বরের সর্বব্যাপিত্বের জন্য সাড়ম্বর ঘোষণার কোন প্রয়োজন নেই; তাঁর

---

* জন ১৮ ঃ ৩৭ (বাইবেল)।

† সাম্‌স ৪৬ ঃ ১০ (বাইবেল)। যোগবিদ্যার লক্ষ্য হলো অন্তরে সেই প্রয়োজনীয় স্থিরতার আনয়ণ যাতে মানুষ প্রকৃত অর্থে "ঈশ্বরকে জানে।"

পরিস্ফুটবাণী নির্মল অন্তরে গভীর নীরবতার মধ্যেই শোনা যায়। নিখিল বিশ্বমাঝে প্রতিধ্বনিত প্রণব ঝঙ্কাররূপে নাদব্রহ্ম ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে মুহূর্তমধ্যে সুস্পষ্ট বাণীরূপে প্রকাশিত হয়।

মানববুদ্ধির পক্ষে বা যুক্তিতে যতটা বোধগম্য, ঈশ্বরের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি তা বেদেতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঋষিরা এই শিক্ষাই দিয়ে গেছেন যে, প্রত্যেক মানবই ঈশ্বর কর্তৃক একটি আত্মা রূপে সৃষ্ট হয়েছে, যাতে সে তার নির্গুণ অভেদত্বে ফিরে যাবার পূর্বে সেই অসীম সত্তার কতকগুলি বিশেষগুণ অপূর্বভাবে প্রদর্শন করতে পারে। দিব্য বৈশিষ্ট্যের কান্তি দ্বারা ভূষিত সকল মানবই ভগবানের কাছে সমভাবে প্রিয়।

পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে অগ্রজপ্রতিম যে ভারতবর্ষ, তার সঞ্চিত জ্ঞানেতেও তাই সমগ্র মানবজাতির সমান উত্তরাধিকার। সকল সত্যের মত, বৈদিক সত্যের অধিকারও ঈশ্বরের — একা ভারতবর্ষের নয়। মহাঋষিগণ, যাঁদের মন দিব্য বৈদিকজ্ঞানের গভীরভাব ধারণ করবার নির্মল ও পবিত্র আধার, তাঁরাও সমগ্র মানবজাতির এক অংশমাত্র। তাঁরা সমগ্র মানবজাতিকে সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়েই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন — অন্যত্র কোথাও যাননি। সত্যের রাজত্বে জাতি বা রাষ্ট্রের মধ্যে ভেদজ্ঞান একেবারেই নিরর্থক; সেখানে একমাত্র গ্রহণযোগ্য গুণ হচ্ছে — আধ্যাত্মিক উপযোগিতা।

ঈশ্বর প্রেমময়, — তাঁর সৃষ্টিপরিকল্পনাকে কেন্দ্রীভূত করা যেতে পারে একমাত্র প্রেমে। এই অত্যন্ত সরলভাব, পাণ্ডিত্যপূর্ণ যুক্তির চেয়ে কি মানবহৃদয়ে বেশি আশ্বাস প্রদান করে না? প্রত্যেক সাধক, যিনি পরম সত্যের অন্তস্তলে প্রবেশ করতে পেরেছেন তিনিই এই মহাসত্য প্রচার করে গেছেন যে, একটি দৈব বিশ্বপরিকল্পনা আছে, আর তা হচ্ছে পরম সুন্দর আর অসীম আনন্দময়।

ধর্মোপদেষ্টা ঈশাইয়াকে ঈশ্বর তাঁর অভিপ্রায় এই কয়টি কথায় ব্যক্ত করেছিলেন ঃ*

---

* ঈশাইয়া ৫৫ ঃ ১১-১২ (বাইবেল)।

"আমার মুখ হতে নির্গত আমার বাণী (সৃজনশীল 'প্রণবঝঙ্কার') এইরূপই হবে; নিষ্ফল হয়ে আমার কাছে তা ফিরে আসবে না, কিন্তু আমি যা চাই সে তাই সম্পন্ন করবে — আর আমি তাকে যে উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে থাকি না কেন, তাতে তার সমৃদ্ধিই হবে। কারণ, তুমি আনন্দেতে বিকশিত হবে এবং শান্তিতে নবজীবন লাভ করবে। পাহাড়পর্বত তোমার উদ্দেশে গীত গাইবে এবং প্রান্তরের বৃক্ষসকল করতালি দেবে।"

"আনন্দেতে বিকশিত হবে এবং শান্তিতে নবজীবন লাভ করবে" — এই বিংশ শতাব্দীতে দুঃখযন্ত্রণাক্লিষ্ট মানব এই অপূর্ব প্রতিজ্ঞা কতনা আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করে। এর অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণ সত্য সেইসব ঈশ্বরভক্তরাই উপলব্ধি করতে পারেন, যাঁরা তাঁদের দৈব উত্তরাধিকার পুনঃপ্রাপ্তির জন্য সাহস, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা করেন।

ঈশ্বরের আশীর্বাদপূত "ক্রিয়াযোগের" কার্য প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সবেমাত্র শুরু হয়েছে বলা যায়। সকল লোকেই জানুক যে মানবজাতির যাবতীয় দুঃখদুর্দশা মোচন করবার জন্যে আত্মোপলব্ধির এক সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পন্থা অবশ্যই আছে।

উজ্জ্বল মণিমুক্তার মত পৃথিবীর চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র ক্রিয়াযোগীদের নিকট প্রেমের ভাবতরঙ্গ প্রেরণ করবার সময় আমি প্রায়ই সকৃতজ্ঞচিত্তে ভাবি ঃ

"প্রভু, তুমি এই সন্ন্যাসীটিকে কত বড় সংসারই না দিয়েছ!"

শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ

জীবনে ও মরণে যিনি মহাযোগী

শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজী বিগত ১৯৫২ সালের ৭ই মার্চ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশস্থ লস্-অ্যাঞ্জেলস্ শহরে, ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী বিনয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের সম্বর্ধনায় আহুত এক ভোজসভায় বক্তৃতা দেবার পর 'মহাসমাধিতে' (যোগীর সজ্ঞানে দেহ থেকে শেষ নিষ্ক্রমণ) লীন হন।

এই মহান জগৎগুরু যোগের (ঈশ্বরানুভূতিলাভের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি) মূল্য কেবলমাত্র জীবনেই নয়, মরণেও প্রতিপন্ন করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পরেও তাঁর অবিকৃত মুখমণ্ডল বিকারহীনতার স্বর্গীয় জ্যোতিতে ভাস্বর ছিল।

লস্-অ্যাঞ্জেলসে অবস্থিত ফরেষ্ট-লন মিম্যরিয়্যাল পার্ক, (যেখানে মহান্ গুরুর মরদেহ সাময়িকভাবে রক্ষিত ছিল), শবাগারের ডিরেক্টর মিঃ হ্যারি. টি. রো. একটি প্রমাণিত লেখ্যপত্র সেল্ফ্-রিয়লাইজেশন ফেলোশিপকে প্রেরণ করেন। তাই থেকে নিম্নলিখিত উদ্ধৃতিটি গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

"পরমহংস যোগানন্দজীর মরদেহে পচনের কোন চাক্ষুষ প্রমাণের অভাব আমাদের অভিজ্ঞতায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ... মৃত্যুর কুড়িদিন পরেও তাঁর দেহে কোন প্রকার শারীরিক বিঘটন দৃষ্ট হয়নি ... তাঁর চর্মের উপর ছত্রাকের কোন নিদর্শনও পাওয়া যায়নি, আর তাঁর দেহপেশীর কোন শুষ্কতাও দৃশ্যতঃ ঘটেনি। শরীরের এইরূপ সম্পূর্ণ সংরক্ষণ, শবাগারের ইতিহাসে আমরা যতদূর জানি, একেবারে অতুলনীয় ... যোগানন্দজীর দেহ গ্রহণ করবার সময় শবাগারের কর্মচারীবৃন্দ শবাধারের কাচের ঢাকনার মধ্য দিয়ে দেহের ক্রমশঃ পচন দেখবে বলে আশা করেছিল। আমাদের বিস্ময় দিনের পর দিন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়েই চলল, যখন দেখা গেল যে, পর্যবেক্ষণে রক্ষিত দেহে চাক্ষুষ পরিবর্তন কিছুই ঘটে নি। যোগানন্দজীর দেহ দৃশ্যতঃ অবিকৃতির এক অসাধারণ অবস্থায় ছিল। ...

"কোন সময়েই তাঁর দেহ হতে পচনক্রিয়াজনিত কোন দুর্গন্ধ নির্গত হয়নি। ... পরমহংসজীর দৈহিক আকৃতি ৭ই মার্চ তারিখে যেমন ছিল, ২৭শে মার্চ তারিখে তাঁর শবাধারের ব্রোঞ্জ ঢাকনা বন্ধ করার সময়েও সেই একইরকম অবস্থায় ছিল। মহাপ্রয়াণের রাত্রিতে তাঁর দেহ যেরূপ ছিল, ২৭শে মার্চ তারিখে তাঁর সেই দেহ একইরূপ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, পচনশূন্য ও অবিকৃতই দেখাচ্ছিল। তাঁর দেহের যে কোনরকম চাক্ষুষ বিকৃতি ঘটেছিল, ২৭শে মার্চ তারিখে এ'কথা বলার কোন কারণ ঘটেনি। এইসব কারণে আমরা আবার বলি যে, পরমহংস যোগানন্দজীর দেহত্যাগ আমাদের অভিজ্ঞতায় একেবারে অভূতপূর্ব।"

১৯৭৭ সালে শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দের পঁচিশতম *'মহাসমাধি'* বার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সম্মানে ভারত সরকার এই স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ডাকটিকিটের সঙ্গে সরকার যে পরিচয় পুস্তিকাটি প্রকাশ করে, তাতে এই কথাগুলি লেখা ছিল ঃ

> "ভগবৎপ্রেম ও মানবসেবা — এই দুই আদর্শই পরমহংস যোগানন্দের জীবনে পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছিল ... জীবনের বেশিরভাগ সময় ভারতের বাইরে অবস্থান করলেও, তিনি আমাদের মহান সাধু-মহাত্মাদেরই একজন। তাঁর কর্মধারা যেমন ক্রমবর্ধমান, তেমনি তা ক্রমশঃ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে, এবং সর্বত্রই মানুষকে ব্রহ্মদর্শনলাভের পথে আকৃষ্ট করছে।"

যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়ার
আদর্শ ও লক্ষ্য

গুরুদেব ও প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দ
সঙ্ঘমাতা ও সভানেত্রী—শ্রীশ্রী মৃণালিনীমাতা

ঈশ্বরের সাথে প্রত্যক্ষ যোগস্থাপনার সহায়তার উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ার শিক্ষা বিভিন্ন দেশে প্রচার করা।

স্ব-প্রচেষ্টায় মানুষের সীমিত নশ্বর চৈতন্যকে ভগবৎ চৈতন্যে ক্রমোন্মেষ করাই জীবনের লক্ষ্য — এই শিক্ষাদান করা, এবং সেই উদ্দেশ্যে ভগবৎ-মিলনের জন্য সর্বত্র যোগদা সৎসঙ্গ মন্দির স্থাপন এবং মানব-অন্তরে ও আবাসে, নিজস্ব ঈশ্বর-উপাসনালয় স্থাপনে উৎসাহদান।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রবর্তিত আদি যোগ ও যীশুখৃস্ট প্রচারিত আদি খৃস্টীয় মতবাদের মধ্যে মূলগত ঐক্য ও সামঞ্জস্য উদঘাটন করা, এবং সত্যের এই তত্ত্ব যে সমস্ত সত্য ধর্মেরই সাধারণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি — তাহা প্রতিষ্ঠা করা।

নিত্য, বিজ্ঞানসম্মত, ভক্তিপূর্ণ ঈশ্বর-তপস্যাই যে সকল সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাসের নির্দেশিত একমাত্র দিব্য পথ, তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

মানুষকে ত্রিমুখী যন্ত্রণা মুক্ত করা — শারীরিক ব্যাধি, চিত্তচাঞ্চল্য, ও আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা।

"সাধারণ জীবনযাপন করা ও উচ্চ চিন্তা করায়" উৎসাহ দান। মানুষের ঐক্যের সনাতন সত্য হলো ঐশ্বরিক সাযুয্য — এই শিক্ষা প্রচারের দ্বারা সার্বিক ভ্রাতৃত্ববোধ জাগরিত করা।

শরীর থেকে মন, এবং মন থেকে আত্মার উৎকর্ষতা প্রতিপন্ন করা।

অসৎকে সৎ, বিষাদকে হর্ষ, নিষ্ঠুরতাকে দয়া, এবং অজ্ঞতাকে জ্ঞানের দ্বারা জয় করা।

বিজ্ঞান ও ধর্মের মূল অন্তর্নিহিত সূত্র যে এক, এই সত্যকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে তাদের একত্রিত করা।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক সহমর্মিতা প্রচার করা ও উভয়ের বিশিষ্ট উপাদান আদান-প্রদান করা।

সর্বমানবকে নিজ আত্মার বৃহত্তর প্রকাশরূপে সেবা করা।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঋ

এ

ও

ক

খ

গ

ঘ

চ

জ

ট

ঠ

ড

ত

থ

দ

য

র

ল

শ

স

হ

YOGODA SATSANGA LESSONS

The *Yogoda Satsanga Lessons* are unique among Paramahansaji's writings in that they give his step-by-step instructions in yoga techniques for God-realization. The simple yet highly effective methods taught in the Lessons enable one to harmonize and recharge the body with life energy; to awaken the unlimited power of the mind; and, above all, to achieve direct, personal experience of God through the *Kriya Yoga* science of meditation.

In addition, the Lessons cover a broad range of other subjects—offering inspiration and practical guidance for living every day in greater harmony with oneself and others, and for coping with the multitude of problems that seem so pressing in today's world. A few of the many topics covered are:

- **Strengthening the Power of Will for All-Round Success**
- **Freeing Yourself From Bad Habits**
- **Banishing Fear, Worry, & Stress**
- **Spiritualizing Business**
- **Finding & Expressing Unconditional Love**
- **Understanding Karma & Reincarnation**
- **Creating Harmony in Family Life & Marriage**
- **The Art of Getting Along With Others**
- **How to Weave God into Your Daily Life**
- **Life After Death**
- **How to Build World Unity**
- **Yoga Principles of Rejuvenation & Healing**

For free Introductory Literature, please write or call:

YOGODA SATSANGA SOCIETY OF INDIA
Paramahansa Yogananda Path
Ranchi 834001, Jharkhand
Tel: (0651) 2460071, 2460074, 2461578
www.yssofindia.org

OTHER BOOKS BY PARAMAHANSA YOGANANDA

- ধর্ম-বিজ্ঞান
- আধ্যাত্মিক ধ্যান
- সাফল্য লাভের নিয়ম
- আধ্যাত্মিক দিনলিপি
- সঙ্কল্প ও নিরাময় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি
- যোগ ও তার বিশ্বজনীনতা
- পরমহংস যোগানন্দ বাণী
- দিব্যবাণী
- কেমন করে তুমি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলবে
- Man's Eternal Quest
- The Divine Romance
- Living Fearlessly
- Inner Peace
- Journey to Self-realization
- Where There Is Light
- In the Sanctuary of the Soul
- To be Victorious in life
- Why God Permits Evil and How to Rise Above It
- God Talks With Arjuna: *The Bhagavad Gita (A New Translation and Commentary)*
- The Second Coming of Christ: *The resurrection of the Christ Within You—A Revelatory Commentary of the Original Teachings of Jesus*
- Autobiography of a Yogi (MP3 Audiobook, read by Sir Ben Kingsley)
- Words of Cosmic Chants

OTHER PUBLICATION FROM YOGODA SATSANGA SOCIETY OF INDIA

- "মেজদা"—শ্রীশ্রী পরমহংস যোগানন্দজীর পূর্বজীবন ও পারিবারিক বৃত্তান্ত—*শ্রী সনন্দলাল ঘোষ*
- গীতা তত্ত্ব—*শ্রীশ্রী স্বামী শ্রীযুক্তেশ্বর গিরি*
- ভক্ত গুণাবলী—*শ্রীশ্রী দয়ামাতা*
- The Holy Science *by Sri Sri Swami Sri Yukteswar Giri*
- Paramahansa Yogananda: In Memoriam—*Personal Accounts of the Master's Final Days*
- Only Love: Living the Spiritual Life in a Changing World *by Sri Sri Daya Mata*
- Finding the Joy Within You: Personal Counsel for God-Centered Living *by Sri Sri Daya Mata*
- God Alone: The Life and Letters of a Saint *by Sri Gyanamata*
- Rajarsi Janakananda—A Great Western Yogi *The Life of Paramahansa Yogananda's First Spiritual Successor*
- Two Frogs in Trouble

Audio Recordings of Paramahansa Yogananda

- Beholding the One in All
- Awake in the Cosmic Dream
- The Great Light of God
- Be a Smile Millionaire
- To Make Heaven on Earth
- One Life Versus Reincarnation
- In the Glory of the Spirit
- Removing All Sorrow and Suffering
- Self-Realization: The Inner and the Outer Path
- Songs of My Heart (Chants, Poems, and Prayers)

Audio CDs by Sri Sri Daya Mata

- Moral Courage
- Free Yourself From Tension
- Finding God in Daily Life
- "My Spirit Shall Live On..."
- Anchoring Your Life in God
- Karma Yoga
- A Heart Aflame
- Living a God Centred Life
- God First
- Let Us Be Thankful
- Strengthening the Power of the Mind
- Understanding the Soul's Need for God
- Is Meditation on God Compatible with Modern Life?

DVDs

- The Life of Sri Sri Paramahansa Yogananda: *The Early Years in America (1920–1928)*
- Him I Shall Follow
- Living in the Love of God
- You Can Know God in This Life
- Security in a World of Change
- Opening Your Heart to God's Presence
- Be Messengers of God's Light and Love
- In His Presence
- Portal to the Inner Light
- The Wisdom of the Bhagavad Gita
- Your Thoughts Can Change Your Life

সম্যক জীবনযাপন পুস্তিকামালা

শ্রী শ্রী পরমহংস যোগানন্দের ঃ

❖ প্রার্থনার প্রত্যুত্তর

❖ সাফল্যলাভের জন্য মনঃশক্তির কেন্দ্রীকরণ

❖ শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক নিরাময়করণ প্রক্রিয়ার সমন্বয়সাধন

❖ ঈশ্বরের অসীম শক্তির সাহায্যে নিরাময়করণ

❖ দিব্যপ্রেম উন্মোষণার উপায়

❖ জয়লাভের পথানুসন্ধান

❖ জীবনকে পুনর্গঠিত করা

❖ উদ্বেগমুক্ত চেতনা

❖ আমাদের পরলোকগত প্রিয়জনরা কোথায় ?

শ্রী শ্রী দয়া মাতার ঃ

❖ অপরকে পরিবর্তনের উপায়

❖ চারিত্রিক বাধ্যবাধকতাকে জয় করা

❖ দক্ষতার সঙ্গে সন্তান প্রতিপালন করা

শ্রী শ্রী মৃণালিনী মাতার ঃ

❖ গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ

Some of the above-mentioned books are also published in Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu and Urdu. For a complete list of books and audio recordings write to Yogoda Satsanga Society of India at the address given below. Also available are black-and-white and colour pictures of Sri Sri Paramahansa Yogananda.

Available at your local bookstore or from:

Yogoda Satsanga Society of India
Paramahansa Yogananda Path, Ranchi 834001, Jharkhand
Tel: (0651) 2460071, 2460074, 2461578
www.yssofindia.org
Order online at: yssbooks.org

AFFIX
POSTAGE
STAMP
HERE

Yogoda Satsanga Society of India
Paramahansa Yogananda Path
Ranchi 834001, Jharkhand
India

সম্যক জীবনযাপন পুস্তিকামালা

শ্রী শ্রী পরমহংস যোগানন্দের ঃ

- ❖ প্রার্থনার প্রত্যুত্তর
- ❖ সাফল্যলাভের জন্য মনঃশক্তির কেন্দ্রীকরণ

Before mailing please tear at the perforation

Yogoda Satsanga Society of India

Paramahansa Yogananda Path, Ranchi 834001, Jharkhand

Ph: (0651) 2460071, 2460074, 2461578

Please return this card if you would like to receive:

- ☐ More information about Yogoda Satsanga Society of India and the *Yogoda Satsanga Lessons.*
- ☐ A catalogue of other books published by Yogoda Satsanga Society of India.
- ☐ A free copy of *Yogoda Satsanga* Magazine.
- ☐ Yogoda Satsanga eNewsletter (Your Email ID): ____________

I FOUND THIS CARD IN (name of book): ____________

SRI/SMT./KUM. ____________

ADDRESS ____________

CITY ____________ STATE ____________

PIN CODE ____________

www.yssofindia.org

Paramahansa Yogananda Path, Ranchi 834001, Jharkhand
Tel: (0651) 2460071, 2460074, 2461578
www.yssofindia.org
Order online at: yssbooks.org